পরিচয়

বার্ষিক
৪।০
প্রতি সংখ্যা

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিষয় সূচী

পথ ও পাথেয়	...	কাজী আবদুল ওদুদ
বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া	...	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সোশ্যালিজম্-এর মূলসূত্র	...	শ্রীসুশোভন সরকার
আধুনিক নাট্য-প্রসঙ্গ	...	শাহেদ সুরহ্বর্দ্দি
ছন্দবিতর্ক	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুরানো কথা	...	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
বৌদ্ধধর্ম্মের দান	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী
যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ	...	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নাই বা হোল চেরীফুল (অনুবাদ)	...	শ্রীস্বয়ম্ভু চক্রবর্ত্তী
কবিতাগুচ্ছ	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীলীলা রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ, শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল ইত্যাদি।

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ইস্‌লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ তার জীবনের সত্যকার স্বাদ পেতে পারে, সারা জগৎ সন্ধান ক'রে এ তিনি বুঝেছেন,—এতে ইস্‌লামকে দাঁড় করানো হল এক সুমহৎ বিশ্ব-আদর্শ হিসাবেই, তার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা বা কার্য্যকারিতাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল হয় না।

কিন্তু যুক্তির সাহায্য যে ইকবাল বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন, অথবা করতে চেয়েছেন এতেই বহু শ্রেণীর যুক্তিবাদীর আঘাতের স্থল তাঁকে হ'তে হয়েছে, আর এই যুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হ'লে পরম বিনয়ে হার স্বীকার না ক'রে তাঁর উপায় নাই। অন্যভাবে কথাটি বল্‌লে দাঁড়ায়—যুক্তির সাহায্যে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি যুক্তিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অর্থাৎ যুক্তির আশ্রয় তিনি যখন নিয়েছেন তখন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে যুক্তিতে যা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় তাই-ই শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে Dr. Nicholson তাঁর অনূদিত Secrets of the Self-এর ভূমিকায় বলেছেন—

Iqbal's philosophy is religious, but he does not treat philosophy as the handmaid of religion. Holding that the full development of the individual presupposes a society, he finds the ideal society in what he considers to be the Prophet's conception of Islam.

ইকবালের মতবাদ এইবার একটু বুঝতে চেস্টা করা যাক।

বলা হয়েছে তিনি শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী—নিজের শক্তিতে যে বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে পারলেনা, তাঁর মতে সে কৃপার পাত্র। এই শক্তির বাণী প্রচার ক'রে একদিকে যেমন পতিত মুসলমানের কানে জড়তা বিসর্জ্জনের মন্ত্র দেওয়া হলো অন্যদিকে তেম্‌নি তার কল্পনা উদ্দীপ্ত করা হলো, তার অবসন্ন শিরায় শিরায় এক নূতন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল,—মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের এক মহাসার্থকতার দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হলো।

এম্‌নিতর অনুভূতির পরক্ষণে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক—এই সার্থকতা লাভ হবে কোন্ পথে ?

মানুষের মুখে এ বড় নিষ্ঠুর প্রশ্ন। কিন্তু নেতারা এ প্রশ্নের উত্তর দেন—ইক্‌বালও দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—মুসলমানের পতনের কারণ সে ইস্‌লাম ছেড়ে দিয়েছে, তার পূর্ব্বপুরুষ বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন ইস্‌লাম অবলম্বন ক'রে। এই কথাটি একটি ইংরেজী বক্তৃতায় খুব জোরালো ক'রে তিনি বলেছেন এই ভাবে—

In times of crises in their History it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims.

এ উত্তরে বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে ইস্‌লাম বলতে অনেকখানি সুস্পষ্ট এক আদর্শ তাঁর মনে আছে, তার মাহাত্ম্য তাঁর কাছে অপরিসীম। কিন্তু

তাঁর এই উক্তির ক্রটি এই যে তিনি এখানে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন নূতন অর্থে। ইস্‌লাম ব'লতে তিনি বোঝেন শক্তিমত্তা, কিন্তু বহু প্রাচীন মুস্‌লিম মনীষী ইস্‌লাম ব'লতে বুঝেছেন আত্মসমর্পণ। কেউ ব'লতে পারেন, এ দুইয়ে আসল পার্থক্য হয়ত নেই। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে শক্তিবাদী ইকবাল বিশেষভাবে চাচ্ছেন মুসলমানের জন্য রাজনৈতিক গৌরব, কিন্তু সমর্পণধর্ম্মী অনেক মুসলিম মনীষী ঠিক তাই-ই চান নাই।

তারপর ঐতিহাসিক ঘটনারও তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, সঙ্কটকালে ইস্‌লাম মুসলমানকে উদ্ধার করেছে। একটি সুপরিচিত সঙ্কটকালের কথা ভাবা যাক—মোতাজেলা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের সংঘর্ষ-কাল। ইস্‌লামের সেই সুপরিচিত সঙ্কটকালে ইমাম গাজ্জালি জয়ী হয়েছিলেন ও মোতাজেলা-নেতা ইবনে রোশ্‌দ (Averroes) পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ জয় ইস্‌লাম ও মুসলমানের জন্য সত্যকার জয় হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মুস্‌লিম চিন্তাশীলদের ভিতরেই প্রবল মতভেদ বিদ্যমান। এই সম্পর্কে এই ব্যাপারটির উল্লেখ হয়ত অসঙ্গত হবে না যে পরাজিত ইবনে রোশ্‌দের চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান ইয়োরোপ, আর বিজেতা ইমাম গাজ্জালির চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান মুস্‌লিম জগৎ। বলা যেতে পারে—ইতিহাস শেষ হয়ে যায় নাই। তা সে-শেষ বিজেতা বিজিত কারো জন্যই হয় নাই।

উর্দ্দু কাব্যরসিকরা এ বিষয়ে বোধ হয় একমত যে মুসলমানের পতনের জন্য বেদনা যাতে ব্যক্ত হয়েছে সেই শেক্‌ওয়া-র চাইতে তার প্রতিকারের কথা যাতে বলা হয়েছে সেই জওয়াব-ই-শেক্‌ওয়া কাব্য-হিসাবে নিকৃষ্টতর। এর থেকে দৃষ্টিমানরা সহজেই বুঝতে পারেন প্রতিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অকুণ্ঠিত বাণী উচ্চারণ করতে ইকবাল পারেন নাই—যদিও তার সন্ধানে তিনি ফিরছেন। কিন্তু তা না পারলেও তাঁর এই সব কথার প্রভাব কম না হওয়াই সম্ভবপর। তিনি যা বলছেন মুসলমান সমাজে তাই-ই প্রচলিত মত, তার উপর এর সঙ্গে তাঁর সংস্রব এ'কে নূতন শক্তি দিয়েছে।

ইকবালের রচনায় দার্শনিকতা থাকলেও আসলে তিনি কবি—ইস্‌লাম বলতে এক নূতন সৌন্দর্য্যচ্ছবি * তাঁর মনোনেত্রে আবির্ভূত হয়েছে, তার মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত বিশ্বাসবান।

---

* কবিদের উদ্দেশ্যে গ্যেটে এই একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন:—যখন হৃদয় মন উধাও হয়ে ওঠে তখন, হে তরুণ, মনে রেখো কল্পনাদেবী (Muse) সঙ্গিনী হতে পারেন কিন্তু অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ তাঁর নয়।—Goethe by B. Croce, p. 4.

এই একান্ত বিশ্বাস অশ্রদ্ধার যোগ্য নয় বরং শ্রদ্ধেয়,—নূতন বিশ্বাসে মানুষ তার অন্তরে অন্তরে এক নিবিড় পুলক অনুভব করবে ও অপরকে সেই আনন্দ উপহার দেবে এর চাইতে ভাল কাজ সে আর কি করতে পারে! কিন্তু বিশ্বাসের প্রভাব মানুষের উপর এ না হয়ে হয় অন্য রকমের—এর প্রভাবে মানুষ হয়ে ওঠে নিদারুণ অত্যাচারী। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে—একালের জাতীয়ত্ব-বাদীরা নূতন ক'রে এই অভিশাপগ্রস্ত হয়েছেন। ইকবাল বলছেন, ইস্‌লাম মানুষের জন্য "আবে হায়াত" (Elixir), ডাঃ মুঞ্জে বা শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, হিন্দুত্ব মানুষের জন্য অমোঘ বিধান—এসব কথা মানুষ কখনো ধীরে-সুস্থিরে বুঝে দেখতে চেষ্টা করবে কিনা জানিনা, কিন্তু এর প্রভাবে ভারতবাসীর জীবন যে হয়ে উঠ্‌ল দুর্ব্বহ। মনীষী সাদী বলেছেন—সাধু উদ্দেশ্যের মিথ্যা অসাধু উদ্দেশ্যের সত্যের চাইতে ভাল; ইকবাল বা আধুনিক হিন্দু মনীষীদের ব্যাখ্যাত ইস্‌লাম-আদর্শ বা হিন্দুত্ব-আদর্শ যদি যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে অভ্রান্তও হতো তবু সে-সবের এমন ভয়াবহ পরিণতি দেখে মানুষের জন্য সে-সবের উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করা অসঙ্গত হতো না।

ইকবালের ইস্‌লাম-ব্যাখ্যার দুর্ব্বলতা কোথায় তা কিছু বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। এর উৎপত্তি-সূত্র খুঁজলেও বুঝতে পারা যাবে এর দুর্ব্বলতা—আধুনিক জগতে মুসলমান এক পতিত সম্প্রদায় অথচ এ জ্ঞান তাঁদের আছে যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ জগজ্জয়ী হয়েছিলেন,—রুগ্নের পক্ষে উত্তেজনা অকল্যাণকর।

কিন্তু যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে কোনো মতবাদ দুর্ব্বল হ'লেও মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব প্রবল হ'তে বাধ্‌তে না-ও পারে, বিশেষতঃ ইকবালের বাণীতে যখন রয়েছে প্রত্যয়ের তেজ ও এক অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছটা।

ইকবালকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ না ক'রে ভারতীয় মুসলমান হয়ত পারবেন না যদি অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা তাঁদের সামনে উন্মুক্ত না হয়।

ইকবালের চিন্তার চাইতে অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা ভারতীয় মুসলমানদের সামনে আছে কি না বলা শক্ত। তবে এ কথা সত্য যে অন্য একটি চিন্তাধারাও কিছুদিন থেকে তাঁদের সামনে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধারা প্রবর্ত্তিত করেছেন মুস্তফা কামাল।

মুস্তফা কামালের সত্যকার অনুরাগী ভারতীয় মুসলমানদের ভিতরে তেমন বেশী হয়ত নেই—অন্ততঃ 'আলেম'-সম্প্রদায়ের ও নেতা-ও সম্পাদক-

সম্প্রদায়ের কথাবার্ত্তা শুনে তাই-ই মনে হয়। তবে তরুণ মুসলিম কামালের কর্ম্মচেষ্টার অর্থ পূরোপূরি না বুঝেও মোটের উপর হয়ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই তাঁর পানে চেয়ে আছেন। বাংলা দেশে এই দল নিজেদের আদর্শের নাম দিয়েছেন—বুদ্ধির মুক্তি।

ইকবালের ইস্‌লাম-আনুগত্যের আদর্শ আর মুস্‌লিম তরুণদের এই বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ পরস্পর-বিরোধী মনে হ'তে পারে। এ দুয়ে খুব বড় পার্থক্যও আছে,—একের দৃষ্টি শাস্ত্রের পানে খুব বেশী, অপরের দৃষ্টিতে শাস্ত্র জীবনের বহু উপকরণের এক উপকরণ, একের ভিতরে রয়েছে একটি আদর্শের জন্য আকুলতা, অপরের ভিতরে আছে আত্মপ্রকাশের আনন্দ ও সহজ জগৎ-প্রীতি,—তবু এই দুয়ের ভিতরে এই বড় মিল রয়েছে যে দুই-ই যুক্তিপন্থী, দুয়েরই চরম লক্ষ্য সত্য ও জগতের কল্যাণ।

বাংলার মুস্‌লিম সমাজে এই 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদের উদ্ভবের মূলে তিনটি বড় কারণ দেখতে পাওয়া যাবেঃ—প্রথমতঃ, ইসলামের সত্যকার সামাজিকরূপ বাংলার মুস্‌লিম জীবনে নগণ্য অথচ এরও উপর ধর্ম্মের হুকুম প্রবল করতে চেষ্টা করা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মসাধনার দেশ, আউল-বাউলের দেশ, ধর্ম্মসংহিতাদির প্রভাব এ-দেশের লোকদের জীবনে অল্প। শতাধিক বৎসর আগে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান দরবেশ তাঁর 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থে হজরত মোহম্মদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

মোর পরে পয়গাম্বর না জন্মিব আর ॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন ॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিআ।
প্রভুপ্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ ॥

বাংলার মুসলমান বাউলদের রচনায় চিন্তার স্বাধীনতা খুবই লক্ষ্য-যোগ্য; তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে শতাধিক বৎসর যাবৎ চিন্তা ও কর্ম্মের বিশ্বধারায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাতে বাংলার জাতীয় জীবনে আশানুরূপ ফল ফলেছে কিনা সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও বলা যায় এ ঢেউ আজো যে প্রবল তার আধুনিকতম প্রমাণ শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'। এ ঢেউ যে বাংলার মুস্‌লিম সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদেরও লাগ্‌বে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু এরও চাইতে বড় কারণ এই অভিনব মুস্‌লিম জাগরণের মন্ত্রের মূলে হয়ত আছে। আধুনিক তুর্ক যে ইউরোপের ইতিহাস থেকে নিজেদের কর্ম্মচেষ্টার নজির সংগ্রহ করছেন এ কথা অনেকেই বলেছেন,

তার সঙ্গে একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে এই ধরণের কর্ম্মপ্রেরণার উৎস ইস্‌লামের নিজের ভিতরেই আছে। ইস্‌লাম দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছে, পৌরহিত্য রহিত করেছে, নরনারীনির্ব্বিশেষে ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, কাণ্ডজ্ঞানের এই জয়যাত্রা শাস্ত্রের দুর্জ্জেয় মাহাত্ম্যের সামনে যুগের পর যুগ প্রতিহত হবে, এ আশা করা সঙ্গত না-ও হ'তে পারে। ইকবাল নিজেই তাঁর নবপ্রকাশিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন—

The birth of Islam is . . . . . the birth of inductive intellect. In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition (p. 176).

এই বুদ্ধির মুক্তির জন্মবেদনা বারবার মুস্‌লিম জগতে অনুভূত হয়েছে। পশ্চিমের আবু হানিফা ও মোতাজেলা সম্প্রদায় ও পূর্ব্বের আকবর ও আবুল ফজল এর কিছু কিছু প্রমাণ।

তা উৎপত্তি-সূত্র যাই-ই হোক তার চাইতে বড় কথা এর অনুবর্ত্তীদের অন্তরে এর জন্য অনুরাগ ও সমসাময়িক জীবনের জন্য এর প্রয়োজন। এর অনুবর্ত্তীদের অন্তরে এ এক অভিনব স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির আনন্দ এনে দিয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর এর প্রয়োজন সুগভীর ব'লেই মনে হয়। আমরা গৃহে বাস করি সত্য কিন্তু সে-গৃহ নির্ম্মিত হয় আকাশের নীচে। বিভিন্ন জাতীয়ত্ব বা সাম্প্রদায়িকতাও তেম্‌নি মানুষের জন্য অসত্য নয়, কিন্তু সকলে মিলে মানুষ এক বিশ্ব-পরিবার সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য রয়েছে; এই বৃহত্তর জীবনের কথা মানুষ যখন বিস্মৃত হয় তখনই আরম্ভ হয় তার দুর্দ্দিন। মুস্‌লিমত্বের অভিমান বা হিন্দুত্বের অভিমানের চাইতে বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর জন্য পরম কল্যাণকর আদর্শ, একথা হয়ত নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

মুস্‌লিম জাগরণ সম্পর্কে ইকবালের যে-সব কথার আলোচনা আমরা করেছি সে সব তাঁর আগেকার লেখা কাব্য থেকে নেওয়া। মনে হয় কিছু মত-পরিবর্ত্তন সম্প্রতি তাঁর হয়েছে। তাঁর নবপ্রকাশিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে (এর উল্লেখ একবার করা হয়েছে) তুর্কীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেও তিনি তা'র সংস্কার চেষ্টা মোটের উপর শ্রদ্ধা ও আনন্দের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য—

If the Renaissance of Islam is a fact, and I believe it is a fact, we too one day, like the Turks, will have to revaluate our intellectual inheritance . . . . The truth is that among the

Muslim nations of to-day Turkey alone has shaken off its dogmatic slumber, and attained to self-consciousness. She alone has claimed her right of intellectual freedom; she alone has passed from the ideal to the real—a transition which entails keen intellectual and moral struggle. To her the growing complexities of a mobile and broadening life are sure to bring new situations suggesting new points of view, and necessitating fresh interpretations of principles which are only of an academic interest to a people who have never experienced the joy of spiritual expansion. It is, I think, the English thinker Hobbes who makes this acute observation that to have a succession of identical thoughts and feelings is to have no thoughts and feelings at all. Such is the lot of most Muslim countries to-day. They are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values.

কিন্তু ইকবাল নিজে বদলালেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব মুস্‌লিম জনসাধারণের উপর অন্য রকমের হওয়া বিচিত্র নয়। মনীষী বার্ণার্ড শ বলেছেন—পরাধীনতায় যে ভুগছে তার অবস্থা 'ক্যান্‌সার'গ্রস্ত রোগীর মতো, যে-কেউ চেঁচিয়ে বলে সে ওষুধ জানে তারই শরণাপন্ন সে হয়। 'মুসলমান বড় অবনত পতিত' এই inferiority complex-এর জন্য তার উপর ইকবালের বাণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত রকমের হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মুস্‌লিম জনগণের সামনে এই যে দুই পথ তার বিচিত্র পাথেয় নিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে এর কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবলম্বন হবে সে-উত্তর আজ দেওয়া সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ নিশ্চয়ই খুব সহজসাধ্য আদর্শ নয়; তবে মানুষের সাধনা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে, আর এতেই তার আনন্দ, তাই ভয় পাবারও কিছু নেই। আজ হয়ত মুসলমানের পক্ষে প্রয়োজন একান্ত ক'রে ভাবা কোন্‌টির কি ফল। তারই সঙ্গে সঙ্গে inferiority complex-এর স্থানে জীবনে আনন্দ ও শ্রদ্ধা এবং মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস তার পক্ষে যদি সত্য হয় তবে সেটি হবে তার পক্ষে ও জগৎ বা বৃহত্তর দেশের পক্ষে যেন এক দৈব অনুকম্পা।

তাহ'লে আজকের এই পতিত ভারতীয় বা বাঙালী মুসলমানই হবে অন্ততঃ তার নিজের দেশের জন্য কল্যাণের সিংহদ্বার।

কাজী আবদুল ওদুদ।

বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া

পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ, উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের সম্বন্ধ, আপাততঃ অসম্ভব মনে হোলেও জগতে নিত্যই ঘোট্‌ছে। আমরা মনে মনে নিজেদের চারিদিকে, পরিবারের চারিদিকে, দেশের চারিদিকে দেয়াল গেঁথে রাখতে চাই, কিন্তু নিয়তির বিচিত্র বিধানে সে দেয়াল ধোসে যাচ্ছে। প্রতিনিয়তই বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মিলনের বার্ত্তাও আকাশে বাতাসে ভেসে আসে, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তা কিছুমাত্র নির্ভর করে না। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—কত বিভিন্ন; বেশ-ভূষা, জীবনযাত্রার প্রণালী, পারিবারিক সম্বন্ধ—কত দিকে উভয়ের মিল নেই; কিন্তু অমিল সত্বেও পরস্পরে মিলবার একটা চেষ্টা—হয়ত তাদের অজ্ঞাতসারেই—চোল্‌ছে। তাই সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়েও ইংরাজের সাহিত্য, আমেরিকার কাব্য, ফরাসীর ফ্যাশান, জার্ম্মানীর মাল, রাসিয়ার সাধনা হিমালয় দ্বারা সুরক্ষিত, সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতভূমির মধ্যে আত্মপ্রকাশ কোর্‌ছে। তাই শেক্সপিয়ার ও হুইটম্যান, গেটে ও লিঙ্কন, টলষ্টয় ও লেনিন, এঁদের জীবনের সাধনা ও ভাবধারার সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত।

আমাদের এই পরিচয় তো নিতান্ত অল্পদিনের নয়। ঐতিহাসিকেরা দুহাজার বৎসরের পূর্ব্বেও ভারতের ও গ্রীসের যোগ আবিষ্কার কোরেছেন। প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমান যুগের আলোচনায় দেখতে পাই, ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে পোর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসবার সহজ পথ বের করে; ভাস্কো দা গামা ভারতে আসবার এই নব পথ প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৪৯৮ খ্রীঃ তিনি পূর্ব্ব উপকূলে মান্দ্রাজের নিকটে কালিকটে জাহাজ লাগান, সেখানকার অধিপতি তাঁকে অতিথি-সমুচিত সমাদরে বরণ করেন। এসব ইতিহাসের কথা। সেই বিচিত্র জলযাত্রার ফলে ভারতের যে-ঐশ্বর্য্য পোর্ত্তুগীজের কাছে প্রতিভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল, যে-ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের চাবী তাদের হাতে এসে পোড়্‌ল, সে-সম্বন্ধে জাতীয় মহাকাব্য পর্য্যন্ত রচনা হোয়েছিল; কামোয়েন্সের লুসিয়াদ্ পোর্ত্তুগীজ সাহিত্যের এক অতি উজ্জ্বল রত্ন, ইউরোপীয় সাহিত্যের এক মহতী কীর্ত্তি; কামোয়েন্স অদ্ভুতকর্ম্মা গামার গৌরবে উল্লসিত হোয়ে বোল্‌ছেন,—

I sing a daring Lusitanian name,
O'er Neptune and o'er Mars to rule ordained;
Cease all the Ancient Muse resounds, for lo!
Another valour bolder front doth show. (Canto I, St. III.)

"সেই সাহসী পোর্ত্তুগীজ বীরের কীর্ত্তিকাহিনী গাইছি, যিনি জলদেবতা ও যুদ্ধ দেবতার উপরেও প্রভুত্ব কোরেছিলেন; প্রাচীন কবি-কাহিনীর সকল প্রতিধ্বনি থামুক—আরও সাহসের পরিচয় দিয়ে বীর্য্যবান পুরুষ উপস্থিত হোয়েছেন যে।" ভারতের নূতন পথ আবিষ্কার কোরে গামা এরূপে জাতীয় প্রশংসার ভাজন হন।

পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বের এই অভিনব সংস্পর্শের ফলে এইরূপে পাশ্চাত্য সাহিত্যে নূতন হাওয়া, নূতন সুর এল বটে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী পরিবর্ত্তন এল ভারতের সাহিত্যে, ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে; নূতন অনুভূতির বিচিত্র স্পন্দনে তাদের সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, সৃষ্টি হোলো এক অভিনব কাকলীর, এক সুমধুর সঙ্গীতের, এক নূতন ভাবনার, এক নূতন ভঙ্গীর। আমাদের বাংলা দেশে সেই ভাবতরঙ্গের প্রতিঘাত এসে লেগেছিল, সে প্রতিঘাত এখনো থামেনি, তার সঙ্ঘাতলব্ধ দোলায় আমরা এখনো তুলছি; প্রথম দিনের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু মনের দোলা আজও একেবারে থামেনি, কোনওদিন থাম্‌বে কিনা কে জানে, কে বোলতে পারে! জীবন পথে চোল্‌তে গেলে দোল খাওয়া তো একেবারে থামে না, নিত্যনূতন অনুভূতির প্রয়াস আমাদের চিত্তকে নিয়তই চঞ্চল কোরে রাখে। চিত্তের সজীবতা হারিয়ে ফেল্‌লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা বোল্‌তে হবে। তখন তো মানুষ বেঁচে থাকে না, তখন সে কলের পুতুলমাত্র।

পশ্চিমের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে বাংলায় যে ভাবতরঙ্গের আবির্ভাব হয়, তার বিশেষ পরিচয় দেখা দিচ্ছে আমাদেরি বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের মধ্যে। বাঙ্গালী ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সাহিত্যেরি গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; অন্যান্য বিষয়ে যতই তার অযোগ্যতার, অকর্ম্মণ্যতার কথা শোনা যায়, এবিষয়ে কিন্তু সকলেই তার প্রতিভা স্বীকার করে; প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব স্বাভাবিক; কিন্তু প্রতিবেশী জাতিরাও স্বীকার কোরতে বাধ্য হোয়েছেন যে, বর্ত্তমান বাংলার সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তবিকই বিচিত্র, অভিনব; তাঁরা প্রাচীন বাংলার ভাবদৈন্যের কথা বলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য কোর্‌তে ভরসা পান না। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি জগতে বাংলা ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়েছে, বাংলার সাহিত্য-সমৃদ্ধির কথা বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় সকলকে শুনিয়েছে।

আমাদের নবযুগের এই সাহিত্যসৃষ্টির ওপর পশ্চিমের ছাপ পোড়েছে একথা আর কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। অস্বীকার করবার প্রয়োজনও কিছু নেই। চিন্তার একটা বিশ্বজনীনতা আছে,

দেশের গণ্ডী বা ব্যবধান কিছুই সে মানে না,—আমাদের মধ্যে যে-সব ভাব সুপ্ত আছে, বিদেশের স্পর্শে তা জেগে ওঠে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পশ্চিমের ছাপ কতখানি, অতি সংক্ষেপে তাই আমরা আজ আলোচনা কোর্‌বো।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের সূত্রধর; তাঁর নাম দেওয়া হোয়েছিল সাহিত্য-সম্রাট। তখনকার দিনে তিনি সমস্ত বাংলা সাহিত্য সংহতমুখী ক'রে দেশের সেবায় লাগিয়েছিলেন, দেশের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ সকল ভাবের মুখপাত্র কোরে বিশ্বের দরজায় হাজির কোরতে চেয়েছিলেন। দেশের যত চিন্তাধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সে সমস্ত যেন নবরূপ পেল; তাদের সামনে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন দেশভক্তির প্রতীক স্বরূপে। তাঁর পূর্ব্বগামী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজেও সমসাময়িক সাহিত্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখে গত বর্ষের সাহিত্যিক একটা হিসাব-নিকাশ করবার চেষ্টা ছিল তাঁর; ইংরাজী সাহিত্য থেকে নানা কবিতার বঙ্গানুবাদ তাঁর কাগজে স্থান পেত, তাদের ভঙ্গী হয়ত হোত কিম্ভূতকিমাকার, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয় হোচ্ছে বাংলাকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত কোরে দেবার তাঁর এই চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন,—ঠিক্ এই সূত্রে তিনি কতখানি পাশ্চাত্যের অনুগামী হোয়েছিলেন জানি না, কিন্তু তিনিও বরাবর পাশ্চাত্যের সাধনালব্ধজ্ঞান যাতে আমাদের দেশের লোকে পায় সেজন্য বিশেষ চেষ্টা কোরেছিলেন। তখনকার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যজগতে ছন্দোবিষয়ে ও কাব্যের উপজীব্যবস্তু নিয়ে বিস্তর পরিবর্ত্তনের কারণ হোয়েছিলেন, কিন্তু মধুসূদনকে বিরোধেরই সম্মুখীন হোতে হয়, জাতিকে তিনি আর নূতন পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি, তাঁর প্রতিভা হোয়েছিল বিদ্রূপের কারণ, তাঁর প্রতিভার দীপ্তরশ্মি সমসাময়িক বাংলা সহ্য কোরতে পারে নি, অনেক কিছু নিয়েছিল বটে, তবে বিস্তর বিলম্বে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অন্যকে পরিচালনার শক্তি ছিল, নেতৃত্ব ছিল তাঁর পক্ষে সহজ, সুতরাং পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার তিনি যতটা কোরতে পেরেছিলেন মধুসূদন তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও তা পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—উপন্যাস ও অন্য গদ্য, যেমন কৃষ্ণচরিত্র ও কমলাকান্তের দপ্তর। এর ভেতর উপন্যাস সাহিত্যই আমাদের আজ বেশী প্রিয়, যদিও কালপ্রভাবে সে উপন্যাসও আমরা আজকাল না পোড়েই ভাল বোল্‌তে শিখেছি। বড় লোকের লেখার দোষই এই, বর্ত্তমান যুগের মহিমাই এই। সাধারণ লোক

অতীতকে ফেলে বর্ত্তমানেরই আদর করে বেশী, বড়লোকের লেখাও কালের তাপে ঝোরে যায়। তাই আজ বঙ্কিমের উপন্যাসও লোকে মুখে ভাল বলে, পড়ে কিন্তু অন্য সবার উপন্যাস—পরবর্ত্তী সময়ের উপন্যাস। তবু বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল,—এ সবের মধ্যে একটা অতীতের সুখময় স্মৃতি বিজড়িত আছে, আমরা তা অস্বীকার কোর্‌তে পারি না। এর মধ্যে, রাজপুতানার কাহিনীর মধ্যে, বাঙ্গালীর সুখদুঃখের গল্পে, পশ্চিমের পদচিহ্ন কোথায়, তা অবশ্য একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

বঙ্কিম যে-নূতন পথ পেলেন, সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের যে-নূতন ধারা প্রবর্ত্তন কোর্‌লেন তা উপন্যাস। তাঁর পূর্ব্বে বিলিতি উপন্যাসের আদর্শ এ দেশের জনসমাজে, শিক্ষিত সমাজে আদর লাভ কোরেছিল, সে ধরণের লেখবারও চেষ্টা হোয়েছিল। কিন্তু অক্ষমের চেষ্টা আর প্রতিভাশালীর চেষ্টা, এ দুইয়ে প্রভেদ বিস্তর। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী অনুবাদ নয়, কোনও বই সামনে রেখে লেখার চেষ্টা নয়, মনের তটভূমিতে যে-সব ভাবতরঙ্গ এসে এসে লাগ্‌ছিল, কল্পনার সাহায্যে তাদের একটা ছায়া, একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টামাত্র। গড় মান্দারণে সেই দুর্য্যোগের মধ্যে জগৎ সিংহ তিলোত্তমার সাক্ষাৎ—তা কি কোরে এ দেশে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনশ্চক্ষে ধরা দিল? সেই যে 'খড়্গো খড়্গো' কোলাকুলি, রোগশয্যা থেকে যুদ্ধ পরিদর্শন, এসব বাঙ্গালীর কল্পনার জালে কি কোরে ধরা পোড়্‌ল? সেই যে নবাবনন্দিনী আয়েষার আধো-আলোক আধো-আঁধার ছবি, একদিকে জগৎসিংহ অন্য দিকে ওস্‌মান এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে—এই ছবি যিনি ভাব্‌তে পারলেন তিনি কি কোরে তা ভাব্‌লেন? তাঁকে এই ভাবনার খোরাক কে জোগালে? এসব ভাবতরঙ্গের মূলে কি? অভিজ্ঞতা, না নিছক প্রতিভা, না নিছক কল্পনা? সেদিন এক দল সমালোচক ভেবেছিল, বঙ্কিমবাবু নিশ্চয় ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কটের বই দেখে তাঁর Ivanhoe থেকে দুর্গেশনন্দিনীর অনেকখানি নিয়েছেন। বঙ্কিমবাবু সে কথার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোরে গেছেন, বোলেছেন, তিনি কখনো দুর্গেশনন্দিনী লেখার পূর্ব্বে স্কটের লেখা Ivanhoe পড়েন নি। স্কটের লেখা নাই পড়ুন, কিন্তু ইংরাজী ভাবের ভাবুক তিনি, নূতন ধরণের শিক্ষা যাঁরা সেদিন পেয়েছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন। মধ্যযুগে ইউরোপে chivalry-র যে-পূজা হোয়েছিল, সে পূজার সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়ই নিবিড় পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ছেলেবেলায় তাঁর দাদার মুখে অনেক পাশ্চাত্য গল্পের উপন্যাসের সারাংশ শুনেছিলেন, তা মনের কোণে জমাট হোয়েছিল এবং তাই বেরিয়েছিল দুর্গেশনন্দিনীর

রূপ ধোরে। তখন থেকেই পাশ্চাত্য ভাবসাগরে আমরা আকণ্ঠ নিমগ্ন হোয়ে থাক্‌তে সুরু কোরেছি,—কোথা থেকে কোন্ ভাব এসেছে তা ভালো কোরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু সে-সব ভাব যে নূতন, তা বুঝতে পার্‌ছি যখন দেখি যে আমরা অনেকেই সে ভাবের পক্ষপাতী, সে ভাবের গুণগ্রাহী, সে ভাবের আদর আমরা কোর্‌তে জানি, অথচ সে সমস্ত ভাব এ দেশের নয়, আমাদের আশে পাশে সে ধরণের কিছু ঘটে না।

দুর্গেশনন্দিনীতে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি, বঙ্কিমের পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে তার সঙ্গে অন্য অনেক জিনিষ মিশেছে; 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে' সীতারামের এই মূলমন্ত্র, দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠে মাতৃমন্ত্রের উপাসনা, গীতাকে প্রতিদিনকার কর্ম্মের সাধনায় জীবন্ত কোরে তোলা, গীতার সঙ্গে মানুষের সামাজিক ধর্ম্মের একটা মহা সমন্বয় সাধন করা,—এই সব ভিন্ন ভিন্ন সুর এসে দুর্গেশনন্দিনীর আবহাওয়াকে আরও জটিল আরও সূক্ষ্ম কোরে তুলেছে। বলবার ভঙ্গীও যে নিত্য নূতন নূতন বিচিত্রতায় মধুরতর হোয়ে ওঠে নি তা বলা যায় না, কারণ 'রজনীর' আত্মকথা, অমরনাথের আত্মকথার একান্ত ঘনিষ্ঠ সহজ সুর অভিনব প্রণালীতে বেজে উঠেছে; আর তার উৎস যে পশ্চিমের উপন্যাসে সে কথা বঙ্কিমবাবু নিজেই বোলে দিয়েছেন। রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীর মনের গোপন কথাটি কি-অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কানে শুনিয়ে গেলেন, দিবা-নিশার শান্তি-চঞ্চলকুমারীর ভেতরে নারীর মহীয়সী মূর্ত্তির সঙ্গে শক্তি ও মাধুর্য্যের সুন্দর সমন্বয় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধোর্‌লেন, তাঁর ভবানন্দ পশুপতি গঙ্গারামের মধ্য দিয়ে পাপপুণ্যের প্রবল দ্বন্দ্ব পাঠকের চারদিকে সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়ে দেয়। এসব কথা আমাদেরি ঘরের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও এমন কোরে এসব কথা কেউ তো আমাদের সাহিত্যে বলে নাই! আমরা যে পৃথিবীর কথা সহজ সাদা চোখে তেমন না দেখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতাম গোপনসঞ্চারী দেবদেবী বিগ্রহের ওপর; কখন নর্ত্তনশীলা কোন্ অপ্সরার তালভঙ্গ হবে, ভূতলে তাঁর জন্ম হবে বিশেষ কোনও দেবদেবীর পূজা প্রচারের জন্য, এই তো ছিল আমাদের পূর্ব্বকার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু; নয় তো নিত্যবৃন্দাবনলীলারসিক রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ মিলন বিরহ-গীতি—মানুষের চিরন্তনী আবেগধারার উপর ভর রেখে সুস্বর কাকলীতে সকল দিগ্‌ভূমি ভোরে দিত; অথবা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ উপাখ্যান হোতে সংগ্রহ কোরে বাংলা ভাষার সাহায্যে জনশিক্ষার ব্যবস্থা কোরতো। এই সমস্ত পুরাণো কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল সত্যি, আমরা তাদের সঙ্গে জীবনের নানা গ্রন্থিতে বাঁধা থাক্‌তাম, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

কথাশিল্পের ভেতর দিয়ে নূতন আদর্শে বাঁধা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কাহিনী আমাদের মন মুগ্ধ কোরে ফেল্‌ল,—সেকথা অস্বীকার করবার জো নেই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা শুধু উপন্যাসরচনায় পর্য্যবসিত হয় নি। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল্‌টন, এঁরা ভাবতেন কবি হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, পরম পরিণতি, নয়, শিক্ষক হোতে হবে, I wish to be a teacher or nothing। বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসরচনায় তেমন স্ফূর্ত্তি পান নি। তাঁর সার কথা তিনি বলেছেন কৃষ্ণচরিত্রে। শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে ভগবান বোলে, আদর্শ মানুষ বোলে বিশ্বাস কোরতেন। এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। তবু তিনি জানতেন যে তাঁর সমসাময়িক অনেক লোকে মনে করে, কৃষ্ণ ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ; যে-সব বিশেষণে তারা শ্রীকৃষ্ণকে শোভিত কোরতো, সে সব পুনরাবৃত্তি কোরে লাভ নেই, করার প্রয়োজনও নেই; কিন্তু প্রগাঢ় ভক্তি সত্বেও বঙ্কিম এই সব প্রতিকূল সমালোচনা খণ্ডন করবার জন্য কৃষ্ণকে ভগবানের আসন থেকে সরিয়ে মানুষের মাপকাঠিতে তাঁর চরিত্রের ও কীর্ত্তির পরিমাপ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের মাপকাঠিও একটু অদলবদল হোয়েছে। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ culture-এর ফলই হচ্ছে মনুষ্যত্ব, এবং এই মনুষ্যত্ব শ্রীকৃষ্ণতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব কথার মূলে যে-আদর্শ, যে-ভাব, তা নিয়েই আমাদের আলোচনা। মানুষ যেমন ভগবান হোতে পারে, কাব্যের অনুরোধে সমাজের সুব্যবস্থার জন্য মানুষকে যেমন উচ্চাসন দেওয়া হয়, ভগবানের উচ্চাসনে বসানো হয়, এযুগে আবার ভগবানকেও তেমনি মানুষের মাপকাঠিতে বিচার করা হচ্ছে। আদর্শ মানুষ না হোলে, সাধারণ জীবনে পদে পদে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হলে ভগবানও আর আমাদের কাছে ভক্তি পাবেন না। এই যে যুক্তি দিয়ে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা, মানুষের মাপকাঠিতে ভগবানকে দেখা এবং মানুষের সকল বৃত্তির সুসমঞ্জস অনুশীলনই হচ্ছে প্রকৃতধর্ম্ম এ কথা বলা,—এ সবের মধ্যেই অল্প বিস্তর পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায়। তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরও অপূর্ব্ব জিনিষ, এবং তার মধ্যেও ডিকুইন্সি, স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতি লেখকের প্রভাব স্পষ্টই ধরা দিচ্ছে। অবশ্য পাশ্চাত্যের নিকট এই সব বিষয় ঋণ কোরতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতি থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হন নি; বর্ত্তমান যুগে বাহ্যসম্পদের পূজাকে বিদ্রূপ কোরেছেন, নূতন ফ্যাসানের বিদ্যা সমাজ-বিজ্ঞানকে ভূয়সী প্রশংসা কোরেছেন, কিন্তু তার পায়ে নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দেন নি, সর্ব্বদাই একটা আলোচনা করবার ইচ্ছা তাঁর রচনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের মতি ছিল স্থির, এবং স্থিতধী ছিলেন বোলেই সমস্ত জাতি ও

তার সাহিত্যকে তিনি একেবারে বিপরীত আদর্শের অনুসরণ থেকে কিছু না কিছু রক্ষা কোরতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর এই ভাবে সাহিত্যের অধিনায়কত্বে কেটে যায়। তাঁর সময়ে বিশেষ যে-পরিবর্ত্তন হয় তার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যুগ তার পর থেকেই আরম্ভ হয়। তিনি কথা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রথম হোতেই নূতন পথে চলেন। তাঁর রাজর্ষি ও বৌঠাকুরাণীর হাটের মধ্যে আমরা রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য্য দেখতে পাই না, অট্টালিকা আমাদের চোখে পড়ে না, শুধু হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা, ছোটখাট সুখদুঃখের কথা, মানবের অন্তঃশীলা রসধারার কথা শুনতে পাই। তার বহুপূর্ব্বেই পাশ্চাত্যেও রোমান্সের আমদানী কোমে গিয়েছিল, মানুষের সাহিত্যিকের দৃষ্টি পোড়ছিল সাধারণ ঘটনার ওপর; সাধারণ ঘটনার ভেতরে সাধারণ অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন ভাবে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, নিজেকে চালিয়ে নেয়, তাই নিয়ে কথাশিল্পীরা বেশী ব্যস্ত থাকতে আরম্ভ করেন। রোমান্সের শেষ কোনও দিন তো হবে না, শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যতদিন মানুষ সুদূরের পিয়াসী থাকবে, যতদিন অপরিচিতের—অজানার—হাতছানি তাকে সমুখপানে ডাকতে থাকবে ততদিন তার পক্ষে রোমান্সের গণ্ডী একেবারে পার হোয়ে যাওয়া সম্ভব হোতেই পারে না।

কিন্তু ইউরোপ রোমান্সের বহু চর্চ্চা কোরে এখন একটু আল্‌গা দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর পর যে-দুটি উপন্যাস লেখেন তাদের মধ্যে এইটি লক্ষ্য করবার বিষয়। নৌকাডুবি ও চোখের বালি,—এ দুটি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অসাধারণ ঘটনা নিয়ে লেখা বটে, কিন্তু বড় ঘরের ওপর লেখকদের যে-একটা টান ছিল, ঐতিহাসিক চিত্র না হোক ইতিহাসের কাঠামোকে অবলম্বন কোরে চলবার যে-একটা রীতি ছিল তা এতে খোসে যায়। তার পরে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোচ্ছে গোরা। গোরার সঙ্গে কোনও বিদেশী উপন্যাসের মিল আছে, কিন্তু সে মিল দেখানো আমার এখন উদ্দেশ্য নয়; আমি শুধু গোরার মূল কথাটার ওপর জোর দিতে চাই। সকল প্রকার পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে গোরা হচ্ছে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। তার মধ্যে এমন সব বস্তু আছে যা যুক্তিসহ নয়, তবু একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আছে, যার জোরে বিদেশের সাধু সমালোচনা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। গোরা ও পানুবাবুর তর্কের মধ্যে এইটিই আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয়। তার পর আর এক পরিবর্ত্তনের আভাসও গোরাতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে এনেছেন একেবারে সদর রাস্তায়—বিশ্বের রাজপথে। নিজের পরিচয়ে

সে যখন দেখতে পেলে যে হিন্দুয়ানীর ওপর, হিন্দু সভ্যতার ওপর তার কোনও দাবী নেই, দাবী থাকতেই পারে না, তখন সে জগতের সামনে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে ভারতের দেবতার মন্ত্র পরেশবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিল। গোরা তাই শুধু সাধারণ মানুষের কথা নয়, সে যেন রবীন্দ্রনাথেরই সেই সময়ে যে-পরিবর্ত্তন হয় তার মূর্ত্ত প্রতীক, সে এই পরিবর্ত্তনের কথা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বোলে গেল,—দেশের মধ্যে থেকেও তার আত্মা যেন দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও এক বিশালতর দৃষ্টি অর্জ্জন কোর্‌লে,—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় অন্ততঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনায় গোরার মূল্য তাই এত বেশী।

তার পরে আর একটী উপন্যাস আমরা আজ আলোচনা কোর্‌ব—ঘরে বাইরে। ঘরে বাইরের জন্য রবীন্দ্রনাথকে তখন বিস্তর প্রতিকূল সমালোচনা শুনতে হোয়েছিল; কিন্তু ঘরে বাইরে ও নৌকাডুবির তুলনা কোরলে বোঝা যাবে,—ঘরে বাইরের মধ্যে এমন কিছু ঘোটেছে যার অস্তিত্ব নৌকাডুবিতে নেই। বহিঃপ্রকৃতি যেন তাঁকে চঞ্চল করবার, মুগ্ধ করবার অবসর পাচ্ছে না, মানুষের মনে যে-বিপ্লব লেগেছে, যা দেশবিদেশের গণ্ডী মেনে চলে না, যা বহিঃপ্রকৃতির ছায়া মাত্র নয়, যা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ব্যাপার, সেই অন্তর্বিপ্লবের এক ছবি তিনি এঁকেছেন; অল্প কথায়, প্রায় অনাড়ম্বর বোললে চলে এমন ভাষায়, স্বামীস্ত্রীর প্রেম কোথায় জীবন্ত, আর কোথায় শুধু কলের ব্যাপার, তা নিখিলেশ ও বিমলার পরস্পর প্রীতিঘন বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু স্রষ্টা নন, নিপুণ সমালোচক; বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে সমগ্র দৃষ্টি আছে, তাঁর শিল্পীহৃদয়ের মধ্যে যে-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য আছে, তার জন্য তিনি উপন্যাস লিখতে গিয়ে লোকে যাতে শুধু অনুবাদ না করে এবং অনুবাদের সাহায্যে আবহাওয়া নষ্ট না করে সে কথা বারবার বোলেছেন। এই নজীরে পাশ্চাত্য ভাল উপন্যাসও আমাদের ভাষায় অনুবাদ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু পাশ্চাত্য উপন্যাসের সহিত ব্যাপক পরিচয়ের ফলে তাঁর শিল্পধারা যে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হোয়েছে, সে কথা অস্বীকার কোরবার উপায় কি? ঘরে বাইরে-তে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পের যে-অবস্থা দেখতে পাই, তার মূলে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেকখানি জোড়িয়ে আছে, এ কথা বোল্‌তেই হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। তাঁর গীতিকবিতা বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু। এই গীতিকবিতার জন্যই মুখ্যতঃ বিশ্ববরেণ্যদের মধ্যে তাঁর আসন। তার মধ্যে যদি আমরা পশ্চিমের পদচিহ্ন খুঁজতে যাই, তবে আমাদের অসুবিধা বিস্তর। কবি তাঁর পূর্ব্বতন লেখাগুলি পুনঃপ্রকাশের পথ বন্ধ কোরে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে

এই সব অপরিণত রচনা সাধারণের সামনে এনে ধরা হয়। কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই সে কথা লিখে জানিয়েছেন, সুতরাং এবিষয়ে আমাদের আর আশা করবার কিছু নেই। কিন্তু কোনও প্রতিভাশালী লেখকের মধ্যে বাইরের কারো প্রভাব দেখতে হোলে আমাদেব খুঁজতে হবে সে লেখকের প্রথম রচনা, যখন বিচার কোরে সমালোচনা কোরে বাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি বেড়ে ওঠেনি, যখন ভালবাসার পাত্রেব দোষগুণ চোখে পড়ে না, যখন প্রতিভা একটা স্বতন্ত্র পথ বেছে নেওয়ার মত পরিণতি লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বতন কবিতাগুলি পুনর্মুদ্রিত হোতে না দিয়ে এই পথ বন্ধ কোরেছেন। সুতরাং আমাদের উপায় হোচ্ছে অন্য পথ ধরা, যে-সব কবিতা তাঁর কাছ থেকে জাতি পেয়েছে, সেই সব অমূল্য কবিতার ভিতর দিয়েই এরূপ আলোচনার একটা ধারা বা পথ বেছে নেওয়া। প্রথমতঃ, আমরা কাব্যের গঠনের কথা বিচার কোর্‌লে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বগামী ভারতচন্দ্রের মতো পুরাতন ছন্দ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি, বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন কোরে গেছেন। সে সব কথা ছেড়ে দিয়েও একটি বিশেষ রূপের সম্বন্ধে বলা চলে,—চতুর্দ্দশপদী কবিতা, যা কিনা মাইকেল মধুসূদন আমাদের দেশে চালিয়ে গেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের হাতে অনেক প্রকারের হোয়ে পোড়েছে। এ সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, তা থেকে বুঝতে পারা যাবে মাইকেলের দানকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ, মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহু-বিধ পিক যেথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাগ্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।
উপহার রূপে আজি আরপি রতনে ॥

—ফরাসী-দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, রচিত।

তারপর রবীন্দ্রনাথের ৩৫ বৎসর পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত—

মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হ'তে। সে কঠিন ভার
যদি খ'সে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে,—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ।
তোমার চরণপ্রান্তে করি' প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি',—নিঃশব্দ গমনে
চ'লে যাব কর্ম্মক্ষেত্র মাঝখান দিয়া,
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম্ম সারি'
সমুদ্রের পানে ল'য়ে বন্ধহীন বারি।

—নৈবেদ্য

মধুসূদনের পদবিন্যাস ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো নয়, পায়ে পায়ে মিলের ওপরে ভর কোরে চোল্‌ছে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশপদী, আর মধুসূদনের চোল্‌ছে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে, ইংরাজি বা ইতালীয় সনেটের মতো; এ ছাড়া আরো কত রকমে চতুর্দ্দশপদীকে যে রবীন্দ্রনাথ আপন কোরে নিয়েছেন তা তাঁর উৎসর্গ বা গীতাঞ্জলির পাতা ওল্‌টালেই বোঝা যাবে। শুধু চতুর্দ্দশপদী কেন, অন্য সকল কবিতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোরেছে; কবিতার অন্তর্নিহিত যে-ভাব তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব দান আছে, আর সে দানের সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিদের মর্ম্মকথার নিগূঢ় সম্বন্ধ। প্রকৃতির মধ্যে আমরা পূর্ব্বে দেখতাম শুধু অচেতন শোভা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য; এখন আমরা অন্যরূপ দেখতে আরম্ভ কোরেছি; প্রকৃতি এখন প্রাণময়ী, সে এখন আমাদের অতীত সুখদুঃখের সাথী, এখন তার স্পর্শে আমাদের মনের কলকব্জা নোড়ে ওঠে, প্রকৃতির অধ্যাত্মস্পর্শে আমরা অনন্ত জীবনের আস্বাদ পাই, অধ্যাত্ম-আলোকের কিরণসম্পাতে নবজীবনের স্পর্শ লাভ করি। তা ছাড়া পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের পল্লীসৌন্দর্য্য যে হতশ্রী হয়, তা দেখে যৌবনে পদ্মার নিবিড় সঙ্গলাভে আনন্দপুষ্ট কবির মনে বড় বাজে; তখন তিনি কার্লাইল-রাস্কিনের মতোই প্রাচীন ভারতের জন্য আক্ষেপ করেন, বর্ত্তমান ভারতের এই নিরানন্দ সমস্যাম্লানমুখচ্ছবি তাঁকে ব্যথা দেয়। তাঁর দেশপ্রীতি, বিশ্বপ্রেম এ উভয় বস্তুই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিণাম। তাঁর

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যে-সহজ সমন্বয়ের ভাব, কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতি, কঠোর বৈরাগ্যের প্রতি যে-বিতৃষ্ণা, তার মূল আমাদের সনাতন পল্লীর ভেতরে বাউল-বৈরাগীর ভাবসংস্পর্শে কতটা হোয়েছে আর পৈতৃক বা নিজের জীবনে ইউরোপ-আমেরিকার প্রটেষ্টাণ্ট-ইউনিটারিয়ান্ ধর্ম্মমতের আদর্শে কতটা বেড়েছে কিম্বা প্রাচীন ভারতের উপনিষদ্‌রাজির মধ্যে যে-অমূল্য রত্ন নিহিত আছে তার জন্য কতখানি, এসব কথাও ভেবে দেখবার বিষয়। অবশ্য মনে হোতে পারে যে, কবিকে এরকম কোরে কাটাকুটি কোর্‌লে কাব্যরস শুকিয়ে যাবে, বিচারের অত্যাচারে কাব্যের সরসতা আর থাকবেনা। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নেই, কবিকে সব দিক দিয়েই আমাদের বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। না বোঝবার আনন্দের চেয়েও বোঝার আনন্দ ঢের ভাল, মনের সুস্থ অবস্থায় একথা সকলে নিশ্চয় স্বীকার কোর্‌বেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনা এই কাব্য-বিচারের, সাহিত্য-বিচারের, একদিক মাত্র; তবে এটা বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ ইউরোপ-আমেরিকা ও ভারতের বিশেষ সম্বন্ধের জন্য, একটা প্রধান দিক, এই কথা বুঝে তবে এ বিষয়ে আলোচনা সুরু করা ভালো, এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেও একথা মনে রাখা উচিত। যদি রসগ্রহণে আমাদের সামর্থ্য বাড়ায় তবেই না এ সব আলোচনার সার্থকতা, আর যদি আমাদের লাভ হয় শুধু শুষ্কতা, শুধু কথার কাটাকাটি, তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক বেশী হবে; সেটা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কথা বল্‌তে গিয়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে এসেছি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না। আমাদের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছবে তা বুঝতে হোলে গিরিশচন্দ্রের পৃষ্ঠগামী নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা প্রয়োজন। ইং ১৮৫২ সালেই ইংরেজী আদর্শে বাংলা নাটক লেখ্‌বার প্রথম চেষ্টা হয়। তার পর কুড়ি বৎসর ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ পর্য্যন্ত হরচন্দ্র, রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি অনেকেই নাট্যসাহিত্যে আমাদের যে-অভাব ছিল তা পূরণ করবার জন্য ব্যস্ত হন। এ বিষয়ে মধুসূদনের দানও নিতান্ত কম নয়। তবু গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চের একটা ভাল ব্যবস্থাই ছিল না; কাঞ্চন-কৌলীন্য যে থিয়েটারের বেলায় খাটবে, টাকা দিয়ে কোনও লোক যে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ লাভ কর্‌বে, সনাতন ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙ্গালী সমাজ সেটা প্রথমে নির্ব্বিবাদে হজম কোরতে পারে নি। তার ওপর বাজনা, নাচ, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নামানো, নানারকম নাটক লেখা ও অভিনয় করা—এসব একটা ভয়ানক ওলট-পালটের ব্যাপার। তখনকার দিনে মানুষের রুচি কেমন ছিল

তা একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী বিয়োগান্ত নাটক। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নেই, থাকতে পারে না, অলঙ্কার শাস্ত্রে তার স্পষ্ট নিষেধ আছে। কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করার জন্যে কোলকাতার বিদ্যোৎসাহী কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে আয়োজন হয়; কিন্তু ভদ্রলোকের মা কিছুতেই তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে এই অভিনয় হোতে দিলেন না। আমরা আজ সেই অবস্থা থেকে অনেকদূর এগিয়েছি। বাইরের বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে আমাদের নাট্য-অভিনয়ের যাতে একটা ভালোমত সঙ্গতি থাকে তার জন্য আমাদের আজ বিস্তর চেষ্টা। আজকাল রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালী জীবনের এক আদরের বস্তু, এমন কি প্রয়োজনীয় বস্তু বোল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থা যে হোয়েছে তার মূলে গিরিশচন্দ্রের সাধনা। ১৮৭২ থেকে ১৯১২ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য জীবনপাত করেন। এই উন্নতির মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব যে কতদূর পোড়েছে তা তখনকার রঙ্গমঞ্চগুলির নাম আলোচনা কোর্‌লেও খানিকটা বোঝা যাবে; এমারেল্ড, ক্লাসিক, গ্রেট ন্যাশনাল, কোরিন্থিয়ান্ ইত্যাদি; আর আজ যে হাওয়া অন্য দিকে বইছে তার দৃষ্টান্ত, নাট্যনিকেতন, নাট্যমন্দির ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের আক্ষরিক অনুবাদ কোরে গেছেন, অথচ রসের অপকর্ষ ঘট্‌তে দেন নি; শেক্সপীয়ারের অন্যান্য নাটকের ঘটনা সমাবেশও কিছু কিছু নিয়েছেন, যেমন তাঁর 'বিষাদ'; পাশ্চাত্যে যাঁরা অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছেন তাঁদের জীবনী পাঠ কোরে তাঁদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এদেশী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শেখাতে চেষ্টা কোরেছেন; আর সাক্ষাৎভাবে বিলিতি অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমনধারা অভিজ্ঞ ইউরোপীয় বিদুষীর সঙ্গে আলোচনায়ও তিনি এ বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছিলেন, তবে অন্যান্য বড়লোকের মতো তাঁর সম্বন্ধেও এই কথা খাটে যে, তিনি যা কিছু গ্রহণ কোরেছেন তাই নিজস্ব কোরে নিতে পেরেছেন—দেশের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল ব'লে তাঁর দৃষ্টি পরগাছা হয়নি, পশ্চিমের হাওয়ায় বেড়েছে বটে, কিন্তু মূল তার আমাদেরি বাংলা দেশের মাটিতে।

রবীন্দ্রনাথের পরই আসে শরৎচন্দ্রের কথা। এখনকার দিনে তিনি কথাসাহিত্যে জনসাধারণের দৃষ্টিপথে অত্যুজ্জ্বল রত্ন। তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব খুঁজতে গেলে হতাশ হোতে হয়। তাঁর কাছে আমরা অনেক নূতন কথা পেয়েছি, অনেক ভালো কথা পেয়েছি, কিন্তু সে সব কথার মূলে পশ্চিমের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অনেক ঘটনা আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের মধ্য দিয়েও আমাদের কাছে তাঁর জীবনের একাংশ উন্মুক্ত কোরে দিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের

জীবন-কথা আজও রহস্যজালে ঢাকা। তাঁর শিক্ষানবিশীর কোনও কথাই তো আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাস বহুদিন অতি যত্নের সঙ্গে তিনি পোড়েছিলেন, সাধনার বস্তু কোরে নিয়েছিলেন, আর জানি যে, বাঙ্গালী জীবনের বহু বিভিন্ন স্তরের সহিত. তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্রতি পদে তিনি আদর্শকে বাস্তবের সঙ্গে সুসঙ্গত কোরে তাঁর লেখার মধ্যে প্রয়োগ কোরেছেন।

তাই বল্‌ছিলাম, শরৎচন্দ্রের যুগে আমরা আমাদের চারদিকে আঘাত-সঙঘাতের ফলে যে-সমাজ গোড়ে উঠেছে তার সঙ্গে জোড়িয়ে পোড়েছি, পশ্চিমের দিকে আমাদের আর তেমন তাকাবার উপায় নাই,—পল্লী-সমাজের দলাদলি, বাঙ্গালীর রেঙ্গুনযাত্রা, সস্তাদরে খেলনা বাড়ী নিয়ে যাওয়ায় কেরাণী জীবনের যে-দুর্লভ আনন্দ তাতেও ব্যাঘাত, বর্ত্তমানযুগের বিবাহসমস্যা, এইসব নানারূপ দুঃখকষ্ট সুখআনন্দ আমরা আর অবহেলা কোরতে পারি না, আর বুঝি যে এ সব দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিবিড় আনন্দের উৎস আছে, ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্বলাভের মতো শ্রীকান্তের জীবনে আর কখনও এত লাভ হয় নি, তা সে জীবন যত পর্ব্বেই ছড়িয়ে যাক্ না কেন। পাশ্চাত্য প্রভাব এখন যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হোয়ে পড়্‌ছে, জাতীয় সাহিত্যের কলরোল আর কানে পর্য্যন্ত এসে পৌছুতে পার্‌ছে না।

প্রসঙ্গক্রমে 'অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য' সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলার মাসিকপত্রগুলি বিতণ্ডা-মুখর হোয়ে উঠেছিলো; তাদের বিতণ্ডার বিষয় ছিল বর্ত্তমান গল্প ও উপন্যাসের রুচি ও ঘটনাসংস্থান। যাঁরা ছিলেন বিরুদ্ধবাদী অতি-আধুনিকতাই ছিল তাঁদের কাছে নিন্দার হেতু। অন্য পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তারুণ্যের গর্ব্বে স্ফীত হোয়ে স্পর্দ্ধাভরে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ কোরতে লাগ্‌লেন,—"আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের রুখ্‌বে" এইভাবে। যাঁরা বিরুদ্ধবাদী তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী; তাঁর আপত্তির কারণটা আমাদের বোঝা দরকার। সে কারণ তিনি বহুবার বোলেছেন, বহুবার নবীন সাহিত্যিকদের সাবধান কোরে দিয়েছেন। তাঁর আপত্তি রুচিগত নয়, শুচিবাইয়ের চীৎকার নয়, তার চেয়ে সার কথা আছে তাঁর যুক্তিতে,—পশ্চিমের হাওয়ায় যে-কৃত্রিম সাহিত্য গোড়ে উঠেছে বোলে তাঁর ধারণা, তাঁর আপত্তি সেই কৃত্রিম সাহিত্যের বিরুদ্ধে। ভাবের ঘরে মেকী চলে না, সাহিত্যে কৃত্রিমতার স্থান নেই, যে-দেশে যে-সমস্যা উপস্থিত নেই, সমাজগঠনের বিশেষ নিয়মহেতু উপস্থিত হোতে পারে না, সেই দেশের সাহিত্যে সেই সমস্যার উপস্থাপন দোষের বোলে তাঁর

ধারণা আর সেই ধারণার জন্যই তিনি এই অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এর বহুদিন পূর্ব্বে প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে কবি যখন সাধনা-পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন, তখনো মনে পড়ে ফরাসী কোনও ভালো উপন্যাসের বাংলা অনুবাদে তাঁর আপত্তি ছিল প্রচুর, কারণ তিনি বোল্‌তেন—ফরাসী উপন্যাসে যে-অতিসূক্ষ্ম কাজ আছে অনুবাদের অত্যাচারে তার আব্রুটুকু চোলে যাবে, তার মাধুর্য্যটুকু নষ্ট হবে, ফুটন্ত গোলাপ ফুল গাছ থেকে নিয়ে ঘর সাজালে যেমন তার আভা ম্লান হোয়ে যায়, সাহিত্যেও ঠিক তেমনি ধারা হবে, সুতরাং তাতে সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করাই সার হবে, তাকে জীইয়ে রাখা হবে না। আধুনিক ও অতি-আধুনিকের তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তবে এই কথাই মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য পরগাছা নয়, পশ্চিমের হাওয়া তাকে চঞ্চলতা দিতে পারে, তাকে নূতন পথে চলার কথা বোল্‌তে পারে, তাকে প্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না।

পশ্চিমের প্রভাব তাহলে আমাদের ওপরে কি দাগ রেখে যাবে? আলেকজান্দার যখন এ দেশে আসেন তখন হয় তো গ্রীক প্রভাব ভারতে যথেষ্ট বিস্তার লাভ কোরেছিল। কিন্তু এখন? এখন সে প্রভাবের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। পাশ্চাত্য প্রভাবও কি দুদিনের জন্য আমাদের ওপরে কাজ কোরে শেষ হোয়ে গেছে, ক্ষয় হোয়ে গেছে—সে প্রভাবের দরুণ আমাদের যে-সাহিত্যসম্পদ, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-গিরিশ-শরতের সাধনার ফলে পুষ্ট বঙ্গসাহিত্য, তাও কি কালপ্রভাবে লুপ্ত হোয়ে যাবে, গবেষণার জন্যও কিছু অবশিষ্ট থাক্‌বে না? এ সব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা আপাততঃ নিরাপদ বটে, কিন্তু সহজ নয়। শুধু ১৩২০ সালে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ অধিবেশনে জগদীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কথাগুলির পুনরুক্তি কোরেই আজকের মতো ক্ষান্ত হওয়া যাক্—

"আমাদের মধ্যে অনেকে ভাবেন যে, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তরকালে যাহা কিছু হইবে, তাহা যদি কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয়, কিম্বা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্ত্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশের জিনিষ হইল না। তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, এবং তাহা দ্বারা আমাদের আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা ঘটে। জড়বস্তু সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে বটে, কারণ যাহা তাহার পূর্ব্ব পরিচয়, তাহার উত্তর পরিচয়ও তাহাই; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থের যথার্থ পরিচয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেই প্রকাশ পায়।……………ইউরোপীয় সাহিত্যে যে-প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহার সুললিত ছন্দে আমাদের সাহিত্যও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা যখন এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখনই বঙ্গসাহিত্য-লক্ষ্মীর উটজ-প্রাঙ্গণে আনন্দময় মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।……স্তুতিনিন্দার জন্য তখনও

আমাদিগকে পাশ্চিমাভিমুখী হইয়াই থাকিতে হইত। তখনও আমরা মিল্, বেন্থাম, কোঁত, মিল্টন্, বাইরণ, স্কটের মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থ দেখিতাম ; কারণে অকারণে যদি কখনও আমাদের পাশ্চাত্য গুরুর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছি, তথাপি সেই ঔদ্ধত্যের দ্বারাই আমাদের হৃদয়ের বন্ধনদশা সূচিত হইয়াছে।······এইজন্য তখনকার সাহিত্যের মূলদেশ আমাদের দেশের মাটির সহিত সংলগ্ন ছিল না, সে যেন "অরকিডের" মত আর এক গাছে উচ্চ শাখায় ঝুলিতেছিল। সে-সাহিত্য যে প্রাণবান্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার প্রাণরস অন্য দেশের সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইত।"

আমরা আজ এ অবস্থা ছাড়িয়ে গিয়েছি. আর ছাড়িয়ে গিয়েছি বোলেই আমরা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ মত পোষণ কোর্‌তে পারি না। আমাদের সাহিত্য তার সমগ্রতা বজায় রাখতে পারবে না এরূপ আশঙ্কা আমাদের আজ আর নেই।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর মূলসূত্র

১

আজকের দিনে দেশে দেশে সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলন যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে শুধু তা' নয়, সোশ্যালিষ্ট্‌ মতামত আধুনিক চিন্তাধারার উপর নানারূপে প্রভাব বিস্তার কর্‌ছে একথাও স্বীকার কর্‌তে হবে। সোশ্যালিষ্ট্‌ ভাবস্রোতের ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌচেছে, যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা মনে করেন। অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোচনাকে পশ্চিমের সস্তা অনুকরণ ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্ব্বোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা প্রায় শুনতে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন মত ও আদর্শ আহরণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হন না—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জাতীয়তা-বোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি আছে কিন্তু তাকে বিদেশী ব'লে বর্জ্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক সভ্যতার বিশেষত্ব আছে—একথা নিশ্চয়ই সত্য। বিদেশী আদর্শের অনুকরণ না করার প্রবৃত্তিও অনেক স্থলে প্রশংসনীয়। কিন্তু সকল বিষয়েই যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পার্থক্য থাকবে এমন কোন কথা বলা চলে না। বর্ত্তমান যুগে সহজ যাতায়াত ও ভাবের নিয়ত আদান-প্রদানের ফলে মানুষের ঐক্য স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। বিজ্ঞান যেমন জাতি ও দেশের সীমা অতিক্রম করে, আর্থিক বিধিব্যবস্থার মূলসূত্রগুলিও তেমনই আজ সকল দেশে একই রূপ ধারণ করেছে। একই আর্থিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একই পরিণতি আজ সকল সমাজের লক্ষ্য। চীন ও জাপানের প্রাচ্য সভ্যতা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে নি। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর সমস্যা সকল দেশে সমান তীব্র হ'য়ে না উঠলেও কোনো সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সে আলোচনা ও আন্দোলন বন্ধ রাখতে পারবে না।

আমাদের দেশে সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর স্থান যাই হোক না কেন, ইউরোপে অন্ততঃ তাকে উপেক্ষা করবার আর উপায় নেই; গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে তার প্রভাব পাশ্চাত্য জীবনকে আলোড়িত ক'রে তুলছে। পশ্চিমের সাহিত্য ও বাদানুবাদের মধ্যে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অনেক তর্কই আমরা শুনি কিন্তু এই বিরাট আন্দোলনের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। যে-কোনো মতবাদের প্রকৃত বিচারের পথে অজ্ঞতা

ও অস্পষ্ট ধারণা বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। সোশ্যালিষ্ট্‌ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যে-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই ব্যবস্থাকে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ বা ধনতন্ত্র বলা হয়। এর একটি মূলসূত্র বহু প্রাচীন—ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ভোগের নিয়ম ও উত্তরাধিকার প্রথা। অপরটি ইতিহাসে খুবই নূতন—গত দেড়শ বৎসরের ভিতর ধনোৎপাদন-প্রণালীর বিপুল পরিবর্ত্তন। প্রতি দেশেই ধনোৎপাদনের জন্য যা' কিছু প্রয়োজন তার মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম বা গতর ছাড়া অন্য সবই অতি অল্পসংখ্যক লোকের সম্পত্তি। নূতন আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি আবার ধনী ভিন্ন অন্যদের আয়ত্তের বাহিরে। ফলে প্রতি সমাজেই দুটি প্রধান স্তর দেখা যায়—একদিকে অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, সকল ব্যবসায়বাণিজ্যে লাভ পায় তারাই, দেশে তারাই প্রকৃত প্রভু; অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমজীবীর দল—তারা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে যে সামান্য মজুরি পায় তাতে হয়তো কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে এবং সেটুকুর জন্যও তাদের নির্ভর করতে হয় ধনিকদের উপর। সমাজের অন্য অন্য অংশগুলি এই দুই মুখ্য শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত—তাদের স্বার্থ ধনিক কিংবা শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গেই বিজড়িত।

ধনিকদের প্রভুত্ব এবং ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এই বিরাট প্রভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিছু নূতন নয়। ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের প্রারম্ভে অনেক সহৃদয় লোক তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন—তাঁদের মনে হয়েছিল যে, দেশের পূর্ব্বতন একতা চূর্ণ ক'রে ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ স্ফুট ক'রে তুল্‌লে একই দেশে যেন দুটি বিভিন্ন জাতি গ'ড়ে উঠ্‌বে। সম্প্রতি ইউরোপে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ও সমাজের মঙ্গলের জন্য ধনিকদের স্বেচ্ছাচারে বাধা দেবার কথা তুলেছে। আমাদের দেশেও ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে আপত্তি বিরল নয়—সনাতন আর্থিক বিধিব্যবস্থা অনুসরণের উপদেশ এবং যন্ত্র-সভ্যতার অমানুষিকতা ও সৌন্দর্য্যহীনতার আলোচনায় আমরা অভ্যস্ত।

কিন্তু এই ধরণের আপত্তি ও সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। উপরে যাঁদের কথা বলা হয়েছে—তাঁরা যন্ত্রের বহুল প্রচার ও ধনিকদের নির্ম্মম ও যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগের উপর সমাজ-প্রতিষ্ঠা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ও ন্যায্য মনে হয়। সোশ্যালিস্ট্‌রা কিন্তু যন্ত্রপাতির বিরোধী নন কেন-না

যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে ধনোৎপাদন সম্ভব নয় এবং নূতন পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ কর্‌লে মানুষের দারিদ্র্য বা শ্রমভার লাঘবের অন্য উপায় থাকেনা। তাঁদের মতে ধনতন্ত্রের অমঙ্গলের মূল কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার, যন্ত্রের ব্যবহার নয়; তবে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে নূতন ধনোৎপাদন-প্রণালীগুলি ব্যয়সাধ্য ব'লে ধনিকের প্রতাপ প্রচণ্ডতর হ'য়ে উঠেছে। ধনোৎপাদনের জন্য যা' কিছু প্রয়োজনীয় সে সমস্ত সাধারণের সম্পত্তি হ'লে অন্যায় অত্যাচার, দারিদ্র্য ও দাসত্ব অসম্ভব হবে, এই বিশ্বাস সোশ্যালিষ্ট্‌দের মজ্জাগত।

এই নিয়মের অভাবেই ধনতন্ত্রকে অসীম অমঙ্গল ও অশেষ দোষের আকর ব'লে সোশ্যালিষ্ট্‌রা মনে করেন। ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য অপরকে অতিক্রম ক'রে বড় হওয়া। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের বদলে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বার্থের সঙ্ঘাতই বড় হ'য়ে দেখা দেয়—আর তার সঙ্গে থাকে অজস্র অপচয়। ধনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করলে অবশ্য প্রতিযোগিতা হ্রাস হয় কিন্তু তখন আবার অল্পসংখ্যক ধনিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দেশের সমস্ত আর্থিক জীবন নিজেদের করায়ত্ত ক'রে ফেলে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেশে বা সমাজে স্বদেশী ও বিদেশী ধনিকের আধিপত্য স্থাপিত হয়—নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে থাকে প্রভুত্ব আর জনসাধারণকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করতে হয় তাদের উপর। আজকাল অনেক লোকে অর্থ সঞ্চয় করে বটে কিন্তু সে অর্থ ধনোৎপাদনের কাজে লাগে ধনিকদেরই ইঙ্গিতে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে দেশের সঞ্চিত অর্থ যায় শুধু সেই সব দিকে যেখানে ধনিকদের প্রভূত লাভের সম্ভাবনা—সমাজের কল্যাণ বা জনসাধারণের উন্নতি লক্ষ্য হিসাবে নিতান্তই গৌণ হ'য়ে থাকে। জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলকে খর্ব্ব ক'রে মুখ্যতঃ অল্পসংখ্যক লোকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবসাবাণিজ্য-পরিচালন ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাবেকি অর্থশাস্ত্রের যুক্তি ছিল এই যে, প্রত্যেক লোকেরই কিসে নিজের মঙ্গল হবে তা' স্থির ক'রে সেইমত কাজ করবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে; ফলে সমষ্টির কল্যাণ আপনা হ'তেই সাধিত হ'য়ে যায়। আধুনিক ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দেবে যে, এই মত আসলে ভিত্তিহীন। কর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণ লোকের স্বাধীনতা বা আত্মরক্ষার উপায়ের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য ধনিকদের অপর্য্যাপ্ত লাভের দিনেও কখনও শ্রমজীবীদের দারিদ্র্য ঘোচে না এবং ব্যবসায়ে ক্ষতির সময় বেকার-সংখ্যা বেড়ে চলে। আধুনিক যুগের ফ্যাক্টরি-জীবনকে অনেকে দাসপ্রথার নূতন রূপ ব'লে গণ্য করেন। যে-সমস্ত বিদ্যা বা বৃত্তির অনুশীলন মানুষের প্রধান সম্পদ, বর্ত্তমানের

আর্থিক ব্যবস্থায় দরিদ্রেরা তাতে বঞ্চিত। অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানই এই জীবনে অধিকারী। কিন্তু তাদের আরাম-অবসর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পরিশীলন-সম্পদ সমস্ত নির্ভর করছে অপরের শারীরিক পরিশ্রমের উপর। অবশ্য জীবনে উৎকর্ষলাভ সকলের স্বভাবগত অধিকার না হ'তে পারে কিন্তু সে অধিকার কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকের আয়ত্তে থাকবে, এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। পৃথিবীতে প্রভু ও ভৃত্য শ্রেণীর প্রভেদ স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে বটে কিন্তু কেন চল্‌বে এ প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তোষজনক নয়। এই প্রশ্ন থেকেই সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর উৎপত্তি।

৩

সমাজের সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের প্রায় সকলের কাছেই ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌-এর দোষগুলি সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, দেশে গণতন্ত্র পূর্ণভাবে স্থাপিত হ'লে সংখ্যাধিক দরিদ্রেরা ভোটের ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে অনায়াসে ধনিকদের প্রভুত্বকে খর্ব্ব করতে পারবে। এই কারণে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করেন। গত শতাব্দীতে বিশেষ ক'রে গণতন্ত্রই সকল প্রশ্নের সমাধান করবে, এইরকম একটা বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল—আমাদের দেশে বোধ হয় এই মত এখনও অবিচল।

সোশ্যালিষ্ট্‌দের কাছে এ ধারণা ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীভেদের হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিও ডিমোক্র্যাসি আজ পর্য্যন্ত ক'রে উঠতে পারেনি। এর কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব।

সহস্র দুঃখভোগ সত্ত্বেও সাধারণ লোকে যে পলিটিক্সের প্রতি উদাসীন, নিজেদের অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ ও আপন শক্তিতে আস্থাহীন, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। ভোটের অধিকার থাকলেও তারা মতামতের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও জনমত গঠনের প্রধান উপায় হচ্ছে সংবাদপত্র। যে-সমস্ত সস্তা চাকচিক্যময় সংবাদপত্র প'ড়ে জনসাধারণ কোনো ব্যাপারে নিজেদের মন স্থির করে, তার পিছনে রয়েছে অজস্র মূলধন; সঙ্গে সঙ্গে ধনিকের স্বার্থ জড়িত—সত্যগোপন তাদের ব্যবসা। সমাজে ধনিক-কর্ত্তৃত্ব থাকার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিম্নস্তরের শিক্ষা-পদ্ধতিরও উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কারো মনে যেন প্রশ্ন না জাগে।

যেখানে কোন পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতাপ প্রবল সেখানেও ফল একই। ইহজগতের সমস্যা উপেক্ষা ক'রে পরলোকে আত্মার কল্যাণে মন নিবিষ্ট করা; দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো; পৃথিবীর সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার মৃত্যুর পরপারে নির্দ্দিষ্ট থাকে, এই বিশ্বাসের প্রচার—প্রায় সকল ধর্ম্মেরই এইগুলি সাধারণ লক্ষ্য। ধর্ম্মশিক্ষার ফলে লোকে সমাজে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা অন্যায় মনে করে। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও আবার সাধারণতঃ ধনিকদের উপর নির্ভর করতে হয়। সোশ্যালিষ্ট্‌দের ধারণা এই যে, দেশে ডিমোক্র্যাসি থাকলেও সংবাদপত্র, লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মমতের সম্মিলিত শক্তি জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। তা ছাড়া ভোটের অধিকার কয়েক বৎসর পর পর একবার কাজে লাগে—অজ্ঞতা ও সাময়িক উত্তেজনায় ভোটারের মন ঠিক সেই সময় আচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রতিদিন সাধারণ লোককে যে-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হচ্ছে তার মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নিদর্শন কোথায়? আর্থিক সমতা আন্‌তে হ'লে সেইজন্য গণতন্ত্র স্থাপনেই সন্তুষ্ট হ'লে চল্‌বে না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নূতন আদর্শ লোকসমাজে প্রচার করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাসই সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলনের ভিত্তি।

৪

সোশ্যালিজ্‌ম্ যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একথা বোঝা সহজ কিন্তু যে নূতন সমাজ গঠন তার আদর্শ সে সমাজের বৈশিষ্ট্য কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে। সোশ্যালিষ্ট্‌রা নানা দলে বিভক্ত সুতরাং তাদের মধ্যে মতদ্বৈধ স্বাভাবিক। অনেকে আবার সোশ্যালিষ্ট্‌ নাম গ্রহণ ক'রেও সে আদর্শের সকল দিক পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেন না। সোশ্যালিষ্ট্‌দের আচরণের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিশুদ্ধ মতবাদটির মূলসূত্রগুলির আলোচনা করতে হবে।

সকল দেশে ও সকল যুগে সমাজের মধ্যে একটা স্তরভেদ পাওয়া যায়—এই বিভিন্ন অংশগুলিকে শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের কথাই বিচার করি কিন্তু তার থেকেও বড় কথা বোধ হয় এই শ্রেণীর সমস্যা কেননা সাধারণ লোকের স্বার্থ ও মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত। শ্রেণীভেদের অর্থই এই যে, বিভিন্ন স্তরের স্বার্থের মিল থাকে না; কাজেই শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ সমাজের চিরন্তন প্রথা। সেইজন্য সমাজকে স্থিতিশীল

করতে হ'লে শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য আবশ্যক। অথচ যাদের উপর এই কর্তৃত্ব তাদের পক্ষে এ প্রভুত্ব মেনে চলা সহজ নয়। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর প্রধান কথা এই যে, সমাজ থেকে অত্যাচার, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নির্ব্বাসিত করতে হ'লে শ্রেণীভেদ নির্ম্মূল করতে হবে—ভবিষ্যতের মানব-সমাজ গঠিত হবে মাত্র একটি বিরাট শ্রমিক-সঙ্ঘকে নিয়ে। বার্ণার্ড্‌ শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধনসাম্য চেয়েছেন কিন্তু উত্তরাধিকার প্রথা উঠে গেলে শ্রেণীগত বৈষম্যের উচ্ছেদই যথেষ্ট মনে হয়। এর প্রধান উপায় হচ্ছে এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন যে, ধনসৃষ্টির সকল উপাদান (ভূমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, শক্তির উৎস, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি) সাধারণের সম্পত্তি হবে। এগুলির ব্যবহার ও পরিচালন-পদ্ধতির সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্ট্‌দের মধ্যে কোন স্থির মত পাওয়া যায় না কিন্তু এদের উপর যে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার অস্বীকার করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের লেশমাত্র নেই। পশ্চিমে রাষ্ট্রীকরণের যে-আন্দোলন চল্‌ছে তার উদ্ভব এই বিশ্বাসের থেকে। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত জিনিষগুলি কয়েকটি লোকের সম্পত্তি ব'লে তারা দেশের সমস্ত আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর আর একটি মূলসূত্র হচ্ছে দারিদ্র্যের অপসারণ। শ্রেণীবিভাগ উঠে গিয়ে যদি সকল মানুষের সমান অভাব হয় তবে আর যাই হোক্‌ তাকে নূতন সমাজ ও নবসভ্যতা বলা চলবে না। লেনিন্‌ অবশ্য বলেছিলেন যে, কোন লোকের বাহুল্য ভোগ করবার উপায় রাখার আগে প্রত্যেকের যা' অত্যাবশ্যকীয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনকার অপেক্ষাও কম সময়ে ও পরিশ্রমে সকলের আরামে থাকার মত ধন উৎপন্ন করা সম্ভব। দারিদ্র্যের কারণ মানুষের শক্তির অভাব নয়—আসলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিগত অধিকার ও তাদের লাভের জন্য ইচ্ছামত ধনোৎপাদন ইত্যাদি সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাগুলিই অভাব সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা স্মরণ রাখতে হবে। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর আদর্শে উত্তরাধিকার প্রথার স্থান নেই কিন্তু তার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থার জন্য সমাজের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আর্থিক সমতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অবসরের অধিকার, শিক্ষার সমান সুযোগ ইত্যাদি কতকগুলি ধারণা এই মতবাদের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। সোশ্যালিষ্ট্‌ সমাজ সম্পূর্ণভাবে গঠিত হবার পর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার থাকবে না অথচ সুব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকের পক্ষেই আপনার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হ'য়ে উঠবে এই আশা করা হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ

ও সুকুমার বৃত্তিগুলি হয়ত তখন আর অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মাত্র কতকগুলি লোকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর—নূতন ব্যবস্থাতেই জনসাধারণের পক্ষে সে পথ প্রথম উন্মুক্ত হবে।

সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শের আর দু'টি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি এই যে, সমাজের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার ভার থাকবে জনসাধারণের উপর—গণতন্ত্রের মূলসূত্র শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না, প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনেও তাকে প্রচলিত করতে হবে। কি উপায়ে যে এই আদর্শ কার্য্যকরী হ'তে পারে সে সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্ট্‌দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এক বিশ্বাস যে, অন্ততঃ নূতন সমাজ গ'ড়ে উঠবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। এক অশেষপরাক্রান্ত শাসকের ইঙ্গিতে শ্রেণীভেদ ও দারিদ্র্যের অবসান কল্পনায় সম্ভব হ'লেও তাকে পূর্ণ সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সোশ্যালিজ্‌ম্ এক দেশের ব্যাপার নয়। ধনতন্ত্রের কল্যাণে এখন সমস্ত পৃথিবী এক সূত্রে যুক্ত, একই আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। ভবিষ্যতে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আর কোনো জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। একটি দেশে সোশ্যালিজ্‌ম্ গ'ড়ে উঠবার আগে সেইজন্য অন্ততঃ অন্য প্রধান দেশগুলিতে তার আবির্ভাব আবশ্যক। স্বাদেশিকতার মোহ কাটিয়ে ওঠা প্রকৃত সোশ্যালিষ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সমস্ত বিশ্বকে স্বদেশ ভাবা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

৫

সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্ভব কি অসম্ভব সে বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বিরোধী কয়েকটি যুক্তি ও সেগুলি খণ্ডনের চেষ্টার উল্লেখ না করলে তার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য এ তর্কের বিশদ আলোচনা সময়সাপেক্ষ।

অনেকে মনে করেন সোশ্যালিজ্‌ম্ সহৃদয় দুর্ব্বল লোকের দিবাস্বপ্ন মাত্র। এক সময়ে এ বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ছিল কিন্তু এখন আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগ শেষ হ'য়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের চিন্তারাজ্যে সাম্যভাব অতি প্রবল—যুগে যুগে তার প্রসার হ'য়ে এসেছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা প্রথম ভগবানের কাছে ধনী নির্ধন উচ্চ নীচ সকল মানুষের সমভাবের কথা প্রচার করেন। ফরাসী-বিপ্লবের পর পোলিটিক্যাল্ সাম্যের

আদর্শ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক সমতা আনবার চেষ্টা ক'রে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সেই একই ভাবধারাকে পূর্ণরূপ দিচ্ছে বলা যেতে পারে।

সমাজে ধনিক-কর্তৃত্ব ও শ্রমিক-দাসত্ব অনেকের কাছে সম্ভবতঃ অমূলক মনে হয়। এই বিশ্বাস সত্য হ'লে অবশ্য সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর কোনো আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রতিকারের উপায় যদি বা না থাকে তবু শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা তর্কে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রমজীবীদের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত হয়েছে একথা বলাও শক্ত; হ'য়ে থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনই তার মুখ্য কারণ। রাষ্ট্রশক্তির নিরপেক্ষ বিচারে অবিশ্বাসী সোশ্যালিষ্ট্‌দের যুক্তি এই যে, শাসকসম্প্রদায় যে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ পরিহার করতে পারবে তার স্থিরতা কোথায়? অসন্তোষ থাকলে আন্দোলনও অবশ্যম্ভাবী।

এ অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায় যে, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঈর্ষা ও সাংসারিক বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত। কিন্তু ধনতন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে নিঃস্বার্থতার কোনো প্রমাণ পাওয়া দুর্লভ। শ্রেণীস্বার্থ যদি নিছক কল্পনাপ্রসূত না হয় তবে এই সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়—মায়া ও মোহের আবরণ এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার উপায়মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থত্যাগের উদাহরণ বিরল নয় বটে কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্‌দের বিশ্বাস যে, একটি সমগ্র শ্রেণীর স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্বার্থ-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ অস্বাভাবিক ও প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী এই বিশ্বাস খুবই সাধারণ। কিন্তু মানুষের স্বভাব ব'লে একটা অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তন পদার্থ আছে কিনা বিবেচ্য। যুগে যুগে মানব-চরিত্র ও লোকমত যে ঠিক অবিকৃত থেকে যায় এ কথা বলা চলে না। প্রচার, শিক্ষা, নেতৃত্ব ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সোশ্যালিষ্ট্‌দের কাছে দুরূহ মনে হয় না। তাঁরা বলেন যে, ইউরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিককালের মধ্যে মতামতের বিপুল পার্থক্য তাঁদের এই আশার সমর্থন করে।

সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলনের বিরুদ্ধে শেষ আপত্তি এই যে, এতে এক অমঙ্গলের বদলে আসবে আরেক অমঙ্গল। শেষ পর্য্যন্ত নূতন ব্যবস্থাতে মানুষের কোন স্থায়ী কল্যাণ হবে না। ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়; সুতরাং এ কথা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা অসম্ভব। যাঁরা অনিশ্চিতের ভয়ে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা শ্রেয় মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু দু' ধরণের লোক এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এক, যাদের, মার্ক্সের ভাষায়, পৃথিবীতে শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই; আর, যাদের চিন্তা বরাবরই দুঃসাহসিক।

৬

আধুনিক ইতিহাসে তিনটি মত পাওয়া যায় সোশ্যালিষ্ট্ নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যাদের সোশ্যালিজ্ম্-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কেন চলে না সে কারণ নির্দ্দেশ করলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হ'তে পারে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে ক্রীশ্চান্ সোশ্যালিজ্ম্-এর উৎপত্তি হয়। পরে অন্যান্য দেশেও অনুরূপ দলের সৃষ্টি হয়েছিল। ধনিক ও শ্রমিকের অবস্থার পার্থক্যে ব্যথিত হ'য়ে কিংস্লি, হিউস্ প্রমুখ নবীন লেখকেরা ধনিকদের সংশোধনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন—যিশুর উপদেশের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ছিল তাঁদের প্রধান অস্ত্র। ক্রীশ্চান্ সোশ্যালিষ্ট্দের শতচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ধনতন্ত্রের বিরোধী হয় নি; ধনিকদের মন-পরিবর্ত্তনের চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তি কোন ধর্ম্মমতে নয়, শ্রমিক-শ্রেণীর আত্মপ্রত্যয়ই তার মূল।—এর থেকে নিঃসন্দেহ এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

জার্ম্মাণীতে যখন সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাট্ দল বিশেষ ক্ষমতাশালী হ'য়ে ওঠে তখন দমন-নীতি ব্যর্থ হওয়াতে বিস্মার্ক্ অন্য পথ অবলম্বন করলেন। তিনি ষ্টেট্ থেকে শ্রমিকদের উপকারের জন্য নানারকম বীমার সৃষ্টি ক'রে সদয় ব্যবহারে শ্রমিক-আন্দোলনের উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্ভাবিত হিতসাধনপদ্ধতিকে তখন ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্ম্ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, অন্য দেশেও অল্পবিস্তর সে চেষ্টা হয়। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে, বিস্মার্কের পন্থাকে সোশ্যালিজ্ম্ বলা চলে না কারণ ধনতন্ত্র বজায় রেখে শ্রমিকদের ছোটখাট উপকার সাধনের চেয়ে সোশ্যালিজ্ম্-এর উদ্দেশ্য অনেক বেশী ব্যাপক।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে ফ্যাসিষ্ট্রা ন্যাশনাল্ সোশ্যালিষ্ট্ বা নাজি আখ্যা গ্রহণ ক'রে অতি দ্রুত গতিতে ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্ছে। আসল সোশ্যালিষ্ট্ ও কমিউনিষ্ট্দের সঙ্গে অবশ্য তাদের অহিনকুলের সম্পর্ক। মুসোলিনীর পন্থা অনুসরণ ক'রে এই ফ্যাসিষ্ট্রা কেন যে আজ পর্য্যন্ত সোশ্যালিষ্ট্ নাম বর্জ্জন করে নি বোঝা শক্ত। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এদের সোশ্যালিজ্ম্-এর পংক্তিতে ফেলা অনুচিত। শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ সোশ্যালিজ্ম্-এর মূলমন্ত্র, কিন্তু নাজিদের উদ্দেশ্য দেশের লুপ্তগৌরবোদ্ধার ও নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি-প্রতিষ্ঠা। জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট্দলের নামে জাতীয় ও সোশ্যালিষ্ট্ এই দুটি অংশ পরস্পর বিরোধী।

৭

আদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ, নানা দেশের আর্থিক অবস্থাগত পার্থক্য, জাতিগত বিশেষত্ব, ভিন্ন ভিন্ন নেতার প্রভাব—ইত্যাদি

নানা কারণে সোশ্যালিষ্ট্রা বহু দলে বিভক্ত। কিন্তু উপরে যে মূলসূত্রগুলি আলোচিত হয়েছে সকল দলই সে গুলির সম্বন্ধে একমত বলা যেতে পারে।

সোশ্যালিজ্ম্-এর পাঁচটি প্রধান শাখা আছে—ইংরাজিতে তাদের নাম —Collectivism, Syndicalism, Guild Socialism, Communism, Anarchism. এদের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। কাজ চালাবার জন্য কতকগুলি কথা ব্যবহার করা যেতে পারে—**সমষ্টিবাদ, সমিতিতন্ত্র, সঙ্ঘতন্ত্র, সাম্যবাদ** ও **নৈরাজ্য**।

সমষ্টিবাদে ভবিষ্যৎ সমাজের চালকরূপে কল্পিত হয়েছে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক মতে গঠিত বিরাট রাষ্ট্রশক্তি। এই নূতন রাষ্ট্র জনসাধারণের সমষ্টি—তারই হাতে রাজনৈতিক ও আর্থিক সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। নূতন সমাজ গঠনের উপায় হচ্ছে অহিংসভাবে জনসাধারণের মধ্যে নূতন আদর্শের প্রচার ও ধীরে ধীরে আইনসঙ্গত উপায়ে সংস্কার। ইউরোপে সাধারণতঃ এই বিশেষ মতটিকে সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাসি আখ্যা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কোনো বিপুল শক্তি-স্থাপনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই সমিতিতন্ত্রের মূল কথা। ফরাসী syndicat কথাটি শ্রমিক-সমিতির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। সিণ্ডিক্যালিষ্ট্ মতবাদে ভবিষ্যৎ সমাজে প্রত্যেক ব্যবসায়ের পরিচালন সেই কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারই থেকে সিণ্ডিক্যালিজ্ম্ নামের উৎপত্তি। শ্রমিক ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ এবং দেশব্যাপী বিরাট ধর্ম্মঘটের সাহায্যে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের সঙ্কল্প সমিতিতন্ত্রের বিশেষত্ব।

সঙ্ঘবাদ উপরোক্ত মত দুটির সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগে ইউরোপে যে গিল্ড্ বা সঙ্ঘের কথা শোনা যায় তারই নামে এই মতটির নামকরণ হলেও আসলে আদর্শটি নূতন। সমাজের প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য পৃথক একটি শ্রমিক-সঙ্ঘের কল্পনা করা হয়েছে—ভবিষ্যৎ সমাজ এক অসীম পরাক্রান্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির পদানত থাকবে না; ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ মালার মত একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে নূতন সমাজের সৃষ্টি করবে। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সুসম্পাদন ও সঙ্ঘগুলির মধ্যে বিরোধ নিরাকরণের জন্য কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন সঙ্ঘবাদ স্বীকার করে। শ্রমিক সমিতিগুলিকে পূর্ণ সঙ্ঘে পরিণত করার চেষ্টাই এই দলের কার্য্যপ্রণালী। ভবিষ্যৎ বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে গভীর মৌলিক চিন্তা ও অভিনব প্রস্তাব সঙ্ঘবাদের একটি বৈশিষ্ট্য।

সাম্যবাদ মার্ক্স্ ও এঞ্জেল্স্-এর মতের লেনিনকৃত টীকার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে। রুষ-বিপ্লবের পর এই মতবাদ সাফল্য-গর্ব্বে মণ্ডিত ও সুপরিচিত হ'য়ে পড়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্ম্মপদ্ধতিতে। সাম্যবাদ

অনুসারে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রের ধ্বংস অসম্ভব এবং বিপ্লবের পর শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্যের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এই কর্ত্তৃত্ব অবশ্য সাম্যবাদী দলের হাতে ন্যস্ত থাকবে কিন্তু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রে পূর্ণ পরিণতি লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবকাশ নেই। রাশিয়াতে উদ্ভাবিত সোভিয়েট্-সমিতি বর্ত্তমান সাম্যবাদের অঙ্গীভূত হয়েছে এ কথা বলা বাহুল্য।

নৈরাজ্যবাদকে সোশ্যালিজ্‌ম্-এর শাখা বলাতে আপত্তি হ'তে পারে কেননা এই মতের সঙ্গে অন্য দলগুলির একটা প্রাচীন দ্বন্দ্ব আছে। কেন্দ্রীয় বা অন্য যে-কোনরূপ শাসক-শক্তির প্রয়োজন অস্বীকার করাই নৈরাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রেণীভেদ না থাকলে ষ্টেটের অস্ত্রবল ছাড়াও সমাজের সকল কাজ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হ'তে পারে এই বিশ্বাস নৈরাজ্যবাদীদের মজ্জাগত। এঞ্জেল্‌স্-এর ভাষায় কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃ আপনা হতেই লোপ পেতে বাধ্য। এই মত সত্য হ'লে স্বীকার করতে হয় যে, সাম্যতন্ত্রের পরিণতি নৈরাজ্যে।

সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতের সমাজ-পরিচালনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থেকেই এই ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলির উৎপত্তি। কিন্তু মূলসূত্রের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় এই বিভিন্ন মতগুলির ভিতর একটি গভীর ঐক্য আছে।

শ্রীসুশোভন সরকার

আধুনিক নাট্য-প্রসঙ্গ

য়ুরোপের আধুনিক নাট্যসমালোচনার সঙ্গে যিনিই সুপরিচিত, তিনিই প্রায় শোনেন যে রঙ্গালয়ের এখন শনির দশা। আসলে য়ুরোপীয় নাটকের ইতিহাসে, সেনেকার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, কখনো এমন যুগ ছিলোনা, যখন এই সঙ্কট দেখা যায়নি। অবশ্য তুর্দ্দশার অবস্থাভেদ আছে। কখনো কখনো, যেমন ফরাসী রোমান্টিকদের বাহুল্যপ্রিয় যুগে, নাট্যশালা অতিভোজনের কুফল ভোগ করে; আবার মাঝে মাঝে, যেমন আজকে, সে দক্ষিণতুয়ারের অতিনিকটে এসে পড়ে। এরকম সময়ে যমদূতের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে হ'লে, চোখ বুজে মৃত্যুর ভান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। কয়েক বছর আগে তার অবস্থা আরো অপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো; সকলে ভয় পেয়েছিলো যে নির্ব্বাক ছবির আক্রমণে বুঝিবা তার চিহ্নমাত্র বাকি থাকবেনা। তখন কিউবার মতো তু-একটা দেশের নাম করা হতো, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে বসেছিলো। য়ুরোপের বড় বড় সহরে নাট্যমন্দিরগুলো তো সিনেমায় রূপান্তরিত হচ্ছিলোই, এমন-কি জায়গায় জায়গায় অতিকায় চিত্রপ্রাসাদগুলোকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে অনেক রঙ্গালয়ই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। অবশেষে যখন মনে হলো, এই প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা তার সাধ্যে আর কুলাবেনা, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সবাক ছবির প্রাতুর্ভাব তাকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুললে।

সিনেমার প্রবেশমূল্য সস্তা এবং বাড়িগুলি শ্রান্তিবিনাশক; কিন্তু কেবল এই তুটি কারণেই সিনেমা দিগ্বিজয়ী হয়নি। তাছাড়া সিনেমাছবি-মাত্রকেই খুসিমতো ছাপা ও বিনাহাঙ্গামে চালান দেওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে যেটুকু শিক্ষা বা যেরকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হতে পারে, তা একটা সঙ্কীর্ণ পল্লীতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য, কিন্তু সিনেমার ব্যাপ্তি প্রায় অপরিসীম। ভাষার বাধা, এমন-কি নিরক্ষরতা অবধি, তার পথরোধে অক্ষম। আষ্টপ্রহরিক অভিনয়, নৈঃশব্দ্য, নবতন ইমারতের অপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিশেষত অন্ধকারে সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের সুযোগ এবং চিত্রবস্তুর নির্ভারতা, প্রধানত এই কটা বৈশিষ্ট্যই তার সাফল্যকে স্থায়ী ও সংহত ক'রে তুলেছে।

উপার্জ্জনের দিক দিয়ে রঙ্গালয় যদিচ সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনা, তবু এইটাই তার উপস্থিত তুরবস্থার একমাত্র কারণ নয়। একটা মজ্জাগত ত্রুটি তাকে চিরদিনই পীড়া দিয়ে এসেছে: তাঁর আকার আয়তন, ব্যবস্থাপক প্রযোজক, নট নটী, মিস্ত্রি মজুর, এ-সমস্তই স্থিতিস্থাপকতার

পরিপন্থী, এবং এদেরি জন্যে সে আজ রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ। অবশ্য দারুণ দুঃসময়ে ছাড়া নাট্যশালা কখনো সাধারণ রুচির পদানত হয়নি, কিন্তু তাহলেও তার আর্থিক ইতিহাসে এই রুচিই মুখ্যপাত্র। সাহিত্যবিচারে সাধারণ পাঠকের যতটা মূল্য, নাট্যানুষ্ঠানের সার্থকতা-পরিমাপে সাধারণ দর্শকও তদনুরূপ হতে পারে, তবু কোনো-না-কোনোখানে নাটক ও যথার্থ নাট্যামোদীর মধ্যে একটা রহস্যময় যোগসূত্র আছেই আছে। ফলে নাট্যামোদীর রুচি যেমন নাট্যশালার প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে, তেমনি নাট্যশালাও নাট্যামোদীর বশবর্ত্তী হয়ে পড়ে। আসলে নাটকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রভেদটা অন্য গোত্রের। সাহিত্য রচিত হয় বাসগৃহের নীরব নির্জ্জনতায়, যে-নামহীন জনতাকে সে ডাক দেয়, তার অস্তিত্ব হয়তো না-ও থাকতে পারে। কিন্তু নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমন-কি ব্যক্তিগত; মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারে শিল্পসৃজনে সমর্থ কি-না, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলে এই নাটক-দর্শকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

উপরে নাট্যকলার যে-সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করলুম, তার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর। সেই সময়ে বের্লিনের লেসিঙ্ থিয়েটার মাইনিঙ্গার-নামে দুই ভায়ের হাতে আসে। তাঁরা দুজনেই একনিষ্ঠ পরীক্ষাপন্থী ছিলেন; এবং উভয়েই সঙ্কল্প করেছিলেন যে নাটুকেপনার বাড়াবাড়ি ও বক্তৃতার বাহুল্য থেকে ম্রিয়মাণ নাট্যকলাকে উদ্ধার করবেন। ফলে তাঁরা একটি অভিনব নাট্যপ্রণালীর উদ্ভাবনে লেগে গেলেন; এটি হলো বাস্তবিকতার পরিবেস্টনে ফেলে নাট্যকারের অভিপ্রায়কে বাস্তব উপায়ে ব্যাখ্যা করা। প্রতিবিম্বনশিল্পমাত্রেই তখন ওই দিকে ঝুঁকেছিলো। কিন্তু তাঁদের সদুদ্দেশ্য সাময়িক এবং পদ্ধতি উপযুক্ত হ'লেও, মাইনিঙ্গার-ভ্রাতাদের প্রতিভা অতিমাত্রিক ছিলোনা। তাই তাঁদের প্রভাব একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েই আবদ্ধ থেকে গেলো। এই ছোট দলটি তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধা করতো বটে, কিন্তু অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, কারণ সেজন্যে প্রয়োজন সর্ব্বসাধারণের সমর্থন। সে যাই হোক, স্বদেশে উপযুক্ত সম্মানে বঞ্চিত হ'লেও, সৌভাগ্যক্রমে বিদেশে তাঁদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লো; এবং তখন সর্ব্বত্রই যেহেতু সুমনা নাট্যশিল্পীরা সাময়িক অসঙ্গতির প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তাই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁরা বহুসংখ্যক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী পেতে লাগলেন। ফরাসীদেশে আঁতোয়ান-নামে একজন তরুণ নট ও নাট্যকার তাঁর অভিনেতাদের মাইনিঙ্গার-প্রথায় দীক্ষিত করলেন, এবং অচিরে যখন তেয়াত্র্ লিব্র্-নামে একটি নতুন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো, তখন সেকালকার সমস্ত সাহিত্যফৌজ সেই

অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মানি উভয়ত্রই কাজ চলতে লাগলো অবৈতনিক ভাবে, কেমন যেন একটা অনিশ্চিত পরীক্ষার আবহাওয়ায়। বোঝা গেলো সে-অবস্থায় পেশাদার অভিনেতা ও পরিচালকের মৌরসী হাতযশের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা দুরাশামাত্র। ঠিক এই মুহূর্ত্তে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি ও নেমিরোভিচ-দান্‌শেঙ্কো-নামে দুজন রুষ আসরে নামলেন। আধুনিক নাট্যজগতের এই দুটি গ্রহপতির নাম নাট্যকলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

ষ্টানিশ্লাভ্স্কির জন্ম মস্কোর সেই সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীদের ঘরে যারা তাদের জন্মভূমির শিল্পসৃষ্টিতে ও পরিশীলনবর্দ্ধনে রোমের অভিজাত প্যাট্রিশিয়নদের মতোই অগ্রগণ্য। ষ্টানিশ্লাভ্স্কি দেশভ্রমণকালে মাইনিঙ্গার-ভ্রাতাদের সংসর্গে আসেন, এবং তাঁদের পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ ক'রে, প্যারিসে আঁতোয়ানের সহায় হন। তাঁর উপজীবিকা ছিলো একটা প্রকাণ্ড তাঁতশালার পরিচালনা, কিন্তু তাঁর সমস্ত অবসরটুকু মস্কোর 'ললিতকলা সমিতির' নাট্যরসিক সভ্যদের অভিনয়শিক্ষায় উৎসর্গিত হতো। অল্প দিনেই তিনি উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ব'লে খ্যাত হয়ে পড়লেন; এমন-কি সরকারী নাট্যানুষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষদের বহু আমন্ত্রণও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হলো। শুধু নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তিই এ-প্রত্যাখ্যানের একমাত্র কারণ ছিলোনা; উপরন্তু সেকালের নাট্যজগৎ যে-আত্মম্ভরিতা, কুৎসা ও নীতিশৈথিল্যের আশ্রয়স্থল ছিলো, সেখানে তাঁর মন স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করতো।

নেমিরোভিচ-দান্‌শেঙ্কোর উদ্ভব আরমিনিয়ার এক রুষপরিবারে। তিনি তিফ্‌লিস্ থেকে সদ্য এসেই একগুচ্ছ সামাজিক নাটকের সাহায্যে আপনার ব্যক্তিস্বরূপকে নাট্যকেন্দ্রগুলিতে সুপ্রকাশ ক'রে তুললেন, এবং অপরিসীম বৈদগ্ধ্যের গুণে অচিরেই মস্কোর ইম্পিরিয়াল্ লিট্‌ল্ থিয়েটারে সাহিত্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন। তখনকার দিনে এই অনুষ্ঠানটি গতানুগতিক শিল্পের আদর্শস্থল তো ছিলো বটেই; এমন-কি সোভিয়ৎ কর্ত্তাদের কারো কারো বৈরিভাব সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্ত সে-সম্মান তারি প্রাপ্য। এই নাট্যমন্দিরটির সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চাদর্শের ও ধ্রুপদী সুরুচির তুলনা একমাত্র কোমেদি ফ্রঁসেজ্-এই পাওয়া সম্ভব। সে যাই হোক, নেমিরোভিচ নাট্যকলার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেননা; তাঁর মনে হলো যে তাঁর নিজের নাট্যমন্দিরেই সে-শিল্পের অন্তঃকাল ঘনিয়ে আসছে; তিনি যেন দেখতে পেলেন যে এটি একটি সুসজ্জিত ঘোড়ার মতো—খাটো দড়িতে বাঁধা প'ড়ে তার চলচ্ছক্তি হারিয়ে গেছে; আহার্য্য-সংগ্রহের ক্ষমতা নেই ব'লে, আজ নিজের মরা মনই হয়ে উঠেছে তার

একমাত্র উপজীব্য। ফলে নাট্যসংস্কারের ধ্রুব সঙ্কল্প তাঁকে পেয়ে বসলো; তাঁর মনে হলো, এখনো সময় আছে, চেষ্টা করলে এখনো হয়তো নাট্যকলা প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচ্যবস্তু না-ও হয়ে উঠতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নেমিরোভিচ যদিও মস্কোর বাসিন্দা ছিলেন, তবু ষ্টানিশ্লাভ্স্কির নাম তিনি শোনেননি; ভদ্রপরিবার থেকে অভিনেতা সংগ্রহ ক'রে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি যে অবৈতনিক নাট্যসমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাও তাঁর অবিদিত ছিলো। সে যাই হোক, মধ্যস্থ বন্ধুরা দুই পক্ষের পরিচয় ঘটিয়ে দিলে, এবং ষ্টানিশ্লাভ্স্কি-সন্দর্শনে নেমিরোভিচ একদিন মস্কোর সহরতলীর এক প্রকাণ্ড আস্তাবোলে উপস্থিত হলেন, যেখানে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি তাঁর অভিনেতাদের মহলা দেওয়াচ্ছিলেন। সেবারে আলাপ জমলোনা, কিন্তু বিদায়কালে পুনর্ম্মিলনের ব্যবস্থা হলো। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটলো মস্কোর এক হোটেলকামরায়। একসঙ্গে নৈশ ভোজন সেরে, তাঁরা এক দুর্গন্ধ ঘরে গিয়ে কথা সুরু করলেন; এবং সারা রাত চ'লে, নাট্য-উজ্জীবনের আলোচনা যখন শেষ হলো, তখন দুজনেই দেখে চমকে গেলেন যে ইতিমধ্যেই সূর্য্যোদয় হয়েছে। এই সুদীর্ঘ বিশ্রম্ভালাপের ফলেই মস্কো আর্ট থিয়েটারের সম্ভব।

উক্ত ঘটনার বর্ণনায় আমি ইচ্ছা ক'রেই এত সময় অতিবাহিত করলুম, কারণ ওর কল্যাণে যে-মহান নাট্য-উদ্যোগের সূত্রপাত, তার সমকক্ষ কোনো যুগেই মিলবেনা। কথাটা যদিও হেঁয়ালির মতো শোনায়, তবু তাঁরা যে-নাট্যকলার জন্মদাতা, সেই নাট্যকলাই, নানারকম অবস্থান্তর ও উষ্ণমস্তিষ্ক তরুণদলের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্ত একমাত্র আধুনিক, এমন-কি একমাত্র সম্প্রতিবিদ, অভিনয়শিল্প। তিনটি মূলসূত্রের সাহায্যে তাঁরা নাট্যকলার মুক্তিবিধান করেন, এবং মর্য্যাদায় এদের প্রত্যেকটিই সমান। এই তিনটি সূত্র হচ্ছে অকৃত্রিম শিল্পসেবা, নাট্য-জগতের নৈতিক সংস্কার, এবং ব্যাবসায়িক সাফল্যের সুব্যবস্থা। শেষোক্ত বিষয়ে সমবায়-আদর্শ-অনুসারে প্রত্যেক কর্ম্মীকেই মুনাফায় ভাগ দেওয়া হতো। অকৃত্রিম শিল্পসেবা বলতে তাঁরা বুঝতেন দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, যার দ্বারা অভিনেতা কেবল নাট্যকারের অভিপ্রায়কে নয়, তাঁর প্রত্যাদেশকে সুদ্ধ মূর্ত্ত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অভিনেয় যুগের প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা ক'রে, তবে দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি নির্ব্বাচিত হতো। ষ্টানিশ্লাভ্স্কি ধারালো ভাষায় বলতেন, শ্রেষ্ঠ শিল্পই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পণ্য; এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে তাঁদের উদ্যোগে দৈবদুর্ঘটনার কোনো অবকাশ রাখবেননা। সুতরাং কোনোখানে তাঁদের ঔদাসিন্য ছিলোনা; সাজসজ্জা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রচ্ছদপরিচ্ছদ

অবধি সমস্ত খুঁটিনাটিকে, সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারকে তাঁরা সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁদের প্রবর্ত্তিত নৈতিক সংস্কার ছিলো ব্রহ্মচর্য্যের মতো কঠোর; অভিনেতাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম থেকে তাদের পরস্পারের সম্পর্ক পর্য্যন্ত সমস্তই সে-বিধানের অন্তর্গত। কিন্তু তাহলেও এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করতে বেশি কষ্ট লাগেনি, কারণ তাঁরা ছিলেন উৎসাহী কর্ম্মীর দ্বারা পরিবৃত; এরা সকলে তো কৃতবিদ্য ছিলোই, এমন-কি অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ছাত্র। নেমিরোভিচ নিজে অভিনেতা না-হ'লেও, অপূর্ব্ব শিল্পী ছিলেন। ষ্টানিস্লাভ্স্কির প্রতিভা ও ব্যক্তিস্বরূপ মহত্তর হওয়াতে মস্কো আর্ট থিয়েটারের উদ্যোক্তা-হিসেবে নেমিরোভিচের খ্যাতি আজকে আওতায় প'ড়ে গেছে। কিন্তু এটা নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস, কারণ নেমিরোভিচ কেবল উক্ত অনুষ্ঠানের ব্যাবসায়িক দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েই তুষ্ট হননি, উপরন্তু এই কাজে তাঁর যতটুকু ছুটি মিলতো, সে-সমস্তই তিনি অতিবাহিত করতেন শিল্পবিভাগে ষ্টানিস্লাভ্স্কির সাহচর্য্যে।

তাঁরা দুজনেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে অভিনয়শিক্ষায় একটা নূতন পন্থা আবিষ্কৃত না-হ'লে, নাটককে রঙ্গালয়ের বাঁধা কথা ও সাধা প্রথার অত্যাচার থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। এই সঙ্কল্পে ষ্টানিস্লাভ্স্কি যে-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, রুষদেশে তা 'সিষ্টেমা'-নামে প্রসিদ্ধ। এই অদ্ভুত নাট্যবেদ মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাপনাবিধির নূতন তথ্যগুলিকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে, এবং গত পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিজ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হয়ে, অবশেষে একটা অপূর্ব্ব অনুকম্পনের আধারে পরিণত হয়। এই সটীক অনুশাসনে জনৈক মনীষী দেখিয়ে দিয়েছেন শিল্পজীবনে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রয়োগ কোথায় ও কেমন ক'রে। ষ্টানিস্লাভ্স্কির পদ্ধতিই অভিনয়শিক্ষার অনন্যপন্থা, তার সংযম যোগাভ্যাসের মতোই কঠোর। তিনি 'আমার শিল্পজীবন'-নামে যে-বিস্ময়কর আত্মজীবনী ছ বছর আগে আমেরিকায় প্রকাশ করেন, এবং যার মূল সম্প্রতি রুষদেশে বাহির হয়েছে, সে-গ্রন্থে উক্ত নটযোগের আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিবন্ধখানি মস্কো আর্ট থিয়েটারের সম্পত্তি। অভিনেতামাত্রেই সেখানির সঙ্গে সুপরিচিত বটে, কিন্তু নটসমাজের ব্যূহবদ্ধ একাত্মবোধ বইখানিকে এখনো অনধিকারীর কাছ থেকে গোপন রেখেছে।

উক্ত পদ্ধতির সার কথা হচ্ছে অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়ে, নট ও নাটকের মধ্যে প্রায় একটা মরমী সম্বন্ধ স্থাপন করা। ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে একটা আধ্যাত্মিক উপমা ধার ক'রে ষ্টানিস্লাভ্স্কি বলেছেন, যেমন অসমাপ্ত কর্ম্মের মধ্যে মরলে আবার সেই কর্ম্মেই পুনর্জ্জন্ম হয়, তেমনি ভূমিকার সাযুজ্যে যে প্রাণবিসর্জ্জন করতে

পারে, কেবল সেই নটই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নাটকের চরিত্ররূপে। যে-অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তিত্ববন্ধন থেকে অভিনেতার মুক্তি সম্ভব, তিনি তার নাম দিয়েছেন "এতুদ্"—অর্থাৎ সাধনাভ্যাস। এই উপায়েই সে কালক্রমে নিজেকে ভুলে, নাট্যোল্লিখিত চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। দৃষ্টান্ত-হিসেবে বলা যেতে পারে যে কোনো রমণী যদি তার দেহসৌষ্ঠব ও গমনগরিমার গুণে লেডি ম্যাকবেথ-ভূমিকার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়, তবু প্রথমেই তাকে শেক্স্পীয়রের পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করতে দেওয়া হয়না। সুরুতে প্রযোজকসূচিত কতকগুলো দৃশ্যে সে নিজের আচারব্যবহারকে আয়ত্ত ক'রে নেয়। এই দৃশ্যগুলোর সঙ্গে মূলনাটকের কোনো সম্পর্ক থাকেনা, কেবল কতকগুলো প্রাত্যহিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে দেখায়, প্রকৃতপক্ষে লেডি ম্যাকবেথ হ'লে, সে কি ক'রে দরজা খুলতো, শুতে যেতো, জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতো। শিক্ষক যদি এতে সন্তুষ্ট হন, তবেই সে আসল নাটকে প্রবেশাধিকার লাভ করে, এবং এই পরিবেষ্টনে স্বরচিত বাক্যব্যবহারে আরো কিছু কাল অভিনয় শেখে। ইতিমধ্যে বিশেষ যত্ন করা হয় যাতে অতিপ্রয়োগে শেক্স্পীয়রের ভাষার সুকুমার লাবণ্য নিষ্প্রভ না-হয়ে পড়ে।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন নাট্যবিশারদদের সঙ্গে ষ্টানিশ্লাভ্স্কির পার্থক্য এইখানে। তাঁদের ধারণা ছিলো যে আগে থেকে কাগজে নক্সা ক'রে, নটমঞ্চকে ভিন্ন ভিন্ন নটগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ষ্টানিশ্লাভ্স্কি স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান;—এই প্রযোজনা নটসমবায়ের একাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের সাহিত্যিক ও শিল্পবিষয়ক উচ্চাদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী যখন কোনো নাটক নির্ব্বাচন করেন, তখন সে-নাটকে অভিনয়ের জন্যে কেবল এমন নট-নটী আহূত হয়, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে যাদের চারিত্রিক ও দেহগত সাদৃশ্য আছে। তার পর প্রযোজকের সভাপতিত্বে এক গোলটেবিল বৈঠক বসে; এবং সভাপতি দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন নাটকখানির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেষ্টন কি এবং কোন মানসিক প্রশ্নের উপরে সেটি প্রতিষ্ঠিত। যাতে ভাষ্যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় যথাসাধ্য অবিকৃত থাকে, সেইজন্যে লেখকবিশেষের সমগ্র রচনা সবিস্তারে অধ্যয়ন ক'রে তবে প্রযোজক এই ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হন। তার পরে সুরু হয় অভিনেতাদের স্ব স্ব ভূমিকাপাঠ। এই সময়ে পাঠ্য পুস্তক থেকে অন্যত্র দৃষ্টি ফেরানো, কোনোরকমের অঙ্গবিক্ষেপ করা, অথবা মুখে কণ্ঠে অনুকরণের আভাসমাত্র আনা একেবারে নিষিদ্ধ। জনবিরল নিঃশব্দ ঘরে এমনিতর গোটাকয়েক বৈঠকের পর হঠাৎ দেখা যায় যে অভিনেতাদের আকারে-ইঙ্গিতে, মুখে-

চোখে একটা অন্তর্দীপ্ত আবেগের প্রতিভাস ফুটে উঠতে সুরু করেছে। এই লক্ষণগুলো সুপ্রকাশ হতে হতে, ক্রমে এমন একদিন আসে যখন নটেরা স্বেচ্ছায় আসন ছেড়ে, আপনাদের ভবিষ্যৎ অনুষঙ্গ আপনারাই নির্দ্দেশ ক'রে দেয়। ইতিমধ্যে, পুষ্পবিলাসী যেরূপে কান পেতে ফুলের কেয়ারিতে প্রথম প্রাণসঞ্চারের সাড়া শোনে, ঠিক তেমনি ক'রেই প্রযোজক উদ্‌গ্রীব হয়ে এদের পরস্পরের ব্যবধান, পরম্পরার অঙ্গরেখা, হাবভাবের সঙ্কল্প, শ্রেণীবিভাগের স্বাভাবিকতা ইত্যাদির মধ্যে নাটকখানির পরিণত পরিকল্পনার উপাদান সংগ্রহ করেন। এই অবস্থা উপনীত হলে নটেদের পরস্পরের থেকে পৃথক ক'রে, পূর্ব্বোক্ত সাধনাভ্যাসে নিযুক্ত করা হয়। এই পৃথক্করণের দুটি উদ্দেশ্য: মহলায় স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রেণীবিন্যাস ও অঙ্গ-বিলাসকে সাধ্যমতো সহজ রাখা এবং স্বসমুখ বস্তুমাত্রার অনুগত থাকা। অভিনেতারা এসে যখন আবার একত্রে মেলে, তখন চিত্রশিল্পী তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রথম থেকেই চিত্রকর প্রযোজকের সংসর্গে থাকে; এইবার সে নিয়মিত ভাবে নটেদের বৈঠকে যোগ দেয়, তাদের বলা-চলার ভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে পোষাক বানায়, এবং নাটক সম্বন্ধে তাদের ধারণাকে অবলম্বন ক'রে, প্রচ্ছদপটে রঙ ফলায়। এই অঙ্গলীলা ও অনুষঙ্গের বিস্ময়কর উদ্ভবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যার ঘটে, তারি মন শ্রদ্ধায় ভ'রে ওঠে; বোধ হয় যেন কোনো অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধুসম্প্রদায়ের সংস্রবে এসেছি, তাঁরা অন্তগ কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার প্রতীক্ষায় নীরব, নিশ্চল, ধ্যাননিরত।

পাঠকের বিরক্তিভাজন হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উপরোক্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে হলো। তার কারণ শুধু এ নয় যে উক্ত পদ্ধতিই নাট্যানুশীলনের একমাত্র প্রবেশিকা; উপরন্তু যে যাই বলুক, অভিনয়-শিল্পই আজ পর্য্যন্ত নাট্যপ্রয়োগের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া য়ুরোপের শিল্পপ্রাণ নাট্যমন্দিরমাত্রের অভিনয়শিক্ষাই এখনো ওই পথেই চলে। পূর্ব্ববর্ণিত অবহিত সাধনায় সিদ্ধি এতই সময়সাপেক্ষ যে প্রারম্ভে মস্কো আর্ট থিয়েটারের কোনো অভিনয়ই অন্তত ন মাসের কমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতোনা। এই ঐকান্তিক চেষ্টা সদ্যস্তন অধীর নাট্যপ্রযোজনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকের দিনে যখন দুর্ভাগ্যক্রমে নগদ লাভই অধিকাংশ রঙ্গালয়ের একমাত্র লক্ষ্য, তখন আর ওধরণের প্রস্তুতির সময় থাকেনা। পাছে বহুঅভ্যাসের ফলে ভূমিকাগুলো নটেদের কাছে বাসি হয়ে দাঁড়ায়, তাই পাঠ মুখস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানিকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু মহলা চলে নেপথ্যে, কাজেই যে-অতিপ্রয়োজনীয় গুণের কথা প্রথমেই বলেছিলুম, অভিনেতাদের মধ্যে তার অভাব থেকে

যায়। অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণ ও ভাবের অভিব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নট ও দর্শকের মধ্যে যে-সহযোগ স্থাপিত হওয়া উচিত, তার চিহ্নও মিলেনা। জনশূন্য ও জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সমানভাবে অভিনয় করা কোনো সাত্ত্বিক নটের পক্ষেই সম্ভব নয়। যে-রহস্যময় সৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক ও অভিনেতাকে সংযুক্ত ক'রে দেয়, তাতে আতিশয্যের অবকাশ নেই। মনস্তত্ত্বের বিচারে কোনো বিশেষ স্বরকম্পন বা অঙ্গবিলাস যতই অকপট হোকনা কেন, নট-দর্শক-সংবাদ-ব্যতিরেকে তা কেবল শিল্পের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে, কখনো শিল্পে পরিণত হয়না। এই কথা মনে রেখে, প্রকাশ্য অভিনয়ে নাটকবিশেষকে ভাসিয়ে দেবার পূর্ব্বে, মস্কো আর্ট থিয়েটার নটেদের বন্ধুবান্ধবদের জন্যে পোষাকপরিচ্ছদ, গীতবাদ্য, দৃশ্য-যবনিকা যোগে তিনটে ক'রে খোলা মহলার আয়োজন করে।

স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নাট্যকারের অভিপ্রায়কে দেহলীলার মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তোলা, আধুনিক নাট্যকলায় এই কটাই মস্কো আর্ট থিয়েটারের চিরস্থায়ী দান। অখণ্ড অভিনয়শিল্পের এই সজীব অবয়বগুলি এতই অপরিহার্য্য যে মাঝে মাঝে যখন মিস্ত্রিরা প্রযোজককে জিজ্ঞাসা করে সে-রাত্রে যবনিকা-বিশেষের পালা আছে কিনা, তখন শ্রোতার মনে কোনো বিস্ময় জাগেনা। নটশিল্পকে মনোবিজ্ঞানের সুদৃঢ় আসনে বসানো ছাড়া, উক্ত থিয়েটারের অন্য কীর্ত্তি হচ্ছে অভিনেতাকে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারার গণ্ডি থেকে মুক্ত করা। সাবেকি নিয়মে অভিনেতাবিশেষ একটা বিশেষ ধরণের ভূমিকায় আজীবন আবদ্ধ থাকতো। সেই নির্ব্বিকার ভূমিকা-অনুসারে নটেদের মুদ্রাঙ্কিত ক'রে রাখাই সেকালের প্রথা ছিলো। তখনকার স্বল্পাঙ্গ নাটকগুলিতে কাউকে বরাবর তরুণ নায়ক হয়ে থাকতে হতো, কেউ হতেন শঠ, কেউ বাচাল, কেউ বিদূষক, কেউ বা সরলা অবলা। যার কর্ম্মজীবন যে-ধারাকে অবলম্বন ক'রে স্ফূর্ত্ত হতো, সে আমরণ অবরুদ্ধ থাকতো সেই আবহে।

আজকালকার কৃতকর্ম্মা নাট্যবিশারদেরা অভিনেতার প্রাধান্য অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরাজকতা অখণ্ড শিল্প-সাধনার পরিপন্থী। গর্ডন্ ক্রেগ্-এর মতো অতিমেধাবী অকারী সূত্রকারদের অনুসরণ ক'রে তারা বলেন যে মারিওনেট্‌জাতীয় কলের পুতুলই নটশিল্পের আদর্শ। মানুষের সহজ নাট্যবোধ এই যন্ত্রচালিত কুশীলবের মধ্যেই প্রথম রূপ পায়; এবং এদের মুখে মননের চিহ্নমাত্র না-থাকায়, এরা বিশুদ্ধ প্রয়োগশিল্পের রসগ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। এদের নিয়ন্ত্রিত অঙ্গবিক্ষেপের পুষ্পিত রেখায় যে-সুসঙ্গত ছবি গ'ড়ে ওঠে, তা বিবেচনা-সাপেক্ষ। এই দলের সমালোচকেরা স্বমতের সমর্থনে যবদ্বীপের ছায়া-

বাজিকে সাক্ষী মানেন। সঙ্কটে পড়লে তাঁরা প্রাচ্যের প্রাচীন নাট্যকলার অনুদেশে নটের মুখ মুখোশে ঢেকে তার স্বয়ম্বশ অঙ্গচালনাকে সংযত করতে চান সমগ্রতার খাতিরে। লিখিত নাটকে পাত্রপাত্রীদের উপরে যে-চরিত্র-বৈচিত্র্য আরোপ করা হয়, তা তাঁদের মনে ধরে না। তাই তাঁরা ভেনিসে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত কোমেদিয়া-দেল-আর্তে নামক যে-বিখ্যাত নাট্য-রীতির প্রচলন ছিলো, তার পুনরুত্থান কামনা করেন। কারণ তার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিরা ছিলো ছাঁচে-ঢালাই-করা; তাতে অভিনেতারা হালিকুইন, কলাম্বাইন, কবিরাজ, দুরাচার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত ভূমিকায় স্বকপোলকল্পিত অচিন্তিতপূর্ব্ব বাক্যের আবৃত্তি করতো। এখানে দ্রষ্টব্য এই, উপরোক্ত মতবাদটির বিবৃতি অতি আধুনিক হ'লেও, ওর উৎপত্তি ঐতিহাসিক অতীতে। এই দলের মতে, অভ্যাসদোষে মানুষ যদি সত্যই অপরিহার্য্য হয়, তবে তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক; এবং তা অসম্ভব হ'লে, সকল ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিমানে আবদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভাববার অবকাশ থাকলে এঁরা হয়তো বুঝতেন যে এ-বিবাদ অভিনেতার সঙ্গে নয়, অভিনেয় নাটকের সঙ্গে। যুক্তির তাগিদ শুনতে হ'লে, নাট্যশালা ছেড়ে তাঁদের রাজপথে বেরুনো উচিত, এবং প্রসিদ্ধতম সোভিয়েৎ প্রযোজক মায়ারহোল্ট্-এর প্রতিধ্বনি করে বলা কর্ত্তব্য যে রাষ্ট্রনৈতিক শোভাযাত্রা অথবা বিদ্রোহবাহিনীর কুচকাওয়াজই নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, কারণ এ-ধরণের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গী একই তালে বাঁধা থাকে, প্রত্যেক নটের মুখ একই সার্ব্বজনীন মুখোশে ঢাকা পড়ে।

আর একদল নাট্যকুশলী আছেন যাঁদের মতামত আর একটু আধুনিক। তাঁদের বিশ্বাস সমগ্র অভিনয়টা আসলে একটা সঙ্কলনবিশেষ। কাজেই তাঁরা নটের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ ক'রে বলেন যে সে সমগ্র সাজসজ্জার অধীনে থাকতে বাধ্য; তার মর্য্যাদা কোনোমতেই দীপাবলী বা পটবিন্যাসের চেয়ে বেশি নয়; প্রযোজকের মনীষা সম্পূর্ণ ছবির যে-সীমারেখা টেনে দিয়েছে, সে-গণ্ডির বাইরে যাওয়া তার পক্ষে নিষিদ্ধ। সোভিয়েতের বর্ত্তমান চিন্তাধারা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে অনুবর্ত্তিত হয়েছে; দেখা যাচ্ছে সমষ্টিবাদীরা মস্কো-আর্ট-থিয়েটার-প্রবর্ত্তিত স্বজনসমবায়ের গণতন্ত্রে আর সন্তুষ্ট নয়, উল্টে তারা প্রযোজকের অনন্যতন্ত্রে অত্যন্ত আস্থাবান। কিন্তু তাহলেও তারা এই ব'লে আত্মরক্ষা করে যে প্রযোজকের একাধিপত্য নাট্যাদর্শের অনুকূল, অর্থাৎ এতে ক'রে নট আপনার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অবশেষে একটা আদর্শে পরিণত হয়। তাদের মতে এই আদর্শই ঐক্যসূচক সমষ্টি। ষ্টানিস্লাভস্কির

পদ্ধতিতে তারা দেখে একটা নাটকীয় চরিত্রের উদ্ভব, একটা অরাজক ব্যষ্টির জন্ম।

সে যাই হোক, এ-প্রসঙ্গে সাধারণ নাট্যামোদীর কিছু বক্তব্য থাকা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক; এবং সে-বক্তব্য হচ্ছে এই যে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চারণশীল ক'রে তোলে, কারণ সে-ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমতো বিস্তারণ-সঙ্কুচনের অনন্ত ক্ষমতা। সাধারণ নাট্যামোদী যে-নায়ক-নায়িকার গুণমুগ্ধ হয়, যে-নটনটীর সাধুবাদ করে, তারা তাদের অন্তরের সমবেদনাকে অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত্ত ক'রে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করতে পারে। এই যে-আবেগপ্রবাহ নটের হৃদয়ে উত্থিত হয়ে দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে, এইটাই একমাত্র নিকষ যার সাহায্যে অভিনেতাদের মূল্যনির্দ্ধারণ সম্ভব। এই আবেগের অভিব্যক্তি-প্রণালী কি ?

স্বভাবের বশে এবং সময়ে সময়ে নাটকের গুণে নটমাত্রেরই শিল্প-সৃজনী শক্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু তাহলেও সকল সুসম্পাদিত অভিব্যক্তির মূলেই একটা অভিব্যাপ্ত ঐক্য থাকে,—এটা হচ্ছে শিল্পীচিত্তের রাগাতিশয্য। সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যার মতো অভিনয়কলাকেও দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—একটি বিচারপন্থী, অপরটি উপজ্ঞাপ্রধান। নাট্যশালায় আধুনিক অনুসন্ধিৎসার যুগ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে প্রথমটির খুব আদর ছিলো; এবং দিনকতক বিরাগভাজন হবার পরে আবার তাকে স্বাধিকারে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। নাট্যবিবেচকেরাও তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ ক'রে এসেছেন,—কাউকে হয়তো একদল মুগ্ধ করেছে, অপরে আকৃষ্ট হয়েছেন অন্যদলের প্রতি। সে যাই হোক্, অতিভক্তির অবশ্যম্ভাবী পক্ষপাত বাদ দিলে, একথা মানতেই হবে যে প্রকৃত গুণে কোনো পক্ষই বঞ্চিত নয়, প্রত্যেকের উপকারিতার অনেকখানিই নির্ভর করে নাট্যবস্তুর উপরে। উভয় পক্ষ থেকে একজন ক'রে প্রসিদ্ধ প্রতিনিধির দৃষ্টান্ত ধ'রে, প্রভেদটাকে সুস্পষ্ট করা যাক। এই প্রতিভূ-দুটিকে যারা কখনো অভিনয় করতে দেখেছে, তাদের কাছে এঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সারা বের্ণাড্, যিনি জীবদ্দশায় জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ব'লে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিচারপন্থী দলের অন্তর্গত। বাগ্মিতার ক্ষমতায় তিনি তো অসামান্য ছিলেনই, উপরন্তু সে-সাধনালব্ধ কণ্ঠস্বরের সুরসঙ্গতিতে দর্শকমাত্রেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতো; মনে হতো সে-গতিবিধির লাবণ্য, সে-অঙ্গলীলার ঔদার্য্য যেন একটা অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিস্বরূপের উদ্ভাসে উদ্দীপ্ত। বহু বর্ষের অভ্যাসে তিনি আত্মসমাহিত হতে পেরেছিলেন, এবং এতে

ক'রে তাঁর মধ্যে যে-ধ্রুপদী নিরাসক্তি দেখা দিয়েছিলো, তা কেবল সেই আয়ত্ত করতে পারে যে নিজের দেহের প্রত্যেক বিভ্রমবিলাসকে একতালে, একলয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে শিখেছে। সারার অভিনয়রীতির প্রধান সম্পদ ছিলো নাট্যোপযোগী পরিমার্জ্জিত উচ্চারণপদ্ধতি আর ইচ্ছাধীন অঙ্গভঙ্গীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য। অভিনেয় যুগ বা রসের দিক দিয়ে তাঁর সম্পাদন অত্যন্ত অবাস্তব ছিলো বটে, কিন্তু লেখকের বেদনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগ দেখা যেতো; এবং সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন অদ্ভুত সৌষ্ঠবের পরিচয় থাকতো যে সে-কুহক অবসান না-হওয়া পর্য্যন্ত সমালোচক মুখ খোলার সাহস পেতোনা। কিন্তু শুধু আদর্শনিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি যাদের মনঃপূত হয়না, যারা তাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখতে চায়, যবনিকাপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে হতো যে সারা-সম্বন্ধে নিন্দকদের মন্তব্যই বুঝি সত্য, বাস্তবিক পক্ষেই তিনি হয়তো সেকালের নিকৃষ্ট অভিনেত্রীদের মধ্যে মহত্তম।

অন্য দলের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ইতালীয় অভিনেত্রী এলিয়নোরা দুজের সঙ্গে সারার তুলনা করা অন্যায়। রাশেলের খ্যাতিকে কিম্বদন্তী যে-অলৌকিক অমরত্বে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে, স্বরাজ্যে দুজেও সেই অবিনশ্বরতায় অধিকারী। নাট্যকলার ইতিহাসে এমন অন্য কোন নটীর নাম নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না, যে, দুজের মতো, ভূমিকার মধ্যে আত্মনিমজ্জন ক'রেও নিজের রূপকারী ব্যক্তিস্বরূপকে জাগিয়ে রাখতে পেরেছে, যে সমাধিস্থ হয়েও, অনুপম কৌশলে নাট্যের প্রাণবস্তুকে সেই কল্পনাতীত লোকে উন্নীত করেছে। দেহের প্রত্যেক তন্তুকে এই রকম হৃদয়সংবেদ্য ক'রে তোলা, রূপায়ণের এতখানি পরিপূর্ণতা আর কখনো দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। তাঁর সুকুমার কণ্ঠস্বর, সেই অনুপম আস্বচ্ছ অথচ দীপ্তিঘন চোখ, সেই ভাস্কর্য্যনিন্দিত ললাটের উপরে ঘনকুন্তলের কিরীট ও রজতাভ সীমন্ত, সেই বিশ্ববিখ্যাত করযুগ যার উদ্দেশ্যে দানুন্‌ৎসিও তার শ্রেষ্ঠ নাটক—জোকন্দা—উৎসর্গ করেছিলো, এই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে, মনে হতো, যেন গয়টে-বাঞ্ছিত চিরন্তনীর অমর নিঃসার অতিমাত্রায় নিষ্যন্দিত হয়ে পড়ছে।

সাধনার স্তরে উভয়েরই তুল্যমূল্য হ'লেও, সারা বের্ণাডের মধ্যে যেটা ছিলো চাকচক্য, দুজের মধ্যে সেটা হয়ে উঠতো ভাস্বর অন্তর্দীপ্তি; প্রথমার মধ্যে যেটা অদ্ভুত ব'লে ঠেকতো, দ্বিতীয়ার মধ্যে সেটা জাগাতো অবাক বিস্ময়। দুজের আবেগের ছন্দোবদ্ধ ধারা যে-আত্মায় লীলায়িত হয়ে উঠতো, তার প্রধান সম্বল ছিলো বেদনা ও অনুকম্পন। ফলে সারা যেখানে অতিরঞ্জনের বাহুল্যে দর্শককে চমৎকৃত ক'রে দিতেন,

সেখানে কেবল অনির্ব্বচনীয় বিভাবের গুণে তুজে করতেন তার প্রাণস্পর্শ। রাসিনের অভিজাত ট্রাজিডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'ফ্রেদ্র্'-এর ভূমিকায় এঁদের তুজনের প্রভেদ অতি সহজেই ধরা দিতো। সপত্নিপুত্র ইপোলিতের প্রতি আসক্ত হয়ে রাণী ক্রোধে অপমানে জর্জ্জরিত; মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে তাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে স্বীয় উচ্চণ্ড প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির তর্পণে উদ্যত হয়েছে; ট্রাজিডির অবসান তার প্রাণপাতে। সারা বের্ণাডের পরিকল্পনায় ফেদ্র্ একটি বিশালাঙ্গী চলচঞ্চলা রমণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো; তার মধ্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেম হিংসার নৃশংস শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। প্রবঞ্চিত স্বামীকে ক্রোধান্ধ ক'রে তোলার জন্যে তার সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রে কোনো ফাঁক নেই। সারার আবেগমুখর বাক্চাতুর্য্যে ফেদ্র্ যেন জ্বালাময়ী রুদ্রাণীতে পরিণত হতো, মনে হতো কেবল রাজ্যশাসনের সামর্থ্য নয়, নিজের অদৃষ্টকে উদ্দাম হৃদয়ের মর্জ্জিমতো চালানোর শক্তিও সে রাখে। সারার অভিনয় যে-উৎকর্ষে গিয়ে পৌঁছতো, তা সফোক্লিসের যোগ্য, তেমনি আরণ্যিক, তেমনি মহিমাময়, তেমনি নির্ম্মম। সে-ফেদ্র্ সংরক্ত সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, রাণীর মতো রাণী।

এই দৃশ্যে তুজেকে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হতো যেন জগতের গভীরতম দুঃখের সংস্পর্শে এসেছি, এ-দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের দুঃখ, আত্মগ্লানির দুঃখ। তাঁর সন্নিধি থেকে কিসের একটা সুরভিশ্বাস নির্গত হতো, সে যেন ভবিতব্যপ্রপীড়িত নিরাশ নিঃসহায় নারিত্বের পরিমল। ইপো-লিৎকে নির্ব্বাসনে পাঠানোর চক্রান্ত প্রেমার্ত্তের দুর্ব্বলতায় অভিষিক্ত হয়ে উঠতো। মনে হতো সে-সর্ব্বনাশা প্রলয়ের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দ্দয়তার ভান করা। ফেদ্র্-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রেমের অভিশাপে ভারানত হয়ে পড়তো, তার আত্মার সাধ্য থাকতো না যে সে-প্রেমের পথরোধ করে। তার দুঃস্থ মস্তিষ্কে শুধু এই সঙ্কল্পের বিবর্ত্তন চলতো যে যার জন্যে সে এত দুঃখ পেয়েছে, সেই প্রেমকে উচ্ছেদ করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অনাথ ম্রিয়মাণ নারীর মধ্যে রাণীকে হারানোর কোনো উপায় থাকতোনা; সঙ্গে সঙ্গে এটাও কোনোমতে ভোলা যেতোনা যে এই সর্ব্বনাশ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনাশ, যে স্বয়ং রাসিনের অনুপম নাটকেও এই উপনিপাতের তুলনা নেই। এতখানি শোভনতা, বিভ্রমবিলাসের এ-রকম সুমিত প্রয়োগ আর কখনো দেখা যায়নি, কোনোস্থানে নামমাত্র আতিশয্য ঘটলে নাটকখানি একটা সামান্য পারিবারিক কলহে পরিণত হতে পারতো। অভ্রান্ত সাধনার প্রসাদে যার দেহ ও মন এই অঘটন-সংঘটনে অধিকারী হয়েছে, শুধু সে-ই দ্বিধাবিভক্ত অনন্তের মধ্যে উক্ত তুলাসাম্য রাখতে

পারে। এই দস্তরবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব'লেই তুজে আপনার আশুক্লান্ত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও আমাদের চৈতন্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অমন নিবিড় মিতালি স্থাপন করতে পেরেছিলেন; এবং সেইজন্যেই আমাদের পূর্ব্বসংস্কারগুলোকে ওলটপালট ক'রে দিয়ে তিনি নাট্যকলার অলৌকিক সম্ভাব্যতার অমন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বরসাধনায় সিদ্ধি, ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, এইগুলোই হচ্ছে নাট্যামোদের মুখ্য সহায়। আমরা যারা পাদদীপের প্রভামণ্ডলের বাইরে থাকতে বাধ্য, তাদের কাছে নটের সংবেদন ও অভিপ্রায় এসে পৌঁছয় উক্ত রীতির মারফতে। সারা বের্ণাড, মুনে সুলি, ফর্বস্-রবার্টসন, হেনরি অর্ভিঙ, আলবর্ট বাসারমান, ভাসিলি কাচালফ, রুজিয়েরো, রুজিয়েরি ইত্যাদির মতো বিচারপন্থী অভিনেতারা এই কলাকৌশলে তুজের সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেছেন; কারণ তুজের দল আত্মার প্রদোষান্ধকারে যে-আবেগের উদয় হয়, তাকেই অধিক মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু পদ্ধতি-ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনা যেহেতু অসম্ভব, তাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাছাই করা দরকার হ'লে, বুদ্ধিমান প্রযোজকমাত্রেই প্রথম শ্রেণীকে বরণ করবে। নাট্যসৃষ্টির পরম মুহূর্ত্ত হচ্ছে তখন, যখন ভিন্ন ভিন্ন আবেগ একটি জ্যোতির্ম্ময় নাট্যপুরুষের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এটা না-হ'লে নট খুব বেশি দূর এগুতে পারে না, সে কেবল বুদ্ধিমান মনোবিদ হয়েই থেকে যায়। চাতুরী ও কৃত্রিমতাকে নাট্যশালা থেকে একেবারে বিতাড়িত করা অসাধ্য। কেবল কণ্ঠস্বর ও অঙ্গলীলার সাহায্যেই যদি মনোবস্তুকে রূপ দিতে হয়, তবে হাবভাবে একটা অবাস্তবতা অনিবার্য্য। এইজন্যেই ষ্টানিশ্লাভ্স্কির অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে আধুনিকদের অভিযোগ একান্ত অসঙ্গত নয়। তাঁর পদ্ধতির ব্যাপকতা সার্ব্বত্রিক হ'লেও তিনি সেই সঙ্গে একটা ভ্রান্তি পোষণ ক'রে এসেছেন যে চেষ্টায় মানুষমাত্রেই নটে পরিণত হতে পারে। ফলে তিনি মাঝে মাঝে এমন দু-একজন নট-নটী গ'ড়ে তুলেছেন যারা আবেগে নিতান্ত অখল হ'লেও, উপরোক্ত ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিস্বরূপে একেবারেই বঞ্চিত। যে-অলৌকিক মুহূর্ত্তে সকল অণুপরমাণু একটা পরম অখণ্ডতায় সংগ্রথিত হয়ে ওঠে, সে-অমৃতযোগ তাদের অভিনয়ে কখনো আসে না। এ-ক্ষেত্রে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি যদি তুজের প্রজ্ঞাঘন উপদেশ শুনতেন, তবে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অন্যরকমের হতো। তুজে একবার তাঁকে সহজ অথচ সপ্রতিভ ভাষায় বলেছিলেন,— নটশিল্পের মূলমন্ত্র হচ্ছে একই সময়ে সমস্ত মনে রেখে সমস্ত ভুলে যাওয়া—tutto ricordare e tutto dimenticare। শুধু নাট্যকলা নয়, সমস্ত কলাশাস্ত্র-সম্বন্ধে এর চেয়ে সারগর্ভ কথা কখনো উচ্চারিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

একটা ধারণার সঙ্গে ক্রমেই আমরা সুপরিচিত হচ্ছি,—এটা হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠানে প্রযোজকের প্রাধান্য। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে এর নাম সুদ্ধ অজ্ঞাত ছিলো। কিন্তু প্রযোজক-শব্দটা তেমন সুষ্ঠু নয়, ওতে ক'রে মন নাট্যশালার আর্থিক দিকেই চালিত হয়। শিল্পনায়ক শব্দটা হয়তো শ্রেয়স্কর হবে। নটনটী, সাজসজ্জা, পটপ্রচ্ছদ, আলোবাতি ইত্যাদির জন্যে সেই দায়ী, নাট্যকারের অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করার ভার তারি উপরে, নাট্যানুষ্ঠানের ললিত দিকটা সম্পূর্ণ তারি তত্ত্বাবধানে। অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে পরিচালকের যে-সম্পর্ক নাটকে আর তাতেও সেই রকমের সম্বন্ধ। পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ, নাটকের কালমাত্রা নির্দ্ধারণ, অভিনয়ের আরোহণ-অবরোহণ ইত্যাদি যে-ব্যাপারগুলো রসোৎপাদনের জন্যে অভিনয় ও সাজসজ্জার মতোই অত্যাবশ্যক, সে-সকল ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। নাট্যকলার আধুনিক সংজ্ঞায় এই ব্যক্তিটি অপরিহার্য্য ; তার অবর্ত্তমানে নাটকখানা অচিরে একটা নিষ্প্রাণ ঘটনাপুঞ্জে পরিণত হয় ; এই খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলোকে সার্থক সমষ্টিতে সংহত ক'রে, নাটককে সেই সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। রুষ বা জার্ম্মান নাট্যমন্দিরে তাকে বাদ দিয়ে কিছুই হয়না। গোটাকয়েক ব্যতিরেক বাদে নাট্যকলা-সম্বন্ধে এই নূতন ধারণা ইংলণ্ডে এখনো বদ্ধমূল হয়নি। ইংরেজ আজো মনে করতে পারেনা যে রঙ্গালয় শুধু প্রমোদের স্থান নয়, একটা পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসাও সেখানে মিটে থাকে। সেইজন্যে ওদেশে প্রযোজকের কাজ সাধারণ শিক্ষকের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। ইংলণ্ড ও ইতালি নটচূড়ামণিদের দেশ, কিন্তু সেখানে কখনো মহৎ অভিনয়শিল্প গ'ড়ে ওঠেনি। ও-দুই দেশে নাট্যকারের অভিপ্রায়টা মোটামুটি ব্যক্ত হ'লেই, অভিনয় উপভোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে এটা উপলব্ধি করা যায় যে প্রযোজক চিত্রকরের মতো, রঙ্গমঞ্চের বর্ণপাত্রে সৈ মানুষ আলো, সাজসজ্জা ইত্যাদিকে রঙের মতো ব্যবহার ক'রে একটা সুসঙ্গত ছবি আঁকতে চায়, অমনি সে অতিপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী দেশের তথাকথিত চরমপন্থী নাট্যমন্দিরগুলোতে প্রযোজকই অভিনয়ের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। তবে সেখানে তাকে এখনো 'মেতর্-আঁ-সেন্' বা দৃশ্যশিল্পী বলা হয়। এই নামটি সেই আমলের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যখন কারুকে ডেকে অভিনয়ের সময়ে নটমঞ্চের কোন অংশ কোন নটের অধিকারে থাকবে, তার একটা নক্সা করিয়ে নেওয়া হতো।

আজকের দিনে নটমঞ্চের পরিকল্পনা ও গঠন এবং বিশেষ ক'রে আলোকসম্পাত, এই তিনকে যে-মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তার দিকে নজর

না-দিলে নাট্যকলার কোনো বিবরণই সম্পূর্ণ হবেনা। সেকালে মামুলি পটে-আঁকা রঙবেরঙের ঘরবাড়ি আর আজাব ক্ষেতপাহাড়ের ছবি নটের পিছনে পতপত ক'রে উড়তো। তখন আকাশের নীল এতই নীল ছিলো যে সেদিকে চাইলে গায়ে জ্বর আসতো। এই সমস্ত ডাকের গহনা রোমান্টিকদের দায়ভাগ-হিসেবে পাওয়া। অপেরার অভিনয়ে আজো আমরা এই যবনিকাগুলোকে দেখি। এগুলোর হাস্যকর অসারতা অপেরাগায়কদের নাটকী ঢঙের উপযুক্ত পটভূমি বটে; বুকে হাত রেখে, রঙ্গমঞ্চে আড়ষ্ট হয়ে উল্লম্ফন করা এই আবেষ্টনেই শোভা পায়। বাস্তবিকতার আবির্ভাবে এ-সমস্তই বদলে গেলো। এখন থেকে নটমঞ্চের অলঙ্করণ এমন হতে লাগলো যাতে ঐতিহাসিক সাত্ত্বিকতা সূচিত হয়। রঙ্গালয়ের কুহক যথার্থ অভিজ্ঞতার মুকুর, এ-বিশ্বাস বজায় রইলো। কিন্তু বাস্তবিকতাও মাঝে মাঝে উপহাস্য হয়ে ওঠে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আন্দ্রেয়েফ্-এর "লাইফ অফ ম্যান"-নামক নাটকের উপক্রমণিকা একটি নবজাত শিশুর ক্রন্দনে। মস্কো আর্ট থিয়েটারে যখন এখানির মহলা চলছিলো, তখন সরকারী অনাথাশ্রম থেকে তেরোটি নবজাত শিশুর আমদানি ক'রে, তাদের কাঁদানো হলো। উদ্দেশ্য ছিলো গ্রামোফোন-রেকর্ডে তাদের ক্রন্দনধ্বনি মুদ্রিত ক'রে, যবনিকা-উত্থানের সময়ে সেই রেকর্ড বাজানো। প্রযোজকদ্বয় কিন্তু শিশুদের কান্নায় প্রথমটা সন্তুষ্ট হতে পারলেননা; অবশেষে একটি ছেলে অত্যন্ত আদর্শ-রকমের জোর গলায় ককিয়ে উঠতে তবে তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে পরস্পরের দিকে সহাস্য নয়নে চাইতে পারলেন।

সেই প্রাচীন প্রকৃতিবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ আজকে আর প্রচলিত নেই; ধরণ এখন বদলে গেছে। আজকালকার ঝোঁক হচ্ছে অলঙ্করণকে ভাবব্যঞ্জক ক'রে তোলা; তাতে ব্যয়সঙ্কোচও সম্ভব। ফলে এখন একটা খিলেন বা ওই রকমের কোনো ভগ্নাংশমাত্র সারা অট্টালিকার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আলেখ্যচিত্রণের মতো মঞ্চনির্ম্মাণ ও বেশপরিকল্পনা চলে ফিউচুরিষ্ট, কিউবিষ্ট অথবা সুপ্রিমেটিস্ট নিয়মানুসারে। রুষদেশে এখন মাত্র গাছাকয়েক দড়ি আর খানকয়েক তক্তা দিয়েই অভিনয়ের কাঠামো তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সজ্জাসামগ্রীর অনটনেই যদিও উক্ত প্রথার সূত্রপাত, তবু জনগণের উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হওয়াতে ওই বাহুল্যবর্জ্জিত মঞ্চসজ্জাই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়েছে, এবং একেই মায়ার-হোল্ট্ ও তাঁর জার্ম্মান শিষ্য পিস্কাটর কন্‌স্ট্রাক্টিভিস্‌ম্ নাম দিয়ে, তাঁদের নাট্যানুষ্ঠানের আদর্শ ক'রে তুলেছেন। ওতে ক'রে শুধু নির্ব্বোধ নাট্যা-মোদীদের আধুনিকতার আকাঙ্ক্ষা মিটে ব'লেই, উক্ত রীতি সফল হয়নি।

রসতত্ত্বে খালি জায়গা ও উপাদানের অনাবৃত সৌন্দর্য্যের একটা যথার্থ প্রয়োজন আছে ; আগে এই নগ্নতাকে রঙে ঢেকে রাখা হতো ; সে-ত্রুটি এতদিনে ঘুচলো। সেকালের চিত্রিত প্রচ্ছদের স্থানে নির্ম্মিত দৃশ্য কিম্বা গর্ডন্ ক্রেগ্-প্রবর্ত্তিত রঙীন পর্দ্দা আমল পেলো। মস্কো আর্ট থিয়েটারের যুগেই গর্ডন্ ক্রেগ্ মস্কোয় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর নির্দ্দেশে হ্যামলেটের যে-অভিনয় হয়, তার একটি দৃশ্যেই ক্রেগের নাট্যপ্রতিভার অদ্ভুত প্রমাণ মিলে। পর্দ্দায়-তৈরি সোনালি দেওয়ালের উপর হ্যামলেটের ছায়া আলোকসম্পাতের কৌশলে প্রতিফলিত হয়েছে, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি "To be or not to be" ব'লে স্বগতোক্তি করছেন—এই ছবির হৃদয়গ্রাহিতা অবিস্মরণীয়।

এ ছাড়া নটমঞ্চের অবগুণ্ঠনমোচনের আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে দিনে দিনে আলোক রঙকে স্থানচ্যুত করছে। নটমঞ্চের ভিতরের জন্যে আলোকচ্ছুরণের উদ্ভাবনা, রীতিপ্রধান অভিনয়ের জন্যে সঞ্চারণশীল রশ্মিসম্পাতের আবিষ্কার, এবং ইচ্ছামতো উভয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যবস্থা, এই তিনের কল্যাণে নাট্যমন্দিরে যে-দ্যোতনাব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, তা ইতিপূর্ব্বে অভাবনীয় ছিলো। আজকাল নট ও নাটকের প্রত্যেক ভাবান্তরের সঙ্গে চলে আলোর সঙ্গৎ। আলোর সাহায্যে প্লাষ্টার-রচিত আকাশে যে-চমৎকার রঙ ফুটে উঠে, আস্বচ্ছ পর্দ্দায় যে-বায়ুমণ্ডলের ইঙ্গিত জাগে, ছায়ার সমর্থনে মূর্ত্তিমাত্রেই যে-স্পষ্টতা পায়, এ-সমস্তই নাট্যকলায় যুগান্তর নিয়ে এসেছে। এখন প্রযোজকের দৃষ্টি মুখ্যত অলঙ্করণের উপরেই ন্যস্ত, এবং এই অলঙ্করণের ভবিষ্যৎ আলোকশিল্পের ভাবী সম্প্রসারণের সঙ্গে গ্রথিত।

নাট্যমন্দিরের নক্সায় সুদ্ধ অদলবদল চলছে। রাইনহার্টের মতো কয়েকজন প্রযোজকের আদর্শ হচ্ছে অভিনেতা ও প্রেক্ষণিকের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে এমন সমস্ত নূতন নাট্যশালার নির্ম্মাণ হচ্ছে, যাতে নটেরা প্রেক্ষাগৃহে নেমে দর্শকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। এই রকমের রঙ্গালয়গুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে বের্লিনের নয়স্ শাউস্পিল্হাউস্। এই সার্কাসতুল্য প্রকাণ্ড ইমারতে নটমঞ্চটা অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং প্রেক্ষাগৃহের মাঝখানে অবস্থিত। রাইনহার্ট—ষ্টানিশ্লাভ্স্কির পরে এত বড় প্রযোজক আর হয়নি—রাইনহার্ট "অর্ফিউস্ ইন্ দি আণ্ডারওয়ার্লড্"-এর মতো অপেরার এবং "ডেথ্ অফ্ দাঁতন"-এর মতো চক্ষুচমৎকারী নাটকের অভিনয়ে উক্ত নাট্যমন্দিরটির সদ্ব্যবহার করেছেন ; কারণ শুধু এই ধরণের মঞ্চেই বিপুল জনসংখ্যাকে স্থান দেওয়া ও পরিচালিত করা সম্ভব। আজকালকার সকল নাট্যশালাতেই মঞ্চ একটা ঘুরন্ত টেবিলের আকার

ধরছে। এতে ক'রে দৃশ্যগুলো আগে থেকে গুছিয়ে রাখা যায় এবং দৃশ্যপরিবর্ত্তনে কোনো বিলম্ব ঘটেনা। তাছাড়া ড্রেস্‌ডেনে আর একটা নূতন ধারার সূত্রপাত হয়েছে, যাতে কয়েকটা তয়খানায় দৃশ্যগুলো বড় বড় মঞ্চে সাজানো থাকে, এবং প্রয়োজনমতো সেগুলোকে যন্ত্রসাহায্যে উপরে তোলা হয়। এর চেয়েও অল্পব্যয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে গোটাকয়েক চাকাওয়ালা তক্তার উপরে দৃশ্য ও আসবাবগুলো চড়িয়ে রাখা, এবং যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে সেগুলোকে মঞ্চের সামনে আনা।

আধুনিক রঙ্গালয়ের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে এটা সুরু থেকেই লক্ষ্য ক'রে এসেছি যে নাট্যকলার মধ্যে এমন একটা কোন বস্তু আছে, যা তার স্থিতিস্থাপকতার প্রতিবন্ধক। এতেই সে পরিবর্ত্তনশীল শিল্পধারার অনুসরণে অক্ষম। এই বাধা হচ্ছে সাহিত্য, এবং অবাধ্যতার অপরাধে সাহিত্য আজ সম্প্রতিবিদেদের চক্ষুশূল। তাদের প্রবর্ত্তনায় কলাপদ্ধতিতে যে-সকল রূপান্তর ঘটছে, সেগুলো অবিলম্বে নাট্যশালায় প্রযুক্ত হোক—এইটাই তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু চিত্রবিদ্যার মতো বিশুদ্ধ শিল্প হয়েও, মঞ্চ-স্থাপত্যই যখন কেবল কিউবিষ্ট কিম্বা ফিউটুরিস্ট মতে কোনো সর্ব্বকর্ম্মা মঞ্চের উদ্ভাবনে অক্ষম, তখন উক্ত ইচ্ছা বিড়ম্বনামাত্র। যদিও আজকালকার রীতিপ্রধান শিল্পাদর্শের সমর্থনে এমন অলঙ্করণ সম্ভব যা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে বা ধ্রুপদী অভিনয়ের পক্ষে শোভন, তবু ইবসেন, বর্ণাড্ শ, গলসওয়ার্দি, জুড়ারমান এবং গত যুগের ফরাসী নাট্যকারদের বাস্তবগন্ধী রচনার প্রযোজনায় সে-আদর্শ অব্যবহার্য্য; অন্তত তার ভগ্নাংশমাত্র কাজে লাগতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যকলার আত্মীয়তা সত্যই ঔৎসুক্যময়। সাহিত্যের গুণাগুণ যেমন প্রযোজনশিল্পের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অভিনয়শিল্পের সংস্পর্শ এসে পৌঁছয় সাহিত্যে। এই জন্যেই, গোড়াকার চক্ষুচমৎকারী নাটকগুলো বাদে, মস্কো আর্ট থিয়েটারের দৃশ্য-পরিকল্পনা, উচ্চারণপ্রণালী, আবেগ-ব্যঞ্জনার কড়িকোমল ইত্যাদি সমগ্র অভিনয়পদ্ধতি চেকোফের রচনার গুণে বদলে গিয়েছিলো; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই আছে। এমন-কি মনে হয় যেন এই মৃদুস্বভাব রেখাশিল্পীদের প্রায় সকলেই অন্তরের আবেগকে বীরোচিত ব্যক্তিস্বরূপে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে অপারগ হয়ে পড়েছে। এই কারণেই বিকলনপন্থী পিরান্দেলোর অদ্ভুত নাটকগুলোর জন্যে রোমসহরে একটা নূতন নাট্যশালার প্রয়োজন ঘটে; এঁর নাটকের জন্যে যে-অভিনব কলাকৌশলের দরকার, তা অন্যত্র দুর্লভ। বর্ণাড্ শ-র 'ব্যাক টু মেথুসেলা'-নামক নাটকখানিকে মামুলি বাস্তবগন্ধী দৃশ্যপরিচ্ছদে অভিব্যক্ত করা

সম্ভব হয়নি ব'লেই, আজকাল ইংলণ্ডেও কলাকৌশল-সম্বন্ধে কৌতূহল দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে রুষ ও জার্ম্মানদের কল্যাণে মার্কিনি নাট্যশিল্পে অপূর্ব্ব উন্নতি সুরু হওয়াতে, ইউজিন ওনিল "এম্পারার জোন্‌স্" লিখতে সাহসী হন। এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখকদের নাট্যরচনা উত্তর-সামরিক জার্ম্মান নাট্যশালার অসিদ্ধ অন্বেষণপ্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি মাত্র।

নানা ধরণের নাটকে নানা রকমের নাট্যশিল্পের প্রয়োজন হয়. কাজেই সম্প্রতিবিদ নাট্যশালাগুলোকে বাঁচতে হলে উপযোগী নাটকের আবশ্যক। এক মতসর্ব্বস্ব লেখক ছাড়া নাট্যকারমাত্রেই নানাশ্রেণীর নাটক লিখে থাকেন, তার মধ্যে কোনোটা হয়তো আষাঢ়ে, কোনোটা রীতিপ্রধান, কোনোটার প্রসঙ্গ মনস্তাত্বিক, কোনোটার বা ঐতিহাসিক, আবার এক-একটা হয়তো বাস্তবপন্থী। ফলে আজকালকার অতি আধুনিক রঙ্গালয়ে সাহিত্যের আমদানী অত্যন্ত অল্প। কিন্তু উপযুক্ত উপাদান পেলে মায়ারহোল্টের বিপ্লবপ্রচারিণী নাট্যশালা সুদ্ধ কী রকম অপরূপ শিল্পসৃজনে সমর্থ হয়, তার প্রমাণ মিলে "হার্ল ও চায়না"-নামক চৈনিক শ্রমিকসংঘর্ষের নাটকখানির অভিনয়ে। তবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়ৎ কারখানাও বেশি নাটক তৈরি করতে পারছেনা। সুতরাং স্বয়ং মায়ারহোল্টও এখন ধ্রুপদী রুষ নাটকগুলোর বৈহাসিক অনুকরণে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর ফলে নাট্যসম্বন্ধে কতকগুলো চমৎকার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে থাকলেও, তাঁর অবস্থা এখন মামুলি প্রযোজকদের মতোই বৈচিত্র্যবিহীন। অতএব দেখা যাবে প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় যে সঙ্কটের উল্লেখ করেছিলুম, তার সমাধান এখনো সুদূরপরাহত। শুধু সেইদিন সে-দুর্দ্দশার অবসান হবে যবে উপযোগী সাহিত্যের বন্যা রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করবে। এযুগের কারুকৌশলের আবিষ্কারগুলি নাট্যকলার ভবিষ্যৎকে কী পরিমাণে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলেছে, তা বোঝা যাবে শুধু সেই শুভদিনে।*

শাহেদ সুরহ্বর্দ্দি

* অপ্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ

একটা সাফাই গেয়ে রাখি। এ শেয়ালটা মেরেছিলাম মা'র হুকুমে, অন্দর বাড়ীতে বড় উপদ্রব ক'রত। লাটীনে এক কথা আছে নরকে নেমে যাওয়ার পথ বড় সুগম। এই শেয়াল থেকে আমার অধঃপতন সুরু। পরে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন নিরীহ পাখী মেরেছি সে ত আর কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে নয়। একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কেন এ দুষ্কর্ম্মে লোকে প্রবৃত্ত হয়। বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহে, বন্দুক মারার আনন্দে, রক্তপাতের নেশায়, আর কতকটা খাদ্য-লোভে। আমি কিন্তু পাখীর মাংস যা খেয়েছি তার চেয়ে গালাগাল খেয়েছি ঢের বেশী। আর সে গালাগাল খুব জোরে দিয়েছেন তাঁরাই যাঁরা সে মাংস আমার চেয়েও তৃপ্তিপূর্ব্বক খেয়েছেন। আমি কিন্তু গাল খেয়েও স্বধর্ম্ম ছাড়িনি। শুধু তাই নয়। যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি ছেলেপিলেদের বন্দুক ধ'রতে শিখিয়ে আমার গুরু-ঋণ পরিশোধ করেছি। শাস্ত্র শিখলেই শেখাতে হয় এই সনাতন বিধি, তা সে যজুর্ব্বেদই হোক বা ধনুর্ব্বেদই হোক। শত্রুপক্ষ হয়ত ধনুর্ব্বেদকে চৌর্য্যশাস্ত্রের দলে ফেলবেন। তা ফেললেই বা. চুরি যদি ক'রতেই হয় ত আনাড়ীর মত করা কিছু নয়। মানুষের শত্রু বাঘ ভাল্লুক মারতে দোষ নেই, সেপাই হ'তেও দোষ নেই, এ কথা এক যোগী ঋষি ছাড়া সবাই কবুল করেন। কিন্তু এই দুই কাজেই সিদ্ধির জন্য রীতিমত সাধনার দরকার। কেবল চাঁদমারিতে নিশানা ক'রতে শিখে বাঘ শত্রু কি মানুষ শত্রুর সামনে গেলে অপঘাতেরই বেশী সম্ভাবনা। অপঘাত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, ত দুপয়সার সেঁকো খেলে সস্তাও হয় কষ্টও কম। কিন্তু শত্রুনাশ ক'রতে হ'লে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকা চাই আর শরীরটাও রীতিমত রোদজল-সহা হওয়া চাই। বনে পাহাড়ে নদীর চরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করাই এর সোজা উপায়। এই আমার গীতোক্ত অভ্যাসযোগ। এই ঈশোপনিষদের অবিদ্যার উপাসনা, যা নইলে অমৃতাশনের কোনও আশা নেই। ছেলে বখানোর কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য দিলুম। একটা কথা বলি, আমার দুচারজন কাক-শালিক-মারা শিষ্য এখন রীতিমত শের আফগান হয়েছেন।

শিকার ক'রলে শুধু শরীর শক্ত হয় তা নয় নানারকমের শিক্ষাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্ত দেখলে গা ছমছম করা বন্ধ হ'য়ে যায়। দেশের গরীব চাষী, কাঠুরে প্রভৃতির সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশা হয়। এই সমস্ত লোক, যারা আমলামাত্রকেই ভয় করে, ভদ্রলোককে দূরে ঠেলে রাখে, তারা শিকারীদের সঙ্গে এত অসঙ্কোচে মেশে যে আশ্চর্য্য। আনাড়ীর মত নিশানা চুকলে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেনা। এই সম্বন্ধে দুই-একটি মজার গল্প বলি। একবার গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাবাবু

দুই হাকীম সাহেবকে নিয়ে স্নাইপ (কাদাখোঁচা) মারতে গেছলেন। স্নাইপ খুব জোরে ওড়ে, মারা ভয়ানক কঠিন কাজ। সাহেব দুটি নিতান্ত green অর্থাৎ কাঁচা শিকারী ছিলেন। তবু সাহেব ত, খুব কেতা ক'রে দড়াম দড়াম ক'রে টোটা ওড়াতে লাগলেন। চিন্তা নেই, টাকা গৌরী সেনের। প্রায় পনের মিনিট পরে যখন পাখী একটাও পড়ল না জ্ঞানদাবাবুর বুড়ো শিকারী ভয়ানক চ'টে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, এগুলাকে ঘুঘু মারতি নিয়া যান"। সাহেবদের অর্থ-বোধ হ'ল, কারণ বাঙ্গলায় Higher Standard পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ রকম বলা এক গান্ধীজী ব'লতে পারেন, আমাদের কর্ম্ম নয়। আমার অদৃষ্টে একবার এই রকম স্তুতিবাদ হয়েছিল। এক প্রকাণ্ড বিলে হাঁস মারতে গেছি। গাদা গাদা শর কেটে এক সঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরী হয়েছিল। তাইতে শিকারী-সরদারকে সঙ্গে নিয়ে বসেছি, আর গ্রামের লোক চারিদিকে ডিঙ্গীতে ঘুরেফিরে হাঁস ওড়াচ্ছে। তার আগের হপ্তায় একদল সাহেব শ'ছয়েক পাখী মেরে নিয়ে গেছলেন, তাই আমার পাখীগুলো খুব উঁচুতে আর খুব জোরে উড়ছিল। আমি আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। এক একবার গুলি যেই ফসকে যায় শিকারীগুলো কোরাস্ গেয়ে ওঠে "রাম রাম ব'লে চলে-এ-এ গেল।" একে নিজের যথেষ্ট বিরক্তি, তার উপর এই কোরাস্ গান, মনের অবস্থা কি হ'ল বুঝতেই পারছেন। শেষকালে দৈব সদয় হ'লেন, হঠাৎ আন্দাজ পেলাম। পরে পরে গোটা কয়েক হাঁস পড়ার পরে শিকারীদের কৃপা হ'ল সরদার ব'লে উঠল, "হাঁ, আজ পাখীগুলো বড় বেয়াড়া রকম উড়ছে।" এই আশ্বাস পেয়ে আরও কয়েকটা পাখী পাওয়ায় মান বাঁচল। আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট, শিকার আমার এলাকার মধ্যেই হচ্ছিল, তবু এই ব্যাপার।

আর একবার এর চেয়েও বিভ্রাট হয়েছিল। কারণ, নায়ক স্বয়ং পুলিশ সাহেব। সে এক পাহাড়ে দেশ কিন্তু জঙ্গল বড় কম, কাজেই জানোয়ারও বেশী নেই। কোন কোন জায়গায় দু-চারটে হরিণ মাত্র। নানা তোড়জোড় ক'রে শিকার ক'রতে হ'ত। হয়ত একটা সমস্ত পাহাড় হাঁকা ক'রে একটা হরিণ বের হয়। সেটা ফস্কালে সারা সকাল রৌদ্রে হাঁটাই সার। আমি দুই-একবার কপালজোরে একটু কারদানী দেখাতে পেরেছিলাম তাই আমায় গাঁয়ের লোকে খাতির ক'রত। একদিন এই পুলিশ সাহেবটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আর পাটিলকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলাম যে তাকে একটা হরিণ দেওয়াই চাই। সুতরাং জঙ্গল ভাঙ্গবার সময় সবচেয়ে ভাল জায়গাটায় তাকে বসালে। কিন্তু বেচারার সেদিন নসিব খারাপ। দু-দুবার হরিণ এল একেবারে কাছে, সে আওয়াজও ক'রলে, কিন্তু গুলি লাগল না।

এতে সত্যি লজ্জার কিছু নেই। আর একটা হরিণ বের হ'লে হয়ত ঠিক পেত। কিন্তু বেলা বারটা পর্য্যন্ত মানুষে কুকুরে সারা বনটা তোলপাড় ক'রলে, কিছুই দেখা গেল না। শ্রান্ত হ'য়ে এক গাছতলায় সবাই ব'সে আছি এমন সময় পাটিল বোধহয় আশ্বাস দেবার অভিপ্রায়ে ব'ল্লে, "আসছে বার সাহেব তোমার কাছে হরিণ বেঁধে এনে দেব।" সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। পাটিল আমার দিকে তাকিয়ে ব'ললে, "তুমি বাবা অতদূরে কেন বসলে? আমাদের আজ মাংস খাওয়া হ'লনা।" সাহেবটি বিমর্ষভাবে বললে, "I didn't know I was such a rotten shot." (এত বড় আনাড়ি আমি তা জানতাম না।) হয়ত এই পাটিলই গ্রামে কি সহরে হ'লে পাঁচ মিনিট অন্তর সাহেবের পায়ের ধূলো নিত। কিন্তু এ যে বন, এখানে সবাই সমান! বনের এ শিক্ষাটা সকলের হওয়া ভাল।

অকারণ নিষ্ঠুরতা যথার্থ শিকারীর চোখে নিন্দার জিনিস। যে শিকারী পাখী কি জানোয়ার জখম ক'রে ছেড়ে দেয় তার বড় দুর্নাম হয়। বাঘ জখম ক'রে ছেড়ে আসা ত একটা গুরুতর অপরাধ। কারণ চোট-খাওয়া বাঘ দু-একদিনের ভেতর বনে এক-আধটা কাঠুরে মারবেই। যে-বাঘ কখনও মানুষের সংস্রবে আসেনি তার প্রথম চেষ্টা পলায়নের, কিন্তু যিনি গুলি খেয়েছেন কি মানুষের রক্ত আস্বাদন করেছেন, তিনি সদাই মানুষের পিছু ঘুরছেন! বাগ পেলেই ঘাড় মটকে দেন। শিকারের তাই একটা কড়া নিয়ম আছে যে, বাঘের উপর একবার গুলি ছুঁড়লে তাকে নিকেশ ক'রে আসতে হবে। আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রথম বাঘ মারার গল্প বলি। তিনি উত্তরবঙ্গে কোনও মহকুমায় চাকরী ক'রতেন। তাঁর শিকার প্রধানতঃ পদব্রজেই চ'লত। তবে কালেভদ্রে হাকিম মহাশয়ের সওয়ারীর হাতীটা পেতেন। দু-চারটে বনবরা' ও চিতাবাঘ মারার পর বন্ধুবরের সাধ হ'ল এইবার এক সত্যি গো-বাঘা মারবেন। একদিন খবর এল, এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড বাঘ কাদের মহিষ মেরে এক হোগলা বনে নিয়ে গেছে। আশে পাশে কোন বাঘমারা সাহেবলোক ছিলেন না কাজেই বন্ধুর সুযোগ মিলল। হাকিমবাবুর হাতী নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন। সঙ্গে মেচ-জাতীয় শিকারী। খুব ভোরে বনের বাইরে উপস্থিত হ'লেন। শিকারী নেমে দেখিয়ে দিলে কোনখান দিয়ে বাঘ মহিষটাকে টেনে নিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাতী সেই পথে বনে ঢুকল। এরকম ক্ষেত্রে হাতীর পায়ের শব্দে বাঘ সচরাচর পালায় না। বড় জোর একটু এদিক ওদিক সরে গিয়ে দেখে যে আগন্তুক কে। এবার কিন্তু তাও করলে না। হাতী একেবারে Kill (মরা মহিষটা)-এর সামনে বন্ধুবরকে উপস্থিত ক'রলে।

তিনি দেখলেন যে বাঘটা আধ শোওয়া অবস্থায় মহিষের ওপর দুই থাবা রেখে দিব্যি একমনে ছোট হাজরী করছে। হাতীর পায়ের শব্দে প্রকাণ্ড চাকাপানা মুখটা তুললে। বন্ধুবরের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই শক্ত। তবে বন্ধু আজন্ম বনচারী, সহজে ঘেবড়ে যাবার পাত্র ছিলেন না। নিমেষের মধ্যে বাঘের দুই জ্বলন্ত চোখের মাঝে তাক ক'রে লাগালেন গুলি। যেই না গুলি মারা, বাঘ ভীষণ গর্জ্জন ক'রে দিলে এক লাফ। হাতীটা শিকারী হাতী ছিল না। গৌড়জনসুলভ প্রকৃতি। চক্ষের পলকে মুখ ফিরিয়ে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হ'য়ে দৌড় দিলে। বন্ধু সতর্ক ছিলেন না, মাথায় একটা গাছের ডাল লেগে গড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে গেলেন। চোট লেগে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলেন যে হাত পা কিছু ভাঙ্গেনি কিন্তু বন্দুকটা দুখণ্ড হ'য়ে গেছে। সন্তর্পণে সরীসৃপ গতিতে বন থেকে বের হ'লেন। মহা সঙ্কট। জখম বাঘটাকে বনে ছেড়ে যেতেও পারেন না; অথচ ভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে করেনই বা কি ? সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, আস্তে আস্তে সদরের পানে হেঁটে চললেন নূতন বন্দুক সংগ্রহ ক'রে ফিরবেন ব'লে। তখন বেশ বেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখলেন দূরে কে হাতী চড়ে যাচ্চে। জোরে ডাক ছাড়লেন। হাতী কাছে এলে দেখলেন এক পরিচিত গারো জমীদার। তাঁকে সব ঘটনা ব'লতেই তিনি তাঁর হাতী ও বন্দুক দিলেন। বন্ধু আবার বনে ঢুকলেন, এবার কিন্তু প্রাণ হাতে ক'রে। জানতেন বাঘ সহজে ছাড়বে না। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হাতী যখন ভেতরে গেল, দেখলেন যে বাঘ মহিষের উপর শুয়ে আছে। একেবারে কাছে গেলেন তবুও ওঠে না। তখন হাতী শুঁড় দিয়ে বাঘকে নাড়া দিলে। দেখা গেল, বাঘ মধ্যললাটে বিধিলিপি নিয়ে ব্যাঘ্রের প্রেতলোকে চলে গেছে। হাতীর উপর শব তুলে নিয়ে বন্ধু সেই গারো রাজার সঙ্গে মহাধূম ক'রে নগর প্রবেশ ক'রলেন। পকেটে যে রুটি ও গুড় ছিল সেটা খাবার ফুরসৎ এতক্ষণে হ'ল।

একটা ভালুক শিকারের গল্প বলি। Bad shot অর্থাৎ বে-আন্দাজি গুলিমারা কতটা লজ্জার কথা পাঠক তা বুঝবেন। আমার পরিচিত এক সাহেব তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বতে ভালুক মারতে গেছলেন। তিনজনেই পাকা শিকারী, কিন্তু সারা সকাল পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়া ও বাদাম গাছের তলায় ঘুরে একটাও ভালুক দেখতে পেলেন না। তখন কতকটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হ'য়ে টিফিন বাক্স নিয়ে ব'সে প'ড়লেন পাহাড়ের গায়ে এক সরু তাকের উপর। সাহেবদের একটু ক্ষিদে বেশী, রসদের গোলযোগ হ'লে কাজ পণ্ড হ'য়ে যায় একথা সবাই জানেন। আমার সাহেবরা যখন রুটি মাখন, নানারকম পশুপক্ষীর মাংস ও পানীয়ের বোতল

নিয়ে বেশ জমে বসেছেন, খুব গল্প চলেছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের ফাটল থেকে এক বিশাল কালো ভালুক বেরিয়ে এল। যেই বেরোন, কি তিন সাহেবই চক্ষের নিমেষে বন্দুক তুলে দুম দাম দুম ক'রে তার উপর তিন আওয়াজ। ঋক্ষরাজ তাক থেকে গড়িয়ে একেবারে খাদে পড়ে গেলেন। তখন তিনজনে মহা তর্ক জুড়ে দিলেন। এ বলে আমার গুলি লেগেছে ও বলে আমার গুলি। তিনজনের বন্দুকের ফাঁদল তিন মাপের, সুতরাং জানোয়ার দেখলেই বোঝা যাবে কার গুলি লেগেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনজনেই খাদে নেমে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ভালুকটা মরে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই, পুচ্ছাগ্রে মাত্র একটা জখম। তখন তিনজনে আবার তর্ক। এ বলে ও তোমার গুলির দাগ, ও বলে ও তোমার। কেউই সে চমৎকার লক্ষ্যবেধের জন্যে দায়ী হ'তে চায় না। শেষে মিটমাট হ'ল। স্থির হ'ল তিনজনেই নিশানা চুকেছেন, পড়বার সময়ে কোন কাঁটাগাছে লেগে ভালুকের ল্যাজের ডগা ছিঁড়ে গেছে।

আমি একবার বাঘের নাকে গুলি লাগিয়ে লজ্জা পেয়েছিলাম সে গল্পটাও করি। বাঘ শিকার অনেক রকমে হয়। এক রকম ত বলেছি, একটা হাতী নিয়ে কি পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢুকে kill-এর উপর বাঘকে মারা। আর এক রকম হচ্চে বড়লোকের শিকার, অনেক হাতী নিয়ে। অধিকাংশ হাতী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সারবন্দী হ'য়ে জঙ্গল ভাঙ্গতে থাকে আর যেদিকটায় বাঘ বেরিয়ে পালাবার সম্ভাবনা সেই দিকে হাওদা-বাঁধা হাতীর উপর শিকারীরা বসেন। এই রকম শিকারে বাঘকে খুবই কাছে পাওয়া যায়। পেছনে তাড়া খেয়ে বাঘ বনের কিনারায় এসে মুখ তুলে একবার দেখে নেয় সামনে কি আছে। সেই সময়ে মারার খুব সুবিধা যদি মাথা ঠিক থাকে। এই অবস্থায় আমি একদিন বাঘের অপেক্ষায় রয়েছি। আমার দুদিকে দুজন পাকা শিকারী। সামনের কেশেবনের উপরটা যে রকম ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে বাঘ সোজা আমার কাছে আসছে। হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে একটু বেঁকে গিয়ে আমার ডানদিকের শিকারীর সামনে মাথা বাড়াল। তিনি আমাকে একটা সুযোগ দেবার ইচ্ছাতে চেঁচিয়ে বল্লেন আপনি মারুন। আমার হাতীতে হাওদা ছিল না, pad-এর (গদীর) উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম, ঝট ক'রে ঘুরে বসতে সাহস হ'ল না। যদি হাতীটা হঠাৎ দৌড় মারে ত মুস্কিল। ডানদিকে নিশানা ক'রতে বাধ বাধ ঠেকল, ফলে গুলি লাগল না। বাঘ ফিরে জঙ্গলে ঢুকল কিন্তু বেশীদূর যেতে হ'ল না, কেননা হাতীর লাইন অনেক এগিয়ে এসেছিল। ভয় পেয়ে বাঘটা তিন লাফে আমার বাঁদিকের

শিকারীর পাশ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বের হ'ল। তিনি মারলেন এক গুলি। বাঘ কিন্তু পড়ল না। আমরা তিনজনেই হাতী ফিরিয়ে তার পিছু নিলাম। খানিক দূরে দেখি এক কুল ঝোপের ভিতর ব'সে বাঘটা ভীষণ গর্জ্জাচ্ছে। আমি এক ঘা মারতেই উল্টে প'ড়ল। আমি আনাড়ী শিকারী, মনে মহা আনন্দ হ'ল বাঘ মেরেছি। কিন্তু হাতীগুলো যখন তাকে টেনে বের করলে, দেখা গেল যে আমি গুলি না মারলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না, কারণ আমার বাঁদিকের বন্ধু গোটা চারেক Buck shot ছররা তার বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিকারের নিয়ম অনুসারে বাঘ তাঁর আমার নয়। হঠাৎ এক মাহুত বাঘের নাকের উপর এক জখম দেখিয়ে ব'ললে, "হুজুরই প্রথম গুলি লাগিয়ে ছিলেন।" আমি সবেগে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, আমার গুলি মোটে লাগেনি, ওটা ছররার দাগ।

আমার মৃগয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এলেই হাস্যরসের অবতারণা হবে সুতরাং সে আর কাজ নেই। এইবার একটা বড় দুঃখের গল্প বলি। পাঠক বুঝবেন শিকারকাহিনীতে করুণ রসের অভাব নেই। একদিন এক ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন বক্সা দুয়ারের এক চা বাগান থেকে। মস্তবড় শিকারী ব'লে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল তাই আমি তাঁকে ব'ললাম, "আমায় নিয়ে একদিন বাঘ মারতে চলুন না।" তিনি ব'ললেন, "মহাশয়! আমি নাকে কানে খৎ দিয়ে বন্দুকধরা ছেড়ে দিয়েছি।" কি হয়েছিল বারবার জিজ্ঞেস করায় নিতান্ত অনিচ্ছায় এই গল্প ব'ললেন। তাঁদের বাগান প্রায় ৯০০ একার জমী। তার তিন ভাগের একভাগ পরিষ্কার ক'রে বাগান হয়েছে, বাকী ৬০০ একার এখনও ভীষণ জঙ্গল, তার মধ্যে থাকেনা হেন বুনো জানোয়ার নেই। সেই বনে পনের বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের ডাক্তারবাবু অব্যর্থ লক্ষ্য ও অগাধ সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। এ ত আসামের বাগান নয় যে ডাক্তারকে নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়; আর এখানকার কুলিরা পাহাড়ী, তাদের অত বেশী ঔষধপত্রও দরকার হয়না, তাই ডাক্তারের সময়ের অপ্রতুল হয়না। তিন বছর আগের কথা। বিলেত হ'তে এক তাজা ছোট সাহেব এসেছেন। বড় সাহেব কাজে বড় ব্যস্ত তাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে ব'ললেন, "ডাক্তার, ছোট সাহেবকে একটু শিকার করিয়ে নিয়ে এস।" এক পুরানো ওস্তাদ শিকারী হাতী ও মাহুত দিলেন। ছোট সাহেবের কিন্তু এ বন্দোবস্ত ভাল লাগল না। ডাক্তার একটা বাবু মাত্র, আর তার হাতে কিনা বড় সাহেব ছেড়ে দিলেন শিকার শিখতে! বেচারার অদৃষ্ট, প্রথম থেকেই ডাক্তারের সঙ্গে খিটিমিটি আরম্ভ ক'রলে, ডাক্তারকে জানিয়ে দিলে

যে, সে দেশে অনেক শিকার করেছে, তার নতুন শেখবার কিছু নেই। হাতী ক্রমে গভীর বনে এসে উপস্থিত হ'ল। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। শিকারের কানুন অনুসারে মানুষ তিনটিই নিস্তব্ধ নির্ব্বাক। এমন সময় দূরে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড বারশিঙ্গা হরিণ চরছে। ডাক্তার সাহেবকে ব'ললেন, বেশ ক'রে তাক ক'রে একটা গুলি লাগাতে। ছোকরাটি বন্দুক তুললে বটে কিন্তু হাতীর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যতটা গা নড়ে তাতেই তার হাত কাঁপতে লাগল। সে নীচে নেমে মারতে চাইলে। ডাক্তার অনেক বারণ ক'রলেন, প্রবীণ মাহুত জোড়হাত করলে, কিন্তু সেখানে বেশী কথা ত কওয়ার জো নেই, তাকে বন্ধ করা গেলনা। হাতীর ল্যাজ বেয়ে নেমে পড়ল আর হরিণের উপর আওয়াজ করলে। হরিণ পালাল, কিন্তু এদিকে চক্ষের পলকে ভীষণ ব্যাপার হ'য়ে গেল। কাছের ঝোপ থেকে এক প্রকাণ্ড বাঘ এক লাফে ছোকরার ঘাড়ে এসে পড়ল। দেখতে না দেখতে বাঘে মানুষে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। ডাক্তার ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন কিন্তু প্রায় মিনিটখানেক ভরসা ক'রে গুলি মারতে পারলেন না, যদি ছোকরাটির গায়ে লাগে। যখন সুবিধে পেলেন মারলেন বটে, বাঘও গুলি খেয়ে চীৎ হ'য়ে প'ড়ল কিন্তু সাহেবটির মাথা তার আগেই দু থাবার মাঝে পিশে গুড়ো ক'রে দিয়েছিল। শব দুটো নিয়ে ডাক্তার বড় সাহেবের বাঙ্গলায় ফিরলেন। তিনি দেখামাত্র সব বুঝলেন, গম্ভীর স্বরে ব'ললেন, "তুমি চ'লে যাও ডাক্তার, আর আমাকে কখনও মুখ দেখিওনা।" ডাক্তার নীরবে মাথা হেঁট ক'রে চ'লে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে সাহেব ডাক্তারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। আসবাব পত্র প্যাক করা দেখে কাতরভাবে ব'ললেন, "ডাক্তারবাবু, তুমি আমি পনের বছরের বন্ধু, কুঠির বন্ধু নয় আফিসের বন্ধু নয় বন জঙ্গলের বন্ধু, আমার একটা কথায় রাগ ক'রে চলে যেওনা। কিন্তু ছোকরা মায়ের এক ছেলে ছিল, বিশ্বাস ক'রে তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমরা রক্ষা ক'রতে পারলাম না, ডাক্তার।" ডাক্তার উঠে গিয়ে তাঁর সাধের বন্দুকটি নিয়ে এলেন, নলটা ধ'রে ভূঁয়ে আছাড় মেরে তিন টুকরো ক'রে ফেললেন। সাহেব নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে ডাক্তার আর বন্দুক ধরেন নি।

ইংরেজীতে যাকে sport বলে তাতে নীচতা বা বীরধর্ম্মের অবমাননা কিছু নেই। সাহেবরা বসা পাখী মারেন না। কেউ মারলে তাকে pot shot (হাঁড়ী ভরাবার জন্য শিকার) বলেন। হাতীর উপর থেকে বা মাচানের উপর থেকে বাঘ মারাতে শিকারীর বিপদের অন্ত নেই তাই সেটাও sport ব'লেই গণ্য। কিন্তু কোথাও কোথাও রাজোয়াড়াতে

কোঠাবাড়ীর মধ্যে ব'সে যে বাঘ মারা হয় সেটা খুন-খারাপির সামিল। সেইরকম, মোটারে ব'সে ভীষণ ঝকঝকে আলো ফেলে জানোয়ারের চোখ অন্ধ ক'রে দিয়ে তাকে গুলিমারা এও আমার মতে কসাইয়ের কাজ। সত্যি, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, যথার্থ মরদের মত বাঘ মারা পায়ে হেঁটেই হ'য়ে থাকে। ইতিহাসের শের আফগান সম্মুখযুদ্ধেই শের মেরেছিলেন। আমাদের একালে যতীন মুখুযোও মল্লযুদ্ধে বাঘ মেরে 'বাঘমারা যতীন' নাম পেয়েছিলেন। অবশ্য, বাঘকে ভগবান যেমন নখদন্ত দিয়েছেন তাতে শিকারীর হাতে অস্ত্র থাকায় পরাক্রমের লাঘব হয়না। একবার এক মস্ত জাঁদরেল ইন্দোরের শিবাজীরাও হোলকারের দরবারে উপস্থিত হ'য়ে শের মারা সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব ক'রছিলেন। হোলকার জিজ্ঞেস ক'রলেন, "সাহেব, তুমি কি রকম ক'রে শের মার?" বেচারা সেনানী জবাব দিলেন যে, মাচানই তাঁর মতে প্রশস্ত উপায়। রাজা আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললেন, "তুমি না জাঁদরেল, গাছের উপর থেকে লুকিয়ে বাঘ শিকার কর!" সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "মহারাজ, আপনি তবে কি ক'রে মারেন?" রাজা উত্তর ক'রলেন, "শের কে সাথ শের কী লড়াই। চলিয়ে, সুবোকো মেরে সাথ বাতায়ঙ্গে।" সাহেব গিয়েছিলেন কিনা আমি জানিনা। এই হোলকার নাকি পাগল ছিলেন। সিংহাসন ছাড়ার পর কিছুদিন মাথেরান সহরে থাকতেন। একদিন এক পারসী ছোকরা খুব জোর সাহেবী কাপড় প'রে মহা কায়দায় তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা কিন্তু খোঁড়াচ্ছিল। হোলকার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে ডাক দিলেন, "পারসী, এই পারসী, ইধার আও।" সে বেচারা প্রাণপণ চেষ্টায় তার টুপীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রছিল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। রাজাও ছাড়বার পাত্র নয়, সেপাই পাঠিয়ে তাকে ঘোড়া শুদ্ধ ধরিয়ে আনালেন। হিন্দীতে হুকুম ক'রলেন, "উতর যাও, ঘোড়ে কা পায়ের দেখো।" দেখা গেল এক পায়ে ঘা, তাই ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছিল। রাজা চ'টে আগুন হ'য়ে গেলেন। চার জন লোক সঙ্গে দিয়ে পারসীটিকে ব'ললেন, "ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তে আস্তে আস্তাবল নিয়ে যাও। পথে যদি ঘোড়ায় চড়তে চেষ্টা কর ত আমার সেপাইরা তোমায় খাদে ফেলে দেবে। আর ফের যদি কোন ঘোড়াকে কষ্ট দাও ত তোমার ঠ্যাঙ্গ ভেঙ্গে দেব।" পাগল বই কি, নইলে বাঘের জন্য ঘোড়ার জন্য এত দরদ!

হরিণ শিকারে বড় আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ ব'লে ব'সবেন না যেন। হরিণগুলো যে রকম নির্ম্মমভাবে ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে তা দেখলে বুঝবেন যে, তাদের মেরে ফেলা অস্ত্রধারীর একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। বরাহ

আর হরিণ কৃষকের এত বড় শত্রু বলেই তাদের মাংস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত খাদ্য ব'লে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পায়ে হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে কখনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো যে কত আনন্দ তা বর্ণনা ক'রে বোঝান সম্ভব নয়। তারপরে ঠিক জায়গাটিতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ, সে একছুটে ক্রোশখানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করাতে সবার সেরা হচ্চে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত ক'রে দিতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডারমাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ নাকি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশঃ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করছেন। এই দরদটা সময়ে হ'লে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ী বাড়ী টিয়া পাখীর বদলে লোকে pterodactyl পুষত। তারা ত সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য কায়েম থাকবে। কি দয়ার শরীর মানুষের! পাখমারাদের কিন্তু দয়ামায়া নেই, তাদের মন্ত্র, "মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার।" কিন্তু সকলের অদৃষ্টে ত গণ্ডারের দেখা মেলেনা। আমার কপালক্রমে একবার মিলেছিল, পাঠককে সেই গল্পটা শোনাব। একদিন কুচবেহারে দুই খবরিয়া আমার কাছে এসে বললে যে, এগার মাইল দূরে এক গণ্ডার এসেছে আর গাঁয়ের লোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকে আটকে রেখেছে এক বাবলা বনে। তাদের ইচ্ছা আমি গিয়ে মারি। সে সময় সারারাজ্যে গোটা পাঁচ-সাত গণ্ডার মাত্র ছিল। তাদের সযত্নে সরকারী জঙ্গলে পূরে রাখা হ'ত, বংশ বৃদ্ধি হবে ব'লে। আমি স্থির বুঝলাম যে, এ তারি একটা, আর একে আমি মারলে রাজদণ্ড, অন্ততঃ রাজরোষ, অবশ্যম্ভাবী। মেজ রাজকুমার তখন কুচবেহারে ছিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, গণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই গল্প রচনা করা গেল যে, জানোয়ারটা এ-রাজ্যের নয়, রঙ্গপুর জেলা থেকে এসেছে। গাড়ী চেপে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। তিনটি হাতী সংগ্রহ ক'রে পাঠান হয়েছিল। একদল কলেজের ছাত্র গেঁড়ামারা দেখার জন্য জিদ ক'রে সঙ্গে এসেছিল। পৌঁছে দেখা গেল আট-দশ বিঘে এক বাবলা বন, তাই ঘেরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্র কেরাসীনের টিন, ঢোলক ইত্যাদি। রাজকুমার একটা হাতী চ'ড়ে

দূরে বনের উল্টো পিটে চ'লে গেলেন। সু— দ্বিতীয় হাতী নিয়ে ডাইনের দিকে গেলেন। বনের সামনে যে খোলা ময়দান তার একদিকে কচুয়া সাহেব তৃতীয় হাতীর উপর রইলেন, অন্যদিকে আমি ছেলেদের নিয়ে ভুঁয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজকুমার আমার হাতে একটা খুব জোরালো Cordite বন্দুক দিয়েছিলেন কিন্তু আমার মতলব ছিল যে, পারতপক্ষে বন্দুক ছুঁড়বনা। ছেলেদের আমার পিছনে সূচীব্যূহ ক'রে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাদের তালিম দিয়ে রেখেছিলাম যে, গেঁড়া যদি আমাদের পানে তাড়া করে ত সকলে দিকবিদিকে দৌড় দেবে, সোজা নয় এঁকে বেঁকে। তাদের বাঁচাবার জন্যে দরকার হয় ত আমি বন্দুক ছুঁড়ব, নইলে নয়। সকলে আপন আপন ঘাটি নিলে পর একটা বাঁশী বাজল আর চাষারা চারিদিকে মহা উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। দেখা গেল যে, বনের ভেতর একটা বাচ্চা হাতীর মত জন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে, একবার এদিক একবার ওদিক, যেন ভয় পেয়েছে। হঠাৎ দড়াম ক'রে এক মোটা আওয়াজ হ'ল, বোঝা গেল সু— তার প্রকাণ্ড সেকেলে ten bore রাইফেলটা ছুঁড়েছে। গেঁড়া বনের ভেতর ঢুকে প'ড়ল। সু— চেঁচিয়ে বললে, "সাবধান জিৎ, লেগেছে।" আবার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল, এবার পিং গোছের শব্দ, বুঝলাম রাজকুমার মারলেন। সোঁ ক'রে একটা গুলি ছেলেদের মাথার ওপর দিয়ে চ'লে গেল। ভীষণ দুর্ঘটনা হ'তে হ'তে বেঁচে গেল। কিন্তু বিধাতা পুরুষকে ডাকবার আমার সময় হ'লনা কারণ তখনই সেই প্রকাণ্ড গণ্ড-মৃগ জঙ্গল ভেঙ্গে ময়দানে উপস্থিত হ'ল। কোন দিকে যায়, দেখতে দেখতে কচুয়া সাহেবের হাতীর দিকে মাথা নীচু ক'রে তেড়ে গেল। ভাগলো হাতী ল্যাজ তুলে। সাহেব দুবার বন্দুক চালালেন, লাগলনা। গণ্ডারটা যে কি ভয়ানক দেখাচ্ছিল কি বলব। সু—র গুলিটা গলার কাছে লেগে অনেকখানা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ছে, রাগে পাগল হ'য়ে প্রথমে হাতীটাকে তাড়া ক'রলে তারপর এক টাট্টু ঘোড়া চরছিল সেটাকে প্রায় খতম ক'রলে। আমরা কৃষ্ণনাম জপছিলাম কিংবা ওইরকম একটা কিছু করছিলাম। কিন্তু ছেলেদের দিকে ফিরলনা আমার বিশ-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। কি বিকট শব্দ হচ্ছিল, মুখে কি রকম খক্ খক্ খক্ করছিল, আর গায়ের ঢালগুলো খসখস করছিল। আমার বেয়ারাটা ত ভয়ে আত্মহারা হ'য়ে কুকরি হাতে গেঁড়ার পিছু পিছু দৌড়'ল। গেঁড়া ত পালাল। পিছু পিছু উড়ে বেয়ারা। কচুয়া সাহেবকে নিয়ে তাঁর হাতী অন্তর্দ্ধান। দুই-এক মিনিটে রাজকুমার ও সু— "কোথা গেল কোথা গেল" ক'রতে ক'রতে এসে পড়ল। আমি ব'লে দিলাম আমার বেয়ারার পাগড়ী লক্ষ্য

ক'রে এগুতে। হাতী দুটো ছুটল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম। একটু পরে দেখি অনেক দূরে গেঁড়াটা কুকুরের মত ক'রে ব'সে রয়েছে। বোধ হ'ল আর দৌড়বার দম নেই। প্রায় তিনশ' গজ দূর থেকে রাজকুমার গুলি লাগাতেই উল্‌টে প'ড়ল। তারপর দুদিন ধ'রে সেই পবিত্র মাংস বিতরণ হ'ল। সেদিন বন্দুক না মেরে আমি বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলুম। রাজকুমার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিলেন তাই মহারাজের রাগ হ'তে স্থ— বেঁচে গেল।

যদি পাঠকের মনে এ রকম কোনও কুসংস্কার থাকে যে জাতিবিশেষের শিকার বিষয়ে একটা জন্মগত অধিকার আছে তাহ'লে আমি মিনতি করি যে সেটা বর্জ্জন করুন। কি লক্ষ্যভেদে কি সাহস পরাক্রমে অমুক দেশের লোকের প্রাক্তন সংস্কার আছে তা বলা যায় না। সবটাই আবেষ্টনের কথা। মৃগয়া অর্থ-সাপেক্ষ আমোদ। অজস্র টোটা না ওড়ালে সিদ্ধিলাভ হয়না। তবে সিদ্ধি নানারকমের। রাজা-রাজড়াদের শিকারক্যাম্প কতকটা political (মৎলবী) ব্যাপার। তাই অতিথি এলে তাকে তুষ্ট করার রীতিমত বন্দোবস্ত রাজাবাহাদুরদের থাকে। খুব মহামান্য অতিথির খাতিরে মাংসে আফিঙ্গ মিশিয়ে বনে রেখে দেওয়া হয় এরকম নিন্দাবাদও শুনেছি। এটা বাড়াবাড়ি, হয়ত সত্যি নয়। কিন্তু আর একরকম ব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। রাজা খুব হুঁসিয়ার দেখে বেছে একজন A. D. C.-কে অতিথির হাওদায় বসিয়ে দেন আর খুব শক্ত তাগিদ দিয়ে রাখেন, "এঁকে আজকের বাঘটা দেওয়াই চাই, বুঝলি? ওঁর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ করবি আর বলবি যে তোর গুলি লাগেনি।" ফলে অতিথির ব্যাঘ্র হনন নির্ব্বিবাদে সমাধা হয়। আরও যে কতরকম ফন্দী আছে বলা শক্ত। পাঠক হয়ত জানেন আমাদের দেশে দাড়িওয়ালা সিংহ এখন আর নেই। কাঠিয়াবাড়ে গীর জঙ্গলে এক রকম নেড়া সিংহ আছে মাত্র। একবার এক রাজা কোনও মহাপুরুষকে খুসী ক'রবার জন্য লুকিয়ে বারটা দাড়িওয়ালা সিংহ আফ্রিকা থেকে আনিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়ত সে সময় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কিন্তু পরে সব কথাটা জানাজানি হ'য়ে যায়। হ'লেই বা কি? জানেনই ত, দুকানকাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়! এসব sport নয়, sport-এর নামে ধাপ্পাবাজী। তবু জানা ভাল। কুচবেহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কর্জ্জন লাটের একবার বড় মনকষাকষি হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দেশময় টি টি পড়ে গিয়েছিল। মহারাজ লাটসাহেবকে এক রকম তুড়ি দিয়েই বাদশাহের হুকুম নিয়ে অভিষেক-উৎসবে বিলেত চ'লে গেলেন। মেজাজী লাটসাহেব এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষ

ঝগড়াটা মিটল এই শিকারের সাহায্যে। এমন একটা সময় এল যখন ভূটান সংক্রান্ত কিছু কাজে কর্জ্জন সাহেবের মহারাজকে দরকার প'ড়ল। অন্য কেউ হ'লে দুচারটে সেলামীর তোপ বাড়িয়ে দিলেই কার্য্যোদ্ধার হ'ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লাটসাহেব শিকারের চার ফেললেন। আসামে ধূম ক'রে ক্যাম্প ক'রলেন আর মহারাজকে অনুরোধ ক'রলেন তার ভার নিতে। বহুদিনের মনোমালিন্য দূর হ'ল। আসল কাজের কি হ'ল তা আমার জানা নেই। তবে শিকারের পর আমাদের মহারাজ ভূটানের রাজপ্রতিনিধি থাম্পু জাম্পেনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে গেছলেন মনে আছে। এটাও মনে আছে যে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিনা আয়াসে কিছু টাকা ধার পাওয়া গিয়েছিল ঐ সময়ে। কর্জ্জন সাহেব রাজকার্য্যও সম্পন্ন ক'রলেন, বাঘও মারলেন। শিকারের political aspect (রাজনৈতিক উপযোগ) দেখিয়ে এ পর্ব্ব শেষ করলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(৩) হীনযান—

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক

পূর্ব্বেই এ কথা বলেছি যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির বা বুদ্ধের বাণীর তত্ত্বনির্দ্দেশ করতে গিয়ে কালক্রমে নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সব মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ভিতর চারটী নিজেদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনের জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই চারটী সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিককে হীনযান ও মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বল্‌তে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হীনযান-মহাযান এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে একটীকে বাদ দিয়ে অন্যটার পৃথক বিচার সম্ভবপর নয়। উভয়ের সম্বন্ধ অতিনিকট ও প্রভেদ অতিসূক্ষ্ম। বিশেষ কোন যুগে বৌদ্ধসংঘের ভিতর যে পরস্পরবিরোধী দুটী দলের সৃষ্টি হয়েছিল তা মনে করা অসঙ্গত হবে। হীনযান-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুও যে মহাযানপন্থী হ'তে পারতেন তার বহু প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন বৈভাষিক এবং জীবনের প্রথম ভাগে তিনি অভিধর্ম্মকোষ-নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা' বৈভাষিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। পরে এই বসুবন্ধুই যোগাচার-বাদ অবলম্বন ক'রে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-নামক বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপনা করেন। সেই সময়ে তিনি যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলিই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব সর্ব্বাস্তিবাদে এবং উভয়ের প্রাচীন নাম সর্ব্বাস্তিবাদ ছিল একথা বলাও চলে। বস্তুতঃ সর্ব্বাস্তিবাদের সাতখানি অভিধর্ম্ম বা দার্শনিক গ্রন্থই বৈভাষিকদের শাস্ত্র। এই সাতখানি গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্ম্মস্কন্ধ, সংগীতিপর্য্যায়, বিজ্ঞানকায়, প্রজ্ঞপ্তিপাদ, প্রকরণপাদ ও ধাতুকায়পাদশাস্ত্র। জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র কাত্যায়ণীপুত্রের রচিত। তিনি ছিলেন কুশাণবংশীয় রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক, সর্ব্বাস্তিবাদের প্রধান আচার্য্যও খৃষ্টীয় প্রথম শতকের লোক। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বসুবন্ধু অভিধর্ম্মকোষশাস্ত্র-নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা' জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রেরই টীকা। সর্ব্বাস্তিবাদের অভিধর্ম্মগ্রন্থগুলি অবলম্বন ক'রে যে সব প্রাচীন টীকা প্রণয়ন করা হয়েছিল তাকে বিভাষা বলা হ'ত। সেই থেকেই বৈভাষিক নামের উৎপত্তি। সুতরাং বৈভাষিক মতের সৃষ্টি যে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

সৌত্রান্তিক-মতের উৎপত্তি হয় আরও কিছু পরে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে সর্ব্বাস্তিবাদের আচার্য্য কুমাররাত বা কুমারলাত ও তাঁর শিষ্য হরিবর্ম্মণ এই নূতন মতবাদ স্থাপন করেন। অভিধর্ম্ম ও বিভাষা গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক ব'লে স্বীকার না ক'রে তাঁরা বল্‌লেন যে বুদ্ধের বাণী সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে সূত্রগ্রন্থগুলির শরণ নিতে হবে। কারণ তা'তেই শুধু বুদ্ধের নিজের মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে। কুমাররাতের প্রণীত কোন মৌলিক গ্রন্থের খোঁজ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে হরিবর্ম্মণের প্রণীত সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র-নামক গ্রন্থের মূল বিলুপ্ত হ'লেও চীনা অনুবাদ রয়েছে। এ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমে।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এই উভয় দার্শনিক মতেরই মূল হচ্ছে সর্ব্বাস্তিবাদ। বৈভাষিকেরা সর্ব্বাস্তিবাদের অভিধর্ম্ম ও সৌত্রান্তিকেরা সূত্রগ্রন্থ অবলম্বন ক'রে নিজেদের মত গ'ড়ে তোলেন ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবার আমরা তাই বিচার করব।

বৈভাষিকেরা ছিলেন অস্তিবাদী বা realists। তাঁদের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক নাম 'সর্ব্বাস্তিবাদে' সেই দার্শনিক মতই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের 'অস্তি'বাদ যে জড়বাদীর realism সে কথা বলা চলে না। আত্মা অথবা পুদ্গলের (individuality) অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না সত্য—কিন্তু নির্ব্বাণ যে সম্পূর্ণ আনন্দময় সে বিশ্বাস তাঁদের অটল ছিল। সে বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধমতই অনুসরণ করতেন। শুধু পঞ্চস্কন্ধ ও ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের আপেক্ষিক (relative) অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব স্বীকার করতে গিয়েই তাঁরা মূল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রদর্শিত পন্থা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বৈভাষিকেরা 'ধর্ম্ম' শব্দের যে অর্থনির্দ্দেশ করলেন তা' পাশ্চাত্য দর্শনের phenomenon-এর সহগামী বলা চলে। যা' স্বলক্ষণ বা নিজের বিশিষ্ট লক্ষণ ধারণ করে তাই হ'ল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—ইন্দ্রিয়ের সেই গ্রহণ ব্যাপারেই ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ ধরা পড়ে। আর ধর্ম্মের প্রকৃত স্বভাব-সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হ'লে মুক্তি লাভ হয় না। বসুবন্ধুর নিজের কথায় বল্‌তে হ'লে—

ধর্ম্মাণাম্ প্রবিচয়ম্ অন্তরেণ নাস্তি।
ক্লেশানাম্ যত উপশান্তয়েঽভ্যুপায়ঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহের স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান ব্যতিরেকে ক্লেশ উপশান্তির উপায় লাভ হয় না। আর ক্লেশ বা দুঃখের নিরোধ না হ'লে যে নির্ব্বাণের

পথ মুক্ত হয় না তা' বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম আলোচনাতেই দেখতে পেয়েছি। ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের স্বভাব-পরিচ্ছেদ করতে গিয়ে বৈভাষিকেরা ৭৫টী ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্থাপন করেছেন! এই ধর্ম্মসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—সাস্রব বা মলযুক্ত এবং অনাস্রব বা মলহীন।

সাস্রব ধর্ম্মকে 'সংস্কৃত'ধর্ম্ম নামেও অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ধর্ম্মের অর্থ করা হয়েছে "সংস্কৃতা ধর্ম্মা রূপাদিস্কন্ধপঞ্চকম্" অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ বা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্ম্মসমূহকেই সংস্কৃত বলা হয়। সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে সেই ধর্ম্ম যা' একীভূত ও সম্ভূত বা সমীকৃত (সমেত্য, সম্ভূয়) হেতুসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রতি ধর্ম্মের উৎপত্তির পেছনে নানা হেতুর সমাবেশ রয়েছে—প্রতি ধর্ম্মই অন্যান্য ধর্ম্মের সংযোগে উদ্ভূত হয়। এই জন্যই একটি সংস্কৃত শ্লোক পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্রভাবে গৃহীত হয়েছিল—

> যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
> হ্যবদত্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ হেতুপ্রভব। তথাগত বা বুদ্ধ তা'দের হেতু ও নিরোধোপায় নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বন ক'রেই সংস্কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। আর ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা যা' গ্রহণ করা অসম্ভব হয় ও যা' অহৈতুকী তা'কেই 'অসংস্কৃত' বা অনাস্রব ধর্ম্ম বলা হয়। এইজন্য ইউরোপীয় ভাষায় এ দুই শব্দের অনুবাদ হয়েছে conditioned (সংস্কৃত) ও unconditioned (অসংস্কৃত)। সংস্কৃত ধর্ম্মের সংখ্যা ৭২ আর অসংস্কৃতের সংখ্যা ৩। এই ৭২টী সংস্কৃত ধর্ম্মকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—রূপ, চিত্ত, চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত। পঞ্চস্কন্ধ থেকেই এদের উদ্ভব। পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ ও চিত্তধর্ম্ম, রূপ ও বিজ্ঞান এই উভয় স্কন্ধকে অবলম্বন ক'রে উদ্ভূত হয়। আর চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্মসমূহের উদ্ভব হয় বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে।

রূপ হচ্ছে একাদশ প্রকারের—পঞ্চেন্দ্রিয় বা গ্রাহক আর তা'দের প্রত্যেকের গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ চক্ষু, শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় আর তা'দের গ্রাহ্যধর্ম্ম, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই শ্রেণীর আর একটী ধর্ম্ম হচ্ছে অবিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞান-বহির্ভূত ধর্ম্ম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তির জাগ্রত অবস্থায় সে ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়শক্তির শুধু

বিকল অবস্থাতেই তা'র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বসুবন্ধু বলেছেন—

বিক্ষিপ্তচিত্তকস্যাপি যোহনুবন্ধঃ শুভাশুভঃ।
মহাভূতান্যুপাদায় সা হ্যবিজ্ঞপ্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেও মহাভূতগুলিকে অবলম্বন ক'রে যে শুভাশুভ ধর্ম্মের অনুবন্ধ বা প্রবাহ (serial continuity) ঘটে তা'কেই অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্ম বলা হয়। মহাভূত চারটী—পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু—এবং তা'রাই হচ্ছে অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মের উৎপাদ—হেতু। সমাধির কোন কোন অবস্থায় চিত্ত যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখনও অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মের আবির্ভাব হ'তে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে চিত্ত। চিত্ত মন ও বিজ্ঞান একার্থক। চিত্ত ধর্ম্ম ৬টী—চক্ষু শোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা ও কায়াত্মক পঞ্চবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের কোনটীই চিত্তের বহির্ভূত নয়। বিজ্ঞান-পঞ্চক ও মনোবিজ্ঞান চিত্তের অঙ্গ ও চিত্ত হচ্ছে সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞান বা sensorium commune। সেইজন্য বসুবন্ধু বলেছেন "ষন্নাম্ অনন্তরাতীম্ বিজ্ঞানম্ যদ্ধি তন্মনঃ"—মন হচ্ছে ষট্ বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত বিজ্ঞান। মন বা চিত্তকে কখনো কখনো রাজা বলা হয়েছে কখনো বা তা'কে বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত তুলনা করা হয়েছে। সেখানে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলিকে বলা হয়েছে—পাতা, ফুল ও শাখা। ধর্ম্মপদের প্রথম শ্লোকে মনের ঐ অর্থই গ্রহণ করা চলে—

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেট্ঠা মনোময়া।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ মনোপূর্ব্বগামী, মনোশ্রেষ্ঠ ও মনোময়। সকল ধর্ম্মই হচ্ছে মনের বশবর্ত্তী।

তৃতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে চৈত্তধর্ম্ম বা চিত্তের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম। চৈত্ত ধর্ম্মের সংখ্যা ৪২ ও সেগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত—

(১) চিত্ত-মহাভূমিক ধর্ম্ম—১০

বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ, ছন্দ, মতি, স্মৃতি, মনস্কার, অধিমুক্তি ও সমাধি।

(২) কুশল-মহাভূমিক ধর্ম্ম—১০

শ্রদ্ধা, অপ্রমাদ, প্রশব্ধি, উপেক্ষা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, বীর্য্য।

(৩) ক্লেশ-মহাভূমিক ধর্ম্ম—৬

মোহ, প্রমাদ, কৌসীদ্য, অশ্রাদ্ধ্য, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য।

(৪) অকুশল-মহাভূমিক ধর্ম্ম—২
অহ্রীকতা, অনপত্রপা।

(৫) উপক্লেশভূমিক ধর্ম্ম—১০
ক্রোধ, ম্রক্ষ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, প্রদাশ, বিহিংসা, উপনাহ, মায়া, শাঠ্য, মদ।

(৬) অনিয়তভূমিক ধর্ম্ম—৮
বিতর্ক, বিচার, কৌকৃত্য, রাগ, মান, বিচিকিৎসা প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই বলেছি চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভূত হয়। বেদনা ও অনুভব বা অনুভূতি একার্থক। এই অনুভূতি সুখদুঃখময় হ'তে পারে ও সুখদুঃখহীনও হ'তে পারে। আর বস্তুর স্বভাবগ্রহণেই সংজ্ঞার উৎপত্তি।—"সংজ্ঞা নিমিত্তোদ্‌গ্রহণাত্মিকা"। বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই নিমিত্ত বলা হয়েছে—আর তা'র উদ্‌গ্রহণ বা পরিচ্ছেদই (determination) হচ্ছে সংজ্ঞা। আর সংস্কার-স্কন্ধের উৎপত্তি হয় প্রকৃতপক্ষে অন্য চার স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে—'সংস্কারস্কন্ধশ্চতুর্ভ্যোঽন্যে সংস্কারাঃ'। সুতরাং এই যদি তিনটী স্কন্ধের স্বভাব হয় তাহ'লে প্রথম পাঁচ প্রকারের চৈত্ত ধর্ম্ম যে তা'দের থেকেই উৎপন্ন তা' সহজেই বোঝা যায়। তা'দের 'মহাভূমিক' বলা হয়েছে তা'র কারণ তা'রা চিত্ত থেকেই উদ্ভূত। ভূমির বিশেষ অর্থ হচ্ছে উৎপত্তিবিষয় অর্থাৎ যে স্থান থেকে উৎপত্তি হয়। চিত্ত থেকে সব ধর্ম্মের উৎপত্তি বলেই মহাভূমি হচ্ছে চিত্ত।

যে সব ধর্ম্ম চিত্তের সমস্ত ক্রিয়াকেই আশ্রয় করে তা'দের মহাভূমিক ধর্ম্ম বলা হয়েছে। বেদনা বা নানা প্রকারের অনুভব, চেতনা বা চিত্তপ্রস্যান্দ (that which conditions the thought), সংজ্ঞা ('বিষয়-নিমিত্ত গ্রহণ'), ছন্দ ('অভিপ্রেতে বস্তুনি অভিলাষঃ'), স্পর্শ ('ইন্দ্রিয়-সন্নিপাত'), মতি বা প্রজ্ঞা ('বস্তুনি প্রবিচয়'), স্মৃতি, মনস্কার ('আলম্বনে চেতস আবর্জ্জনম্ অবধারণং') ও সমাধি (চিত্তৈকাগ্রতা) চিত্তের সমস্ত ক্রিয়াতেই বিদ্যমান। সেই জন্যই এগুলিকে চৈত্ত ধর্ম্ম বলা হয়েছে।

চিত্তের কুশলী অবস্থাতে যে সব ধর্ম্মের উদ্ভব হয় তা'দের কুশল-মহাভূমিক-ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা ('চেতসঃ প্রসাদঃ'), অপ্রমাদ বা কুশলধর্ম্মের অবহিততা, প্রশ্রব্ধি বা চিত্তলাঘব ('চিত্ত-কর্ম্মণ্যতা'), উপেক্ষা বা চিত্তসমতা, হ্রী (গৌরবতা), অপত্রপা ('অবদ্যে ভয়দর্শিত্বম্,) অলোভ, অদ্বেষ (মৈত্রী), বিহিংসা ও বীর্য্য ('চেতসোঽভ্যুৎসাহঃ')।

ক্লেশমহাভূমিক ও অকুশলমহাভূমিক :ধর্ম্মসমূহ প্রকৃতপক্ষে কুশল-মহাভূমিক-ধর্ম্মসমূহের বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্ম। শ্রদ্ধার অভাবে মোহ বা অবিদ্যা,

অপ্রমাদের অভাবে প্রমাদ, বীর্য্যের অভাবে কৌসীদ্য, প্রশ্রদ্ধি বা চিত্ত-লঘুতার অভাবে স্ত্যান বা অকর্ম্মণ্যতা, ঔদ্ধত্য, হ্রীর অভাবে অহ্রীকতা ও অপত্রপার অভাবে অনপত্রপা প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

উপক্লেশ-মহাভূমিক ধর্ম্মগুলিও অকুশল বা কুশল-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী। ক্রোধ, ম্রক্ষ বা শত্রুতা, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি ধর্ম্মও চিত্তের অকুশল অবস্থায় উৎপন্ন হয়। আর অনিয়তভূমিকধর্ম্ম চিত্তের কুশল ও অকুশল দুই অবস্থাতেই উদ্ভূত হ'তে পারে।

আর এক শ্রেণীর সংস্কৃত ধর্ম্মকে বলা হয় চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কার অর্থাৎ যে ধর্ম্মের চিত্ত ও রূপের কোনটীর সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। পূর্ব্বেই দেখেছি যে চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম সংস্কার-স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভূত হয়— ও তা'দের সংখ্যা ১৪—প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সভাগতা, আসঙ্গিক, সমাপত্তি, জীবিত, লক্ষণ ও নামকায় ইত্যাদি। এ সব ধর্ম্মের বস্তুত্ব নেই, তা'রা চৈত্ত ধর্ম্মও নয়, তবে চৈত্তের সহিত তা'দের ভাবসাদৃশ্য আছে। প্রাপ্তি দুই প্রকারের—লাভ ও সমন্বয় (acquisition and possession)। ধর্ম্ম, আশ্রয়, স্কন্ধ, আয়তন, প্রভৃতির লাভ ও সমন্বয় কার্য্যকে 'প্রাপ্তি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্তিসংস্কার স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রবাহকেই অপেক্ষা করে, অন্যের কর্ম্মকে আশ্রয় করে না। সভাগতা বা নিকায়-সভাগতাও এক-প্রকারের ধর্ম্ম। সাধারণতঃ নানা বস্তু বা সত্ত্বসমূহের ভিতর যে সাম্যের বা সাদৃশ্যের অনুভূতি হয় তা'র হেতু হচ্ছে সভাগতা সংস্কার। আসঙ্গিক সংস্কার চিত্ত ও চৈত্তধর্ম্মপ্রবাহের নিরোধ উৎপন্ন করে। সেইজন্য এই ধর্ম্মকে নদীস্রোত-নিরোধের সঙ্গে তুলনা করা হয় (নদীতোয়-নিরোধবৎ)। সমাপত্তি হচ্ছে মহাভূতের সমতা উৎপাদন (মহাভূত-সমতাপাদনম্)। চিত্ত প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবাহ নিরুদ্ধ হ'লে চিত্তের যে সমতা উৎপাদিত হয় তা'কেই সমাপত্তি বলা হয়। ধ্যান সমাধি প্রভৃতি সমাপত্তিরই নামান্তর। সেইজন্যই সমাপত্তি দুই প্রকারের অসংজ্ঞি ও নিরোধ সমাপত্তি, অর্থাৎ আসংজ্ঞিক ও নিরোধ-সংস্কারের সংগ্রহ। মোক্ষকামীর পক্ষেই এ দুই ধর্ম্ম উৎপাদন সম্ভবপর। 'জীবিত'ও একপ্রকার ধর্ম্ম, 'জীবিত' ও আয়ুস্ উভয়েই একার্থক। এ সংস্কারের দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবাহের স্থিতি নিরূপিত হয়। সুতরাং এই ধর্ম্মই হ'ল বসুবন্ধুর মতে "আধার উষ্ণবিজ্ঞানয়োঃ"—অর্থাৎ আয়ুঃই হচ্ছে উষ্ণতা ও বিজ্ঞানের আধার বা আশ্রয়স্থান। আয়ুর এই অর্থ নির্দ্ধারণে বসুবন্ধু বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেছেন—

> আয়ুর উষ্ণাথ বিজ্ঞানম্ যদা কায়ম্ জহত্যমী।
> অপবিদ্ধ তদা শেতে যথা কাষ্ঠমচেতনঃ॥

অর্থাৎ যখন আয়ু, উষ্ণা ও বিজ্ঞান কায়কে পরিত্যাগ করে তখন তা'র অচেতন কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ হচ্ছে জাতি, জরা, স্থিতি ও অনিত্যতা এই চারটী। এ চারটীর প্রত্যেকেই এক-একটী ধর্ম্ম।

আর তিনটী চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম হচ্ছে—নামকায়, পদকায় ও ব্যঞ্জনকায়। সংজ্ঞা, বাক্য ও অক্ষর থেকে এই তিন সংস্কারের উৎপত্তি। নামের সাহায্যে সংজ্ঞাকরণ, ও পদের সাহায্যে অর্থ পরিসমাপ্তি হয়, আর ব্যঞ্জন বা অক্ষর হচ্ছে লিপির হেতু। সুতরাং এই তিনটীও ধর্ম্মবিশেষ।

এইবার অনাস্রব বা অসংস্কৃত ধর্ম্ম কোনগুলি তার বিচার করা যাক। পূর্ব্বেই বলেছি যে—যে ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই হচ্ছে অসংস্কৃত (unconditioned) ধর্ম্ম। অসংস্কৃত ধর্ম্ম তিনটী—"আকাশম্ দ্বৌ নিরোধৌ চ" অর্থাৎ আকাশও দুই প্রকারের নিরোধ—প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ।

আকাশের অর্থ হচ্ছে অনাবৃতি, অর্থাৎ যা' রূপ বা বস্তু (matter) দ্বারা আবৃত হয় না ও রূপ বা বস্তুকে আবৃত করে না তা'ই হচ্ছে আকাশ। আর প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ নির্ব্বাণেরই অঙ্গ। প্রতিসংখ্যা নিরোধ হচ্ছে সাস্রব ধর্ম্মসমূহের প্রত্যেকের পৃথক্‌ভাবে নিরোধ বা বিসংযোগ —"বিসংযোগঃ পৃথক্ পৃথক্"। এই বিসংযোগ বা নিরোধের ধর্ম্মত্ব বা দ্রব্যত্ব (entity) আছে, এবং সে ধর্ম্মত্ব অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রত্যুৎপন্ন নয়—নিত্য। সেই জন্যই নিরোধ আর্য্যসত্য হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিসংখ্যা হচ্ছে প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সাস্রব ধর্ম্ম-সমূহের স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই হচ্ছে প্রতিসংখ্যা নিরোধ। আর যে নিরোধ ধর্ম্মোৎপত্তির আত্যন্তিক বিঘ্ন ঘটায় তাই হচ্ছে অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ ('উৎপাদাত্যন্তবিঘ্নঃ')। প্রজ্ঞার সাহায্যে পৃথক পৃথক্ সাস্রব ধর্ম্মের প্রকৃত স্বভাব—অবগতিতে এ নিরোধ নয়,—যখন ধর্ম্মোৎপত্তির হেতুসমূহ বিনষ্ট হয় ('প্রত্যয় বৈকল্যাৎ') তখনই এই নিরোধ ঘটে। সুতরাং এই নিরোধই হচ্ছে বৈভাষিকদের মতে বৌদ্ধসাধকের কাম্য। কারণ এতেই আত্যন্তিক নির্ব্বাণ লাভ হয়। বস্তুতঃ যখন সাস্রব ধর্ম্মসমূহের উৎপাদ বিনষ্ট হয় তখনই তিনটী অসংস্কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মশূন্যতাই হচ্ছে অসংস্কৃতত্রয়ের লক্ষণ।

বৈভাষিকদের এই ধর্ম্মপরিচ্ছেদের পেছনে রয়েছে অস্তিবাদ। কিন্তু এই অস্তিবাদে সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ কিম্বা আত্মার কোন স্থান নেই। রূপের (form or matter) বস্তুত্ব এবং পরমাণুরও বস্তুত্ব আছে বটে কিন্তু সে পরমাণুর কোন স্বাধীন সত্তা নেই। এইখানেই

বৈশেষিকের সঙ্গে বৈভাষিকের বিরোধ। বৈভাষিকের পরমাণু দ্রব্য-পরমাণু (atom, monad) নয়, তা'র কোন দ্রব্যত্ব (substantiality) নেই। সে পরমাণু হচ্ছে সংঘাত-পরমাণু, অর্থাৎ সংঘাত বা রূপ-সংঘাতের (aggregate of matter) সূক্ষ্মতম অবস্থা। রূপসংঘাতের সেই সূক্ষ্মতম অবস্থাও স্বলক্ষণবিশিষ্ট—তা'র লক্ষণ হচ্ছে আটটী—চতুর্ম্মহাভূত বা ক্ষিতি, অপ্, বায়ু ও তেজ ও চতুর্ভৌতিক বস্তু—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ। সুতরাং এই পরমাণুর কোন আত্যন্তিক সূক্ষ্মতা (ultimate simplicity) নেই। বৈশেষিকের পরমাণুর নাশ নেই—কিন্তু বৈভাষিকের সংঘাত-পরমাণু স্বল্পস্থায়ী, তার বিনাশ হ'লে তৎসদৃশ অন্য পরমাণু তার স্থান গ্রহণ করে। প্রতি সংঘাত-পরমাণুর উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হেতু-পরম্পরার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

চিত্ত ও চৈত্ত ধর্ম্মের (mind ও mental phenomena) সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। চিত্ত বা মনেরও কোন স্বাধীন সত্তা নেই। বিজ্ঞানের উৎপত্তিতেই মনের অস্তিত্ব। বিজ্ঞানও স্বল্পস্থায়ী, এক বিজ্ঞানের লয় হ'লে নূতন বিজ্ঞান তা'র স্থান গ্রহণ করছে। তা'দের উৎপত্তি ও স্থিতি হেতু-পরম্পরার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। ভূতপূর্ব্ব বিনষ্ট বিজ্ঞানই পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে জাত বিজ্ঞানের আশ্রয় হিসাবে গৃহীত হয় ও সেই জন্যই তা'কে মন আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং চিত্ত চৈত্তধর্ম্ম 'সংস্কৃত' লক্ষণ নিয়েই উৎপন্ন হয়।

কোন ধর্ম্মই একটীমাত্র হেতু থেকে উদ্ভূত (একহেতু-সম্ভূত) নহে। প্রতি ধর্ম্মই অন্য কোন ধর্ম্মের কারণ-হেতু। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের (causality) পৌর্ব্বাপর্য্য ও সহভাবিত্ব (coexistence) দুইই আছে। প্রদীপ আলোক ও বৃক্ষছায়ার কারণহেতু—তা'দের যেরূপ প্রতীত্য-সমুৎপন্নত্ব আছে তেমনি সহভাবিত্বও আছে। এইখানে বৈভাষিকদের সৌত্রান্তিক-মতের সঙ্গে বিরোধ—সৌত্রান্তিকেরা ধর্ম্মসমূহের সহভাবিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এক ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়ে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বেই দেখেছি যে বৈভাষিকেরা অসংস্কৃত ধর্ম্মত্রয়কেও ভাবস্বভাব (positive) ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেও সৌত্রান্তিকের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ। সৌত্রান্তিক-মতে অসংস্কৃতত্রয় অভাবস্বভাব (negative)—তাঁ'রা স্প্রষ্টব্য বা স্পর্শ করবার বস্তুর অভাবকেই আকাশ ও জাতি বা অনুৎপাদের অভাবকেই নির্ব্বাণ বলেন। সুতরাং সৌত্রান্তিকের নির্ব্বাণ হচ্ছে অবস্তুক (unreal) আর বৈভাষিকের নির্ব্বাণ বাস্তব, অনাস্রব ও আনন্দময় অবস্থা।

প্রথমেই বলেছি যে বৈভাষিকমতে আত্মা বা পুদ্গলের কোন অস্তিত্ব নেই। রূপী ও অরূপীধর্ম্মের অর্থাৎ স্কন্ধ ও মহাভূতের সংযোগে জীবের উৎপত্তি। আর তা'র আত্মা বা বৈশিষ্ট্য বল্‌তে বুঝতে হবে শুধু ধর্ম্মসমূহের সমাবেশ। সৈন্য, পিপীলিকাশ্রেণী, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির সঙ্গে এই জীববৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়। নানা সৈনিকের একত্র সমাবেশে সৈন্য ও নানা পিপীলিকার সমাবেশে পিপীলিকা-শ্রেণী গঠিত। তা'দের পরস্পরের ভিতর কোন নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ নেই। স্রোতস্বিনীও তেমনি হচ্চে জলের পূর্ব্বাপর অনুস্যূতি ও সে অনুস্যূতিও নিত্য নয়—অনিত্য। সুতরাং আত্মা বা পুদ্গলের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই—আছে শুধু হেতুসম্ভূত ধর্ম্ম, স্কন্ধ আয়তন (বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়) ও ধাতু বা ভূত (elements)। গভীরভাবে প্রণিধান করলে উপলব্ধি হয় যে আত্মা নেই—সেখানে আছে শুধু শূন্য। বৈভাষিকেরা এখানে প্রায় শূন্যবাদীদের সমধর্ম্মী হ'য়ে পড়েছেন—কিন্তু সে কথা পরে বিচার করবো। এইবার সৌত্রান্তিক-মতের পরিচয় দিয়েই এ অধ্যায় সমাপ্ত করব।

বৈভাষিকমতে আত্মা নেই বটে কিন্তু ধর্ম্মের অস্তিত্ব, আপেক্ষিক হ'লেও আছে। সে ধর্ম্মের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস আছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ধর্ম্মের পেছনে রয়েছে একটা হেতু ও সে হেতুও হচ্ছে ধর্ম্মসংঘাত। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মসংঘাতও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মসমূহের কারণ-হেতু। কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা এর কিছুই স্বীকার করেননি, আত্ম বা পুদ্গলশূন্যতা ও ধর্ম্মশূন্যতাই হচ্চে তাঁদের মতের দুটী মূলসূত্র। শূন্য ঘটের ভিতর যেমন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, স্কন্ধ ও ভূতাত্মক দেহের ভিতরেও তেমনি কোন আত্মা নেই। ঘটের অস্তিত্ব ব্যাবহারিক সত্যমাত্র—পরমার্থতঃ তারও কোন সত্তা নেই। ঘট হচ্ছে সংজ্ঞা মাত্র। এ কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যাক্। সৌত্রান্তিকমতে সত্য দুই প্রকারের—সংবৃতি ও পরমার্থ অর্থাৎ relative ও absolute। কোন ধর্ম্ম বা বস্তুকে যখন পরিচ্ছিন্ন করা যায় তখন পরমার্থতঃ তার আর অস্তিত্ব থাকে না। তখন তা'র অস্তিত্ব আছে এ কথা বলা শুধু সংবৃত্তি সত্য মাত্র—relative truth। উদাহরণ—জল। যখন জলকে পরিচ্ছিন্ন ক'রে তার রং, স্বাদ, শৈত্য প্রভৃতি ধর্ম্মকে পৃথক ক'রে বিচার করি তখন সে জলের কোন পৃথক সত্তা থাকে না। তখন শুধু ব্যাবহারিক হিসাবেই তার 'জল' আখ্যা দেই। জলের অস্তিত্ব একটা সংবৃত্তি সত্যমাত্র। তেমনি পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্ম্মেরও কোন অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই—ধর্ম্মও হচ্ছে শূন্যস্বভাব। ধর্ম্ম শূন্যস্বভাব কারণ তা' ক্ষণিক। তা'র কোনও অতীত বা ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই—আছে শুধু ক্ষণিক স্থায়ীত্ব। তা'র প্রধান কারণ এই যে—ধর্ম্মের প্রকৃত স্বভাব প্রতি মুহূর্ত্তেই

বিনষ্ট হচ্ছে ও তার নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে। এ'তে শুধু ধর্ম্মের প্রবাহই সৃষ্টি হচ্ছে—সে প্রবাহের প্রতিধর্ম্মই অনিত্য বা ক্ষণিক। এই সত্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা একটী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—কোনও সূত্রখণ্ডের একধারে যদি অগ্নিসংযোগ ক'রে তা'কে ঘুরানো যায় তাহ'লে যে অগ্নিময় বৃত্ত দেখা যায় ধর্ম্মপ্রবাহের লক্ষণও অনেকটা সেইরূপ। অগ্নিময় বৃত্ত বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র জ্যোতিকণার সমষ্টিতে তৈরী। সে জ্যোতিকণাসমূহ এক বৃত্ত হিসাবে অনুমিত হ'লেও তাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন যোগসূত্র নেই। ধর্ম্মপ্রবাহ বা ধর্ম্মসন্তান তেমনি continuous phenomena মাত্র। সে ধর্ম্মসন্তানের পেছনে কোন সন্তানীন্ নেই—অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ে সন্তান বা প্রবাহ তৈরী হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন বন্ধন নেই। উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। গতিশীল পিপীলিকার পংক্তিতে বহু পিপীলিকা চলেছে। কিন্তু তা'দের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই।

এই ধর্ম্মসন্তানের যে বন্ধন বা ঐক্য তা'র পেছনের যে সন্তানীন্ আছে বলে আমরা মনে করি তা' সম্পূর্ণ অলীক—তা' মায়ামাত্র। আমাদের মনেন্দ্রিয় বা বিজ্ঞান, ধর্ম্মসমূহের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করে তা'তেই শুধু তা'দের বন্ধনের অস্তিত্ব। সুতরাং এই ধর্ম্মসমূহকে বলা যায় শুধু প্রতিবিম্ব-প্রবাহ যা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয় (a series of images not directly perceptible)। এইখানেও বৈভাষিকের সঙ্গে সৌত্রান্তিকের প্রভেদ। বৈভাষিকেরা ধর্ম্মসমূহের প্রত্যক্ষীকরণে (direct perception) বিশ্বাস করেন।

সৌত্রান্তিকেরা বলেন যে ধর্ম্মসমূহের আর একটী লক্ষণ হচ্ছে অনিত্যতা। যে মুহূর্ত্তে তা'দের উৎপত্তি সেই মুহূর্ত্তেই তা'দের বিনাশ হয়। বৈভাষিকেরা ধর্ম্মকে ক্ষণিক বলেন বটে, তবে 'ক্ষণিকের' অর্থ হচ্ছে 'অল্পক্ষণ-স্থায়ী'। প্রতিধর্ম্মেরই তাঁ'দের মতে উৎপত্তি, স্থায়ীত্ব, বৈনাশিক-অবস্থা ও বিনাশ আছে। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ সমকালীন নয়—পূর্ব্বাপর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বৈভাষিকেরা ধর্ম্মসমূহের অস্তিত্বে ও বস্তুত্বে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের মতে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষীকরণ (direct perception) সম্ভবপর। আর সৌত্রান্তিকেরা ধর্ম্মসমূহকে শূন্যস্বভাব বা অলীক মনে করতেন। তাঁ'দের মতে আমাদের বিজ্ঞান প্রবাহেই শুধু ধর্ম্মের অস্তিত্ব। সে ধর্ম্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়—অনুমেয় (deductive)। বৈভাষিকের নির্ব্বাণ বাস্তব, অনাস্রব আনন্দময় অবস্থা, ভাবস্বভাব বা positive, আর সৌত্রান্তিকের নির্ব্বাণ অবস্তুক, ও অভাব-স্বভাব বা unreal ও negative।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ

মৃত্যুর পরে ?

কবি খেদোক্তি করিয়াছেন—'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে!' ঠিক্ কথা! মৃত্যু জন্মের যমজ ভাই—আজ হউক্ আর শত বর্ষ পরে হউক্, মানুষকে মরিতে হইবেই হইবে।

> মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।
> অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥—ভাগবত

সেই জন্য মানুষের সনাতন প্রশ্ন—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে?' মৃত্যুর সঙ্গেই কি সব ফুরাইয়া যায়? না, চিতাভস্মের পরও কিছু থাকে? অর্থাৎ 'Survival of man' কি সত্য কথা? না, 'The grave is but his goal'? অতি প্রাচীন যুগে আমাদের এই ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

> যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
> অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে—কঠ, ১৷২০

'মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? কেহ বলে অস্তি, কেহ বলে নাস্তি। এ সন্দেহের মীমাংসা কি?'

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে, আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

> যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি?

'মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়?'—এ প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদী বলেন—'আর কি হবে? 'নাস্তিত্ব' হয় (annihilation)।' 'যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদে'র আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্য জীববাদী; জড়বাদীর ঐ উত্তরে তিনি তুষ্ট নন। জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—জীবরিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের কথা এই—

> তদ্ যথা অহি-নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবম্ এব ইদং শরীরং শেতে অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ—বৃহ, ৪৷৪৷৭

'যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই শরীর জীবরিক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু জীব? জীব অ-শরীর, অ-মৃত, প্রাণ।'

মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম

যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষের সহিত জীবের উপমা দিয়াছেন ঃ—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমৃষা—বৃহ, ৩।৯।২৮

'যেমন বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনি জীব অব্যয় (অমৃষা)।'

বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়—তার পর ? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট হয় না—সে বীজরূপে রহিয়া যায়। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব, আবার বিটপ, আবার পুষ্প, আবার ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ—বীজ, বীজ—বৃক্ষ, অনাদি হইতে অনন্ত কাল এই পর্য্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে—তিরোভাবের পর পুনশ্চ আবির্ভাব; আবার আবির্ভাবের পর পুনশ্চ তিরোভাব।*

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ॥—বৃহ, ৩।৯।২৮।৪

বৃক্ষের এই যে বারংবার 'প্রেত্য-সম্ভব' (পুনরুৎপত্তি), তাহার নিদান ঐ বীজ (ধান)—

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ।

জীবের যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার তিরোভাব ও আবির্ভাব হয় (ন্যায়দর্শনে যাহাকে 'প্রেত্যভাব' বলা হইয়াছে), তাহার নিদান কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'তাহার নিদান কর্ম্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা (Thoughts, Desires and Actions)।' উহাই জন্মান্তরের বীজ।

কর্ম্ম হৈব তৎ * * পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদ্ অভিসংপদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'এই পুরুষকে কামময় বলা যায়। সে যে-প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা করে; যে-প্রকার ভাবনাযুক্ত হয়, তদনুরূপ কর্ম্ম করে; যে-প্রকার কর্ম্ম করে, তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়।'

---

*Mankind is like a plant. Like this it springs up, develops, and returns finally to the earth. Not entirely, however. But as the seed of the plant survives, so also at death the works (*Karma*) of a man remain as a seed, which, sown afresh in the realm of ignorance (*Avidya*), gives rise to a new existence in exact correspondence with his character.'
—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp. 313-4.

অতএব কামই মূলাধার। এই কামকে গীতায় 'সঙ্গ' বলা হইয়াছে (সঙ্গং ত্যক্ত্বা, মুক্তসঙ্গঃ ইত্যাদি)। বুদ্ধদেব ইহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। (তন্‌হা 'তৃষ্ণা'-শব্দের পালি অপভ্রংশ)। অবিদ্যাজনিত এই তন্‌হা হইতেই জন্ম-জন্মান্তর এবং তন্‌হা-ক্ষয়েই জন্ম-নিবৃত্তি।*

কোন বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎখাত করা যায়, তবে যেমন তাহা হইতে আর বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয় না—সেইরূপ কোন জীবের কর্ম্মমূল অর্থাৎ 'কাম' বা বুদ্ধদেবের কথিত 'তন্‌হা' যদি নিঃশেষে উৎসারিত হয়, তবে তাহার 'প্রেত্যভাব' হইবে কিরূপে? কারণ,

সতিমূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩। 'মূল থাকিলে তবে ত তাহার বিপাক—জন্ম আয়ুঃ ভোগ।'

যদি মূলই বিনষ্ট হয়, তবে প্ররোহ কখনই সম্ভব নহে।† যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন :—

যৎ সমূলম্ আবৃহেয়ুর্ বৃক্ষং ন পুনঃ আভবেৎ।
মর্ত্ত্যঃস্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্‌নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি।
জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ॥—বৃহ, ৩।৯।২৮।৬-৭

'বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎপাটিত করা যায়, তবে তাহা হইতে আর বীজ জন্মে না। মানুষ যদি মৃত্যু কর্ত্তৃক বৃক্‌ন হয়, ‡ তবে কোন্ মূল হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিবে? এইবার জন্ম হইয়াছিল—আর সে জন্মিবে না। কে আর ইহাকে জন্মাইতে পারিবে?'

অর্থাৎ ইহাই তাহার শেষ জন্ম ও শেষ মৃত্যু—সে অতঃপর জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া মোক্ষলাভ করিল। সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের ইহাই মুখ্য কথা। এখন আমরা ইহার বিস্তার করিব।

জীবের পরলোকগতি

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি ছাড়িয়া দিই, তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসি?—'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব

---

*Verily it is this thirst (*Tanha*) or craving *causing the renewal of existence*, accompanied by sensual delights, seeking satisfaction now here now there—the craving for the gratification of the passions, for continued existence in the worlds of sense.—Buddhist Suttas, S. B. E. Vol. XI, p. 148.

†Hence it is this (Tanha or thirst), which must be completely eradicated, root and branch, during our present life-time—if at death we want to get out of the cycle of rebirth.—The Doctrine of the Buddha, p. 312.

‡ বলা বাহুল্য, এ মৃত্যু Death নহে। অগ্নি বৈ মৃত্যুঃ (বৃহ, ৩।২।১০)—এ মৃত্যু জ্ঞানাগ্নি, যাহার স্পর্শে সমস্ত কর্ম্মপাশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার কি গতি হয়?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা নরক,—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর।* প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃষ্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ অনন্ত স্বর্গ-নরকে (Eternal retribution in heaven or hell-এ) বিশ্বাসবান্। এ বিশ্বাস কি বিচারসহ? মানুষের আয়ুঃ শত বর্ষের অধিক নহে।—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—বাইবেলের মতে আরও কম—Three score years and ten—মাত্র সপ্ততি বর্ষ। এই স্বল্প কয়েক বৎসরে মানুষ কি এমন সুবৃহৎ পুণ্য-পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার ফলে তাহার অন্তহীন স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা হইবে? কার্য্য ও কারণের ত অন্ততঃ কতকটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এত ছোট কারণে এত বড় কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে কি? সেই জন্য অনেক খৃষ্টান 'the unparalleled disproportion in which cause and effect here stand to one another'—কার্য্য কারণের ঐ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া eternal reward or punishment (অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার)-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ন্যায়পর বিধাতা, তখন তিনি লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড, অল্প পুণ্যে এত বিপুল ঋদ্ধির বিধান করিবেন কেন? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করেন না। তাঁহার কথা এই, 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং'—কর্ম্মানুসারে ফলের তারতম্য—As you sow, so shall you reap—যেমন কর্ষণ, তেমনি ফলন—আর ঐ ফলন কোনমতে অন্তহীন নয়।

পরলোকে 'তরতম'

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যে-প্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেইপ্রকার হয়; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়, পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যলোকে এবং পাপকর্ম্মের ফলে পাপলোকে গতি হয়।'

---

*If the fact of death not being our end is established for a man, then the second question for him is: Of what kind is his continued existence after death? Here two chief doctrines are opposed to each other,—first, the immortality of the individual in an eternal heaven or in an eternal hell and secondly, the doctrine of palingenesis (জন্মান্তর)—George Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 104.

লোকান্তরে এই তারতম্যের বিষয়, আমরা জীববাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জীব দেহান্তে পরলোকে গমন করিয়া, সেই সেই 'আবসথে'র (environment-এর) অনুযায়ী নবতর রূপ গ্রহণ করে। পরলোকে ঐ তারতম্যের হেতু ইহলোকে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যা-কর্ম্মণী'।

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই :—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেইমত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত ঐ আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী কিম্বা অন্য লোকের উপযোগী শরীর।'

বৈদিক সাহিত্যে পরলোক

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে, 'সুকৃতাং লোকে' জীবের যে পরলোকগতির বর্ণনা আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের এ বর্ণনা তাহার অনুরূপ। সেখানে দেখি, সুকৃতকারীরা সেই লোকে 'সর্ব্বতনু, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু' হইয়া উত্থিত হন। ইহাই সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের 'নবতরং কল্যাণতরং রূপম্'।

এষ বা ওদনঃ সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনুঃ। সর্ব্বাঙ্গ এব সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনুঃ সংভবতি য এবং বেদ।—অথর্ব্ববেদ, ১১।৩।৩২

'ঐ (মন্ত্রপূত) ওদন (Rice-dish) সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু (পরু=joint), সর্ব্বতনু। যিনি এবংবিৎ (এ বিষয় জানেন), তিনি সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু, সর্ব্বতনু হইয়া উদ্ভূত হন।'

স হ সর্ব্বতনুরেব যজমানঃ অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি—শতপথ, ৪।৬।১।১ ও ১১।১।৮।৬

'সেই যজমান সর্ব্বতনু হইয়া ঐ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।'

যঃ সৌত্রামণ্যা অভিষিচ্যতে * * তথা কৃৎস্ন এব সর্ব্বতনুঃ সাঙ্গঃ সম্ভবতি—শতপথ, ১২।৮।৩।৩১

'যিনি সৌত্রামণী যাগে অভিষিক্ত হন, তিনি সম্পূর্ণ সর্ব্বতনু, সাঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হন।'

বেদে সুকৃতকারীর পরলোকের সাধারণ নাম 'স্বর্গ'। আর দুষ্কৃতকারীর পরলোকের নাম বব্রঃ (pit) (ঋগ্বেদ, ৭।১০৪।৩), পদং গভীরং (ঋগ্বেদ, ৪।৫।৫), অন্ধং তমঃ—অনারম্ভণং তমঃ (ঋগ্বেদ, ১০।৮৯।১৫, ১০।১০৩।১২)। প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত লোকে বসতি করিতে হয়।

তস্মাদ্ আহুঃ কৃতং লোকং পুরুষঃ অভিজায়তে ইতি—শতপথ, ৬।২।২।২৭

অন্যত্র শতপথ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

স যদ্ধ বা অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ অন্নম্ অত্তি, তদ্ এনং অমুষ্মিন্ লোকে প্রত্যত্তি —১২।৯।১।১

'ইহলোকে জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, পরলোকে সে সেই অন্নের দ্বারা ভক্ষিত হয়।'

ইহাকেই বলে কর্ম্মের বিপাক (Retribution)। কারণ, পরলোকে নিক্তির তৌলে সূক্ষ্ম বিচার হয়।

তুলায়াং হ বা অমুষ্মিন্ লোকে আদধতি, যতরদ্ যংস্যতি তদ্ অন্বেষ্যতি, যদি সাধু বা অসাধু বা—শতপথ ১১।২।৭।৩৩ 'পরলোকে তুলাদণ্ডে জীব নিহিত হয়; দুই দিকের যে দিক্ উত্তোলিত হয়, সে তাহার অনুসরণ করে। সে সাধুই হউক আর অসাধুই হউক।'

মোট কথা, দুষ্কৃতকারীরা স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারে না—

কশ্চিদ্ হ বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য * * কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রতি-প্রজানাতি—অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।১

'কেহ কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না—অগ্নি-মুগ্ধ হইয়া, (চিতা-) ধূমাকুলিত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না।'

কারণ, তাহাদের দুষ্কৃত স্বর্গের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।

বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গের অনেক মনোমদ বর্ণনা আছে।

ঐ বর্ণনার সার-সঙ্কলন করিয়া কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ বলিয়াছেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিং চ নাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে—কঠ, ১।১২

'স্বর্গলোকে ভয়ের প্রচার নাই, জরার প্রসার নাই, যমের অধিকার নাই। স্বর্গলোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া, শোকের অতীত হইয়া, (জীব) আমোদে বিহরণ করে।'

স্বর্গ দেবস্থান (তিব্বতীর দেবচান—Devachan)

নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
য প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৬।৫

সুকৃতকারীরা স্বর্গবাসী জ্যোতির্ম্ময় পিতৃ ও দেবগণের সহিত 'স্বধা-মাদং মদন্তি'—

অথা পিতৄন্ সুবিদত্রা উপেহি
উপেহি যমেন যে স্বধামাদং মদংতি—ঋগবেদ, ১০।১৪।১০
যূয়ম অগ্নে ! শন্তমাভি স্তনূভিরীজানমভি লোক স্বর্গম্ ।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ, যত্র দেবৈঃ স্বধ মাদং মদন্তি ॥
—অথর্ব্ববেদ, ১৮।৪।১০

ত্বং সোম ! প্রচিকিতো মনীষা, ত্বং রজিষ্ঠম্ অনুনেষি পংথাং ।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইংদো ! দেবেষু রত্নম্ অভজংত ধীরাঃ ॥
—ঋগ্‌বেদ, ১।৯১।১

'হে সোম ! তুমি মনীষা দ্বারা বিদিত হইয়া আমাদিগকে ঋজুতম পথে চালনা কর। হে ইন্দু ! তোমার চালনে আমাদের ধীর পিতৃগণ দেবতাদিগের মধ্যে রত্ন (সমৃদ্ধি) লাভ করিয়াছেন।'

এই যে যজমান যজ্ঞজনিত 'অপূর্ব্ব' দ্বারা স্বর্গলোকে নীত হইয়া, দেবতাদিগের সহিত স্বর্গের সমৃদ্ধি ভোগ করেন (দেবেষু রত্নম্ অভজন্ত ধীরাঃ), ইহাকে দেবতাদিগের সহিত 'স-লোকতা' বলা যাইতে পারে। স-লোকতা অর্থে সমান লোক প্রাপ্তি। কিন্তু ইহাই স্বর্গের চরম নহে। সলোকতার উপরে দেবতার সহিত সরূপতা, তাহারও উপর দেবতার সহিত সাযুজ্য।

অসৌ বাব আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমম্—আদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি
—কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫।১।৮।৬

'ঐ আদিত্যই উত্তম জ্যোতিঃ—আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।'

অমৃতোহৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ এতি, আদিত্যস্য সাযুজ্যম্
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১।১১

স হ হংসো হিরণ্ময়ো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায়—আদিত্যস্য সাযুজ্যম্
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।৯।১১

'সেই জীব হিরণ্ময় হইয়া স্বর্গলোকে আসিল—সূর্য্যের 'সাযুজ্য' লাভ করিল।'

স যদ্ বৈশ্বদেবেন যজতে, অগ্নিরেব তর্হি ভবতি, অগ্নেরেব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যদ্ বরুণপ্রঘাসৈর্যজতে বরুণ এব তর্হি ভবতি বরুণস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যৎ সাকমেধৈর্যজতে ইন্দ্র এব তর্হি ভবতি ইন্দ্রস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি—শতপথ, ২।৬।৪।৮

'তিনি যদি বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি অগ্নি হন এবং অগ্নির সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি বরুণ-প্রঘাস অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি বরুণ হন এবং বরুণের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি সাকমেধ

অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি ইন্দ্র হন এবং ইন্দ্রের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।'

অতএব স্বর্গভোগেরও ইতরবিশেষ, তারতম্য আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যও একস্থলে কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন—(ইহাই দেব-সরূপতা)—

যে কর্ম্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অন্যত্র বৃহদারণ্যক যে বলিয়াছেন—দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহ, ৪।১।২—ইহা দেবসরূপতা নহে, দেবসাযুজ্য।

ঐ যে 'অপ্যয়', দেবতার সহিত একীভূত হওয়া—উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহাকেই 'সাযুজ্য' বলা হইয়াছে। ইহার ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেবলোকে স্থিতি ও দেবতার মহনীয় ঐশ্বর্য্যভোগ ঘটিতে পারে। বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিরাছেন—

যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি * * * তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে। স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ—৫।১০।১

'(সুকৃতকারী) পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করতঃ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন। তিনি সেই লোকে উপনীত হন—যে লোক অশোক-অহিম (শীত-উষ্ণের অতীত)। সে লোকে শাশ্বতী সমা (সুদীর্ঘ কাল) বসতি করেন।' (অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে গীতার বাক্য স্মরণ হইবে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।)

পরলোক ও পুনঃমৃত্যু

কিন্তু এ বসতি ত চিরস্থায়ী নহে। সুকৃতের ফলে স্বর্গে স্থিতি কত দিন ঘটে? শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ, অযুত বর্ষ, লক্ষ বর্ষ, কোটি বর্ষ—আর কত? কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় এ স্থিতি অত্যল্প নহে কি?

ঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, পরলোকে কাল আমাদের সুকৃতের আয়ুঃ হরণ করে—

স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি, অহোরাত্রৈর্বা ইদং সযুগ্ভিঃ ক্রিয়তে
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।২

'(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে—কিন্তু অহোরাত্রি তাহার সুকৃত ভক্ষণ করে।'

এরূপে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসীর পতন হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা, ৯।২১

মুণ্ডক-উপনিষদেরও ঐ কথা—

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে—১।২।৯

এই চ্যুতি বা স্বর্গ হইতে পতন, পুণ্যক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে হনুভূয়
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।—মুণ্ডক ১।২।১০

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে, জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে।'

ইহাই লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা * * পুনর্নিবর্ত্তন্তে'—৫।১০

'সম্পাত (পতন পর্যান্ত), স্বর্গে বসতি করিয়া (জীব) আবার ফিরিয়া আইসে।'

এই কারণেই নচিকেতাঃ যমের নিকট বর চাহিয়াছিলেন—'ইষ্টাপূর্ত্তয়োঃ অক্ষিতিঃ' (imperishableness) (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।১১।৮)। কিন্তু এ বর ত দিবার নয়—এ যে অসম্ভব প্রার্থনা! তাই কঠ-উপনিষদে যমের উত্তর শুনিতে পাই—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ—কঠ, ২।১০

'শেবধি' (পুণ্যফল) কখন নিত্য হয় না—অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্য) ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?'

নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—নশ্বর দ্বারা অনশ্বরের অর্জ্জন অসম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি বর্ণন করিয়া এবং তাহার নবতর কল্যাণতর রূপের উল্লেখ করিয়া ঐ কথাই বলিয়াছেন—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে-কৃত কর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।'

এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায়—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে প্রচ্যুত হইয়া (পরলোকে কর্ম্মভোগান্তে) বিলোম গতিতে ফিরিয়া আইসে 'প্রাণায়'—নূতন প্রাণলাভ করিবার জন্য।'

এইরূপে আবার প্রাণ, আবার পরলোক—পুনর্ব্বার প্রাণ, পুনর্ব্বার পরলোক—এইরূপে 'গতাগতি পুনঃপুনঃ'—ইতি নু কাময়মানঃ (বৃহ, ৪।৪।৬), যত দিন না কামনার নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়, তন্‌হার নির্ব্বাণ হয়।

পরলোক হইতে এই অবশ্যম্ভাবী পতনকে বৈদিক ঋষিরা 'পুনর্ম্মৃত্যু' বলিতেন। ইহলোকে মৃত্যুর পর পরলোক—আবার পরলোক হইতে চ্যুতির পর ইহলোক—অতএব ঐ চ্যুতির সার্থক নাম 'পুনর্ম্মৃত্যু (Death over

again)। আর এই মৃত্যু একবার নয়, তুইবার নয়—পুনঃপুনঃ। সেইজন্য ইহাকে 'আবৃত্তি' (Repetition) বলে।

তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫
ইমং মানবম্ আবর্ত্তম্ ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫

অমৃতের পুত্রের অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা

ঋগ্বেদে মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলা হইয়াছে—শৃণন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমরা প্রত্যেক নরনারী সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষে'র সন্তান। সেইজন্য মর্ত্ত্য মানুষ হইলেও আমাদের প্রাণে প্রতিক্ষণ ব্রহ্মক্ষুধা (পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Hunger for the Absolute বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন) সন্ধুক্ষিত হইতেছে। এবং যেহেতু আমরা অমৃতের পুত্র (Heirs of Immortality), সেইজন্য 'অমৃতত্ব'ই আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষার বস্তু।* চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীব তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতে স্বস্তি বোধ করে না। সেই জন্য তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—বৃহ, ১।৩।২৮

তাই যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী মানবের প্রতিভূ হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—বৃহ, ৪।৫।৪

মানবের এই অতৃপ্য আকাঙ্ক্ষাকে ঋগ্বেদের ঋষি সেই অতীত যুগে স্থায়ী আকার দান করিয়াছেন ঃ—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান! অমৃতে লোকে অক্ষিত॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূ যহ্বতীরাপঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদ্রঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥—ঋগ্‌বেদ, ৯।১১৩।৭-১১

*'To conquer death'—this question has been the great question of mankind from its first beginnings, and will remain so, as long as there are men.—The Doctrine of the Buddha, p. 4.

হে সোম! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ—যে জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্—সেই অমৃত অক্ষিত লোকে আমাকে উন্নীত কর!

যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যে লোকে স্বর্গের পুণ্যতম সীমা, যে লোকে অমৃত বারি ক্ষরিত হয়, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!

যে লোকে যথাকাম (অবাধ) গতি, যে তৃতীয় স্বর্গে ত্রিধাম বিস্তীর্ণ, যেখানকার ভুবন জ্যোতিষ্মন্ত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!

যে লোকে কাম নিকাম, যে লোক সূর্য্যের পরপারে, যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!

যে লোকে আনন্দ ও মোদ, প্রমোদ ও আমোদের স্থিতি, যেখানে কামনার কামও স্তিমিত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!'

অতএব পুনর্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে অমৃতের পুত্র বরণ করিবে কিরূপে? যে চায় অমৃতত্ব (Not-dying-anymore-ness)—এই পুনর্মৃত্যুতে (এই Dying-over-again-এ) সে তুষ্ট হইবে কেন? সেই জন্য দেখা যায় উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ব্রাহ্মণ'যুগেও পুনর্মৃত্যু-বারণের বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল 'আপ্নোতি অমৃতত্বম্ অক্ষিতিং স্বর্গে লোকে' (কৌষী, ৩।২)—স্বর্গলোকে 'অক্ষিতি,' ক্ষয়রহিত অমৃতত্ব অর্জ্জন করা।

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি যোগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনম্ এবং বেদ
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৬

'যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং যিনি ইহাকে ঐরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

অতি হবৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, য এবম্ এতাম্ অগ্নিহোত্রে মৃত্যোরতিমুক্তিং বেদ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৩।৩।৯

'যিনি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিমুক্তিকে অবগত হন, তিনি পুনর্মৃত্যু হইতে অতিমুক্ত হন।'

অন্তরেণো হবা এতং অশনায়া চ পুনর্মৃত্যুশ্চ। অপ অশনায়াং চ পুনর্মৃত্যুং চ জয়ন্তি যে বৈষুবতম্ অহঃ উপযন্তি—শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ, ২৫।১

'যিনি বিষুবৎ দিন (the day of the equinox) চরণ করেন তিনি ক্ষুধাকে জয় করেন, পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁহাকে ক্ষুধা ও পুনর্মৃত্যু স্পর্শ করে না।'

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি, সর্ব্বম্ আয়ুরেতি, য এবং বিদ্বান্ এতয়া ইষ্ট্যা যজতে
—শতপথ, ১১।৪।৩।২০

'যিনি এইরূপ জানিয়া ঐ ইষ্টি দ্বারা যজন করেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, সর্ব্ব আয়ুঃ লাভ করেন।'

তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ। অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ—বৃহ, ৩।৩।২

'যিনি বায়ুই ব্যষ্টি, বায়ুই সমষ্টি—এইরূপ জানেন তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

আপেক্ষিক অমৃতত্ব

কেহ কেহ আশা করিতেন, দেবতাদিগের অনুগ্রহে বা মধ্যস্থতায় অমৃতত্বের অধিকারী হইবেন।

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজংতে
দক্ষিণাবংতঃ প্রতিরংত আয়ুঃ—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৫।৬

'দক্ষিণাবন্তের অমৃতত্ব লাভ হয়, দক্ষিণাবন্ত আয়ুঃ উত্তরণ করেন।'

ত্বং তম্ অগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্ত্যং দধাসি—ঋগ্‌বেদ, ১।৩১।৭

'হে অগ্নি! তুমি মর্ত্ত্য মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কর।'

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং * *
উতো অস্মান্ অমৃতত্বে দধাতন।—ঋগ্‌বেদ, ৫।৫৫।৪

'হে মরুদ্‌গণ! তোমাদের মহনীয় মহিমা! আমাদিগকে অমৃতত্বে নিধান কর।'

'হে মিত্রাবরুণ!—বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে (ঋগ্‌বেদ, ৫।৬৩।২)—তোমাদের ধন বর্ষণ কর—যেন আমরা অমৃতত্বের ভাগী হইতে পারি।'

অপরে মনে করিতেন সোম-যাগ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃতত্ব অর্জ্জন করিবেন। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে—কঠ, ১।১৩। তাঁহারা বলিতেন—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্।

'সোম পান করিয়াছি, জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, দেবতাদিগকে জানিয়াছি—আর ভয় কি? আমরা অমর হইলাম।'

বৃথা আশা! এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক (relative) মাত্র। ইহার বয়ঃক্রম বড় জোর একশত (দেব-) বৎসর!

সোমযাজী শতে শতে সংবৎসরেষু, অগ্নিচিৎ কামম্ অশ্নাতি, কামং ন। তদ্ হৈতৎ যাবৎ শতং সংবৎসরাঃ তাবদ্ অমৃতম্ অনন্তম্ অপর্য্যন্তম্—শতপথ, ১০।১।৫।৪

'সোমযাজী শত বৎসরে একবার, অগ্নিচয়নকারী ইচ্ছামত ভোজন করেন কিংবা না করেন। এই যে শত সংবৎসর, ইহাই অমৃত—অনন্ত ও অনবধি (unending and everlasting)।

গীতা এই সোমযাজীর স্বর্গভোগ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে—গীতা, ৯।২০

'সোমপান দ্বারা পূতপাপ হইয়া সোমযাজী, বৈদিক বিধিমার্গে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে'।

স্বর্গে যায়ও বটে এবং প্রচুর স্বর্গভোগও করে বটে—

তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।—গীতা, ৯।২০

কিন্তু—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি—গীতা, ৯।২১

'সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্বর্গবাসীর স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'

অপরে দেবতার সহিত সারূপ্য ও সাযুজ্য দ্বারা অমরতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন।

য এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিনুতে, ভূয়ান্ এব ভবতি, অভীমান্ লোকান্ জয়তি। বিদুরেনং দেবাঃ। অথো এতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ৫।৭।৫।৭

'যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নি চয়ন করেন, তিনি ভূয়ান্ হয়েন, অভীম লোক জয় কবেন। দেবতারা তাঁহাকে জানেন। তিনি ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।'

ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাম্ আপ্নোতি। এতাসাম্ এব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমানলোকতাম্ আপ্নোতি য এতম্ অগ্নিং চিনুতে---তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৫।১২

'ব্রহ্মার সাযুজ্য, সালোক্য প্রাপ্ত হন। এই সকল দেবতার সাযুজ্য, সার্ষ্টিতা (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য প্রাপ্ত হন—যিনি এই অগ্নি চয়ন করেন।'

ছান্দোগ্য-উপনিষদেও ইঁহাদিগের উল্লেখ আছে—

এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—২।২০।২

বৃহদারণ্যকও ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্য আত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি—বৃহ, ১।২।৭

'যিনি এইরূপে অশ্বমেধের প্রতীক ভাবনা করেন, তিনি দেবতাদিগের অন্যতম হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, মৃত্যু তাঁহার আত্মা হয়।'

এই যে মৃত্যুজয়—ইহাও আপেক্ষিক এ অমৃতত্বও প্রকৃত অমৃতত্ব নহে। ধরুন, সাধক বিবিধ বিচিত্র সাধন দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোকেরও উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিলেন—এইবার কি আকাঙ্ক্ষার নিধি অমৃতত্ব তাঁহার করতলগত হইল ? আর কি তাঁহাকে কোনো কালে পুনর্মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে না ? এইখানে গীতা ঐ উচ্চ দুরাশার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—গীতা বলিলেন—

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন !—৮।১৬

'ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন হয়—নিম্নতর লোকের কা 'কথা ?'* কঠ-উপনিষদে নচিকেতাও এই কথাই বলিয়াছেন—'যম !' তুমি আমাকে 'চিরজীবিকা' (অমৃতত্ব) দিবে বলিলে।

* বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated.

কিন্তু তোমার সহিত সাযুজ্যে—জীবিষ্যামি, যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্—১।২৭। তুমি নিজেই যখন চিরজীবী নহ—আমাকে চিরজীবিকা দিবে কিরূপে?'

নচিকেতাঃ যমের উদ্দেশ্যে যাহা বলিলেন, সমস্ত দেবতাকে—ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, এমন কি যিনি, ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব (মুণ্ডক ১।১।১) দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান,—সেই ব্রহ্মাকেও ঐ কথা বলা যায়।

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ

—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ইন্দ্র দিবাকর রুদ্র ব্রহ্মা—কেহই ত চিরস্থায়ী নহেন। কালের করাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংস-মুখে পড়িতে হইবে!

সত্য বটে, দেবতাদিগকে সাধারণতঃ 'অমর' বলা হয়—'অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ'—সত্য বটে, ঋগ্বেদের ঋষি সূর্য্যদেবের আকাশগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আ সত্যেন রজসা বর্ত্তমানো
নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্ত্যং চ—

'সূর্য্য অমৃতকে ও মর্ত্ত্যকে (দেবতাকে ও মনুষ্যকে) যথোচিত নিবেশিত করিয়া আকাশে বিবর্ত্তিত হইতেছেন'

—কিন্তু এ 'অমৃতত্ব' আপেক্ষিক মাত্র। মনুষ্যের তুলনায় দেবতারা দীর্ঘজীবী বটেন কিন্তু তাঁহারা চিরজীবী নহেন। যেহেতু,

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

'কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে। কালের গতি কে অতিক্রম করিবে?' কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।

সেইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর পিতৃলোকের উপযোগী, দেব-লোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী নবতর কল্যাণতর রূপের প্রসঙ্গ করিয়া—অবসানে 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' (বৃহ, ৪।৪।৬) ভোগ দ্বারা কর্ম্মের অন্ত হইলে ঐ সুকৃতকারীর পতন বা চ্যুতির কথা শুনাইয়াছেন। অতএব অমৃতত্বে উপনীত হইবার পন্থা দেবতা ধরিয়া নয়, দেবতা হইয়াও নয়—ঐ সারূপ্য ও সাযুজ্য অমৃতত্বের পথ নহে, বিপথ—অমৃতত্বকামীর পক্ষে এ পথে বিচরণ পণ্ডশ্রম মাত্র।

অমৃতত্বের অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম-সাযুজ্য

আচ্ছা, বিনশ্বর দেবতার ভরসা ভাসাইয়া দিয়া,—যিনি অবিনশ্বর, যিনি অজর অমর অক্ষর, যিনি অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়, যদি সেই অজিত অক্ষিত

অমিত ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য করা যায় ? যদি জীব কোন মতে সেই চিরন্তন সনাতন পুরাতনে প্রবেশ করিতে পারে, যদি সে কোনো দিন ব্রহ্ম-সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিতে পারে—এক কথায় যদি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে পারে (সাযুজ্য-শব্দের অর্থই তাই)—তবেই ত সে শাশ্বত স্থায়ী সনাতন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে- সেই অমৃতত্ব, যে অমৃতত্বে ক্ষয়-ব্যয় নাই, উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই—যে অমৃতত্বের অন্তিকে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু কোনদিনই অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব অমৃতত্ব-অর্জ্জনের, পুনর্মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বারণের ইহাই আর্য্য পন্থা—অদ্বিতীয় অমোঘ পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

যাজ্ঞবল্ক্য এই পন্থারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অথ অকাময়মানো যঃ অকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'যিনি কামনারহিত, যিনি অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া 'ব্রহ্মাপ্যয়' প্রাপ্ত হন।'

এই যে ব্রহ্মে অপ্যয় (একীভাব), ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহার কাম (তন্‌হা) নিঃশেষে নির্ধূত হইয়াছে, তাঁহার আর উৎক্রান্তি (পরলোক ও পুনর্মৃত্যু) ঘটিবে কেন ? সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

'যিনি ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাবে সুস্থিত হইয়াছেন, কিসের ইচ্ছায়, কোন্ কামনায় তিনি আবার শরীরে সন্তপ্ত হইবেন ?'

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'-এইভাবে জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই জীব অমৃতত্ব লাভ করিবে।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ।—বৃহ, ৪।৪।১৭

'তাঁহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিলে, সেই অ-মৃত ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে, অমৃত হইতে পারিব।'

এই জ্ঞান ইহলোকে, শরীর-ধারণেই হইতে পারে। যাঁহার হয়, তিনিই অ-মৃত হন।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্ম স্তদ্ বয়ং ন চেদ্ অবেদী মহতী বিনষ্টিঃ ।
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥—বৃহ,৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে পারি। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃত হন। আর অপরে—যাহারা অ-জ্ঞ, তাহাদের মহতী বিনষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু) এবং (জন্মে জন্মে) দুঃখভোগ হয়।'

এই যে অমৃতত্ব (শপেন্‌হয়র যাহাকে Indestructibility *without* continued existence বলিয়াছেন, জর্জ্জ গ্রিম যাহার নাম দিয়াছেন—the great riddle of deathless and tranquil Eternity)* নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য, এই অমৃতত্বের গম্ভীর ঝঙ্কারে মুখরিত।

স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ * * * গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি
—মুণ্ডক, ৩৷২৷৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি গুহাগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।'

যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ—শ্বেত, ৫৷৬

'দেবতা বা ঋষি—পূর্ব্বতন যাঁহারাই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।'

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি —কঠ, ২৷৬, 'যাঁহারা তাঁহাকেজানেন, তাঁহারা অমৃত হন।'

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২৷৫

'যিনি 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', ভূতে ভূতে তাঁহার অনুধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি অমৃত হন।'

কারণ, তিনি 'প্রতিরোধ-বিদিত' (অগ্র্যা বুদ্ধির গম্য)—তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব।

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২৷৪

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩৷২৷৬

'ব্রহ্মলোকে উন্নীত জীব পরান্তকালে (কল্পের অবসানে) পরম-অমৃতত্ব লাভ করিয়া পরিমুক্ত হয়।'

শুধু পরলোকে কেন, ইহলোকেও যেই তাঁহাকে জানিবে, সেই অমৃতত্ব লাভ করিবে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—কঠ, ২৷৬

'যে কেহ মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিতে পারে, সেই অমৃত হয়—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।'

তাহার দেহান্ত সময়ে সে মূর্দ্ধণ্য সুষম্না মার্গে উৎক্রান্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।

তয়োর্দ্ধম্ আয়ন্ অমৃতত্বমেতি—কঠ, ২৷১৬

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ অমৃতত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না—হইতে পারে না।

---

*The Doctrine of the Buddha, p. 502.

স এষঃ অকামঃ সর্ব্বকামো ন হেতং কস্তচন কামঃ। তদেষ শ্লোকো ভবতি—

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি ॥

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভিঃ ন তপসা অনেবংবিদ্ অশ্নুতে,
এবংবিদাং হৈব স লোকঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'যিনি অকাম সর্ব্বকাম, তাঁহাকে কোনও কামনা স্পর্শ করে না। এ সম্পর্কে এই শ্লোক আছে—'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা-দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবস্তু যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না। যে 'এবংবিৎ' নহে, (যে অবিদ্বান্)—দক্ষিণা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা সে ঐ লোক (position) প্রাপ্ত হয় না—কারণ, সেই লোক এবংবিদেরই লোক।'

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'তাঁহাকে জানিলে, তবে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়—মুক্তির গত্যন্তর নাই—নাই।'

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে—কৈবল্য, ৯

'তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—বিমুক্তির অন্য পন্থা নাই।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব পাশৈঃ—শ্বেত, ১।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অদ্বিতীয় হেতু।'

সেই জন্য এ বিজ্ঞানকেই ঋষিরা বিদ্যা বলিতেন—আর সমস্ত জ্ঞান অবিদ্যা।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা অমৃতং হি বিদ্যা—শ্বেত, ৫।১

কারণ, তাহাই বিদ্যা—যাহা-দ্বারা অমৃতত্ব অর্জ্জন করা যায়—বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে (ঈশ, ১১)।* সেইজন্য তাঁহারা বলিতেন—

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥—মুণ্ড, ২।২।৫

'সেই পরমাত্মা (ব্রহ্মবস্তুকেই) একমাত্র জানিবার চেষ্টা কর—তিনিই অমৃতের সেতু। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর।' কারণ, উহা বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ (is mere verbiage)।

* পাশ্চাত্যদেশেও কোন কোন মনীষী Head-learning ও Soul-wisdom-এর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ Wisdom-ই প্রকৃত প্রজ্ঞা—ইহাই অমৃতত্বের দ্বার—'The wisdom that is life eternal.'

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পর ?

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের অনন্তর কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ, ৪।৪।৬)—'ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মে অপ্যয়—অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ'। সমস্ত উপনিষদ্ এ কথার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত।*

অথ যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন।'

ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষীতকী, ১।৪

'ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।'

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'তখন বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয় পরমাত্মায় একীভূত হয়।'

এই যে একীভাব, ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মী-'ভবন'—ব্রহ্মের সহিত কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ।

অশব্দে নিধনম্ এতি—অথ হৈষাগতিঃ এতদ্ অমৃতম্ এতৎ সাযুজ্যত্বং নির্বৃতত্বম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২২

'সেই অশব্দে (পরব্রহ্মে) নিধন (লয়) প্রাপ্ত হন—নদ্য ইব সমুদ্রে লয়ম্ এতি—ইহাই পরমাগতি, ইহাই অমৃতত্ব, সাযুজ্যত্ব, নির্বৃতত্ব (Summum bonum)।'

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে।'

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ যতয়ো বিশন্তি—কৈবল্য, ৩

'সেই গুহাহিত ব্রহ্ম, যিনি পরব্যোমে জ্যোতিষ্মান্, যতিরা তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'

সেই গীতার কথা—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ (১৮।৫৫)—ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ বিজ্ঞাত হইয়া অনন্তর ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ।

দেহধারণে যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—বৃহ, ৪।৪।৭

---

* যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হয়—সে আভাস মাত্র। ষড়্ বৈ ব্রহ্মণো দ্বারঃ—অগ্নির্বায়ুরাপঃ চন্দ্রমা বিদ্যুৎ আদিত্যঃ। (ছয়টি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির দ্বার—অগ্নি, বায়ু, অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্য)। স য উপদগ্ধেন হবিষা যজতে * * সোঽগ্নিনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। * * অথ যো বিপতিতেন হবিষা যজতে * * স বায়ুনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ইত্যাদি—শতপথ, ১১।৪।৪।১-৭। যিনি উপদগ্ধ হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি অগ্নিরূপ ব্রহ্মের দ্বার দ্বারা উপসন্ন হইয়া ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয় করেন। যিনি বিপতিত হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি বায়ুরূপ ব্রহ্মের দ্বার দ্বারা উপসন্ন হইয়া ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয় করেন। (এইরূপ অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্যরূপ ব্রহ্ম-দ্বার দ্বারা ব্রহ্মের সাযুজ্য ও সালোক্য জয়ের কথা বলা হইয়াছে।)

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই চরিতার্থ পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩)। তাঁহার মতে তিনিই 'ব্রাহ্মণ' (বৃহ, ৪।৪।২৩)। গীতা ঐ জীবন্মুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥—গীতা, ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সমত্বে সুস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসৃতি জয় করিয়াছেন—কারণ, নির্দোষ-সম যে ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি-লাভ হইয়াছে।'

প্রারব্ধের সংস্কার (momentum)-বশে কতকদিন তাঁহাদের দেহ-ব্যাপার সচল থাকিতে পারে—চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ—তার পর দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য বা একীভাব।*

এই যে ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহিত একীভাব—মুক্ত পুরুষের পক্ষে যখন ইহার উপলব্ধি হয়—তখন তিনি বিশ্ব যে কেবল ব্রহ্মময় দেখেন, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম (ছা, ৩।১৪।১)—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীতা ৭।১৯)—তাহা নহে, তাঁহার নিকট নানাত্ব নিঃশেষে নিবৃত্ত হয় (Plurality is wholly negated); তখন শুধু সুস্থিত থাকেন, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ
—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম
—মুণ্ডক, ২।২।১১

'ব্রহ্মই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই নানাত্ব-নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈবানু দ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

'ঐ অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ হয়—(মুক্ত পুরুষ) মনঃ দ্বারা তাঁহাকেই দর্শন করেন'।

কিরূপ দর্শন করেন ?

যদেবেহ তদ্ অমুত্র, যদ্ অমুত্র তদ্ অন্বিহ—কঠ, ৪।১০

'দেখেন যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে'—তিনি সর্ব্বময়, তিনিই সর্ব্ব—তিনি ভিন্ন কিছু নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—তিনি প্রপঞ্চোপশম (effacing the entire universe)—তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত।

অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্—মাণ্ডুক্য, ৭।

---

*Until this six-senses-machine has broken up at the death of the saint, in the same way that the potter's wheel still for a time keeps on turning, after the force that had set it in motion has ceased to operate. —Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 377.

যতদিন তিনি নানাত্ব দেখিতেন—Plurality-র আয়ত্তে ছিলেন, ততদিন তাঁহার শোক মোহ ছিল, তাঁহার ভয় ভাবনা ছিল—ততদিন তিনি মৃত্যুর অধীন ছিলেন,

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯

এখন ? একধৈবানু দ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০)—এখন তিনি একত্বের উপলব্ধি করিয়াছেন, বুঝিয়াছেন—'All plurality is *mere* appearance'; জানিয়াছেন যে স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্ত্তিত হইয়া যেমন অলাতচক্র (fiery circle) রচনা করে (অলাতচক্রম্ ইব স্ফুরন্তম্ আদিত্যবর্ণম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২৪), এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব সেইরূপই মায়ার বিবর্ত্ত।—এখন তিনি সেই অমেয় অজ্ঞেয় অজেয়, সেই অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়কে আত্মস্থ করিয়াছেন--এখনও তাঁহার শোক-মোহ ?

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—ঈশ, ৭

এখন তিনি অতি-মৃত্যু জয় করিয়াছেন—তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি—এখন তিনি অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছেন—ব্রহ্মণি স আত্মা অমৃতত্বায় (মহানার, ১৫।১০)—এখন ব্রহ্মে সুস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মে সুস্থিত হওয়াই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭২

'ইহারই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। এ স্থিতিতে স্থিত হইলে মোহের অপগম হয়। যিনি অন্তবেলায় (দেহান্তকালে) ঐ স্থিতিতে সুস্থিত হয়েন, তিনি 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' প্রাপ্ত হন।'

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য উহার উপদেশ করিয়া জনককে বলিলেন—

অভয়ং বৈ প্রাপ্তোসি জনক ! ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।২।৪

'হে জনক ! আপনি 'অভয়' প্রাপ্ত হইলেন।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ। কেন ইহাকে 'মোক্ষ' বলা হয় ? মোক্ষের স্বরূপ কি ? মোক্ষ-দশাই বা কিরূপ ? মোক্ষের সহিত বুদ্ধদেব যাহাকে 'নির্ব্বাণ' বলিতেন--তাহারই বা সম্বন্ধ কি—বারান্তরে ঐ সকল কথার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নাই বা হোল চেরীফুল

(রোমানফ হইতে)

(১)

বসন্তের এমন ঘটা আর কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু ভারুচা, বোন আমার, আমার মনে তবু শান্তি নেই। আমি নিরানন্দ, অবসন্ন, যেন কোন মাঝারিগোছের কাজ কোরে ফেলেছি।

আমার হষ্টেলের জানলায় একটা বোতল রয়েছে। তার গলাটা ভাঙা, আর সেখানে বসানো একটা ছেঁড়া শুকনো বুনো চেরী-র ছোট ডাল। কাল রাত্রে ওটাকে এনেছি।

ঐ বোতলটার দিকে চাইলেই কি জানি কেন আমার কান্না আসে।

না, সাহস কোরে তোকে আজ সব বল্‌ব। সম্প্রতি অন্য বিভাগের একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার ভাষায় বল্‌তে গেলে, কোন রকম ভাবালুতার বালাই আমার নেই। ভ্রষ্ট কৌমার্য্যের অনুশোচনা আমার কাজ নয়; প্রথম "পতন" নিয়ে বিবেক-দংশন আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু কাল্‌কের ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা অস্বস্তিকর; সেটা স্পষ্ট নয়, গোলমেলে, তবু সর্ব্বদাই লেগে আছে।

কেমন কোরে কি ঘট্‌ল তোকে বল্‌ছি পরে, একেবারে "বেহায়ার" মত। তার আগে তোকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা কোরতে চাই।

পল্‌-এর সঙ্গে তোর যখন প্রথম মিলন হোলো তোর কি তখন মনে হয় নি যে তোদের প্রথম প্রণয়ের দিনটি উৎসবের দিন হোয়ে উঠুক, কোন-না-কোন রকমে সকল দিনের থেকে আলাদা?

ধর, তোর জীবনের সেই মধু-উৎসবের দিনে কাদামাখা জুতো প'রে বাইরে বেরুতে, কিংবা ছেঁড়া বা ময়লা ব্লাউজ গায়ে দিতে তোর কি অপমান বোধ হোত?

একথা জিজ্ঞাসা করার কারণ আমার সমবয়সী আলাপীরা ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখে। দেখ্‌ছি আমি যা অনুভব করি, সেইমত ভাবার ও কাজ করার সাহস আমার নেই।

যাদের সঙ্গে থাক্‌তে হয় তাদের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে যেন খানিকটা জোর লাগে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যৌবনসুলভ তাচ্ছিল্যই আমাদের মধ্যে প্রচলিত মনোভাব। একটু সৌখীনতা, পোষাকের সামান্য

বাহার বা ঘরে পরিচ্ছন্নতা—সব বিষয়েই তাই। আমাদের হষ্টেলটা ময়লা, নোংরা, বিশৃঙ্খল। বিছানাগুলো লণ্ড-ভণ্ড। জানলার খাঁজে খাঁজে পোড়া সিগরেট; কামরার হালকা পার্টিশনগুলো ছেঁড়া প্ল্যাকার্ড ও বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাওয়া। এমন একজনও নেই যে ঘরটাকে একটু সাজাতে চায়। একটা গুজব রটেছে আমরা শীঘ্রই অন্য বাড়ীতে বদ্‌লি হব। তাতে মেয়েদের অগোছ আরো বেড়ে গেছে। অনেকে ইচ্ছে কোরেই জায়গাটাকে নষ্ট কোরছে।

ঠিক মনে হয়, আমরা লজ্জিত হোয়ে পড়ব যদি কারো কাছে ধরা পড়ে যাই যে পরিষ্কার ও সুন্দর ঘর, তাতে খোলা স্বাস্থ্যকর হাওয়া, এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই। একথা সত্য নয় যে আমাদের হাতে ভয়ানক কাজ ও সময়ের অত্যন্ত অভাব। আসল কথা হচ্ছে এই যে আমাদের ধারণা, রূপ-সাধনা-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুকেই ঘৃণা কোরতে আমরা বাধ্য।

এ-তে আরো আশ্চর্য্য হোতে হয়। কারণ আমরা সবাই জানি আমাদের নতুন শাসনকর্ত্তারা,—আমাদের দারিদ্র্য-পীড়িত শ্রমজীবি শাসনতন্ত্র—কত অর্থ ও শক্তি খরচ করে সুধু সব জিনিসকে সুন্দর করার জন্যই। সহরময় ফুলের বাগান লাগিয়েছে, ধনিক ও ভদ্রলোকের পুরানো শাসনতন্ত্রে যার জুড়ি মেলে না, যদিও শোভন সুন্দর জীবন সম্বন্ধে তাদের দম্ভের অন্ত ছিল না। আজ সমস্ত মস্কো সহর ষ্টাকোর ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল; আর আমাদের ইউনিভারসিটি—যেটা একশো বছর ধ'রে ঠিক ধসে-পড়া পুলিশের থানার মত দেখতে ছিল—সেটা এখন মস্কো-র সুন্দরতম অট্টালিকায় পরিণত হোয়েছে।

এটা যে এত সুন্দর, তাতে আমরা অজ্ঞাতসারে গর্ব্ব অনুভব করি। তা সত্ত্বেও, আমাদের নতুন শাসনতন্ত্রের তদারকে পরিষ্কার করা এই দেয়াল-গুলির ভিতরে আমাদের জীবন কদর্য্যতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিশাসিত। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এমনভাবে চলে যেন সে ভীত, পাছে কেউ তাকে ভদ্রতা বা সৌজন্যের দোষ দেয়। তারা ইচ্ছে কোরে অসভ্য ও অভব্য কথার ধরণ অভ্যাস করে ও পরস্পরের পিঠে চাপড় মেরে আলাপ করে। যৌন সম্বন্ধের কথা কইতে গেলেই তারা সব চেয়ে অশ্লীল ভাষা, সব চেয়ে ইতর বুলি লাগায়। বাছাবাছা জঘন্য অভিধাগুলিও আমাদের ভাষায় পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে। এতে যখন কোন কোন মেয়ে—সব নয় অল্প কয়েকজন—ব্যথা পায় তখন অবস্থা হয় আরো খারাপ। বাকী সকলে চেষ্টা করে তাকে "মাতৃভাষায়" অভ্যস্ত কোরতে।

বিশ্ব-তাচ্ছিল্য, স্থূল লাম্পট্য, সৌকুমার্য্যের পদদলন, এইগুলোই সুধু

টিঁকে থাক্‌তে পারে। এর কারণ হয়ত এই যে আমরা সবাই গরীবের দল, পোষাকের খরচা না জোটায় পরিচ্ছদমাত্রকেই ঘৃণা করি, অন্ততঃ তাই ভান করি। কিংবা হয়ত আমরা নিজেদের ভাবি বিদ্রোহের সৈন্যদল যাদের কাছে ভাববিলাসিতা ও খুঁতখুঁতে-পনা স্বভাবতঃই কোন স্থান পেতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি সত্যিই বিদ্রোহের সৈন্যদল হই, তাহলে ত আমাদের উচিত আমাদের প্রতিষ্ঠিত শক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া ও জীবনে সৌন্দর্য্য সাধনা করা,—সুধু সৌন্দর্য্যের খাতিরে নয়, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের খাতিরেও। এইজন্য আমার মনে হয় এই সব অতিরঞ্জিত, বাড়াবাড়ি, ব্যার‍্যাকী ব্যবহার পরিহারের সঙ্কল্প করার সময় এসেছে।

কিন্তু জানিস, বেশীর ভাগই এ সব পছন্দ করে। সুধু ছেলেদের কথা নয়, মেয়েরাও করে। এতে তারা বেশী স্বাধীনতা পায় ও তাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের কোন দরকারই হয় না।

কিন্তু সুন্দর, পবিত্র ও স্বাস্থ্যকরের প্রতি এই অনাস্থা আমাদের অন্তরঙ্গ ব্যবহারে বেশী স্থূলতা এনে দিয়েছে। এর ফলে এসেছে জবরদস্তি, সদাচারের ও সূক্ষ্মভাবের অভাব, এবং বান্ধবী বা অন্য কোন মেয়ের প্রতি সামান্য যত্ন দেখানোয় ভয়।

এ সবের মূল হচ্ছে অলিখিত নীতিশাস্ত্র লঙ্ঘনের আশঙ্কা! তোদের ওখানে—তুই যেখানে পড়ছিস্—হালচাল আলাদা। আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয় কেন ইউনিভারসিটিতে এলাম। আমার মা ত গাঁয়ের ধাই; সে আমার কথা ভাবে সশ্রদ্ধ সম্মানের সঙ্গে, যেন আমি একটা উচ্চস্তরের লোক। আমি প্রায়ই নিজেকে এই প্রশ্ন করি যে, মা কি ভাববে যদি সে টের পায় আমরা কি কদর্য্যভাবে থাকি ও কি কুৎসিত ভাষা অভ্যাসবশে সর্ব্বদা ব্যবহার করি।

আমাদের কাছে প্রেমের কোন অস্তিত্ব নেই; আছে সুধু দৈহিক সঙ্গম। কাজেই প্রেমকে আমরা ঘৃণাভরে মনস্তত্বের রাজ্যে হাঁকিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকার অধিকার আমরা কেবল দেহতত্ত্বের দিক দিয়েই বুঝি।

মেয়েরা তাদের পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে বাস করে। তাদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কি মাসখানেকের মতন বেরিয়ে যাওয়া এমন কিছু গুরুতর কাণ্ড নয়,—অনেক সময় এলোমেলোভাবে এক আধ রাত্রের জন্যও। কেউ যদি প্রেমের মধ্যে দেহতত্ত্বের বাইরে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে তবে তাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

(২)

কে জানে ছেলেটা নিজেকে কি ভাবে? এমনি মামুলি ছেলে, উঁচু বুট পরা, গায়ে নীল জামা, গলায় বোতাম নেই। উস্‌কো-খুস্‌কো চুলের গোছা কপাল থেকে কেবলই হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া তার অভ্যাস।

তার চোখ দুটি আমাকে টানে। একা একা সে যখন করিডোর দিয়ে চলে, লক্ষ্য করা যায় তার চোখে কি গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তি।

কিন্তু যেম্‌নি দলের কোন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়, আমার মনে হয়, অমনি সে যেন অতিরিক্ত রকম হট্টগোলপ্রিয়, অসংযত ও অশিষ্ট হোয়ে ওঠে। মেয়েরা তার আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছে, সে সুন্দর বলে; ছেলেরা, সে চালাক বলে। এই ধরণের নেতৃত্বটুকু হারাবার ভয়ে সে কুণ্ঠিত।

তার মধ্যে আমি দুটি মানুষ দেখতে পেতাম। একটির ছিল অন্তরের প্রচুর শক্তি ও চিন্তার গভীরতা; অপরটি ছিল যেন চ্যাংড়া ছোকরা; যে প্রকৃতপক্ষে যতটা বদ্‌রসিক তার চেয়ে ঢের বেশী ভান কোরে ও চালবাজী দেখিয়ে লোককে বিরক্ত কোরে তোলে।

কাল সূর্য্যাস্তকালে আমরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, প্রথমবার। সহরের ওপর সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ছড়ানো; পথের গোলমাল কমে এসেছে। বাতাস ছিল তাজা, আর বাগান থেকে আস্‌ছিল ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।

—চল না আমার ঘরে, এখান থেকে বেশী দূর নয়,—সে বললে।

—না, আমি যাবো না।

—কেন? শিষ্টাচার?

—না, তা নয়, মোটেই সেজন্য নয়। আপাততঃ ঘরের বাইরে বেশ লাগ্‌ছে।

জেটির ধার দিয়ে হেঁটে একটা পুলের ওপর আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। একটি মেয়ে এল চেরীফুল বেচ্‌তে। আমি একটা ডাল কিনলুম। ভাঙানির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরতে হোল। একপাশে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে সে অল্প একটু ভ্রুভঙ্গি কোরলে।

—চেরীফুল নইলে কি চলে না?

—চলে, তবে না থাকার চাইতে থাকাই ভালো।

—আমি ত সর্ব্বদা চেরীফুল ছাড়াই চালাই; দেখেছি ত, শেষ পর্য্যন্ত মন্দ চলে না—এই বলে সে বিশ্রী রকমের হাস্‌তে লাগল।

পথে দুটি মেয়ে আমাদের এগিয়ে ছিল। একদল ছেলে তাদের

জ্বালাতন কোরছিল। যখন তারা নিজেদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ছেলেগুলো সশব্দে হেসে উঠ্‌ল, তাদের দিকে চেয়ে চীৎকার কোরে যা তা বল্‌তে লাগ্‌ল।

—মেয়ে তুটোকে চটিয়ে দিয়েছে দেখছি। চেরীফুল না নিয়ে কাছে গিয়েছিল কিনা, তাই ওরা ভয় পেয়েছে—আমার সঙ্গীটি বললে।

—চেরীফুলের ওপর আপনি চটা কেন?—আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম।

—কি জান, চেরীফুল নাও বা না নাও, শেষ পর্য্যন্ত একই দাঁড়ায় ……সত্য গোপন কোরে লাভ কি?

—এভাবে কথা কইছেন কখনও ভালোবাসেন নি বলে।

—তার কি প্রয়োজন?

—তাহলে মেয়েদের কাছে আপনি কি চান?

—আঃ, ছাড় তোমার ওই চীনে শিষ্টাচার। আমায় 'তুমি' বল, আপনি বোলোনা। মেয়েদের কাছে কি চাই? হ্যাঁ, মেয়েদের কাছে কিছু চাই বৈ কি, আর জোর কোরে বল্‌তে পারি সেটা বড় কম জিনিষ নয়।

—আমি আপনাকে তুমি বলব না। সকলেই তুমি বললে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না।

কতকগুলো লাইলাক-এর ঝোপ পেরিয়ে গেলাম। চেরী ফুলটা আমার জামায় পিন দিয়ে আট্‌কাবার জন্য আমায় একটু থাম্‌তে হোল। সে হঠাৎ এসে, আমার মাথা ঠেলে দিয়ে আমাকে চুম্বনের চেষ্টা কোরলে।

আমি তাকে ঠেলে পেছিয়ে দিলাম।

—চাওনা; বেশ, চেয়ো না—সে ধীরভাবে বল্‌লে।

—না, আমি চাই নে তুমি ত কাউকে ভালোবাস না, তাই তোমার এসে যায় না তুমি কাকে চুমো দিচ্ছ। আমি না হোয়ে আর কেউ হোলেও তুমি এমনি কোরেই তাকে চুমো খেতে চাইতে।

—ঠিক কথা। মেয়েরাও যাকে খুসী তাকে চুমো খায়, একজনেই আবদ্ধ থাকে না। সম্প্রতি আমাদের একটা ভোজ হোয়েছিল। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাগ্‌দত্তা তাকে যত জোরে চুমো খেয়েছিল, আমাকেও ঠিক ততজোরেই চুমো দিয়েছিল। আমি না হোয়ে আর কেউ কাছে থাক্‌লে, তাকেও ঠিক এই রকমই কোরত। অথচ এরা তুজনে প্রেমে প'ড়ে বিয়ে কোরতে যাচ্ছে রেজেষ্ট্রী অফিসে। এই রকমই হয়।

তার এই ধরণের কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা জ্বলে উঠল। আমি ভেবেছিলাম সে আমার প্রতি উদাসীন নয়। কতবার সে আমার দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে ফিরেছে, এমন কি যখন আমি অন্য মেয়েদের ভীড়ের মধ্যে

থেকেছি। আজ এই বসন্তের সুন্দর সন্ধ্যায় প্রাণ যখন স্নিগ্ধ শান্ত আলাপ চায়, তখন কেন সে তার স্থূল কামাতুর কথা দিয়ে তা' নষ্ট কোরে দিচ্ছে।

সে মুহূর্ত্তে আমি তাকে ঘৃণা কোরে ফেল্‌লাম। আমরা একটা বেঞ্চির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। একজন মহিলা তাতে বসেছিলেন, এক পায়ের ওপর আর এক পা চাপিয়ে। তাঁর পরনে সিল্কের মোজা। নিকট দিয়ে কেউ গেলেই তিনি চোখ তুলে চাইছিলেন।

আমার সঙ্গীটি তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে চাইল। মনে হোল যেন আমার গায়ে হুল বিঁধছে। ঠিক পরের বেঞ্চিটায় গিয়ে সে বল্‌লে—এখানটায় বসা যাক। উদ্দেশ্য সেখান থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে পারবে।

হঠাৎ এত বিচলিত হোয়ে পড়লাম যে ভয় হোল কেঁদে ফেলব। পাছে ভেঙ্গে পড়ি তাই বিদায় নিলাম এই বলে যে তার সঙ্গে আর আমি থাক্‌তে চাই না।

স্পষ্ট বোঝা গেল সে বিস্মিত হোয়েছে। জিজ্ঞাসা কোরল—আচ্ছা তুমি কি চাওনা যে আমি অকপট হই? সাজিয়ে গুজিয়ে মিথ্যে বল্‌লেই কি ভাল হোত?

—না সাজালে চলে এমন কিছুই তোমার নেই দেখে আমি দুঃখিত।

যেন প্রথমটা আমার কথা কিছু বুঝতে পারে নি এই ভাব দেখিয়ে সে বল্‌লে—"বেশ, এখন তুমি কি কোরতে চাও? আচ্ছা, আমিও তবে চল্‌লুম; গুড্ বাই।" সে আমার হাত ধরলে এক মুহূর্ত্তের জন্যে। "কিন্তু এটা বোকামি, নিছক বোকামি"—এই বলে আমার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে তার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

আমিও অবাক হোয়ে গেলাম। আমি ভাবিনি সে চলে যাবে।

বুলভার-এর একটা কোণে থেমে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। তেমনই মে মাসের এক রাত যখন মনে হয় চারপাশে জীবনের স্রোত, সুধু সেই রাত্রিটিরই জন্য, আর কখনও ফিরে আসার নয়। টুক্‌রো মেঘের মধ্যে চাঁদ আকাশের গায়ে স্থির হয়ে আছে, উষ্ণ মেঘময় হলুদ-রঙের কুয়াশায় মণ্ডিত হোয়ে। সুদূর সূর্য্যাস্তের শেষ আভাস অনেক বাড়ীর ছাদ ও ক্রেমলিন-এর চূড়ার আড়ালে মিলিয়ে আসছে। পথের দূর-দূর আলোগুলো চাঁদের কিরণে ম্লান।

ক্যাথীড্রালের সামনে উজ্জ্বল-আলোকিত বাগানে তরুণতরুণীর প্রফুল্ল জনতা। আর নুয়ে-পড়া, পাতা-ছাঁটা গাছ ও লাইলাক-ঝোপের মধ্যে আসনগুলিতে প্রেমিক-যুগল।

হালকা কথা ও হাসির মৃদু মর্ম্মর। জ্বলন্ত সিগরেটের প্রান্ত চোখে পড়ে। রাত্রির এই জাগিয়ে-তোলা উষ্ণতায় সকলেই তপ্ত, উন্মত্ত, কেউ একটি নিমেষও হারাতে চায় না।

কিন্তু এমন রাতও যখন কারো হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে না, যখন সে সঙ্গীহীন, বিষণ্ণ, একা,—তখন সে ভারি দুঃখী, তার দুঃখের তুলনা নেই।

একটু আগে সে আমার কাছে রইল কিনা তাতে আমার কোন লাভ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সেই বেঞ্চিতে-বসা মেয়েটির দিকে তার তাকিয়ে থাকার স্মৃতি আমার মনে আঘাত কোরতে লাগল। উদ্বেগে কাঁদ-কাঁদ হোয়ে পড়লুম। চিত্তের দুর্ব্বলতা এমনই বেড়ে গেল যে সে আমার কাছে থাকুক এ ছাড়া দুনিয়ায় কোন কিছুই চাইবার রইল না।

এক কথায়—আমার দোষ দিস নি—আমার সহ্য হোল না যে আমি এই বসন্তের উৎসব-রাত্রে আনন্দিত সঙ্গ থেকে, সঙ্গীদের দল থেকে, প্রক্ষিপ্ত বিতাড়িত হোয়ে থাকি।

তারপর কিসে কি হোতে পারে না ভেবে আমি ফিরলুম, আর চল্‌লুম, দ্রুতগতিতে, তার বাড়ীর দিকে।

(৩)

আমার মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা; হয়ত সে বেরিয়ে গেছে, হয়ত আমার দেরী হোয়ে গেছে; হয়ত বা আমায় একা থাক্‌তে হবে। তখন আমি নিজেকেই বকতে লাগলুম তার স্বভাবের ভালো দিকটা ফোটাবার একটুও চেষ্টা না কোরে এ রকম হাস্যকর ভাবে তাকে ছেড়ে চলে আসার জন্যে।

ভাবলুম আমি ত ঠিক তাদেরই মত ব্যবহার করছি যারা কোন অবস্থা দেখলে ভালো করার চেষ্টার বদলে শুধু ঘাড় দুলিয়ে নিশ্চেষ্টতার অঙ্গভঙ্গি করে। মানে নিজে কোন শক্তি প্রয়োগ না কোরেই শ্রেয়তর কিছু পেতে চেয়েছিলাম।

পুরানো পাথরের বাড়ীটার গেট পার হোয়ে গেলুম। বুঝতে পারলুম বাইরের মে-রজনীর তপ্ত বায়ুর সঙ্গে পাথরের শীতল প্রাচীরের ভিতরকার ঠাণ্ডা দুর্গন্ধ হাওয়ার কত তফাৎ।

মস্কোর অনেক বাড়ীতে এ রকম ঢোকবার পথ এখনও যথেষ্ট আছে যার দরজা ধোয়া হয় না; পুরানো বিজ্ঞাপনের টুক্‌রো ঝুল্‌ছে, বাইরের সিঁড়ি ময়লা, হিজিবিজি কাটা ও জঙ্গলে ভরা।

আমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আশা সে মোটেই করে নি।

ভাবে বোধ হোল সে কাজে বস্‌তে যাচ্ছিল। দেয়ালের গায়ে ঠেসান-দেওয়া একটা ছোট্ট টেবিল। ঘরের ভিতরকার ছাদ থেকে একটা ইলেক্‌ট্রিকের 'বাল্‌ব' দড়ি দিয়ে ঝোলানো; সেটাকে টেবিলের ওপর টেনে নিয়ে পেরেক দিয়ে আট্‌কানো হয়েছে।

—তাহলে বীররমণী ফিরে এলেন,—চেঁচিয়ে সে বল্‌লে। নিশ্চয়ই ভেবে দেখে ভুল শুধ্‌রেছেন। ভালোই হোয়েছে।

হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে এসে সে আমার হাত ধরলে। হয়ত সে আমায় চুমো খেতে বা আদর কোর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই কোর্‌লে না।

আমি বল্লুম—ঝগড়া কোরেছিলুম ব'লে আমি দুঃখিত; তাই মিটোতে এসেছি।

—মিটোবার আবার কি আছে? দাঁড়াও একটু, দরজায় একটা নোটিস টাঙিয়ে দিই যে আমি বাড়ী নেই। নইলে কেউ এসে পড়তে পারে।

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সে নোটিসটা লিখলে। তারপর সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একলা আমি চারদিক চেয়ে দেখে নিলাম। ঘরটার চেহারা ঐ সিঁড়িটার মতই। দেয়ালের গায়ে টেলি-ফোনের নম্বর আঁচড় কাটা; ঝাঁট-না-দেওয়া মেঝেয় সিগরেটের গোড়া আর কাগজের টুক্‌রো ছড়ানো; একটা গোটানো বিছানা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে জড় করা, ঠিক আমাদের মত; জানলার কুলুঙ্গিতে ময়লা ডিশ, খালি বোতল, মাখন-মোড়া কাগজ, ডিমের খোলা, ঘটিবাটি ইত্যাদি।

যেন কি রকম বিব্রত বোধ হোতে লাগল, ভেবেই পেলাম না সে ফিরে এলে কি বলব। চুপ কোরে থাকাটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ তার একেবারে বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব।

তখন আমার নিজেকে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে হোল কেন সে ঐ নোটিসটা দরজায় লাগাতে গেল। না হয় কেউ আসতই?

হঠাৎ সমস্তটা স্পষ্ট হোয়ে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে গেল। দুরু-দুরু বুকে আমি জানালার ধারে গেলুম, বোতল ও সিগরেটের বাক্সগুলো সরিয়ে একটু বসার জায়গা কোরে নেবার জন্যে। দেখতে পেলুম আমার হাত কাঁপছে। তা সত্ত্বেও সেখানটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়লুম। পিঠের আড়ালে কি ঘট্‌ছে তাই শোনবার জন্য কান খাড়া কোরতেই মনে হোল প্রতীক্ষার এমন চঞ্চল উদ্বেগ আমি আগে কখনও উপলব্ধি করি নি।

আমার একমাত্র দুঃখ ছিল এই যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত্তগুলি, আমার প্রেমের প্রথম দিনটি কাটাতে হবে এই অপরিচ্ছন্ন ময়লা ঘরটায়, এই বাসি এঁটো কাঁটার মধ্যে।

তাই সে ঘরে ফিরে এলে আমি বল্‌লাম—চল, একটু খোলা হাওয়ায় যাওয়া যাক।

চমক ও বিরক্তির আভাস তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল।

—কেন, তুমি কি এইমাত্র সেখান থেকে এলে না ?

তারপর তার গলার স্বর বদলে গেল। সে হুড়হুড় কোরে বোলতে লাগল—নোটিসটাকে এমন কোরে এঁটে দিয়ে এসেছি যে কেউ আর আমাদের বিরক্ত কোরতে আসবে না। বাজে বোকো না। আমি এখন তোমায় কোথাও যেতে দিচ্ছি না।

—এখানে থাকতে আমার ভালো লাগ্‌ছে না।

সে চ'টে বল্‌লে—আবার সেই পুরোনো কথা ! হয়েছে কি ? কোথায় যেতে চাও ?

তার কথাগুলো দম-আট্‌কানো অথচ দ্রুতগতি। আমাকে আট্‌কে রাখার কথা ভেবে তার হাত কাঁপতে লাগল।

আমার হাতও কাঁপছিল, আর বুকের স্পন্দনের এমন জোর যে চোখে আঁধার দেখতে লাগলুম। আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছিল। একদিকে আত্মসমর্পণের ভাব, কেউ এসে বিরক্ত কোরবে না এই অনুভূতি; অন্যদিকে প্রতিবাদের ইচ্ছা,—তার চোরের মত দ্রুত চুপি-চুপি কথা, তার পেটুকের মত তাড়া, তার অসংযম—এইগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বোধ হোল, তার মনে তখন একটিমাত্র ইচ্ছা, বন্ধুদের কেউ এসে পড়ার আগেই কাজ সেরে ফেলা। আমার সামান্যটুকু বাধাতেও অধীর ও ক্রুদ্ধ হোয়ে পড়ছিল।

মুক্তপ্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা মেয়েরা আসল ব্যাপারটিকে সোজাসুজি দেখতে পারি না। আমাদের কাছে এই ব্যাপারটি সর্ব্বদাই একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শেষ অংশ। প্রথম আমরা মুগ্ধ হই মানুষটিকে দেখে, তার বুদ্ধিতে তার আত্মায় তার কোমলতায়। দৈহিক সঙ্গম ছাড়া অন্য কিছু কামনা কোরে আমরা সুরু করি। এই কামনা যখন চরিতার্থ হয় না, যখন কোন মেয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক আবেগের বশীভূত হোয়ে পড়ে, তখন তৃপ্ত না হোয়ে সে নিজের ওপরেই চটে ওঠে। পুরুষটিকে সে মনে করে, যেন তার শত্রু, তার পতনের সহচর, যেন জোর কোরে তাকে অত্যন্ত অপ্রিয় ও পরিহার্য্য অনুভূতি উপভোগ করিয়েছে।

সেই গোটানো বিছানা, ডিমের খোলা, ময়লা, তার চোরা চাহনি, আর ব্যাপারটা যে ঠিকমত চল্‌ছে না এই বোধ, এ-সব মিলে আমায় ইতিমধ্যেই অপ্রস্তুত কোরে ফেলেছিল। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—আমি এখানে থাকতে পারছি নে।

—কি হোল আবার? আসবাব-পত্র পছন্দ হচ্ছে না? যথেষ্ট কবিত্ব নেই এতে। কিন্তু আমি ত কোন ব্যারণ নই—সে বিরক্তি না চেপে চেঁচিয়ে বল্‌লে।

খুব সম্ভব তার এই চীৎকারে আমার মুখের ভাব বদ্‌লে গিয়েছিল। কেননা, তার এই কথাগুলোর ছাপ মুছে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচু গলায় আমায় শান্ত করার চেষ্টা কোরতে লাগল।

—ও কিছু নয়, লক্ষ্মীটি, থাম······সত্যিই কেউ এসে পড়তে পারে।

নিশ্চয়ই আমার উচিত ছিল তখনই চলে আসা। কিন্তু তার কাছে একা থাকার দরুণ আমার মনও বাসনায় উদ্দীপ্ত হোয়ে উঠেছিল, যেমন হয়েছিল তারও মন। নিজেকে ঠকানোই স্থির করলুম, এবং এই মিথ্যে আশায় থেকে গেলুম যে কিছু-না-কিছু এসে বাধা দেবেই।

—দাঁড়াও, তোমার জন্যে কিছু কবিত্বের ব্যবস্থা করা যাক—এই বলে সে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

সত্যিই ভালো হোল। কারণ, ময়লা বিছানাটা, বোতলগুলো, সিগরেটের গোড়া আর চোখে পড়ে না।

তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সে আমার পিছনে এসে একটা হাত দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলে। আমি বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলুম। তার মুখের ভাব দেখ্‌তে পাই নি, কিন্তু এই আলিঙ্গনটির জন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ হোল। ইচ্ছে করছিল, অনেকক্ষণ, অনেক অনেকক্ষণ সেখানটায় দাঁড়িয়ে থাকি।

কিন্তু তার আর তর সইল না। কেবলই তার মনে হচ্ছিল কখন কে এসে পড়ে। আমায় ধোরে জানলা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে "আর কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?"—সে জিজ্ঞাসা কোরলে।

* * * * *

উঠে দাঁড়াতেই সে চট্‌ কোরে আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। ভয়ে আতঙ্কে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম—আলো চাইনে আমার। সে আমার দিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে, কাঁধ নেড়ে, আলোটা আবার নেবালে। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে সেটাকে ঠিকঠাক কোরতে লাগল।

সে বল্‌লে—রুম-মেটের বিছানাটা ঠিক কোরে রাখ্‌তে হবে; নইলে 'ভান্যা' এসে নিশ্চয় ধরে ফেলবে যে ঘরে মেয়ে এনেছিলাম।

বিশ্বজগৎ হিমকুয়াসায় ঘেরা,
দীর্ঘশ্বাসে বিষায়িত মোর গেহ ;
রবি শশী তারা—সর্ব্ববল্লভেরা,
সকলে উধাও, দূরে কাছে নেই কেহ।
কে জানে কোথায় আজিকে সে পলাতকা,
সে-মায়ামৃগীরে কে ধরেছে ফাঁদ পাতি !
মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সুচির সাথী।
চিন্তাও আর আগুয়ান হতে নারে ;
গতাসু হতাশ ; বিলাপ চেতনাহত।
সহসা বিমুখ-বাতাসে-বন্ধ দ্বারে
কার করাঘাত বাজে স্বপনের মতো !

ফুকারিলো রণতূর্য্য ; সমস্বরে গম্ভীর দুন্দুভি
উঠিলো বাঙ্ময় হয়ে ; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিলো বিপুল মন্দ্র ; তন্ত্রে তন্ত্রে হলো বিনিময়
গমক মূর্চ্ছনা মীড় ; লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর আগ্রহভরে বিতরিলো দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার। তরুণীর বক্র কেশে
সঞ্চারিলো শিহরণ বিচঞ্চল করতাল হতে ॥

* * * * *

উদয়শৈল 'পরি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু রভসে,
শাপবিমোচিত সন্নত ধরণী তারক তাপক পরশে।
উতল কমলবন গন্ধে,
মন্দ্রে মধুকর ছন্দে,
বৃক্ষ বিনতি করি বন্দে,
সাগর উচ্ছল হরষে।
উদয়শৈল 'পরি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু রভসে।

আগত আগত উদার সবিতা, প্রাচী রঞ্জিত রাগে ;
উত্তর-দক্ষিণ-অস্তদিগন্তে লাগে আশিস লাগে।

চিরপরিচিত গৃহশিখরে
কুহকী অধরা ঠিকরে ;
ধূলিমলিন পুরশিকড়ে
জাগে শিহরণ জাগে।
আগত আগত উদার সবিতা, প্রাচী রঞ্জিত রাগে ॥

* * * * *

ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র,
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য,
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র,
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিতহাস্য।
কুন্তলে তব শরৎসাঁঝের ঋদ্ধি,
পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে,
উরসে তোমার মর সাধনার সিদ্ধি,
ধরা রূপবতী, সে তোমারি অনুষঙ্গে।
কত জনমের বঞ্চনা ব্যথা মত্ত
পেয়েছে তোমার তিনটি কথায় ক্ষান্তি।
অলীক স্বপন—তুমিই নিপট সত্য ;
চলচঞ্চলা—তুমিই পরম শান্তি ॥

নীরব সকল যন্ত্র। ক্লান্তিহীন বেহালা কেবল
ফিরিলো সপ্তকরথে সমধর্ম্মী সুহৃদ্‌সন্ধানে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। টুটিলো হঠাৎ সনির্ব্বন্ধ
অনুনয়ে তার সরমের সঙ্কোচন নির্ব্বচন
পিয়ানোর বুকে ; সঞ্চালিত কড়ি ও কোমলে দ্রব
সুর উদ্বেল উচ্ছল হলো ; অতিমর্ত্ত্য অনুনাদে
ভ'রে গেলো সঙ্গীতের শূন্য অবকাশ। মোর পাশে
মৌন বিদেশিনী অহৈতুক সোহাগের আকস্মিক
গূঢ় প্রবর্ত্তনে স্থাপিলো অধীর পাণি দয়িতের
চমৎকৃত ভুজে, চিত্রল নখের মূলে শশীকলা
করি বিকিরণ। পরশিলো আমারে উত্তরী তার

* * * * *

দখিন-বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
ভনিলো কোন কথা, তা শুধু সেই জানে !
সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা ;
অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
কহিলো সমীরণ কী কথা কানে কানে ?

অচল শিলাবুকে উন্মাদিনী নাচে।
স্ফুরিত তনুলতা কে জানে কারে যাচে !
মেখলা কটিতটে চমকে ছায়ানটে,
রসনা জাদু রটে, কবরী উড়ে পাছে।
স্তব্ধ মেঘে যেন সৌদামিনী নাচে !

সে যেন মায়ামৃগী বিতরি কস্তুরি
পাগল বায়ুসনে খেলিছে লুকাচুরি !
কখনো বনছায়া ঢাকে সে-বরকায়া ;
কভু সে-পীত মায়া আলোরি কারিকুরি।
অপ্সরীতে প্যানে খেলে কী লুকাচুরি ॥

* * * *

বনবীথি ছায়া ঢাকা,
সোনাখচা পথখানি,
ফুলে অবনত শাখা
গুঞ্জরে বনবাণী।
সে-বিজন ছায়াপথে
ছুটি বিহ্বল প্রাণে ;
বুঝিনা যে কোনোমতে
লুকায়েছো কোনখানে।
ধ্বনে তব হাসি ধ্বনে
কাছে আবডালে কোথা !
তব কঙ্কণ ভনে
অদূরে আবছা কথা !
হে তপতী, তোমা চুমি
বায়ু আজ হিমজয়ী !
দিবেনা কি ধরা তুমি,
ওগো কৌতুকময়ী ?

ক্ষণপরে দাও ধরা।
তুলি লাইলাক্‌রাশি,
হাসিতে উন্মুখরা
দাঁড়াও যে পাশে আসি।
অবশেষে ছল ভুলি
মুখে চাও অকারণে।
ফেলে এসো ফুলগুলি
কবে কোথা অযতনে ?
সহসা না-জানি কেন
ধৈরজ ভেঙে পড়ে,
গাঢ় চুম্বনে যেন
মাতোয়ারা করো মোরে !
তার পরে শ্লথ বেশে
সরম ভরম টুটে,
দিশাহারা কী আবেশে
মোরে নিয়ে চলো ছুটে !
ডাকে বন সমুখে যে,
ঘনতর হয় ছায়া।
সেখানে কি ফুলশেজে
এক হবে দুটি কায়া ?

আবার সকল তূরী, সমস্ত বিষাণ আরম্ভিলো
সমস্বরে কাংস্য-কোলাহল ; অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝঙ্কারিলো সমুচ্চ সপ্তমে ; মহিয়ান আর্গানের
পরিপূর্ণ সাগরসঙ্গীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ
অচিরাৎ হয়ে গেলো লীন। ত্রিভুবন পরিপ্লুত
হলো তানে, তালে, সুরসমন্বয়ে ; রহিলোনা কোনো
ছিদ্র, নিবৃত্তি, বিরাম। রঙ্গমঞ্চ হতে পলাতক
আলোকের স্পন্দিত অণিমা বিচ্ছুরিলো অকস্মাৎ
পার্শ্ববর্ত্তী যুবতীর নীলাঞ্জন নয়নের কোণে॥

* * * * *

অগাধ গগন হতে দ্বিপ্রহরে
আলোব সোনালি সুরা অঝোরে ঝরে।
সে-মাতনে বাহু তুলে　　অটবী দোদুল দুলে,
তারি কণা ফুলে ফুলে উঠেছে ভ'রে।
ঝরে আলোকের সুরা দ্বিপ্রহরে !

অসীম নীলিমা হাসে উদার নভে,
পুলকিত শ্যামলিমা অখিল ভবে।
ছায়াতে কি প্রয়োজন ?　　সঙ্কোচ অশোভন
মিলনের বিবসন মহোৎসবে।
ধরণীতে শ্যামলিমা, নীলিমা নভে !

কখন হয়েছে মূক পাখীর গীতা ;
অকপট সমারোহে বচন বৃথা !
শোনো মৌনের তলে　　বিধাতা অবাধে চলে
আঁকিয়া অলখ হলে প্রাণের সীতা।
অকপট সমারোহে বচন বৃথা ॥

*　　*　　*　　*　　*

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
হঠাৎ হলো পথের অবসান।
তৃণাসনে ফুল্ল তরুর মূলে
শুনছি মোরা স্রোতস্বিনীর গান।
পর পারে নাম-না-জানা গ্রাম
রৌদ্রে অসার মরীচিকার প্রায় ;
পশ্চাতে মাঠ উধাও ঘনশ্যাম
লুটায় গিয়ে স্বর্গলোকের পায়।
সপ্ত সাগর পেরিয়ে চারণ-বায়ু
অচিন ভাষায় করছে কথকতা ;
ঝঙ্কারে তার মুখর মোদের স্নায়ু,
জিহ্বা অবাক, নয়ন বলে কথা।

থামলো প্রলাপ হঠাৎ নদীর মুখে,
স্তব্ধ হলো হাওয়ার কোলাহল ;
শুনতে পেলেম সেই নীরবের বুকে
প্রাণদেবতার অজর হোমানল।

পড়লো তোমার ব্যাকুল বসন টুটে
বিশ্বম্ভর চরণপ্রান্ত চুমি ।
ফিরলো পুলক রিক্তাকাশে ছুটে ।
কল্পলোকের উর্ব্বশী কি তুমি ?
শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত হলো ধরা,
ত্রিভুবনে কেবল তুমি আমি ঃ
সৃজনপ্রাতের প্রথম যমক মোরা,
প্রলয়রাতের শেষ বনিতা স্বামী ॥

সহসা ডম্বরু, ডঙ্কা বজ্রকণ্ঠে উঠিলো হুঙ্কারি ;
ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ ঝঞ্জনা ঝঙ্কারিলো করতালে
বিপরীত সুরে ; রহি রহি নিবদ্ধ তন্ত্রের পরে
খেলে গেলো অসঙ্গত সুরের ঝলক ; তীব্র বাঁশি
অরুন্তুদ হাহাকারে প্রচারিলো প্রলয়ের ক্ষতি
বিদীর্ণ কীচকসম ; অর্গানের সান্তর গর্জ্জনে
ঘোষিলো যন্ত্রণাক্ষিপ্ত বাসুকির নাভিশ্বাস বুঝি ;
উদ্‌ভ্রান্ত পিয়ানো যেন আছাড়ি বিছাড়ি মূর্ত্তি দিলো
উচ্চণ্ড মৃত্যুরে। সে-বিক্ষুব্ধ উতরোলে কিশোরীর
উদ্দীপ্ত নয়ন নিবে গেলো আচম্বিতে, নিরুৎসুক
শ্লথ স্তব্ধ তনুলতা তার অকস্মাৎ মোর রিক্ত
বুকে করিলো সঞ্চার বিষাদের উদাস বেদনা ॥

*   *   *   *   *

আজি ফাগুনবেলার পরসাদ
যায় হারায়ে অকালে বাদলে ;
ভাঙে সুখশ্রান্তির অবসাদ
ওই মত্ত মেঘের মাদলে।
ফুঁকে কালবৈশাখী তূর্য্য,
কাঁপে দেওদার বট ভূর্জ্জ ;
ডুবে মধ্যদিনের সূর্য্য
ভীমা অমাবস্যার আদলে।
টুটে সিদ্ধকামের পরমাদ
আজি সহসা অকাল বাদলে।

ঘোর　　ঈশানে সঘনে গরজায়
　ওই　　প্রলয়পাগল অশনি ;
ভাঙা　　কুঞ্জবনের দরজায়
　নাচে　　রুদ্রাণী দিগ্‌বসনী
তারি　　লেলিহান অসি খরধার
লিখে　　আকাশে আকাশে সংহার
যত　　ত্রিকালতিষ্ঠ মূলাধার
　পাড়ে　　ঝঞ্ঝা বরাহদশনী।
ধরা　　আঘাতে আঘাতে মূরছায়,
　ক্রোধে　　গরজে গগনে অশনি

আজ　　মহেশ মেলেছে বিলোচন,
　তার　　পায়ে তাণ্ডব জেগেছে ;
হলো　　বিশ্বের শাপ বিমোচন,
　নভে　　পক্ষ প্রসারি ভেগেছে
আজ　　উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের ;
যত　　তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা　　মেতেছে গাজনে চড়কের ;
　সারা　　বিশ্বে ঘূর্ণি লেগেছে।
ওই　　ছারখার হলো ত্রিভুবন,
　ওকি　　প্রমথেশ আজ জেগেছে

*　　*　　*　　*　　*

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, "তোমার প্রেমে
　নই কি আমি প্রথম আগন্তুক ?"
এলো হতাশ হঠাৎ তোমার চক্ষে নেমে ;
　পাণ্ডু হলো প্রণয়রক্ত মুখ ;
কাঁপলো তোমার মলিন অধর থর থর
　কথা বলার পরম প্রচেষ্টাতে,
আর বছরের শুকনো গোলাপ যেমনতর
　শিউরে ওঠে এই ফাগুনের বাতে ;
লাজে হঠাৎ ঝলসে গেলো তনুলতা।
　নগ্ন বক্ষে জড়িয়ে ব্যাকুল বাহু,
সঙ্কালি শির, করলে জ্ঞাপন দুর্ব্বলতা।
　গর্ব্বেরে মোর গিললো ভীষণ রাহু ;

লুপ্ত হলো আধারবিন্দু বিশ্ব হতে,
নাস্তিতে খিল রইলোনাকো আর ;
ভাগ্যরবি চললো ছুটে পাতালপথে,
চতুর্দ্দিকে আদিম অন্ধকার।
একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে,
সামনে মরু অস্থিসমাকুল ;
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিলো আজকে মোরে,
অস্তমিত বিধির আমি ভুল ॥

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ সকলি। তার পর আরবার
মোহন মুরলী কী অপূর্ব্ব পূরবীর মোহময়
সুরের আবেশে তুলিলো রণিত করি সীমাশূন্য
শূন্যতার হিয়া! সারেঙ্গীর রলরোল বিলম্বিত
তালে সমাহত পিয়ানোর মুখে সিঞ্চিলো পরম
যত্নে সঞ্জীবনী সুধা। অলক্ষ্য কিঙ্কিণী ঝঙ্কারিলো
শান্ত সুরে বিরামে বিরামে। কান্তের বিহ্বল স্পর্শ
ফিরে দিলো উৎসুক কম্পন যুবতীর স্তব্ধ দেহে ॥

* * * * *

সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে
অঙ্গারমসি প্রেমালোকে করে পুণ্য ;
পূর্ব্বগগনে মধুনিশা আসে মন্থরে ;
প্রতিচ্ছায়ায় রঙীন উদাস শূন্য।
পরপারে কোথা অনামা গ্রামের কির্ম্মীরে
দেউলে ঘণ্টা ঘোষে দেবতার ক্লিপ্তি ;
এ পারে সুচির ধ্রুবতারকার মিস্মিরে
স্নাত কিসলয় প্রচারে কী পরিতৃপ্তি !
দূর দিগন্তে নিবাত ধূমের ডম্বরে
বাজে পলাতক ঝড়ের মুরজমন্দ্র।
গত দুর্য্যোগ।—সে যেন উষার অম্বরে
বিরহরাতের দুঃস্বপনের চন্দ্র।
অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী ;
পরিমণ্ডলে বাহিত অলকনন্দা ;
ঝিল্লির ডাকে মরধামে নামে উর্ব্বশী ;
তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা॥

অভয় নিশার দক্ষিণ হাতে উদ্ধত,
সপ্তপ্রদীপ ম্রিয়মাণ বাম হস্তে ;
যদিও দিনের ভাস্বর আঁখি মুদ্রিত,
মর্ত্ত্যমহিমা যায় নাই তবু অস্তে ॥

* * * * *

স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে ;
নিবিড় নীল নয়নকোণে অশ্রুস্মৃতি অঙ্কিত ;
অতীত ব্যথা—কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে ;
হরিণীসম কম্প্র তনু অহেতু ভয়ে শঙ্কিত।
কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা ;
বচনাতীত প্রলাপ তব শ্রবণে মম গুঞ্জরে।
কী মায়াবলে ঊর্ণাজালে বেঁধেছো, সুরবালিকা,
গহনচারী মদস্রাবী আমার স্ফীত কুঞ্জরে ?
স্পর্দ্ধা মোর পড়েছে টুটে, ভ্রান্তি মোর গিয়েছে ;
দৃপ্ত শির পঙ্কে লুটে তোমার চরণাম্বুজে।
নিঃস্ব আমি, বিশ্ব তাই আজিকে কোল দিয়েছে।
অরূপ প্রেমকাহিনী হলো ব্যক্ত ভাঙা গম্বুজে !
চিনেছি চির মানবী তুমি ; পাবন তব করুণা,
অযোগ্যের মুক্তিস্নানে হয়না ম্লান লাঞ্ছিত ;
প্রথম ঠাঁই পাইনি তাই তোমার প্রেমে, অরুণা,
প্রত্যাগত মাধবে আমি হয়তো তাই বাঞ্ছিত ॥

উদাত্ত বিষাণ উৎসরিলো ঊর্দ্ধগ আহ্বান ; মুগ্ধ
বেণু দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি বেঁধে
দিলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংযোগের রাখী; আবিষ্ট মূর্চ্ছনা
সহসা উদ্বেল হলো বেহালার অগম অন্তরে ;
ত্রিপথগা সুরধুনী অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে
চরাচরে আঁকিলো মুক্তির মার্গ শ্রাবণ-প্লাবনে।
সে-বিপুল সঙ্গীতের আড়ে প্রণয়ীর বাহুপাশ
ঘেরিলো তন্বীর তনু স্নেহ-আবেষ্টনে ; চারি চোখে
হয়ে গেলো দেওয়া নেওয়া কী বেদনা অনির্ব্বচনীয় ॥

* * * * *

স্বর্গের মর্ত্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে ;
মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সঞ্চে গগনের পাত্রে ;
জন্মস্মর কার প্রণব সারিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে ;
প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত্ত গোলাপের পুঞ্জে ;
চন্দ্রের কৌস্তুভ উরসে প্রকৃতির, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ ;
মৃত্যুর মঞ্জীর নীরবে শোনা যায়, শূন্যে মিশে যায় অব্দ ;
সিদ্ধির নির্ব্বাণ প্লাবিলো মরধাম। কাজ কি অমরায় অন্য ?
সুপ্তির সন্ধান দিয়েছে ভগবান, ধন্য ধরা আজ ধন্য ॥

* * * *

পূর্ণচন্দ্র খোলা বাতায়নে পশিছে ঘরে,—
তব তনুলতা সুপ্ত কুসুমশয়নপরে।
জ্যোৎস্না তোমার পীড়িত উরোজে
বিথারে প্রলেপ সিত মলয়জে ;
স্তিমিত অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।
নিদ্রিত সুখশ্রান্তিতে তুমি শয়নপরে।

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন ঊরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার ;
নবদুর্ব্বার চিকণ পুলক ও-বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে।

মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে ;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ;
সন্নিধি তব সৃজন-আকুতি পরাণে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।

খোলা বাতায়নে চন্দ্রমা চুমে তোমার মাথা ;
দূর নীহারিকা গুঞ্জে শ্রবণে সুপ্তিগাথা।

তব স্বপনের শমিত লহরী
দেয় মোর বুকে হিন্দোলা ভরি ;
নিবিড় আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা।
বিধির আশিস মুকুটিত করে যুগল মাথা ॥

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেলো টুটে। দেখিনু সরমে চাহি
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চপরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক প্রেমিকা চলে
গেছে অমৃতসঙ্কেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারিধারে :
কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় রুদ্ধ হাহাকারে ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

অপরাজিত—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন প্রকাশালয়, মূল্য ২।০ ও ২৲ টাকা।

বিভূতিবাবুর মত সৌভাগ্যশালী লেখক বাংলাদেশে কখনও জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার প্রথম পুস্তক "পথের পাচালী" প্রকাশিত হইতে না হইতে তিনি যে খ্যাতি ও স্তুতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনার ভাগ্যে জোটে নাই। একথা আর বলা চলে না যে বাঙালী পাঠক গুণের মর্য্যাদা করিতে জানে না।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি অনেক স্থলেই কতকগুলি সাময়িক কারণের সমাবেশ। 'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতার নিয়ত-প্রবর্দ্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও একথা এখনও নির্ব্বিবাদে বলা যায়, বাংলার সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লী-কেন্দ্রিত। এমন শিক্ষিত পরিবার খুবই কম, দুই তিন পুরুষের মধ্যে যাহারা বাংলার জমির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল না। এমন বাঙালী ক'জন পাওয়া যায় যাহারা ছাত্রবয়সে সহরে বাস করিয়াও সহুরে জীবনকে তীব্র ভাষায় নিন্দার পর পল্লীজীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বরতার গুণগানে স্কুল বা কলেজগৃহ মুখরিত করিয়া তোলে নাই? চলন্ত রেলগাড়ীর জানালা দিয়া কোন্ বাঙালী ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকায় না? প্রাচীন সাহিত্যের কথা ধরিবার প্রয়োজন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প পল্লীজীবনকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে এই সব ওস্তাদ শিল্পীর কবিপ্রতিভার জ্যোতিঃতে বাংলার পল্লীশ্রী আমাদের কল্পনানেত্রে ধরাধামে সুখস্বর্গের শোভায় বিরাজিত ছিল।

কিন্তু চমক ভাঙিল, স্বপ্ন-জড়িমা পলকে ভাগিল যেদিন শরৎচন্দ্রের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি রূঢ় দীপের আলোক লইয়া বাংলার পল্লীজীবনের বাস্তব চিত্রটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, তাঁহার "পল্লী সমাজে"। সে চিত্র এমনই নিষ্করুণ অথচ এতই অবিতর্কিত যে পল্লীসম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল; যাহা ছিল সুখের খনি, সৌন্দর্য্যের আকর, তাহাই হইয়া উঠিল দলাদলির আড্ডা, ম্যালেরিয়ার ডিপো, সঙ্কীর্ণতার দৃঢ় দুর্গ ও পুঞ্জীভূত কলঙ্কের বিস্তীর্ণ পসরা। সাহিত্যেও, নদীর মতো, একদিকে ভাঙন ধরিলে অন্যদিক গড়িয়া ওঠে। বাংলা সাহিত্যের টান অতিমাত্রায় সহরমুখী হইয়া পড়িল। এমন-কি যে-লেখকের নিকট পল্লীগ্রাম শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত, হয়ত যাঁহার নিজের বাড়ী শ্যামবাজার ও মামার বাড়ী বাগবাজার হওয়ায় পল্লীগ্রামের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটে নাই, তিনিও সুযোগ পাইয়া পূরামাত্রায় ওয়াকিবহাল হইবার জন্য পল্লীজীবনকে দুটো খোঁটা না দিয়া ছাড়িলেন না। তদুপরি আবার একদল পশ্চিমানুরক্ত লেখক বাংলা সাহিত্যকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতার কোঠায় তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় অনেকস্থলে মূলহীন ভাব ও অবাস্তব চরিত্রের প্রবর্ত্তনে সাহিত্যক্ষেত্রে সমুদ্র-মন্থনের কোলাহল সৃষ্টি করিলেন, যাহা হইতে কেহ বলিলেন অমৃত উঠিতেছে, কেহ বলিলেন

গরল। এই বিপর্য্যয়ে আত্মহারা হইয়া পল্লীগ্রামে নাড়ী-বাঁধা বাঙালী পাঠকের সাহিত্যিক শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটিল।

এহেন সঙ্কটে ত্রাণের বার্তা আনিলেন বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুরের বৃদ্ধা বালবিধবা ইন্দির ঠাকরুণ ও তাঁহার স্নেহের ধন দুর্গা ও অপূ-র বাল্যজীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া। পল্লীমাতা আবার যেন কথা কহিয়া উঠিলেন। স্বদেশপ্রাণ বাঙালী পাঠক তাহার একান্ত প্রিয় স্বদেশী বস্তু পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বিভূতিভূষণের বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের ফল, সুনিপুণ বিষয়নির্ব্বাচনের পুরস্কার।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী''-তে বিভূতিবাবু বাংলা সাহিত্যকে স্থায়ী এমন কিছু দিয়াছেন যাহার মূল্য সমসাময়িক রুচি-অরুচির মানদণ্ড দিয়া নিরূপিত হইবার নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কিরূপ সতর্কতার সহিত তিনি শরৎচন্দ্রের এলেকার পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পল্লীচিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লীচিত্রকে সমর্থনও করে না, প্রতিবাদও করে না, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকে। যেখানে শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন পল্লী-সমাজ, বিভূতিভূষণ আঁকিয়াছেন একটী পল্লী-গৃহ, তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ সর্ব্বজয়া-ইন্দিরঠাকরুণের সংসারে হরিহর রায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। আর ইন্দিরঠাকরুণের শোচনীয় মৃত্যুর যে করুণ চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন তাহা কোন প্রকৃত পল্লীগ্রামে ঘটা সম্ভব বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। বাংলার পল্লীসমাজ যতই পাপদুষ্ট কলঙ্ক-জর্জ্জরিত হউক, এটুকু হিতবুদ্ধি ও ক্ষমতা তাহার এখনও আছে যে ওরূপ অবস্থায় গৃহস্থকে বাধ্য করে অসহায় মুমূর্ষুর সেবা-যত্ন করিতে। লোকালয় হইতে সামান্য দূরে গ্রামের একপাশে ফেলিলেই কোন পল্লী-পরিবার যে সমাজ-নিরপেক্ষ হইয়া ওঠে তাহা আমাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে, কোন প্রকৃত পল্লীর অবিকৃত চিত্রাঙ্কন বিভূতিবাবুর মূল উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিয়াছেন, বাংলার বাঁশবনে-ঘেরা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম দুটি সদ্যজাগ্রত, গ্রহণশীল উপভোগসমর্থ শিশুচিত্তের উপর কি ছাপ ফেলে, কোন্ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাই আঁকিয়া দেখাইতে। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুরকে সাধারণ পরিণতমন মানুষের চোখ দিয়া দেখিলে চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে দূর্গা-অপূ-র বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দিয়া। বিস্ময়বোধ কাব্যানুভূতির উৎস ও বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি। শিশুচিত্ত বিস্ময়বোধের প্রথম ও প্রধান আধার; তাই 'পথের পাঁচালী'র সুবৃহৎ আয়তন তিনি শিশুচিত্তের বিকাশের ইতিহাসে ভরাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিকে তাঁহার শক্তি অনন্যসাধারণ, ও তাঁহার কীর্ত্তি বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। বিস্ময়-বোধের ফলে, বস্তু-বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহার চোখ নাক কান আশ্চর্য্য রকমে খোলা ও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের তুচ্ছতম গাছ-গাছালির পাখ-পাখালির খুঁটিনাটিও তাঁহার লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই। ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, গাছ লতা ফুল ফল পশু পাখীদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সহিত সাহিত্যসেবীগণের কি অন্তরঙ্গ সহমর্ম্মিতা ও নিগূঢ় পরিচয়। তুলনায় বঙ্গ-সাহিত্যে এই অভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে। কোন দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে কয়েকটি অতিপরিচিত নামের পরই 'কত-কি ফুল' 'নাম-না-জানা পাখী' ইত্যাদি অস্পষ্ট কথার আড়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে এরূপ ফাঁকি কোথায়ও নাই বলিলে চলে। বর্ণে গন্ধে স্বাদে শব্দে পল্লীলক্ষ্মীর ভাণ্ডারও যেরূপ প্রচুর, বিভূতি-

বাবুর বর্ণনাও সেইরূপ সমৃদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে তাঁহার আসন সুবিখ্যাত ডব্লিউ, এইচ্ হাড্সন্-এর শ্রেণীতে অকুণ্ঠ-অধিকার বলে বসানো যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে পল্লীগ্রাম যত বিভিন্ন উপায়ে আনন্দ দিতে পারে, 'পথের পাঁচালী'তে গ্রন্থকার তাহাদের সবিস্তার ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আমকুড়ানো, নোনা-পাড়া, পানফলতোলা হইতে কড়িখেলা, নৌকাবাওয়া, বারোয়ারি দেখা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু পল্লীশিশুর প্রধানতম সুখের একটি উপলক্ষ সাঁতার দেওয়া। কি মনে করিয়া যে বিভূতিবাবু দুর্গা ও অপুকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিলেন তাহা তিনিই জানেন। ইছামতীতে না হয় কুমীরের ভয়, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরে কি কোন পুকুর ছিল না?

'অপরাজিত'-র পরিচয়-প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী'-র এই পর্যালোচনা অপরিহার্য্য, কেননা, 'অপরাজিত' স্বতন্ত্র উপন্যাস নহে, শেষোক্ত গ্রন্থেরই সম্প্রসারণ। 'পথের পাঁচালী'-র শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায় দশ-এগারো বৎসরের পিতৃহীন শিশু অপু মফঃস্বলের কোন সহরে পাচিকা মায়ের মনিব জমিদার বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে যাইতেছে ও বিনাদোষে মার খাইয়া নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হইল বছর চব্বিশ পরে। এই চব্বিশ বৎসরের বঙ্কিম ইতিহাস 'অপরাজিত'-র দুইখণ্ডে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার অসম্ভব—কারণ অপু-র ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীটি ঠিক দশগজী মসলিন্-এর মতো নয়, যাহাকে নাকি একটি আংটির আয়তনে আঁটা যাইত। মোটামুটি এটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, অপু মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া হাইস্কুলে পড়িল; প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলিকাতার রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইল। দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিয়া আই, এ, পরীক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মা সর্ব্বজয়াকে হারাইল। খবরের কাগজে কাজ করিতে করিতে বন্ধুর মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়া তাহার প্রায় দোপড়া মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। পরে একদিকে ক্লান্তিকর কেরাণীগিরি, অন্যদিকে শান্তিময় পারিবারিক জীবন। পুত্রের জন্ম দিয়াই স্ত্রীর মৃত্যু, ও অপুর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দেশভ্রমণের পর সুদূর মধ্যপ্রদেশে অরণ্যবাস। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে বাংলাদেশে ফিরিয়া পুত্র কাজলকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিল ও ক্রমে গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবে তাহার প্রতিপত্তি ও অর্থাগম হইতে লাগিল। এক বিদেশী বন্ধুর প্রস্তাবে সে ভারতবর্ষের বাহিরে পর্য্যটনের সুবিধা পাইল, ও নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া তাহার বাল্যসঙ্গী বর্ত্তমানে নিঃসন্তান বিধবা রাণু-দির অভিভাবকতায় পুত্রকে রাখিয়া সুদূরের পিয়াসা মিটাইবার জন্য ভাসিয়া পড়িল। অপুর জীবন-কাহিনীর বর্ত্তমান পরিসমাপ্তি এই চৌত্রিশ-পয়ত্রিশ বছরেরই। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার পুনরুদয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে কিনা তাহা বিভূতিবাবুই বলিতে পারেন।

দেখা যাইতেছে সেই একই অপু-র জীবনকাহিনী হইলেও 'অপরাজিত' ঠিক 'পথের পাঁচালী'র সমধর্ম্মী রচনা নহে। যে ক্ষুদ্র পল্লী-বিশ্বের গণ্ডীর ভিতর অপু-র বাল্যজীবন কাটিয়াছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে তাহাকে চিরদিন সেখানে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। বলা যাইতে পারে, 'পথের পাঁচালী'র প্রধান চরিত্রই হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুর। 'অপরাজিত'-য় নিশ্চিন্দিপুর দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর হইতে মনের আড়ালে স্থান পাইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা হইয়া উঠিয়াছে স্মৃতি। গ্রীক পুরাণে

বলে মিউজ্-রা নিমোজিনী-র কন্যা, অর্থাৎ স্মৃতিই কবিতার জননী। বিভূতিভূষণ যে কবি, ও তাঁহার কবিত্ব যে স্মৃতিমূলক, তাহার প্রভূত নিদর্শন 'অপরাজিত'-য় পাওয়া যায়। যখন-তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপু-র মনে পড়িয়া যায়, ও কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির পরিচালনায় স্মৃতির জলতরঙ্গ টুং-টাং করিয়া বাজিয়া ওঠে। সামান্য কয়টি কথার ভাবগর্ভ প্রয়োগে বাংলার পল্লী-শোভা রূপ পরিগ্রহ করে। সুধু বাংলাদেশ কেন, প্রকৃতির অন্য দৃশ্যও যে বিভূতিভূষণের কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মধ্য-প্রদেশে বিন্ধ্যারণ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা। ভাষার লালিত্যে, ভাবের ঘনত্বে, পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাহার তুলনা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।

স্মৃতির আর এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া, কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রখর স্মৃতির সাহায্যে বর্ত্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্ত্তমান অপেক্ষাও সজীব হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্ত্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্ত্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত্-এর "হারানো কালের অনুধাবনের" কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট ভুলনা। কথাশিল্পে কাল-বোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতনপন্থী ; অপু-র জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্য্যের শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, স্বেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।

Le temps proustien a une élasticité, une relativité qui échappe à toute mensuration du dehors. Chacun aura pu constater que Proust ne donne jamais de dates ni indications précises d'époques. Nons ne comptons pas dans son roman par mois et années mais d'après le changement des saisons de l'âme. Elles ne permettent ancune analyse chronologique. Le temps s'écoule suivant une courbe si irrégulière qui'elle échappe au calcul. Un changement de l'atmosphère suffit a recréer le monde et nous-mêmes. Le temps et l'espace sont de simples modes du souvenir et réaction mutuelle.

[প্রুস্ত্-বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্ত্তী মানদণ্ডের অতীত। এ-কথায় সকলেই সায় দিবেন যে প্রুস্তের মধ্যে তারিখ বা যুগ-সম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ থাকেনা। তাঁহার উপন্যাসে কালগণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয়না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্ত্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্ত্তনেই পাঠক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে ; সেখানে দেশ ও কাল স্মরণের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।]

কিন্তু মানবমনের কারবার ত সুধু বস্তু-বিশ্বকে লইয়া নহে, বুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, আনন্দের জন্য তাহাকে মানবজগতেও চলাফেরা করিতে হয়। মানবজগতের বৈচিত্র্যের অবধি নাই, মানুষের সংস্পর্শে আমাদের অন্তর-লোক যে-বিকাশ লাভ করে তাহার রহস্যের আদি অন্ত নাই। বিভূতিবাবু তাঁহার রচনায় এই মানবজগতকেও প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অপু যে কত বিভিন্ন ধরণের নরনারীর জীবন-বৃত্তকে ছেদ করিয়া গেল, বিভূতিবাবু সযত্নে তাহাদের

ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন—মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন মতামতের পরকলার ভিতর দিয়া নহে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা ও অবহেলিত প্রাণী তাই তাঁহার অনুকম্পালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার চিত্রপট বিস্তৃতপরিসর ও চিত্রশালিকা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। তবুও মনে হয়, মানবচরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দৃষ্টি অগভীর, অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষীণ, ও সাফল্য সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, প্রাকৃতিক জগতে সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে বিরাট্ নীহারিকাপুঞ্জ ও নাক্ষত্রিক আকাশের নিকট তিনি নিজেকে যেমন ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন, মানবজগতে তাহা পারেন নাই।

Le sujet du romancier, la vision du poète se présetent à leurs esprits tyranniquement, et comme du dehors. L'artiste ne choisit pas sa matière, il est choisi par elle. Il est contraint de l'exprimer, et de l'exprimer dans toute sa pureté et son intégrité. Pour l'artiste, comme pour le penseur et pour le savant, le plus haut devoir est de se soumettre à la realité qu'il a contemplée. Comme toute connaissance, l'activité de l'artiste consist à reproduire une réalité objective. L'artiste n'invente pas, il découvre. L'art n'est pas une invention, mais une exploration. [ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু, কবির স্বপ্ন বহির্জগৎ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে যেন অত্যাচারীর মতো। প্রসঙ্গ-নির্ব্বাচনে শিল্পীর কোন হাত নাই, প্রসঙ্গই তাহাকে মনোনীত করিয়া লয়। তখন প্রকাশ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর তো থাকেই না, উপরন্তু ব্যঞ্জনাকে অকৃত্রিম ও অবিকল করিতেও সে বাধ্য হয়। ভাবুক ও বিদ্বজ্জনের মতো ধ্যেয় সত্যের নিকটে আত্মসমর্পন করাই শিল্পীর পরম কর্ত্তব্য। যেমন বহিরঙ্গ বস্তুর প্রত্যুৎপাদনই জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র লক্ষ্য, রূপকারের সাধনাও তদনুরূপ। সে উদ্ভাবক নহে, আবিষ্কারক, কপোলকল্পনা তাহার ব্রত নহে, তাহার ব্রত কেবল জিজ্ঞাসা।]

মানবজীবন-সম্বন্ধে এই exploration-এর, অনুসন্ধানের আভাস বিভূতিবাবুর রচনায় পাওয়া যায় না। আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সাদামাটা মামুলি স্তরের। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরণে ভাল, না হয় মামুলি ধরণে মন্দ, না হয় মামুলি ধরণেই প্রাণহীন জড় পদার্থ—এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে আরো জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব-বেদনা, কিন্তু বোধহয় উপলব্ধি করেন নাই যে বেদনার অনন্তরূপ, সুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়। দারিদ্র্যের সহিত অপু-র বিরোধও অত্যন্ত মামুলি ধরণের—কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া কখনও না করিয়া অপু দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্স-প্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপু-কে সর্ব্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া ওঠে, মানুষ অতি-মানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই ত অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথায়ও জীবনের কোন জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র "লীলা"; সেও অত্যন্ত

মামুলিভাবে জুটিল। বড়ঘরের রূপসী বিদুষী তরুণী এক বিলাতফেরৎ বদ্-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কুলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিষ্টারের হাতে গিয়া পড়িল যে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্ব্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস্-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল—এ-কাহিনী কি সর্ব্ব-জন পরিচিত নহে? অপূ-র সহিত লীলা-র স্বল্পব্যক্ত প্রণয়-সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণীমন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধহয় না। গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্ব্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই বিমুখীনতার তথ্যবহুল বিবরণ পড়া ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠে। ছদ্মবেশী আত্মচরিতের বিপদই বোধ হয় এই যে যে-ছোটো ঘটনা গ্রন্থকারের নিকট দ্যোতনাপূর্ণ, তাহা পাঠকসাধারণের নিকট ব্যর্থ হইতে পারে, এ-চেতনা সহজেই লোপ পায়। খুঁটিনাটির বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইতুপূজা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-মাসে না হইয়া পৌষ-মাসের পিছনে চলিয়া গিয়াছে; সরস্বতী পূজা কোনকালেই মাঘমাসের কয়েক মাস পরে হইতে পারে না; পূজার ছুটির ঠিক পূর্ব্বেই কলিকাতায় হকি খেলিবার সীজন্ নয়; ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নলজির ঠিকানা বোধহয় কেম্‌ব্রিজে নয়, লণ্ডনে। কিন্তু ক্লান্তি না আসার আসল কারণ বিভূতিবাবুর ভাষা। মাঝে মাঝে শব্দবিন্যাস-বিপর্য্যয় আছে। তথাপি তাহা স্বচ্ছ ও অনায়াস। মনে পড়ে মিড্‌ল্‌টন্ মারি-র উক্তি—Try to be precise and you are bound to be metaphorical। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনীতে বিভূতিবাবু যে সুপঠিত তাহার অনেক ইঙ্গিত যেখানে সেখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু কোথায়ও অবান্তর কোটেশন বা এলিউশন-এর সাহায্যে বিদ্যা জাহির করিবার সহজ পন্থায় পাঠকের চমক উৎপাদন করিবার চেষ্টা নাই। তাঁহার পরিশীলন মেঘান্তরিত সূর্য্যরশ্মির মতো সহনক্ষম দীপ্তিতে তাঁহার রচনাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। রচনায় এই দুর্ল্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় উপন্যাসকার হিসাবে, মানবচরিত্রের বিবৃতিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখিলেও বড় লেখক নহেন। কারণ Le grand écrivain est celui qui a la vision de nouveaux aspects de la rélatité, vision si impérieuse et exigeante qu'elle les remplit pour lui de quelque chose d'éternel. Son œuvre est une fenêtre qui nous donne vue sur une nouvelle perspective,; c'est une échappée sur une paysage jusqu'alors inconnue. [বড় লেখক তিনিই যাঁহার চোখে বস্তুবিশ্বের নবতর বিভাস প্রতিভাত হয়। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির এমনি অনিবার্য্য মহিমা যে তিনি এই বিভাসেই চিরন্তনের পরিপূর্ণতার সন্ধান পান। বাতায়নের মতো তাঁহার সৃষ্টি আমাদের সামনে নূতন পরিপ্রেক্ষিত আনিয়া দেয়; অদ্যাবধি-অজানা জগতে নিষ্ক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।]

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

On Forsyte 'Change—JOHN GALSWORTHY, (Heinemann).

A Maid in Waiting—JOHN GALSWORTHY, (Heinemann).

"পরিচয়ের" সম্পাদক তথা পাঠকপাঠিকার কাছে একটু ভূমিকার অবতারণা ক'রে উপরি-লিখিত বইদুখানির সমালোচনা করব। ভূমিকাটির যে প্রয়োজন আছে আশা করি স্বীকৃত হবে।

সমস্যাটি এই, সমালোচনার কোনো স্থায়ী সার্থকতা আছে কি না। পরে এ নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে, তাতে দেখাবার চেষ্টা পাব যে, এ-সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করার যথেষ্ট ও গুরুতর কারণ আছে। এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই। শেলি বাইরণের "ডনজুয়ান" প'ড়ে তাঁকে প্রায় মহাকবি ব'লে সোচ্ছ্বাস-দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। রিচার্ডসনের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস "পামেলা" প'ড়ে গেটের মতন গভীরদর্শী কবি ও সমালোচকও মুগ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন, অপূর্ব্ব বই। রুসোর উপন্যাস "এমিল" ফ্রান্সের সুধীবৃন্দ পড়তে পড়তে প্রায় কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। উল্‌টো দিকে ঠিকে-ভুলও আছে। রাস্কিনের মতন সমালোচকও হুইস্‌লারের মতন চিত্রীর ছবিকে কশাঘাত করেছিলেন। টলষ্টয়ের মতন স্রষ্টা মনস্বীও শেক্সপীয়রের নাটককে বলেছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিভার লক্ষণ দেখেছিলেন ও তাঁকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ দিতেন উপন্যাস লিখ্‌তে। বাংলার মনস্বীবৃন্দ এক সময়ে নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে অম্লানবদনে "কবি" আখ্যা দিয়েছিলেন, (এখনো কেউ কেউ দেন)। তীক্ষ্ণধী লিটন ষ্ট্রেচি মহাশয় তাঁর Books and Characters-এ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: যথা, ব্লেককে এক সময়ে বলা হ'ত পাগল, আজ বলা হয় প্রফেট,—দুদিন বাদে হয়ত ফের বলা হবে উচ্ছ্বাসী-ভাববিলাসী; ভলটেয়ারের নাটক প'ড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র য়ুরোপে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল—অথচ শেক্সপীয়রের নাটকের জন্যে একটি ঢেউও ওঠে নি; রাসিনকে শ্যেনদৃষ্টি ইংরাজ ক্রিটিকরা (যেমন বেলি) বলেন দুঃসহ, অথচ সুকুমার ফরাসীরা (যেমন ভালেরি, লমেত্র্‌) বলেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইত্যাদি। ষ্ট্রেচি রাসিন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত—কিন্তু ইংরাজ জাতি রাসিনকে এখনো মেনে নেন নি। ওদিকে কন্টিনেণ্টে আজও শেলির চেয়ে বাইরনের বেশি আদর, গলস্‌ওয়ার্দ্দির চেয়ে বার্ণার্ড শ'র।

এসব দেখে শুনে মনে হয় না কি যে, সমালোচনা জিনিষটি পণ্ডশ্রম? মনে প্রশ্ন উদয় হয় না কি—জ্ঞানের সঙ্গে মানুষে মানুষে ঐক্যই জাগে, না অনৈক্য?

অন্ততঃ অনেকের হয়—এ নিশ্চয়। যাঁদের হয় না—যাঁরা "চিরন্তন, বিশ্বজনীন, সত্য"—প্রভৃতি কয়েকটি কথার উপরে একান্ত আস্থা ও অনন্ত নির্ভরের বোঝা চাপিয়ে নিজেদেরকে হাল্‌কা মনে করতে পারেন তাঁরা সৌভাগ্যবান্‌। কিন্তু যাঁরা (ষ্ট্রেচি, আলডুস হাক্‌স্‌লি প্রভৃতির মতন) তা না পারেন? যাঁরা বাস্তব জীবনে এসব 'ডগ্‌মা'-র স্বপক্ষে প্রবর্দ্ধমান ও অবিসংবাদিত সাক্ষ্য চান—তাঁরা বোধ হয় একটু ভড়কে না গিয়েই পারেন না। সশঙ্কে স্বীকার করছি আমি এই ভড়কে-যাওয়া দলের। সলজ্জে স্বীকার করছি জীবনে approximations towards truth খোঁজাকে আমি কাম্য মনে করি। সদুঃখে স্বীকার করছি "ভিন্নরুচির্হি"—কথায় আমার মন সান্ত্বনা পায় না—যদি দেখি হৃদয়ের সৌন্দর্য্যবোধ, সূক্ষ্মদৃষ্টি, আনন্দানুভূতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদবোধই বাড়ে—সত্যদৃষ্টির মিল কমে।

অথচ অকরুণ বাস্তব হৃদয়ের এই মিলনের কামনাকে, দরদের তৃষ্ণাকে তো দেখি পদে পদেই দলিত বিধ্বস্ত ক'রে চ'লে যায়। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন এখানকার একটি পার্শী সাধক কবিকে (নাম সি ডি শেঠনা বা অমল কিরণ) লেখেন: "If you send your poems to five different poets, you are likely to get five absolutely disparate and discordant estimates of them."* কথাটা যে সত্য—তা বার বার দেখেছি,—শুধু গত যুগের ইতিহাসেই নয়, আধুনিক নানা কবি সম্বন্ধে নানা মনীষীর রায়েও বটে। কিন্তু দেখে গোলই বেড়েছে, কিছুই পরিষ্কার হয় নি। চিন্তাশীল মনস্বী আলডুসও এতে বিমর্ষই হ'য়ে লিখেছেন যে হায় রে—"The machinery for creating values universal" হ'লে হবে কি—যখন "the values must be manufactured?" এ থেকে কোনো সাধারণ ব্যাপক দার্শনিক সিদ্ধান্তে তিনি (বা ষ্ট্রেচি) পৌছতে পারেন নি, শুধু এই হতাশ সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে "The process has not yet been rationalized; value-making is still a village industry"। স্বতঃই নিরাশ সত্যসন্ধানী হৃদয় প্রশ্ন ক'রে বসে: "ততঃ কিম্?" কোনো দিশা কি কেউ পাবেই না কোনোদিন?—মানুষ চিরদিন রসবোধের ক্ষেত্রে থেকে যাবে স্বৈরাচারী, ভেদপন্থী? একজনের আকাশ আর একজনের কাছে আকাশকুসুমই থেকে যাবে—চিরদিন? এই কি সমালোচনার শেষ কথা?

জানি না। ইতিহাসে কোনো orientation বা দিক্-নির্ণয়ের প্রমাণও পাই না। সুতরাং কী করা? না, রসবিচারে একান্ত ক'রে ব্যক্তিগত মতামতের দায়িত্ব নিয়েই রায় দেওয়া—যদি রায় প্রকাশ্যে দিতেই হয়।—এই ব'লে সমালোচনা করা যে অমুক অমুক জিনিষ "আমার" ভালো লাগে, অমুক অমুক জিনিষ "আমার" ভালো লাগে না। আর কেন ভালো লাগে বা লাগে না সে-বিষয়েও কারণ দর্শানোর সময়ে একটুখানি চেতনা রাখা ভালো যে এসব কারণ বা যুক্তি শুধু সমপ্রকৃতি, সমরুচি দু'চারজনের কাছেই দরদ পেতে পারে—অন্যের কাছে নৈব নৈব চ। সাধে কি ভবভূতি "বিপুলা পৃথ্বী" ও সমানধর্ম্মা-র কাছে প্রসাদ যাচ্ঞা করেছিলেন? বস্তুতঃ রসবিচারে বোধহয় একমাত্র সান্ত্বনাই এই, কতিপয়ের সাড়া—কতিপয় সমমরমীর প্রীতি।

> "মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা,
> দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।"

তাই শুধু এই রকম দু'চারজন সমদরদীর জন্যেই গল্স্‌ওয়র্দ্দির এ-দুটি বইয়ের একটু "পরিচয়" দেব। "সমালোচনা" কথাটি ব্যবহার না ক'রে "পরিচয়" কথাটি ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করলাম, কারণ objective criticism ব'লে যদি কোনো বস্তু না-ই থাকে তবে তাকে সমালোচনা বলা হবে অসঙ্গত। আমি শুধু বই দু'খানি প'ড়ে আমার subjective তথা personal reaction সম্বন্ধে দু-একটি কথা লিখ্‌ব। এর বেশি দাবী আমার নেই।

---

*শেঠনার কবিতা নিন্দা করেন আমার এক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ভারতীয় বন্ধু;—আমি বিখ্যাত কবি A. E-কে শেঠনার চারটিমাত্র কবিতা পাঠাই, তাতে A. E খুশী হ'যে শেঠনার কবিতার খুব সুখ্যাতি ক'রে আমার নিকট একটি চিঠি লেখেন।

ইংলণ্ডে একদল লোক আছেন, যেমন ফর্ষ্টার, যাঁরা ডি এইচ লরেন্সকে বলেন আধুনিক ইংলণ্ডের greatest imaginative novelist ; আর একদল আছেন, যেমন ল্যাস্কি বা জুলিয়ান হাক্‌স্‌লি, যাঁরা এইচ জি ওয়েল্‌স্‌কে এ পদ দেন ; আর একদল—জন গল্‌স্‌ওয়র্দ্দিকে। আমি এই শেষ দলের লোক। এবং যাঁরা মনে করেন যে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির সব চেয়ে বড় বই হচ্ছে তাঁর "ফরসাইট সাগা"—তাঁদের রুচি ও উৎসাহের সঙ্গে আমার মেলে। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" বইটি "সাগা"-র সর্ব্বশেষ পুস্তক, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত।

মনে আছে ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডে যখন "সাগা" প্রথম পড়ি তখন আমার একটি স্কচ চিত্রী বান্ধবী বলেছিলেন যে এ বইখানির প্রতি চরিত্র যেন চোখের ওপর ভাস্‌তে থাকে—এদের যেন পথে ঘাটে দেখা মেলে। আর একটি ইংরাজ ব্যাঙ্কার চিন্তাশীল বন্ধু আমাকে বল্‌তেন যে অনেক চিন্তাশীল ইংরাজই সানন্দে স্বীকার করেন যে "সাগা"-য় এ-যুগের ইংরাজ জাতি তার সুসম্পূর্ণ রূপ নিয়ে যেরকম সুসমঞ্জসভাবে ফুটে উঠেছে—"convincingly,"—সেরকম ছবি অন্য কোনো আধুনিক ইংরাজ লেখকের লেখায়ই ফোটেনি। এ দলের লোকের মতেও আমি পূর্ণভাবে সায় দিই। "সাগা"র নানা চরিত্রই ইংলণ্ডে চোখে পড়ে। বিশেষ ক'রে "সাগা" পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'তে হয় তার নিপুণ চরিত্র-চিত্রণে। তাছাড়া আরও অনেক গুণে এ বইটি দীপ্তিমান্‌ঃ সুবৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে, দৃষ্টির ব্যাপকতায়, অনুভবের পেলবতায়, ভাষার প্রাঞ্জল সৌন্দর্য্যে ও সর্ব্বোপরি পরিপূর্ণ সত্যতায়, সুষমায়। শুধু একটি বনস্পতি ফুটিয়ে তোলা নয়,—তার প্রতি পাতাটির দিকে শিল্পীর সজাগ দরদ, নিবিড় স্নেহ।

"সাগা"-র খণ্ড-পর্য্যায় বোধ হয় এইঃ The Man of Property ; In Chancery ; To Let ; The White Monkey ; The Silver Spoon ও শেষ খণ্ড The Swan Song।

কিন্তু শেষেরও শেষ আছে—অথচ সে শেষও নয়। এই রকম একটি—সংজ্ঞা দেওয়া যায় না এমন বই হচ্ছে "অন ফরসাইট চেঞ্জ"। এর ভূমিকায় এর আকস্মিক জন্মলাভের ইতিবৃত্তান্তে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি বল্‌ছেনঃ "Before a long-suffering public...I lay this volume of apocryphal Forsyte tales, pleading two excuses : That it is hard to part suddenly and finally from those with whom one has lived so long ; and that these footnotes do really, I think, help to fill in and round out the chronicles of the Forsyte family"।

যাঁরা এ-কথায় সাড়া দেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। আমরা বলি—"বিদায় নেওয়ার দরকার কি কবি? যার সাথে মিলন এত সুন্দর তাকে বিদায় দেবার এত তাড়াই বা কেন?" বাস্তবিক গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির "সাগা"-কে বিদায় দিতে আমাদের মন যে কত অনিচ্ছুক তা যেন তাঁর এ অপ্রত্যাশিত বইখানি পড়বার সময়ে নতুন ক'রেই উপলব্ধি করলাম। মনে আছে ঠিক্ একথা মনে হ'ত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তৃতীয় খণ্ড হঠাৎ পেয়ে।—তিনখণ্ড প'ড়ে মনে হ'ত আরও তিনখণ্ড হ'লে ক্ষতি কী ছিল? মনে হ'ত "জন ক্রিস্‌টফার" পড়ার সময়ঃ—দশখণ্ড প'ড়ে মনে হ'ত আরও দশখণ্ড হ'লে তবেই বুঝি মনটা খুসিতে ভরত। মনে হ'ত ডষ্টয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজফ" পড়বার

সময় :—হাজার পাতা পড়া শেষ হ'লে প্রাণ চাইত আরো হাজার পাতা কেন লেখা হ'ল না? অবশ্য একদল লোক আছেন জানি—যাঁরা উপন্যাসে চান শুধু চিত্তবিনোদন, যাঁরা তারস্বরে বলেন "সময় যে নাই—ছোট করো কবি, গল্প এমন ছোটই করো যাতে ট্রেণে ট্রামে ব্যস্ত ভাবে প'ড়ে ক্লান্ত শরীরে চোখ বুলিয়ে গিয়েও রস পাওয়া চলে—সমাজের একটা bird's-eye-view পাওয়া চলে।" তাঁদের সঙ্গে একটুও বিবাদ নেই আমাদের। কেবল ব'লে রাখা যে অন্ততঃ আমরা দীর্ঘ উপন্যাসের যুগ গত ব'লে মনে করি না। আমরা এ ব্যস্ততাধূমল যুগেও গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির চিরসবুজ "সাগা"-কে মনেপ্রাণে অভিনন্দন করি—ও তাঁর "সাগা"-র এ নব-পরিশিষ্ট পেলে "long-suffering public"-এর দুঃখের দরদী হ'তে একদম চাই না। আমরা চাই কৃতজ্ঞ হ'তে "অন ফরসাইট চেঞ্জের" মধ্যে বহু পুরোনো আলাপীর হঠাৎ দেখা পেয়ে। আমরা চাই সেই যুগের নানা সুকুমার সৌরভ গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির লেখায় পেতে যে-যুগ অস্তমিত হয়-হয়। এবং সর্ব্বোপরি আমরা চাই তার পরিচয় পেতে যা এ-যুগের লেখকদের মধ্যে খুব কমই পাই—"লেখার-পিছনকার-মানুষটি"-র (এমার্সনের কথা "Talent alone does not make a writer, there must be a man behind the book"); বর্ত্তমান যুগের একটা অবিসংবাদিত প্রবণতা বোধহয় এই যে, পুস্তকের সংখ্যা যতই বাড়ছে লেখকের সংখ্যা ততই কম্‌ছে। ইংলণ্ডে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি, লরেন্স, আলডুস, ওয়েল্‌স্‌ প্রমুখ জনকয়েক শিল্পীর সম্বন্ধেই কেবল জোর ক'রে বল্‌তে পারি there is a man behind the book। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" পড়তে পড়তে কি জানি কেন বার বার মনে হচ্ছিল যে এই mass-production-এর যুগে, state-worship-এর যুগে, standardization-এর যুগে এরকম লেখককে বোধ হয় অঙ্কুরেই নিষ্পিষ্ট ক'রে মারা হবে—বই-ই বেরুবে, মানুষ যাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। এজন্যেও বইখানি ভালো লেগে থাক্‌বে। একটা বই তো একটা কারণে ভালো লাগে না, লাগে অনেক কারণে।

এ-বইখানির আর একটি মহৎ গুণ—এর একান্ত অভিনবত্ব।-মানে, বইটির কোনো নাম দেওয়া কঠিন, এই গুণটি। এইজন্যেই বোধ হয় গ্রন্থকার এর নাম দিয়েছেন—পাদটীকা—"footnotes"; সত্যিই এ অনামী। অন্ততঃ কোনো উপন্যাসের এরকম পাদটীকা তো আমার চোখে পড়েনি। এর অধ্যায়গুলির মধ্যে না আছে unity, না selectiveness, না গল্পের কোনো চলতি কোড মানার নিদর্শন। আছে কেবল এক অপূর্ব্ব রস।

অথচ এ-ও আমি জানি যে একদল লোক ঠিক এই জন্যেই এতে রস পাবেন না। তাঁরা বল্‌বেন গল্পের মধ্যে যদি গল্পত্বই না রইল, ঐক্যই না রইল, নির্ব্বাচনের নীতির মর্য্যাদাই না রক্ষিত হ'ল তবে আর্টের যে ভরাডুবি হবেই। এ-রকম স্থলে তর্ক নিষ্ফল। যেহেতু স্বয়ম্বরার মতন রসবিচারেও অজ্ঞাতকুলশীলকে যদি রুচিদেবীর মনে না ধরল তবে তার ওপর আর না চলে আপীল, না কাকুতিমিনতি।

তাই আমরা সে-চেষ্টা করব না। আমরা শুধু বল্‌ব যে আমরা সেই দলের লোকের সমরুচি (যেমন ওয়েল্‌স্‌, লরেন্স, আলডুস) যাঁরা এসব বিধান মানেন না; সেই সব লোকের সমপ্রত্যয়ী যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে উপন্যাসের টেকনিক আজ একরকম হ'লে কাল সম্পূর্ণ উল্‌টো রকম হ'তে পারে না; সেই সব লোকের সমমনা যাঁরা মনে করেন না যে গল্পের রসপ্রবাহের কোনো চিরন্তন ধারা আছে।

এবং এই রকম যাঁদের রুচি তাঁদের মন "সাগা"-র টেকনিকের নিত্য নব পরিবর্ত্তনে ব্যাহত হবে না। তাঁরা তেম্নি ক'রেই "সাগা"কে অভিনন্দন করবেন যেমন ক'রে করেন একটি সুন্দর গভীর নদীকে। তার স্রোত এঁকা বেঁকা, সরল জটিল, নানা সময়ে নানা খাতেই বয়। বইবেই তো। সে যে জীবন্ত—কোনো অনড় প্রিন্সিপ্‌লের নিষেধ-তটকে মেনে চল্‌বে কেন? ইচ্ছে হ'লেই কূল ছাপিয়ে যায়—না মানে unity, না মানে selectiveness, না মানে action। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" প'ড়ে মুগ্ধ হবার সময় একথা বারবারই মনে হয়। মনে হয় এ যেন একটা মহাভারতের পরে "প্রক্ষিপ্ত" রচনা। তফাৎ এই যে "প্রক্ষিপ্ত" অপরে রচে, এ সব পাদটীকা রচেছেন গ্রন্থকার নিজে।

এ বইখানি পড়ার সময়ে মনকে খানিকটা এভাবে উদার, মুক্ত ও নির্ব্বন্ধন ক'রে নিতে পারলে এর ভিতরকার রসটিতে মন বোধহয় সাড়া না দিয়ে পারে না। ধরা যাক্ বইটির "Cry of Peacock" অধ্যায়ে সোম্‌সের আইরিনির প্রতি পূর্ব্বরাগের তীব্র আবেগের চিত্রটি। কিংবা চিরকুমারী আণ্ট জুলির ব্যর্থ ভালোবাসার নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসের ছবিটি। কিংবা রোজারের গৃহে তাদের বাট্‌লার স্মিথকে ছাড়িয়ে দেবার দরুণ তাঁর শিশুপুত্র ইউষ্টেস ও কন্যা ফ্রান্সির বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার কোমল হাস্যকর দৃশ্যটি। কিংবা টিমথির ওখানে একটা রাস্তার কুকুর নিয়ে সেই তুমুল কাণ্ডটি।...কত বল্‌ব? এ-সবের কোনোটাই গল্প নয়। অথচ এর চিত্রগুলি এমন এক নতুন ঢঙে লেখা, এমন এক নতুন ভঙ্গীতে দেখা, এমন সুন্দর ভাষায় আঁকা ও এমন স্নিগ্ধ রসিকতায় আদ্যন্তমধুর, যে গম্ভীরানন শ্মশ্রুবহুল সমালোচককেও করজোড়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয়ঃ "ম'শায়, কোনো কোডে বিচার না ক'রে একে দেখ্‌বার ঠিক্ ভঙ্গীটি অর্জ্জন করুন—শ্রম সার্থক হবেই। যে-পুরস্কার পাবেন তাতে মন ভরবেই।"

কিন্তু তবু মুস্কিল হয় একটু। এদের কী নাম দেব? এরা কী জাত?—এদের কোন্ angle থেকে দেখ্‌লে দেখাটা ঠিক্‌মতন হবে?—এই ধরণের প্রশ্ন জাগেই প্রথমটা। অন্ততঃ বইটির প্রথম কয়েকটি অধ্যায় প'ড়ে আমার তো জেগেছিল। কিন্তু সে দোষ লেখকের নয়—পাঠকেরই। কারণ স্রষ্টা যে, দাতা যে, তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করার দায়িত্ব গ্রহীতারই। বারবার অনেক ভালো জিনিষ প'ড়েই একথা আমার মনে হ'য়েছে; যেমন আলডুসের সুন্দর নক্সা Crome Yellow বা বড় গল্প Two or Three Graces; ওয়েল্‌সের Undying Fire বা World of William Clissold; বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" বা "অপরাজিত"; বুদ্ধদেবের "নিরঞ্জন রায় ও উমা" বা "সাবিত্রী বোস ও অতনু মিত্র"; আনাতোল ফ্রাঁসের Dieux ont Soif বা Revolte des Anges; শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বা "শেষ প্রশ্ন"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা নতুন টেকনিক আছে। অতীত যুগের কোডকে এরা মানে নি। হয়ত তাতে ক'রে এরা কোনো কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানও লঙ্ঘন ক'রে থাক্‌বে। কিন্তু তাতে কী? আমার মনে হয় না যে তাতে কোনো লেখার মূল্য এক তিলও কমে, যদি তার মূলে একটা সত্য প্রেরণা—urge থাকে। গল্পের নানা মামুলি দাবীর বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মনস্বী ওয়েল্‌সের বিদ্রোহে আমি পূর্ণভাবে সাড়া দিই *ঃ

* Boon বইটিতে ওয়েল্‌সের কথাগুলি আদ্যন্ত পড়তে "পরিচয়ের" পাঠক পাঠিকাকে অনুরোধ করছি, স্থানাভাব না হ'লে সবটুকু উদ্ধৃত করতাম। আক্রমণটি Henry James-এর উদ্দেশে।

"He wants unity . . . homogeneity. Why *should* a book have that? His 'Notes and Novelists' is one sustained demand for picture effect, which is the denial of the sweet complexity of life, of the pointing this way and that, of the spider on the throne . . . Life is diversity and entertainment, not completeness and satisfaction. All actions are half-hearted, shot delightfully with wandering thoughts—about something else. All true stories are full of irrelevancies. James . . . sets himself to pick the straws out of the hair of life before he paints her. But without the straws she is no longer the mad woman we love."

জানি একদল লোক আছেন যাঁরা এ কথায় সায় দেবেন না—যাঁদের কাছে "অন ফরসাইট চেঞ্জ" ভালো লাগ্‌তেই পারে না, এ নিয়ে তর্কও তাঁরা করবেন, এবং করাও কঠিন নয়—কোন তর্ককে না টেনে লম্বা করা যায়? কিন্তু আমি তর্ক করবার জন্যে এ-নজীরের অবতারণা করি নি। মনে হচ্ছে যেন কোথায় প'ড়েছিলাম যে, রসের সমালোচনা হচ্ছে পাদ্রীর চার্চ্চে বক্তৃতার মতন—যারা সে মতে দীক্ষিত কেবল তারাই সাড়া দিতে পারে। কথাটা আর্টের বিশ্বজনীনতা-র নীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু বাস্তবের সাক্ষ্যের স্বপক্ষে। তাই ফের পুনরুক্তি ক'রে বলি (ক্লাইভ বেল সাহেবের নজীর দিয়ে যে because I wish to be understood……I shall repeat myself) যে এ-প্রশস্তি কিছু প্রমাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়, এ লেখা শুধু তাঁদেরই জন্যে যাঁরা খানিকটা আমাদের সমধর্ম্মী।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির অনুরাগী তথা ভক্তদের নিবেদন করছি যে তাঁর শেষ উপন্যাস Maid in Waiting আমাকে নিরাশ ক'রেছে। বইটির কোথাও যে একেবারেই ভালো লাগে নি তা বল্‌ছি না অবশ্য, কিন্তু গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির কাছে বড় দাবী রাখি ব'লেই বাজে—আশা না পূরলে। কেন আশা পূর্ণ হয় নি বল্‌ছি। সংক্ষেপেই বল্‌ব—কারণ যা ভালো লাগে নি তার সমালোচনা করতে বা কেন লাগে নি প্রকাশ্যে বল্‌তে আমার একটা প্রকৃতিগত অনিচ্ছা আছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই : একটি ইংরাজ যুবক হিউবার্ট, এক আমেরিকান প্রফেসর হালরসেনের সঙ্গে যান বলিভিয়ায় এক নৃতাত্ত্বিক অভিযানে। সেখানে হিউবার্ট কয়েকটি বলিভিয়ান বর্ব্বরকে প্রহার করেন, ও একজনকে করেন গুলি! প্রফেসর তাঁর নামে তাঁর বইয়ে লেখেন—অত্যাচারী ব'লে। তাতে হিউবার্টের কমিশন যায় যায়—পার্লিমেণ্টে প্রশ্ন ওঠে। ধীরে ধীরে সে বেচারী নিরন্ন বে-আব্রু হয় আর কি। তার বোন ডিনি—ইনিই নায়িকা—নানান লর্ড, অফিশিয়াল প্রভৃতির সঙ্গে চুপি চুপি দেখা ক'রে হিউবার্টকে বাঁচাতে চা'ন। (এই wire-pulling নিয়ে কবি নানা স্থলে ভারি উপভোগ্য ব্যঙ্গ ক'রেছেন—অতি উপাদেয় সিনিসিজ্‌ম্) ডিনির হঠাৎ খেয়াল চাপে প্রফেসর হালরসেনের সঙ্গেও দেখা করার। হালরসেনের তাঁর প্রতি 'দরশনে উপজিল প্রেম' আর কি। পরিণাম—তিনিই হিউবার্টের সমর্থক হ'য়ে দাঁড়ালেন—প্রকাশ্যে কাগজে ভুল স্বীকার করলেন। (এই সূত্রে আমেরিকান সভ্যতার উপরে গ্রন্থকার কয়েকটি সস্তা উদারনৈতিক সার্টিফিকেট দিয়েছেন—যে-ধরণের প্রশংসার মধ্যে আছে হিন্দুমুসলমান-মিলনপন্থী propagandist-এর ভাব যা শিল্পপ্রাণ গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির কোনোদিন ছিল না।)

এর পরের অংশটি গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি বেশ সুন্দর ফুটিয়েছেন। দেখিয়েছেন,

যে চাকা একবার গড়িয়েছে—অফিশিয়াল চাকা—সে আর থামতে চায় না—প্রায় নিউটনের Law of Inertia অনুসারে গড় গড় ক'রে চলে আর কি। কত রকম রেড টেপ, প্রেস্‌টিজ, ভ্রূকুটি—সে কত কী!··· খুব উপভোগ্য। শেষটায় হিউবার্ট মুক্তি পেল অবশ্য—কিন্তু নানা গণ্ডগোলের পর। সে চিত্রটিও মন্দ না—যদিও কথনো একবারও মনে হয় না যে হিউবার্ট সত্যিই ডুব্‌তে পারে অর্থাৎ বিপদের ছায়া গ্রন্থকার তেমন নিপুণভাবে ঘনিয়ে তুলতে পারেননি এডগার আলেন পো বা কনান ডয়েলের মতন।

এর মধ্যে নানা সাব-প্লট আছে। যথা হিউবার্টের কাকা অ্যাড্রিয়ানের ডায়ানা ব'লে একটি মধ্যবয়স্কা সুন্দরীর প্রতি অনুরক্তি; তার স্বামী Captain Ferse-এর সুস্থ থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে পাগল হ'য়ে আত্মহত্যা করা; হিউবার্টকে একটি মেয়ের এক রকম জোর ক'রে চড়াও হ'য়েই বিবাহ করা ও এয়ারোপ্লেন চড়া শেখা (যদি হিউবার্টকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে সে তাকে নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে তুর্কীতে পালাবে—এই উদ্ভট মৎলবে) পাণিপ্রার্থী হালরসেনকে ডিনির ভালো লাগা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করা—(নইলে সে উদাসিনী হ'তে পারে না ব'লেই বোধ হয়!) ইত্যাদি ইত্যাদি। সবের মধ্যে নানা স্থলেই verisimilitude বা probability-র আশ্চর্য্য অভাব।

একদল লোক আরও আপত্তি তুল্‌বেন এই ধরণের সাব-প্লটের বিরুদ্ধে। ঐ unity-র অভাবের আপত্তি, অবান্তরতার আপত্তি। কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই, কারণ ব'লেছি গল্পে অবান্তর নানা প্রসঙ্গ থাকা আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি। (এবিষয়ে আলডুসের Tragedy and the Whole Truth-নামক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।) আমার আপত্তি —এ সব অবান্তর বিষয় গল্পের মধ্যে উঁকি দিয়েছে ব'লে না—আমার আপত্তি এসব অবান্তর বিষয়বস্তু তেমন সরস হ'য়ে ফুটে ওঠেনি ব'লে। কয়েকটি মাত্র কারণ দিই কেন ওঠেনি আমার কাছে: প্রথমতঃ, গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির ভাষার বিস্ময়জনক অবনতি; তিনি এত বেশি slang ব্যবহার করেছেন যে আক্ষেপই হয়; মডার্ণ হ'তে হ'লে এ চাই বল্‌লে শুনব না, কারণ আলডুস, বা লরেন্স বা ওয়েল্‌স্‌ তাঁর চেয়ে কম মডার্ণ নন কিন্তু এঁদের ভাষা আত্মসম্মানী। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নানা স্থলে যে সব কারুণ্য ফোটাতে চেয়েছেন তাতে অকৃতকার্য্য হওয়া —যেমন ডায়ানার স্বামীর পাগল হ'য়ে যাওয়া; তৃতীয়তঃ, অ্যাড্রিয়ানের সঙ্গে ডায়ানার প্রেম জমিয়ে তুলে হঠাৎ মাঝরাস্তায় তাদের নিষ্করুণ হ'য়ে ছেড়ে দেওয়া, এবং শেষতঃ (এবং এইটেই সব চেয়ে বড় ত্রুটি) গল্পের নায়িকা ডিনির কিছু "হ'য়ে উঠ্‌তে না পারা।" সকলেই যে 'জীবনে' কিছু হয় তা বলি না—কিন্তু 'রসসাহিত্যে' প্রতি চরিত্রের কিছু-একটা হওয়া চাই-ই—যে কথা গতবারে শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য বলেছেন। তার জীবন ব্যর্থ হোক্ কি সার্থক হোক্ তাতে কিছু যায় আসে না (মানে আমাদের রুচি-মতে অবশ্য) কিন্তু ব্যর্থতা বা সার্থকতাও যদি ভালো ক'রে না ফুটে ওঠে তবে বিলক্ষণ যায় আসে। Maid in Waiting-এ গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির এ লিপিদৌর্ব্বল্য দেখে বিস্ময় লাগে। মনে হয় কোনো সত্যিকার প্রেরণা—urge—নিয়ে এ বইটি লেখা নয়, লেখ্‌বার জন্যেই লেখা। নইলে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি যে কারুণ্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পারলেন না এর চেয়ে বিস্ময়জনক বস্তু কি হ'তে পারে? অবশ্য বইটির মধ্যে মাঝে

মাঝে দীপ্তি সুন্দর, ব্যঙ্গ উপভোগ্য, রেখাপাত হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগে—এ শক্তিমানের শক্তিও কি পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল? তবে ফের বলি এ আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত মতামত। কেন-না এ-ও সম্ভব যে খুব একজন গভীর দৃষ্টি, তীক্ষ্ণধী, স্রষ্টা শিল্পী ও সমালোচক বল্‌বেন "গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির Maid in Waiting-এ তাঁর প্রতিভার যে সুসমঞ্জস বিকাশ, যে অভিনব ভঙ্গী, যে লিপিচাতুর্য্য একটা নতুন পথ কেটে নিয়েছে তাতে" ইত্যাদি—এবং একথা যদি কেউ বলেন, স্বীকার করতে হবে যে তাঁর সে মত ভুল মনে করার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেওয়া যায় না।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পত্রাবলী—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান (শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত) মূল্য ১৲ টাকা।

Science and Human Experience—HERBERT DINGLE, (Williams & Norgate).

The Scientific Outlook—BERTRAND RUSSELL, (George Allen & Unwin Ltd.).

Brave New World—ALDOUS HUXLEY, (Chatto & Windus).

য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত কয়েক বৎসর ধ'রে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সীমানা নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে, প্রথম বইখানি তারই জের টেনেছে বাংলা দেশে। বইখানিতে যে-কয়েকটি প্রবন্ধ (প্রবন্ধ ছাড়া এদেরকে চিঠি বলা যায় না) ছাপা হয়েছে, সেগুলি ইতিপূর্ব্বে নানা মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকদের মনকে সর্ব্বপ্রথম সজাগ করে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই এই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও সমন্বয় নিয়ে বিদেশী ভাষায় লেখা অনেক বই পড়েছিলেন। কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী ভাষায় চিন্তা করার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে বিশ্বাস করি, সেইজন্য 'পরিচয়ে'র মারফৎ সমগ্র বাঙ্গালী পাঠকদের এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধের কথা শুনলেই পরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্কটের কথা মনে হয়। বৈদ্য-হাকিমের টোটকা, এলোপ্যাথের কড়া দাওয়াই, এবং হোমিওপ্যাথের জল-পড়া খেয়ে রোগী সারুক আর নাই সারুক, তার আর্থিক অবনতি ও মানসিক অবসাদ যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। যখন লক্ষ্য করি, আমাদের দেশের মনকে কুসংস্কার কি ভীষণভাবে ঘিরে রয়েছে, যখন দেখি ধর্ম্মের নামে যত রকম ফাঁকি সম্ভব ততরকম ফাঁকি আমাদের শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীরা নিজেদের মনকে দিতে ক্রুটি করছেন না, তখন মনে হয় বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এমন-কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-তন্ত্রের যতটা প্রসার হয় ততটাই মঙ্গল। পরে কি হবে, বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজের গোটাকয়েক মূল্যবান জিনিষ নষ্ট হবে কি না, ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একটা অমানুষিক গড়পড়তার চাপে নষ্ট হবে কি না, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সমীকরণে বৈচিত্র্য তার রং খোয়াবে কিনা—এ সব ভাবতেও ইচ্ছা করে না।

হয়ত লোকে আবার একটা নতুন রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হবে—প্রমথবাবুর কথা অনুসারে; সমাজ হয়ত বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাবিধি ও তাদের স্বার্থজড়িত মত প্রচারের তাড়নায় একটা নিষ্ঠুর ও শক্তিশালী সঙ্ঘের অধীনে গিয়ে পড়বে—হাক্‌সলী ও রাসেলের কথামতো; তবুও ভারতবর্ষের অনেক উপকার হবে ভেবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বহুল প্রচার সম্বন্ধে ভীত হই না। মনে হয়, এ দেশে বিজ্ঞান ছাড়া কোন উপায় নেই। আশুফললাভের আশায় আমি অনেকটা ছাড়তে রাজী। একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা জগদীশ, একটা রামণে আমি নিশ্চিন্ত নই। আমাদের average নেহাইৎ নীচু, তাকে তুল্‌তে হলে বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিতে হবে, ধর্ম্মের নয়। রাসেল সাহেব যে average-এর ভয় দেখিয়েছেন তাতে কাবু হই না, কারণ, average death-rate যত বেশী হোক না কেন, সে মৃত্যুহারের জোরেই কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু অবধারিত নয়—নচেৎ হিন্দুসমাজের রক্ষক বৃদ্ধের দল এখনও বেঁচে রয়েছেন কেন? Average মানে বড়র মাথা কেটে বেঁটের মাথায় জুড়ে দেওয়া নয়—এই কথাটি জানলে বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের সর্ব্বনাশ হবে ভেবে অ-সাধারণ ব্যক্তির খেদ করার ততটা প্রয়োজন থাকে না।

আমার মনের কথা লিখলাম। তবুও ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধটুকু থেকেই গেল। বিরোধটার প্রকৃতি জানতে হ'লে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রসম্বন্ধে ভৌগলিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। Dingle সাহেব বোধ হয় হগ্‌বেনের ভাষা গ্রহণ ক'রেই বলছেন—বিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে the recording, argumentation and rational correlation of those elements of our experience which are actually or potentially common to all normal people। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে আলোচনা করা যায়, যাকে প্রকাশ করা যায় অন্যের কাছে। ধর্ম্মের সংজ্ঞা তিনি দেন নি—শুধু বলছেন যে, এর ক্ষেত্র হচ্ছে private, এবং বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ক্ষেত্র যেকালে আলাদা তখন প্রত্যেকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন, এই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু গোল বাধে এইখানে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস যদি এই সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন একটি অংশ নিয়ে তৈরী হয়, কিংবা কোন মানুষ যদি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যেভাবে সত্য ঠিক্ সেই ভাবে সত্য বিবেচনা করেন, তাহ'লে বিরোধ অনিবার্য্য। এই যেমন, পৃথিবী ছয় দিনে তৈরী হয়েছিল, ভগবান সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছেন। এ সব স্থলে বিজ্ঞানের দাবী ধর্ম্মের চেয়ে বেশী। এই রকম একাধিক প্রকার বিরোধের বিষয় উঠতে পারে। প্রত্যেক বিষয়ে বিজ্ঞানের attitude আলাদা।

"In considering the relation of science to religious creeds, then, we must recognise three attitudes which science can take, according to the character of the creed in question: it can make a final pronouncement, it can reserve judgment, or it can influence the probability with which a particular dogma is invested."

অতএব সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-বাক্য গ্রাহ্য নয়। অন্য দিক থেকে, ধর্ম্মও বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ধর্ম্ম এই সাধারণ অভিজ্ঞতা

সম্বন্ধে কোন মতামত জাহির করছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ধর্ম্মের পক্ষে খুবই সাজে। ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে Dingle-এর এই মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য।

"The individual man may correlate his own experiences, whether of common or individual nature in a single whole with complete validity, and if in so doing he finds the assumption of God necessary, his position in adopting it is impregnable."

তাই ব'লে ভগবানকে potentially common experience-এর বিষয় মনে করতে পারার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই; তা করতে হ'লে তাকে দাঁড়াতে হবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অন্যান্য অভিজ্ঞতারই মত কোন অভিজ্ঞতার ওপর। God of Reason ব'লেও কিছু একটা থাকতে পারে। বিজ্ঞানের কাজ শুধু correlation নয়, augmentation of experience-ও বটে, এবং এই সূত্রে বিজ্ঞান এমন অনেক hypothesis ব্যবহার করে, যেগুলি সত্য ব'লে প্রমাণিত হওয়ার পরে সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই হিসাবে hypothesis of God হয়ত পরে আবশ্যক হবে, পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় যদিও তার কোন সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। যদিও হয়, তাহ'লে সে ভগবান না হবেন কেষ্ট ঠাকুর, না হবেন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। জীন্সের ভগবান তাঁর নিজের দার্শনিক সংস্কারের দ্বারা তৈরী, তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সাধারণ পাঠকের তর্কবুদ্ধি দ্বারা সে ভগবান প্রতিষ্ঠিত হন নি। এডিংটনের mind-stuff-ও ঐ ধরণের ব্যক্তিগত সংস্কার মাত্র। রাসেল ঠাট্টা ক'রে ঠিকই লিখেছেন—

"It is, I suppose, natural that every man should fill the vacuum left by the disappearance of belief in physical laws as best as he may, and that he should use for this purpose any odds and ends of unfounded belief which had previously no room to expand. When the robustness of Catholic faith decayed at the time of the Renaissance, it tended to be replaced by astrology and necromancy, and in like manner we must expect the decay of the scientific faith to lead to a recrudescence of pre-scientific superstitions."

এ ভয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নচেৎ এডিংটন্ ধর্ম্মের ধ্বজা তুললেন অণুর পাগলামি দেখে, আর জীনস্ এক আজব ভগবান খাড়া করলেন সেই একই অণুর ভদ্র ব্যবহারের ওপর! নচেৎ কোন্ এক বিশেষ বিশ্বাসের দ্বারা জীবনটা সমগ্র ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল তারই পরিচয় না দিয়ে দিলীপকুমার আশ্রয় খুঁজতে যান এই সব দার্শনিকদের কাছে! এ সব বিষয়ে নিজের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাই হল একমাত্র আশ্রয়। অন্যের কাছে তার মূল্য ভিন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চলে না। সেই জন্য মনে হয়, critical mysticism ব'লে একটা মত তৈরী হওয়া অসম্ভব নয়।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আর-একটি বিরোধের বিষয় রয়েছে। অনেকে সন্দেহ করছেন, বিজ্ঞান যে ভাবে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বেঁধে দিয়েছে তাতে ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কোন স্বাধীনতাই থাকছে না। এডিংটনের Physics has gone off the gold standard প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বাণী সত্ত্বেও, বিজ্ঞান এখনও একটা ব্যক্তিসম্পর্করহিত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা পরিচালিত হবে মনে করার

যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 'পরিচয়'-এর পূর্ব্বের সংখ্যায় Planck-এর The Universe in the Light of Modern Physics বইখানির মূল বক্তব্য সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। Planck-এর বক্তব্য এতই মূল্যবান যে, তাঁর বই থেকে কয়েক লাইন তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা।

"In my opinion, therefore, it is essential for the healthy development of Physics that among the postulates of this Science, we reckon, not merely the existence of law in general, but also the strictly causal character of this law. . . . . Further, I consider it necessary to hold that the goal of investigation has not been reached until each instance of statistical law has been analysed into one or more dynamic laws."

এটা determinism-এর কথা। আমি ভাল করেই জানি যে, দার্শনিকের determinism আর বৈজ্ঞানিকের determinism ঠিক্ এক বস্তু নয়, যে-অর্থে দার্শনিক determine কথাটি ব্যবহার করেন, বৈজ্ঞানিক সে-অর্থে ব্যবহার করেন না। কিন্তু সাধারণে এই পার্থক্যকে শ্রদ্ধা করেন না; অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ববিদেরাও করছেন না। তাঁরা হয়ত ঠিক্ কথাই বলেন, কিন্তু তাঁরা যে কারণ দেখান সেটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা বিজ্ঞানের ভুল দেখান, মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক এবং সংখ্যাশাস্ত্রের নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না, কখনও যাবেনা, কেন না তার পুরুষকার প্রবল, এই সব দোহাই পেড়ে। 'But the question of free-will is not concerned with the question whether there is such a definite connection, but whether the person in question is aware of this question !' এই জ্ঞানটুকু ব্যক্তিগত, অর্থাৎ মানুষের গোপন কথা—কিন্তু fact। সেইজন্য এডিংটনের, জীন্সের ঝুটা ধর্ম্মবুদ্ধির চেয়ে প্ল্যাঙ্কের ethical law-এর প্রতি আস্থা আমার কাছে বেশী যুক্তিগত ব'লে মনে হয়। Ethical law-এ বিশ্বাস করলেই বিজ্ঞানের বাঁধাধরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হবার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা মানতে হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠছে—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধগুলি রয়েছে তাদের সমন্বয় হবে কিসে? সভ্যতা কিছু চিরকাল বিরোধের মধ্যে অবস্থান করতে পারেনা। যাঁরা সভ্যতা বলতে মানুষেরই সভ্যতা বোঝেন তাঁরা বলেন যে, একমাত্র ব্যক্তিই এই সমন্বয় সাধিত করবে। আমার মনে হয় যে, অলড্যাস্ হাক্সলি ও রাসেল এই ব্যক্তিগত মানবধর্ম্মে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানব-সমাজের যে যে দোষ বর্ত্তাতে পারে তাই দেখাতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে শেষ অধ্যায়গুলিতে রাসেল যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাই দেখে মনে হয় যে, তিনি মুখ্যত বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক হ'লেও বাস্তবিকপক্ষে নীতিবিদ্ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সমাজে থাকতে হ'লে যে সব values-এর ওপর জোর দিতে হয় তার এত চমৎকার বিবরণ ইংরেজী সাহিত্যে আর কোথাও পড়েছি ব'লে স্মরণ হয় না। একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির জীবনের মধ্যেই বিজ্ঞান তার স্বরচিত নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, এবং সেই মুক্তির সাহায্যে মানুষ এক নতুন সমাজ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করতে পারে—এইটাই হ'ল রাসেলের সমন্বয়। হাক্সলিও রাসেলের সমধর্ম্মী। বিজ্ঞানের standardisation, যার প্রতীক হচ্ছেন হেনরী ফোর্ড, মানুষের ওপর বৈজ্ঞানিক সমীকরণের চাপ, যার প্রতীক হ'ল ওয়াট্সন, বৈজ্ঞানিকের

অত্যাচার যার প্রতীক হ'ল Controller—এ সবের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে Barnard ও Savage, পুরুষ ও স্ত্রীর ভালবাসা, আত্মবলিদান, দুঃসাহস, মানুষের খামখেয়াল, শেক্সপীয়র, অর্থাৎ সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি গোটাকয়েক মামুলী জিনিষ। বিজ্ঞানের অত্যাচারের বিপক্ষে মানুষ যদি এখন থেকে সাবধান না হয়, তাহ'লে তার কি দুর্দ্দশা হবে যদি কেউ ভাবতে চান তবে তিনি যেন হাক্সলির বইখানি পড়েন। আজ পর্য্যন্ত হাক্সলি যত বই লিখেছেন তার মধ্যে এইটাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ রকম নিষ্ঠুর বই সচরাচর চোখে পড়ে না। এত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমরা খানিকটা সহৃগুণ প্রত্যাশা করি। হাক্সলির কিন্তু সহৃগুণ নেই। কিন্তু সব দোষ সহ্য হয় যখন Savage-এর 'I come to bring you freedom' মহাবাক্যটি মনে পড়ে। হাক্সলির বইখানির সাহিত্যিক দোষগুণ দেখাবার স্থান অন্যত্র, তাই শুধু ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ সম্পর্কে তাঁর মত যতটুকু আলোচনা করা যায় তারই আভাস দিলাম। ২৮৩ পৃষ্ঠায় Savage বলছে, 'But I like the inconveniences'। Controller বল্লেন, 'We don't, we prefer to do things comfortably'। Savage তার উত্তর দিলেন, I want God. I want poetry; I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin! 'In fact,' said Mustapha Mond, 'you're claiming the right to be unhappy!' 'All right, then,' said Savage defiantly, 'I am claiming the right to be unhappy!' মোস্তাফা মণ্ড অসুখী হবার অর্থ বোঝাবার পরও যখন Savage বল্লে 'I claim them all,' তখন 'You're welcome' ছাড়া মণ্ডের মুখে কোন উত্তর জোগাল না। বৈজ্ঞানিক-ব্যবস্থাপত্রে অন্য কোন উত্তর লেখা আছে কিনা জানি না।

যে উপায়ে সমালোচনা শেষ করলাম তাতে অনেকে সন্দেহ করবেন যে হয়ত বা আমি হাক্সলির মতো 'Truth is a menace, science a public danger' বলছি। আমার মত তা নয়। আমার মত এই যে, নির্ম্মমভাবে তর্কবুদ্ধি খাটালে যে অবস্থাতেই আসা যাক্ না কেন সেই অবস্থাতেই দাঁড়াবার সাহস থাকা চাই, তবেই মানুষ সৎ হয়। সৎ হ'লেই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ মিটে যায়।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Hero—ALFRED NEUMANN (Martin Secker).
The Hidden Child—FRANZ WERFEL (Jarrolds).

আলফ্রেড নয়মান্ হচ্ছেন ম্যাক্স ব্রড, ভিক্টর মায়ার-এক্হার্ট, ইনা জাইডেল প্রভৃতি জার্ম্মানীর নব-রোমান্টিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের দলের। ওয়াল্টার স্কট বা রিকার্ডা হুকের মত এঁরা নিছক পুরাতন দিনের গল্প ব'লে, বিগত কোন যুগের সাজসজ্জার বর্ণনা করে, জীবনপ্রণালীর চিত্র এঁকে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে চাননি, বর্ত্তমান সময়ের বাস্তবতার গুরুভার এড়িয়ে কোন বিগত কল্পলোকে পালাতে পারেননি। আজিকার দিনের নানা সমস্যায় প্রপীড়িত অন্তরে তাঁরা যখনই কোন গত কালের গল্প বলতে গেছেন, মানব ইতিহাসে কালে কালে যে সব চিরন্তন সমস্যা

এসেছে, তাঁদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে সেইগুলিই মূর্ত্ত হয়েছে; আধুনিক কালের দ্বন্দ্বাকুল দৃষ্টিতে তাঁরা প্রাচীন যুগের জীবনধারা দেখেছেন।

বিশেষতঃ আলফ্রেড নয়মান; ঐতিহাসিক জীবনধারার কথক বা চিত্রকর তিনি নন, তিনি হচ্ছেন নাট্যকার। পুরাতন কোন দিনে যেখানে ঘটনার সংঘাতে, বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে ইতিহাস সমস্যাকুল হয়েছে, তাঁর নাট্যপ্রবণ শিল্পীমন সেই সব বিরোধ-ক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে উপন্যাসের মালমসলা খুঁজেছে। The Patriot উপন্যাসখানি যাঁরা পড়েছেন অথবা The Patriot অবলম্বনে লিখিত এ্যাসলি ডিউকের "Such Men are Dangerous" নাটকখানি যাঁরা পড়েছেন বা এমিল জেনিংস অভিনীত Patriot ফিল্ম যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন পুরাতন ইতিহাসকে নয়মান কি নব দৃষ্টিতে দেখে নবভঙ্গীতে এঁকেছেন।

The Hero বইখানিতে আমরা কিন্তু The Patriot বা The Devil-র নয়মানকে পাইনা; সেজন্য বইখানি আরম্ভ ক'রে কিছু হতাশ হ'তে হয়। বিরুদ্ধ ঐতিহাসিক শক্তিগুলির প্রতীকরূপে নানা ব্যক্তিত্বের বিরোধে, ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতে যে অপূর্ব্ব নাট্যকলার সৃষ্টি নয়মানের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে পেয়েছি, The Hero বইখানিতে তা পাইনা; এখানে দ্বন্দ্ব বাহিরের নয় অন্তরের; এখানে নয়মান ঐতিহাসিক নাট্যকার নন, যুদ্ধাগ্নিদগ্ধ বিপ্লবী মনের অশান্ত বিরোধের বিশ্লেষক; যদিও নয়মান এ বিশ্লেষণ শক্তির সহিত ক'রেছেন, তবু এ পড়ে মন ভরে না; মনে হয় এ মনস্তত্ত্ববিদের কাজ তাঁর নয়, সে কাজ করবার ত অন্য লেখক আছে। বস্তুতঃ, এই মানসিক সংঘাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের প্রতি সমবেদনা কমে এসেছে; যে Hero, সে সত্যি বীর নয়, লেখকের কাছে নয়, পাঠকের কাছে নয়, এমন কি তার নিজের কাছেও নয়, তার সত্তার যে স্থির ভিত্তি ছিল, বিশ্লেষণে তা ভেঙে গেছে; নিজের আদর্শের প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই, নিজের জীবনের ওপর বিশ্বাস নেই; সেজন্য হিরোর-চরিতের ভাঙনের বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদের অন্তরে করুণা জাগে বটে কিন্তু সমবেদনা অনুভব করিনা অথবা ট্রাজেডির ভীতি বা বিস্ময়ে মন দোলে না।

গল্পটি হচ্ছে বর্ত্তমান জার্ম্মানীর, বিগত মহাযুদ্ধের আগুনে পোড়া, ঝড়েতে নোয়া নব জার্ম্মানীর। প্রাক্-সৈনিক হুবার্ট হোফ্ জীবিকার জন্যে ইম্পিরিয়াল কাফেতে রাতের বেলা নৃত্য করত, সেখানে সে অশ্বারোহী সৈন্যদের অফিসার নয়, সে নৃত্যের প্রফেসার। কিন্তু হুবার্ট হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ন্যাসানাল লীগের কমিটির সভ্য; এই নব সোসিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার ভার সে গ্রহণ করে। হত্যার কয়েকদিন পূর্ব্বের ও পরের হুবার্টের মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস হচ্ছে বইখানি।

গুপ্ত সৈনিক-সমাজের পক্ষ হ'তে প্রধানমন্ত্রীকে গুলি ক'রে মারার মধ্যে হুবার্টের অন্তরের কোন প্রেরণা নেই, Patriot-এ প্রধানমন্ত্রী যে অত্যাচারী উন্মাদ জারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, তাতে তার অন্তরের বেদনা ও কর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণা ছিল, কিন্তু এখানে হুবার্টের এই বিপ্লব, এই গুপ্তহত্যা যেন কোন অদম্য চঞ্চলতার, কোন অনিয়ন্ত্রিত শক্তির, মানসিক বিকারের প্রকাশ। এ হত্যাকে সে বীরত্বের বা দেশভক্তির কাজ ব'লে বিবেচনা করেনি। কেন যে হত্যা করতে চায়, তার জবাবদিহিতে হুবার্ট বলেছিল, চারবৎসরব্যাপী যুদ্ধ……।

যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ জার্ম্মানীর জীবনকে ওলটপালট ক'রে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার কালো ছায়া সমগ্র জাতির ওপর, সমস্ত সাহিত্যের ওপর। রেমার্কের "রোড ব্যাক্" বইখানিতে দেখেছি, তরুণ যুবকদের মন কেমন বিকল বিকৃত হয়ে গেছে, ট্রেঞ্চের সৈনিকবৃত্তিতে। The Hero-তে নয়মান্ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

যুদ্ধের আগে যে সহজ স্বাভাবিক হুবার্ট হোফ্ ছিল সে ভেঙে পড়েছে চারবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতায়; তার স্নায়ু অসুস্থ, রাত্রি বিনিদ্র, অন্তর ভারাক্রান্ত কত প্রমত্ত চিন্তায়, কোথাও সে শান্তি, সুস্থতা পায়না; সে সত্যিকার নৃত্যকার ব' বিপ্লবী নয়; মহাযুদ্ধের দীর্ঘ অস্বাভাবিক নৃশংস জীবনে ক্রূর মৃত্যুর লীলার মধ্যে, তাণ্ডবনৃত্যের অগ্নি-উৎসবে তার ব্যক্তিত্বের ভূমি কম্পিত, দগ্ধ, দীর্ণবিদীর্ণ। রাতের বেলা যখন ঘুম হয় না, তার প্রাণে বাজে, খুন্, খুন্! অষ্টেণ্ড হ'তে বাজেল, কনষ্টান্টিনোপল্ হ'তে রেভেল, ইয়োরোপের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত, মাইলের পর মাইল মানুষ-খুনের অগ্নিঅস্ত্র অহর্নিশি গর্জ্জন করছে, যে যত মানুষ খুন করতে পারবে সে তত বড় বীর। হত্যা শুধু সহজ নয়, হত্যা স্বাভাবিক।

বইটির মধ্যে দু'তিনটি দৃশ্য ভোলা যায় না, ভূতের মত মনকে অভিভূত করে। একটি হচ্ছে, হত্যা করার পূর্ব্বের রাতে গ্রন্থপরিকীর্ণ লাইব্রেরীর নিস্তব্ধতায় হুবার্ট হোফের সহিত ডেভিড্ হেয়র্ত্সের চিন্তাভারাক্রান্ত স্তব্ধতাখণ্ডিত কথাবার্ত্তা। একজন তার স্ত্রীকে হ্রদের জলে ডুবিয়ে মেরেছে, প্রেমের প্রতিহিংসায়; আর একজন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে যাবে, আপনাকে বিপ্লবী ভেবে। অন্ধকার রাত্রি, জনহীন হ্রদের তট, স্তব্ধ হ্রদের গভীর কালো জল, তার মধ্যে ছোট নৌকায় স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে; সে স্ত্রী তার ভাইকে ভালবাসে; এ জ্বালা বুকে জ্বলছে; সেই বেদনার আঘাতে বুঝি নৌকা উল্টে গেল, চারিদিক ঘন অন্ধকার ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল, তারপর সব চুপচাপ—ডেভিড্ হেয়র্ত্স্ এ দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারছে না; এ দৃশ্যের জ্বালাময়ী স্মৃতি তার দিনকে অশান্ত, রাত্রিকে নিদ্রাহীন করেছে। এই বেদনাক্ষুব্ধ স্ত্রী-হত্যাকারীর কাছে আর একজন শান্তিহারা নরহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে এসে বসল, তাদের সম্মিলিত অন্তরের সংঘাত ও বেদনা যেমন নিবিড় তেমনি করুণ। তাদের আত্মা স্পর্শ করল ভাষার আদানপ্রদানে নয়, কোন অতলস্পর্শ ভাষাতীত ব্যথার রহস্যময় রাজ্যে।

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার পর আবার যখন হুবার্টের সঙ্গে ডেভিডের দেখা হ'ল, তখন দু'জনেই হত্যাকারী, দু'জনের আর বেশী কথা হ'ল না; হুবার্টের হত্যার পাপভার যেন ডেভিড্কেও বহন করতে হচ্ছে, তার ভার আরও বেড়ে গেছে; দু'জনের মানসিক বিপ্লব হয়ে গেল; এতদিন ডেভিড্ যে ভার বহন ক'রে এসেছে, এখন তা অসহনীয় হয়ে উঠল; এ ভার আর বহন করা যায় না। না, তারা বীর নয়, তারা দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ, মানুষের মত সুস্থচিত্তে এ পাপ গোপনে বহন করতে পারবে না। তাই হুবার্ট বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পুলিসে গিয়ে ধরা দিল আর ডেভিড্ আত্মহত্যা করল; পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করবার মত মানসিক বল তার নেই। কিন্তু হুবার্ট হচ্ছে সৈনিক, সে যেমন প্রাণকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রাণবিসর্জ্জন করতেও তেমনি ভয় পায় না। বস্তুতঃ বইখানির নাম 'বীর' না হয়ে 'সৈনিক' হ'লে ঠিক হ'ত।

The Hidden Child গ্রন্থখানি, ফ্রান্স ভেয়র্ফেলের লিখিত "Barbara

Oder die Frommigkeit" উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ। বইখানির নাম ইংরাজীতে কেন Hidden Child দেওয়া হল তা বোঝা যায় না, অনুবাদক তার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নি; বোধ হয় কোন চমকপ্রদ নাম দিলে কাটতির সুবিধে হবে ব'লেই এমন নাম দেওয়া। কিন্তু কোন চটকদার নাম না দিয়ে সহজ "বার্‌বারা" নাম দিয়ে অনুবাদ করলেও বইখানির বিক্রি কিছু কম হ'ত বলে মনে হয় না। কারণ, উপন্যাসখানি ভেয়র্ফেলের শিল্পী-প্রতিভার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কেবলমাত্র ভেয়র্ফেলের নয়, বর্ত্তমান জার্ম্মান সাহিত্যের একখানি প্রধান গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে।

ভেয়র্ফেল্ কবিরূপে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু করেন; "Der Weltfreund," "Einander" প্রভৃতি তাঁর প্রথমবয়সের লেখা কবিতা-গ্রন্থগুলিতে যে অশান্তি, বিদ্রোহ, নবজীবনের তৃষ্ণা, এ পুরাতন পৃথিবী ভেঙে নতুন স্বপ্নের পৃথিবী গড়বার আশা জেগেছে, এই বইখানি ভ'রে তারি সুর বাজে। ভেয়র্ফেলের কবিতাতে বিদ্রোহের সুর ছাড়া আর একটি করুণক্লান্ত সুর আছে; সেটি হচ্ছে, কোন শান্তিহারা গৃহহারা পথিকের একটি প্রেমের নীড়ের জন্য, একটি আনন্দের স্নিগ্ধ আশ্রয়ের জন্য আত্মার ক্রন্দন। Hidden Child-তে যার গল্প বলা হয়েছে সেই শৈশবে পিতৃমাতৃহীন যৌবনে দুঃখদারিদ্র্যে সহায়হীন ফ্রেড্‌রিকের অন্তরের ভালবাসাঘেরা একটি ঘরের তৃষ্ণায়, বেদনার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বইখানি করুণসুন্দর।

ভেয়র্ফেল্ হচ্ছেন বর্ত্তমান জার্ম্মান এক্সপ্রেশনিষ্টদের দলের। কিন্তু তাঁর লিরিক কবিতাতে তিনি যে এক্সপ্রেশনিষ্ট লিখনরীতি অনুসরণ করেছেন, এ উপন্যাসে তা সম্পূর্ণরূপে করেন নি। বরং, স্মৃতির ধারা বেয়ে নিজ জীবনের কথা বলার যে অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী প্রুস্ত্ প্রবর্ত্তন করেছেন, সেই নবরীতির প্রভাব ভেয়র্ফেলের এ গ্রন্থে দেখতে পাই। সে প্রভাবকে আত্মস্থ ক'রে ভেয়র্ফেল্ এক্সপ্রেশনিষ্ট লিখনরীতির সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য করেছেন। স্মৃতি এখানে শিল্পী, স্মৃতি এখানে কথক; গতজীবনের কত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত, কত সুখদুঃখের সংঘাত-কথা স্মৃতি তার বিজন ঘরে বসে বসে লিখেছে, কত ছবি এঁকেছে; স্মৃতির সেই পুরাতন জীবনের চিত্রশালায় কোন ঘটনার ছবি ম্লান, কোন ঘটনার ছবি বেদনার রঙে জ্বলজ্বল্ করছে; সেই চিত্রশালা থেকে জীবনের উপন্যাসে বলবার মত, রসসৃষ্টি করবার মত ছবিগুলি বেছে, কথায় তাদের বর্ণনা করা, চিরপ্রবহমান সময়ের সূত্রে বেঁধে তাদের অখণ্ডরূপ দেওয়া, তাদের মধ্যে জীবনের মর্ম্মগত বেদনা, প্রাণের গভীর আশাকে রূপ দেওয়া—প্রুস্ত্-পন্থী কথাশিল্পীদের এই নব লিখনরীতিকে ভেয়র্ফেল্ তাঁর এই বৃহৎ উপন্যাসে বড় সুন্দরভাবে পরম শক্তির সহিত ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু বইখানি যদি কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতি হ'ত, তার লিখনরীতি অত্যাশ্চর্য্যকর হ'লেও, আমাদের চিত্তকে বইখানি এমনভাবে আন্দোলিত করতে পারত না। বইখানির শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে, ফ্রেড্‌রিকের ব্যথিত করুণ শৈশব, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছাত্রজীবন, রুদ্র যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা, যুদ্ধশেষের ভিয়েনার দিশাহারা দিনগুলির কথা। এ দীর্ঘকাহিনীতে শুধু ফ্রেড্‌রিকের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা শুনতে পাই না, তার চারিদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, জাতির উত্থান-পতনের ছন্দ শুনতে পাই। ফ্রেড্‌রিকের সরল কোমল অন্তরের আশা-বেদনার স্পন্দনের তালে তালে সমস্ত দেশের হৃৎপিণ্ডের কম্পনের স্পর্শ পাই। এইখানে বইখানির সার্থকতা। ইহা কেবল জীবনেতিহাস

নয়, ইহা সামাজিক ইতিহাস ; ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও বেদনা, ব্যক্তির বিদ্রোহ ও সমাজের শাসন ও পেষণ, ব্যক্তি ও সমাজের অসামঞ্জস্যে রাষ্ট্রের ভাঙন—ব্যক্তিত্বের এ ট্রাজেডির কথা এমন করুণ-সুন্দর সুরে খুব কম লেখকই লিখেছেন।

কয়েকটি ছবি আমাদের চোখের ওপর জ্বলজ্বল্ ক'রে ফুটে ওঠে ; ঘটনার বর্ণনার সহিত চরিত্র ফুটিয়ে তোলবার দক্ষতা, কথা-চিত্র আঁকবার কুশলতা আশ্চর্য্যকর। Advance Post Ferdinandowka III-তে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে যুদ্ধাগ্নির মধ্যে যোঝার যে বর্ণনা আছে, যুদ্ধের এরূপ অমানুষিক নৃশংস রুদ্ররূপের কথা রেমার্কের All Quiet ছাড়া আর কোথাও পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

কিন্তু যুদ্ধের শেষের ভিয়েনার কথা, বিশেষতঃ Piller Hall-র দলের কথা পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগে ; এই বিচিত্র বিদ্রোহীদল যুদ্ধক্লিষ্ট সমাজের ভাঙনের প্রতীক ; এরূপ অপূর্ব্ব দলের পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না। Piller Hall-তে দু'টি চক্র : একটির চক্রপতি হচ্ছে তরুণ জেবার্ট, Relationship মতবাদের প্রচারক ; তার মতে মানুষের যৌন-সম্বন্ধ অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ত হয়েছে ব'লেই, মানুষের সামাজিক সম্বন্ধও বিকৃত, দুঃখময় ; এই যৌন-সম্বন্ধকে সহজ স্বাভাবিক করতে না পারলে মানবজাতির আনন্দ-কল্যাণের কোন আশা নেই। কথা বলার অফুরন্ত শক্তি, ভাব রচনার অদ্ভুত যাদু দিয়ে সে তার মতবাদ প্রচার করে ; তরুণ মনগুলি আকৃষ্ট করে। অপর দলের নেতা হচ্ছে বেসিল্, বয়সে প্রবীন হ'লেও সে আপনাকে চিরযুবা ভাবে, সমস্ত যুব-আন্দোলনের নেতা হবার যোগ্যতা একমাত্র তারই ; "Revolution in God" পত্রিকার সৌখীন ভাবুক সম্পাদক রোম ও রুশিয়ার মতবাদের সামঞ্জস্য ক'রে ক্যাথলিক চার্চ্চ ও কমুনিজমের মিলন সাধন করবার প্রয়াসী, কিন্তু তার পূর্ব্বপ্রেমিকা হেভার একটুকু অবহেলায় সে অধীর হয়ে ওঠে। কথা-বিলাসী সৌখীন আদর্শবাদী অপূর্ব্ব এ দলটির সহিত পরিচিত হবার আনন্দলাভে বইখানি পড়া সার্থক হয়।

এ দলটির ক্ষুদ্রতা, অহমিকা, ভীরুতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন এংলেন্ডার ; তার বিদ্রোহ যেমন আন্তরিক, তার বেদনা তেমন গভীর, তার জ্বালা তার মনকে বিকল ক'রে দিল। তার চরিত্রের সহিত ফ্রেডরিকের চরিত্রের মিল আছে, কিন্তু এংলেন্ডার যেখানে আপন স্বপ্ন-আদর্শ সার্থক করতে না পেরে জীবন ব্যর্থ ভেবে উন্মাদ হয়ে গেল, ফ্রেডরিক সেখানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার নবজীবনের কাজে যোগ দিলে, অন্তরে সে উদাস, তবু আত্মায় শান্তি অনুভব করলে ; তার কারণ হচ্ছে ফ্রেডরিকের সমস্ত জীবন ঘিরে রক্ষাকবচের মত রয়েছে তার শৈশবধাত্রী বার্‌বারার নিবিড় স্নেহ ও সেবা। ছোটবেলায় এক সন্ধ্যায় একলা ঘরে অন্ধকারে অজানা ভয়ে সে যখন কেঁপেছিল, বার্‌বারার স্নেহময় আনন্দময় মুখখানি সে অন্ধকারে জেগে তার সব ভয় দূর ক'রে দিয়েছিল, জীবনের দীর্ঘপথে দুঃখ-হতাশের অন্ধকারে সকল ঝঞ্ঝার মধ্যে বার্‌বারার স্নেহদীপ্ত আনন, তার কল্যাণহস্তের স্পর্শ তাকে অভয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে। প্রেমের এই সত্যভূমিতে তার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে বাহিরের সকল অবিচার, দারিদ্র্য, যুদ্ধ বিপ্লবে সে ভেঙে পড়েনি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Song and Its Fountains—By A. E. (Macmillan).

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ-ই-নামে সুপরিচিত আইরিশ-কবি জর্জ্জ উইলিয়ম রাসেল তাঁর ১৯১৮ সালে প্রকাশিত The Candle of Vision-এর চিন্তাসূত্র ধ'রে এই বইখানি লিখেছেন। সেবার রূপ ও স্ব-রূপের কথা বলেছিলেন, এবার কবিতার সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন-মানসে অন্তর্লোক ও বহির্লোকের নিগূঢ়-সংস্পর্শ-সচকিত চিৎ জীবাত্মার (psyche) সত্তা নিরূপণ করেছেন।

কবিতাকে ওয়ার্ডস্বার্থ্ বলেছেন "Emotion recollected in traquillity"—অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা, তৎপরে অনুভূতি, তা'তে কল্পনার ও কবির ব্যক্তিত্বের রং ফলিয়ে অতঃপর অভিব্যক্তি। আমাদের কবিও তিনটি পর্য্যায়ের উল্লেখ করেছেন। কাব্যস্রষ্টা সাইকির সৃষ্টি-ব্যাপারটা দৈব হ'লেও তা'র প্রথম পর্ব্বে উপলব্ধি, তারপর রূপদান, অবশেষে অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির সময় সাইকির নিখুঁৎ সৃষ্টির খানিকটা নষ্ট হয়, অভিব্যক্তি কখনও বিশুদ্ধ থাকে না। কবির বাণী অমোঘ নয়, কেবল সত্যসন্ধানী। ওয়ার্ডস্বার্থ্ও তাঁর Prefaces-এ মোটা রকমের গদ্যে এই কথাই ব'লে কবিকে "প্রফেট"-আখ্যা দিয়েছিলেন, অতএব নূতন কিছুই বলা হ'ল না। কিন্তু সাইকির কথাটা যে একটু অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে।

এ-ই সাইকি-বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে তাতে দুইটি ব্যক্তি আছে, একজন জগৎকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক, একজন বিরাগী; একজন নায়ক, একজন দর্শক; একজন রসিক, একজন রস। প্রথম ব্যক্তি সমাধিস্থ থাকলেও, দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্লিপ্ত ভাবে সৃষ্টি সমাধান করে।

এ সবই অপ্রত্যাশিত হ'লেও, বোধগম্য। তারপর সৃষ্টি রহস্যের আরও ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এখানে যেন কীট্‌সের প্রতিধ্বনি শুনি। সৃষ্টিকার্য্য গোপনে সাধ্য। কবিতাসৃষ্টিও কবির অগোচরে, অজ্ঞাতসারে সাধিত হওয়া স্বাভাবিক; সেইজন্য কবিতা নৈর্ব্যক্তিক। নিয়ত কর্ম্মশীল সাইকি কেবলমাত্র তা'র দেবদত্ত জ্ঞান,—"pre-natal wisdom", ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। আমাদের কবির প্রথম বয়সের কবিতা এইভাবে উদ্ভূত; পরবর্ত্তী কবিতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। তাঁর অবস্থা অনেকটা ওয়ার্ডস্বার্থের Immortality Ode-এর হতভাগ্য নায়কের মতন। কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নেই, কেননা দেহের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হ'লে সেই সকল দৈবস্বপ্নগুলি সার্থক হ'বে। কবি যেন আশ্বস্ত হ'ন।

প্রথম বয়সে কাব্যরচনার কোনো সজ্ঞান পদ্ধতি তিনি উপলব্ধি করেন নি, গানের পদগুলি যেন আর কেউ রচনা ক'রে তাঁর রসনাগ্রে এনে দিতো। প্রথমবার শ্রোতা, নিজেও একটু চমৎকৃতি অনুভব করেছিলেন। এ যেন ব্রাউনিং-এর Abt Vogler-এর সুরের প্রাসাদের মতো কোন সুগভীর রাজ্যে তৈরী।

রাসেল অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু এই অনুপ্রেরণা কোন ঘটনাজাত নয়, এ যেন প্রকৃতির নীরব নিরীক্ষণে জেগে ওঠার সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি। কীট্‌সের হাইপেরিয়নের নেমসিনির মতন। অ্যাপোলোর কণ্ঠনিঃসৃত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"　. . . . . . What divinity
Makes this alarum in the elements,
While I here idle listen on the shores
In fearless yet in aching ignorance?"

এখনও চেতনা সম্পূর্ণ হয় নি, কাজেই এই অজ্ঞানতা কিন্তু আত্ম-পরিচয় সুরু হয়েছে, সেইজন্যেই ওই বেদনা।

". . . . . I can read
A wondrous lesson in thy silent face.
Knowledge enormous makes a God of me."

এই অবগতিই হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন জ্ঞান।

" Creations and destroyings all at once
Pour into the wide hollows of my brain
And deify me."

আমাদের কবির নিকটেও ঠিক এমনি ক'রে মূক পৃথিবী বাণীময় হ'য়েছে, যা' অজ্ঞাত ছিল তা'কে তিনি জেনেছেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে এই যে কবির সহসা-দৃষ্ট নির্জ্জনতার সঙ্গিনী, এই অজ্ঞাত সুন্দরী, যা'র কথা কীট্‌স্ এবং রাসেল উভয়েই বল্‌ছেন এ কি কবি-কল্পনার সৃষ্টি, না তা'র উদ্দীপক, অন্তর্লোকের না বহির্লোকের? রাসেল অনুপ্রেরণার স্থান চেতনার অন্তরালে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে খালাস হয়েছেন। কীট্‌সের নেমসিনি যেন অ্যাপলোর ধাত্রীস্বরূপা, বহির্লোকের নয়, শৈশবকাল থেকে অ্যাপলোর সহবাসিনী, কিন্তু তা'র কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিতা, মাঝে মাঝে সুঘন বিপিনে হেমন্তের শুষ্কপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতে অ্যাপলো তা'র আভাসটুকু হয়তো পেয়েছে, কিন্তু সাধারণতঃ সে তা'র স্বপ্নলোকের নিত্যসহচরী। শুভ-মুহূর্ত্তে তা'র সঙ্গে কবির পরিচয় হ'ল, অন্তর্লোকবাসিনী সহসা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে এসে দাঁড়াল, কোন নিদারুণ সংঘাতে নয়, স্বভাবগুণে। এখানে কীট্‌স্ ও রাসেল একমত।

রাসেল দার্শনিক ন'ন, তিনি কবি। তাঁ'র ভাষাও তদনুরূপ, স্থানে স্থানে একটু গোলমেলে, কোথায় রূপক শেষ ক'রে গদ্য ধরেছেন বলা কঠিন। মূল কথা, যা'কে রূপক বল্‌লাম সেও তাঁর কাছে নিছক সত্য। স্বপ্নকে তিনি অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন; কবিতাকে বলেছেন স্বপ্নের প্রক্ষেপণ। একস্থানে কোন দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তা'তে তাঁ'র নিজের বক্তব্যটাও সুস্পষ্ট হ'য়ে গেছে—

" We must remember that the mind of man is made in the image of God and therefore even in its wildest speculations it follows an image of truth."

এর থেকে যদি বুঝ্‌তে হয়, যে সকল আকাশকুসুমের মধ্যেই একটা যাথার্থ্য আছে যেহেতু মানবকে ভগবান নিজ মূর্ত্তিতে গঠিত করেছেন, এবং ভগবান সত্যস্বরূপ, তবে আর তর্ক খাটে না, কারণ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্‌ও তর্ক ক'রে ভগবানকে ঠেকাতে পারেন নি। আমাদের আদ্য পিতা ভগবানই হোন আর বানরই হোন, আপাততঃ উভয়ের কাউকেই আমাদের প্রয়োজন নেই, নইলে তর্কশাস্ত্রবিদরা আমাদের Petitio Principii-এর অভিযোগে ফেল্‌বেন।

নিদ্রিত অবস্থার স্বপ্নকে অনেক সুপণ্ডিত বৈদেহ আত্মার আচরণ ব'লে নির্দেশ করেছেন, তা'র মধ্যে নূতন কোন তথ্য নেই। রাসেল আরেকটু অগ্রসর হ'য়ে সিদ্ধান্ত করেছেন দিবা-স্বপ্নও অতিমাত্রায় সত্য। তিনি নিজে স্ফটিক প্রাসাদে পৌরাণিক রাজরাজড়ার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন, তা'দের নাম ধামও তাঁর কানে আসে, কিন্তু এর সূত্রপাত ব্যক্তিগত জাগ্রত অভিজ্ঞতায় কি না তা তিনি উল্লেখ করেন নি; এ সকলকেও দৈব ব'লে গ্রহণ করেছেন, এবং বলেছেন যে, যে কেউ symbolic স্বপ্ন দেখে থাকেন তিনিই গভীর ভাবে চিন্তা করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন। দুঃখের বিষয় "symbolic" স্বপ্নের সংজ্ঞানির্দেশ তিনি করেন নি।

কোলরিজ্ও স্বপ্ন দেখে কবিতা লিখ্তেন, তাঁর Kubla Khan ও কিয়দংশে The Ancient Mariner স্বপ্ন লব্ধ ব'লে শুনা যায়। ডি কুইন্সির স্বপ্ন-দেখার কথাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ সকল কবিদের স্বপ্ন দেখার একটা অতি স্থূল কারণ ছিল। রাসেল অহিফেন-সেবীর কথা বল্ছেন না, তিনি নিজের অভিজ্ঞতাটাকেই ধ'রে নিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে যাই বলুন, ব্যাপক ভাবে তাঁর কথা গ্রাহ্য হ'তে পারে না।

ওয়ার্ডস্বার্থ ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখে, কেটে ছেঁটে স্পষ্ট গদ্যে কবিতাকে বল্লেন "Emotion recollected in tranquillity"। আবেগ অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করে, কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারটি কবি ভেবে চিন্তে, বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে, অনেক যাচাই ক'রে তবে সাধন করেন। বহুকাল পূর্ব্বে একজন সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যাসিক্ সাহিত্যিকও বলেছিলেন কাব্যরচনা শেষ হ'লে পর নয় বৎসর কাল সংশোধনের নিমিত্ত কাছে রেখে অতঃপর তা প্রকাশ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সজ্ঞান প্রচেষ্টার অনেকখানির প্রয়োজন আছে। এ সকল ক্ষেত্রে ঐ স্বপ্ন দেখার কথাটা টি'কে না। কিন্তু এ-ই কি সকল প্রকার কবিতা ও সকল শ্রেণীর কবির কথা লিখেছেন? এ বিষয় শেষ পর্য্যন্ত একটু গোলযোগ থেকে যায়।

সমালোচনা করতে গিয়ে ভুলে গেলে চল্বে না, এ-ই-র বইখানা দার্শনিক গবেষণার বইও নয়, মনস্তত্ত্বের বইও নয়; কবি তাঁর নিজের মিষ্টিক অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা নিয়েই মুখ্যভাবে আলোচনা করেছেন, মতপ্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর বইখানি সুখপাঠ্য, ভাষা সকল স্থানে অতি প্রাঞ্জল না হ'লেও সব সময়েই সুললিত। সাহিত্য-জগতের কল্যাণার্থে কোন নিগূঢ় নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার তিনি করেন নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা যে কথা ব'লে গেছেন, সেই কথাই এই যুগের ভাষায় আরেকবার ব'লেছেন। নূতন যেটুকু বলেছেন সে তাঁর ব্যক্তিগত কথা, ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না হ'লে তর্ক করবার কিছু থাকে না। আগাগোড়া সমস্ত বইখানি সুচিন্তার পরিচায়ক।

শ্রীলীলা রায়

From Punishment to Prevention by PRASANTO KUMAR SEN, (Oxford University Press). 10 s. net.

অনেকে মনে করেন, এবং যাঁহারা শুধু য়ুরোপীয় দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ত কথাই নাই, যে প্রাচীনকালের দণ্ডনীতি ও বর্ত্তমানের দণ্ডবিজ্ঞানের মধ্যে মূলগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আমি এই মতের প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদের

প্রথম কারণ এই যে কার্য্যতঃ দণ্ডবিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই বর্ত্তমানে গৃহীত হয় নাই, এখনও তাহা অনিশ্চিতের পর্য্যায়ে আছে। যেগুলি গৃহীত হইয়াছে প্রাচীন দণ্ডনীতির সহিত তাহার পার্থক্য কেবলমাত্র আকার ও প্রকার ভেদে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কেবল পাশ্চাত্য ইতিহাসেই classical ও positivist বাদের বৈষম্য পাওয়া যায়, প্রাচ্যসভ্যতার প্রাচীন চিত্রে তাহার কোনও ছায়া পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যদেশের classical ও positivist বাদের বৈষম্য এই যে সেখানে প্রাচীনপন্থীরা মানুষের ব্যষ্টিগত শক্তিকে ন্যায়-অন্যায়ের আধার মনে করিতেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সেই শক্তির পরিচালক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং অপরাধের মাত্রাই দণ্ডের পরিমাণ স্থির করিত, তদ্ভিন্ন অপর কোনও পক্ষপাত ছিল না; অপর পক্ষে নবপন্থীরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করেন, তাহার জন্মগত বিশেষত্ব ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা অপরাধের মাত্রা বিচার করিতে চান, এবং অপরাধের জন্য শাস্তিদান অপেক্ষা সেই অপরাধ ঘটিবার কারণ কি তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিধেয় মনে করিয়া দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে চান। এই দুই মতবাদ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাবে করিতে পারিলাম না। ব্যবহারশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ময়ূরভঞ্জের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় সম্প্রতি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে এই দুই মতবাদের সম্পর্ক বিশদভাবে নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে সমধিক উৎসুক তাঁহাদের এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বলিতেছিলাম যে প্রাচীনকালের দণ্ডনীতির সহিত বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞানের বৈষম্য বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য ইতিহাসেই পাওয়া যায়, প্রাচ্যে তাহার কোনও পরিচয় নাই। এই বিষয়ে প্রশান্তবাবু আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন, এবং বইখানির মধ্যে ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে। আজ কেবল দণ্ডনীতির এই দিকটিই আলোচনা করিব, কারণ অন্যান্য অধ্যায়ে প্রশান্তবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় positivist বাদের অনুকূল সমালোচনা মাত্র, পরিষ্কারভাবে এবং সুন্দর ভাষায় সে-মতের বিভিন্ন নীতির বিশ্লেষণ। প্রথম অধ্যায়টিই এস্থলে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ের বিষয়-বস্তুও লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং জ্ঞানলিপ্সার উদ্রেক করে। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি "প্রাচীন দণ্ডনীতির ভাবধারা", দ্বিতীয় "দণ্ডদানের মূল নীতি," তৃতীয় "ব্যবহারশাস্ত্রে দণ্ডনীতি বা উদ্দেশ্যের প্রয়োগ," চতুর্থ "অতীত ও বর্ত্তমানের সম্পর্ক নির্ণয়," পঞ্চম "সংরক্ষণ বনাম দণ্ড," ষষ্ঠ ও সপ্তম "সংরক্ষণ বা দণ্ডনীতির বিধেয়"। গ্রন্থের মুখপত্র লিখিয়াছেন, স্বনামধন্য পণ্ডিত সার্ এভ্‌লিন্ রাগল্‌স্-ব্রাইস্।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। অপরাধীও মানুষ, কেবল মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে সে স্খলিত হইয়াছে, সৎপথে আসিবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, এবং সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত সেই শক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে, তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং তাহার প্রয়োজনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিলে আসল গলদের প্রতিকার হইবে না, সমাজ সংরক্ষণের সম্যক্ ব্যবস্থা হইবে না। ইহাই হইল সামাজিক আত্মরক্ষার নূতন নীতি—social defence অথবা ফরাসীভাষায় La defense sociale। এখানে সমাজকে খুব ব্যাপকভাবে ধরা

হইয়াছে। অপরাধ ও তাহার দণ্ড—ইহার কার্য্যকারণ নির্ণয়ে দণ্ডবিজ্ঞানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা, অর্থাৎ অপরাধীকে রোগী বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং সেই রোগের নানারূপ চিহ্ন পরিলক্ষণ করিয়া মূল ব্যাধি নির্ণয় (diagnosis) করা হয়।* মানুষ সমাজের অঙ্গ এবং অপরাধী সমাজের রুগ্ন বা দূষিত অঙ্গ। রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন, চিকিৎসায় জ্ঞান ও সহানুভূতি চাই। কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলে অনেকস্থলেই দেখা যায় কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করা দূরে থাকুক, অপরাধীর মন আরও দূষিত হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া যাহারা অপরিণতবয়স্ক তাহাদের। দণ্ডবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, অপরাধের মূল আহরণ করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করা। তাহার জন্য হয়ত একটা বংশ-উচ্ছেদ পর্য্যন্তও প্রয়োজন হইতে পারে, অবশ্য কালনেমীর পরামর্শ-অনুযায়ী নহে, পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি-উচ্ছেদের প্রণালী-অনুযায়ী। দূষিত ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদন করিতে না দেওয়াই এস্থলে বিধেয়। ইহার দ্বারাই সমাজের সংরক্ষণ হয়।

এইখানেই classical মতের সহিত পার্থক্য। অপরাধ করিলে শাস্তি দিব, ইহাই ছিল সে যুগের মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের অনেকগুলি উপাদান ছিল। প্রথমতঃ ছিল শাস্তির সহিত ভয় সংযোজনা। অপরাধীর শাস্তি হইল যাহাতে সে আর সে অপরাধ না করে এবং অপরেও সে অপরাধ করিতে প্রয়াসী না হয়। অপরাধী যাহাতে নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহাও দণ্ডদানের একটা উদ্দেশ্য ছিল। আর ছিল, প্রতিহিংসার ভাব। মোসেস্ বিধান দিয়াছিলেন, চোখের জন্য চোখ, দন্তের জন্য দন্ত। একজন যদি আর একজনের চক্ষু অথবা দন্ত উৎপাটন করিত তখন সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীব্যক্তির চক্ষু বা দন্ত-উৎপাটনের ব্যবস্থা ছিল। আমরা এখন অতটা যাইনা, কিন্তু প্রাণের বদলে প্রাণ লই, এবং চক্ষু বা দন্ত (অথবা আর কিছু) হারাইলে অর্থের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করি। ইহাই হইল প্রাচীন lex talionis। কেবল প্রাণদণ্ডের ক্ষেত্রেই যখন নির্জ্জলা lex talionis-এর ব্যবস্থা হইল, তখন মধ্যযুগের (ঐতিহাসিক হিসাবে) মানুষ যতটা পারিল প্রাণদণ্ডটাকে বিস্তৃত করিয়া দিল। এই বিস্তৃতি য়ুরোপেও পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতেও পাওয়া যায়, যদিও উভয়ের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। এ বিস্তৃতিকে মোসেস্‌এর আইনের বিকৃতি বলিতে পারি বোধ হয়। অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিকে ভীতিময় করিয়া ভবিষ্যৎ অপরাধীকে নিরস্ত করা। একসময় ছিল যখন ইংলণ্ডে দুইশত অপরাধের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। রাজা অষ্টম হেনরির সময়ে কয়েক সহস্র লোক সাধারণ বিচারে অনায়াসে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছিল। কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত বৎসর পূর্ব্বে,

* প্রশান্তবাবু তাঁহার গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—

"The defence of society is regarded as the one objective to which criminal legislation and criminal therapy are directed—such defence involving not only the reform or rehabilitation of the members infected by the anti-social germ, but the introduction into society of preventive and hygienic measures to make it secure from the germ's ravages. These measures are necessarily negative or destructive as well as positive or constructive."

দোকান হইতে চারি টাকার (পাঁচ শিলিং) দ্রব্য অপহরণ করিলে প্রাণদণ্ড হইত। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি চামচ চুরি করার অপরাধে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালককে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এখন মাত্র দুইটি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বাদশটি প্রদেশে, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ইতালী প্রমুখ দেশে প্রাণদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ সে সমস্ত দেশের লোকেরা এখনও বাঁচিয়া আছে। বস্তুতঃ শুধু যদি আমরা য়ুরোপকে আলোচনার ক্ষেত্র করি তাহা হইলে সমাজে দুর্নীতি সম্বন্ধে মতবাদের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিব। কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তনই শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করিয়াছিল, ধীরে ধীরে সঙ্ঘের মন তাহাদের গ্রহণ করিয়াছে। অথচ, ভারতের পৌরাণিক যুগের সহিত যদি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নীতির তুলনা করি তাহা হইলে দেখিব মানবজাতি সমাজনীতির ক্ষেত্রে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপরে classical ও positivist বাদের যে অতিশয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা কেবলমাত্র আমাদের আলোচ্যবিষয়টিকে সুবোধ্য করিবার জন্য। ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে, উক্ত দুই মতবাদের কোনও বিভিন্ন অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাই না। অথচ positivist বা neo-classical-দের ভাবধারা যে পাশ্চাত্য দণ্ডনীতির প্রয়োগ ও ব্যবহারে নূতন যুগ আনিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ এই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে করেন ভারতবর্ষেও এই ভাবধারা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে নূতন যুগের প্রতীক হইবে। অবশ্য সংস্কারকার্য্যের সূচনা হইতেছে মাত্র। কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ, কিশোর আসামীদের জন্য বিভিন্ন বিচারপ্রণালী ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ, কারা-পরিচালনার উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের সংস্কারকার্য্যের চেষ্টা চলিতেছে। এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে এই সংস্কারের মূলমন্ত্র পাশ্চাত্য আদর্শ। এখনও এদেশে যে দণ্ডনীতি অনুসরণ করা হয় তাহাও পাশ্চাত্যনীতি অবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে, প্রধানতঃ classical মতবাদ অনুযায়ী। যাহা সংস্কার হইতেছে তাহা অতি-আধুনিক।

কিন্তু বক্তব্য এই যে যাহাকে আমরা নূতন যুগ বলিয়া আবাহন করিতেছি ভারতের অতি প্রাচীন যুগেই তাহার পরিকল্পনা পাই। প্রতীচ্য যখন মোসেস্-এর নীতির দ্বারা প্রভাবিত, কি তাহারও পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞান ও অপরাধতত্ত্বের (criminology ও criminal anthropology) অনেকগুলি সিদ্ধান্তই প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন তাঁহার গ্রন্থে ইহার যথাযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অথবা কৌটিল্যের যুগেরও পূর্ব্বে মনুসংহিতায় আমরা দণ্ডপ্রয়োগের যে বিধান পাই তাহাতে আধুনিক দণ্ড বিজ্ঞানের পরিকল্পনার আভাস আছে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্লোকের পর শ্লোক পাওয়া যায় যাহাতে কৃত অপরাধের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে বিশেষ অবধানের সহিত বিচার করা হইয়াছে। বিচার করিতে হইবে "তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে। প্রশান্তবাবু মনুর সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত শ্লোকের ভাষা ও অর্থ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক

ব্ল্যাকষ্টোনের টীকার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়।* অপরাধের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ করা হইয়াছিল ইহা বলিলেই অপরাধের আপেক্ষিকতা সপ্রমাণ হইবে।

শুধু আপেক্ষিকতা-বিচারে নয়, আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও অতি-আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞান বা অপরাধতত্ত্বকে লজ্জা দিয়াছেন। প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে আজকাল অনেক তর্কবিতর্ক শোনা যায়। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করিলে মনে হয় যেন আমরা পুরাতন শাস্ত্রবচনেরই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মনুর সময়ে বহু অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, কিন্তু তথাপি য়ুরোপের মধ্যযুগের তুলনায় সে সমস্ত অপরাধের তালিকা স্বল্পসংখ্যক ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতে অপরাধ ও তাহার দণ্ড"† সম্বন্ধে পুস্তকে পাই যে যাজ্ঞবল্ক্য ও কৌটিল্যের যুগে অনধিক পঁচিশটি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, অথচ ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, এমন-কি ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ অপরাধের সংখ্যা দুইশতেরও অধিক ছিল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাঁচ শিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণের নিমিত্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নিরাকরণের প্রস্তাব হয়, তখন ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি এলেনবরা খেদোক্তি করিয়াছিলেন যে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে ইংলণ্ডের লোকেরা মাথার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে কি পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা থাকিবে না, সুতরাং ঐরূপ বিপজ্জনক প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না।‡ অপরপক্ষে শুক্রনীতিতে আমরা দণ্ডদানে অহিংসানীতির পরিচয় পাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আমরা দণ্ডনীতির যে বিশদ ব্যাখ্যা পাই আজিও তাহা বিস্ময়কর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রাণবধ সম্বন্ধে রাজা দ্যুমৎসেন ও পুত্র সত্যবানের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহার চুম্বক না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—প্রশান্তবাবু তাঁহার গ্রন্থের একাদশ পৃষ্ঠায় শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। মানুষের প্রাণবধ কখনও ধর্ম্ম হইতে পারেনা—সত্যবানের এই উক্তির উত্তরে যখন দ্যুমৎসেন বলিলেন যে যাহাদের প্রাণবধ করা উচিত তাহাদের যদি উচ্ছেদ না করা যায়, যাহারা অসৎ ও দস্যু তাহাদের যদি হনন না করা হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সকল প্রভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন সত্যবান্ বলিলেন, বধ না করিয়া তত্ত্ব ও শাস্ত্রানুযায়ী

* মনুসংহিতায় আছে—

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥

Blackstone বলেন,— "The age, education, and character of the offender; the repetition (or otherwise) of the offence; the time, the place, the company wherein it was committed; all these, and a thousand other incidents may aggravate or extenuate the crime." *Commentaries*, Vol. iv, pp. 15-16.

†Rama Prasad Das Gupta. *Crime and Punishment in Ancient India*, pp. 168, published by the Book Company, 1930, Rs. 5.

‡ এলেনবরা বলেন,—

"Your lordships will pause before you assent to a measure pregnant with danger to the security of property. . . . My Lords, if we suffer this Bill to pass, we shall not know where we stand; whether we stand upon our heads or upon our feet."

যথাবিধি দণ্ডদান হোক। নীতিজ্ঞান ও অপরাধের প্রকৃতির বিষয়ে সমধিক চিন্তা না করিয়া দণ্ডদান করা উচিত নহে। অসতের প্রাণবধ করিয়া রাজা বহু নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনাশের পাপলিপ্ত হন। একজন দস্যুকে নিহত করিলে তাহার ভার্য্যা, মাতা, পিতা, পুত্র সকলেই নিহত হয়। এরূপ দেখা যায়, সাধুসমাগমে দুর্জ্জনের ধর্ম্মভাব হয়। অনেক সময়ে অসাধু ব্যক্তি হইতে সৎপুত্রের জন্ম হয়। অতএব অসাধু ব্যক্তির সমূল বিনাশ সনাতন ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য নহে। সত্যবানের এই উক্তি হইতে আমরা তিনটি নীতির পরিচয় পাই—প্রথমতঃ, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে নিরপরাধ পরিবারবর্গকে শাস্তি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডিত ব্যক্তির কোনও উদ্ধারের আশা থাকেনা। তৃতীয়তঃ, তাহার সৎপুত্র জন্মের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়। এই যে তিনটি নীতি, ইহাতে আছে পরম সত্যের উপলব্ধি এবং অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য। সুতরাং বলিতে পারি যে, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু মৌলিক কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অপরাধী নরের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেই হউক অথবা তাহার বংশ নির্ণয়েই হউক, বিজ্ঞান জগৎকে সম্পূর্ণ নূতন সিদ্ধান্ত দিতে পারে নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন শাস্ত্রকারের বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্র পাই তাহা হইতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাসন-নীতির যে মূলগত কোনও পার্থক্য আছে তাহা মনে হয় না।

পরিশেষে একটিমাত্র বক্তব্য বলিয়াই শেষ করিব। Social Defence-এর কথা বলিয়াছি। সামাজিক সংরক্ষণ বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞান ও দণ্ডনীতির মূলনীতি। এইজন্য সমাজসংস্কারকগণ, অপরাধ হইতে অপরাধীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিধেয় মনে করেন। মানুষ অপরাধ করে কেন, কোনও বিশেষ অপরাধী কেন অপরাধ করিল, তাহাতে সমাজের কোনখান দিয়া ক্ষতি হইল, ইহাই হইল আধুনিক সমাজ-সংস্কারের জিজ্ঞাস্য। ইহারই উত্তরস্বরূপ, অনির্দ্দিষ্ট দণ্ডদান (indeterminate sentence) সর্ত্তবদ্ধ করিয়া দণ্ডমুক্তি (conditional release), সৎপথে থাকিবার শিক্ষানবীশী (probation), দণ্ডমুক্ত কিশোর অপরাধীর জন্য অভিভাবক নিয়োগ (parole), অধঃপতিত নরনারীর জন্য সাধারণ আসামী হইতে বিভিন্ন ব্যবহার (delinquents and degenerates) ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থা-সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্বুদ্ধ হয়। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তর আজ এইখানে আলোচনা করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রশ্নটি এই, social defence নীতি অবলম্বন করায় কি সত্যসত্যই সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইবার আশা আছে? অতি-আধুনিক বলিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতি আছে। দণ্ডনীতির নূতন প্রণালী, কারা-পরিচালনার নূতন পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রে যতটা প্রসার লাভ করিয়াছে, অন্যদেশে ততটা হয় নাই। অথচ উক্ত দেশে যেরূপ প্রকাশ্যভাবে আইন অমান্য হয়, এবং দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ আইনভঙ্গকারীদের উপদ্রব যেরূপভাবে প্রতিকারবিহীন হইয়া সহ্য করিতে হয় তাহাতে কি বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞান সাফল্যলাভ করিয়াছে বলা যায়? কথাটি উঠিয়াছিল, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের অপহৃত অসহায় শিশুর নৃশংস হত্যার খবর পাওয়া গেল যেদিন সেইদিন। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পুলিশ ও রাজশক্তি আজও পর্য্যন্ত আততায়ীদের সন্ধান পাইল না। শুনিলাম,

যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে দুই সহস্র শিশুপুত্র অর্থের জন্য অপহৃত হয়। বৎসরের পর বৎসর এই যে রাজশক্তির অবমাননা, দেশের জনসাধারণের উপর তাহার কি বিষময় প্রভাব তাহা বলাই বাহুল্য। শিশু অপহরণের কথা ছাড়িয়া দিলাম, সভ্যতার শিখরারূঢ় প্রত্যেক দেশেই দেশের গণ্যমান্য যশস্বী লোক যেরূপভাবে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া রাজদণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে শুধু মানবপ্রকৃতি নহে সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়। ক্রয়গার আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু জীবনের যে কয় বৎসর তিনি জনসাধারণের অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছিলেন, রাজদণ্ড তাঁহার নাগাল পায় নাই। এইরূপ কত লোক, ব্যাঙ্ক-ডাইরেক্টর, কোম্পানীর পরিচালক, রাজকর্ম্মচারী নির্ব্বিবাদে সকৌশলে আইনের চক্ষে ধূলি দিয়া আসিতেছে বর্ত্তমান কালে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব জনসাধারণ যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় এবং শ্রদ্ধা হারাইয়া দুর্জ্জনের সংসর্গকে নিরাপদ ও লাভজনক মনে করে, অর্থাৎ সমাজের প্রতিষ্ঠাই যদি হয় অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাতিত্বের উপর, তাহা হইলে দণ্ডবিজ্ঞানের বড় বড় নীতির সার্থকতা কোথায় রহিল ?

বন্ধু বলিলেন, এইখানেই বর্ত্তমান সভ্যতার বিরাট নিষ্ফলতা। আমাকে মনে মনে যুক্তির সারবত্তা মানিতেই হইল। প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় ইহার উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার বই খুলিয়া প্রথম অধ্যায়েই পাইলাম—

দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্যজ্ঞো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শাশ্বদ্রূপং মহদ্বিভ্রন্মহান্ পুরুষ উচ্যতে ॥
তথোক্তা ব্রহ্মকন্যেতি লক্ষ্মীর্নীতিঃ সরস্বতী।
দণ্ডনীতির্জগদ্ধাত্রী দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ ॥

—শুক্রনীতি, চতুর্থ অধ্যায়।

উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু চক্ষু ফুটিল। দণ্ডের এই যে বিরাট রূপকল্পনা, যজ্ঞ, বিষ্ণু ও নারায়ণের সহিত ঐক্যস্থাপনা, প্রাচীন সমাজে ইহার কি কোনও মূল্য ছিল না ? এইরূপ কল্পনা সামাজিক কল্যাণের যে কি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের পুরাণে তাহার ছায়া পাই। বন্ধু বলিলেন, কালীয়দমন, পরীক্ষীতের উপাখ্যান, বলী রাজার উপাখ্যান ন্যায়দণ্ডের মহিমা কীর্ত্তন করে। প্রত্যেক স্থলেই দণ্ডিত ব্যক্তি নতমস্তকে দণ্ডগ্রহণ করিতেছে, নারায়ণ দণ্ড দিতেছেন। এই যে নতমস্তকে দণ্ডিতের দণ্ডস্বীকার ইহার মূলে ছিল জনসাধারণের চিত্তের উপর ন্যায়ের অমোঘ প্রতিষ্ঠা, রাজধর্ম্মের নিরপেক্ষ বিচার, সত্যের ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা, দণ্ডনীতির মূল ধারা। এই ধারা আজ আমরা হারাইয়াছি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা social defence কথাটি ব্যবহার করিতেন না বটে কিন্তু ন্যায়ের যে রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, সে কল্পনা যেদিন আবার ফিরিয়া আসিবে, সেদিন সত্যই কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ সেই সত্যভ্রষ্ট হইয়া মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিতেছি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

Rhymes of Darby to Joan—BY H. W. FOWLER, (J. M. Dent & Sons, Ltd.).

Selected Poems—BY L. A. G. STRONG, (Hamish Hamilton).

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমান্সের যুগ আরম্ভ হয়েছিল। শেলী কীট্‌সের অরূপ ও অপরূপের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের ব্রাউনিং টেনিসন একটা রূপ জুড়ে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নিজস্ব সাহিত্য ও দর্শনকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। যুক্তি ও রহস্য এই দুই-এর মধ্যে ব্রাউনিং যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দিলেন, তা'র একটা সাময়িক ফল হ'ল everyday poetry—যা'কে সোজা বাংলায় আটপৌরে কবিতা বলা যেতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-রহস্য থেকে কাব্যের উপকরণ আহরণ চল্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কালে নিত্যটুকু বাদ পড়ে নৈমিত্তিকটুকুই রইল বাকি। একশ্রেণীর কবির পরিচয় পাওয়া গেল যা'রা কোন মহাবাণী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি। পোপের তীব্র ভাষা ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার ধার দিয়েও তা'রা যায় না, তা'রা অবসরের কবি, নিছক আনন্দের কবি।

Rhymes of Darby to Joan এই শ্রেণীর বই। কবি তাঁর সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে নানা উপলক্ষ্যে ও অপলক্ষ্যে কাব্যরচনা করেছেন। বিবাহ, জন্মদিন, গৃহ-পরিবর্ত্তন, বাড়ির মালিকের খেয়ানি, রোগ শোক কোন কিছুই বাদ যায় নি। কবিতার ভাণ্ডার অফুরন্ত, এমন সরস হাস্যরসে আনন্দিত, তারিফ না ক'রে উপায় নেই।

কবিতাগুলির অধিকাংশই মাঝারি শ্রেণীর, নানা উপলক্ষ্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও ভাব-বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। আসল কথা, গোড়াতেই একটু গলদ্ আছে। বিবাহ-রূপ বিভীষিকাটাকে পঞ্চাশ বৎসর কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখে, অবশেষে সহসা এক "লীপ ইয়ারে" এবং তদুপরি ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, সাতচল্লিশ বৎসরের এক সরলা কুমারী লাভ ক'রে তিনি যে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ক'রে ফেল্লেন, তা'র রহস্যটা তাঁকে এমনি চমৎকৃত ক'রে দিয়েছে যে, তিনি জনসাধারণকে সম্বোধন ক'রে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দিবসেই তিনি প্রথম বিবাহপ্রস্তাব করেছিলেন, একদিন পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে নয়। পাছে এ বিষয় কোন অসতর্ক অভাজনের মনে ভ্রম থেকে যায় তাই পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা ক'রে দিচ্ছেন যে ২৯শে ফেব্রুয়ারী চার বৎসরে একবারই আসে, এবং ঠিক সেই দিনেই ইত্যাদি।

পুরাতন কথা নূতন ক'রে বলবার কৌশল তাঁর অবিদিত নয়, কিন্তু বারম্বার পুনরুক্তির দরুণ ঐ নূতন ক'রে বলাটার রসের অনেকটা হানি হয়েছে। অবশ্য এ কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে কবিতাগুলির একটিও সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নি, একটিমাত্র ব্যক্তির কাছে নিবেদিত হয়েছে, সেইজন্য কবি পাঠককে তাঁর confidence-এ নেন নি, স্থানে স্থানে হতভাগ্য পাঠক নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি হ'য়ে পড়ে। লীপ ইয়ারে লব্ধ গৃহিনীকে ঘন ঘন প্রেমসম্বোধন বৃদ্ধের পক্ষে নিষিদ্ধ ক'রে দিলে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা হবে, তথাপি বেচারা পাব্‌লিকের কথা চিন্তা ক'রে, কাব্য-প্রকাশের পূর্ব্বে প্রত্যেক কবির মনে রাখা উচিত—No private jokes in public।

পরিণত বয়সের বিবাহিত প্রেমের কথা বল্‌তে গেলেই মনে পড়ে ব্রাউনিং দম্পতির কথা, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের কবির তুলনা করা চলে না; তাঁরা হ'লেন

কাব্যজগতের বনেদী ঘরের মানুষ, আর ইনি খেলাঘরের ছড়াবাঁধা কবি। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক লঘুতার পরিবর্ত্তে একটা গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে বিবাহিত জীবনের কল্পনাতীত মাধুর্য্যের কথা বল্‌ছেন

> "Friends I had had ; but never guessed
> With how diverse a spell the wife
> Whose lips so rarely mine had pressed
> Should weave herself into my life."

অতি-আধুনিক কবিদের চল্‌তি চাকচিক্য ফাউলারের রচনার মধ্যে বর্ত্তমান না থাক্‌লেও, মামুলী কথার বাঁধা গতে তিনি কদাপি পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করেন না। নূতন ক'রে পুরাতন কথা বল্‌তে যে তাঁর বিশেষ প্রয়াস করবার প্রয়োজন হয় না, বিবাহের সপ্তম সাম্বৎসরিকে লিখিত কবিতাটি তা'র সুন্দর প্রমাণ। তিনি বল্‌ছেন প্রেমের গৃহে তাঁর সাত বৎসরের লীজ্‌ ফুরিয়েছে, ভাড়া বাড়ালে তাঁর আর দেবার সামর্থ্য নেই, এবার বাড়ির মালিক তাঁর হৃদয় শোষণ ক'রে ছাড়বে! বইখানিতে এই কবিতাটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। Criss Cross উপাধি-ধারী কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। দাম্পত্য জীবনের অষ্টাদশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কেটেছে, কিন্তু এখন cross-word নিয়ে দাম্পত্য কলহ। Cross-word শব্দটি নিয়ে একটু কথার খেলা আছে যা'র তর্জ্জমা চলে না। এই ধরণের আরও বহু কবিতা আছে। বইখানি প'ড়ে আনন্দলাভ হয়, এবং সেইখানেই সকল কবির চরম সার্থকতা, তিনি মহাকাব্যই লিখুন, আর ছড়াই কাটুন।

এ ত গেল আটপৌরে কবিদের কথা। Celtic Revival-এর কবিরা বিপরীত জাতীয়। তারা ম্যাক্‌ফার্সনের অলীক কাব্যের ধারা বেয়ে অতিরিক্ত মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর দিকে চলে গেলেন, কিন্তু সে মিষ্টিসিজ্‌ম্ অদর্শনকে নিয়ে নয়, অরূপকে নিয়ে। L. A. G. Strong-এর কবিতার সঙ্কলনখানি পড়ে এই অরূপবিলাসীদের কথা মনে পড়ে। এঁদের দৃষ্টির মতন তাঁর দৃষ্টিতেও একটা নেশা লেগেছে ; আটপৌরে কবিদের মতন মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিত্যকার সুপরিচিত সংসারের দৃশ্য থেকে তাঁর উপকরণ জুগিয়েছে, কিন্তু তিনি তা'র থেকে অত্যাশ্চর্য্যের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। এবং অত্যাশ্চর্য্যের নিত্য অনুচর ভীতিরও একটা আভাস দিয়েছেন।

কবিতাগুলির অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্রকায় ; নানান্ রকম মানুষের বর্ণনা, কোন মানুষই সাধারণ মানুষ নয়, অথচ তেমন মানুষ সকলেই নিত্য দেখ্‌ছে। আধুনিক ছোট গল্পের মতন সাধারণের অসাধারণত্বটুকু সুপরিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তিগুলি যেন তা'দের genus-কে অতিক্রম ক'রে গেছে। অথচ সামান্য বিষয় নিয়ে কবিতা, পশ্চিমের দুরন্ত মেঘ, পাহাড়ের গাত্রবাহী অনাবৃত পথ, বক্রদেহ ওক্ গাছ, পথের ধারে উন্মাদিনী, চৌমাথায় বুড়ো ঝাড়ুদার, আগুনের ধারে মাতাপুত্রীর কথোপকথন। সবই পরিচিত কিন্তু সবই অপরূপ। বিবরণে খুঁটিনাটি বাদ পড়ে নি, অথচ কবিতাগুলি বাহুল্যবিবর্জ্জিত। বলপূর্ব্বক সুন্দরের মোহ ভাঙ্গবার কোন চেষ্টা হয় নি, বরং সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্ একটু বেশিই।

প্রশংসা করবার অনেক আছে, তথাপি বইখানিকে একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা চলে না। ইয়েট্‌স্ অথবা ব্রীজেস্-এর সঙ্গে তুলনা করলেই অত্যুক্তি করবার

প্রবৃত্তি অপসারিত হয়। কোন বিষম ত্রুটি চোখে পড়ে না, কিন্তু কবির যে কোন এক স্থানে একটা দুর্ব্বলতা আছে সেটা আর গোপন থাকে না। ব্রীজেস্ যে-জিনিষটাকে রক্তমাংসে গ'ড়ে তুলতে পারতেন, এঁর লেখনী থেকে সেটা জোলো হ'য়ে নিঃসৃত হয়। তবু স্থানে স্থানে সেই যাদুর একটু আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য By the Fireside-শীর্ষক কবিতাটি, উদাহরণার্থে কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম।

"Mother when my baby stirred
Deep within me
Fluttered like a bird;
Then although I dearly love him
I felt far above George,
Far above him."

স্বল্প কয়েকটি কথায় নারীর জীবনের সৃষ্টির গরিমা সুস্পষ্টভাবে ও সহজে ব্যক্ত হ'য়ে গেল। "The Green-grocer's Daughter"-এ এই শক্তি নেই, কিন্তু সুপাঠ্য।

বইখানির কতকগুলি বিভাগ করা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে বোধগম্য হ'ল না। একটু cross-division-ও হয়েছে। নহিলে বেশ সুবিন্যস্ত সংস্করণ।

শ্রীলীলা রায়

Essays in Persuasion—JOHN MAYNARD KEYNES,
(Macmillan & Co., Ltd.), 10s. 6d.

কেন্‌স্ সাহেব তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন যে, তাঁর এই বইখানার নাম Essays in Persuasion না হ'য়ে Essays in Prophecy and Persuasion হ'লেই মানাত; কারণ অনুনয়ে বিশেষ কাজ হয়নি, গণনাটা কিন্তু হাড়ে হাড়ে ফলেছে। অবশ্য সব গণনা ফলবার সময় এখনও আসে নি। "ততঃ কিম্" নাম দিয়ে তিনি যে শেষ অধ্যায়টী লিখেছেন, তাতে আমাদের নাতিদের জীবনযাত্রার কথা আছে। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী একশ বছর পরে মেলানো যাবে। কিন্তু (The Treaty of Peace) সন্ধির সর্ত্ত, (Inflation and Deflation) টাকার হ্রাস বৃদ্ধি এবং (The Return to the Gold Standard) স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন, প্রথম এই তিন খণ্ডে তিনি যে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন তার অনেকগুলিই আশ্চর্য্য ভাবে ফলছে। অবশ্য না মিল্‌লেই ছিল ভালো, কারণ তিনি Cassandra-র মত (এ তাঁর নিজেরই কথা) কেবল অশুভই বলেছিলেন আর অশুভই ঘটেছে।

আর একটা বিষয়েও বইখানা আমাদের কম বিস্মিত করে না। গত দশ-বারো বৎসর ধ'রে অর্থনৈতিক জগতে একটা প্রচণ্ড ওলটপালট চলেছে। দুঃসহ ব্যথার ভারে পৃথিবী আজ ম্রিয়মাণ। কেউ বলছেন যে স্থবির ধরিত্রী বাতে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে। আবার কেউবা বলছেন এই ব্যথার ফলেই সে নূতন প্রাণ লাভ করবে। এর একটাই মিথ্যা হোক আর দুটোই মিথ্যা হোক, তবু এটা মানতেই হ'বে যে পুরোনো জগৎ ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। এই রকম প্রচণ্ড

পরিবর্তনের যুগে এই রকম প্রকাণ্ড পরিবর্তনের বিষয়ে লেখা সহজ নয়। আবার সেই যুগের নানা সময়ে নানা অবস্থার মধ্যে লেখাগুলোকে কিছুমাত্র না বদলিয়ে একসঙ্গে ক'রে পাঠকদের কাছে ধরাও কম সাহসের,—কম যোগ্যতার কথা নয়। কেন্‌স্ (Keynes) ছাড়া এই অসাধ্য সাধনের সাহস আর কার থাকতে পারে?

১৯১৯ সালে সন্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল (the Economic Consequences of Peace) ব'লে বইখানি যখন তিনি লেখেন তখনকার অবস্থা আর আজকার অবস্থা এক নয়। "কাইজারকে ঝুলিয়ে দাও, জার্ম্মানীর কাছে কড়ায় গণ্ডায় আদায় কর"—এই সব চীৎকারে জগৎ তখন মুখরিত। আর আজ?—কিন্তু সেইকালেই কেন্‌স্ সাহেবের কলমে সন্ধির সময়কার প্যারিসের যে ছবিটা ফুটেছে সেটা পাঠকদের উপহার না দিয়ে থাকতে পারছি না।

Paris was a nightmare, and everyone there was morbid. A sense of impending catastrophe overhung the frivolous scene; the futility and smallness of man before the great events, confronting him; the mingled significance and unreality of the decisions; levity, blindness, insolence, confused cries from without,—all the elements of ancient tragedy were there (pp. 5—6).

যুদ্ধের ঋণের কথা বলতে গিয়ে কেন্‌স্ এক জায়গায় দেখিয়েছেন যে, জার্ম্মানীর কাছ থেকে ফ্রান্স যা আদায় করতে পারবে তা'তে যুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রদেশটারও ক্ষতিপূরণ হ'বে না। কিন্তু অন্য দেশের যে ঋণ ফ্রান্সকে শোধ দিতে হ'বে সে ঋণ ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের চারগুণেরও বেশী।

The hand of Bismarck was light compared with that of an Ally or of an Associate (p. 35).

এই রকম আরও কত কি অদ্ভুত ব্যাপারের বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বুঝিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক ঋণ মুছে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

A general bonfire is so great a necessity that unless we make of it an orderly and good-tempered affair in which no serious injustice is done to any one, it will, when it comes at last, grow into a conflagration that destroy much as well.

কি আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি! কিন্তু তবু বলি বইটার নাম Essays in Persuation-ই হওয়া উচিত, কারণ কেন্‌স্ সাহেবের মতে—

The events of the coming year [1920] will not be shaped by the deliberate acts of statesmen, but by the hidden currents, flowing continually beneath the surface of political history, of which no one can predict the outcome. In one way only can we influence those hidden currents, by setting in motion those forces of instruction and imagination which change opinion (p. 45).

জনমত সম্বন্ধে কেন্‌স্ একটা মজার কথা বলেছেন—

It is the method of modern statesmen to talk as much folly as the public demand and to practise no more of it than is compatible with what they have said, trusting that such folly in action as must wait on folly in word will soon disclose itself as such, and furnish an opportunity for slipping back into wisdom,—the Montessori system for the child, the public (p. 46).

এর ফল এই দাঁড়ায় যে, রাজনৈতিকদের গর্জ্জন যত বর্ষণ তত নয়। সন্ধির সর্ত্তের বহ্বারম্ভের লঘুক্রিয়া হচ্ছে।—এই যা রক্ষা।

তার পর টাকার হ্রাসবৃদ্ধির কথা। "টাকা" কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে,—যাতে কেনা-বেচা চলছে তাই টাকা, অর্থাৎ টাকা টাকা, নোট টাকা, পাউণ্ড টাকা, ডলার টাকা, মার্ক টাকা ইত্যাদি। টাকা দিয়ে সব সময়ে সমান জিনিষ পাওয়া যায় না—এই হচ্ছে অর্থনীতির একটা মস্ত বড় সমস্যা। আমি তিন বছর আগে একশ টাকা ধার করেছিলাম এবং তা দিয়ে ত্রিশ মণ ধান কিনে খেয়েছিলাম। ঐ ঋণ আজ যদি আমার ক্ষেতের ধান থেকে শোধ দিতে হয় তবে আশি মণ ধান না বেচ্‌লে আসলই শোধ হবে না,—সুদের ত কথাই নেই। তিনবছর আগের একশ টাকায় যত জিনিষ পাওয়া যেত এখনকার একশ টাকায় তার ডবলেরও বেশী জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। এমন অবস্থায় মহাজনের পৌষমাস, খাতকের সর্ব্বনাশ,—অবশ্য যদি খাতক তার ঋণ শোধ করে। যুদ্ধের পরে যখন জিনিষ-পত্রের দাম বেড়েছিল অর্থাৎ সমান টাকা দিয়ে কম জিনিষ পাওয়া যাচ্ছিল তখন এর ঠিক উল্টোটা হয়েছিল। কেবল মহাজন খাতকের কথা কেন, টাকার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অনেকেরই অবস্থার বিপর্য্যয় হয়। জিনিষ-পত্রের দাম বাড়্‌লে পূর্ব্বের সস্তা দামের কেনা জিনিষ চড়া দামে বিক্রী ক'রে ব্যবসায়ীরা লাভ ক'রে থাকে এটা ত সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তারা যে ঋণ ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছে সেই ঋণের বোঝা হাল্‌কা হ'য়ে গিয়ে লাভে দাঁড়ায়, এটা হয়ত এত সহজে বোঝা যায় না। তেমনি যারা উৎপাদক—তা কৃষকই হোক বা শ্রমশিল্পীই হোক—তাদের খরচা প্রায় আগের মতই থাকে অথচ তারা জিনিষ বেচে বেশী টাকা পায়, এবং তাদের ঋণের ভারও লাঘব হয়, এবং খাজনা প্রভৃতি নামে সমান থাকলেও বাস্তবিক কমে যায়—অর্থাৎ কম জিনিষ বেচেই এখন আগেকার সমান খাজনা দেওয়া চলে। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ কেন্‌স্‌ সাহেব দিয়াছেন।

টাকার দাম বাড়ে কমে কেন? এ বিষয়ে কেন্‌স্‌ সাহেব এক নতুন মতবাদ করেছেন। ঠিক নতুন বলা যায় না, কারণ ইউরোপে এই রকমের কথাবার্ত্তা অনেক দিন আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে নতুন বটে। সব রকম গোলমালের কথা বাদ দিয়ে সোজাসুজি এই ভাবে কেন্‌স্‌ সাহেবের মত বলা চলে। যদি সমস্ত পৃথিবীটাকে একসঙ্গে ভাবা যায়, কিংবা যদি এমন কোনও দেশের কথা ভাবা যায়, যে দেশের সঙ্গে অন্য দেশের টাকার বা জিনিষের লেন-দেন নাই, তাহ'লে বলা যায়, সে দেশের লোকেদের মোট আয় যা', সেই দেশের উৎপন্ন জিনিষের খরচাও তাই। কারণ একজনের খরচা অন্য লোকের আয়। মোট আয় আর মোট উৎপাদন-খরচা দুইই সমান। অবশ্য "জিনিষ" কথাটা এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। দিনমজুরী, অধ্যাপনা, ডাক্তারি,—এ সকলই "জিনিষ", কারণ এদেরও কেনা-বেচা চলে। যে আয় হয়েছে তার অনেকটাই গেল খরচ হ'য়ে—তেল, নুন, লকড়ির দাম দিতে, আর বাকিটা জমানো হলো। এখন যদি জিনিষের উৎপাদন আগেকার সমানই থাকে, কিন্তু জমানো বেশী হয়, অর্থাৎ জিনিষের উৎপাদনের খরচা সমানই থাকে কিন্তু সেগুলি কেনার জন্য কম টাকা দেওয়া হয় তবে জিনিষ-পত্রের দাম কমে উৎপাদকের লোক্‌সান আরম্ভ হয়। এবং উৎপাদন কমে গিয়ে—শুধু

উৎপাদন কেন—বেচা-কেনা, ধারকর্জ্জ, কাজকর্ম্ম সবেতেই মন্দা পড়ে। কিন্তু যদি জমান টাকা খাটানো যায়, অর্থাৎ টাকা মাটির নীচে বা ব্যাঙ্কে না ফেলে রেখে তাই দিয়ে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনা যায়, তবে তেল নুন লকড়ি কেনার জন্যে কম খরচ হ'বে বটে কিন্তু নতুন নতুন কলকারখানা, রাস্তাঘাট, পুল, রেললাইন প্রভৃতি কেনা হ'বে, এবং ব্যবহারের জিনিষের বদলে মূলধনের জিনিষ তৈরী হ'বে। তাহ'লে অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়্‌বে না। এইজন্যেই কেন্‌স্ সাহেব বার বার বলছেন শুধু জমানোতে কল্যাণ নেই। জমানো টাকা যখন খাটান যায় তখন দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

"স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন" খণ্ডে ১৯২৩ হ'তে ১৯৩০ পর্য্যন্ত নানা সময়ের কথা আছে। প্রথম অধ্যায়টির নাম "Aura sacra fames" "সোনাতে সর্ব্বনেশে প্রীতি"। কেন্‌স্ সাহেব দেখিয়েছেন যে, এক তোলা সোনা দিয়ে কোনও সময়ে বেশী জিনিষ কোনও সময়ে কম জিনিষ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে আরও বেশী তারতম্য হ'ত যদি না সোনার ঘাটতির সময়ে রূপো চালান হ'ত এবং নতুন স্বর্ণখনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ না করত। যোগানের সঙ্গে চাহিদার সামঞ্জস্য করবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখন স্বর্ণমান অনেক দেশেই অচল। পৃথিবীর সব দেশের (Central Bank) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের নোট ও আমানতি টাকার পরিশোধের জন্য কি পরিমাণ সোনা জমা রাখ্‌তে হ'বে এইটী পরস্পরে আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে যদি সোনার চাহিদার পরিমাণ জোগানের চেয়ে কম না রাখে তবে স্বর্ণমান চলতে পারেনা।

Thus gold, originally stationed in heaven with his consort silver as Sun and Moon, having first doffed his sacred attributes and come to earth as an autocrat, may next descend to the sober status of a constitutional king with a Cabinet o Banks, and it may never be necessary to proclaim a Republic. But this is not yet—the evolution may be quite otherwise. The friends of gold will have to be extremely wise and moderate if they are to avoid a Revolution (p. 185).

এটী নিছক সত্য কথা। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় হবে না। হয় আন্তর্জাতিক ঋণের বিলোপ চাই, নতুবা জিনিষ দিয়ে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত চাই। শুল্ক বসিয়ে খাতক দেশে জিনিষের আমদানী বন্ধ ক'রে কেবল সোনা আনিয়ে আনিয়ে জমা করলে চল্‌বে না। মোট কথা, এই বিদেশের সঙ্গে স্বদেশের সমস্ত লেন-দেনের ফলে বিদেশের যা' পাওনা (বা দেনা হবে) সেই পরিমাণ বিদেশকে ধার দিতে (কিংবা বিদেশের কাছ থেকে ধার নিতে) হ'বে। অর্থাৎ কিনা সোনার চলাচল যথাসম্ভব কম করতে হ'বে। নতুবা স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হ'বে না। এত কথা অবশ্য কেন্‌স্ সাহেব এখানে বলেন নি। কতক কতক অন্যত্র বলেছেন। কিন্তু এখানে না ব'লে ভালোই করেছেন, কারণ এই খণ্ডটীতে এবং আগের খণ্ডটীতে যথেষ্ট কঠিন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু লেখকের প্রসাদগুণ এমনি অনন্যসাধারণ এবং তাঁর শব্দবিন্যাস এমনই মনোহর যে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করবেই।

চতুর্থ খণ্ডের বিষয় রাজনীতি। প্রথমেই রাশিয়ার কথা। কেন্‌স্ সাহেবের মতে Lenin is a Mahomet, not a Bismarck (p. 298)। ধর্ম্ম Communism-এর মুখোশ মাত্র নয়, ধর্ম্ম Communism-এর প্রাণ। এই কথাটী

মনে রাখ্‌লে, Communism-এর ভালোমন্দ দুইই বোঝা যাবে। কেন্‌স্‌ সাহেবের মতে—

Here—one feels at moments—in spite of poverty, stupidity and oppression, is the Laboratory of life. Here the chemicals are being mixed in new combinations, and stink and explode (p. 311).

আবার বলেছেন—

" Russia will never matter seriously to the rest of us unless it be as a moral force " (p. 311).

এটা ১৯২৫ সালের, Five Year Plan-এর আগেকার কথা। কিন্তু কথাটা এখনও সত্যি।

কেন্‌স্‌ সাহেব Liberal। উদারপন্থী এই দলের প্রোগ্রাম fighting programme নয়। কিন্তু এতে অনেক বিষয়ের অবতারণা আছে; যেগুলি সাধারণত কোনো প্রোগ্রামেই ঠাই পায় না, যেমন যৌনসমস্যা। কেন্‌স্‌ সাহেবের মতে—

The very crude beginnings represented by the Suffrage Movement were only symptoms of deeper and more important issues below the surface. Birth Control and the use of Contraceptives, Marriage Laws, the treatment of sexual offences and abnormalities, the economic position of women, the economic position of the family,—in all these matters the existing state of the Law and of orthodoxy is still mediæval (p. 332).

Economic Questions সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেন্‌স্‌ দেখিয়েছেন যে, মানবের ইতিহাসে তিনটী পর্য্যায় আছে। প্রথম যুগ অভাবের যুগ; তখন মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকার ক'রে তাকে ক্রীতদাস ক'রে অভাব মেটাবার চেষ্টা চলেছে। পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগের সঙ্গে সঙ্গেই এর অবসান হয়েছিল, আমাদের দেশে সে মনোভাব এখনো বর্ত্তমান। এর পরের যুগ প্রাচুর্য্যের যুগ, এ সময়ে Laissez Faire-এর অব্যাহত গতি, গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কিছু তখন মানুষের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না। এটাও অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের সম্বন্ধেই খাটে। সেখানে আরও এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে Stabilisation-এর যুগ। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে জবাই করতে কারুরই আপত্তি নাই, তা সে ফাসিজ্‌মই হোক আর বল্‌শেভিজ্‌মই হোক। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের ও পার্লামেণ্টের হাতে আর সমস্ত ব্যবস্থা ফেলে রাখ্‌লে চলবে না। অনেক কাজ হস্তান্তরিত করতে হবে।

Our task must be to decentralise and devolve wherever we can, and in particular to establish semi-independent corporations and organs of government, new and old, without, however, impairing the democratic principle or the ultimate sovereignty of Parliament (p. 331).

শেষ অধ্যায় (The Future) 'ততঃ কিম্‌'-এর কথা গোড়াতেই বলেছি। প্রথমটা H. G. Wells-এর The World of William Clissold-এর সমালোচনা। এই বইখানার তিন খণ্ডের তিনবার সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কেন্‌স্‌ সাহেব আর একবার সমালোচনা করেছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়, এই বইটাতে বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে বড় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। Clissold-এর কথাতেই বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

"Before the creative Brahma can get to work Siva, in other words, the passionate destructiveness of Labour awakening to its now needless limitations and privations may make Brahma's task impossible" (p. 355).

অবশ্য H. G. Wells-এর এই বিরাট উপন্যাস প'ড়ে হয়ত কাব্য-রসিকেরা বলবেন এটা কি জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করা হচ্ছে? এতে Art কই? কেন্‌সের নীচের কথাগুলি তাঁদের ভেবে দেখ্‌তে অনুরোধ করি—

Though we talk about pure art as never before, this is not a good age for pure artists; nor is it a good one for classical perfections. Our most pregnant writers to-day are full of imperfections; they expose themselves to judgment; they do not look to be immortal. For these reasons, perhaps, we, their contemporaries, we do them and the debt we owe them less than justice" (p. 357).

শেষের অধ্যায়টীর নাম Economic possibilities for our grand children। এতে কেন্‌স্ সাহেব দেখিয়েছেন যে, জগতের সত্যিকারের আবিষ্কারগুলি যেমন ভাষা, আগুন, কৃষি, পশু পালন, ও ধাতুর ব্যবহার—এমন কি রাজনীতি, ব্যাঙ্কিং, গণিত, জ্যোতিষ-বিদ্যা, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চ'লে আসছে। তবু বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা মধ্যযুগের জীবনযাত্রা হ'তে কত বিভিন্ন,—যদিও আমাদের দেশ এখনও মধ্যযুগেই আছে ধরতে হ'বে। এর দুটী কারণ,—প্রথমতঃ technical inventions এবং দ্বিতীয়তঃ accumulation of Capital।

বর্ত্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, এ দুটীর ক্রিয়া চলছে এবং চলবে। একশত বৎসরের মধ্যেই জগতের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটবে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড়ের চেষ্টাতেই মানুষের সব শক্তি সব সময় নিয়োজিত হয়েছে। তখন সে সবের ভাবনা থাকবে না, এটা কল্পনা করাও মুস্কিল, অন্ততঃ আমাদের দেশের পক্ষে। এর ফল ভাল হ'বে, না মন্দ হ'বে? সোজাসুজি উত্তর দেওয়া শক্ত। সভ্যদেশের ধনী-গৃহিণীদের স্নায়ুর ব্যারামের কথা এ সময়ে মনে করা দরকার। তবে এটা বলা যায় ইকনমিক্‌স্-এর চেয়ে আর্টের চর্চ্চাই তখন বেশী কাজের হ'বে। তখনই হয়ত ধর্ম্ম তার সত্যিকার স্থান পাবে। আমাদের নিজেদের দেশের কথা ভাবলে মন কিন্তু নৈরাশ্যে ভ'রে ওঠে। কেবলই মনে পড়ে "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ।"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

কাব্যপরিমিতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন (রসচক্র)।

অদ্ভুত বই, অদ্ভুত লেখকের রচনা! যতীনবাবুর মধ্যে দুটী বিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশ আছে—কবিত্ব আর ইঞ্জিনিয়ারি; কিন্তু বিরোধ দোষ না হ'য়ে, 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার হ'য়েই আছে। 'কাব্যপরিমিতি'র উদ্দেশ্য কাব্যের জাতিভেদ তথা রস-বিচার; কিন্তু তা'র পথনির্দ্দেশ হয়েছে পরিমিতির রেখাঙ্কনে।

বইখানির পাঁচটী অধ্যায় এবং অধ্যায়গুলির নামকরণ 'পরিমিতি'রই পরিভাষায়—(১) সূত্র, (২) অঙ্কন, (৩) সিদ্ধান্ত, (৪) দৃষ্টান্ত আর (৫) অনুশীলনী।

একখানি ellipse-জাতীয় চিত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার যা' বোঝাতে চেয়েছেন, তা'র মর্ম্ম হচ্ছে এই—

কবি আর পাঠক দু'জনেরি চিত্তধারা যাত্রা সুরু করে বস্তুজগৎ থেকে। এই বস্তুজগতের পরের ষ্টেশন্ ভাবলোক। ভাবলোকের ছ'টী Sub-লোক—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় আর শম। [এরা A Priori—Kant-এর ভাষায় এদের Forms বলা যেতে পারে।] বস্তুজগৎ থেকে Sense-Perception-রূপে যা'রা মনের ভিতর ঢোকে, ভাবের ছাঁচে প'ড়ে তা'রাই স্মৃতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এই ভাবস্মৃতির জগৎখানির নাম বাসনালোক। বাসনালোক থেকে কবি পৌঁছোন কল্পনালোকে আর পাঠক কাব্যে। কল্পনামায়াবিনী জাদু-মন্ত্রে রসলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়; অমনি কবিচিত্ত ওই লোকে প্রবেশ ক'রে রসায়িত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ওইখানেই তার শেষ নয়। রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত ঝ'রে পড়ে কাব্যে, মানুষের উপভোগ্য হওয়ার জন্য—কাব্যের সার্থকতাই এইখানে। পাঠক কাব্য থেকে উত্তীর্ণ হন রসলোকে। আর Critic যিনি, তিনি রসলোক থেকে কবিচিত্তধারার উজানপথে কল্পনা-বাসনা-ভাবলোকের ভিতর দিয়ে ফিরে আসেন আপন ক্ষেত্রে অর্থাৎ বস্তুজগতে, কবিচিত্তধারার অখণ্ড পরিচয় পে'তে। বলা-বাহুল্য দুই চিত্তধারা বিপরীতমুখী—মিলন সম্ভব হয়, পথ বৃত্তাভাস ব'লে। কবি কাব্যরচনা করেন প্রতিভার প্রেরণায়, যে-শক্তিতে ধরিত্রী তার মাটির রসকে গোলাপে গন্ধায়িত করে তেম্‌নি একটা অচিন্ত্য শক্তির বলে। অরূপ-রসায়িত চিত্তখানি যখন কাব্যে রূপপরিগ্রহ করতে চায়, তখনি আসে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি। কাব্যে শব্দ হচ্ছে কঙ্কাল, ছন্দ অবয়ব, অলঙ্কার ভূষণ, বাচ্যার্থ মন, ব্যঞ্জনা বুদ্ধি আর রস আত্মা।

কিন্তু, এ হ'ল শ্রেষ্ঠ কাব্যের কথা। নীচের থাকের পাঠক নীচুদরের কাব্য থেকে আনন্দ পান; যতীনবাবু এ জাতীয় আনন্দের নাম দিয়েছেন 'বিলাস'। কবিচিত্ত তথা পাঠকচিত্তের মিলনে চারটী 'অয়নচক্র' হয়; সেগুলিকে সাজানো হয়েছে এইভাবে—

১। ভাবসমুখকাব্য + ভাবমুখী চিত্ত = ভাববিলাস }—বিলাসচক্র (২)।
২। বাসনাসমুখকাব্য + বাসনামুখী চিত্ত = বাসনাবিলাস }
৩। কল্পনাসমুখকাব্য + কল্পনামুখী চিত্ত = কল্পনানন্দ—আনন্দচক্র।
৪। রসোত্তীর্ণকাব্য + রসোন্মুখী চিত্ত = রস—রসচক্র।

এদের ভিতরে-ভিতরে, বিশেষ ক'রে আনন্দচক্র আর রসচক্রের মধ্যে, অনেক মিশ্র চক্র আছে। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কবি নিম্নশ্রেণীর কাব্য কেন লেখেন, উচ্চ শ্রেণীর পাঠক নিম্নশ্রেণীর কবিতা থেকেও আনন্দ পান কেন, mystic কাব্যের স্বরূপ কি, কাব্যে তত্ত্বের স্থান আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। মোটের ওপর এই হ'ল বইখানির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।

'কাব্যপরিমিতি'র আবির্ভাব এদেশেরই কাব্যবিচারপন্থার অনুসরণ-সূত্রে; পাশ্চাত্য মতবাদের ছায়াও এতে আছে ব'লে মনে করি না। দেশী হ'লেও 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব' যতীনবাবুর গতি নয়। তিনি নিজে কবি এবং রসগ্রাহী; পূর্ব্বসূরির ইঙ্গিত তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং উপলব্ধির রসায়নে অভিনব রূপে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

'ভাব'—বা নিখুঁত পারিভাষিক ভাষায় 'স্থায়িভাব'—'বিভাব', 'অনুভাব' ইত্যাদির বলে, একেবারে রসে উত্তীর্ণ হচ্ছে, সে-কালের রসবিদ্‌দের প্রায় সকলেরি এই মত। "সংস্কারাত্মনা চিরকালস্থায়িত্বাৎ যাবৎ রসপ্রতীতিকালম্ অনুসন্ধানাচ্চ স্থায়িত্বম্;" "বাসনারূপতয়া স্থিতান্ রত্যাদীন্ স্থায়িনো বিভাবয়ন্তি রসাস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতাং নয়ন্তি ইতি বিভাবাঃ"—এই হ'ল 'প্রভা' আর 'কাব্যপ্রদীপ'-এর মত। 'সাহিত্যদর্পণে'ও তাই,—"আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্‌গমাৎ।……উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।…" 'দশরূপ'-এও দেখ্‌ছি—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। অনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।" এমন-কি নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনিও বলেছেন,—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।" প্রাচীনদের মতে তাহ'লে পাচ্ছি যে "রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চৈব ……"—এই আটটা স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির যোগে, যথাক্রমে "শৃঙ্গারো হাস্যকরুণারৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসমদ্ভুত……"—এই আটটা রসে পরিণতি লাভ করে। মতান্তরে 'নির্ব্বেদ' ব'লে একটা স্থায়িভাব আছে; তার থেকে ওই একই রীতিতে 'শান্ত'-রসের জন্ম হয়। মোটের ওপর রস ছাড়া কাব্য হয় না—"বাক্যং-রসাত্মকং কাব্যম্" এবং কাব্যে বিচার হবে শব্দ, অর্থ বা রসের ভালো মন্দ নিয়ে।

এইখানে প্রাচীনদের সঙ্গে যতীনবাবুর মতভেদ। তিনি বল্‌তে চান কাব্যমাত্রেই রস থাকে না, থাক্‌তে পারে না। কল্পনা, বাসনা, এমনকি ভাবলোক থেকেও সরাসরি কাব্যে পৌছোনো যায়। রসোত্তীর্ণ কাব্য শ্রেষ্ঠ, এরা নানান্ রকমে নিকৃষ্ট। "সদাশিবং নৌমি পিনাকপাণিম্"—প্রাচীনদের মতে রসোত্তীর্ণ কাব্য; তবে শ্রেষ্ঠ কাব্যের নমুনা এ নয়, কারণ রসের বিরুদ্ধতা রয়েছে—'পিনাকপাণি'-তে রয়েছে রৌদ্ররস আর 'সদাশিবে' শান্ত। যতীনবাবুর মতে বিচার করতে গেলে রসের গন্ধও নাই এতে, শিব এখানে ভাবলোকে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যে-রসকে প্রাচীনরা "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ" ব'লেছেন, তা'র নমুনা যদি এই হয় তাহ'লে, "নমামি বিলাতী অগ্নি দেশালাইরূপী। দেহখানি চাঁচাছোলা, শিরে বাঁধা টুপী।" কেন শ্রেষ্ঠকাব্য হবে না? এর ভিতর শব্দদোষ, অর্থদোষ, রস (?) দোষ কিছুই নাই; বরঞ্চ চমৎকার হাস্যরস (?) রয়েছে। এর থেকে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্ছি প্রাচীনরা 'রস'-কে অখণ্ডরূপে বুঝে ব্যবহারে তা'কে খণ্ড খণ্ড করেছেন। যতীনবাবু রসের আভিজাত্য বজায় রেখেছেন, ব্রহ্মলোক থেকে টেনে এনে তা'কে বাজারে করেন নাই। কাব্যের জাতিভেদে আমরা যতীনবাবুর সঙ্গে একমত।

কিন্তু কোথাও কোথাও কবিতা-বিচারে একটু ব্যক্তিগত স্পর্শ আছে ব'লে মনে হয়। সত্যেন্দ্রদত্তের 'চম্পা' কবিতাকে তিনি রসোত্তীর্ণ বলেছেন; আমাদের মনে হয়েছে 'রসাভাসী'—যে-চম্পা 'সূর্য্যের সৌরভ', 'সূর্য্যের বিভূতি' যার 'লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি', কেন তা'র 'মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন'? যদি আনন্দে হয়, বল্‌বার কিছু নাই। কিন্তু 'খরতাপে আমি কভু ঝরিয়া না মরি', 'উগ্রমদ্যসম রৌদ্র…বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা' সহজে পান করি'—এই যা'র স্থির বিশ্বাস, সে কেন 'আধত্রাসে', 'বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান' হ'য়ে 'সাহসিকা অপ্সরার মত' আবির্ভূত হয়? রবীন্দ্রনাথের 'শিশুকাব্যে'-র আলোচনা-প্রসঙ্গে যতীনবাবু বলেছেন, "এখানে শিশু শিশু নয়, মা মা নয় এবং কাব্য শিশুকাব্য নহে"। কিন্তু এটা যে কি,

সে-সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর। শিশু যে-কাব্যে শ্রোতা, শিশুই বক্তা (অবশ্য শিশুর পিতামাতাও আছেন, তবে শিশুকেই আশ্রয় ক'রে) সে-কাব্য সম্বন্ধে যতীনবাবুর এই ইচ্ছাকৃত উদাসীনতায় আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লাম না। 'রূপক' বল্‌লেই সব গোল মিটে যেতো। মনে পড়ে অনেকদিন আগের একটা কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লিখেছিলেন তাঁর 'বাঙলার গীতিকবিতা'-য়। শিশুচিত্ত সাধারণতঃ ভাবমুখী, কদাচিৎ বাসনামুখী ; কাজেই সত্যকার শিশুকাব্য রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে না—এ কথা যতীনবাবুর সঙ্গে আমরাও বলি।

এইবার mystic কবিতা। যতীনবাবুর মতে 'অতিলব্ধ বাসনা' এই জাতীয় কবিতার মূলে। রসোত্তীর্ণ কবিতার মাথার মুকুট বলা যেতে পারে mystic কবিতাকে। 'অতিলব্ধবাসনা' বল্‌তে যতীনবাবু বুঝেছেন জন্মজন্মান্তরের ভাবস্মৃতি—কালিদাস এই বস্তুটীকেই বোধহয় "ভাবস্থির" বলেছেন, (Deepest layer of subconsciousness retained in the mind from lives long past)। উদাহরণ তোলা হয়েছে রবীন্দ্রকাব্য হ'তে। যতীনবাবুর সংজ্ঞার মাপকাঠিতে ওগুলি mystic হ'তে পারে। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর mysticism-এর জন্ম উপলব্ধি থেকে, অনুভূতি থেকে নয়। সত্যদ্রষ্টা সাধকদের (যেমন উপনিষদের ঋষিরা) mysticism-কে আমরা উপলব্ধিজাত প্রথমশ্রেণীর mysticism ব'লে মনে করি। Telephone-এ যখন কথা বলি, আমার receiver আমার কাছে 'সত্য' ; কিন্তু তখন আমার পাশে যদি কেউ থাকেন, তাঁর কাছে নয়। কাজেই আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তীর কাছে mystic হ'য়ে উঠি। তবু এ mysticism প্রথমশ্রেণীর নয়—উপলব্ধির চেয়ে ছোট, অনুভূতির চেয়ে বড়। রবীন্দ্রকাব্যের mysticism-কে পাশ্চাত্য মতে Theoretical Mysticism বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের mysticism 'অতিলব্ধ' বাসনার ওপর কল্পনার লীলাবিলাস ; রস আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নয়—রসাভাস, রসশবলতালক্ষণও যথেষ্ট। তবু শ্রেষ্ঠকাব্য বল্‌তে হবে ; কারণ, এ জাতীয় কাব্যের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়।

কাব্যে 'তত্ত্বে'র স্থান-সম্বন্ধে যতীনবাবু বলেছেন, এ জাতীয় প্রশ্ন সঙ্গত মনে হয় না ; সকল বস্তু এবং বিষয়ের স্থান যখন কাব্যে আছে, তখন তত্ত্বেরও আছে। তত্ত্বও রসায়িত হ'য়ে প্রথমশ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি করতে পারে। সত্য কথা, তত্ত্ব তখন হয় গৌণ আর কাব্য মুখ্য। Richards-এর মতন "Ulterior ends—essential to some forms of poems" যতীনবাবু বলতে পারেন নাই। তত্ত্ব যেখানে essential, শ্রেষ্ঠকাব্যের সেখানে স্থান নাই। কিন্তু তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও যে চমৎকার রসোত্তীর্ণ কাব্য হ'তে পারে তা'র নিদর্শন তত্ত্বমূলক আমাদের বৈষ্ণবকাব্য, বিশেষ ক'রে বহুতত্ত্বমূলক রবীন্দ্রকাব্য ;—তত্ত্ব এখানে রসে লীন হ'য়ে গিয়েছে।

পাঠকচিত্তধারার গতি তথা পরিণতি নির্দ্দেশ, অধিকারভেদে পাঠকের জাতিভেদ-বিচার এবং Critic চিত্তধারার বৈশিষ্ট্য-নিরূপণ—এইসব বিষয়ে যতীনবাবুর মৌলিকতার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। নিজে কবি এবং রসিক পাঠক হ'য়েও 'পরিমিতি'কার উপনিষদের 'উদাসীন' পুরুষের মতনই নিরাসক্ত—তাঁর ইঞ্জিনিয়ারি গজকাঠি অয়নচক্রের সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্গফল দিয়েছে। Critic-এর যে-সংজ্ঞা তিনি নির্দ্দেশ করেছেন, নিজেই তার দৃষ্টান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে Richards বলেছেন, "It (the world of poetry) is made up of experiences of exactly the same kinds as those that come to us in other ways" এবং এইটুকুমাত্র এর বিশেষত্ব যে, "It is fragile"। কিন্তু রসোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠকাব্য, বিশেষতঃ mystic কাব্যও কি এই ছাঁচে গড়া ? Shelley-র 'Epipsychidion', Bridges-এর 'Testament of Beauty', কি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'চঞ্চলা', 'সাবিত্রী' এই পর্য্যায়ভুক্ত ? Bradley-র যে-মত খণ্ডন ক'রে Richards নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, সেই "······A world by itself, independent, complete, autonomous"-কেও অবশ্য কাব্যের ব্যাপক স্বরূপ ব'লে মনে করতে পারি না। দুনিয়ার বেশীর ভাগ কবিতাই এই স্বাধীন, সম্পূর্ণ, স্ব-তন্ত্র জগতের বাইরে। যতীনবাবুর মধ্যে এই দুটী মতের সমন্বয় দেখ্ছি। আমরা পাঠকচিত্তধারার বিচার করতে হঠাৎ কাব্য-স্বরূপের অবতারণা ক'রে ফেল্লাম এইজন্যে, যে ওদের মতে এই পন্থাতেই কাব্যের রসভোগ তথা রসবিচার দুই-ই করতে হবে। পাঠকসম্বন্ধে Bradley বলেছেন,

"To possess it (the poetry-world) fully, you must enter that world, conform to its laws, and ignore, for the time being, the beliefs, aims and particular conditions, which belong to you in the other world of reality."

Richards বলেছেন ". . . . . When we experience it (the world of poetry), or attempt to, we must preserve it from contamination, from the interruption of personal particularities. . . . "

ভাষা ভিন্ন হ'লেও দুজনের বক্তব্য প্রায় এক। 'কাব্যপরিমিতি'তেও এরি অনুরূপ যুক্তি দেখতে পাচ্ছি। Critic-সম্পর্কে Richards-এর মতই সমীচীন ব'লে বোধহয়। Bradley-র "···it is to be judged entirely from within"-কে Richards বলেছেন, "misleading"। তাঁর মতে "In most cases we do not judge it from within"। "Entirely from within" রবীন্দ্রনাথের Synthesis-পন্থায় রসবিচারের মতন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস Synthesis পন্থায় রস-সম্ভোগ চলতে পারে, বিচার (criticism) সম্ভব নয়। যতীনবাবুর Critic রসলোক পর্য্যন্ত যান Synthesis পন্থায় পাঠকের মতন; তারপর Analysis পন্থায় কবিচিত্তের উজানপথে চলেন। Richards-এর চেয়ে যতীনবাবুর মত বেশী পরিস্ফুট।

এইবার দুই একটা অবান্তর কথা। 'ছন্দ'কে যতীনবাবু কাব্যের 'অবয়ব' বলেছেন কেন বুঝ্লাম না। ছন্দকে অনেক সময় ব্যঞ্জনারও কাজ করতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন—"অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর ভাবের স্বাধীনলোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজসম উদ্দাম সুন্দর গতি···" একথা শ্রেষ্ঠ কবিতাসম্পর্কে অতিসত্য (বলা বাহুল্য এ-'ভাব' যতীনবাবুর 'ভাব' নয়)। নীচু-দরের কবিতাতেও ছন্দ অনেক সময় গুরুতর কাজ করে।

যতীনবাবু একজায়গায় তাঁর চিত্রটীকে অশ্বডিম্ব ব'লে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ-ডিম্ব কি স্বয়ম্ভূ ? না, গ্রন্থকারের ভেবেচিন্তে প্রসবকরা ? এমনি ellipse-জাতীয় চিত্র না হ'লে পাঠকচিত্ত আর কবিচিত্ত ঘোরাফেরা করতো কেমন ক'রে ? দুটী কেন্দ্রের কি দরকার ছিল না ?

কাব্যরসিকদের দরবারে 'কাব্যপরিমিতি' যে শ্রদ্ধার আসন পাবে সে কথা নিঃসংশয়েই বল্‌তে পারি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

The Loosening and other Poems—RONALD BOTTRAL,
(The Minority Press)

যদিও এই নবীন কবি প্রথম কবিতাতেই বলেছেন—

Why take the odds of mental strife
When being mute rounds off the life?

তবুও যে বট্রালের কাব্যপ্রেরণা রুদ্ধ হয় নি, তার কারণ তিনি নিজেই দেখিয়েছেন,—

Yet, can the skeleton command?
Can flesh revoke its reflexed act?

বট্রালের কবিতায় খুসি হওয়া যায়। এলিয়টের পরে যারা আসছেন—হর্বার্ট রীড্, রয়্ ক্যাম্পবেল্ আদি—বট্রাল্‌ও যে তাঁদের সঙ্গে বস্‌তে পারেন তাঁর এই প্রথম বই পড়েই তা মনে হয়। এমন কি বায়রনীয় বাক্যবহুল ক্যাম্পবেলের চেয়ে অন্তত এই বুদ্ধিজীবী কবিটির সম্বন্ধে বেশি আস্থা হয়।

এই বইটি তিন ভাগে সাজানো। ৩০ সালে লেখা Arion Anadyomenos-নামে একটি কবিতাগুচ্ছ; Poems; ও ৩১ সালে লেখা The Loosening। একথা বলাই বাহুল্য, যে তিন খণ্ডেই বট্রাল্ আধুনিক—বট্রাল্ জানেন যে

All sap has gone out of tradition
And the new limbs destined for full-leaved strewments
Are withered, marrowless, natally thwarted.

এই সভ্যতাচূর্ণের সঙ্গে আশ্বাসও গেছে—বট্রালের ভাষায়—নবজীবনের চাবিও হারিয়েছে। কাজে কাজেই শালবীথিতে, চাঁদের আলোয়, দখিন হাওয়ায়, কোকিলের গানে মুগ্ধ হ'য়ে, বা শোপ্যাঁর সুর শুনে ক্ষান্তি কোথায়? অথচ সিটওয়েলের কাকাতুয়াকাব্যে ভীত হ'য়েই বোধহয় বট্রাল্ কাব্যশক্তিতে আস্থা স্থাপন করতে ইতস্তত করছেন—

Microscopic anatomy of ephermerides,
Powerhouse-stacks, girder-ribs, provide a crude base;
But man is what he eats, and they are not bred
Flesh of our flesh, being unrelated
Experientially, fused in no emotive furnace.

কিন্তু Leavis তাঁর New Bearings in English Poetry-নামক সমালোচনা-গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন, বট্রালের কবিতার উপমা, ভাষাবন্ধ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে কবির চেতনায় বাইবেল, সমুদ্র ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনও স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, ছন্দব্যবহারে (মিটার নয়, রিদম্) তিনি যে এন্‌জিনের শব্দ সহ্য করেছেন, তা বোঝা যায়। এবং নিতান্তই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক অথবা ব্যাবহারিক শব্দ ব্যবহার ও বাক্যরচনা করা সত্ত্বেও যে তাঁর কবিতা প্রবন্ধ বা প্রলাপ হয় নি,

তাতেই প্রমাণ হয় যে বট্রাল্ চেষ্টা ক'রে নূতন ন'ন—তিনি স্বভাবতই স্বকীয়। The Loosening-এর শেষ কটি ছত্র বট্রালের কবিতা সম্বন্ধেও লাগিয়ে দেওয়া যায়—

We hail with contumely or
Introverted joy the rain
Of irrigating dailiness, which leaves
The fields gleaming with hundred-fold grain.

বট্রাল্ এসেছেন মরুভূমিতে বটে, কিন্তু তিনি বলেন না যে

This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

Arion Anadyomenos-এর শেষটুকু উদ্ধৃত করলেই তাঁর অন্তরের আশার আভাস পাওয়া যাবে—

" Is it worthwhile to make lips smile again,
To transmit that uneasiness in us which craves
A moment's mouthing, craves to bully the pain
The pain and pity of it into staves
Of crabbed pothooks, filling the breadth
Of tiltepage to colophon?
Is it worth while to debate upon
The automatic sense which forces us
To circumvent our quietus
And put instead on record
Reactions to the vibrations of a vocal chord?"

The waters are lifting at length, and stand revealed
The shoddy roofs steeled,
Even silvered, by reflected light, quite rent
From their cadaverous cerement,
While the final passacaglia of Brahms
Weaves itself point by point
Into the shuddering waves of rain,
Assertive, affirmative, triumphant . . .
Perchance, after all, living within
And for ourselves, exhaling our entity
In our perceptions, yet not altogether bent
With our breaths to petrify and eternize
Some stony replica, we have tracked
What song the sirens sang. So may the disjoint
Time resolve itself and raise up dolphins backed
Like whales to waft us where a confident sea
Is ever breaking, never spent.

এই আত্মস্থ আশ্বাসের সুর যে এইখানেই শুধু পাওয়া যায় তা নয়। অন্যত্রও মেলে, যথা,—Salute to Them That Know। বট্রাল্ মরুভূমিতে সরোবরের আভাস পেয়েছেন। কিন্তু আমি এই আশার উৎস বা ভিত্তি ধরতে পারিনি। বট্রাল্ স্বপ্নলোকে পালান্ নি, তা দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এই আশার মূলধন শুধু সুস্থ সচ্ছল যৌবন কিনা, তা জানি না। এলিয়টের মুক্তির ইসারা তাঁর কাব্যে প্রচুর পেয়েছি—

বট্রাল্ সে ভাগবৎ করুণা বা শান্তির আশ্বাস পান্ নি। অথচ কিছু মূলধন যে তাঁর আছে, তা তাঁর শক্তিশালী কবিতা বিশ্বাস করায়। হয়ত ভবিষ্যতে তাঁর কবিতায় এই অবৈকল্য পরিপূর্ণ মূর্তি পাবে ও তার উৎস আমরা খুঁজে পাব। আজ পর্যন্ত মান্‌ছি যে তাঁর অবস্থা—

. . . . Hades
Whisks me into the upper air—to leave me poised.

কিন্তু এই সঙ্গতি সত্ত্বেও তাঁর যাত্রার বিরাম হয় নি। এখনও বট্রাল্ ভুলছেন, 'জয়স্ ও ভালেরির ব্যর্থ অন্তর্দর্শনে' ও সুস্থদেহ অবিকৃত শুচি ফার্ম্-গর্লের স্মৃতিতে। তিনি জানেন যে—

The wielder of dialectic is ensloughed.

এবং তিনি বলেন,

I have chopped logic
Since then and laid out the subject in
My brain's mortuary, held my mind
A clearing-house for moral commonplaces
Which gutter and are gone, yet I am sick
With excess of memory, how a farm girl, ইত্যাদি।

যাই হোক্, এ সব বাহ্য। তাঁর রচনা কবিতা হিসাবেও উপভোগ্য—বিশেষ ৩০ সালের অনেকগুলি। ছন্দ, উপমার প্রাচুর্য্য ও বিস্ময়কর সার্থকতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির মিল মুগ্ধ করে। এলিয়ট্ ও পাউন্ডের পরের কবি যে তিনি ও তিনি যে হপ্‌কিন্সের কাছে ছেলেবেলায় কিছু সমাসরচনা ও ধ্বনিশিল্প শিখেছেন তার প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু তাতে এ কবির স্বকীয়তাই প্রকাশ পেয়েছে—যেমন পেয়েছে ওয়ালারের অনুসরণে ড্রাইডেনের প্রতিভা। এবং মনে হয়েছে যে এ স্বকীয়তা ইংরেজি কাব্যের ধাতে সয়, সুতরাং এলিয়টের কথায়, এ খাঁটি জিনিস।

শ্রীবিষ্ণু দে

A Letter from India—EDWARD THOMPSON, (Faber & Faber) 5s.
Hindoo Holiday—J. R. ACKERLEY, (Chatto & Windus) 8s. 6d.

ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কোনো বই বেরিয়েছে শুনলেই আমাদের আতঙ্ক জাগে। ভয়ের কারণও যথেষ্ট আছে। এই হতভাগ্য দেশসম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো প্রথম শ্রেণীর বই প্রকাশ হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। পাশেই যখন অৰ্দ্ধসভ্য আরবে ডাউটির অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত আজও মরুযাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে, তখন ইয়েট্‌স্-ব্রাউনের নিরামিষ যোগানুরাগে সন্তুষ্ট হওয়া শক্ত। অবশ্য এই সম্পর্কে ই-এম্-ফর্ষ্টারের নাম অবিস্মরণীয়। তিনি অন্ততঃ বিদেশকে স্বদেশী দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে চাননি, ভারতকে দেখেছেন ব্যক্তির স্বকীয় দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু "এ প্যাসেজ্ টু ইণ্ডিয়া"-র উপসংহার সত্যই ভয়াবহ; ফর্ষ্টারের সিদ্ধান্ত কিপ্‌লিঙের প্রসিদ্ধ শ্লোকের চেয়েও নৈরাশ্যময়। কিপ্‌লিঙ শেষ পর্যন্ত এইটুকু স্বীকার করেছিলেন যে পূর্ব্বপশ্চিমের বিরোধ চিরন্তন হ'লেও, ও-দুই অঞ্চলের বীরসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ অভাবনীয়। ফর্ষ্টার কিন্তু সে-তুচ্ছাতিতুচ্ছ আশ্বাসের পথটিও খোলা রাখেননি; তাঁর মতে আজকের দিনে শ্বেত-

কৃষ্ণের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সুদ্ধ অসাধ্য। বিসংবাদের পাহাড় তাঁদের সহযাত্রার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, অভিমানের নির্ঝর তাদের অনুষঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দেয়, রাষ্ট্রনৈতিক কুয়াসায় তাদের সম্মিলিত গন্তব্যের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। ফলে মনে হয় স্পেঙ্গলারের অনুমানই হয়তো সত্য, বিশ্বমৈত্রী বুঝি আসলে কবিদের ভাববিলাসমাত্র, শুচিবায়ুগ্রস্ত জাতীয়তার ছুৎমার্গ ভেদ ক'রে একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের আদানপ্রদান একেবারেই অসম্ভব।

গৌরচন্দ্রিকার বহর দেখে অনেকেই ভাববেন যে, আলোচ্য বই-দুখানিও বুঝি মিস্ মেয়োর মহাকীর্ত্তির সমতুল্য। কিন্তু এমন ধারণা অমূলক। সত্য বলতে গেলে উক্ত গ্রন্থ দুটির সম্বন্ধে আমার উপক্রমণিকা অবান্তর। লেখকদ্বয়কেই আমি নিঃস্বার্থ ও অনুকম্পায়ী হিসেবে দেখি এবং তাঁদের নিবন্ধ পড়ার পরে আর্য্যাবর্ত্তকে রহস্যাচ্ছন্ন মনে করার কোনো কারণ থাকেনা। কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতা বাড়াবাড়ির কোলঘেঁষা হ'লেও, এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে এঁদের নিরাসক্ত সত্যনিষ্ঠাতেও কিসের একটা ফাঁক আছে। এঁরা যথার্থ ভারতকে পাননি, তা বলা চলেনা, কিন্তু এঁদের লেখায় একটা কোন অপরিহার্য্য লক্ষণের অভাব শেষ পর্য্যন্ত মনকে স্বস্তি পেতে দেয়না। এই অতৃপ্তিবোধ থেকেই উপরের মুখবন্ধটার সৃষ্টি।

"এ লেটার ফ্রম্ ইণ্ডিয়া"র প্রসঙ্গ হচ্ছে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি; এবং রাষ্ট্রনৈতিক জগৎটা অপেক্ষিক। এই লোকে কোনো সুনিশ্চিত মধ্যপন্থা নেই; যে-পথ কেন্দ্রের যত কাছে আসে, উক্ত সম্মানে তার অধিকার হয় তত বেশি। এমন-কি এখানে মধ্যস্থের সংখ্যা একাধিক হ'লেও স্বত্বহরণ বা স্থান-সংকুলনের সূত্রপাত হয়না। কাজেই টম্‌সন্-সাহেবকে নিরপেক্ষ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি একথা ভালো ক'রেই অনুভব করছি যে লেখক ভারতবাসী হ'লে বিবরণের চেহারা অতি অবশ্যই বদলে যেতো। নিরাসক্তের লক্ষ্য কেন্দ্রাভিমুখী বটে, কিন্তু স্বার্থের অন্তিম আকর্ষণ তাকেও অল্পবিস্তর বিচলিত করে। এবং টম্‌সন্-সাহেব যেহেতু ইংরেজ, তাই ইংরেজের অভিযোগটা তিনি যত স্পষ্ট ক'রে দেখেছেন, আমাদের নালিশটা তত সরল ক'রে বোঝেননি। নিষ্কাম হয়েও যদি কোনো হিন্দুস্থানী জালিয়ানবালা, চট্টগ্রাম, হিজলি ইত্যাদির প্রতিবাদ করতো, তাহলে তার বাক্য যে টম্‌সন্-সাহেবের চেয়ে খরতর হতো তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু একখানা দেড়শ পাতার বইয়ে তিনটিমাত্র স্থানে উত্তেজনার অপ্রাচুর্য্য কোনোমতেই মারাত্মক ব'লে গণ্য হতে পারেনা। যদিই স্বীকার করা যায় যে উক্ত অনুষ্ণতা স্বেচ্ছাকৃত, তবু টম্‌সন্-সাহেবের সত্যানুরক্তিকে অনাদর করার উপায় নেই।

গত ছমাসের শোচনীয় সংঘটনগুলোর এমন সুসম্বন্ধ বর্ণনা অন্যত্র শুনেছি ব'লে মনে তো পড়েই না, উপরন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটের সমাধানকল্পে তিনি যে-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেছেন, তাতে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই খুব সম্ভব সায় দেবেন। মহাত্মাসম্বন্ধে টম্‌সন্-সাহেবের মতামত জনপ্রিয় হবেনা নিশ্চয়, কিন্তু এ-প্রসঙ্গেও যিনি টম্‌সন্-সাহেবকে উদ্‌ভ্রান্ত-উপাধি দিতে চাইবেন, তাঁর গুরুভক্তিকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করবো, কিন্তু তাঁর সুবিবেচনার বিষয়ে আমি নীরব থাকতে বাধ্য। সে যাই হোক, টম্‌সন্-সাহেবের সিদ্ধান্ত আমাদের মনে না-ধরলেও, "এ লেটার্ ফ্রম্ ইণ্ডিয়া" ভারতবাসীমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার হয়তো দুষ্কর, কিন্তু তাই ব'লেই অবিচার মার্জ্জনীয় নয়; এবং অবিচার যদি অনিবার্য্যই হয়, তবু তার পরিমাণ সাধ্যমতো সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইখানেই

অন্যপক্ষকে কাজে লাগে। সত্য শুধু স্বদলের সম্পত্তি নয়, এই প্রবচনটা স্মরণে রাখলে, শুধু অবিচার কেন, অত্যাচারকেও আবশ্যিকতার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করা সহজ হবে।

হিন্দুস্থানসম্পর্কে টম্সন্-সাহেব অনেক দিন থেকে অনেক বই লিখছেন। তার মধ্যে কোনোখানাই বর্জ্জনীয় নয় এবং অন্তত দুখানা শিল্পের পাদপীঠে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু "কৃষ্ণকুমারী"-র মতো নিখুঁত নাটক ও "এন্ ইণ্ডিয়ান্ ডে"-র মতো উৎকৃষ্ট উপাখ্যান যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে, তাঁর অপরাপর রচনায় একটা অসহ্য পৃষ্ঠপোষণের ভাব যে কেন ফুটে বেরোয়, তা বোঝা শক্ত। এটা ক্রমশ একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং এইজন্যেই বোধহয় তিনি এখানে তার প্রাপ্যসম্মানে সুদ্ধ বঞ্চিত। অবশ্য এ-অভিযোগটা এক' আমারি মনগড়া হ'তে পারে। অথবা উত্তরে টম্সন্-সাহেব বলতে পারেন যে শিল্পসৃষ্টির রীতি আর প্যাম্ফ্লেট্ লেখার দস্তুর, এ-দুয়ের মধ্যে আসমান-জমির তফাৎ থাকাই উচিত। উপরন্তু তিনি দু-একবার আমার দেশকে ঔপন্যাসিকের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই, বরাবর সেই অনুগ্রহ চাওয়া অসঙ্গত। ভারতের স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলোও এত মৌলিক, এমন মৌরসী যে সে-প্রসঙ্গে সমালোচক-মাত্রেই ন্যায়ত নিজেকে সদাচারী ও ধর্ম্মিষ্ঠ মনে করতে পারেন। কিন্তু তাহলেও এটা ভুললে অন্যায় হবে যে উচ্চাশয়ব্যতিরেকেও হিতোপদেশ সম্ভব। শৈশব স্মৃতি এখনো যাঁর মনে জাগরূক আছে, তিনিই মানবেন যে গুরুমহাশয়ের তর্জ্জনগর্জ্জনের চেয়ে বয়স্যের পরামর্শই বেশি গ্রাহ্য, বেশি সক্রিয়। কল্পিত জ্যেষ্ঠতার প্রাগ্‌ভাব বাদ দিয়েও নীতিকথা কওয়া যায় কিনা, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে একার্লি-সাহেবের "হিন্দু হলিডে"-নামক গ্রন্থে। বইখানি, "এ লেটার ফ্রম্ ইণ্ডিয়া"-র মতোই, পল্লবগ্রাহিতায় ভরা, ব্যঙ্গকৌতুকে লঘু, তার চরিত্রগুলিকে যে-কোনো নির্ভার প্রহসনের পাত্রপাত্রী ব'লে অনায়াসেই চালানো যায়। তবু এই দরদী বিদূষকের বাচালতা তথাকথিত স্মৃতিরত্ন-মহাশয়দের আপ্তবাক্যের চেয়ে কত গভীর, কত সম্ভ্রান্ত, কত মর্ম্মস্পর্শী।

উপরে নিরপেক্ষতার যে-সংজ্ঞা দিয়েছি, তার পরে বলা বাহুল্য যে একার্লি-সাহেবও পক্ষপাত বর্জ্জিত নন। হিন্দুসমাজকে তিনি মুসলমানসমাজের চেয়ে শ্রেয়স্কর মনে করেন, এবং স্থানীয় শ্বেতাঙ্গসমাজ তাঁর শ্রদ্ধায় বঞ্চিত। সত্য বলতে বইখানির প্রত্যেক চরিত্রই মুখ্যত ব্যাজোক্তির সাহায্যে আঁকা; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার মৌলভী আব্দুল ও বান্ধবী মিসেস্ ব্রিষ্টোর ছবিতে শুধু ব্যাজস্তুতিই নেই, বিদ্বেষের বিদ্যুদ্বিলাসও খুব স্পষ্ট। অবশ্য একার্লি-সাহেবের কাছে শ্লেষ অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি সাহিত্য-জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাট্যকাররূপে; এবং সেই অভ্যাসের গুণে তিনি এখনো হয়তো বিশ্বাস করেন যে শিল্পের সংমিশ্রণে সত্যের অমর্য্যাদা হয় না, অলঙ্করণের সমর্থনে বরং তার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। কারণ যাই হোক, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার খাতায় প্রয়োজনমতো যোগবিয়োগ করতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা নেই; এবং একথা মানতেই হবে যে এই অকৃপণ অতিরঞ্জনের কল্যাণে তিনি যে-নক্সা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা হয়তো ছোকরাপুর সামন্তরাজ্যের অবিকল ছবি না-হ'তে পারে, কিন্তু সেটা সমগ্র ভারতভূমির যথাযথ প্রতিলিপি।

এর থেকে এমন ভাবার কোনোই কারণ নেই যে তিনি অখণ্ডতার খোঁজেই ব্যস্ত, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি তাঁর নজরে পড়ে না। কিন্তু যদিই বা তাই হতো, তবু

কোনো ক্ষতি ছিলোনা, কারণ তাঁর বিবরণের সম্ভাব্যতা এত বেশি যে তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যাসত্যের কোনো অবকাশ নেই। ছোকরাপুরের মহারাজ যখন প্রথম সাক্ষাতেই গ্রন্থকর্ত্তার কাছে পাপের সবিস্তর পরিচয় চেয়ে জবাব পাবার আগেই একনিঃশ্বাসে ডারুইন, মারি কোরেলি ও প্র্যাগ্ম্যাটিস্ম্-এর নামোচ্চারণে তাঁর বাকরোধ ক'রে দেন, তখন পাঠকের হাস্যশিথিল মনে অবিশ্বাসের প্রবৃত্তিও থাকেনা, ঘুণাক্ষরেও প্রশ্ন ওঠেনা, এ-ধরণের আচরণ কোনো নরপতির পক্ষে সম্ভব কিনা। তখন কেবল জাগ্রত স্মৃতি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উন্মথন ক'রে অনুরূপ প্রলাপের শতসহস্র নিদর্শন মানসলোকে ভাসিয়ে তোলে। তখন আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই দেওয়ান-সাহেবের চার্ব্বাকপনার নজির মিলে, অনুগতদের মধ্যেই নারায়ণের হাসির প্রতিধ্বনি বাজে, বন্ধুবান্ধবের আচারব্যবহারেই বাবাজিরাওয়ের "আলোকপ্রাপ্তি"র প্রতিভাস ফোটে। আর পাতা উল্‌টানোর ত্বর সয়না, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ঊর্দ্ধশ্বাসে উবে যায়; এবং শেষে যখন লুব্ধ চক্ষু সীমান্তে এসে ধাক্কা খায়, তখন মন বলে—এরি মধ্যে?

বোধ হচ্ছে উচ্ছ্বাসটা সম্ভবত অসংযত ও অসঙ্গত হলো। তাই অবিলম্বে ব'লে রাখা ভালো যে বইখানি বাহ্যত অত্যন্ত সুখপাঠ্য হ'লেও, তার মর্ম্ম যথার্থই ভয়াবহ। লেখক ভারতীয় কোমলতা ও সারল্যের অনেক গুণ গেয়েছে, সত্য; কিন্তু যে-সহৃদয়তা বালবিধবা ভগ্নীর দুঃখ সাশ্রুলোচনে বর্ণনা ক'রে, তার কষ্টলাঘবের প্রস্তাবে শিহরিত হয়, সে-সহৃদয়তা একার্লি-সাহেবকে যতই মুগ্ধ করুক আমাকে সান্ত্বনা দেয় না। এল্‌বমেনের লোভে গরুর চোনা খাওয়া উচিত, এ ধরণের উক্তিই যে প্রহসনের প্রধান সম্বল তাতে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ নেই; কিন্তু চোনার মাহাত্ম্যে যখন হাঁসপাতাল-পরিচালক সুদ্ধ বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠেন, তখন হাসির চেয়ে কান্নাই শোভন। সূচ্যগ্রভূমির চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নীরোর প্রতিযোগিতা খুবই উপভোগ্য বটে, কিন্তু বামে শব শৃগাল দেখবার জন্যে হাক্সলি স্পেন্সার্ আলোচনা করতে করতে বিশত্রিশ ক্রোশ মোটার-ভ্রমণ রাজাপ্রজা কারুর পক্ষেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। কিন্তু বই থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা নিষ্প্রয়োজন; আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই তো একার্লি-সাহে'বর অনুরূপ। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইখানে যে তাঁর দেশের লোক অমঙ্গলের সংসর্গে এলে, হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে আকাশে তাকায় না, আর আমরা মৃত্যুকে শিয়রস্থ জেনে বাবা তারকনাথের কাছে আড়াই পয়সার পূজা মানি। কিন্তু থাক সে-কথা; হতাশের সুরে প্রবন্ধ শেষ করবো না। "হিন্দু হলিডে"-র সাহিত্যিক উৎকর্ষ এ-দেশের ধ্বংসোন্মুখ সমাজতন্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, তারি মধ্যে একটা নবযুগের আশ্বাস আছে। এই হিংস্র জাতিয়তার দিনে একজন ভারতপ্রবাসী ইংরেজও যদি বর্ণভেদের অপার সাগরে সেতুবন্ধ ক'রে থাকতে পারে, তবে হয়তো বিবেক-জিনিষটা সাবেকী উপসর্গ মাত্র নয়। যে-সনির্ব্বন্ধ সুবুদ্ধির সামনে রাষ্ট্রনৈতিক কুসংস্কার পর্য্যন্ত নতমস্তক হলো, তার সংক্রমণে কেবল বিবর্ত্তনভীরুর অসাড়তাই কি শুধু অটল থাকবে? খুব সম্ভব থাকবে, কিন্তু শুভসমাপ্তির খাতিরে আত্মপ্রসাদের নটেগাছটি না-মুড়িয়েই আমার কথা আজ ফুরোক।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথমা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং) দাম দেড় টাকা।

"প্রথমা" সুপরিচিত গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতাপুস্তক, কিন্তু প্রথম ব'লে কবিতাগুলির প্রথমাবস্থার বালাই নেই, যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। কবিতাগুলির কোন শিরোনাম দেওয়া হয়নি, বোধহয় সবগুলির ভেতর দিয়ে একটা প্রধান সুর জাগিয়ে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। সত্যিই একটা প্রধান সুর বেজেছে,—তা' বিলাপের। বিলাপের কারণটি খুব স্বতন্ত্র ও অভিনব। কে কবে পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে ছুড়ে ফেলেছিল আর তাতেই লক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সেই থেকে ব্যর্থতা সর্ব্বময়;—এই হ'ল প্রথমার নিদারুণ বিলাপের প্রধান কারণ। এই ব্যর্থতার ক্ষোভে কবি লিখেছেন, "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল; সে মিথ্যায় মগ্ন হ'য়ে সত্য তোর ভোল"; "নিখিল ভুবন ভরি খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা অনাদি অতীত কাল ধরি"; "বিশ্বজোড়া হাহাকারে অভিনব স্তুতি" ইত্যাদি। কবির এ সব উক্তি ঠিক দুঃখবাদ নয়,—একটা অপ্রত্যাশিত ক্রন্দনবাদ। কিন্তু হাসানো যেমন সোজা কাঁদানো তেমন নয়; কেননা কাঁদাতে হ'লে মানুষের অন্তঃস্থলে পৌঁছাতে হয়। প্রথমার কবিতা সেই অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যায় নি; বরং অধিকাংশ জায়গাতেই কান্নার পরিবর্ত্তে কষ্টকল্পনাই সার হয়। অর্থাৎ প্রথমায় কান্নার অনুশাসন আছে কিন্তু বাস্তবিক দুঃখ বা ক্ষতির বারতা নেই। প্রথমা পড়ে এক একবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে পড়ে, কিন্তু তুলনা চলে না, প্রধানত এই কারণে—তাঁর কবিতায় ক্রন্দন নেই, আছে নির্ম্মম চাবুক।

কান্না-হাসির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কবিতা আলোচনা বাস্তবিক একটু অবান্তর। কবিতার আসল সম্পদ কবিতার সৌষ্ঠব। এবিষয়ে প্রথমা আপন দাবী পেশ করেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কয়েকটি কবিতা আমার বড় ভাল লেগেছে, সেগুলির এখানে নাম করা গেল; যথা—"মাটির ঢেলা," "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল", "আজি এই প্রভাতের আশীর্ব্বাদখানি," "হাঁকে ফিরিওয়ালা—কাগজ বিক্রি"। এ ছাড়া অন্যগুলিতেও কবির কাব্যস্ফুরণের দক্ষতার পরিচয় মিলে। একটি চমৎকার মিল কারুর চোখ এড়িয়ে যাবে না, "হরিৎ-ধান্য-ব্যাকুল গ্রামের সীমা, কানন-কণ্ঠ-লগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা"। বেশীর ভাগ ছন্দই কিন্তু মুক্তচ্ছন্দ অথচ বৈশিষ্ট্যময়। তবে স্থানে স্থানে বৈশিষ্ট্য যেন একটু অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে, যেমন,—

> কূলহীন যত কালাপানি মথি
>   লোণা জলে ডুবে নেয়ে,
> ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
>   ঝড়ের ঝাঁকনি খেয়ে,
> যত হায়রাণ লবেজান তরী
>   বরখাস্ত্ হল ভাই—

আর এক কথা "অমৃত" চার সংখ্যক নয়, তা এখানে অক্ষর, মাত্রা বা স্বর যে-কোনো হিসেবেই সংখ্যাবিচার করা হোক না কেন। এই সব ক্রটিতে স্থানে স্থানে ছন্দ কটু হয়েছে। তেমনি ধাঁধাঁর দিকে একটা ঝোঁকও কাব্যরসকে পঙ্গু করেছে। "ঘাঘ্‌রী বিনা কাজরী নাহি",—কাব্য নয়, একটা ধাঁধাঁ। যে কবিতাটি থেকে এটা নেওয়া তার নাম "সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে"—এটির বেশীর ভাগই ধাঁধাঁ; একটু যা' সুর

আছে তা' ছেলে-ভোলানো সুর। সর্ব্বসমেত একটা প্রশ্ন জাগে যে,—যে লেখক গল্প লেখায় ওস্তাদ সে কি—সুতরাং—কবিতা লেখায়ও 'ওস্তাদ হ'তে বাধ্য? নিশ্চয়ই এর উত্তর হবে, না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেলা উত্তর কি হবে বলতে পারি না; কিন্তু প্রথমার কবিতাগুলি যে মুখ্যত একজন গদ্যলেখকের রচনা তার প্রমাণ এই লাইনটি—

মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপ ঝুপ

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

বেদুইন। শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (বান্ধব পুস্তকালয়, শিবপুর রোড, হাওড়া) এক টাকা।

ইহা নৃতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক নহে, ভ্রমণ-কাহিনীও নহে, আরবদেশের মরুচারী বেদুইনের কোনো উল্লেখই এই পুস্তকে নাই। "বেদুইন" কাব্য এবং যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র তথাপি উৎকর্ষে—'স্নেহের পীযূষ'-কে লিখিত 'তোমার বারীনদা'র পত্র (যাহা মলাটের উপর সগৌরবে মুদ্রিত হইয়াছে) এবং শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পরিচয়' পড়িয়া ধারণা হয়—বোধহয় মহাকাব্য। স্থূলদৃষ্টি পাঠকের ধারণা কিন্তু খুব সম্ভবত উক্ত দুই রকমের সমঝদারের ধারণার সহিত মিলিবেনা, তাঁহার হয়তো মনে হইবে কবি 'বেদুইন'-কাব্যকে যে পোনেরোটি অংশে (না সর্গে) বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা পোনেরোটি খণ্ড কবিতামাত্র এবং তাহাতে মহাকাব্যের কোনো লক্ষণই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি কবিতাগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নাই? অবশ্য আছে; তাহার প্রমাণ কবিতাগুলির সুর ও ছন্দ—বরাবর এক সুর ও এক ছন্দ। বিলাপ ও প্রলাপের নিপুণ সংমিশ্রণে এই কবিতাগুলির সুর রচিত হইয়াছে এবং ছন্দ গঠিত হইয়াছে মাত্রার বন্ধনমুক্ত ধ্বনিতরঙ্গের সমাবেশের উপর। বেশি নয়, দুটি কি তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্থূলবুদ্ধি জনসাধারণের কাছে বেদুইন-কাব্যের ছন্দের ও ভাবের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হইবে; যথা ঃ—

(১) আমার বিগত বন্ধুরা সব আসিও আজিকে স্বপনে
তোমাদের কিছু প্রাণের কথা শুনায়ো আমারে গোপনে।

(২) বছর হিসাবে বাইশ বটে মন ক্ষত বিক্ষত।

(৩) স্রষ্টারে যদি পাই সম্মুখে দুনখে তাহারে চিরি।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্যে বাস্তবতা

বাংলা সাহিত্যের ধারা নিয়ে আজ অনেক অলোচনা চলেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কিছুদিন হল সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হ'লেও যে সে আলোচনায় যোগ দিতে সাহস পেয়েছি, তার একমাত্র কারণ জাতির মনের স্বভাব সহজে বদলায় না। এবং চার বছরেই যে বাংলা সাহিত্যের ধারার কোন বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা আমার মনে হয় না। তাই বহুদিন ধ'রে যে চিন্তার ধারা, যে সাহিত্যের ট্র্যাডিশন ও আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছে, তারি সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা আমি বলতে চাই। সাহিত্যের প্রাত্যহিক প্রকাশের সঙ্গে অপরিচয় সকল সময়ে আমাদের সাহিত্যবিচারের হানি করে না—অনেক সময়ে এ অপরিচয়ে লাভই আছে। সাহিত্যের খুঁটিনাটির সংবাদ সংগ্রহে হয়তো তাতে বাধা পড়ে, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই সাহিত্যের সমগ্ররূপ দেখবার সম্ভাবনা তাতে সহজতর হয়ে আসে। কেবল দূরত্বই বাধার সৃষ্টি করে না—কাছের বাধাও খুবই কঠিন হতে পারে। পাহাড়ের একান্ত কাছে দাঁড়ালে তাকে সমগ্রভাবে দেখা যায় না,—সামনের গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ী ঘর, পাথর ঝর্ণার প্রাচুর্য্যে পর্ব্বতের রূপরেখা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তেমনি সাহিত্যের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার বিভিন্ন প্রকাশ-কেই আমরা স্বতন্ত্র ক'রে দেখি, তার সমগ্রতার বিশিষ্ট মূর্ত্তি আমাদের চোখে ধরা দেয় না। তাছাড়াও, যে সাহিত্যের ধারার মধ্যে আমরা বাস করি, তার আবহাওয়া এমনি ক'রে আমাদের মানসগঠনে মিশে যায় যে তাকে বস্তুগতভাবে দেখবার আমাদের ক্ষমতা থাকে না; তাকে আমরা বিনা প্রশ্নেই স্বীকার ক'রে নিই, তার রীতি, তার ধারাকে স্বভাবের ধারা ব'লে মেনে নিই। সেখানেও যে সমস্যা থাকতে পারে, তার ধারা নিয়েও যে তর্ক চলতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হয় না। তাই নিজেদের সাহিত্যকে সে ভাবে অবজেকটিভ্‌লি দেখতে চাইলে তার প্রভাবের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, অন্য দেশের সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার ধারার তুলনামূলক বিচার চাই।

সে তুলনামূলক বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ধারার আলোচনায় একদিকে যেমন বিভিন্ন সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনার স্থান নাই, তেমনি অন্যদিকে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ লেখকের লেখার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। কাজেই যদি কোন লেখক সাধারণ ধারাকে এড়িয়ে থাকতে পারেন, তবে তাঁর প্রতি আমার কথা প্রযোজ্য নয়—তাঁর নূতনত্বের সাধনা জয়যুক্ত হোক।

বাংলা সাহিত্যে আজ কথায় কথায় কল্পনাবাদ বস্তুবাদ, রিয়ালিজম আইডিয়ালিজম নিয়ে তর্ক ওঠে—নানা লেখককে শ্রেণীবিভাগ ক'রে ফেলবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে বাদানুবাদে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নাই। সে তর্কের অনেকখানিই অর্থহীন, যদিও নির্জ্জীব প্রাণহীনতায় নিষ্প্রশ্ন স্বীকার ক'রে নেওয়ার চেয়ে এ রকম কেবলমাত্র কথা-কাটাকাটিও অনেক বেশী মূল্যবান। আমি শুধু বলতে চাই যে সাহিত্যে যদি জীবনের ছায়াই না পড়ে, তবে সে সাহিত্যের মূল্যই বা কী—জীবনে তার স্থানই বা কোথায়? 'সাহিত্যের জন্য সাহিত্য', 'আর্টের জন্য আর্ট' এ সব কথা অর্থহীন। যারা সে সব কথা বলে, তারা নিজের মন নিজেই স্পষ্ট ক'রে জানে না, কী যে তারা বলতে চায় অন্যকে কেমন ক'রে বোঝাবে? আর যেখানে সত্যি সত্যি বোঝাবার কিছুই নাই, সেখানে সে নির্ব্বুদ্ধিদের ব্যর্থপ্রয়াসে আশ্চর্য্য হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আর্ট বা সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের প্রেরণা, মানুষের সাধনা দিয়েই গ'ড়ে ওঠে—মানুষের আবেগ ও ভাবরাজ্য মানুষের চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রেই তার স্থিতি। কাজেই মানুষের জীবনেই যদি তার স্থান না হয়, তবে সে সাহিত্যে আমাদের প্রয়োজন কী? জীবনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ রয়েছে, জীবনে তারই স্থান জুটবে। মানুষের সুখদুঃখ আশাভরসাকে সুন্দর ক'রে, চিরন্তন ক'রে জীবনে তার স্থান দেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম।

তাই জীবনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই, কেবলি স্বপন আকাশে বপন ক'রে আকাশেই যার বৃদ্ধি, সে অলস হৃদয়ের বিলাস আর যাই হোক, তা সাহিত্য নয়। জীবনের বিপুল বিস্তারের মধ্যে তারও স্থান আছে, স্বপ্ন দেখবার প্রবৃত্তি আমাদের সকলেরই রয়েছে। মনস্তাত্বিকেরা বলেন যে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিরাত্রেই স্বপ্ন দেখি; বেশীর ভাগ স্বপ্নই ভুলে যাই, মাঝে মাঝে যেগুলি মনকে বেশী নাড়া দিয়ে যায়, সেগুলি জাগ্রতক্ষণেও মনে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে সেই স্বপ্নকেই যদি কেউ জীবনের চেয়ে বড় ক'রে তুলতে চায়, তার স্থান হয় পাগলা-গারদে, সাহিত্যের মহলে নয়।

বাংলা সাহিত্যের দরবারে আজ এ কথা বিচারের প্রয়োজন হয়েছে। পরাধীন জাতির মনের লক্ষণই এই যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা সারাক্ষণই ব্যাকুল। মনে ভয় রয়েছে যে যদি তারা নিজেদের অধিকার সর্ব্বক্ষণই দাবী না করে, তবে পৃথিবী পাছে বা সে দাবী অস্বীকার ক'রে বসে। তাই বাইরের পৃথিবী যাই বলুক বা না বলুক, বাইরের পৃথিবী আমাদের ডাকুক বা না ডাকুক, আমরা পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে সর্ব্বক্ষণই ব্যগ্র। পৃথিবী আমাদের সম্মান

করেছে, পৃথিবী আমাদের সবার সেরা ব'লে মেনে নিয়েছে—এ কথা জোর গলায় প্রচার ক'রে আমরা নিজেদের হাস্যাস্পদই করি—আত্মগৌরবে সত্যকার গৌরব কোনদিনই বৃদ্ধি পায় না। সমালোচনায় আমরা যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তার কারণ মনে ভয় থাকে যে, সে সমালোচনা হয়তো সত্য। যার আত্মপ্রত্যয় আছে, নিজের দোষগুণ দুই নিজেই জানে, সে কেন অন্যের সমালোচনায়—তা সে সমালোচনা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—চঞ্চল হয়ে উঠবে? দোষ বা ত্রুটি সংস্কারের জন্য নিজেরই তাকে দোষ ব'লে জানা দরকার, আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতার গোপন কারণও তাই আমাদের নিজেদেরকেই উপলব্ধি করতে হবে।

বাস্তবজগতে আমরা পরাধীন—সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে আমরা হেয়। আমাদের দেশে লোকের ক্ষুধায় অন্ন জোটে না, আমাদের দেশে নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্রেরও অভাব। আমাদের দেশের শিশুর জীবনেও আনন্দ নাই—রুগ্ন দেহে, নিরানন্দ গৃহে জীর্ণ মন নিয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপনই আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের ইতিহাস। কিন্তু স্বপ্নজগতে সে দৈন্য, সে দারিদ্র্য, সে পরাধীনতার লজ্জা আমাদের স্পর্শ করে না। আমরা অতীতের স্বপ্ন দেখি, ভবিষ্যতের স্বপ্নরচনা করি, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানকে ভোলবার উপায় কোথায়? তবু সে বর্ত্তমানকে অস্বীকার ক'রেই আমরা চলি—স্বপ্ন দিয়ে তার সত্যের কঠিনতাকে যতদূর পারি কোমল ক'রে তুলতে চেষ্টা করি।

এই স্বপ্নবিলাস একান্তভাবে পরাধীন জাতিরই মনের লক্ষণ। যেখানে সম্মান জোটে নাই, সেখানেও নিজেদের কল্পনায় আমরা সম্মান সৃষ্টি ক'রে তুলি। সাহিত্যেও এই অবাস্তবতা আমাদের মজ্জায় ঢুকেছে। তাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ অনেকখানেই নাই—জীবনের কঠিন রূঢ় সত্যকে অস্বীকার ক'রেই সে সাহিত্যের বিকাশ। তিনিই সাহিত্যিক বা শিল্পী যাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণ, যাঁর কল্পনা ও আবেগ দুই-ই সূক্ষ্মতমভাবে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশে সাড়া দেয়, জীবনের বহুমুখী স্রোতধারাকে নিজের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত ক'রে সত্য ও সুন্দর ক'রে তোলে। তাই সংসারের গীতশূন্য অবসাদপুর আশার সঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কর্ম্মহীন জীবনের বিপুল বিস্তার তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, দুঃখ তার ভাষা খুঁজে পায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ কোথায়? দেশের দৈন্য, দেশের দারিদ্র্য, দেশের ক্ষুধা, দেশের হাহাকারের প্রতিধ্বনি তার মধ্যে মেলে কই? রাজনৈতিক আন্দোলনের রাজনীতির সঙ্গে হয়তো সাহিত্যের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু জাতির অন্তরের গভীরতম কেন্দ্র হতে যে সাড়া জাগে, বহুযুগের সঞ্চিত

যে গ্লানি, যে পাপের বোঝা ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে জাতির জীবনে জোয়ার আসে, সাহিত্যিকের মনে কি তার সাড়া জাগে না? তখনই যদি তার মন দোলা না দিয়ে ওঠে, তবে তার অনুভূতির সূক্ষ্মতা কই? তার কল্পনার, তার হৃদয়াবেগের প্রবলতার পরিচয় কোথায়?

সকল সাহিত্যই যে প্রপাগ্যাণ্ডা বা কেবলমাত্র মতামত প্রকাশ-মূলক হবে এমন কথা কেহই বলে না। কিন্তু কোন কথা বলতে গেলেই তাতে কোন-না-কোন মত প্রকাশ পায়, এবং সেভাবে সাহিত্যে যদি মতামত প্রকাশ না থাকে তবে সে সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে যোগ শিথিল হয়ে আসে। এ স্বপ্নবিলাস কেবলমাত্র কেতকীছায়ায় চন্দ্রালোকে মেঘ-আলোতে হাসিকান্নার লীলা দিয়েই প্রকাশ পায় না—তথাকথিত অতি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয়, তার উগ্র জোরকরা বাস্তবতার মধ্যেও এর লক্ষণ দেখেছি ব'লে মনে হয়। জীবনে যে সেক্সের স্থান আছে সে কথা অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা, জীবনে সেক্স ছাড়া আর কিছুরই স্থান নাই সে কথা বলাও ঠিক সমানই বাতুলতা। পুরুষ নারীসঙ্গ ভালবাসে, নরনারীর দৈহিক মিলন সে ভালবাসার একটা অঙ্গ, কিন্তু দেহের মিলনই যেমন ভালবাসার সমস্তখানি নয়, ঠিক তেমনি ভাল-বাসাও জীবনের সমস্ত প্রাঙ্গণকে জুড়ে নাই। এখানেও দেশের দারিদ্র্য, দেশের ক্ষুধা, দেশের জনসাধারণের অন্নচিন্তার কথা ওঠে। জীবনের ভিত্তিতে ক্ষুধা এবং সেক্সের মধ্যে কোনটা যে গভীরতর, সে বিষয়ে হয়তো তর্ক চললেও চলতে পারে, কিন্তু দুটাই যে জীবনের একান্ত মূলে, সে কথা অস্বীকার করবার তো উপায় নাই। আর দেশের জীবনে আজ যে বান ডেকেছে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন যার কেবল একটা মাত্র দিক, সেই জোয়ারের স্রোতে কি এই তরুণ সাহিত্যিকদের মনেও সাড়া জাগে নাই? তাঁরা কি কেবল তাঁদের স্বপ্নজগতে নিজের মনের কারাগারেই বন্ধ থাকবেন—জীবনের বিপুল প্রসারকে হৃদয়ের প্রসার দিয়ে প্রতিফলিত ক'রে তুলবেন না?

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক—সকল রকম দাসত্বই মনকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে। তাই ছুৎমার্গ একান্তভাবে দাসমনোভাবেরই লক্ষণ। জীবনের প্রবাহ যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাবন্ধনকে আপনার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চলার পথে তাই আবর্জ্জনা জমতে পারে না—সকল ময়লা ধুয়ে মুছে যায়। স্রোতের জল তাই সকল সময়েই পান করা চলে, কিন্তু সেই নদীই যখন ম'রে যায়, তখন কেবলমাত্র তার জলই দূষিত হয়ে ওঠে না—তার প্রবাহের প্রসারও ক'মে যায়। জাতির জীবন যখন মন্দীভূত হয়ে আসে, তখন সংসারের বিপুল

বিস্তার উপলব্ধি করবার তার আর ক্ষমতা থাকে না। তাই তার সাহিত্য একমুখী হয়ে ওঠে, বাস্তব জগতের কঠিনতার সাধনা ভুলে যায়, বাস্তব জগতের রূপবৈচিত্র্য আর তার মনকে স্পর্শ করে না—সে সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে যোগ নাই।

সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোন স্বভাবগত বিরোধ নাই, তাই কঠিনতার মধ্যেও আমরা সৌন্দর্য্য খুঁজে পাই। মানুষের সুখদুঃখের চিরন্তন রূপ তাই সুন্দর—সমগ্রতার মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যও তাই আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আমরা রূপ বা সৌন্দর্য্যের কোমলতাই দেখেছি, শক্তির চেয়ে মাধুর্য্যের কারুণ্যেই আমাদের মন বেশী সাড়া দিয়েছে। কোমলতা বা মাধুর্য্যের মূল্য অস্বীকার করতে কেহই পারে না; কিন্তু জীবন তো একরঙা ছবি নয়, তার পর্দ্দায় পর্দ্দায় বহু রঙের যে বিকাশ তাকে কেবল একটী ধাবার মধ্যে ফেলবার চেষ্টায় আমরা তার ঐশ্বর্য্যের হানিই করি। সত্যের অপলাপে তার সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ থাকে না, কারণ বৈচিত্র্যের সমন্বয় সৌন্দর্য্যের প্রাণমন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতা যে কত বেশী তার কেবল আর একটীমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। সে কথা হয় তো অনেকের কাছেই অপ্রিয় হবে। কিন্তু অপ্রিয় হ'লেও যে কথা সত্য, সে কথা বলবার প্রয়োজন আছে। মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়মের কাপুরুষতা দেশের অনেক আবর্জ্জনার জন্যই দায়ী—সে কাপুরুষতা আজ বর্জ্জন করতে হবে।

এদেশে আজ প্রায় সাতশো বছর হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি ঘর করেছে। দুঃখে সুখে, শান্তি অশান্তিতে, কলহকোন্দলে, বন্ধুত্বমিলনে তাদের সম্বন্ধ কি কখনো রাঙিয়ে ওঠে নাই? বন্ধুত্ব শত্রুতা জাতিধর্ম্ম মেনে চলে না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কাউকে আমরা ভালবাসি, কাউকে হিংসা করি, কাউকে ঘৃণা করি। কারু সঙ্গে শৈশবের পরিচয় যৌবনের বন্ধুত্ব গ'ড়ে তোলে। কারু সঙ্গে জাতিধর্ম্মভেদের পার্থক্যের সঙ্গে স্বার্থ-বৈভিন্ন্য মিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু সন্ধির পথেই হোক আর দ্বন্দ্বের পথেই হোক, জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবলমাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলাদেশে বেশী নাই। যেখানে বাতাস এক, আবহাওয়া এক, নদনদী খালবিল এক, একই মাঠে পাশাপাশি কাজ করতে হয়, একই গাঁয়ে ঘর বেঁধে থাকতে হয়, সেখানে হিন্দুমুসলমান পরস্পরের গায়ের বাতাস বাঁচিয়ে চলবে কেমন ক'রে? কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোথাও কি তার ছায়াটুকুও পড়েছে? সমস্ত বাংলা সাহিত্য প'ড়েও কি কেউ ভাবতে পারে যে সাতশো বছর এত বড় দুটো জাতি এমনি ক'রে পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছে? হিন্দু লেখকদের কথাই আমি বলব, কারণ বাংলা সাহিত্য

প্রধানতঃ তাঁদেরই সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্য বল্‌লে এখন প্রায়ই কেবলমাত্র তাঁদের সাহিত্যই বোঝায়। কিন্তু তাঁদের কাব্যে উপন্যাসে গল্পে কি এই যুক্তজীবনের কোন সাক্ষ্য মেলে? হয়তো দুয়েকজন কখনো কোন জায়গায় মুসলমানের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু মাঝি খানসামা ছাড়া কি বাংলাদেশে মুসলমান নাই? আর সে কথা ছেড়ে দিলেও যেখানে তাঁরা মুসলমানকে টেনেছেন সেখানে কি সত্যি তাদের স্থান আছে? সাহিত্যের সৃষ্টিতে সে চরিত্রগুলি কি জন্মলাভ করেছে, না কেবলমাত্র ঘটনা-পরম্পরায় নেহাৎ আলগোছা ভাবে তাদের এক্সটার্ণালি যুক্ত করা হয়েছে? তারা কি সত্যি রক্তমাংসের মানুষ, না কেবলমাত্র বিদেশী ভাষায় কয়েকটী নাম? তাদের নাম বদলিয়ে কোন হিন্দু বা অন্য নাম সেখানে বসালে কি গল্পের কোন হানি হয়, না পরিবর্ত্তন লোকের চোখে একেবারে ধরাই পড়ে না? বাংলার সাহিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নাই, তাই জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে বাংলা সাহিত্য আজো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নাই।

এই যে সতর্ক সন্তর্পণে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে সাহিত্য গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা এতদিন ধ'রে আমরা ক'রে এসেছি, সেও আমাদের মানসগঠনের অবাস্তবতারই একদিকের প্রকাশ। আমরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারিনি, তাই চাঁদের স্বপ্নই হোক আর সেক্সের স্বপ্নই হোক,—স্বপ্ন-জগৎ অতিক্রম ক'রে নরনারীর আনন্দ-বেদনাময় এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের সাহিত্য পৌঁছায় নাই। এই পরিচিত পৃথিবীর দ্বন্দ্বকলহ পার্থক্য-মিলনের ছায়া তাই সে সাহিত্যে নাই, জীবনের বিচিত্র প্রকাশের ঐশ্বর্য্য সেখানে সৌন্দর্য্যে সত্য হয়ে ওঠে নাই। তাই সে সাহিত্য কেবলমাত্র খেলাই রয়ে গেছে, জীবনের বাস্তবতা লাভ করে নাই। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ছায়া তাতে পড়েনি। দ্বন্দ্ব স্বার্থের ক্ষেত্রে যে বারে বারে কটু হয়ে ওঠে, কল্পনা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে সাহিত্যের জগতে তাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারিনি ব'লে পদে পদে আমাদের তাই পরাজয় হয়েছে। আজ যিনি বাংলা সাহিত্যের সে স্বপ্ন ভাঙতে পারবেন, ঘুমন্তপুরীর রাজ-কন্যাকে জাগিয়ে সংসারের ঘরকরণায় নামাতে পারবেন তিনি যে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক জীবনেই আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেবেন, তা নয়—নতুন জাগরণের বুদ্ধির আলোকে সাহিত্য-লক্ষ্মীর রূপশ্রীও তাঁর স্পর্শে নতুন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

হুমায়ুন কবির

মোক্ষ ও নির্ব্বাণ

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছিলাম যে, অমৃতের পুত্র জীব চিরদিন অমৃতত্ব-পিপাসু—তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। অতএব বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দিষ্ট পুন-র্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে জীব কোন মতে বরণ করিতে পারে না। 'স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত'—এই বিধির বিরুদ্ধে সে বলে—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক, ১।২।১২

'কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি (অস্থায়ী)-লোকের পরীক্ষান্তে নির্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছি—কৃতের দ্বারা কখনও অকৃতকে, অনিত্যের দ্বারা কখনও নিত্যকে অর্জ্জন করা যায় না'। তখন জীব অমৃতত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় (আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্—কঠ, ২।১।১)—এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপদিষ্ট মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিয়া 'ব্রহ্মসাযুজ্য' সাধন করে এবং ঐ সাধনার ফলে,- যিনি অজর অমর অক্ষর, যিনি অব্যয় অক্ষয় অদ্বয়, যিনি চিরন্তন সনাতন পুরাতন—সেই ব্রহ্মের সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিয়া, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া, পুনর্মৃত্যুর পরপারে অমৃতধামে উপনীত হয়। এই যে অমৃতত্ব-সিদ্ধি, ইহারই প্রাচীন নাম মোক্ষ বা মুক্তি।

সংসার মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬
অমৃতোভূত্বা মোক্ষী ভবতি—জাবাল ১

যদ্ ইদং সর্ব্বং মৃত্যুনা আপ্তং সর্ব্বং মৃত্যুনা অভিপন্নং, কেন যজমানো মৃত্যোঃ আপ্তিম্ অতি মুচ্যত ইতি × × × স মুক্তিঃ সা অতি মুক্তিঃ—বৃহ, ৩।১।৩

কেহ কেহ আবার সে যুগে 'বি' বা 'প্র' উপসর্গ যোগ করিয়া এই মোক্ষকে বিশেষিত করিতেন।

অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—বৃহ, ৪।৩।৩৩
ইত ঊর্দ্ধং বি-মুক্তাঃ—বৃহ, ৪।৪।৮
তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বি-প্র-মোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদেও ঐ 'বিমোক্ষ' শব্দের প্রয়োগ আছে—

বিমোক্খো যস্স গোচরো—অরহন্তবগ্গো ৩
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং (বিমুক্তানাং)—পুপ্ফবগ্গো ২৪

নির্ব্বাণ কি মোক্ষ ?

এই মোক্ষকেই বুদ্ধদেব 'নির্ব্বাণ' বলিয়াছেন—উহাই তাঁহার উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গের লক্ষ্যস্থল। কোন প্রাচীন উপনিষদে কিন্তু এই 'নির্ব্বাণ' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, তখনও 'নির্ব্বাণ' শব্দের মোক্ষ অর্থ হয় নাই। এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম কি অষ্টম শতকে সঙ্কলিত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-ব্যাকরণেও 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ মোক্ষ নহে—নির্ব্বাণঃ অবাতে—৮।২।৫০।* বুদ্ধের পরবর্ত্তী 'চাণক্যসূত্রে' মোক্ষের প্রতিশব্দরূপে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—দুঃখানাম্ ঔষধং নির্ব্বাণম্। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ, চাণক্যযুগের পূর্ব্বেই বুদ্ধদেবের দেশনার ফলে 'নির্ব্বাণ' শব্দ ভারতাকাশ মুখরিত করিতেছিল। কোন কোন অর্ব্বাচীন উপনিষদে মোক্ষ-অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী।

এবং নির্ব্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্—আরুণেয়, ৫
একমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্—ব্রহ্ম, ২

গীতাতেও কয়েকবার নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি—৬।১৪
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি—২।৭২
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি—৫।২৪

গীতা এখন আমরা যে আকারে পাই, খুব সম্ভবতঃ তাহা বুদ্ধদেবের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন।† সেই জন্য গীতাতে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, দীপনির্ব্বাণ বলিলে যাহা বুঝায়, ঐ যুগে বোধ হয় 'নির্ব্বাণ' শব্দ ঐ extinction-অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইজন্য গীতাকার 'ব্রহ্ম' শব্দ উপসর্গরূপে যোগ করিয়া নির্ব্বাণ যে নাস্তিত্ব নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ—গীতা, ৫।২৫
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্—গীতা ৫।২৬

---

* নির্-পূর্ব্বক 'বা' ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় হইলে 'নিবাত' স্থলে 'নির্বাণ' পদ সিদ্ধ হইবে—অবাতে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ না বুঝাইলে (ন চেদ্ বাতাধিকরণো বাত্যর্থো ভবতি—কাশিকা)—যেমন নির্ব্বাণঃ অগ্নিঃ কিন্তু নিবাতং বাতেন।

† আমার ধারণা, গীতা প্রাচীনতর আকারে এক সময় প্রচলিত ছিল—মহাভারতের 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে' উহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং উহা সম্ভবতঃ অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনে শেষ হইত।

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

সে যাহা হ'ক্, 'প্রকৃতম্ অনুসরামঃ'—আমাদের বক্তব্যে ফিরিয়া আসি।

ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের পন্থা

আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মবিজ্ঞানই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-লাভের অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
অথ যো হবৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম হন।' সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন—

যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেত, ৬।২০

'যেদিন মানুষ বাহুদ্বারা ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ডের মত আকাশকে বেষ্টন করিতে পারিবে, সেইদিন ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হইবে।'

কেবল উপনিষদের কেন, প্রাচীনতর সংহিতার ও ব্রাহ্মণেরও ঐ কথা।

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্য-বর্ণ, যিনি তমসের পরপার। তাঁহাকে জানিলে, তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—অয়নের ইহাই অনন্য পন্থা।'

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ
আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্॥
—অথর্ব্ববেদ, ১০।৪।৮।৪৪

'যিনি সেই চির-তরুণ, অজর, ধীর (বিপশ্চিৎ) পরমাত্মাকে জানেন, মৃত্যু হইতে তাঁহার ভয় হয় না।'

তস্যৈব আত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮

'তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মা পদবিৎ (path-finder) হয়—তিনি কর্ম্মরূপ পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।'

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি॥
—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫

'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।'

আমরা দেখিয়াছি, এই ব্রহ্মসাযুজ্যই মোক্ষ।

ব্রহ্মবিজ্ঞান কারণ না কারক ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের চিন্তাকে একটু সতর্ক করিতে চাই। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় বটে কিন্তু ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের জনক নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নহে। মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নহে—মোক্ষ অজাত, অকৃত—জাত বা কৃত নহে—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 'It is un-caused and is not the consequence or effect of any cause।' দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে—'It is Being and not Becoming—সম্ভূতি নয়, অসম্ভূতি (ঈশ-উপনিষৎ, ১২-১৪*)।' যাহারই উৎপত্তি আছে, তাহাই বিনাশশীল—মোক্ষ যদি নৈমিত্তিক হইত, তবে উহা নিত্য হইতে পারিত না। গৌড়পাদাচার্য্য ঠিক্ই বলিয়াছেন—

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥

—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৩০

'অনাদি সংসারের অন্ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। মোক্ষের যদি উৎপত্তি থাকিত, তবে তাহা অনন্ত হইতে পারিত না।'

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—'What has in any way become, what is compounded—that is changeable and must perish.'—

যং খো পন কিঞ্চি অভিসংখতং অভিসংচেতয়িতং,
তং অনিচ্চং নিরোধধম্মং তি পজানতি

(মজ্ঝিমনিকায়, ১ম বিভাগ)

---

* ঈশ-উপনিষদের অসম্ভূতি বা অসম্ভবের সহিত ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকের 'অসম্ভব' তুলনীয়।

নমো ভূয়ঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতাম্
অসম্ভবায়াখিল সত্ত্বমূর্ত্তয়ে।

সেই জন্য ধর্ম্মপদে নির্ব্বাণকে অকৃত, অনিমিত্ত (Un-become) বলা হইয়াছে।

সুঞ্ঞতো অনিমিত্তোচ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো—অরহন্ত বগ্‌গো, ৩

সঙ্খারানং খয়ংঞত্বা অকতঞ্ঞু সিব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১

(সংস্কারাণাং ক্ষয়ং জ্ঞাত্বা অকৃত-জ্ঞোঽসি ব্রাহ্মণ।)

The highest liberty, 'holy liberty' consists in being liberated × × from being ever and again entangled in this unwholesome becoming. —The Doctrine of the Buddha, p. 309.

In the sphere of metaphysical phenomenon, to which emancipation belongs, there is in general no becoming but only a being (as all metaphysical thinkers not only in India but in the West also, from Parmenides and Plato down to Kant and Schopenhauer, have recognised). —Deussen's The Philosophy of the Upanishads, p. 344.

যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং—মজ্ঝিমনিকায়, ১৪৭ সূত্ত

তাই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'নিরোধ' বলিয়াছেন—(নিরোধ অর্থে dissolution of Causality)।

উপনিষদেও ঐ অর্থে 'নিরোধ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ শাসনম্।—ব্রহ্মবিন্দু ১০

এই অর্থেই মোক্ষকে 'নিরুপাধি' বলা হয়। দেশ, কাল ও নিমিত্ত (Time, Space and Causality) —এই তিন উপাধি—মোক্ষ ঐ ত্রিবিধ উপাধির অতীত। যাহা Beyond causation, তাহা Becoming হইবে কিরূপে ?

সোপেনহয়র যে, নির্ব্বাণ বা অমৃতত্বকে 'Indestructibility *without* continued existence' বলিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্য ঐ। কারণ, 'in the Redeemed One, all change, and therewith also, time has been done away. × × Because of the ceasing of time, the very expression "to persist" has no more meaning. × × The fact itself can only be correctly characterised by negative expresssions, such as "changeless," "deathless."*—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 179.

আরও দেখুন—আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব।

নিত্যঃ শুদ্ধঃ বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভু শ্চাদ্বিতীয়ঃ—মৈত্রেয়ী, ১।১১

গৌড়পাদ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধা স্তথা মুক্তা বুদ্ধন্ত ইতি নায়কাঃ॥—কারিকা, ৪।৯৮

'আত্মা স্বভাবতই নির্ম্মল, নিরঞ্জন (আবরণহীন)—পূর্ব্বাপরই বুদ্ধ ও মুক্ত—তিনি জাগরিত হন মাত্র—ইহাই তত্ত্বজ্ঞের বাণী।'

অতএব আত্মা যখন নিত্য-মুক্ত, তখন তাহার মুক্তির কথা বস্তুতঃ উঠিতেই পারে না।

নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে? (সর্ব্বসার)। 'আমি (অর্থাৎ আমার metaphysical I) যখন অ-কর্ত্তা, তখন আমার বন্ধমোক্ষ হইবে কিরূপে ?

ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ আর এক গ্রাম চড়িয়া বলিয়াছেন—

ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্তিঃ ইত্যেষা পরমার্থতা।—১০

'পরমার্থদৃষ্টিতে (from the absolute standpoint) মুমুক্ষা ও মুক্তির কথাই উঠিতে পারে না।'

---

* Immortality also as prolonged existence after death is a part of the great illusion, the hollowness of which he (Yajnavalkya) has proved. × × Yajnavalkya has therefore entirely anticipated Schopenhauer's definition of immortality as an "indestructibility without continued existence." —Deussen, p. 350.

সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিলেন—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতি র্ন সহতেতরাম্।

'বন্ধ-মোক্ষকে যদি 'বাস্তব' বলিতে চাও, তবে তাহা শ্রুতির অসহ্য'—কারণ 'We are all emancipated already (how could we otherwise bocome so ?')

যাজ্ঞবল্ক্য যে আত্মাকে বারংবার 'অসঙ্গ' বলিয়াছেন (অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬), ঐ বলারও তাৎপর্য্য এই। অসঙ্গ অর্থে নির্লেপ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ—উহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্ (বৃহ, ৪।৩।২১)। *

ছান্দোগ্যও অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ—৮।৩।২। 'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান পায় না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন ব্রহ্ম-রূপ লোকে প্রবেশ করিলেও তাঁহার সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যা-মোহিত।)'

এই অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। †

তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নহে।

For deliverance is not effected by the knowledge of the Atman (ব্রহ্ম-বিজ্ঞান) but it consists in this knowledge; it is not a consequence of the knowledge of the Atman but this knowledge is already deliverance (মোক্ষ) in all its fulness. (Deussen, p. 346). ‡

---

* বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন—'এই পুরুষ (আত্মা) পুরিশয় (দেহধারী) বটে কিন্তু অসংবৃত—

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ
নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্—২।৫।১৮

† Emancipation therefore is not properly a new beginning but only the perception of that which has existed from eternity but has hitherto been concealed from us.—Deussen, p. 345.

As soon as this state of *ignorance* (অবিদ্যা) is removed by the rise of knowledge in consciousness and the cloud of ignorance thereby dispersed for ever, the motion of willing (তৃষ্ণা) *cannot* rise any more. (তৃষ্ণা বারিত হইলেই নির্ব্বাণ)—The Doctrine of the Buddha, p. 303.

‡ There is no real question of *becoming* perfect or being *made* perfect but of realising the perfection that ever is within. × × × It is realisation rather than becoming, that will help. × × Don't struggle and endeavour to *become*, by great effort, that which you are essentially all the time.—Bosman.

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যবে যাঁহার যেখানেই হইবে—তিনিই মুক্ত—তা সে আজই হ'ক বা কল্লান্তেই হ'ক, ইহলোকেই হ'ক বা ব্রহ্মলোকেই হ'ক—শরীর থাকিতেই হ'ক আর শরীর না থাকিতেই হ'ক—তাহাতে যায় আসে না।

ইহ চেদ্ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন, ২।১৩

'ইহলোকে যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞান হয়, তবেই মুক্তি—না হয় তবে বিনষ্টি (মৃত্যুময়) সংসার গতি।'

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদ্ অবেদী মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে—যদি না হয়, তবে মহতী বিনষ্টি। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের অমৃতত্ব—অন্যথায় দুঃখময় সংসার।'

ইহ চেদ্ অশকৎ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥—কঠ, ৬।৪

'শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বে যদি বিজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শরীর-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু যদি জীবিতমানে মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিয়া ঐ বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তবে অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ —বৃহ, ৪।৪।৭

শরীর ধারণে, যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য অনুভব করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। বুদ্ধদেব এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

I have in this life entered Nirvana while the life of Gautama has been extinguished. Self (অর্থাৎ personal self) has disappeared and Truth has taken its abode in me (এই Truth = 'অথ সত্যম্ অস্তি—কেন, ২।১৩)

তাঁহার পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষি বামদেব আর একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঃ—

তদুক্তম্ ঋষিণা—'গর্ভে নু সন্ন্বেষাম্ অবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা'। গর্ভ এব এতৎ শয়ানো বামদেব এবম্ উবাচ—ঐতরেয়, ২।৪

'গর্ভবাস কালেই ঋষি বামদেব এই কথা বলিয়াছিলেন—'গর্ভে থাকিয়াই আমি এই সমস্ত দেবতাগণের উৎপত্তি জানিয়াছি।' জীবন্মুক্ত ভিন্ন কে তাহা জানিতে পারে ?

বৃহদারণ্যকেও এই বামদেব ঋষির প্রসঙ্গ আছে। তদ্ধ এতদ্ অপশ্যন্ ঋষি বামদেবঃ প্রতিপেদে—'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি—বৃহ, ১।৪।১০

'ঋষি বামদেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জানিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম।'

জীবন্মুক্তি ব্যতীত সম্বিতের এরূপ সম্প্রসারণ সম্ভবে না—কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ যাঁহার অনুভূতি হয়, তিনিই এই সমুদয় হন—অন্যে হয় না।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি,' স ইদং সর্ব্বং ভবতি
—বৃহ, ১।৪।১০

জনক যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবিষয়ক উপদেশ আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্মভাবে সুস্থিত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোসি—বৃহ, ৪।২।৪

এই অভয় আর কে ? এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম ছান্দোগ্য ৮।১১।১

ব্রহ্মই অভয়—অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ—বৃহ, ৪।৪।২৫

এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শ্রোত্রিয় (শ্রুতির পারগামী), অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন এবং বৃহ ৪।৩।৩২-৩ মন্ত্রে তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথার আমরা পরে আলোচনা করিব। এখন আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ ভাবে দেখিলে 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি—এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় গমন করিবে ?'—এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ, সাধারণ জীবের মত, জীবন্মুক্ত পুরুষের—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ, ৪।৪।৬)—উৎক্রান্তি হয় না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়।

The soul after death goes nowhere where it has not been from the very beginning, nor does it become other than that which it has always been, the one eternal omnipresent 'Atman.' (Deussen, p. 348).
—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়), পূর্ব্ব দিক্ যাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রাণ—যিনি নেতি নেতি আত্মা।

তস্য প্রাচীদিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণাদিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচীদিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বাদিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ—স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

কিন্তু তথাপি আমরা দেখি, বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মবিজ্ঞানীর পক্ষেও দেহ-বিগমের পর তবে ব্রহ্মসাযুজ্যের কথা বলিয়াছেন।

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যতি—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ আকাশাৎ)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, এতদ্ ব্রহ্ম। এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি।
—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।—কঠ, ৫।১

অর্থাৎ মোক্ষলাভের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না দেহের বিলয় ঘটে। এমন কি ঋষি বামদেব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি শরীর ভেদের পর ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন।

স এবং বিদ্বান্ অস্মাৎ শরীরভেদাদ্ ঊর্দ্ধম্ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐতরেয়, ২।৪

এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, সমাধি-অবস্থায় জীবন্মুক্তের ব্রহ্মসাযুজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যুত্থান-দশায়, শরীরধর্ম্মে প্রারব্ধবশে আবার সংসারের ভাণ হয়। কিন্তু শরীরের বিলয় ঘটিলে সে সম্ভাবনা আর থাকে না—তখন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণের যে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ভেদও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞার পরিপাকে অর্হতের সম্বোধি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন এখানেই দেহসত্ত্বেও তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন কিন্তু সে নির্ব্বাণ 'সোপাধিশেষ' নির্ব্বাণ। দেহান্তে ঐ অর্হতের যখন পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়, সে নির্ব্বাণ 'অনুপাধিশেষ'-নির্ব্বাণ অর্থাৎ নির্ব্বাণ 'without any remnant of accessories'।*

এই পরিনির্ব্বাণই বেদান্তের 'বিদেহ'-মুক্তি—যে মুক্তিতে মুক্তের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন দেহই থাকে না—এমন কি বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'দহর-কোশ' বলেন—সেই হৃদ্যাকাশময়ং কোশং যদ্দ্বারা চিন্মাত্র বা Monadএর চিদাকাশ হইতে ঔপাধিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই চরম উপাধিরও

* The perfected Holy Ones having rid themselves of all *upadihs* are 'submerged in the Deathless (অমৃত)'—সুত্তনিপাত—V.

ইহা পরিনির্ব্বাণের অবস্থা। কারণ, দেহসত্ত্বে (নির্ব্বাণের অবস্থায়) 'sensations are still felt. × × We are not indeed yet free *from* them but stand towards them as *free* men.'—(The Doctrine of the Buddha, p. 325).

বিলয় ঘটে। সেই জন্য ইহার নাম 'বিদেহ'-মুক্তি। ইহাই অদ্বৈত-সিদ্ধি—ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন একীভাব—কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ—নদী যেমন করিয়া নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয় সেইরূপ। তখন নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায়—অবিভাগো বচনাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬)। বিদেহ-মুক্তিতে জীবও সেইরূপ হয়—জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

যথা ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভেদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্রম্ ইত্যেব প্রোচ্যতে—প্রশ্ন ৬।৫

জলস্তম্ভে জলদ ও জলধি যেমন মিলিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হয় না—এ সেরূপ মিলন নহে—এ মিশ্রণ—নদী যেরূপ নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়—সেইরূপ মিশ্রণ। যাজ্ঞবল্ক্য এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩২

এই সলিলের সহিত উপমা সার্থক—'the dew-drop slips into the shoreless sea'—জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি—কঠ, ৪।১৫

—যেমন শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু, জীবেরও তখন সেই দশা হয়।

উৎক্রান্তি ও ক্রমমুক্তি

এই প্রসঙ্গে বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'ক্রম-মুক্তি' বলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। বেদে সাধনার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া, সাধকের পিতৃযান ও দেবযান গতির ইঙ্গিত আছে।

দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৄণাম্ অহং দেবানাম্ উত মর্ত্ত্যানাম্—ঋগ্বেদ, ১০।৮৩।১৫ *

পরবর্ত্তী উপনিষদে এই দুই 'সৃতি' বা মার্গের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। † পিতৃযান দক্ষিণ মার্গ, ধূমযান গতি; দেবযান উত্তর মার্গ, অর্চ্চিঃযান গতি। যাঁহারা কর্ম্মী—ইহলোকে 'ইষ্টাপূর্ত্তে'র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পিতৃযানে যাত্রা করিয়া স্বর্গলোকে উপনীত হন। সেখানে 'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা' পুণ্যক্ষয়ের পর তাঁহাদিগকে আবার মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। ইহার নাম 'আবৃত্তি'। আর যাঁহারা ধ্যানী—

* বৃহদারণ্যকের ৬।৬।২ মন্ত্রে এই ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কৌতূহলী পাঠক বৃহদারণ্যক ৬।২, ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫, ৫।৩।১০, ৫।১০।১-৬, কৌষীতকী ১।২, প্রশ্ন ১।৯-১০, কঠ ৬।১৪-৬ ও মুণ্ডক ১।২।১০-১, ২।১।৬ দৃষ্ট করিবেন।

ইহলোকে 'শ্রদ্ধাতপে'র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উৎক্রান্ত হইয়া দেবযানে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। সেখান হইতে তাঁহাদের আর ফিরিতে হয় না। সেই জন্য ইহার নাম 'অনাবৃত্তি'।

তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি ; তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫

গীতায় এই পিতৃযান ও দেবযানকে কৃষ্ণা গতি ও শুক্লা গতি বলা হইয়াছে—কৃষ্ণা গতিতে আবৃত্তি, শুক্লা গতিতে অনাবৃত্তি।

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥—৮।২৬

ব্রহ্মলোকে ধ্যানী সাধক (যাঁহার Evolution সাধারণ নহে—অ-সাধারণ Supernormal), যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন অর্থাৎ এক কল্প-কাল অবস্থিতি করেন। পুনরায় আবর্ত্তন করেন না।

স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন পুনরাবর্ত্ততে
—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

ব্রহ্মলোকে তাঁহার কি দশা হয়?

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩।৬।২, কৈবল্য, ৪

'তিনি সেই ব্রহ্মলোকে পরান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে='at the end of time') পর-অমৃত হইয়া মোক্ষলাভ করেন।'

ইহারই নাম ক্রমমুক্তি। ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি, সে জীবন্মুক্তি—ব্রহ্মলোকে পরামৃত হইয়া কল্পান্তে যে মুক্তি, সে ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তি লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ—
ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০

'ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে, তদধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত পরতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।'

এই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম—পরতত্ত্বপ্রাপ্তির অর্থ ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মের সহিত একীভাব, বিদেহমুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় ঘটে, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ ('পরামৃত') হইয়া পরম পদ (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) লাভ করেন।' *

* এ স্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকেরও (কল্পান্তে) আবৃত্তি হয়—(কারণ, ব্রহ্মলোকও বিনশ্বর—আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!—গীতা, ৮।১৬)—যদি না ইতিমধ্যে ঐ সাধক পূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীধরস্বামী এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন :—

মোক্ষের স্বরূপ—অচিন্ত্য

আমরা মোক্ষবাদের আলোচনা করিতেছি—বার বার মুক্তি-মোক্ষ-নির্ব্বাণের নাম উচ্চারণ করিয়াছি। এই মোক্ষের স্বরূপ কি ?

মোক্ষের স্বরূপ মননের, বচনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্যমন হঠিয়া আসে।'

যে হেতু, যিনি মুক্ত তিনি—

এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে —তৈত্তি, ২।৭

'সেই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (unconscious) অবাচ্য, (unutterable), অনিলয়ন (অগাধ=unfathomable) ব্রহ্ম-পদার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।'

তাঁহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ? সেইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—

অত্থং গতস্স, (নির্ব্বাণ-প্রাপ্তের) পমাণং (ইয়ত্তা) নত্থি। †

কারণ—নির্ব্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধর্ম্মপদ, পিয়বগ্গো ১০)।

অতএব Measure not with words.
The Immeasurable, nor sink the plumb of thought
Into the Fathomless! Who asks doth err,
Who answers errs. Say naught.—LIGHT OF ASIA.

কারণ, 'Nirvana is the land of silence and non-being. (The Voice of the Silence).

অতএব এ ক্ষেত্রে, তুষ্ণীমেব বরং—silence is golden।

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো, নান্যেষাম্।

অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোক-গত জীবেরও অবশ্য পুনর্জ্জন্ম হইবে, যদি না তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন, নতুবা করিতে পারেন না। বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার সমর্থন পাই :—

They having entered the stream, × × after death they will no more return to this world but in one of the highest worlds of light, attain Nibbana.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 415.

† অত্থং গতস্স ন পমাণং অত্থি, যেন নং বজ্জু তং তস্স নত্থি—সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু, সমূহতা বাদপথাপি সব্বে—সুত্তনিপাত, ৫ম অধ্যায়।

For the vanished One (অস্তং গতস্য), there is no measure (প্রমাণং নাস্তি)—that whereby he might be designated no longer exists.

অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ-দশা 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা।* সংযুক্ত-নিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি? উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই? উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই।' কেন করেন নাই? কারণ, 'তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়ো দুপ্পরিযোগাহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো'—'যিনি তথাগত (পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ—যেমন মহাসমুদ্র—He is indefinable inscrutable immeasurable like the great ocean'। সেই প্রাচীন উপমা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally-extinguished Delivered One is nowhere and everywhere. (page 359).

নির্ব্বাণ বা মোক্ষ যখন অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত বা view প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ! ভিক্খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠিতি তদ্ অকল্লং—দীঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming); যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য; পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য।'

---

* কারণ, নির্ব্বাণ is 'a kind of existence, that in *our* sense is no longer existence—(it is) at the portals of the unrecognisable, the transcendental. ××× Therefore no conception and consequently no word fits it.—The Doctrine of the Buddha, p. 178.

Nothing whatsoever, absolutely nothing can be told about it; the rest is—silence!—Ibid, p. 502.

ব্যক্তিত্বের বিলোপ

সত্য বটে, আমরা যাহাকে জীবভাব বলি, মোক্ষদশায় তাহার অভাব হয় —আমাদের ব্যক্তিত্বের (Individuality বা Personality-র) বিলোপ ঘটে, আমাদের পৃথক্-বাহিনী চিত্তনদী নামরূপ হারাইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে মিশ্রিত হয়, আমাদের স্বতন্ত্র জীব-বিন্দু অমৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা, পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৭

'বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অক্ষর পর (ব্রহ্মে) একীভূত হয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই একীভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (বৃহ, ৪।৩।৩২)। ইহারই নাম একত্ব—অদ্বৈত, কারণ, তখন যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি (ঈশ, ১৬)

তিব্বতীয় মোক্ষশাস্ত্র হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence) গ্রন্থে এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে ঃ—

And now the self is lost in the Self, thyself unto Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality, Lanoo!* where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the Ocean, the ever present ray become the All and the Eternal Radiance.

বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বের বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (Individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবারিধির তরঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহরীও নয়—নগণ্য বুদ্‌বুদ মাত্র—mere soap-bubble। এই বুদ্‌বুদ ভঙ্গে এত ভয়! আর আমাদের Personality—যাহা চিদাভাসের ছায়া, সে ত আরও তুচ্ছ! Persona শব্দের অর্থ মুখস (mask)—যে মুখস পরিয়া প্রাচীন রোমে অভিনেতারা অভিনয় করিত—এখনও তিব্বতে নর্ত্তকেরা নৃত্য করে। বস্তুতঃ এই personality জীবের মুখ নহে, মুখস—ঐ মুখস পরিয়া জীব ভব-রঙ্গালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করে। এই মুখসের তিরোধানে এত সঙ্কোচ কেন? দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সোপেন্‌হয়র যথার্থই বলিয়াছেন—

Everybody knows himself only as an individual. × × × If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherence to it.

---

* His individuality, the basis of all works, he has seen to be an illusion.—Deussen, p. 346. Personality, in its elements, is something alien to our true essence. From this alien thing, we only need to free ourselves. Grimm, p. 196.

সোপেনহয়র তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আর একজন তত্ত্বদর্শীর কথা শুনাইব—ইনি রাজকবি টেনিসন।

And thro' loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.

—THE ANCIENT SAGE.*

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববিদ্যাসভার অধিনেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট কয়েকটি মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতি প্রণিধান করা উচিত।

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihilation'; it is existence raised to a vividness and intensity, inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind. As the farthing rushlight to the splendour of the sun at noon, so is the earth-bound consciousness to the Nirvanic, and to regard it as annihilation, because the limits of the earthly consciousness have vanished, is as though a man, knowing only the rushlight, should say that light could not exist without a wick immersed in tallow.

—The Ancient Wisdom, pp. 221-22.

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি মোক্ষের আস্বাদন পাইয়া, তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তৎ প্রতি অবধান দেওয়া কর্ত্তব্য।

Liberation is not annihilation, × × Liberation is not negative. On the contrary it is positive. It is not entering into a mere void and there losing yourself. × × × It is true that there is no separate self but there is the Self of all.—By What Authority, p. 37.

এই আমিত্বের সম্প্রসারণই মুক্তি। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

---

* টেনিসন্ একান্তে বসিয়া একাগ্রভাবে নিজের নাম উচ্চারণ করিলে একরূপ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার loss of personality (ব্যক্তিত্বের বিলোপ) ঘটিত। ঐ অবস্থার বর্ণন করিয়া টেনিসন্ তাঁহার বন্ধু টিন্‌ডেলকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক উহা হইতে দেখিবেন loss of personality বস্তুতঃ কিছুই নহে।

"I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?"

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ ৪।৩।২০

মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা। অর্থাৎ

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently **without individual consciousness.** (DEUSSEN).

যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বর্ণনার সহিত বৌদ্ধের দিক্ হইতে স্যার এডুইন আর্ণল্ডের নির্ব্বাণের বর্ণনা তুলনা করুন।

Until greater than Kings, than Gods more glad,
The aching craze to live ends, and life glides
Lifeless, to nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana—sinless, stirless rest—
That change which never changes!

—THE LIGHT OF ASIA, Book vi.

He goes
Unto Nirvana. He is one with Life*
Yet lives not. He is blest, ceasing to be.
× × × Seeking nothing he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I.'

—IBID, Book viii.

এখন যদি আমরা বলি, বেদান্তের মোক্ষ এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ অভিন্ন—তবে পাঠক কি তাহার প্রতিবাদ করিবেন ?

নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নয়

আর এক কথা। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ অতর্ক্য, অবর্ণ্য, অকথ্য, অচিন্ত্য হইলেও—নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—ইহা নিঃসংশয় যে, নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব পাশ্চাত্যেরা যাহাকে abyss of absolute annihilation বলিয়াছেন নিশ্চয়ই তাহা নহে। কারণ—'Our dew-drop slips into the shoreless sea বটে কিন্তু is not lost therein'। † বুদ্ধদেবের প্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিত্ব-বাদী বলিত। তিনি নিজে স্পষ্ট বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—

* অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি—কৌষীতকী, ৩।৩। ঐ প্রাণ মহাপ্রাণ (Life)—life নহে।

† C. W. Leadbeater's How Theosophy came to me, p. 161.

সেই জন্য জর্জ্জ গ্রিম এই নাস্তিত্ব-বাদকে 'the non-sense of absolute Nihilism' বলিয়াছেন (Doctrine of the Buddha, p. 162).

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে! ভিক্খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্স হেতু? দিট্‌ঠে বাহং ভিক্খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবং বাদিনং খো মং ভিক্খবে! এবং অভ্যাখ্যিং একে সমণব্রাহ্মণা—অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্‌ভাচিক্খন্তি (impeach)—'বেনসিকো সমণো গোতমো সতো সত্তন উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং (nullification) পঞ্ঞাপেতি তি'। যথা বাহং ভিক্খবে ন, যথা চাহং ন বদামি, তথা মং তে ভান্তো সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি।—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—ইন্দ্র ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (Here and Now) অননুবেদ্য (untraceable)। ভিক্ষুগণ! এইরূপ বলার জন্য, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসত্যভাবে, তুচ্ছভাবে, মিথ্যাভাবে, অভূতভাবে (wrongly, erroneously, falsely, untruly) আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ বিনাশ বিভব প্রচার করেন।' আমি যাহা নই, আমি যাহা বলি না—হে ভিক্ষুগণ! এই সকল ভান্ত (good) শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা অসত্যভাবে তুচ্ছভাবে মিথ্যাভাবে অভূতভাবে আমাকে সেইরূপ অভিযোগ করেন।'

ইহার পরও কি বুদ্ধদেবকে বৈনাশিক (নাস্তিত্ববাদী) বলিব?

কিন্তু অসাধুবাদের অন্ত নাই—

যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ—ভবভূতি

বুদ্ধদেবের মরণান্তেও তাঁহার ঐ বৈনাশিক-অপবাদ ঘুচে নাই। সঞ্ঞুত্ত-নিকায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য যমকের মনেও ঐ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, বুদ্ধদেবের মতে ক্ষীণাসব (মৃদিত-কষায়) ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর নির্ব্বাণীর নাস্তিত্ব (annihilation) হয়—

এবং খো হং আবুসো ভগবতা ধর্ম্মং দেসিতং আজানামি। যথা খীনাসবো ভিক্খু কাযস্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা তি।

ইহার প্রতিবাদ করিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা বলিলেন—

মা আবুসো যমক! এবং অবচ, মা ভগবন্তং অব্ভাচিক্খি (traduce)। ন হি সাধু ভগবতো অব্ভাক্খানং। ন হি ভগবতা এবং বদেয্য খীণাসবো ভিক্খু কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা তি। × ×

হে আবুস (মান্য) যমক! এরূপ বলিও না। ভগবান্ (বুদ্ধদেবের) অভ্যাখ্যান (traduce) করিও না। ভগবানের অভ্যাখ্যান শোভন নহে। ভগবান্ কখনও বলেন নাই যে, 'ক্ষীণাসব ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর তাঁহার নাস্তিত্ব হয়'।

ইহাতে যখন যমকের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভিক্ষু-প্রধান সারিপুত্রের কাছে লইয়া গেলেন। সারিপুত্র অমোঘ বাক্যে বুদ্ধদেবের উপদেশের ব্যাখান করিলেন। তখন যমকের সংশয় ছিন্ন হইল। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন—

অহু খো মে তং আবুসো সারিপুত্ত! পুবে অবিদ্দাসুনো পাপকং দিট্‌ঠিগতং; ইদং চ পঞ্ঞাসমতো সারিপুত্তস্‌স ধম্মদেসনং সুত্বা তং চেব পাপকং দিট্‌ঠিগতং পতুনং ধম্মো চ মে অভিসমেতো তি

'মান্যবর সারিপুত্র! অজ্ঞতানিবন্ধন আমি পূর্ব্বে ঐ ভ্রান্ত মত (পাপক দৃষ্টি) পোষণ করিতাম। কিন্তু অদ্য আপনার প্রজ্ঞাসম্মত ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া আমার সে ভ্রান্ত মত তিরোহিত হইয়াছে এবং প্রকৃত ধর্ম্ম (Doctrine) কি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি।'

যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে অমৃতপদ বলিয়াছেন (ধর্ম্মপদ, সহস্‌সবগ্‌গো ১৫)—যাঁহার মতে পরমার্থসারো নিব্বাণং (Nirvana is the highest reality)—যিনি মুক্ত পুরুষের 'পীতিসুখং অঞ্ঞং চা ততো সন্ততারং (Happiness and something higher) অর্থাৎ (বেদান্তের ভাষায়) ভূমানন্দ এবং 'Blissful tranquility and stainless bliss' (মজ্ঝিম নিকায়) লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্‌হ লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা (সুত্তনিপাত, ৫)

In this realm of reality, as in the Deathless (অমৃত), the Delivered Ones are submerged। *

—তাঁহাকে নাস্তিত্ববাদী বলা খুব অসঙ্গত নহে কি? তাঁহার নিজের মুখের আর একটি বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই—

Just as of the fire which flames up under the strokes of the smith's hammer, it cannot be said as to whither it has gone after it is extinguished, so just as little can be discovered the abode of the truly-delivered Ones, who have crossed over the stream of the bounds of the senses, have reached the unshakable bliss.

(অভিজ্ঞ পাঠক এই উপমার মধ্যে ছান্দোগ্যের ৮।১২।২ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাইবেন—অশরীরো বায়ুঃ অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ—অশরীরাণি এতানি ইত্যাদি)।

---

* বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, নির্ব্বাণকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে—

'The unshakable,' 'the immovable,' 'eternal stillness,' 'the true,' 'the other shore,' 'the subtle,' 'the invisible,' 'the free from illness,' 'the eternal,' 'the incognisable,' 'the peaceful,' 'the deathless,' 'the sublime,' 'the joyful,' 'the secure,' 'the wonderful,' 'the free from affliction,' '*dhamma* free from oppression,' 'the free from suffering,' 'the free from incitement,' 'the pure,' 'the free from wishes,' 'the island,' 'the refuge,' 'the shelter.'—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 519.

এই প্রসঙ্গে স্যার এডুইন্ আর্নল্ডের উদাত্ত শ্লোকগুলি আমাদের স্মর্ত্তব্য।

If any teach, Nirvana is to cease
    Say unto such they lie.
If any teach, Nirvana is to live
    Say unto such they err ; not knowing this
Nor what light shines beyond their broken lamps
Nor lifeless, limitless bliss.

—LIGHT OF ASIA, Book viii.

ঠিক্ কথা! নির্ব্বাণ যে অস্তি-নাস্তির পরাৎপর অবস্থা—আমরা বদ্ধ মানুষ এই সংকীর্ণ বুদ্ধি মন লইয়া মোক্ষের বিষয়ে কি জল্পনা করিব? এ যেন—'as though a sparrow with his limited wing-power and restricted eye-reach should chitter of the eagle from his umbrageous cover'—এ যেন তিত্তিরির সমুদ্র-তরণ, সফরীর সাগর-শোষণ—তেমনি ব্যর্থ, তেমনি বিফল, তেমনিই হাস্যকর।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হাওয়া-বদল

অমরনাথ গরীবের ছেলে। বাপ নেই। ভবানীপুর চাউলপটী রোডে একখানি ছোট বাড়ী রেখে তিনি পাঁচ বছর হল মারা গেছেন। সেই বাড়ীর নীচের তলার দুটী ঘরে অমর ও তার মা থাকেন। মার কিছু গহনা ছিল। তাই বেচে, আর উপর তলা ভাড়া দিয়ে, মা এই কবছর কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন ও ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছেন। অমর মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। চার বছর হয়ে গেছে। আর বছর দুই হলেই পূরোপূরি ডাক্তার হয়ে বেরোবে। তাহলেই মার সকল দুঃখ ঘুচবে। পাস-টাস এ পর্য্যন্ত অমর মাঝামাঝি রকম করেছে। তবে তার বুদ্ধি নানাদিকে খেলে। কষ্টের সংসারে মানুষ হয়ে সে এ-রকম স্থির করেছে যে বড়লোক একদিন হবেই! শুধু বিদ্যায় সেটা হওয়া যায় না তা সে জানে। বড়লোক হতে হলে কিসে সবাইকে খুসী করা যায় সেটা জানা চাই, সব কথায় সায় দিতে পারা চাই, সকল সময় সকল অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই; এটা অমর বেশ বুঝত। কলেজে সব রকম ছেলেদের সঙ্গেই বেশ বনিয়ে চলত, তবে যারা গরীব, যাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা নেই, তাদের সঙ্গে ভাব করত না। বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই বেশী মেলা-মেশা ছিল। টেনিস খেলতে চেস্টা ক'রে শিখেছিল, কারণ এ বিদ্যা আধুনিক সমাজে খুব কাজে লাগে। মাষ্টার প্রফেসরদের খুসী রাখতেও তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুবিধা পেলেই তাঁদের বাড়ী যেত। তাঁদের মন যোগাবার জন্যই ক্লাসে সদাসর্ব্বদা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। বুঝত এ সব একদিন কাজে লাগবে। ভবানীপুর Y. M. C. A.-তে অমরের খুব যাতায়াত ছিল, কেননা সেখানে অনেক পদস্থ ব্যক্তির সমাগম। তার বড় সাধ বিলেত গিয়ে একটা তকমা নিয়ে আসে, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ, উত্থায় প্রবিলীয়ন্তে, ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, জলে বুদ্‌বুদের মত। কে জানে, হয়ত আসবে একদিন, কোন গণ্ডমূর্খ রাজা নবাবকে আশ্রয় ক'রে পাড়ি জমাবে।

আপাততঃ কলেজের ছুটি হয়ে গেছে, গরমও বেজায় পড়েছে, একবার পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে দিন কয়েক কি ক'রে বেড়িয়ে আসা যায় তাই ভাবছে। তার কয়েকজন বন্ধু দার্জ্জিলিং গেছে। তারা ক্রমাগত আসতে লিখছে, কিন্তু ওরকম শুকনো নিমন্ত্রণে ত আর অমরের চলবে না। শেষ হরেনের এক চিঠি এল, সে যাওয়া-আসার রেল ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। অমর মাকে বললে, "তুমি কিছু দাও ত একবার বেড়িয়ে আসি। এই গরমে লেখাপড়া ক'রে ক'রে মাথা খারাপ হয়ে গেল যে।" মা পঁচিশ

টাকা দিলেন। নগদ সাত টাকায় এক ছাই রঙের ফ্লানেল পেণ্টুলেন আর দশ টাকায় পিতলের বোতাম লাগানো নীল এক কোট কিনে নিলে। গেল বছর সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এক সৌখীন কুমীরের চামড়ার সুটকেস কিনেছিল, সেইটে বেশ ক'রে ঝেড়ে-মুছে তাইতে জিনিস ভরলে। বিছানা বাঁধার কেম্বিসের থলি ছিল না, তাই বিছানার উপর এক লালিম্লী কম্বল জড়িয়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে নিলে। মোটের উপর তাকে বেশ Smart দেখাচ্ছিল স্টেশনে, বিশেষ যখন টেনিস ব্যাটটা হাতে ক'রে পৌছল। শুভক্ষণে (?) রওয়ানা হল। চলল ত, কিন্তু গিয়ে থাকবে কোথায় ? তার এক দূর সম্পর্কের মামা চাঁদমারীতে থাকেন। কিন্তু সেখানে উঠলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানো দুষ্কর হবে।

দুপুরে দার্জ্জিলিং পৌছল। পাঁচ রকম ভেবে-চিন্তে জিনিসপত্র ধর্ম্মশালায় রেখে সোজা Amherst Villa বাড়ীতে চ'লে গেল। সেখানে হরেনরা থাকে। গিয়ে দেখে এলাহী কারখানা। যেমন আসবাবপত্র তেমনি চাকর-বাকরের বহর। অমরকে দেখে চারিদিকে রোল উঠল "হ্যালো, এই যে" ইত্যাদি। স্নান ভোজনাদি বেশ হল। কিন্তু এখানে আশ্রয় জোগাড় করতে কিছুতেই পারলে না। স্থান নেই, পাঁচজন এই বাড়ীতে থাকে। এদের দল সবশুদ্ধ দশজন। অন্য পাঁচজন আরও দু-তিন বাড়ীতে থাকে। আলাদা আলাদা জায়গায় থাকলে কি হয়, রোজ সকালে বিকেলে এরা খুব সুন্দর মনোহারী প্রসাধন ক'রে একত্রে বেড়াতে বের হয়। চৌরাস্তায় গোটাতিনেক বেঞ্চ জুড়ে ব'সে খুব হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্গত লোকের এদের মাঝে স্থান পাওয়ার কোন সম্ভবনা ছিল না। রাস্তায় যেতে যেতে সবাই এই চাঁদের হাট চেয়ে চেয়ে দেখত। নিন্দুকেরা নাম দিয়েছিল, House of Lords। সারা বিকেলটা এদের সঙ্গে কাটিয়ে, সন্ধ্যাবেলা হরেনের বাড়ী আবার সাড়ে বত্রিশ রকমের মাংস খেয়ে, ধর্ম্মশালায় ফিরে যেতে অমরের কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু উপায় কি, নিজের মান ত রাখতে হবে। তাই খাবার পর চেঁচিয়ে ব'লে গেল, "যাই ভাই হরেন, মামী কত ভাবছেন। সকালে উঠেই পালিয়ে আসব। এক পেয়ালা চা রেখো।" সকাল পর্য্যন্ত থাকতে পারবে কেন, ছটার সময় Amherst Villa-তে এসে হাজির। এদের তখনও রাত পোহায় নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। অমর এক নরমগোছের সোফা বেছে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন আটটা বেজে গেছে, পাঁচ বন্ধুই জামা জোড়া এঁটে ব'সে চা-পানি করছেন। "Good morning all" ব'লেই এক লাফে উঠে সেও ব'সে গেল আর একমনে নানা প্রকার ভোজ্য

পানীয় সাবাড় করতে লাগল। ন'টার সময় সব বন্ধু চৌরাস্তায় সমবেত হলেন। আজ এগারজন। দেড় টাকা ক'রে চারটে ঘোড়া ভাড়া হ'ল। হরেন ও তিনজন ম্যাল চক্কর দিতে গেল। যেই তারা ফিরেছে, অমর একেবারে হরেনের কাছে গিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বললে "একবার আমায় চড়তে দাও ভাই।" হরেন ভাল মানুষ কিছু বললে না, অমর ঘোড়ায় চ'ড়ে বসল। খুব কেতা ক'রে রাশ চাবুক ধ'রে যেই বের হবে কি পাহাড়ী সহিসটা দৌড়ে এসে রাস্তা আটক ক'রে চেঁচাতে লাগল, "তুম্ উতর যাও বাবু, তুম্‌কো ঘোড়া নেই দিয়া।" ব্যাপার বেশী দূর গড়াল না, কেননা অমর একটু ভয় পেয়ে মানে মানে নেমে পড়ল। কিন্তু বাইরের লোক চোখ টেপাটেপি করতে লাগল ব'লে Upper House নূতন বন্ধুর উপর একটু বিরক্ত হ'ল। দুপুর বেলা পা ব্যথা ইত্যাদি পাঁচ রকম ওজর দেখিয়ে অমর বন্ধুদের বাড়ীতেই খেতে ব'সে গেল। মনে করলে, এ বেলা ত ভাল ক'রে খেয়ে নিই, ও বেলা বাজার থেকে দু-চার আনার জল খাবার কিনে খেলেই হবে। সন্ধ্যা নাগাদ একটু সুবিধাও হয়ে গেল। হরেন অমরকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, আমাদের সুরেশের তার এসেছে, তাকে কালই নেমে যেতে হবে। তোমার মামীমা যদি মত করেন ত কাল থেকে এখানেই এস না।" এই ত চাই। পরদিন সকাল হতে না হতে অমরনাথ তার তোরঙ্গ বিছানা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। হরেনকে বললে, "যদি একটা আলাদা ছোট্ট ঘর দাও ত খুব ভাল হয় ভাই। আমার বড় নাক ডাকে।" হরেন বন্ধুকে একটু ভালবাসত। বাক্স-পেঁটরা সরিয়ে একটা ঘর খালি ক'রে দিলে। অমর বাঁচল। তার বড় ভয় যে এই সব বাবুলোক এরা তার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে ফেলবে। আর একদিন কাটল। হেসে, বেড়িয়ে, তাস খেলে, ভালমন্দ পাঁচ রকম খেয়ে অমর বেশ আছে। এরই মধ্যে মুখে একটু বেগুনী আভা দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে হরেন বেড়াতে বেড়াতে তাকে বললে, "তোমার কি ভাই আর কাপড়-চোপড় নেই? রোজ এই নীল কোট আর ছাই রঙ্গের পেণ্টুলুন পরা নিয়ে এরা হাসাহাসি করছিল।" অমর কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিলে, "জানত হরেন আমার অবস্থা।" মনে মনে স্থির করলে, একবার জুং পেলে হয়, দেখে নেব এই সব ফোতো বাবুদের। শেষে ঠিক হল যে হরেনের এক plus four suit (খাটো পেণ্টুলুন সুট) আছে সেটা এরা কেউ দেখে নেই, সেইটে কেটে-কুটে অমর ঠিক ক'রে নেবে। অমরের পুঁজির কথা ত পাঠক জানেন। যত সস্তায় পারে নীচে বাজারে কাটা-কুটো ক'রে নিলে। তা ছাড়া আড়াই টাকায় এক রঙ্গীন চিত্র-বিচিত্র সোয়েটার, আর এক

টাকায় এক গরম ফুল মোজা কিনে আনলে। চমৎকার জিনিস, দেখে বোঝবার জো নেই যে পাটের তৈরী। পরদিন নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে যখন অমর বের হ'ল, পাঁচ বন্ধুই সমস্বরে হুররে ব'লে উঠল। অমরও প্রসন্নমুখে গুড্ মর্ণিং ব'লে সম্ভাষণ করলে। আর তার বিশেষ কোন ভাবনা সঙ্কোচ ছিল না। দু-দুটো সুট, একটা রঙ্গচঙ্গে সোয়েটার এতেই কদিন বেশ কেটে যাবে। তবে মুস্কিল হবে যদি মেয়ে মহলে মিশতে হয়। আপাততঃ তার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ তার দলের সবাই বড়লোকের ছেলে হলেও কোন রকম সামাজিক পাশে আবদ্ধ হতে একেবারে নারাজ। কজনই এক মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, সাধ মিটিয়ে হৈ হৈ করবে। তবে তাদের হৈ হৈ কুরসীনশীন গদীনশীন হয়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত কোমল কি না, কাজেই পাহাড়ে পাহাড়ে লম্বা পাড়ি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যায়াম করা দার্জ্জিলিং-এর একটা কুরীতি, তাই তারা রোজ দুবেলা চৌরাস্তায় আসত আর কখনও কখনও ঘোড়া ভাড়া ক'রে Mall-টা মন্থরগতিতে চক্কর দিত। অমর ত ঠিক এই দরের লোক নয়। তার দু-চার দিনেই House of Lords-এর জীবন নিতান্ত একঘেয়ে মনে হতে লাগল। ব্যাট্ কাপড় সঙ্গে এনেছে, তার বড় ইচ্ছা কোথাও মাঝে মাঝে টেনিস খেলে আসে। রোজ সাজগোজ ক'রে চৌরাস্তায় ব'সে থাকায় তার মন উঠবে কেন? তার উপর গরীবের পেট, হরেনের বাড়ীর গুরুভোজন বিনা ব্যায়ামে আর সহ্য হচ্ছিল না। বেঞ্চে ব'সে ব'সে দেখত, কত রঙ্গ-বেরঙ্গের ছোকরা সাহেব ব্যাট্ হাতে হেলতে দুলতে ক্লাবের দিকে চলেছে। লুব্ধ নয়নে দেখত, আর দেখে বড় হিংসা হত। কিন্তু সহায় ছাড়া সে কি ক'রে ক্লাবে যাবে? একদিন হরেনকে কথাটা বলাতে সে হেসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে, অমরের আমাদের ক্লাবে গিয়ে সাহেবদের পা না চাটলে পেট ভরছে না। কেন, যাও না বাবু স্যানিটেরিয়মে, টেনিস খেলার যদি এত সখ।" অমর ভয়ানক চটে গেল মনে মনে। কথার ভঙ্গী দেখনা, চাঁদমারীতে ব'লে মামার বাড়ী পর্য্যন্ত একবার গেলাম না, ধর্ম্মশালা ছেড়ে জলাপাহাড়ে থাকতে এলাম, আবার টেনিসের জন্য ধুতি প'রে কার্ট রোডে নেমে যাব? যাবই আমি জিমখানাতে, যেমন ক'রে পারি। সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু বন্ধুদের চটাতেও ত পারে না, তাহলে থাকবে কোথা!

একদিন চৌরাস্তায় ব'সে রয়েছে, দেখে যে তাদের কলেজের প্রফেসার মেজর রে ব্যাট হাতে ক্লাবের দিকে যাচ্ছেন। সাহেবদের ভাষায় বলতে গেলে, অমর ঠিক বুঝত তার রুটির কোন দিকটায় মাখন

মাখানো। তৎক্ষণাৎ স্থির করলে মেজর সাহেবকে কাণ্ডারী ক'রে ক্লাবে পাড়ি দেবে। দৌড়ে গিয়ে খুব ভক্তিভরে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "স্যার, আপনি এসেছেন জানতাম না। অনুমতি করেন ত কাল একবার গিয়ে প্রণাম ক'রে আসব।" মেজর রে খুব অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। সকাল ৯-টার আগে এসো। আমি Mrs. Monk-এর হোটেলে থাকি, সাত নম্বর ঘর। তুমি যে মস্ত সাহেব হয়েছ হে! আমি ত জানতাম না যে তুমি এরকম smart কাপড়-চোপড় পর। টেনিস খেলছ? তুমি ত বেশ ভাল খেলতে পার।" সেদিন plus fours-টা পরা ছিল। অমর একটু সলজ্জ হেসে বললে, "না স্যার। টেনিস খেলার সুবিধা হয়ে ওঠে নেই।" Right O! So long! ব'লে রে সাহেব চলে গেলেন। অমর বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, "কি বাবা, এই ছুটির সময়েও তোমার প্রোফেসার নইলে চলছে না?" অমর একটু কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, "ওঁর একটু কাজ আছে ব'লে সকালে আমায় ডেকেছেন।" রে সাহেবটা একটু খোসামোদপ্রিয় ছিলেন। অমর কলিকাতাতেও তাঁর বাড়ীতে দু-চার বার গেছল, এখানে রীতিমত তোয়াজ আরম্ভ ক'রে দিলে। রোজ ছোট-হাজরী খেয়েই তাঁর কাছে উপস্থিত হত, চিঠিপত্র টাইপ ক'রে দিত, নোট নকল ক'রে দিত। আবার ৯-টার পর বন্ধুদের সঙ্গে জুটে পড়ত। সব দিক বজায় রাখতে হবে ত! হরেন কিন্তু একদিন একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি রে সাহেবকে অত আ..ড়াগাছী করচ কেন হে? রোজ কি করতে যাও ওখানে?" অমর জানালে যে সাহেবের কতকগুলো দরকারী নোট নকল ক'রে নিচ্ছে। দিন চার-পাঁচ পরে মেজর রে অমরকে বললেন, "ওহে চ্যাটার্জী, তুমি ঐ ছোকরাদের ওখানে বেশ সুবিধামত থাকবার জায়গা পেয়েছ ত? নইলে আমার এখানে আসতে পার। একটা ছোট কুটরী খালি পড়ে রয়েছে।" কুটরীটা দেখলে। নিতান্ত ছোট, একটু অন্ধকারও বটে। তবু এই সাহেবী হোটেলে থাকতে আসা অমরের কাছে সবরকমে বাঞ্ছনীয়। হরেনদের উপর টেক্কা দেওয়াও হবে। আর স্যারের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে খাতিরও অনেক বাড়বে। রাজী হল। স্বর্গের সিঁড়িতে আর এক ধাপ চড়া হল। বন্ধুদের অশেষ ঠাট্টা-তামাসা সহ্য ক'রেও সেই দিনই অমর হোটেলে জিনিসপত্র নিয়ে এসে বসল।

বিকেলে গুরুমহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে ক্লাবটা দেখে এল। নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগল। বহুকাল আগে একবার ঢাকা ক্লাব দেখেছিল। তার কাকা সেখানে সরকার ছিলেন। কাকার দপ্তরে ব'সে লুব্ধনয়নে

সাহেব-মেমদের খেলা-ধূলো আমোদ-প্রমোদ অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেছিল। মনে হয়েছিল যেন অমরাপুরী। সেই ক্লাবই ত! আজ সেও সাহেব হয়ে এসেছে, লেমন স্কোয়াশের গেলাস হাতে ধ'রে একটু বেঁকে ব'সে ইংরেজীতে কথা কইছে! তবে গলদ এই যে সাহেব-মেম এখানে বড় কম। রাহুর তাড়নে শশীপ্রায় অন্তর্হিত, সাদা মুখ যে কটী এসেছে তারা এক পাসে ব'সে আছে। বেশীর ভাগই স্যারের মত সাহেব, বেঁকিয়ে ইংরেজী বলে মাৎ ক'রে দিচ্ছেন। তা সে যাই হোক্, আমাদের স্বদেশী মেম-সাহেবদের কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। যদি বা একটু রঙ্গের গোলযোগ থাকে তা প্রসাধনের চোটে অমরের চোখে পড়ছে না। সব চেয়ে তার ভাল লেগেছে ঐ ছোট মেয়েটীকে, ফিরোজা রঙ্গের সাড়ী পরা, মার কাছ ঘেঁসে ব'সে রয়েছে। কি লাগে ওর কাছে কটাচুল, নীলচোখ'! অমর স্থির করলে, যা থাকে কপালে, ওদের সঙ্গে আলাপ করবেই, সুবিধা পেলে। ফেরবার পথে বন্ধুদের দেখলে চৌরাস্তায়। মন তখন নানারকমে মশগুল্। একটু পাস কাটিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু যাবে কোথায়? সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করলে, “ময়ূর, ময়ূরপুচ্ছ, দাঁড়কাক, সাহেববাবু, আরে শোনই না।” কি করে, গেল তাদের কাছে। নরেশ উপহাস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় গেছলে বাবা, চেয়েই দেখনা যে! এখনও ত হরেনের কাট্‌লেট্ পেটে গজগজ করছে।” অমর শান্তভাবে উত্তর দিলে, “কোথাও যাই নেই, রে সাহেবের সঙ্গে ওদিকটায় বেড়াচ্ছিলাম। আজ চমৎকার বরফ বেরিয়েছে।” নরেশ মুখ বেঁকিয়ে বললে, “তুমি বরফ নিয়ে কি করবে বাবা, তৈল জোগাড় কর। কোথাও না কোথাও মোসাহেবী নইলে তোমার ত চলবে না।” অমর চালাক ছেলে, কথা হজম করতে জানে। সে হরেন নরেশকে চটাবে কেন, চুপ ক'রে রইল।

আরও দুদিন কেটে গেল। মেজর সাহেব ছাত্রকে নিয়ে দুবার টেনিস খেলে এসেছেন। কিন্তু দুপুর বেলায় নিয়ে গেছলেন যখন সাহেব-সুবোর ভিড় কম। একটু একটু ক'রে অমরের ক্লাব ও হোটেল জীবনটা অভ্যাস হ'য়ে আসছে। বড় সুখে আছে। তৃতীয় দিনে সেই মেয়েটীকে রাস্তায় দেখলে। নীল ফ্রেঞ্চ রেশমের সাড়ী খাটো ক'রে পরা, খোলাচুল হাওয়ায় একটু একটু উড়ছে, হাতে সবুজ রঙ্গের চিত্রবিচিত্র ছাতা। অমরের মনে হল যেন সুন্দর একটী প্রজাপতি ফুলের মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার প্রাণের ভেতর যেন কি মোচড় দিতে লাগল। মেয়েটীর মার মুখও বড় ভাল লাগল; কিন্তু সঙ্গে একটী দাদা যাচ্ছিল, সে যেন একটা আস্ত লেবঙ্গের গোরা। প্রায় সেই রকম লাল রঙ্গ, আর ঘুষো যেন উঁচিয়েই

আছে। তবু অমর আমাদের কি ছাড়বার পাত্র! সবুরে মেওয়া ফলে। বিশেষ তার নসীব এখন খুব জোর যাচ্ছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা খানার পর মেজর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ছোকরা, তুমি একটা কালো-গোছের স্যুট সঙ্গে এনেছ কি? পরশু আমার সঙ্গে লেডী বি'র পার্টিতে যাবে।" অমর একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞা না, আমি সেরকম কাপড় ত কিছু আনি নেই।" সাহেব "বোয়, বোয়" ক'রে হুঙ্কার ছাড়লেন। বোয় আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার আর বছরের সেই নীল কাপড়া এনেছিস্ কি?" "হাঁ হুজুর।" "সেটা এই সাহেবের ঘরে রেখে দে। কাল সকালে দর্জীটাকে ডাকিয়ে সাহেবের গায়ে ফিট্ ক'রে নিতে হবে।" "জো হুকুম হুজুর।" পরদিন সকালে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই সেই নীল সার্জ্জের স্যুট ঠিক হয়ে গেল। বড় সাধ ক'রে অমর নূতন কাপড় প'রে বেড়াতে বের হল। কিন্তু নরেশটা এমনি অসভ্য বর্ব্বর যে ব'লে উঠল, "নূতন পুচ্ছ কোথায় জোগাড় করলে হে বায়সপ্রবর?" ভ্যাগিস্ এরা ক্লাবে যায় না। তাহলে প্রাণটা অতিষ্ঠ হত। কাল সকালে ক্লাবে ladies-দের সঙ্গে টেনিস খেলতে হবে মাষ্টার মহাশয় হুকুম করেছেন। সেই সময় নরেশের মত বখা ছেলে দর্শক থাকলে হয়েছে আর কি! নরেশটা দিন দিন অমরের জুজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে যে বড় জুজু গোকুলে বাড়চে তা ত আর বেচারা তখন জানে না।

পরদিন সকালবেলা যখন দশটার সময় অমর টেনিস বেশে সজ্জিত হয়ে ব্যাট্ হাতে ডাঃ রে-র সঙ্গে চৌরাস্তার উপর দিয়ে গশ্‌গশ্ ক'রে চ'লে গেল, নরেশ হরেনকে বললে, "ছেলে বটে, ঠিক বাগিয়েছে।" টেনিস কোর্টে গিয়ে দেখে সেদিনকার সেই মেয়েটী তার ভাইয়ের সঙ্গে ব'সে আছে। আজও নীল সাড়ী। অমরের বুক দুড় দুড় ক'রে উঠল। ভাইটীর সেই মানোয়ারী গোরার মত মুখ, লাল টক্‌টক্ করছে, হাসির লেশ নেই। যে হাতে ব্যাট ধ'রে রয়েছে সেটা যেন একটা বাঘের থাবা। ভগবান্ এমন বোনের এমন ভাই কি ক'রে সৃষ্টি করলেন! অমরদের দেখে ভাই বোনকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, "Why is that fellow looking at you like a sick cow, Nellie. (তোর দিকে অমন রুগ্ন গরুর মত ক'রে চেয়ে রয়েছে কেন রে, নেলী।)" মেজর রে ছাত্রকে এদের সঙ্গে যথারীতি আলাপ ক'রে দিলেন, "মিস্টার অমর চাটার্জী, মিষ্টার ভূপেন রুডার, মিস্ নীলিমা রুডার।" নীলিমা ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে, বোধহয় বয়সের দোষ। কিন্তু ভূপেন অমরের মুখের দিকে একটু কৃপা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "হাডুডু?" অমর নত হয়ে দুজনকেই নমস্কার করলে। ভূপেনের ব্যবহারটার ঠিক অর্থ বোঝবার তার শক্তি ছিল না। আর বুঝলেও

গায়ে মাখবার পাত্র সে নয়। কিন্তু সে যে আজ নেটিভ নয় তা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ মিলল সেইখানেই। তারা যে কোর্টে খেলবে ব'লে স্থির ছিল, সেখানে দুজন আহেলেবেলায়ৎ সাহেব-লোগ খেলছিলেন। তাঁদের সেট্ শেষ হতে তাঁরা খেলা বন্ধ না ক'রে আবার নূতন সেট্ আরম্ভ ক'রে দিলেন। এ কিছু একটা নূতন ব্যাপার নয়। এ রকম হয়েই থাকে, আর আমাদেরও বংশগত প্রকৃতি এ সময় একটা বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয় ভাব দেখান। অমর কিন্তু রসভঙ্গ করলে। একেবারে কোর্টের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এ আমাদের কোর্ট, আপনারা অন্যত্র খেলুন গিয়ে।" একজন সাহেব মৃদু হেসে উত্তর দিলে, "Must we, Baboo? তাই নাকি বাবু?" অমর আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু কোর্টও ছাড়লে না। সাহেবলোগরা তাকে নাছোড়বান্দা দেখে শেষ নিজেদের কোট হ্যাট নিয়ে স'রে পড়লেন। অমরের জয় হল। সে একটু বুক ফুলিয়ে এসে নেলীকে বললে, "আসুন এইবার খেলা যাক।" ভূপেন, কি জানি কেন, খুসী হল না। ভুরু কুঁচকে অমরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা কি জানে যে আপনি মেম্বর নন?" এ সব সামান্য জিনিস হজম করতে আমাদের অমরনাথ খুব জানে। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ঘা সইতেই হয়। তার সামনে এত বড় পুরস্কার, নেলীর সঙ্গে টেনিস খেলা। সে নেলীর ভাইয়ের দুটো কথা বরদাস্ত করবে না? টেনিস সুরু হল ভাই বোন একদিকে, আর মেজর সাহেব ও ছাত্র অন্য দিকে। অমর প্রথম সেট্‌টা খুব জোর খেললে। মেজর রে একদিকে বদ্ধ সাহেব হলেও খেলাধূলোয় সুবিধা ক'রে উঠতে পারেন না। ছাত্র তাঁকে এক রকম কোণ ঠাসা করেই রাখলে, সে একাই সর্ব্বত্র বল্ নিতে লাগল। অন্যদিকে ভূপেন মন্দ খেললে না, কিন্তু তার মেজাজ ভাল ছিল না খানিকটে চেষ্টা ক'রেই হাল ছেড়ে দিলে। ফলে অমর জিতিল, ৬—৩। আবার খেলা আরম্ভ হল। এবার অমর মাষ্টার মহাশয়কে সব ছেড়ে দিতে লাগল। যখন নিজে কোনও বল্ মারে ত সে খুব আস্তে নেলীর দিকে। ফলে দ্বিতীয় সেট্ ভাই বোন জিতল, ৭—৫। নেলী আনন্দে হাততালি দিতে লাগল, কিন্তু তার দাদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে, "ও ত তোকে ইচ্ছা ক'রে জিতিয়ে দিলে। একে আবার টেনিস্ বলে?" খেলা হয়ে গেলে ডাঃ রের ইশারা পেয়ে অমর দৌড়ে নেলীর কোট এনে পরিয়ে দিলে, বসবার জন্য একটা বেশ নীচু দেখে চেয়ার এগিয়ে দিলে। বোপেন নীরস ভাবে ইংরেজীতে বললে, "ইস্কুলের মেয়ে, অত শিভাল্‌রী (সম্মান) ওর অভ্যাস নেই, কেন ওর মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন, চাটার্জী?" ফিরে যাওয়ার পথে মেজর সাহেব ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল

ওদের ? দিব্যি মেয়েটা না নীলিমা ?" অমর অকারণ লাল হয়ে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ বেশ, ওঁরা কোথায় থাকেন ?" "ওদের বাবার নিজের বাড়ী আছে। জালা পাহাড়ে 'বেলা ভিষ্টা' দেখ নেই ? ব্যারিষ্টার সতীশ রুডারকে চেন ত ? তাঁরই ছেলে মেয়ে ওরা। একদিন নিয়ে যাব এখন তোমায়।" অমরের বুকের ভেতরটায় যেন কে হাতুড়ী মারতে আরম্ভ করলে।

ভাই বোনের বাড়ীর পথে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ভাই বললে,. "চাটার্জীটা একটা boor (বর্ব্বর), দেখলেই বোঝা যায় কখনও ভদ্রসমাজে মেশে নেই।" বোন চ'টে উঠল, "দাদা, তোমার ঐ কেমন দড়াম ক'রে কথা বলা অভ্যাস। টেনিসে একবার হেরেছ তাই এত রাগ।" "একবার কেন দুবারই হেরেছি। শেষ সেট্টা ত তোকে ইচ্ছা ক'রে জিতিয়ে দিলে। আমি ও সব ন্যাকামি দেখতে পারি না। ও আবার টেনিস !" "কিন্তু ভদ্রলোকের manners (আদব কায়দা) আমার বড় ভাল লাগল।" "তোর খোসামোদ করছে, তাই চমৎকার ভদ্রলোক। ইস্কুলে পড়িস, সবাই কান মলে দেয় কিনা, তাই খোসামোদ বড় মিষ্টি লাগে। দেখ্ না, এই কাল পরশু একদিন ওর সঙ্গে singles খেলে দেব ঠুকে love set, ৬—০।" বাড়ী গিয়েই নেলী মাকে চেঁচিয়ে বললে, "মা, একজন নতুন টেনিস খেলোয়াড় এসেছে। কি সুন্দর তার ষ্টাইল, কি ভীষণ জোরে মারে ! তার কাছে দাদা হেরে গিয়ে ভয়ানক চটে গেছে।" মিসেস্ রুডার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেরে ভূপেন ? কেউ নূতন সিবিলিয়ান এসেছে না কি ? এখানে নিয়ে আসিস্।" ভূপেন খুব হেনস্থা ক'রে উত্তর দিলে, "না মা, মোটেই নয়, ডাঃ রে তাঁর কলেজের এক ছাত্রকে খেলতে এনেছিলেন। Funny fellow (তাকে দেখলে আমার হাসি পায়), কখনও আমাদের সেট্এ মিশেছে ব'লে বোধ হয় না।" মা মনে করলেন, নাই হল সিবিলিয়ান, জমীদার বড়লোকের ছেলেও হতে পারে, দেখাই যাক না। প্রকাশ্যে বললেন, "তা হোক গে, তোদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, রে-কে বলব তাকে একদিন এখানে খেলতে নিয়ে আসতে।" ছেলে বললে, "তা নিমন্ত্রণ কর, কিন্তু নেলী বাঁদরীকে ব'লে দাও যেন তার সঙ্গে অত গায়ে পড়ে ভাব করতে না যায়।" নেলী মুখ লাল ক'রে জবাব দিলে, "বেশ করব, খুব করব, তোমার কি ? মা, দাদা খেলায় হেরে গেলে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়।"

তার পর দিন লেডী বি'র পার্টি। অমর নীল স্যুট প'রে বুকে এক লাল টুকটুকে কার্ণেশন ফুল গুঁজে গুরুজীর সঙ্গে North Crag কুটীতে

গেল। পাহাড়ের উপর সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিকে বাগান। পরিষ্কার আকাশ, ঠাণ্ডাও বেশী নেই তাই খোলা বাগানেই পার্টির বন্দোবস্ত হয়েছিল। গাছে গাছে লাল নীল আলো, রঙ্গ বেরঙ্গের নিশান টাঙ্গানো। বাগানময় ছোট ছোট চায়ের টেবিল। খানসামারা ঘুরে ফিরে পরিবেশন করছে। ডাঃ রে অমরকে লেডী সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে দিলেন, "আমার ছাত্র ওমর চাটার্জী, খুব ওস্তাদ টেনিস খেলোয়াড়।" লেডী সাহেব বললেন, "একদিন খেলতে আসবেন এখানে।" অমর নমস্কার ক'রে স'রে পড়ল। দূরে এক টেবিলে গিয়ে বসল। মাষ্টার মহাশয় সাদা রঙ্গের সাহেব মেমদের পরিচর্য্যায় মেতে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস যে এই বিশাল বঙ্গদেশে তাঁর সঙ্গে সাহেবদের যেমন একটা understanding (বোঝাপড়া) আছে তেমনটী আর কারও সঙ্গে নেই। সে যাক, কিন্তু অমর বেচারার একা একা হংসমধ্যে বকো যথা অবস্থা হল। এ সব ব্যাপার ত তার সত্যি রপ্ত হয় নেই। তা নইলে পাঁচ জনের সঙ্গে জমিয়ে নিত। সে বিরলে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময়, "এই যে আপনি, একলাটা কি করছেন?" ব'লে, একগাল হেসে নীলবসনা নীলিমা লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হ'ল। অমর, "আমি ত কাউকে চিনি না, বসুন আপনি," বলতে বলতে একটা চৌকী এগিয়ে দিলে। দুজনে বসলে পর অমর জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনি কি নীল রঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রঙ্গের শাড়ী পরেন না? কি ক'রে জানলেন নীলরঙ্গ আপনাকে এমন মানায়?" নেলী হাসতে হাসতে বললে, "নীল আমি বরাবরই ভালবাসি তবে সাড়ী এই কয়েক বছর পরছি। নীলিমা নাম কিনা তাই বোধ হয় মা নীল ফ্রক পরাতেন।" ব'লে আবার হাসতে লাগল। কেন যে এরা দিবারাত্র হাসে কে জানে? অমর বেচারা হাসির তরঙ্গে যেন খাবি খেতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ, "কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, উঠিল সে ধ্বনি", অর্থাৎ কিনা বোপেন সাহেব এসে উপস্থিত হল, দেখলে কার উপর বোনটা এত হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে, বললে, "নেলী, মা তোকে খুঁজছেন, পালা। গুড্ ইভনিং চাটার্জী।" নেলী চট্ ক'রে কথা শোনবার পাত্র কি না প্রায়, সে অমরের হাত ধ'রে টানাটানি আরম্ভ করলে, "আপনিও আসুন না মার টেবিলে।" অমর মরমে ম'রে গেল। নইলে দেখতে পেত বোপেনের দু চোখ কি রকম জ্বলছিল, যেন বনবেরাল। নেলী মা বাবার সঙ্গে অমরের আলাপ ক'রে দিল এই ব'লে, "মা, ইনিই আমার বন্ধু, মিষ্টার চাটার্জী। তোমায় ত বলেছি এঁর কথা।" মিসেস্ রুডার খুব মিহিসুরে ইংরেজীতে বল্‌লেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ

ক'রে বড় আনন্দ হল। আপনি নাকি টেনিসে মস্ত ওস্তাদ। ছেলেরা রোজ বিকেলে বাড়ীতে খেলে। একদিন আসবেন।" অমর কৃতার্থ হল, কিন্তু হঠাৎ দেখে পশ্চাতে বোপেন। সে বুঝতে পারে না কেন বোপেনটা এই রকম পুলিশের দারোগার মত তার পেছনে পেছনে ঘুরছে। কিন্তু বোপেন বাঙ্গলা কলেজে বরাবর প'ড়ে আসছে, অমরের type চেনে খুব ভাল ক'রেই। ও-চীজ বাড়ী থেকে একটু দূরে রাখাই ভাল, এই তার বিশ্বাস। সে যাই হোক, বোপেনকে দেখে অমর ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, "কাজ আছে মাপ করবেন গুড্ বাই," ব'লে স'রে পড়ল। রে সাহেবকে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। শেষে দেখে তিনি জনা তিন চার হোমরা চোমরা ইংরেজ জুটিয়েছেন, তাদের সঙ্গে ব'সে তাস খেলছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে অমর বাড়ী রওয়ানা হল। নীল সাড়ী কাল চোখের ধ্যান করতে করতে কত যে ঠোক্কর খেলে তার ঠিকানা নেই। বাড়ী পৌঁছে এক আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির বর্ণনা আপনার মনে আওড়াতে লাগল। আচ্ছা, বিদ্যাপতি ঠাকুর যেন ঠিক তার জন্যই সে বর্ণনা লিখেছেন,—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
* * *
প্রকট হাস অব গোপন ভেল
* * *
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

বেচারা অমর, নিজের খেয়ালেই আছে। সাহেবরা ত বলে যে প্রেমের দেবতা অন্ধ। নীলিমার হাসি যে অধর ও দুপাটি দন্ত ছেড়ে কোথাও গোপন হয় নেই, তা দেখবার চোখ কি অমরের আছে? আর চলন, তা মরালের চেয়ে মর্কটের সঙ্গেই বেশী মেলে। কথাবার্ত্তা হাসির এমনই তোড় যে বাড়ীর ছাদ কাঁপে। তা এসব কে বলবে অমরকে? অনুমতি পেলে আমাদের বোপেন বলত, বেশ রগড়েই বলত। হয়ত বলবেও একদিন। আপাততঃ অমর চেয়ারে ব'সে চোখ বুজে কিশোরীর রূপ ধ্যান করতে লাগল। মেজর কখন ফিরে এলেন জানতেও পারে নেই। হঠাৎ পিঠে এক প্রচণ্ড চাপড় পড়ায় লাফিয়ে উঠল। শুনলে সাহেব বলছেন, "Lucky Devil!" খুব কপাল তোমার! কোথায় আজ গেছলে জান? North Crag আর লাট-কুঠীতে তফাৎ কি? ওখানে কি যে সে নিমন্ত্রণ পায়? By the way, পরশু রুডারদের বাড়ী টেনিস

ও চায়ের নিমন্ত্রণ। মিসেস্ রুডার তোমার উপর ভারী খুসী। And that little monkey Nellie, she's clean gone on you. (আর নেলী বাঁদরী, সে ত তোমার প্রেমে হাবুডুবু।) She will be an awfully pretty gal some day (একদিন বড় সুন্দরী মেয়ে হবে ও।) অমর ভাবলে, "Will be, হবে! এর অর্থ কি? মেজর সাহেবের চোখে চালশে ধরেছে তাই নীলিমার অপরূপ সৌন্দর্য্য আজও চোখে পড়ছে না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে ডাক্তার সাহেবকে গুড্ নাইট্ ব'লে সে শুতে গেল। কিন্তু চিরদিনের বন্ধু ঘুম আজ আর কিছুতেই ধরা দেয় না। ছোকরাটী যে স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ তা নয়। বরং, এত বয়স হল, এর আগে কোনদিন কোনও স্ত্রীলোকের দিকে ভাল ক'রে চেয়েও দেখে নেই। আজ কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝছে যে তার দফা রফা। তবে অমরের সব দিক ভেবে কাজ করাটা জন্মগত অভ্যাস। তাই সে নিজের মনোভাবটাকে পাকা ডাক্তারের মত dissect করছে (চিরে দেখছে।) নেলীকে ভালবেসেছে; বেশ ত, নেলীকে বিয়ে করবে; রুদ্র কিন্তু জাতে কায়েত; তা হলেই বা? ব্রাহ্ম-সমাজ আছে; মা মত করবেন না; তা কি হবে? পালিয়ে বিয়ে করবে। একটা জিনিস সে ধ'রে নিচ্ছে, যে রুদ্র বাড়ীতে কোনও গোল হবে না। এই ত বিকেলবেলা নেলী তাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে মার কাছে বন্ধু ব'লে আলাপ ক'রে দিলে। আবার রে সাহেব বললেন নেলী তার প্রেমে হাবুডুবু। এর মানে ত সে আমারই মত মশগুল্ হয়েছে। আদুরে মেয়ে, সে জেদ করলে রুদ্র কি আর রুদ্রমূর্ত্তি ধরতে পারবেন? আর বিয়ে হলেই ত তার বিলেত যাওয়ার পথ সুগম হল। তার চির-দিনের সাধ পূরল। কারও খোসামোদের দরকার নেই। কি শুভ মুহূর্ত্তেই দার্জ্জিলিং এসেছিল! এই সব জল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপন দেখলে যে বোপেন রুডার এক নীলাম্বরী সাড়ী প'রে তাকে খ্যাংরা নিয়ে তাড়া করেছে। বেচারা অমর! এই রকমে ঘুমে, স্বপনে, ভয়ে, ভালবাসায় তার রাত কাটল। ভোর হতেই মাথায় এক মতলব এল। সে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় প'রে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা জনশূন্য। হন্‌হন্ ক'রে একেবারে মহাকাল বাবার পাহাড়ের মাথায় উপস্থিত হ'ল। আজ মেঘ মোটে নেই, উঠন্ত সূর্য্যের সোনালী আলো প'ড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা কি সুন্দরই দেখাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য রঙ্গের খেলা। কিন্তু আমাদের নায়কের মন তখন ভরপূর, তার বরফ দেখার অবকাশ কোথায়? সে করলে কি, যেখানটায় নিশান, ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি টাঙ্গানো আছে সেইখানে ঢুকে প'ড়ে লামাকে নমস্কার ক'রে

নগদ চার আনা তাঁর সামনে রেখে দিলে। লামাজী দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তখন অমর ঈষৎ হেসে, জোড়হাতে, বড় সন্তর্পণে তার প্রার্থনা নিবেদন করলে, "লামা মহারাজ, আমাকে আপনি বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে কি না।" লামা কি বুঝলেন তা ভগবান তথাগতই জানেন, কিন্তু এক কথায় জবাব দিলেন, "বেশক।" অমর খুব খুসী হল, কিন্তু সে ত লামাদের হিন্দুস্থানীর দৌড় কতটা তা জানত না। কে জানে হয় ত ভাষাটা গুলিয়ে গেল, "আহাম্মক" বলতে গিয়ে লামাজী "বেশক" বললেন। অমর আরও খানিকক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে নেমে এল। Amherst Villa-তে একবার ঢুঁ মেরে গেল। হরেনরা সবাই রয়েছে, চা খাচ্ছে। তাকে দেখে নরেশ হৈচৈ ক'রে উঠল, "কোথায় থাক বাবা, একেবারে ডুমুর-ফুল হয়েছ যে। কিছু একটা মতলব বাগাচ্ছ, বন্ধু। তোমায় আমি খুব চিনি।" অমর একটু আমতা আমতা ক'রে এক পেয়ালা চা খেয়ে গুড্-বাই ব'লে পালাল।

টিফিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে ব'সেই জাবর কাটতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় বেলা ভিস্টায় উপস্থিত হল। নীলিমা বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল, লাফিয়ে নেমে এল। কাছে এসেই চীৎকার করতে লাগল, "মিষ্টার চাটার্জী, কি হয়েছে জানেন? দাদা পাঁচ টাকা বাজী রেখেছে যে আপনাকে Singles খেলে হারাবে। খবরদার হারাতে দেবেন না। আমার টাকার বড় দরকার। একটা এমন সুন্দর ভুটিয়া কুকুর আজ বেচতে এসেছিল!" অমর মনস্থির ক'রে এসেছিল যে বোপেনের কাছে আজ হারবে। স্বপনে দেখা ঝাঁটাধারী সেই চেহারাটা এখনও যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু উপায় নেই, প্রণয়িণীর হুকুম। প্রথম থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় খেলে ৬-২-তে হারিয়ে দিলে বোপনকে। সে মুখখানাকে ভীমরুলের চাকের মত ক'রে মার কাছে গিয়ে বসল। "ওকে আবার ভদ্রলোকের টেনিস বলে নাকি? হতভাগা জেতবার জন্য যতরকম ফন্দী জানে সব চালিয়েছে।" নেলী পর্য্যন্ত তার উপর একটু দরদ দেখালে না, উল্টো তখনই পাঁচ টাকা চেয়ে বসল। ইতিমধ্যে মেজর রে এসে পৌঁছলেন, রুডার সাহেবও আপিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন চার জন পুরুষ মানুষে দু সেট্ খেলা হল, কিন্তু বোপেন এমন হাঁড়ির মত মুখ ক'রে রইল যে খেলাটা মোটে জমল না। রুডার গিন্নী অতশত বোঝেন না ডাঃ রে-কে ও অমরকে খেয়ে যেতে বললেন। বোপেন কিছু বললে না, কিন্তু "একটু বেড়িয়ে আসি," বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। আজ সকালে সে নরেশের কাছ থেকে অমর সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছে আর মনে স্থির করেছে যে যত শীঘ্র পারে ও Humbug (জোচ্চোর)-

টার এ বাড়ী আসা বন্ধ করবে। সন্ধ্যার আলো জ্বললেই রুডার আর রে দাবা খেলতে বসলেন। মিসেস্ রুড়ার ভেতরে চলে গেলেন বোধ হয় ঘরকন্নার কাজে। নীলিমা অমরকে ধরলে "একটা গল্প বলুন। খেতে এখনও অনেক দেরী।" তুজনে বারান্দায় এক বেতের সোফায় বসল। অমরের গল্পে লাল পরী, সবুজ পরী, নীল পরী এই রকম কত কি ছিল। নেলী তন্ময় হ'য়ে গল্প শুনছে এমন সময় অমর তার মুখ নেলীর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "নীলপরী, ঘুমিয়ে পড়লে?" পরী হো হো ক'রে হেসে উঠল। ঠিক সেই সময় বোপেন বেড়িয়ে ফিরে এল। অমরের মুখ শুকিয়ে গেল। গল্প হঠাৎ বন্ধ হল। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "এই নেলী, মা কোথা রে?" নেলী বললে, "তুমি নিজে দেখনা। আমি গল্প শুনছি, বিরক্ত করনা বলছি।" বোপেন রাগে গর্গর করতে করতে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ঢং ঢং ক'রে খানার ঘণ্টা পড়ল। সবাই ভেতরে গেলেন। অমরের জায়গা টেবিলের এক কোণে, নীলিমার জায়গা আর এক কোণে। এটা বোপেনের কারসাজী। সচরাচর বাইরের লোক থাকলে নীলিমা টেবিলে স্থান পায় না। আজ বোধ হয় নিজেই মাকে বলেছিল। খানা আরম্ভ হল। অমর একটু নিরাশ হয়েছে ত, তাই ভাল ক'রে খাচ্ছে না। এমন কি টাটকা পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজা পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিলে। নেলী চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। আমি ভয়ানক রাগ করব।" রে হেসে উঠলেন, "Sweet heart, তুমি আমায় ছেড়ে দিলে নাকি? আমি খাচ্ছি কি না খাচ্ছি তা ত একবারও ফিরেও দেখছ না। Lucky dog চাটার্জী।" নেলী রাগের ভাণ ক'রে বললে, "আপনাকে আমি কবে বললাম, আপনি আমার Sweet heart।" বোপেনের রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, "নেলী, এই রকম চেঁচামেচি করবি ত কাল থেকে কখনও টেবিলে আসতে পাবি না।" মা ছেলের অকারণ রাগ দেখে বললেন, "কেন ছেলেমানুষকে খেপাচ্ছিস্ ভুপেন! তুই নিজে খা ত।" বোপেন মনে মনে বললে, "বেশ, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব।"

খাওয়ার পর অমর নীলপরীর গল্পটা শেষ করতে বসল। রে চুরুট ধরিয়ে বিদায় নিলে, "আমি যাচ্ছি, তুমি শীঘ্র এসো অমর।" বোপেন সেই বারান্দায় চুপ করে বসে রইল এক কোণে। খানিক পরে অমর উঠল, সবাইকে গুড্‌নাইট্ বলে বের হল। নেলী বললে, সুন্দর চাঁদের আলো, চলুন আপনাকে ফটক পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি।" পাঁচ মিনিট হয়ে গেল তবু নেলী ফেরেনা। বোপেন এক লাফে উঠে বেরিয়ে গেল। দেখে, বোনটী অমরের সঙ্গে ফটকের বাইরে পায়চারি করছে, তুজনেই

হাসছে। গম্ভীর গলায় ডাকলে, "নেলী ভেতরে আয়, মা ডাকছেন।" নেলী উত্তর দিলে, "দাঁড়াও না বাপু, এই এলাম ব'লে এক মিনিটে।" বোপেন রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "না, এখনই চলে আয়। চালাকী চলবে না।" নেলী মুখ ভার ক'রে ভেতরে চ'লে গেল। তারপর বোপেন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে অমরের কাঁধে হাত রাখলে। অমরের মনে হল যেন কাঁধটা জাঁতি কলে পড়েছে। ফিরে দেখলে চাঁদের আলোতে বোপেনের চোক দুটো যেন জ্বলছে। বোপেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "অমরনাথ বাবু আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এ বাড়ীতে ফের কখনও আসবেন না। বুঝলেন আমার কথাটা? আর যেন বলতে না হয়।" অমরের মুখে একটাও কথা সরল না। আস্তে আস্তে চ'লে গেল। Amherst Villa-য় গিয়ে ভাঙ্গা গলায় "হরেন, হরেন" ব'লে ডাকলে। হরেন বেরিয়ে এল। বন্ধুর মুখ দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, অমর?" অমর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "তুমি ভূপেন রুদ্রকে চেন?" "খুব চিনি সে যে আমার ক্লাসে পড়ে।" "সে আমায় আজ বড় অপমান ক'রে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে।" "তোমাকে অপমান করেছে? তা ভাই, আমার কথা যদি শোন ত ওর পথ আর মাড়িও না। অত্যন্ত গোঁয়ার। আর বলাই চাটুজ্যের কাছে যা ঘুষো খেলা শিখেছে সে অতি ভয়ানক।" অমর শুকনো গলায় বললে, "তাহলে ভাই যদি আশ্রয় দাও ত আজ তোমার এখানেই থাকি। কাল ডাঃ রে-র ওখানে থেকে জিনিসপত্র আনিয়ে নেব।" সে রাত্রি অমর Amherst Villa-তেই রইল। পরদিন হরেন মেজর রে-কে চিঠি লিখলে যে অমর তার বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আজই নেমে যাবে, যদি ডাক্তার সাহেব অনুগ্রহ ক'রে মালপত্রগুলো পাঠিয়ে দেন। সেই দিনই অমর কলকাতা চ'লে গেল। ভবানীপুরে পৌছলে তাকে দেখে তার মা ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "হ্যাঁ রে, এ কি চেহারা হয়েছে! সমস্ত মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে। এর নাম তোদের পাহাড়ে হাওয়া-বদল করতে যাওয়া?" অমর বোঝালে যে পেটে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছিল। হৃদয়ের ব্যাধির কথাটা কাউকেই বললে না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রীতি-বিচার

(প্রসাদ)

১

ভাষার প্রথম কাজ সামাজিক মানুষের লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধি, তার চরম পরিণতি লোকোত্তর রস-সৃষ্টিতে। জীবনযাত্রার নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে যে যোগস্থাপনের প্রয়োজন হয় সে যোগ হচ্ছে কর্ম্মযোগ, এবং তার উপায় যে ভাষা সে হচ্ছে কাজের কথার ভাষা। কর্ম্ম-নিরপেক্ষ জ্ঞান বা কর্ম্মের উদ্দেশ্য-শূন্য অনুভূতির প্রকাশ তার কাজ নয়। অর্থাৎ সে ভাষা 'গরু আন, দুধ দোও' জাতীয়, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' শ্রেণীর নয়। এ ভাষা কিছু করতে বলে, নয় কিছু থেকে বিরত থাক্‌তে বলে। সে ইঙ্গিত মাত্র, তার নিজের কোনও স্বতন্ত্র মূল্য নেই। যত সংক্ষেপে ও যত দ্বিধাশূন্য পরিষ্কার রকমে ইঙ্গিতের বিষয়টি সে বোঝাতে পারবে কাজের কথার ভাষার ততই সার্থকতা। যদি তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাতে আঙ্গুল দিয়ে সে যা দেখাচ্ছে চোখ সোজাসুজি কেবল সে দিকে না গিয়ে আঙ্গুলের দিকেও যায়, তবে সেটাও ভাষার দোষ। কারণ তাতে প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কাজের কথার ভাষার আদর্শ হলো কথাকে গোপন ক'রে সুধু কাজকে ব্যক্ত করা। কথার যে স্বাতন্ত্র্য থাক্‌বে না কেবল তাই নয়, তার রং-এর ছোপ্‌ও কাজের গায়ে লাগ্‌বে না।

এ কথা মনে করার কারণ নেই যে মানুষ কোনও দিন বিশুদ্ধ কাজের মানুষ ছিল। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মনের যা ব্যয় হয় তার অতিরিক্ত মন মানুষের চিরকাল আছে। এই বাহুল্য মনের অনুভূতি মানুষ চিরদিন প্রকাশের চেষ্টা ক'রে আস্‌ছে। কিন্তু আদিতে মানুষ এ চেষ্টা করেছে নিশ্চয় ভাষা দিয়ে নয়; করেছে সুরে, অঙ্গের গতি ও ভঙ্গীতে, ছবির রেখায় ও রং-এ। মানুষের ইতিহাসে সাহিত্য ও কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রের অনেক পরে। ঘরকন্নার এ দাসী যে রাজরাণীও হ'তে পারে মানুষের এ আবিষ্কার খুব বেশী দিনের নয়।

বলা বাহুল্য, কাজের ভাষার আদর্শ গুণ হ'লো শোনবা মাত্রই তার অর্থ বোধগম্য হওয়া। আলঙ্কারিকেরা রচনার 'প্রসাদ'গুণের যে সব লক্ষণ দিয়েছেন তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, "অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ" (১)।

---

(১) সাহিত্য দর্পণ ; ৮।১২।

কিন্তু কাজের ভাষার ঐ আদর্শ-গুণ আলঙ্কারিকদের ‘প্রসাদ’গুণ নয়। আদর্শ কাজের ভাষা যে সরল, এবং শ্রুতিমাত্র অর্থবোধক তার কারণ ও ভাষা হচ্ছে শুধু চিহ্ন। চিহ্ন বস্তুটি কাটা-ছাঁটা, মাপাযোকা জিনিষ। ওর মধ্যে কোনও অনিশ্চয়তা নেই। ওর মূল্য ও ওজন একবারে ঠিক করা আছে, এবং সর্ব্বত্রই ওর সেই দাম ও ওজন। যে ভাষায় ক্রিয়া-কর্ম্ম ও আইন-কানুনের বিধি-বিধান দেওয়া হয়, সুতরাং, কাজের ভাষা, মীমাংসকদের কথায় তার একটা সর্ব্বজনসম্মত লক্ষণ হচ্ছে, “সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদেব অর্থং গময়তি”,—একবার মাত্র যে শব্দ প্রয়োগ হয়েছে তার একটিমাত্র স্থির অর্থ নিতে হবে, তা থেকে অতিরিক্ত কিছু আদায়ের চেষ্টা চল্‌বে না। চিহ্নধর্ম্মী এই ভাষা দিয়ে যে কাজের কথা বলা চলে, এবং ঐ ভাষাই যে তার উপযোগী ভাষা, তার কারণ কাজের কথা হচ্ছে সরল ও সহজ কথা। জীবনের রক্ষা ও স্ফূর্ত্তির জন্য “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ”,—মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যুপর্য্যন্ত কাজ ক’রে যেতে হয়। আমাদের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় এই কাজের কল করেই মুখ্যত তৈরী। এবং মনের বড় অংশ ও আদিম অংশ এই কলেরই মালিক ও চালকমাত্র। সুতরাং কাজের কথা মানুষের কাছে অভ্যস্ত বিষয়ের কথা। আর সে বিষয় কেবল জীবনের নিত্য দেনা-পাওনার নিকট পরিচয়ে পরিচিত নয়, তাতে সেই সুনির্দ্দিষ্ট জ্যামিতিক জগতের সহজ সরলতা রয়েছে—যে বস্তু-জগতকে আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে পারি।

সাহিত্য দিয়ে মানুষ যা বল্‌তে চায় তা এ জাতীয় কথা নয়, এবং সে জগতের কথা নয় যে জগৎ কেবলমাত্র আমাদের কর্ম্মের উপাদান ও লক্ষ্য। যে কথা শব্দবহা নাড়ী বেয়ে উঠে কর্ম্মের নাড়ী দিয়ে নেমে মাংসপেশীর পরিমিত বা ব্যাপক আকুঞ্চন-সম্প্রসারণে নিঃশেষ হয় সাহিত্য সে কথা বলে না। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের যে জগৎ আমাদের ঘিরে আছে, সে সামাজিক জগৎ মিলন ও সংঘর্ষের অসংখ্য সূতোর জালে মানুষকে বেঁধে রেখেছে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও তার ইতিহাস—এরা মানুষের মনে যে বিচিত্র অনুভূতির জন্ম দেয় সাহিত্য ভাষার রূপ দিয়ে তার প্রকাশের চেষ্টা। এই প্রকাশের প্রেরণা মানুষের জৈব ব্যাপারের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। মানুষ যেখানে জীবমাত্র সেখানে অনুভূতি তাকে কর্ম্মের প্রেরণা দেয়। অনুভূতিকে গড়ন দিয়ে প্রকাশের প্রেরণা বিশেষ ক’রে মনুষ্য-ধর্ম্ম। যে ভাষা অনুভূতিকে এই প্রকাশের গড়ন দিতে চায়, অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শুধু চিহ্ন হ’লে চলে না, কারণ এ ভাষার লক্ষ্য নয় আকার-ইঙ্গিতে বিষয় বস্তুর সেইটুকু মাত্র পরিচয়

দেওয়া অভীষ্ট কাজের জন্য যেটুকু প্রয়োজন। সাহিত্য বস্তুর বিবরণ নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এই অমূর্ত্ত অনুভূতির সাহিত্যিক মূর্ত্তির দেহ হচ্ছে ভাষা; এবং মূর্ত্তি থেকে তার দেহকে তফাৎ করা যায় না। সুতরাং কাজের কথার ভাষার লক্ষ্য থেকে চিহ্নের যে স্বাতন্ত্র্য, সাহিত্যের ভাষায় বাচ্য ও বচনের সে দ্বৈত নেই। বচনের রঙে বাচ্যকে রাঙানো যায় বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে।

On the 9th Nelson sent Collingwood what he called in his diary the "Nelson-touch." * * * The order of sailing was to be the order of battle—the fleet in two lines, with an advanced squadron of eight of the fastest sailing two-deckers. The second in command, having the entire direction of his line, was to break through the enemy, about the twelfth ship from their rear; he would lead through the centre, and the advanced squadron was to cut off three or four ahead of the centre. This plan to be adopted to the strength of the enemy, so that they should always be one-fourth superior to those whom they cut off. * * * * *

Soon afterwards he asked him if he did not think there was a signal wanting. Captain Blackwood made answer that he thought the whole fleet seemed clearly to understand what they were about. These words were scarcely spoken before that signal was made which will be remembered as long as the language or even the memory of England shall endure—Nelson's last signal: "England expects that every man will do his duty." (১)

এই 'নেল্‌সন্ টাচ্' স্পষ্টই কথায় আঁকা একটি 'প্ল্যান্'। কাগজে দাগ কেটেও ওকে আঁকা যেতো। এবং ঐ কথার 'প্ল্যান' কাগজের 'প্ল্যানের' অনেকটা কাছাকাছি এসেছে বলেই কথাগুলি শোন্‌বা মাত্র প্ল্যানটি চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। নেল্‌সনের শেষ 'সিগ্‌নাল্', যাবৎ ইংরেজি ভাষা বা ইংলণ্ডের স্মৃতি বেঁচে থাকুক আর না থাকুক, কাগজে এঁকে কখনও দেখান যেতো না। কারণ যদিও ওর নাম 'সিগ্‌নাল্' ওটি কোনও বিশেষ কাজের ইঙ্গিত নয়। ওটি নেল্‌সনের সে সময়কার একটি অনুভূতির প্রকাশ, যে অনুভূতি তিনি তাঁর নৌ-বাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ নেল্‌সনের 'টাচ্' হচ্ছে 'সিগ্‌নাল্', আর 'সিগ্‌নাল' হচ্ছে 'টাচ্'। সেইজন্য যে ভাষায় এই অনুভূতি প্রকাশ হয়েছে কেবল চিহ্নধর্ম্মী শব্দ দিয়ে তাকে গড়া সম্ভব হয়নি। "England expects that every man will do his duty."—এর 'ইংলণ্ড' কথাটি ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের একটি দ্বীপের নির্দ্দেশকমাত্র নয়। ঐ ভৌগলিক ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ইংরেজ জাতির স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ, শৌর্য্য ও বিজয়ের গৌরবময় দীর্ঘ

(১) সাদের 'নেল্‌সন-চরিত'; ৯ম অধ্যায়।

ইতিহাস ওর ব্যঞ্জনা। 'ডিউটি' শব্দটির অর্থ নয় হাতে-হাতিয়ারে কি করতে হবে না হবে। যুগে যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা কর্ত্তব্যের কাছে যে আত্মবলি দিয়েছে সেই কথা স্মরণ করানো ওর উদ্দেশ্য। 'এভ্রি ম্যান্'ও ষ্ট্যাটিস্টিক্সের মাথাগুন্তি নয়; প্রতি লোকের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ওর লক্ষ্য। এদের সঙ্গে তুলনা করা যাক্ 'নেল্সন্ টাচ্' অর্থাৎ প্ল্যানের 'enemy' কথাটি। "This plan to be adapted to the strength of the enemy," অথবা, "The second in command was to break through the enemy",—এই 'এনিমি' শব্দটিতে বিরাগ-বিদ্বেষের উগ্র রং-এর স্পর্শ নেই; ওর অর্থ কেবলমাত্র যুদ্ধের অপর পক্ষ, এবং যুদ্ধের প্ল্যান্ বল্তে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শব্দকে চিহ্নমাত্র ক'রেই এখানে কাজ চলে, এবং ভাল চলে।

(২)

কাজের ভাষার যে সরলতা সাহিত্যের ভাষায় যে সে জাতির সরলতা সম্ভব নয় তার মূলকারণ কিন্তু এই চিহ্নধর্ম্মী আর ব্যঞ্জনাধর্ম্মী শব্দপ্রয়োগের প্রভেদ নয়। মূলকারণ অবশ্য এই যে, মানুষের কাছে সাহিত্যের কথা কাজের কথার মত সরল কথা নয়। অনুভূতি মানুষের অন্তরের বস্তু, এবং সেইজন্যই ভাষায় তাকে ঠিক প্রকাশ করা কঠিন কাজ। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের মত আমাদের ভাষাও মূলে বহির্মুখী। সেইজন্য বস্তু ও কাজের কথায় ভাষার যে জন্মগত সহজ পটুত্ব, অন্তরের অনুভূতির প্রকাশে তার সে অনায়াসলব্ধ নৈপুণ্য নেই। এবং শব্দের চিহ্ন দিয়ে যে অত্যন্ত সরল উপায়ে ভাষা কাজের কথা বলে, মনের অনুভূতির প্রকাশে সে কৌশল অচল। সাহিত্যের ভাষাকে তাই ভিন্ন পথ ধরতে হয়। শব্দের আদিম চিহ্ন-মূর্ত্তির চারপাশে যুগ যুগ ধ'রে নানা পথে ও কারণে ভাব ও চিন্তা, ছবি ও রং-এর বহু এবং বিচিত্র যে সব ইঙ্গিত জমা হ'য়ে ওঠে সাহিত্যকে তার ভাষা গড়তে হয় সেই মাল-মশলার অজস্র ব্যবহার ক'রে। বস্তুজগতের সুনির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছিন্নতা অনুভূতির নেই; সেইজন্য তাকে সোজাসুজি নির্দ্দেশ করা যায় না, এই সব ইঙ্গিতের বক্রোক্তি দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে হয়। এ কাজ সহজ নয়, এবং এতে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। শব্দকে ঘিরে ইঙ্গিতের গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু ও উল্কার যে মণ্ডল তার সবগুলিকে টেনে আনলে প্রকাশের কাজ হয় না, এবং ভুলগুলিকে টানলে কাজ পণ্ড হয়। সুতরাং সাহিত্যের শব্দবিন্যাস হ'তে হয় সেই যাদুমন্ত্র যার উচ্চারণে অভীষ্ট যত ইঙ্গিত তারাই আকৃষ্ট হয়, যারা অপ্রয়োজনীয় ও বিরোধী তারা দূরে যায়। অর্থাৎ সাহিত্য যে কথা

বল্‌তে চায় তার প্রকাশের দুরূহতা যেমন রয়েছে কথার প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি রয়েছে প্রকাশের উপায়ের মধ্যে। অনুভূতিকে ভাষার রূপ দিয়ে প্রকাশের কাজটিই দুরূহ, আর যে ভাষা তার উপাদান তার সার্থক প্রয়োগের কৌশলও দুরূহ। যাকে রচনার প্রসাদগুণ বলে তার মূল এই দুরূহতা। কারণ 'প্রসাদ' হচ্ছে এই দুরূহতার বাধাকে অতিক্রমের ক্ষমতা। যে কথার প্রকাশ মনে হয় হবে নিতান্ত জটিল, টানাছেঁড়ার ব্যাপার—যখন দেখা যায় স্বচ্ছন্দ অবলীলায় তার পরিপূর্ণরূপ ভাষায় এঁকে উঠ্‌লো তখন মনে যে বিস্ময়ের চমক লাগে তার আনন্দই হলো প্রসাদগুণের গুণত্ব। এ সেই আনন্দ কষ্টসাধ্য গতি ও ভঙ্গীকে নৃত্যের আনায়াস লীলায় পরিণত দেখ্‌লে যে আনন্দ হয়। 'প্রসাদ' হচ্ছে রচনার সেই গুণ প্রকাশের পায়ের শিকলকে যে তার নাচের নূপুর ক'রে তোলে। 'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধ' যে সাহিত্যের "ষ্টাইলের" একটা গুণ তার মূলে রয়েছে এই বোধ যে এ এমন কথার শ্রুতি যে বহুবার শুনেও অর্থের বোধ না হ'লে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না।

"অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ"—শোন্‌বামাত্রই এ কথার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু কোনও আলঙ্কারিক একে প্রসাদগুণের দৃষ্টান্ত বলেন নি। বিশ্বনাথ প্রসাদগুণের উদাহরণে এই শ্লোকটি তুলেছেন,—

> সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং
> মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।
> বাণৈঃ স্মরস্য শতশো বিনিকৃত্তমর্ম্মা
> স্বপ্নেঽপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি॥

'তুমি মুক্তাহার, এক বার মাত্র সূচীর সূক্ষ্মমুখে ক্ষত হ'য়ে প্রিয়ার অঙ্গের নিবিড় স্পর্শলাভ কর্‌ছ। আমার মর্ম্ম মদনের বহু বাণে শতদিকে বিদীর্ণ; তবু কেন স্বপ্নেও আমি তার দেখাও পাই নে।' আলঙ্কারিকেরা যে উদাহরণ দিয়েছেন, এবং যে উদাহরণ দেন নি তাতেই বোঝা যায় যে 'প্রসাদ' অর্থ সরলতা নয়। রচনার সরলতার কারণ হ'তে পারে যে তার বক্তব্য বিষয় অতি সহজ।

"আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা বহু রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি পত্রান্তরে দেখাইয়াছি। আজ যে দ্রব্যটির কথা লিখিতেছি তাহা একটি উৎকৃষ্ট 'খাদ্যৌষধি'। ইহার নাম কুষ্মাণ্ড। প্রকারভেদে ইহা দুই প্রকার—চাল-কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। চালকুমড়াই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার গুণ লিখিত হইল।" (৩)

(৩) 'কুষ্মাণ্ড'—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন, এল্‌-এম্‌-এস্‌। ভারতবর্ষ—১৩৩৯, শ্রাবণ; ২৮২ পৃঃ।

এ লেখা যে সরল তাতে সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। যা খেলে ক্ষিদে যায় তাতেই রোগ সারে—এ রকম বস্তু যে আছে, এবং দুপ্রকার কুষ্মাণ্ডের একপ্রকার যে এই রকম জিনিষ, এ খবর লেখাটি পড়্‌লেই বিনা আয়াসে জানা যায়। অবশ্য 'খাদ্যৌষধি' ব্যাপারটি, এবং কুষ্মাণ্ডের শ্রেণীবিভাগ কিছু জটিল কথা নয়। কিন্তু সহজ কথাও সরল ক'রে সকলে বল্‌তে পারে না। সুতরাং এ লেখার সরলতা নিশ্চয় এর একটা গুণ; কিন্তু সে গুণ প্রসাদগুণ নয়। কারণ এ সরলতা মনকে যেমন পীড়া দেয় না, তেমনি তাকে নাড়াও দেয় না। একটা কথার মত কথা অতি সহজে সম্পূর্ণ ক'রে বল্‌তে শুন্‌লে মন যে খুসিতে ভ'রে ওঠে, শুদ্ধ সরলতার মধ্যে সে বিস্ময়ের আনন্দ নেই।

কুষ্মাণ্ডের চেয়ে উদ্ভিদসমাজে ঢের নীচু জিনিষ 'ঘাসের' কথা একটু শোনা যাক্।

"সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে—সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলাকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি, ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি, সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্ব্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর একথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্রপরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধসুন্দর, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভাল।" (৪)

ঘাস মানুষের খাদ্য নয়, এবং সম্ভব কোনও নামকরা রোগের ঔষধও নয়। কিন্তু এই 'ঘাসের কথা' মনের রসায়ণ। কারণ এ লেখা পড়বামাত্র শুধু যে এর অর্থ বোধ হয় তা নয়, সে অর্থ তখনি সমস্ত মনে ব্যাপ্ত হ'য়ে তাকে আবিষ্ট করে। 'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধকে' যে আলঙ্কারিকেরা প্রসাদ বলেছেন (৫), সেটা তাঁদের প্রসাদগুণের সংজ্ঞা কি স্বরূপ-বর্ণনা নয়। ওটি প্রসাদগুণের অপরিহার্য্য উপায় মাত্র। তাঁদের মতে 'প্রসাদ' হচ্ছে রচনার সেই ধর্ম্ম যাতে তার বাচ্য ও রস মুহূর্ত্তে চিত্তে ব্যাপ্ত হয়, আগুন যেমন শুক্‌নো কাঠে চকিতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) 'পনেরো-আনা'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫) 'শ্রুতিমাত্রেণ শব্দাত্তু যেনার্থপ্রত্যয়ো ভবেৎ।
সাধারণঃ সমগ্রাণাং স প্রসাদো গুণো মতঃ॥' (কাব্যপ্রকাশ, ৮।১১।)

'চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ ॥' (৬)

কিন্তু বাচ্য ও রসের এই ক্ষিপ্রগতি সম্ভব হয় না যদি না শব্দগুলির শ্রুতিমাত্রই রচনার অর্থ-প্রত্যয় হয়। সেইজন্যই প্রয়োজন

'শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ।' (৭)

'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধ' যেখানে অর্থবোধেই পরিসমাপ্ত হয় সে রচনা শুধু সরল। প্রসাদগুণের সরলতা ফল-লাভের একটা কৌশল মাত্র, তার চরম লক্ষ্য নয়।

(৩)

গোবিন্দদাসের 'করচায়' সমুদ্রের বালুতটের বর্ণনায় আছে,—"দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন"। সমুদ্রের তটভূমি সম্বন্ধে এ কথা হয় ত ঠিক। কিন্তু কোনও রচনা সম্বন্ধে এ কথা সত্য হ'তে পারে না যে,—'বলিবার কিছু নাই তথাপি প্রসাদ'। রকম বিশেষের কথাকে বিশেষ রকম ক'রে বলার মধ্যেই প্রসাদগুণ। কথার বিশেষত্ব ও বলার বিশেষত্ব এই দুয়ে মিলে প্রসাদ। ওর কোনটির অভাব হ'লে রচনায় প্রসাদগুণ থাকে না। অনেক শূন্যগর্ভ কথা, বলার বিশেষ কিছু নেই তবুও খানিকটা বলা, অনেক সময় লেখার গুণে বেশ ঝরঝরে, নিখিচ্, সুখপাঠ্য হয়। কিন্তু এ সব clever রচনায় প্রকৃত প্রসাদগুণ থাকে না। কথার মধ্যে কিছু অভিনব, কিছু চমৎকার, কিছু গভীর না থাক্‌লে, শুধু বলার কৌশলে কোনও রচনা প্রসাদ-যুক্ত হয় না। প্রসাদগুণ মনের পথে কথার গতিকে ক্ষিপ্র করে। সুতরাং তার শক্তির পরিমাণ কেবল গতির বেগ মেপে পাওয়া যায় না, যে কথার গতি তার ওজনটাও দেখ্‌তে হয়। Momentum শুধু velocity-তে হয় না, mass চাই। তবে নাকি নবীন বিজ্ঞানে বলে যে mass-ও গতি-নিরপেক্ষ নয়, সেইজন্য গতির ক্ষিপ্রতায় হাল্‌কা জিনিষকেও ভারী মনে হ'তে পারে; বলার বিশেষ কৌশলে ফাঁকা কথাকেও একটা বিশেষ কিছু ব'লে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

গণিতের পরিভাষায় 'প্রসাদ' প্রকাশের দুরূহতার function। কথার প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশের বাধা যত বেশী, যে রচনা 'শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ' তাকে চিত্তে ব্যাপ্ত করে তার প্রসাদগুণও তত বেশী। সুতরাং দুটি লেখার

---

(৬) সাহিত্য দর্পণ, ৮।১১। 'কাব্য-প্রকাশে' মম্মটভট্ট ঐ এক কথাই বলেছেন,—
'শুষ্কেন্ধাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ।
ব্যাপ্নোত্যন্যৎ প্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র বিহিতস্থিতিঃ।' (৮।৫।)

(৭) সাহিত্য দর্পণ, ৮।১২।

প্রসাদগুণ তুলনা করতে কেবল তাদের প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতার তুলনা করলে চলে না, যে কথা তারা প্রকাশ করছে তার প্রকৃতিও যাচাই ক'রে দেখতে হয়। দুটি নিঃসন্দেহ প্রসাদগুণযুক্ত লেখার তুলনা করা যাক্। লিটন্ স্ট্রেচি রাণী ভিক্টোরিয়ার উপর ডিস্রেলীর প্রভাব বিস্তারের যে বর্ণনা করেছেন তার আরম্ভটা এই—

The amazing being, who now at last, at the age of seventy, after a life-time of extraordinary struggles, had turned into reality the absurdest of his boyhood's dreams, knew well enough how to make his own, with absolute completeness, the heart of the Sovereign Lady whose servant, and whose master, he had so miraculously become. In women's hearts he had always read as in an open book. His whole career had turned upon those curious entities; and the more curious they were, the more intimately at home with them he seemed to be. But Lady Beaconsfield, with her cracked idolatry, and Mrs. Brydges-Williams, with her clogs, her corpulence, and her legacy, were gone: an even more remarkable phenomenon stood in their place. He surveyed what was before him with the eye of a past-master; and he was not for a moment at a loss. He realised everything—the interacting complexities of circumstance and character, the pride of place mingled so inextricably with personal arrogance, the superabundant emotionalism, the ingenuousness of outlook, the solid, the laborious respectability, shot through so incongruously by temperamental cravings for the coloured and the strange, the singular intellectual limitations, and the mysteriously essential female element impregnating every particle of the whole. A smile hovered over his impassive features, and he dubbed Victoria 'the Faery.' (৮)

ডিস্রেলীর অদ্ভুত চরিত্র,—প্রবল সাংসারিক ও প্রবুদ্ধ 'কমিডিয়ান্', এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার লঘু-গুরু ও ধূসর-রঙীন নানা উপাদানে গড়া শেষ পর্য্যন্ত নাতিগভীর ও অনতিজটিল মন, স্ট্রেচি অতি চমৎকার এঁকে তুলেছেন। লেখক যা বলতে চেয়েছেন এ লেখায় তার কোনও কথা পাঠকের মনে অস্পষ্ট থাকে না। এ লেখা যেমন স্বচ্ছ, তেমনি নিটোল। এর পাশে রাখা যাক্ উইলিয়াম জেম্সের বার্গসঁর দার্শনিক মতের আলোচনা থেকে একটা ছোট প্যারাগ্রাফ্—

When you have broken the reality into concepts you never can reconstruct it in its wholeness. Out of no amount of discreteness can you manufacture the concrete. But place yourself at a bound, or d'emblée, as M. Bergson says, inside of the living, moving, active thickness of the real, and all the abstractions and distinctions are given into your hand: you can now make the intellectualist substitutions to your heart's content. Install yourself in phenomenal movement, for example, and velocity, succession, dates, positions, and innumerable other things are given you in the bargain. But with only an abstract succession of dates and positions you can never

(৮) লিটন্ স্ট্রেচি—'কুইন্ ভিক্টোরিয়া', ৮ম অধ্যায়।

patch up movement itself. It slips through their intervals and is lost.

ষ্ট্রেচির লেখার বর্ণচ্ছটা জেম্‌সের লেখায় নেই। কারণ জেম্‌সের যা বিষয়-বস্তু তাতে রং ফলাবার অবকাশ নেই। কিন্তু রঙীন তুলিতে ষ্ট্রেচি যা এঁকেছেন তা অনেকটাই রক্ত-মাংসের জিনিষ, তাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। জেম্‌সের কলমের মুখে অশরীরী দার্শনিক তত্ত্ব মূর্তি পেয়ে বেঁচে উঠেছে। বক্তব্যের মধ্যে পরিপূর্ণ ও পরিষ্কার প্রকাশের যে বাধা ষ্ট্রেচি অতিক্রম করেছেন, তার চেয়ে অনেক বড় বাধা জেম্‌সকে জয় করতে হয়েছে। তবুও ষ্ট্রেচির 'ওয়াটার কলার'-এর চেয়ে জেম্‌সের 'পেনসিল্ ড্রয়িং'-এর প্রকাশের শক্তি কিছুমাত্র কম নয়। বরং পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে জেম্‌সের এ লেখার তুলনায় ষ্ট্রেচির রচনাটির 'প্রসাদ' অনেকটা 'মেক্যানিকাল্'। যত্নে কাটা ও সযত্নে পালিশ করা বাক্য-খণ্ডের পর বাক্য-খণ্ড সাজিয়ে ওটি নিপুণ ক'রে তৈরী করা ইমারত। জেম্‌সের কথা ফুটে উঠেছে ভিতর থেকে,—ফুল যেমন ক'রে ফোটে। পাপ্‌ড়ির সঙ্গে পাপ্‌ড়ি জুড়ে একে কখনও বানানো যেতো না।

(৪)

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'প্রসাদ' ছাড়াও 'অর্থব্যক্তি' ব'লে রচনা-রীতির আর একটি গুণ স্বীকার করেছেন; কিন্তু কাজের বেলায় 'প্রসাদ' থেকে তাকে বড় একটা তফাৎ রাখ্‌তে পারেন নি। বামন 'অর্থব্যক্তিকে' বলেছেন অতি শীঘ্র অর্থ-প্রতিপত্তির হেতু (১০)। দণ্ডীর মতে 'অর্থব্যক্তি' হচ্ছে অর্থের অনেয়ত্ব (১১), অর্থাৎ যে সব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা দিয়েই উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়, আর অন্য কিছু কল্পনা ক'রে নিতে হয় না। নবীন আলঙ্কারিকেরা বলেন, 'অর্থব্যক্তি' একটা স্বতন্ত্র গুণ নয়, ওটি প্রসাদগুণেরই অন্তর্গত। "প্রসাদেন অর্থব্যক্তির্গৃহীতা" (১২)। নবীনদের এই মত বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়। কারণ প্রাচীনেরা 'প্রসাদ' ও 'অর্থব্যক্তি' এই দুই নামে যে সব গুণ-দোষের আলোচনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে 'ষ্টাইলের' এক-ই গুণ ও তার অভাবের ভিন্ন ভিন্ন দিক ও কারণ মাত্র। এক 'প্রসাদ' নামে তাদের আলোচনায় কিছুমাত্র দোষ হয় না। বরং অনাবশ্যক চুলচেরা বিভাগের ব্যর্থ চেষ্টা থেকে আলোচনা রক্ষা পায়।

(৯) উইলিয়াম জেম্‌স্—'এ প্লুরালিষ্টিক্ ইউনিভার্স'। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(১০) "যত্র ঝটিত্যর্থ প্রতিপত্তিহেতুত্বং স গুণোঽর্থব্যক্তিরিতি"। 'কাব্যালংকারসূত্র', ৩।১।২৪।

(১১) "অর্থব্যক্তিরনেয়ত্বমর্থস্য"। 'কাব্যাদর্শ', ১।৭৩।

(১২) 'কাব্যপ্রকাশ', ৮।৭।

(৫)

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দ-প্রয়োগের গুটিকয়েক গুণ নির্দ্দেশ করেছেন যার অভাবে, তাঁদের মতে রচনা প্রসাদগুণ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

বামন 'প্রসাদকে' বলেছেন 'অর্থের বিমলতা',—"অর্থবৈমল্যং প্রসাদঃ" (১৩)। 'ময়লা' বস্তুটি হচ্ছে যেখানে যার প্রয়োজন নেই সেই অস্থানে আবির্ভূত জিনিষ। পানীয় জলে রং মিশালে জলকে ময়লা করা হয়, হোরি খেলার রঙীন জল ময়লা জল নয়। সুতরাং 'অর্থের বিমলতার' মানে,—অর্থকে প্রকাশের জন্য যে কথাগুলি বলা প্রয়োজন কেবলমাত্র সেই কথাগুলি বলা, বাহুল্য কোনও কথা না বলা। "অর্থস্য বৈমল্যং প্রয়োজকমাত্রপরিগ্রহঃ প্রসাদঃ" (১৪)। বামন এর বিপর্য্যয়ের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,—"উপাস্তাং হস্তো মে বিমল-মণিকাঞ্চীপদমিদম্"। শরীরের সে অঙ্গ লক্ষ্য 'কাঞ্চীপদম্' বল্‌লেই তা প্রাকাশ হয়; 'বিমল-মণি' বিশেষণটি বাক্যের অর্থে কিছুই যোগ করে না। সুতরাং ওটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং প্রসাদগুণের বিঘ্ন। "কাঞ্চীপদমিত্যনেনৈব নিতম্বস্য লক্ষিত্বাদ্বিশেষণস্যাপ্রয়োজকত্বমিতি" (১৫)। অনাবশ্যক পদের বোঝায় বাক্যের অর্থকে ভারাক্রান্ত করার দৃষ্টান্ত বড় লেখকদের লেখায় দেখা যায় না। আমাদের মত স্বল্প-ক্ষম লেখকেরা যখন অসাবধান হয়, বিশেষ যখম উচ্ছ্বাস কি কবিত্ব প্রকাশ করতে যায়, তখনি এ দোষ প্রায় দেখা দেয়।

"সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই পর্য্যবসিত হইল না; ভারত সাগরের উর্ম্মিসঙ্কুল নীলজলরাশি তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না, হিমালয়ের তুষারাবৃত শুভ্র শিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না" (১৬)।

'বেগটি' হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজকে আঘাতের বেগ। কিন্তু জলরাশির 'নীলত্বের' ও তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখরের 'শুভ্রত্বের' কোনও কিছুর গতিকে কিছুমাত্র বাধা দানের ক্ষমতা না থাকায় ও দুটি বিশেষণ নিরর্থক কবিত্ব; বামনাচার্য্যের ভাষায় 'বিশেষণদ্বয়স্যাপ্রয়োজকত্ব-মিতি'।

বাক্যের মধ্যে অনাবশ্যক পদ যে দোষ, সমস্ত রচনার মধ্যে অনাবশ্যক বাক্য ও অংশ ঠিক সেই শ্রেণীর দোষ। প্রথমটি বাক্যের প্রসাদ নষ্ট করে, অন্যটি সন্দর্ভের যথার্থ রূপটিকে পরিচ্ছিন্ন হ'য়ে পাঠকের

(১৩) 'কাব্যালংকারসূত্র', ৩।২।৩।

(১৪) ঐ।

(১৫) ঐ।

(১৬) 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ —'উদ্দীপনা'।

মনে ফুটে উঠ্‌তে বাধা দেয়, অর্থাৎ তার প্রসাদগুণের লাঘব ঘটায়। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নাটক সম্বন্ধে যা বলেছেন, সমস্ত রকম রচনা সম্বন্ধেই সে কথা ঠিক। "যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত"। তা না হ'লে রচনাটি দৃঢ়সংবদ্ধ হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে না, বাহুল্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার গায়ে যেন ঝুল্‌তে থাকে। সম্ভব এই দোষ দেখেই জয়দেব উমাপতিধরের কাব্যের সমালোচনায় লিখেছিলেন,—"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"। রচনাকে 'পল্লবিত' করেন—নামকরা লেখকদের মধ্যেও এমন উমাপতিধরের সংখ্যা কম নয়।

(৬)

আলঙ্কারিকেরা বলেন প্রসাদ-যুক্ত রচনায় যেমন বাক্যের মধ্যে অনাবশ্যক পদ থাকে না, তেমনি আবশ্যক পদের অভাবও থাকে না। অর্থাৎ বাক্য যা প্রকাশ করতে চায় তার পক্ষে, যে পদগুলি দিয়ে বাক্যটি তৈরী, তারাই হবে যথেষ্ট; মনকে বাইরে থেকে কিছু কল্পনা ক'রে নিতে হবে না। দণ্ডী দুটি উদাহরণ রচনা ক'রে কথাটা বুঝিয়েছেন। যদি বলা যায়,

মহী মহাবরাহেন লোহিতাদুদ্ধৃতোদধেঃ। (কাব্যাদর্শ, ১।৭৪)।

'মহাবরাহরূপী বিষ্ণু লোহিতবর্ণ সমুদ্র থেকে মহীকে উদ্ধার করেছিলেন,'—তবে বাক্যটির শব্দার্থ বোঝার পর স্বভাবত অ-লোহিত বর্ণ সমুদ্রের লোহিতত্বের কারণ, অর্থের সঙ্গতির জন্য, মন খোঁজ করে। এবং কল্পনা করতে হয় যে মহাবরাহের খুরে ক্ষুণ্ণ সমুদ্রশায়ী অনন্তনাগের রক্তে সমুদ্র লোহিত হয়েছে। আলঙ্কারিকেরা বলেন এটা কষ্ট-কল্পনা, এবং এ রকম কল্পনার প্রয়োজন,—তাঁদের পরিভাষায় 'নেয়ত্ব', বাক্যের প্রসাদগুণ নষ্ট করে। ঐ কথাকেই যদি আর একটু বিস্তার ক'রে বলা যায়,

*　　*　　*　　হরিণোদ্ধৃতা।

ভূঃ খুরক্ষুণ্ণনাগাসৃগ্‌ লোহিতাদুদধেরিতি॥ (কাব্যাদর্শ, ১।৭৩)

'হরি খুরে-ক্ষুণ্ণ নাগের শোণিতে-লোহিত সমুদ্র থেকে ভূমিকে উদ্ধার করেছিলেন,' তা হ'লে ও রকমের কষ্ট-কল্পনা আর করতে হয় না; "উপাত্তশব্দাদেবোপস্থিতির্নিরিত্যর্থ", (১৭) প্রযুক্ত শব্দগুলি থেকেই সম্পূর্ণ অর্থ মনে প্রকাশ পায়।

কিন্তু সামান্য পরীক্ষাতেই দেখা যাবে যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেও শব্দার্থের অতিরিক্ত অনেক কিছুই মনকে কল্পনা করতে হয়। এ 'নাগ' যে অনন্তনাগ, 'হরি'—বরাহরূপী বিষ্ণু, আর 'খুর' হচ্ছে সেই মহাবরাহের খুর—এ সব-ই অর্থের জন্য কল্পনা না করলে চলে না। এবং বিষ্ণুর বরাহ অবতারের

(১৭) কাব্যাদর্শ, ১।৭৩; ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকা।

সমস্ত গল্পটাই মনে আন্‌তে হয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন, সে কথা ঠিক। পদের শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থ দিয়ে সাহিত্যের ভাষা কখনও রচনা হয় না। সন্দর্ভ ও বাক্যের মধ্যে, সংস্থানের কৌশলে, পদের এই 'অভিধা' ভিন্ন অন্য বস্তুকে বোঝাবার, এবং সমস্ত শব্দার্থের অতিরিক্ত বিষয়কে ইঙ্গিতে মনে ফুটিয়ে তোলার যে শক্তি জন্মে,—অর্থাৎ পদের 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা', তারাই হচ্ছে সাহিত্যের ভাষার প্রাণ। কিন্তু প্রসাদযুক্ত রচনায় মনকে কষ্ট ক'রে কিছু কল্পনা করতে হয় না। শব্দার্থ বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই, তার শক্তি ও ইঙ্গিতে, যা কিছু কল্পনীয় তা তৎক্ষণাৎ মনে উদয় হয়। শব্দার্থ-বোধের পর, অর্থের অসঙ্গতি জ্ঞান হওয়ায়, তাকে দূর করার জন্য মনকে খুঁজে পেতে যে কল্পনা করতে হয়—সেই কল্পনাই রচনার প্রসাদগুণ নষ্ট করে (১৮)। মনকে যদি অর্থের জন্য হাতরে বেড়াতে হয় তবে সে রচনার উপর মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। শক্তিশালী লেখকের লেখায় পদের নির্ব্বাচন ও বিন্যাস এমন সুকৌশল যে শব্দগুলির 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনাকে' মনে হয় যেন তাদের 'অভিধা'।

> "নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ
> ক্রিয়ন্তে সাম্প্রতং কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নৈব ত্বশক্তিতঃ।" (কাব্যপ্রকাশ, ৭।৩)।

মন যে চল্‌তি অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে শব্দকে বুঝ্‌ছে, শব্দার্থের অতিরিক্ত বস্তুকে যে সে কল্পনা ক'রে নিচ্ছে, সে কথা মনের মনেই হয় না; কারণ সে জন্য মনের কোনও পৃথক্ যত্ন নেই। কিন্তু এই অভিনবত্বের বিস্ময়ের আঘাতে মগ্ন-চৈতন্যে যে গতির সঞ্চার হয় তার মৃদু দোলায় মন খুসিতে ভ'রে ওঠে।

> The blessed damozel leaned out
> From the gold bar of Heaven;
> Her eyes were deeper than the depth
> Of waters stilled at even; (১৯)

'সায়াহ্নের শান্ত জলের গভীরতার চেয়ে গভীরতর তার চোখের দৃষ্টি'। শান্ত জলমাত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে যে গভীরতা থাক্‌বেই, 'depth' শব্দের অবশ্য তা লক্ষ্য নয়; গভীর শান্ত জলের অতলস্পর্শ গভীরতাকেই পাঠকের মনে আনা ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পদগুলি প্রয়োগ হয়েছে তাতে সে অর্থ বিনা আয়াসে পাঠকের মনে ফুটে ওঠে না। 'Deeper' কথার

(১৮) "যত্র ত্বন্বয়বোধাৎ প্রাগ্‌বাধাদিজ্ঞানেন লক্ষণয়ার্থান্তরোপস্থিতিস্তত্রাপ্যর্থব্যক্তিঃ সম্ভবত্যেব, শক্ত্যেব লক্ষণয়াপ্যুপস্থাপ্যার্থস্যান্বয়বোধ-বিষয়তায়ামবৈলক্ষণ্যাৎ। অন্বয়বোধানন্তরমনুপপত্ত্যুদয়েন কল্পনীয়ার্থস্ত্বেব নেয়ত্বাৎ"।

(কাব্যাদর্শ, ১।৭৪। ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকা।

(১৯) D. G. Rossetti,—"The Blessed Damozel."

মধ্যে সে ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু সে দুর্ব্বল ইঙ্গিত। মনকে একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভেবে নিতে হয় যে এ 'depth' শুধু তিন dimension-এর এক dimension নয়।

It was the rampart of God's House
 That she was standing on;
By God built over the sheer depth
 The which is Space begun; (২০)

এ শ্লোকের 'depth' যে তৃতীয় 'dimension' নয় মনকে তা আয়াস স্বীকার ক'রে ভেবে নিতে হয় না। অর্থের সে আবিলতা থেকে এ 'depth' সম্পূর্ণ মুক্ত। যে প্রচণ্ড দূরত্ব কবির লক্ষ্য,—

So high, that looking downward thence
 She scarce could see the sun.—

তা শব্দগুলির প্রকাশ ও ইঙ্গিতের শক্তিতে, শব্দার্থবোধের সঙ্গে "একেনৈব প্রযত্নেন" পাঠকের মন গ্রহণ করে।

O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes.

হেমন্তের ঝরা পাতার রূপ চার লাইনে দুবার বদল হয়েছে। সে পাতা মরা পাতা, তারা হচ্ছে পাতার ভূত, তারা রোগে বিকৃত-বর্ণ—মারীগ্রস্ত পলায়মান জনসঙ্ঘের মত। কিন্তু মনে কোনও ধাক্কা লাগে না। ওর প্রতি রূপকেই মন স্বীকার ক'রে নেয়, হাঁ এ ঠিক। এ কবিতার অর্থ বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে গেছে পদে পদে। ঝড়ের শক্তির কথা প্রকাশ ক'রে কিছুই বলা হয় নি; কিন্তু presence ও driven দুটি কথার ইঙ্গিতে তার ব্যাপকতা ও বেগ পাঠকের মনে এঁকে যায়। লাল রংএর hectic বিশেষণ তার ক্ষয়-রোগের ছায়া আর সব রং-এর উপর ফেলেছে। এ রোগ মহামারী, নইলে এত পাতা এক সঙ্গে মরে! এ সমস্ত কথাই শব্দার্থের অতিরিক্ত; কিন্তু তাদের কল্পনা ক'রে আনতে হয় না। শব্দের অর্থ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজেরাই ভীড় ক'রে মনের মধ্যে আসে।

(৭)

নিশ্চয়ই সকল লোকের মনে আসে না। কেবল অভীজ্ঞ ও রসজ্ঞ লোকের মনেই আসে। ইঙ্গিতের ইঙ্গিত সকল পাঠকের মন ইঙ্গিতমাত্র

(২০) D. G. Rossetti, 'The Blessed Damozel'

ধর্‌তে পারে না। এবং সে শ্রেণীর পাঠকের কাছে 'সরলতা' থেকে বিভিন্ন যে 'প্রসাদ' তা ব্যর্থ।

সেই জন্য ভিন্ন কালের বা ভিন্ন দেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ মর্ম্ম, ও পূরো রস আদায় করা একরকম অসম্ভব। শব্দের ধ্বনি ও তার অর্থের বিচিত্র-ইঙ্গিত-বাহী পাঠকের মনের যে সব সূক্ষ্ম নাড়ীর উপর লেখকের ভরসা,—দেশে দেশে ও কালে কালে তাদের রকম বদল হয়। বিদগ্ধ সমাজের মনের চেহারা দুই দেশ ও দুই কালে এক নয়; যেমন তাদের মিল, তেমনি তাদের গরমিল। সেইজন্য যে কথার ব্যঞ্জনা এক সমাজের মনে জোয়ারের জলের মত প্রবেশ করে, অন্য সমাজের মনের কাছে সেটা হয় ত allusion-এর প্রত্ন-তত্ত্ব।

> Of man's first disobedience, and the fruit
> Of that forbidden tree, whose mortal taste
> Brought death into the world, and all our woe,

অ-খৃষ্টান পাঠকও এ গাঢ়বন্ধ কবিতার গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করে। কিন্তু আ-জন্ম খৃষ্টান পাঠকের মনের যে সব তারে এ কবিতা ঘা দেয়, অ-খৃষ্টান পাঠক-সমাজের মন নিশ্চয়ই এতে তেমন ক'রে বেজে ওঠে না।

> হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্ম-রণ-বেশে।
> বারে বারে পঞ্চশরে
> অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
> দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
>
> বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
> আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
> মৃত্তিকার কোলে।

মিল্টনের স্বদেশবাসী রসজ্ঞ পাঠক, Old Shiva-র mythology-টা ভাল ক'রে জেনে নিলেও, এ কবিতায় কখনই সে রস পাবে না, যা আমরা পাই।

রচনার অন্য সব গুণের মত, এবং সম্ভব একটু বেশী মাত্রায়, 'প্রসাদগুণ' পাঠকের মনের অপেক্ষা রাখে। এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে যা 'প্রসাদ', অন্য শ্রেণীর কাছে তা হেঁয়ালী হওয়া অসম্ভব নয়। উইলিয়াম জেম্‌সের যে লেখাটি তুলেছি, যে সব পাঠকের ঐ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে একেবারেই পরিচয় নেই, তাঁদের কাছে ওর প্রসাদগুণের ঔজ্জ্বল্য ধরা না পড়াই সম্ভব। উপযোগী পাঠক-সমাজ কল্পনা কর্‌লে,

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা,—৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ যাকে বলেছেন, "অধিকপদত্ব—কষ্টত্বাদি-দোষাসম্বন্ধেন ঝটিত্যর্থোপস্থাপকম্," তার চমৎকার উদাহরণ। তাঁর বাক্যের মধ্যে কখনও নিরর্থক পদ থাকে না, তার অর্থ কখনও কষ্ট-কল্পনা ক'রে আন্‌তে হয় না। আর মনের মধ্যে তার গতি বিদ্যুতের মত, যেমন তার শক্তি তেমনি তার আলো।

"Dr. Spooner নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্ত্তা ব্যক্তি এই ভূমধ্য রাজধানী খনন ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে দেখা যায় যে, তার নীচে ভারতবর্ষ নেই,—আছে শুধু পারস্য। Palimpsest নামক একপ্রকার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে, আর নীচে আর এক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে, তা জাল,—আর নীচে যা লেখা থাকে, তাই আসল। Dr. Spooner-এর দিব্য-দৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট Palimpsest,—তার উপরে পালি কিংবা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে, তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা আছে, তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফার্সি—কেননা, আমরা কেউ তা পড়্‌তে পারি নে! Dr. Spooner-এর কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন্, মান্য করতে বাধ্য,—কেননা, সেকালের কাব্যের যাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের যাদুঘরের কাব্যকে তা করা চলে না।" (২১)।

প্রমথ বাবু দুঃখ করেছেন যে, 'অনেকে তাঁর সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর তাঁর রসিকতাকে সত্য কথা ব'লে ভুল করে' (২২)। এর অবশ্য কারণ যে মুখে রাধাকৃষ্ণ বল্‌লেও, মনে মনে আমরা অনেকেই অদ্বৈতবাদী। আমরা গোপাল ভাঁড়কে জানি, মোহমুদ্গরও বুঝি; কিন্তু 'বীরবল' আমাদের ধাঁধা লাগায়। আর যার গতি আছে তাই যে হাল্‌কা তাতে আর সন্দেহ কি; কারণ যা 'গুরু' এবং 'আবরণক'—প্রাচীনেরা যাকে বলেছেন 'তমঃ'—তাই যে গভীর, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই কোনও সংশয় নেই।

(৮)

আলঙ্কারিকেরা বলেন যে 'প্রসাদ' বা 'অর্থব্যক্তির' শেষ ফল হচ্ছে যে, কথার মুখে বিষয়-বস্তুর স্বরূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে; "বস্তুস্বভাবস্ফুটত্বমর্থব্যক্তিঃ" (বামন)। এবং মনে হয় যেন বস্তুই যাচ্ছে আগে আগে, আর বাক্য যাচ্ছে তার পেছনে।

'পশ্চাদিব গতির্বাচঃ পুরস্তাদিব বস্তুনঃ।
যত্রার্থব্যক্তি হেতুত্বাৎ সোঽর্থব্যক্তিঃ স্মৃতো গুণঃ॥' (বামন, ৩।১)।

(২১) বীরবলের হালখাতা—'প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস'।
(২২) নানা চর্চ্চা—'বীরবল'।

সত্য কথা এই যে, বস্তুও আগে চলে না, বাক্যও পিছিয়ে থাকে না ; ওরা চলে এক-সঙ্গে। কারণ 'প্রসাদগুণের' যেখানে চরম পরিণতি সেখানে বাক্য ও বস্তুর ভেদ লোপ হয়। কিন্তু সে পরিণতি কেবল মহাকবিদের কাব্যেই দেখা যায়। 'যোগাযোগে' কবি 'কুমুদিনীকে' যখন পাঠকদের সাম্‌নে প্রথম আন্‌লেন,—

"দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড ; চোখ বড় না হোক্ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতো চিকণ গৌর ; নিটোল ছুখানি হাত ; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।"

শব্দে-গড়া এই মূর্ত্তি কখন্ যে কাব্য থেকে পাঠকের মনে এসে অক্ষয় হ'য়ে বসে, মন তা জানার সময়-ই পায় না।

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

ভরা বর্ষার ধ্বনি ও সুরের মধ্যে এই বিশ্রব্ধ সুখ-সুপ্তার ছবি কি সহজেই পাঠকের মনে এসে উত্তীর্ণ হয়।

"তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥"

এবং আমাদের মনের পাদ-পীঠে এসে অচল হ'য়ে দাঁড়ালেন,—চিত্তে পাহাড়ের বাঁধে বাঁধা স্রোতস্বিনীর আকুলতা, বেপথুমান দেহযষ্টিতে উন্মুখ অচলতা।

"We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep."

বৈরাগ্য-শতকে নয়, মাত্র ছু-লাইনে—কবি জীবনের যে রূপ দেখাতে চেয়েছেন তা ফুটে উঠেছে ;—স্বপ্নের মত বস্তু-হীন মায়া, স্বপ্নের মতই বিচিত্র ; মৃত্যুর স্বপ্নহীন সুষুপ্তির রহস্য দিয়ে ঘেরা ;—যার উপর মহাকবির বিরাগ বাসনার অতীত করুণ স্নেহ-দৃষ্টি এসে পড়েছে।

রচনার সমস্ত গুণের চরম অভিব্যক্তি মহাকবিদের মহাকাব্যে। কিন্তু সেখানে কোনও গুণের আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সব গুণ ও সব

কৌশল কবি-কর্ম্মের রসায়নে মিলে এক হ'য়ে এ কাব্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষণে যাদের পাওয়া যায় কাব্য তার সমষ্টি নয়। উইলিয়াম্ জেম্‌সের কথায়, "Out of no amount of discreteness can you manufacture the concrete"। কারণ বিশ্লেষণে তফাৎ হ'য়ে তাদের যে রূপ তা তাদের স্বরূপ নয়। কাব্যের ঐক্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যকে মিশিয়ে দিয়েই প্রত্যেক গুণ তার স্বরূপকে লাভ করে। গুণের চরম পরিণতি,—কাব্যের সমগ্রতার মধ্যে তার মুক্তি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য

ফরাসী বিজ্ঞান জার্মান বিজ্ঞান আমেরিকান বিজ্ঞান এমন কথা কেউ কোনোদিন বলে না। ক্রিশ্চান সায়েন্স (Christian Science) বলে বটে, কিন্তু যাকে বলে তা বিজ্ঞানই নয়।

ফরাসী সঙ্গীত জার্মান সঙ্গীত ইতালীয় সঙ্গীত কদাচ শ্রুতিগোচর হয় না, যা হয় তা সঙ্গীত। তবে তার মধ্যে ধারাভেদ আছে। কোনো ধারা হার্মনি-প্রধান, কোনো ধারা মেলডি-প্রধান। উপযুক্ত পরিচয়ের অভাবে ভৌগোলিক আখ্যা দিয়ে পর ক'রে দিবার প্রবৃত্তি থেকে ভারতীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রভৃতি নামকরণ। বহুবিধ সঙ্গীতের স্বাদগ্রহণ যে করেছে সে জানে ধারাগত প্রভেদ প্রকৃতিগত প্রভেদ নয়। তা যদি না হতো তবে শ্রবণকালে তার চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট ও সমান তালে আন্দোলিত হতো না।

চিত্রণে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে ধারাবৈচিত্র্য কখনো কখনো ভৌগোলিক আখ্যা বহন করেছে, কখনো কখনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক অভিধা। সেকালে ছিল Dutch School of Painting, Gothic Architecture, একালে Cubism, Futurism। এক্ষেত্রে ত প্রকৃতিভেদ নেই, তবে পরিচয়ের অভাবে ভারতীয় ইউরোপীয় প্রভৃতি অতিরঞ্জিত উপাধি সুন্দরকে পর ক'রে দেয়।

কেবল সাহিত্যের বেলায় ভৌগোলিক স্বাদেশিকতার সদর্প আস্ফালন, মানসিক প্রাদেশিকতার নির্লজ্জ গৌরব। ইংরেজী সাহিত্য আইরিশ সাহিত্য আমেরিকান সাহিত্য—যত উপভাষা ও উপনিবেশ ততগুলি সাহিত্যের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনা।

এমন যদি হতো যে ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের মধ্যে মূলত কোনো অমিল আছে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন হার্মনি ও মেলডি-ঘটিত অমিল, তবে ভৌগোলিক আখ্যা সঙ্গত না হ'লেও সহ্য হতো। প্রকৃতিভেদ যে নেই তা ফরাসী ও জার্মান সংস্কৃতির মুখপাত্রদের বাণীর তুলনা করলে জানি। প্রভেদ শুধু ভাষার। গোটেও সাহিত্য সৃষ্টি করেন, ভলটেয়ারও। ইনি ফরাসী ভাষার সাহায্যে, উনি জার্মান ভাষার সাহায্যে। শুধু এই এক কারণে একজনের সৃষ্টি ফরাসী সাহিত্য এবং অপরের সৃষ্টি জার্মান সাহিত্য ব'লে পরিগণিত।

কবি নিজের পক্ষে স্বাভাবিক ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করেন। পাঠকের পক্ষে যে ভাষা স্বাভাবিক সে ভাষা হয়তো অন্য। পাঠক পরিশ্রম ক'রে

কবির ভাষা আয়ত্ত কর্‌বে, নতুবা ভাষান্তরিত কাব্য পাঠ ক'রে অন্তত মর্ম্ম-গ্রহণ কর্‌বে। কিন্তু যে কাব্য সকলের তাকে ফরাসী জার্ম্মান ইংরেজী ইত্যাদি গণ্ডীতে পূর্‌লে ফল হয় এই যে তা দলাদলির উপলক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য কোথায় মানুষকে সাহিত্যের ভাব দিয়ে মিলনের আনুকূল্য কর্‌বে, না ভাষার আকস্মিকতাকে শিরোধার্য্য ক'রে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ়তর সীমা-সমন্বিত কর্‌ছে। সাহিত্যের বাহন ভাষা, কিন্তু ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নাম দেওয়া হ'লে গোরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর মতো অদ্ভুত শোনায়।

ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নিবিড় হ'লেও ভাষা ও সাহিত্য এক দরের নয়। ভাষার সম্মান স্বদেশে, সাহিত্যের সম্মান সব দেশে। যেমন রাজার সম্মান, গুণীর সম্মান। রবীন্দ্রনাথের অনেক পাঠক জানেন না যে তিনি বাংলা ভাষার কবি। তাঁরা তাঁকে ভাষান্তর-সূত্রে চিন্‌তে পেরে অভ্যর্থনা করেছেন। এই চিন্‌তে পারা কাজটি দুরূহ। যাঁদের চেন্‌বার ক্ষমতা আছে, যাঁরা সাহিত্যে রস পান, তাঁরা এক বিশেষ জাতের লোক, হোক না তাঁদের দেশ ও ভাষা ভিন্ন। তাঁরা আয়াস স্বীকার ক'রে পরের ভাষা আয়ত্ত ক'রে আপনার কবিকে আবিষ্কার করেন, আবার আপনার কবির বাণী নিজের ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ে আবিষ্কারকে বহুজনসাধ্য করেন।

অন্য জাতের লোক সাহিত্যের মর্য্যাদা বোঝে না। এরা বাঙ্গালী হ'য়েও চণ্ডীদাসের, ইংরেজ হ'য়েও চসারের পরিচয় গ্রহণ করে না; কর্‌লেও মুখে করে, মনে করে না। সাহিত্য এদের আপন নয়, অথচ ভাষা আপন। সাহিত্যকে ভাষার অধীন কর্‌লে এই জাতের লোক তার শাসক হয়, ভারতবর্ষের শাসক যেমন টমি য়্যাট্‌কিন্‌স্‌।

রচনাকে যেমন নির্ব্যক্তিক কর্‌বার উপায় নেই—রচয়িতার ব্যক্তিত্ব তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরোবেই—তেমনি নিষ্পারিপার্শ্বিক করা সম্ভব নয়। স্থান কাল পাত্রের শাসন তাকে মেনে নিতে হবেই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার নদী, নদীচর, নদীকূলের শ্যামল প্রাণনৃত্য, আকাশ, মেঘ, ঋতু-পরম্পরা, বাঙ্গালীর স্বল্পোপকরণ সংকীর্ণ পরিধি, হৃদয়পরিপূর্ণ জীবন-যাত্রা, ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শ ও তার ঐতিহাসিক পরিব্যক্তি—এ সকলের ছায়াপাত ঘটেছে। না ঘট্‌লে অস্বাভাবিক হতো, রচনা অক্ষমতার পরিচায়ক হতো। কিন্তু ঘটেছে ব'লে রচনাকে বঙ্গসাহিত্য নামে অভিহিত কর্‌তে পারিনে। ডব্লিউ এইচ্‌ হাড্‌সন দক্ষিণ আমেরিকার অপরূপা প্রকৃতির অপূর্ব্ব মসীচিত্র এঁকেছেন। ইংরেজী ভাষার উৎকৃষ্টতম গদ্য রচনার নমুনা তাঁর গ্রন্থে। তবু তাকে ইংরেজী সাহিত্য বল্‌তে কুণ্ঠা বোধ

করি। খ্রীষ্টানী ভগবান মুসলমানী ভগবান হিন্দু ভগবান যেমন শ্রুতিকটু এও তেমনি উক্তিকটু ; তথৈব অসত্য।

বৈজ্ঞানিকও নিজ ভাষায় লেখেন। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যে তাঁর রচনার উপর পড়ে না তাই বা কেমন ক'রে বলি ? সম্পূর্ণ objectivity তাঁর পক্ষে কেন, কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দার্শনিকও নিজ ভাষায় চিন্তা করেন, নিজ ভাষায় লেখেন। বৈজ্ঞানিক যদি বা নির্ব্বর্ণ হবার সাধনায় কথঞ্চিৎ সিদ্ধি লাভ করেন দার্শনিক নির্ব্বর্ণ হতে গিয়ে যোগী হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নির্ব্বাক, ইঙ্গিতে যা ব্যক্ত করেন তার বিচার চলে না।

বৈজ্ঞানিককে আমরা বড় জোর বলি জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক, ছেলের নামের সঙ্গে যেমন তার বংশপদবী জুড়ে দিই। এই লেজুড় কোনো বৈজ্ঞানিকের কীর্ত্তির অঙ্গ নয়, তাই Rœntgen Rays বা Raman Effect আলোচনা-কালে কীর্ত্তিমানের নাম উঠ্‌লেও তাঁর দেশ বা জাতি অকীর্ত্তিত থেকে যায়। সত্যিকারের সাহিত্যিক আলোচনাও এই প্রকার। অতি ব্যাপক কালে ও অতি বৃহৎ দেশে সাহিত্যস্রষ্টার বাস ও বিহার। অনায়াসে আমরা কালিদাসের পাশে শেক্সপীয়ারকে বসাই, মিরান্দার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করি। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য-আলোচনা সংস্কৃত ভাষার স্বকীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা লক্ষভ্রষ্ট হয়নি।

অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞান বোঝে না, আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ জার্ম্মান ভাষায় লিখিত হ'লেও অধিকাংশ জার্ম্মানের তাতে প্রবেশ নেই। তাই বিজ্ঞানে স্বাদেশিকতার নর্ত্তন তারাও দাবী করে না, বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেন না। সাহিত্য যে অধিকাংশ মানুষ বোঝে তার প্রমাণ অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচনাতে পাওয়া যায় না। তারা বোঝে ভাষা ও সমাজ, জাতি ও দেশ, এবং সর্ব্বোপরি সংস্কার। বিপদ হয়েছে এই যে সাহিত্যিককে লিখ্‌তে হয় এই সব মানুষের অর্থানুকূল্যের জন্য। সাহিত্যিক যদি বৈজ্ঞানিকের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চেয়ার লাভ ক'রে নিরুদ্বেগ হতো কিম্বা সার্ব্বদেশিক সাহিত্যিকদের যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা গিল্ড্‌ থাক্‌ত তবে তার রচনা বাংলা বা ইংরেজী সাহিত্য না হ'য়ে শুদ্ধমাত্র সাহিত্য হতো। বিজ্ঞানের বিচার করেন বিশারদ, সাহিত্যের বিচার করে যে কেউ দু টাকা দাম দিয়ে একখানা নভেল কিনেছে। রচয়িতা আপত্তি কর্‌তেও পারে না, বাজারে নেমে সে moral right খুইয়েছে।

সাহিত্য বিজ্ঞানের থেকে বয়সে বড় ব'লে, কিম্বা অন্য কোনো কারণে, ভেদরিপুর প্রাবল্য সাহিত্যের ঘরেই বেশী। বৈজ্ঞানিক নিজের ভাষায়

লিখলেও পরের ভাষা সাগ্রহে আয়ত্ত করেন, পরের রচনা অসংকোচে ভাষান্তরিত করেন। বক্তৃতা বা শিক্ষাচ্ছলে দেশে দেশে ঘুরে পরস্পরের সংবাদ নেন। বৈজ্ঞানিক মহলে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা প্রাত্যহিক ব্যাপার। সাহিত্যরাজ্যে কোথায় কি ঘট্‌ছে সাহিত্যরসিকরা তার খবর রাখ্‌তে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকরা সে সম্বন্ধে সাধারণত উদাসীন। তাদের না আছে সহযোগিতা না আছে প্রতিযোগিতা। অবশ্য প্রত্যেক দেশেই চিরকাল তরুণ সাহিত্যিকদের ছোট ছোট মণ্ডলী ছিল, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অখ্যাত শিক্ষানবীশের মিলনমণ্ডলী। প্যারিসের মতো সহরে কিছুকাল থেকে মতবাদের সাম্যকে কেন্দ্র ক'রে পরিণত বয়সের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের বিভিন্ন চক্র গঠিত হয়েছে। এ সকল চক্র কতক পরিমাণে আন্তর্জ্জাতিকও বটে। প্যারিস-প্রবাসীরা যে দেশের সাহিত্যিক হোক ফরাসীদের এই সকল চক্রে যাতায়াত করে ও নিজেদের দেশে ফিরে অনুরূপ চক্র গঠন করে। প্যারিসে ইংরেজ ও আমেরিকান সাহিত্যিকদের উপনিবেশ আছে, চক্রও আছে। কিন্তু চক্রের দ্বারা সহযোগিতা যেটুকু হয় সেটুকু গণ্ডীবদ্ধ; প্রতিযোগিতা যদিও ভয়ঙ্কর ভাবে হয় তা প্রতিবেশী চক্রের সঙ্গে, সুতরাং সেটুকুও গণ্ডীবদ্ধ। উদারমনা সাহিত্যিক চক্রের চক্রান্ত পছন্দ করে না। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিক স্বভাবত free lance। তার সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দলের হুকুম মানে না। কাজেই এক চক্রের লোক অপর চক্রে যোগ দেয়। বড়চক্রের জনকয়েক ছোট চক্র গড়ে। সব হয়, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, হবার অনুকূল সময় পায় না। তাই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসম্পদ তার বিজ্ঞান-সম্পদের তুলনায় নিষ্প্রভ।

বৈজ্ঞানিকের ধ্যানশীলতা, ধ্যানের সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত অবকাশ, দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী, স্বভাষী ও পরভাষী সমধর্ম্মার সহিত দৃঢ়নিষ্ঠ সহযোগিতা ও সদাজাগ্রত প্রতিযোগিতা, নিজের মৌলিকতা পাছে পরের প্রভাবে বিনষ্ট হয় এই আতঙ্ক পরিহার ক'রে পরের রচনার সহিত মূল ভাষায় বা ভাষান্তরে পরিচিত হওয়া, নিরন্তর up-to-date থাকা সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হোক। নতুবা বিজ্ঞানে দর্শনে বাণিজ্যে যানে সংবাদবিনিময়ে, এমন কি রাজনীতিতে শিক্ষানীতিতে ভোজ্যে ও পরিচ্ছদে পৃথিবীব্যাপী একতার দিনে সাহিত্যের গ্রাম্যতা ও গোঁড়ামি হাস্যকর হবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত যথাসম্ভব অনুসরণ করতে বলি। এর অসুবিধা অনেক। প্রথমত বিজ্ঞান-বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁরা ইংরেজী ফরাসী জার্ম্মান ইত্যাদি গোটা কয়েক ভাষাতেই লেখেন; বিজ্ঞানের পাঠকের পক্ষে ঐ কয়টা শেখা শক্ত নয়। সাহিত্যের জন্য নরওয়েজিয়ান থেকে সুরু ক'রে

জাপানী পর্য্যন্ত অসংখ্য ভাষা আয়ত্ত করা যে-কোনো পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিতে তা পারে, কিন্তু সাহিত্যের জন্য নয়, পাণ্ডিত্যের জন্য। বৈজ্ঞানিকের মতো সাহিত্যিক যে গোটা কয়েক ভাষাতেই বক্তব্য পেশ করবে তার সম্ভাবনা নেই। সাহিত্যিকের পক্ষে যেটা পরভাষা সেটা পরধর্ম্মের মত ভয়াবহ। মাতৃভাষাও কারুর কারুর পক্ষে পরভাষা হতে পারে, যথা মনোমোহন ঘোষের পক্ষে। দেশান্তরী হ'য়ে কেউ ভাষা পরিবর্ত্তন করেছেন দেখা যায়, যেমন কন্‌রাড্। কিন্তু পরকীয় ভাষার কসরৎ দেখাতে যিনি আসরে নেমেছেন তিনি বুদ্ধিমান হ'লে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন, নির্ব্বোধ হ'লে মরেছেন। বুদ্ধিমানের উদাহরণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নির্ব্বোধের উদাহরণ আমাদের বহু অধ্যাপক ও সাংবাদিক।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অধিকাংশ ভাষার এজমালি সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিক রচনাকে ভাষান্তরিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের অদলবদল। যে-সব পাঠক পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত তারা বাক্য-যোজনার ভুলে তত্ত্ব বা তথ্য ভুল বোঝে না। সাহিত্যে এক-একটা শব্দের কতরকম প্রয়োগ; দুটো শব্দের pun বা অনুপ্রাস; বাক্যের মধ্যে শব্দসমষ্টির এমন সজীব ও প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ যে অনুবাদকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন, অনুকৃতি করা তো পরের কথা। সাধারণত দু রকম অনুবাদক দেখা যায়। এক, মাছিমারা অনুবাদক। এঁরা দ্বিভাষিক অভিধান আলোড়ন ক'রে শব্দের স্থলে শব্দ বসিয়ে যান। খ্রীষ্টীয় পুঁথির মিশনারীকৃত বঙ্গানুবাদ যে ভাগ্যবানের হাতে পড়েছে তিনি এরূপ অনুবাদ নিশ্চয় উপভোগ করেছেন। অন্য শ্রেণীর অনুবাদক ভাবগ্রাহী। মূল লেখকের ভাবকে যেমন ভাবে প্রকাশ করলে সুষ্ঠু হয় ইনি তাই করতে গিয়ে অনেক সময় এককে আর করেন। রবীন্দ্র-নাথ সেদিন শেলীকৃত "One word is too often profaned"-এর তর্জ্জমার সম্মার্জ্জনা করতে ব'সে তাই করেছেন।

আমার মনে হয় পৃথিবীর যে কয়টি ভাষার সাহিত্যসম্পদ প্রভূত ও পরিবৃদ্ধিশীল সেই কয়টি ভাষায় প্রবেশ লাভ করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। অন্যান্য ভাষায় অধিকার ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। ভাষাশিক্ষা ব্যাপক হ'লে অনুবাদের প্রয়োজন সংকীর্ণ হ'য়ে আসে। শেলীর মূলরচনা পড়্‌তে পেলে অনুরূপ বা প্রতিরূপ পড়্‌তে চায় কে? "মেঘদূত" বা "গীতগোবিন্দে"র অনুবাদ করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অকারণ। আমাদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য পড়েন ও বোঝেন তাঁরা ইংরেজীও জানেন সংস্কৃতও জানেন। অবশ্য বিয়ের উপহার হিসাবে ওসব অনুবাদের বাজারদর

আছে। ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের বাহুল্য থাকায় ইংরেজরা বিদেশী ভাষা শিখ্‌তে গা করে না। তাদের মানসিক দ্বীপ্যতার এও একটা হেতু। কাজেই আমি বাংলা ভাষায় নির্ব্বিচার অনুবাদের পক্ষপাতী নই। ভিক্তর হিউগোর ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ আমাদের এক খ্যাতনামা মাসিকে প্রকাশিত হবার সময় অনুবাদক সম্পাদক ও কম্পোজিটার ছাড়া কেউ কি ও জিনিষ পড়েছে? শুধু কাগজ কালি হরফ ও ডাকটিকিট অপচিত হলো। অনুবাদ কর্‌বার মত বই আমাদের পক্ষে অল্পই আছে। অনুবাদ কর্‌তে চাইলেও তার যোগ্যতা থাকা সব আগে চাই। অনুবাদককে মূল লেখকের সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হতে হবে। দুটো ভাষার উপর দখল তাঁর পাকা না হ'লে চল্‌বে না। অনুবাদ পদে পদে বিষয়াশ্রয়ী হবে ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত যথাযথ হবে। অথচ কাটা কাপড় জোড়া দিয়ে শাড়ী তৈরি করার মত হবে না, আগাগোড়া একটি গোটা জিনিষ হবে, যেন একখানা পাথর কুঁদে একটি মূর্ত্তি। যাঁরা "Spectator" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকৃত "লিপিকা"র ভবানী ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদ পড়েছেন তাঁরা জানেন সত্যকার অনুবাদ কেমন হওয়া উচিত।

তা ব'লে অনুবাদের প্রয়োজন যদি থাকে এবং সে প্রয়োজন জরুরি হয়, তবে উত্তম অনুবাদকের অভাবে অধম অনুবাদককে আমরা উপেক্ষা কর্‌ব না। সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্য হয়নি দেখে দুঃখ কর্‌ব, এই যা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাহিত্যের সম্পদ যে ভাষার ভাণ্ডারে রক্ষিত হোক না কেন সে সম্পদ আমাদের সকলের। ক্যানেডার কোম্পানীতে আমাদের টাকা খাট্‌ছে, ক্যানেডিয়ান ইংরেজী ভাষায় আমাদের কোনো প্রিয় লেখক যদি কিছু লিখে রেখে থাকেন তাকে এক ভাণ্ডার থেকে অন্য ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করা সব সময় সমীচীন নাও হতে পারে।

শ্রীলীলাময় রায়

সায়ামের মন্দির

মন্দিরগুলোই সায়ামের গৌরব। স্বৈরতন্ত্র রাজ্য-কটার মধ্যে একা সায়ামই বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মণদের পুনরুত্থান এবং তার অব্যবহিত পরেই মুসলমানদের হিংসাবৃত্তি, এই দুটো কারণে শাক্যমুনির ধর্ম্মসূত্র ভারতে আজ নগণ্য ; তাতে চীনেরও আস্থা নেই, আর জাপানে লোকাচারের সংমিশ্রণে তাকে চেনা শক্ত। ভারতের দক্ষিণ সীমান্ত সিংহলে, এবং ব্রহ্মদেশে ও কম্বোজে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনো টিঁকে আছে বটে, কিন্তু ইংরেজ আর ফরাসী বিজেতাদের নজরবন্দিতে থেকে, তার সহজ সমারোহটুকু বিলুপ্ত। শুধু সায়ামে মন্দির স্থাপন ও পালনের ঘটাতেই তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সত্য বলতে গেলে এই দেউলগুলো খুব প্রাচীন নয়। রেঙ্গুনের শ্বে-ডাগন অথবা অন্যান্য পাগোডার সৌন্দর্য্যে পর্য্যটকেরা যখন মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে, তখন হয়তো সেগুলোর কাঁচা বয়সের দিকে তাদের লক্ষ্য থাকেনা ; কিন্তু আসলে বালি-ধরানো ইঁটের তৈরি এই ভঙ্গুর মন্দিরগুলো রৌদ্রবৃষ্টির আক্রমণে নিয়তই ভেঙে পড়ে, এবং পুণ্যলোভী ভক্তের কল্যাণে প্রত্যহই পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু খ্মের-স্থাপত্য এই নিয়মের বাইরে, তার উপকরণ স্থায়ী প্রস্তর।

মন্দির, পাগোডা ও ভাট সমস্তই এক প্রতিমাণে নির্ম্মিত। আসলে এগুলি দেবালয় নয়, কেননা বুদ্ধ দেবতা ছিলেননা। অন্তত প্রারম্ভে অধ্যয়নরত পুরোহিত ও পরিব্রাজকদেরকে বর্ষার প্রকোপ থেকে বাঁচাবার জন্যেই এই বাড়িগুলো প্রস্তুত হয়েছিলো। তার পরে হলো সিদ্ধার্থের মূর্ত্তিস্থাপনা, যাতে ক'রে তাঁর নির্দ্দিষ্ট পন্থা অহরহ ভক্তের দৃষ্টিগোচরে থাকে।

বস্তুত পাগোডা একখানি ছাউনী-ঢাকা, চূণকাম-করা, চৌক, সাদাসিদে কুটিরমাত্র। দরজা জানলা সেগুন-কাঠের, তার উপরে গালার কালো পালিশ, তারও উপরে এলোমেলো ছবি, লতাপাতার পুষ্পিত রেখা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি অস্পষ্ট, অস্তব্যস্ত ভাবে ছড়ানো। সায়ামের মন্দিরগুলি চয়নিকার মতো—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রভাব ওই মন্দিরগুলোর মধ্যে একত্রিত। ওই ডিম্বাকৃতি গম্বুজগুলো খ্মেরদের দান ; আবার অতিজীবিত হিন্দুধর্ম্মকে চিরস্থায়ী ক'রে রেখেছে ওই দেবদেবীর মেলা, ওই দ্বারপাল হাতীর দল। চৈত্যগুলোর উৎপত্তি ভারতে, অথচ ছাদগুলো এসেছে চীন থেকে। তবে এই সংমিশ্রণের অনুগ্রহেই একটা স্বকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিতরে সায়ামের সমগ্র ইতিহাস এক পলকে প'ড়ে নেওয়া যায়। দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর দিক দিয়ে চীন থেকে

স্বাধীন থাই জাতি এসে, সায়াম আক্রমণ করে: তাদের তাড়নায় খেমেরেরা পালায় কম্বোজে এবং মনেরা আশ্রয় নেয় ব্রহ্মদেশে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অযুথ্যা-নগরীর পত্তন করেছিলো এই বিজয়ীর দল।

বাঙ্ককের যে দৃশ্যটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, স্মৃতির আহ্বানমাত্রেই যার সাড়া মিলে, সে হচ্ছে সেখানকার মন্দিরের ছাদ। এই ভাঁজ-করা চালগুলো পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে অদ্বিতীয়, অসাধারণ তাদের উর্ব্বরতা। একটা থেকে আরেকটা, তার থেকে আরো একটা, এমনি ক'রে বংশপরম্পরায়, স্তরে স্তরে উঠে ছাদগুলো একটা ছুঁচোলো চূড়োয় গিয়ে ঠেকে। এ-গুলির মুখ্য ভূষণ নাগ, বিস্তৃত-ফণা, উন্নত-পুচ্ছ নাগ; তাদের কাঞ্চনময় নির্ম্মোক স্ফটিকখচিত। প্রত্যেক ছাদই চীনে টালিতে অলঙ্কৃত; কোনোটা বা রৌদ্রে পক্ক শস্যের মতো উদ্দীপ্ত, কোনোটার ঘননীল ছায়ায় চতুর্দ্দিক বিষণ্ণ, কোনোটায় বেগুনীরঙের উপর সবুজ পাড়, আবার কোনোটা কেবল কালো। আশপাশের চৈত্যগুলো বোধহয় এই ছাদসমূহের দর্পহরণ করার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হয়েছিলো। সেগুলোর কোনো-কোনোটা দৈর্ঘ্যে ফুট চল্লিশেক, আকারে লম্বা ধরণের ঘণ্টার মতো; একটা বা শঙ্খাকৃতি, অন্যটা সাদা, কারুর আপাদমস্তক হয়তো সোনালি পাতে ঢাকা। অলিন্দায় অলিন্দায় রঙবেরঙের চীনেমাটির কারুকার্য্য ফুলের মালার মতো তৃপ্তিপ্রদ। প্রাচেদী, স্তূপ, চৈত্য এ-সমস্তই এক জাতীয়, সবগুলিই স্মারকচিহ্নে পরিপূর্ণ, সকলেরই জন্ম সমাধিমন্দির হিসেবে; পার্থক্য শুধু আকৃতির; কোনো-কোনোটি বেশ সুগোল।

এই প্রাণঘন, ছন্দোবদ্ধ অলঙ্করণ, রেখা-রঙের এই স্বচ্ছন্দ লীলা, এই আনন্দময় জীবনের ধর্ম্মনিষ্ঠা, এইগুলিই সায়ামের একান্ত বৈশিষ্ট্য। ভারতের সর্ব্বত্র যে অদ্ভুত উৎপীড়নের আভাস পাওয়া যায়, এখানে তার ছায়ামাত্র নেই, চৈনিক উষরতা এখানে অজ্ঞাত। দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ মিশে সায়ামীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অভিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু ক্যাটাকুমচারী ক্রিশ্চানেরা যেমন ক'রে অরফিউসকে গ্রহণ করেছিলো, তেমনিতর ভ্রাতৃভাবেই এরা ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহারকে কোল দিয়েছে। একদিকে উত্তরাবর্ত্তের চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্ম, অন্যদিকে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর সিংহলী মতবাদ, এই উভয়সঙ্কটে প'ড়ে, সায়াম সিংহলের প্রচারকবর্গকেই বরণ করেছিলো। কিন্তু আদিম টোটেম-পূজার সংস্পর্শে এসে, প্রচারকদের অনুশাসন ক্রমে এতই হৃদয়বান হ'য়ে পড়েছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের করুণাময়-আখ্যা এখানেই যথার্থ সার্থক। ফলে এদের মন্দিরগুলো প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ,—পুরোহিতের দল, শিশুর পঙ্গপাল, প্রাচ্যের কৃপাজীবী অবোধের দঙ্গল, কুকুর, কুষ্ঠরোগী, স্বর্ণবণিক,

ভিক্ষুক, পচা ডিম, পানের পিক, এই সমস্তের অপরূপ সমাবেশে দেউলগুলো জীবন্ত ও মুক্তদ্বার,—এমন-কি য়ুরোপীয়দের যাতায়াতেও বাধা নেই। মুণ্ডিতমস্তক, পীতাম্বর শ্রমণের দল গায়ে প'ড়ে পর্য্যটকের সঙ্গে আলাপ জমায়। সকালে গেলে দেখা যায়, পুরোহিতেরা বিগ্রহের পদপ্রান্তে নৈবেদ্যের মাঝে ব'সে, একসার টানাখোঁপাবাঁধা বাকসর্ব্বস্ব প্রৌঢ়াদের সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত ; কেউ বা কাঠের বালিশ মাথায় দিয়ে মাদুরের উপর শুয়ে আছে, কেউ হয়তো পান চিবুতে চিবুতে, একমনে সুপারীর খোসা ছাড়াচ্ছে। তাদের সকলের মাথার উপর ভগবান বুদ্ধের সুগম, অভ্যস্ত, ক্ষমাশীল উপদেশ-মালা আশীর্ব্বাদের মতো পরিকীর্ণ।

পাগোডাগুলোর ও-দিকে শানবাঁধানো উঠানের পরম্পরা ; এগুলোর অন্ধিতে-সন্ধিতে খেলুর সিংহের দল। পারসিক পূর্ব্বপুরুষদের মতো এদের কেশর ও কুঞ্চিত, গুল্‌ফে গুল্‌ফে কঙ্কণ, গুম্ফের রেখা উদ্ধত, কটিতট বঙ্কিম, দেহ নিবদ্ধ ও তেজস্বী। চতুর্দ্দিক বটের পুণ্য ছায়ায় স্নিগ্ধ ও সরস,—এই বৃক্ষের অগ্রজের আশ্রয়েই বুদ্ধ পরমার্থ লাভ করেছিলেন।

দরজায়, জানলায়, আসবাবপত্রে, সায়ামী-কলার চতুর্দ্দিকে যে জ্যামিতিক রেখাচিত্রের বাহুল্য দেখা যায়, তার আসল অভিপ্রায় জানার জন্যে মন কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। এই উর্দ্ধমুখী রেখাগুলি, এগুলি কি চোখে ধাঁধা দেবার জন্যেই পরিকল্পিত, যাতে সহজ পরিপ্রেক্ষিতের স্বল্পতা পরিপুষ্ট হ'য়ে, উচ্ছ্রায়কে পরিবর্দ্ধিত করে? এই যে সৌধগুলো অনন্যতন্ত্র ধাপে ধাপে উর্দ্ধে চলে গেছে, এই সপ্তস্তর সিংহাসন শাস্ত্রোক্ত সপ্তস্বর্গের মতো ভাসমান, পদ্মারূঢ়, এদের উৎপত্তি কি স্থপতিবিদ্যার মাতৃভূমি বাবিলনে, সেই বাবিলনে যেখানকার বুরুজকে, সেখানকার খিলেনকে আদর্শ ক'রে, ভারতের মন্দিরশিখর একদিন নির্ম্মিত হয়েছিলো।

এখানকার প্রাসাদে রাজা বড় একটা থাকেননা। কামরাগুলোর সাজসজ্জা খুব সুরুচিপূর্ণ নয়, কেবল রাশি রাশি কুরসি-কেদারা আর সারি সারি পিকদান। য়ুরোপে এর জোড়া দেখতে চাইলে লুই ফিলিপের যুগে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু একখানা ঘর আছে, যেখানা দেখার উপযুক্ত। এই পুরাতন সভাগৃহে এখনো দরবার বসে। সোনালি পর্দ্দায় ঘরখানা দুভাগে বিভক্ত, সরালেই একটা সোনার পাট চোখে পড়ে, সেটা আয়ুথ্যার রাজসিংহাসনের নকল। চারদিকে সোনার ছড়াছড়ি, যেন হিন্দুস্থানী রূপকথা পড়ছি। সিংহাসনখানা মাটি থেকে ফুটছয়েক উঁচু, পাশ থেকে একটা হালকা ধরণের পানসীর মতো দেখতে। জলচরের প্রতি এদের নজর যেন একটু বেশী। পদ্ম আর জলজাত লতার জমির উপরে সাত সার দেবদেবীর মূর্ত্তি। এগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে একটা

ছত্রীতে; রাজা তারি নীচে দরবারের দিন ঘটা ক'রে বসেন। তাঁকে ঘিরে থাকে গোল গোল কিংখাপে-মোড়া ছাতার ন-নরী হার। এই সংখ্যাটির কি একটা ইন্দ্রজালিক গুণ আছে, এতে অধিকার স্বয়ং বুদ্ধের আর রাজাদের।

চতুর্দ্দশ লুইর দূত, সিভালিয়ে দ শোমঁ সায়ামরাজের প্রথম সন্দর্শন পেয়েছিলেন এমনি ধরণের আজব জাঁকজমকের ভিতরে। সিংহাসনের অসাধারণ উচ্চতা সেদিনে সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলো আর কি!

এসিয়ার আদবকায়দায় এক রাজার পক্ষে অন্য রাজার পত্র দূতের মারফতে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কাজেই বার্ত্তাবাহকেরা এঁদেরকে নাগালে পায়না। কিন্তু শোমঁ ছিলেন ফরাসী সৌজন্যে লেফাফাদুরস্ত। আমাদের দেশের আচারে রাজদূত রাজারই প্রতিমূর্ত্তি। ফলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞানপত্রটিকে মধ্যস্থের হাতে দিতে রাজি হলেননা। পক্ষান্তরে সিংহাসনটি এত উঁচু যে চিঠিখানাকে স্বয় রাজার হস্তে সমর্পণ করাও অসম্ভব। তখন সায়ামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কন্স্টান্স্,—এই অদ্ভুত জাঁহাবাজটির আসল নাম, কোল্নস্, জাত গ্রীক, পেশা দুঃসাহসিকতা। তিনি চিঠিখানাকে একটা লম্বা ছড়ির আগায় বেঁধে দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সেটা শোমঁর মনঃপূত হলোনা। তিনি ধ'রে বসলেন সিংহাসনখানাকে খাটো করতে হবে। ঔদ্ধত্যের এত বড় দৃষ্টান্ত শুধু দু শ বছর পরে ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যেই দেখা গেছে। ফরাসী রাজ্যের প্রতিনিধিকে মঞ্চারূঢ় করার জল্পনা-কল্পনাও সেদিন চলেছিলো। অবশেষে দরবারের দিনে রাজা সেই ছ-ফুট-উঁচু, গবাক্ষতুল্য সিংহাসনে আবির্ভূত হলেন। তার পরের ব্যাপারটা শোয়াজির জবানীতেই বলি: "রাজদূত পত্রখানা একটা সোনার বাটিতে রেখে রাজাকে নিবেদন করলেন, কিন্তু তাঁর হাত-পায়ে আয়াসের লেশমাত্র দেখা গেলোনা, কাঁধ এক তিল নড়লোনা, ভাবটা যেন রাজা আর তিনি সমস্তরের লোক। দূতের পিছনে নতজানু কন্স্টান্স্ চেঁচিয়ে উঠলেন—তুলে ধরুন, আরো তুলে ধরুন। কিন্তু শোমঁ তাতে বিচলিত হলেন না। শেষকালে রাজাই স্বয়ং জানলা দিয়ে ঝুঁকে, চিঠিখানা তুলে নিতে বাধ্য হলেন।" আর একটি সাক্ষী পাদ্রী তাশার বলেছেন: "তার পরে চতুর্দ্দশ লুইর লিপিখানিকে রাজা কপালে ঠেকালেন; এ-দেশে এটা শ্রদ্ধাসম্মানের পরমচিহ্ন।"

রাজবাগিচার ভিতরে যতই এগুনো যায়, স্তূপের ভীড় ততই ঘন হ'য়ে ওঠে। চৈত্য ও গরুড়স্তম্ভগুলো পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি আরম্ভ ক'রে দেয়, সোনার প্রাচুর্য্যে আর অর্চ্চনার উপকরণে অঙ্গনে তিলধারণের স্থান থাকেনা। মাঝখানের ত্রিকোণ স্তূপটা সোনায় মোড়া, থাকে থাকে

ঢালাই-করা কারুকার্য্য সেটাকে একটা প্রকাণ্ড শঙ্খের আকার দিয়েছে। মধ্যাহ্নের নিদারুণ রৌদ্রে ওটাকে মাঝে মাঝে ক্রেম্‌লিনের সোনার গম্বুজের সঙ্গে গোলমাল ক'রে ফেলছি। পাশের পাগোডাটি চিত্রিত, অরূপ তার সৌন্দর্য্য; কিন্তু ভিতরে দেওয়ালের ছবিতে নোনা ধরেছে; তার ছায়াচ্ছন্ন অন্তরাল থেকে আকাশমুখী দরজা দিয়ে বাইরে চাইলে, আশপাশের সুবর্ণপুঞ্জের খর প্রভা অন্ধ ক'রে দেয়। অদূরে দুজন অসুরতুল্য রক্ষী একটি মন্দিরে পাহারা দিচ্ছে; তাদের কোলে গদা, মুখে স্থানীয় নর্ত্তকদের মতো ভয়ঙ্কর মুখোশ; কিন্তু তাদের আড়ষ্ট হাবভাবে আর সল্‌মাচুম্‌কি-বসানো ছেলেমানুষি উদ্দির জৌলসে মুখ দুখানির ভয়াবহ নিঃসাড়তা একেবারেই ব্যর্থ। স্কেটিং রিঙের মতো পরিমার্জ্জিত মর্ম্মরের দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়। আর একটু গেলেই টাঁকশাল; তার পরেই রাজার গ্রন্থাগার। দুর্ম্মূল্য, মিনে-করা সিন্ধুক-গুলোর রশ্মিতে গ্রন্থালয়ের অন্ধকার উদ্দীপ্ত। মঁসিয় পিলার চেষ্টায় এই জাতীয় আসবাবের কতকগুলো উৎকৃষ্ট নমুনা ১৯২৪—২৫ সনে প্যারিসের সেরনুশি মিউজিয়মে প্রদর্শিত হয়েছিলো। আলমারিগুলি ধর্ম্মগ্রন্থে ভরা; চারিদিকে ছাপা বই, পালি হরফে লেখা ভূর্জ্জপাতার পুঁথি, লিগর কোরটে প্রাপ্ত অমূল্য শিলালিপির ছড়াছড়ি। পাশেই বিরাটাস্থি-পাগোডা। শুধু নাম শুনেই বোঝা উচিত যে এই চীনেমাটির মন্দিরটি হাসির মতোই উজ্জ্বল, হাসির মতোই শুভ্র। এটির আষ্টেপৃষ্ঠে ছাঁচে-ঢালা মালা আর কাঁচে-কাঁটা ফুল। এবম্বিধ অলঙ্করণ দেখা যায় শুধু পারস্যের আর মরোক্কোর মুসলমানী শিল্পের মধ্যে; তবে তার ধরণ একেবারে আলাদা। এই চৈত্যে রাজাদের অঙ্গারিত অস্থি আর ভস্মাবশেষ সোনার জালায় সংরক্ষিত হয়। মানুষের চর্ম্মই শুধু নশ্বর, তাই তাকে ভস্মসাৎ ক'রে, অনৈহিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে সঞ্চিত থাকে কেবল কঙ্কাল।

বাঙ্ককের মন্দিরগুলোর মধ্যে ভাট প্রাকিও-নামক রাজমন্দিরটার জাঁকজমকই সব চেয়ে বেশী। তার কোনো মোহন্ত নেই, কিন্তু একশ বছর ধ'রে প্রত্যেক রাজা তাকে শ্রীমন্ত ক'রে আসছেন। দুষ্প্রবিশ্য শানবাঁধানো উঠানের মাঝখানে প্রহরীমণ্ডপ-জাতীয় একটা উঁচু ছোট ঘর দেখা যায়; তার সমস্তটা সোনা দিয়ে মোড়া, চাকচকো বেনারসী সাড়িও হার মানে। তারি চূড়োয় দেবতাসুলভ ভঙ্গীতে ব'সে, সায়ামরাজ বৎসরে একবার সামন্তবর্গকে দর্শন দিয়ে থাকেন। এই দুরারোহ পীঠস্থানটি দেওয়ালে-বসানো আরসির সাহায্যে আলোকিত।

ভিতরে স্ফটিক ও সুবর্ণ নির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপরে বুদ্ধের বিখ্যাত মারকত মূর্ত্তিটি দেখতে পেলুম। মন্দিরে আলো আসার একমাত্র পথ

একজোড়া ঝিনুকের দরজা। শিলাজতুরঙের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোতে আভ্যন্তরিক অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত। এই অন্ধকারের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতির আকস্মিক রশ্মিতে মূর্ত্তিখানি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির মতো যখন হঠাৎ নজরে পড়ে, তখন বাস্তবিকই মনে হয় তার দৈর্ঘ্য বিরাট, তার অবস্থিতি বুঝি নিরালম্ব শূন্যে। এখানির উপাদান আসলে মরকত-মণি নয়, সূর্য্যকান্তমাত্র, কিন্তু বেশভূষা ম্যাডোনার মতোই পরিপাটী। চার পাশে আরতির দীপ, নৈবেদ্যের থালা; বেদীর পিছনে ভাণ্ডার ও মণ্ডনাগার, কারণ ঋতুর সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। এখানে আগামী গ্রীষ্মের জন্যে উপযোগী সাজসজ্জা প্রস্তুত রয়েছে—কেশবিন্যাসের সোনার জাল, মোতির মালা, আঙটির সারি। বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখার প্রশস্ত উপায় হচ্ছে নীচে থেকে, একটু এক পাশ হ'য়ে দেখা। ওই সঙ্কুচিত স্কন্ধে, কপোলের ওই ললিত রেখায়, ওই উর্দ্ধগামী চোখের কোণে যে অনুপম সৌন্দর্য্য আছে, পশ্চিমের কোনো মূর্ত্তি কোনোদিন তার কাছেও আসতে পারবেনা। ওই সোনায় মোড়া, মিনে-করা অথবা হীরে-বসানো চোখের কিরণ অর্দ্ধমুদ্রিত পল্লবের তলা থেকে এসে যখন আমাদের স্পর্শ করে, তখন জ্যোতির্ম্ময় তপস্যার শিব শান্ত অন্তর্দীপ্তিতে মন যেন উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে। দুর্দ্দৈবের অসংখ্য অত্যাচারেও কি এই যুগযুগান্তব্যাপী সমাধি বিচলিত হয়নি? পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মূর্ত্তিটির দুর্দ্দশা সুরু হয়েছিলো, কিন্তু অজ্ঞাতবাস, ভূগর্ভে অবস্থান, লুণ্ঠন, অপহরণ, লুক্কায়ন, নির্ব্বাসন, নগরধ্বংস ইত্যাদি সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে, মারকত বুদ্ধ আজকে আবার সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাগত।

প্রাসাদপ্রাঙ্গণের বাইরে সব চেয়ে সুদর্শন মন্দির দুটোর নাম ভাট পো আর ভাট শেঙ।

ভাট পো নির্জ্জন তপস্যার নিকেতন। গ্রীষ্মমণ্ডলের আকস্মিক রাত্রির অনতিপূর্ব্বে সূর্য্যের পরাক্রম যখন ম্লান হ'য়ে আসে, তখনই এই মন্দিরে উপস্থিত হবার শ্রেষ্ঠ সময়। সহরের কলকোলাহলের অন্তরে এই দেউলখানি একটি জলাশয়ের মতো, ধর্ম্মঘন শান্তিতে স্নিগ্ধ, বিপুলায়তন বটের পুণ্য ছায়ায় গহন। বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মের সহনশীলতার পরিচয়-স্বরূপ একটা প্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গ হিন্দুকুসংস্কারকে মূর্ত্তিমান ক'রে, বীভৎস উন্নয়নের সাহায্যে অনপত্যাদের আশ্বাস দিতে ব্যস্ত। ভিতরে সুপ্ত বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি দক্ষিণ এসিয়ার অত্যাশ্চর্য্য বস্তুগুলোর অন্যতম। মন্দিরের প্রাকার নিরাভরণ, শুধু চূণকামকরা; এই আড়ম্বরহীনতার পাশে সোনামোড়া দরজা-জানলার জাঁকজমক কেমন যেন চোখে বাজে। ভিতরে প্রবেশ করার পরে কিছুক্ষণ সমস্তই অন্ধকার ঠেকে; একটু পরে

পুরোহিত যেই একটা জানলা খুলে দেয়, অমনি কিসের একটা অসংহত স্তূপ দৃষ্টিপথে ভেসে আসে, ঠিক যেন একটা হাতীর মৃতদেহ। আর খানিক বাদে কক্ষের অপর প্রান্তে আর একটা জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পর্ব্বতটা বুঝি বেড়ে চলেছে, দুর্ব্বার বেগে বেড়ে চলেছে। ভাঙের নেশা অবিকল এই রকমের। এই নিদ্রিত দেবতার আয়তনটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ কিছু সময় লাগে। ভগবান বুদ্ধ কাল সন্নিকট জেনে, ঠিক এমনি অবস্থাতেই মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। মূর্ত্তিটির উপরে চড়া বারণ নয়; কিন্তু সেই বিশাল স্কন্ধে আরোহণ ক'রে মনে হয়, মানুষ সত্যই কীটাদপি কীট, সাধ্য কি এই অনন্ত শয়নে ব্যাঘাত ঘটায়! বিগ্রহের অঙ্গসঙ্গতি স্বভাববিরুদ্ধ বটে, কিন্তু তার ফলে সৌন্দর্য্যের অণুমাত্র হানি হয়নি। প্রভু সুষুপ্ত, তাঁর চক্ষু মুদ্রিত, মস্তক করতলগত, পদযুগ সংলগ্ন, জীবনের ঝড় তাঁকে ভূপতিত ক'রে দিয়ে গেছে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড দেহে কী বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য!

এই অনন্ত শয়নকে প্রদক্ষিণ করতে বেশ কিছু সময় ও পরিশ্রম খরচ হয়। ঘরের সীমান্তে ভগবানের চরণপদ্ম অবস্থিত। পা দুখানি জোড়া, ঝিনুকের আস্তরণে রক্তাভ, মাঝখানে যতির চিহ্ন নেই। স্থানে স্থানে যেমন ফতিমার হাত ও মহম্মদের পাদপূজা চলে, তেমনি এই পা দুখানিও সমগ্র এসিয়ার অর্চ্চনার সামগ্রী। সিংহলে এবং ভারতে কয়েক জায়গায় এই পবিত্র পায়ের ছাপ আছে, সেগুলি তীর্থস্থান। বারাণসীর উত্তর-পশ্চিমে এক শ ক্রোশ দূরে সংকিশ্য-নামক স্থানে প্রথম পদচিহ্নটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। স্বর্গে তিনমাস কাটানোর পরে বুদ্ধ যখন জগতে ফিরে আসেন, তখন তাঁর পা পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শ করেছিলো এইখানেই। পাদপদ্মের মাঝখানে একটি চক্রচিহ্ন দেখা যায়, এটি ধর্ম্মচক্র, কর্ম্মবাদের রহস্যময় কুণ্ডল। আড়ষ্ট অঙ্গুলিগুলিতে কারুকার্য্যের বহুলতা নেই, নরচর্ম্মের অনুকরণে সেগুলি কেবল আবর্ত্তরেখায় ভরা। যাবার আগে মূর্ত্তির মাথার গোড়ায় উঠে, সেই প্রকাণ্ড চিবুকের তলে একবার দাঁড়ালুম। এখান থেকে এই দিব্য বপুর সমস্ত বিস্তারটা নয়নগোচর হয়। মনে হলো জোড়া-পায়ের সমান্তর রেখা-দুটি বিরাট দেহখানিকে যেন অনন্তের দিকে উধাও ক'রে দিয়েছে। একটা অখণ্ড নির্ব্বাণের আবেশে চিত্ত পরিপ্লুত হ'য়ে উঠলো। এই কল্যাণ মিলে শুধু মৃত্যুর উত্তর লোকে, যেখানে রোগ নেই, শোক নেই।

ভাট শেঙ মেনাম-নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জলের এত কাছে ব'লেই, এর প্রকৃত আয়তন প্রতিবিম্বের চাতুরীতে দ্বিগুণ হ'য়ে, দর্শকদের অবাক ক'রে দেয়। ব্রহ্মদেশের লোক আর ভেনিসবাসী, এই দুটি জাতি

জলের সাহচর্য্যে নিজেদের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোর শ্রীবৃদ্ধি করার কৌশলটা যথার্থ আয়ত্ত করতে পেরেছে; তাদের প্রতিফলিত হর্ম্ম্যগুলোকে দেখে ঠিক করা শক্ত, আসলে আর নকলে উজ্জ্বলতার তফাৎ কতখানি। কিন্তু সায়ামীরা এই সহজ সম্বন্ধটাকে উপেক্ষা ক'রে, মন্দিরগুলো নদীর থেকে একটু দূরেই গড়েছে। ফুল ফল, দেব দানব, তারার আকারে গ্রথিত তিন-তিনটে ক'রে হাতী ইত্যাদি নানাবিধ আভরণের সন্নিপাতে ভাট শেঙের চৈত্যগুলোই দেখতে সব চেয়ে ভালো। শস্যপ্রধান দেশের স্থপতি-কলার যেটা প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ ফুল-ফসলের পর্য্যাপ্তি এইখানেই তার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়;—এর পাশে দুষ্ট কল্পনার আতিশয্যকেও মনে হয় সংযত। কোণাচে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা লম্বা ছুঁচোলো থামের তলায়। এইখান থেকে সারা সহরটা চোখে পড়ে। কাছে এলেই চবুতারাটার নিকৃষ্ট মাল-মসলা নজর হয়, চীনেমাটির টুকরো, এমন-কি ষ্ট্রাস্বুর্গের সানকি-ভাঙা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। কিন্তু সে-সমস্তই সিদ্ধ; সমস্ত জঞ্জাল এক হ'য়ে, বিলেতিমাটির সঙ্গে জমে যে-ঝকঝকে, তকতকে, অপরূপ চাতালটির সৃষ্টি করেছে, সেটি অধুনিক শিল্পীদের দুঃসাহসী গবেষণার কথা মনে করিয়ে দেয়। অলিন্দা থেকে সমগ্র বাঙ্কক-সহরখানার উপরে দৃষ্টি চলে। নদীর দুই বাঁকের উভয় কূলে বিস্তৃত এই প্রাচীন নগরটি, পর্ত্তুগীসদের তৈরি পুরানো দুর্গশ্রেণী, শুকনো বাগান, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট খালের সারি, শতনরী ছাদ, এ-সমস্তই যেন মানচিত্রে আঁকা।

সহরতলীর বনে-জঙ্গলে যত মন্দির অনাদরে উপেক্ষায় লুকিয়ে আছে, স্মরণে আজ আবার সেগুলোকে দেখে বেড়াচ্ছি। আমবাগানের গভীর অন্ধকারে, খালগুলোর গোলকধাঁধায় তাদের আবিষ্কার করার কোনো সম্ভাবনা নেই; কিন্তু অজ্ঞাতসারে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময়, পুরোহিত-দের পীতাম্বরের দুর্দ্দমা বর্ণচ্ছটা সেগুলোকে প্রায়ই ধরিয়ে দেয়। এই মন্দিরগুলোর উঠানে চটচটে কাদা,—যেন এইমাত্র জল নেমে গেছে, আর বটগাছ,—এত যে গুণে শেষ করা যায়না। গাছতলাকার মর্ম্মরমঞ্চগুলো চীর্ণ দীর্ণ, প্রাণপণ জোরে নিঃশ্বাস নিলে আঁটসাঁট কোমরবন্ধ এমনি ক'রেই টুকরো টুকরো হ'য়ে ছেঁড়ে। ফাটগুলোকে প্রথমে দেখায় চুলের মতো, ক্রমশ সেগুলো ছিদ্রে পরিণত হয়, শেষকালে যখন গুহায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন হটা ছাড়া মঞ্চগুলোর গত্যন্তর থাকেনা; শ্বেত পাথরের ভারী ভারী বেদীগুলোও শিকড়ের ঠেলায় হেলে পড়ে। চতুর্দ্দিকে তপোবনের প্রশান্তি; অথচ, জাতকের বর্ণনার মতো, সহরখানি অনতিদূরে। বৃক্ষপূজার অতীত যুগকে ভুলতে পারেনি ব'লেই, সায়ামীরা গাছ কাটায় অত কুণ্ঠিত। লিগেশনের সন্নিকটে একটি ফরাসী যাজকের সঙ্গে আলাপ

হয়েছিলো, তার বাড়িটাকে একটা গাছ বেদখল ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পিষে ফেলছে ; কিন্তু সেই উদ্ভিজ্জ গৌরবে হস্তক্ষেপ করায় কারুর সম্মতি নেই।

এই নিভৃত স্থানগুলি নীরবতার বিহারভূমি, এখান থেকে মোটার-গাড়ির হর্ন সুদ্ধ শোনা অসম্ভব। কেবল কতকগুলো বাদুড় নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাও যেন শূন্যের মধ্যে। নদীটা বুঝি মন্ত্রঃপূত, মনে হচ্ছে যাদুকরের আরসির মতো তার জলে অনাগতদের দেখতে পাবো। সাদা-কালো আলো-ছায়ার শানবাঁধানো জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশে একদল কালো বরাহ, অদূরে মন্ত্রোচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনি। যে-ছোট ছেলেটি অল্পক্ষণ আগে আমায় পাখার বাতাস করছিলো, সে এসে মোহন্তের তরফ থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শ্রমণেরা দিনের মধ্যে এক বা দুই বার মাত্র খায়। ভোর হতে না হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে, পথে পথে ভিক্ষা আহরণের জন্যে। ভিক্ষার ভাণ্ডটাকে কেউ নেয় গলায় ঝুলিয়ে ; কেউ দু হাত বাড়িয়ে কোমরের সামনে ধ'রে থাকে। যখন তারা কোনো বাড়ির দ্বারে থামে, তখনো তাদের ধ্যান ভাঙেনা, বা মুখে কথা সরেনা ; সহজ উপায়ে পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে গৃহস্থেরা আপনি এসে তাদের পাত্রে তণ্ডুলকণা ঢেলে দেয়। তারপর কৃতজ্ঞতার নামটুকু অবধি উচ্চারণ না-ক'রে ভিক্ষুর দল মঠে ফিরে আহারে ব'সে যায়। তারা যখন আবার বাহির হয়, তখন বেলা প'ড়ে আসে ; কেউ হয়তো বগলের তলে একটা প্রকাণ্ড ছাতা নিয়ে চলে, কারুর সঙ্গে থাকে একটা ধামাজাতীয় জিনিষ; কিন্তু অভ্যস্ত মূকতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনা। ভিক্ষুদের পবিত্র পীতাম্বর চাকচক্যে স্থানীয় ট্রামকেও হার মানায় ; জলে স্থলে সর্ব্বত্রই এই অভিরাম বর্ণচ্ছটা ; কিন্তু ধাবন আর বয়সের তারতম্যে এই অভিন্ন রঙটি বৈচিত্র্যময়,—বর্ণগ্রামের এক পাশে কাঁচা সোনা, অন্য পাশে শুকনো খড় ; একদিকে অতসী ফুল, অন্য দিকে মুরগীর ডিম ; এক প্রান্তে গেরিমাটির মলিনতা, অপর প্রান্তে ক্যানেরির জাঁকালো জৌলস। এই হলদে রঙটির মূল কথা হচ্ছে যে ভারতে ওটি অন্ত্যজদের রঙ ; সেইজন্যেই বুদ্ধ তাঁর রাজসিক পরিচ্ছদটির বিনিময় করেছিলেন পীতাম্বরের সঙ্গে। শ্রমণসঙ্ঘ স্বেচ্ছাসেবকের সমাগমে পুষ্ট ; আমরণ সঙ্কল্প না-ক'রেও এ-দেশে পুরোহিত হওয়া সম্ভব। ভিক্ষুরা ঠিক নিঃস্ব না-হ'লেও মাত্র আটটা জিনিষে তাদের অধিকার আছে : তিনখানা বস্ত্র, একটা ভিক্ষাভাণ্ড, একখানা ক্ষুর, গোটা-কতক ছুঁচ, একটা ছাঁকনি এবং একটা কোমরবন্ধ। সময়ে সময়ে কোনো-কোনো শ্রমণকে একখানা হাতপাখার আড়ালে এই পাপস্পর্শ সংসারকে ঠেকিয়ে রাখতেও দেখেছি। তাদের মুণ্ড ও ভ্রূ বহু ক্ষৌরির ফলে নীলাভ।

ধর্ম্মের নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রত্যেক সায়ামবাসীই জীবনের কয়েক মাস মঠের অন্তরালে কাটাতে বাধ্য। এই অবশ্যপালনীয় ধর্ম্মজীবন আমাদের দেশের অবশ্যকরণীয় শস্ত্রশিক্ষার মতো। দীক্ষারম্ভের দিনটা খুব ঘটা-ঘটির দিন; আত্মীয়-কুটুম্বেরা দল বেঁধে দীক্ষার্থীকে মঠে রেখে আসে; সেদিনে চাচক্র বসে যায়, গোলাপী চূণ ও পানের বিনিময় চলে; আগন্তুকের মূল্যবান বসন স্বয়ং বুদ্ধের শুক্লাম্বরের অনুকরণ করে। তার পরে গলায় ভিক্ষার ভাণ্ড বেঁধে দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার কোনো সংক্রামক ব্যাধি বা ঋণ আছে কিনা। এই সমস্ত অনুষ্ঠান সাঙ্গ হ'লে, তবে তার পীতাম্বরে অধিকার জন্মায়। তখন তাকে পণ করতে হয় যে তার হাত দিয়ে কখনো প্রাণীবধ হবেনা, সে চুরি করবেনা, মিথ্যা বলবেনা, সুরাপান করবেনা, নাচবেনা, গাইবেনা, জুয়া খেলবেনা, তার ব্রহ্মচর্য্য নিয়ত অটুট থাকবে, তার দেহকে আভরণ বা গন্ধদ্রব্য কখনো স্পর্শ করবেনা, তার শয্যায় আড়ম্বর দেখা যাবেনা, অর্থকে সে অশুচি ব'লে পরিহার করবে। ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া, পা মেলে বসা, কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করা, বাণিজ্যে মন দেওয়া, ভুক্তাবশিষ্ট সঞ্চয় করা, শাস দেওয়া, মাল্যধারণ করা, একজনকে অপরের চেয়ে প্রিয়তর ব'লে ভাবা, এ-সমস্তই তার পক্ষে নিষিদ্ধ। বুদ্ধের আদেশে সে ধ্যাননিরত থাকতে বাধ্য। এই দুঃখময় জগৎ, মানুষের জঘন্য প্রমোদপরায়ণতা এবং এই অনিত্য সংসারের মালিন্য, এই তিনটি বিষয়ই তার একান্ত ধ্যেয়। দেখা গেছে তার ব্রত সহজ। আমাদের ক্যাথলিক বৈরাগীরা যেমন কল্পনা ক'রে থাকে যে ধর্ম্মার্থে, সদাচরণের খাতিরে তারা সমাজবিবাগী, শ্রমণদের ভ্রান্তিও তদনুরূপ। আসলে তাদের সন্ন্যাস খুব কঠোর নয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে জীবন এতই স্বল্পাঙ্গ, তার উপকরণ এতই সামান্য, দারিদ্র্য এতই সার্ব্বজনীন, বৈষয়িক বা যৌন প্রবর্ত্তনাগুলো এতই বিরল ও ক্ষণস্থায়ী যে গার্হস্থ্য এখানে ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে পা মিলিয়েই চলে।*

পল মোরাঁ

* Paul Morand-র Rien que la Terre-নামক ভ্রমণপুস্তকের Les Temples-নামক পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

সমষ্টি-বিজ্ঞান ও বস্তুর সমষ্টি-গণিত

নবা বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব তত্ত্ব স্ব স্ব প্রতিপত্তি নিয়ে মাথা তুলে উঠেছে তাদের অন্যতম হ'ল সমষ্টি-গণিত—Statistical Mechanics। Statistics-এর নামে প্রথমেই সাধারণের মনে আদম-স্থমারি ও তার কীর্ত্তি-কলাপের কথা জেগে ওঠে। গল্প শুনেছিলাম, একবার ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার গোধন নিরূপণের প্রস্তাব গৃহীত হ'লে জেলার এক ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁর এক চতুর দারোগার ওপর এর ভার অর্পণ করেন। দারোগাবাবু একদিন সকালে গ্রামের গোচারণ মাঠে গিয়ে গরুর সংখ্যা গুণে ফেলেন। তারপর বাকিটা সরল ত্রৈরাশিকের হিসাব;—সেবার বাংলার গোধন নিরূপণ কতকটা এইভাবেই সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এটা কৌতুক মাত্র কিন্তু শুধু গ্রামের দারোগাবাবু কেন বৃহত্তর সমাজেরও অনেকেই এই শ্রেণীর গণনাকে এখনও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই শ্রেণীর গণনাকে আর তিলমাত্র অবজ্ঞা করবার উপায় নেই, Statistics-ই বলুন আর সমষ্টির হিসাবই বলুন—এ হিসাব আজ আমাদের জীবনযাত্রা ও আলোচনার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার অসামান্য অধিকার বিস্তার করেছে। Statistical Mechanics বা সমষ্টি-গণিতও এই ব্যাপারের পুনরুল্লেখ ক'রে বলছে যে, শুধু ব্যষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে বিজ্ঞানের আর চলছে না, তাকে সমষ্টির স্বতন্ত্র নিয়ম-লক্ষণাদির হিসাব-নিকাশ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হতে পারে যে, ব্যষ্টির বিধান যদি সর্ব্বৈব জানা থাকে তবে সমষ্টির আচরণ জানতে বাকি রইল কি? এ কথার উত্তরে বলতে হয় যে, সমষ্টির স্বাধীন লক্ষণাদি ধরা পড়েছে বলেই বিজ্ঞানকে আজ সমষ্টি স্বীকার করতে হয়েছে। এমন কি, এ কথা বল্লেও অন্যায় হবে না যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন ব্যষ্টির সমূহের প্রতি সমষ্টি-গণিত খাটানো সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ সে ব্যষ্টিকে প্রাণ খুলে ও সুসম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা বিজ্ঞানের পক্ষে আজ দুরূহ হ'য়ে পড়ছে। বস্তুর সমষ্টি-গণিতে এ কথার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মোট কথা এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুটিই আজ আমাদের জাগতিক তত্ত্বালোচনায় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি গণনার প্রভাব সম্বন্ধে বেশী কথা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, Ecology প্রভৃতি সবই সমষ্টির প্রতি আমাদের মনোনিয়োগের প্রচুর পরিচয় দিচ্ছে। পদে পদে আমরা সমাজ ও সংঘকে ব্যক্তি থেকে পৃথক ক'রে দেখি। স্বদেশ ও সংঘের কাছে ব্যক্তির স্বার্থ প্রতিনিয়ত হেলায় আত্মবলি দিচ্ছে।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমষ্টিহিসাবের একটা সুন্দর উদাহরণ সংক্রামক রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থায়; এ ব্যাপারে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ কিসে রোগীরা এক-একটি ক'রে ভাল হ'য়ে ওঠে এ বিষয়ে লক্ষ্যের চেয়ে কিসে রোগ বেশী ছড়িয়ে না পড়ে এ বিষয়ে লক্ষ্য বেশী। একদিকে যেমন রোগীকে ভাল করবার জন্য পরীক্ষায়, ওষুধ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি উন্নত প্রণালীতে সজ্জিত হচ্ছে, আর একদিকে তেমনি রোগ, তার ফলাফল ও তার ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে দেখবার চেষ্টায় হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্ট, Malaria Survey, Tuberculosis Research প্রভৃতি গ'ড়ে উঠছে। এ সবের প্রধান লক্ষ্য কি ক'রে রোগকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে আনা যায়।

সমষ্টি-গণিতের প্রসঙ্গে এ সব কথা হয়ত একটু অবান্তর কেননা এ সব প্রচেষ্টায় একটা উদ্দেশ্য, সহযোগিতা ও ইচ্ছাশক্তির খেলা আছে যা বস্তুজগতে নেই। সমষ্টি-গণিতের যেটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত তা হ'ল এই যে, ব্যষ্টির লক্ষণ ও আচরণের গড়পড়তা হিসাব নিয়ে সমষ্টির লক্ষণাদি জানবার প্রয়াস না ক'রে, তা মৌলিক উপায়ে জানবার প্রয়াস করা। কেননা সকল সময় ব্যষ্টির প্রত্যেকটির লক্ষণ ও অবস্থা জানা অসম্ভব, অথচ স্বাধীন উপায়ে সমষ্টির এমন সব লক্ষণ হস্তগত হতে পারে যা থেকে পরিশেষে ব্যষ্টিরই অনেক প্রধান ও প্রয়োজনীয় তথ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়।

ম্যাক্সওয়েলের আগে পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ ব্যষ্টির দিকে। তখন বিজ্ঞানের সঙ্কল্প ছিল কতকটা এই রকম:—আলোচ্য বস্তুর খণ্ডিত ভাগগুলির পৃথক পৃথক সংস্থান ও আচার-ব্যবহার নির্দ্দেশ ক'রে দাও, তাহলে বিজ্ঞান সমস্ত অখণ্ড জিনিষটির নাড়ী-নক্ষত্র স্থির ক'রে দেবে। এ রকম টুকরো ক'রে দেখার পরিণতি অণু-পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রণ-এর আবিষ্কারে। বিজ্ঞান যে এ ব্যাপারে অনেকটা সফল হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। শুধু আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যের সুচারু ব্যাখ্যা হাজির ক'রে নয়, বিজ্ঞান এই উপায়ে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও আমাদের সুখ-সুবিধা প্রসার করবার চমৎকার আয়োজন করেছে। যদি অণু-পরমাণুর রহস্য বিজ্ঞানের অজ্ঞাত থেকে যেত তাহলে আজ পৃথিবীর চেহারা কি রকম হ'ত সে বিষয়ে একটা মানস চিত্র তৈরী করা অসম্ভব হবে না। যে সব আবিষ্কার দৈবক্রমে সিদ্ধ হয়, সেগুলি নিশ্চয় আয়ত্ত হ'ত কিন্তু যেগুলি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় আয়ত্ত হয়েছে সেগুলি পিছিয়ে পড়ত, সন্দেহ নেই। লৌকিক অনেক কাজই হয়ত ওয়াট্‌সের ষ্টিম এঞ্জিনে সম্পাদিত হ'ত কিন্তু ঠিক প্রয়োজনসাপেক্ষ গুণসম্পন্ন ইস্পাতের অভাবে শত সহস্র অশ্বশক্তির (Horse-power) এঞ্জিন ও লোকোমোটিভের

বহুল প্রচলন হ'ত না। এ রকম সুপরিণত মোটরকার ও এখনকার অতি-পরিচিত যন্ত্রপাতির উদ্ভব হতে যুগ যুগ অবসান হ'ত। ম্যাঞ্চেষ্টার বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ যন্ত্রচালিত তাঁতের সাক্ষাৎ পেতে পৃথিবী শেষ দশায় উপনীত হ'ত;—কাপড় ও সূতার মোহনীয় রঙ ও ডিজাইন-বৈচিত্র্য স্বপ্নলোকের বিভব থেকে যেত; এয়ালিকের স্যালভার্সান ও ব্রহ্মচারীর "ষ্টিবুরিয়া"র জন্ম হ'ত না। অনেকে হয়ত জানেন না যে আজকের রেডিও ও টকি আবার এদিকে এক্স-রে ইলেক্‌ট্রণ আবিষ্কারের অব্যবহিত ফল। একদিকে বরাতে পাওয়া আবিষ্কার আর একদিকে বিজ্ঞানের ফরমাসী আবিষ্কার।

বলা যেতে পারে যে Dynamics হ'ল ব্যষ্টির গণিত যেমন সমষ্টির হ'ল Statistical Mechanics। ব্যষ্টির চালচলন নিরূপণ করবার প্রয়াসে গ্যালিলিও নিউটনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গতিগণিত যে সব প্রশ্ন ও সমস্যাপূরণ ক'রলে তা বলতে গেলে একেবারে চরম, কেননা তা শুধু পার্থিব ব্যাপারে নয়, অন্তরীক্ষে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদের বেলাতেও পূর্ণভাবে ফলিত হ'ল। যা একটু ত্রুটি ছিল আইনষ্টাইন তা তাঁর আপেক্ষিকগণিত (Relativity) দিয়ে সংশোধিত ক'রে দিলেন। কেবল যে পদার্থ,—যার রূপ আছে, মাপ আছে, সীমা আছে, রং আছে, ভার আছে—এর ক্ষেত্রেই যে শুধু গতিগণিত প্রযুক্ত হ'ল তা নয়,—আলোক, যার আকৃতি নেই, মাপ নেই, অবয়ব নেই, যাকে মুঠো ক'রে ধরতে যাওয়া বিফল—যা' শুধু "পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়," তাকেও বৈজ্ঞানিক গতিশাস্ত্রের অধীন ক'রতে সমর্থ হ'লেন। আলোকে গতিগণিতের নিয়োগকর্ত্তার প্রধান পুরোহিত হাইগেন্স তখন তন্ময় হ'য়ে বলেছিলেন—"গতিগণিতই হ'ল একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিদান, জগতের যা কিছু সমস্তকিছুকেই এর বশবর্ত্তী কর, না পার তার তত্ত্ব নিরূপণের আশা জলাঞ্জলি দাও।" গতিগণিতের এ একাধিপত্য প্রথম খর্ব্ব করলেন ম্যাক্সওয়েল, সমষ্টি-গণিত প্রয়োগ ক'রে। আধুনিক কালে গতিগণিতের ব্যতিক্রম ইলেক্‌ট্রনের আচরণেও দেখা দিয়েছে।

শুদ্ধগণিতে সমষ্টিগণনা যে আকারে দেখা দিয়েছিল সে হ'ল বীজ-গণিতের Law of Probability, যাকে আমরা ব'লব সম্ভাবনামিতি। এর পরিচিত উদাহরণ চাঁদমারিতে রাইফেল বন্দুকের গুলি লাগার সম্ভাবনা নিরূপণে। সম্ভাবনামিতির একটা আদিসূত্র হ'ল এই যে, যদি কোন ঘটনা ণ ও ন এই দুই উপায়ে সম্ভাবিত হয় তবে প্রথম উপায়ে ঘটবার সম্ভাবনা $\frac{ণ}{ণ+ন}$, দ্বিতীয় উপায়ে ঘটবার সম্ভাবনা $\frac{ন}{ণ+ন}$। ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়ম প্রভৃতির হিসাব সম্ভাবনামিতির নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়।

পদার্থবিজ্ঞানে সমষ্টিগণনার প্রথম প্রয়োগ করলেন ম্যাক্সওয়েল।

তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল তাপবিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে। তাপবিজ্ঞানের মতে বস্তুর তাপ তার অণুর গতিজনিত। গ্যাসের অণুরা মুক্ত ও অতি প্রচণ্ডগতিতে ধাবমান, পক্ষান্তরে কঠিন ও তরল বস্তুর অণুরা নৈকট্যের দরুণ পরস্পারের আকর্ষণে বদ্ধ ও শুধু একরকম আণবিক কম্পনে কম্পিত হ'তে সক্ষম। অণুদের এই সব গতি ও কম্পনের হিসাব ধ'রে বিভিন্ন বস্তুর ও মূল পদার্থের যাবতীয় আচরণ ব্যাখ্যা করা তাপবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। গ্যাসের অণুরা মুক্ত ব'লেই গ্যাসকে আধারে আবদ্ধ ক'রে না রাখলে ধ'রে রাখা যায় না। তার তাপ যত বাড়ে তার অণুর গতি, গতিলব্ধ শক্তি ও তার আয়তন সেই অনুপাতে বাড়ে। গ্যাস-অণুর গতিলব্ধ শক্তি কত বেশী হ'তে পারে তার প্রমাণ যে কোন বিস্ফোরণে। তেমনি শৈত্যে গতি, আয়তন ও গতি-শক্তি সঙ্কুচিত হয়, তাপবিজ্ঞান এমন শৈত্য অনুমান করে যাতে তিনটি লক্ষণই সঙ্কুচিত হ'য়ে শূন্যে পরিণত হবে। এই অবস্থার নাম Absolute Zero বা মহাশূন্য। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মহাশূন্যের ২১৩ ডিগ্রীর কাছাকাছি পর্য্যন্ত যাওয়া গিয়েছে। ঠিক এই রকম ভাবে কঠিন বস্তুও তাপে আয়তন-বৃদ্ধি লাভ ক'রে, ও বৰ্দ্ধিতহারে আণবিক কম্পন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ উত্তপ্ত হ'য়ে প্রথমে লাল, ক্রমশঃ কমলা, তারপর শাদা জ্যোতিতে প্রভান্বিত হ'য়ে ওঠে। ইস্পাত ও চুল্লীর উত্তপ্ত বর্ণ দেখে তার টেম্পারেচার নিরূপিত হয়। ঠিক এমনি বর্ণ-বিশ্লেষণ ক'রে জ্যোতিষ্ক ও তারকা নীহারিকার টেম্পারেচার নিরূপিত হ'চ্ছে। উত্তপ্ত হ'তে হ'তে ক্রমে অণুদের বন্ধন মুক্ত হয়ে তা তরল ও তরল থেকে গ্যাসে পরিণত হয়। প্রফেসার সাহা দেখিয়েছেন যে উত্তাপ এমন হ'তে পারে যে, অণুরা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে তাদের শেষ উপাদান ইলেকট্রণ ও প্রোটনে বা ইলেকট্রণ গ্যাসে পর্য্যবসিত হয়। আধুনিক জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানে—Astro-physics—সাহার এই গণনা নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে।

অণুদের এই যে সমাবেশ একেই ম্যাক্সওয়েল সমষ্টিহিসাবে গণনা করার প্রস্তাব ক'রলেন। তিনি দেখালেন, গ্যাসে সমষ্টির একটা লক্ষণ আয়ত্ব করা যেতে পারে যার নাম Distribution অর্থাৎ বণ্টনহার। কিসের? অণুদের গতির। অর্থাৎ কতগুলি গ্যাস-অণু থাকতে পারে যারা নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট গতির অনুগমন করে। বণ্টনহারের তাৎপর্য্য কি রকম হ'তে পারে তা বোঝবার জন্য আমরা এখানে একটা উদাহরণ দেওয়ার প্রস্তাব করি। মনে করুন, ছাত্ররা সমষ্টি-গণিত বোঝবার উপযুক্ত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য একটা পরীক্ষা করা গেল ও ধরা গেল যারা শতকরা ৬০ পাবে তারা সমষ্টি-গণিত পাঠের উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবে। পরীক্ষা-ফলের একটা গড়পড়তা ক'রে দেখা গেল যে তা দাঁড়ায় শতকরা পঞ্চাশে।

তাহলে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত হ'ল না। তার পর বণ্টনহার থেকে দেখা গেল যে, শতকরা ২০ ভাগ ছাত্র শতকরা ৮০ নম্বর পেয়েছে ও বাকি ৬০ ভাগ ছাত্র শতকরা ৩০ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য বাধা না থাকলে, ক্লাসে সমষ্টি-গণিত পড়ানো সঙ্গত ব'লে বিবেচিত হতেও পারে। আমাদের দৃষ্টান্তটি খুব স্থূল: তাহলেও এটা নিরর্থক নয়। যা হ'ক্ এই রকম ম্যাক্সওয়েলের বণ্টনহার থেকে কয়েকটি মূল্যবান নিয়ম ধরা পড়ল, যথা, একটি হচ্ছে অণুদের গতি বিভিন্ন ও ভিন্নমুখী হ'লেও তাদের শক্তি সমান সমান। আর একটা অতি মূল্যবান তথ্য তিনি বার করতে পারলেন সে হচ্ছে গ্যাস অণুদের পাড়ি—Mean free path—কতখানি। অর্থাৎ অণু গড়পড়তায় কতদূর যাবার পর অন্য অণুর সঙ্গে সংঘর্ষে উপস্থিত হয়। ম্যাক্সওয়েলের এ সব আবিষ্কার শুধু তাঁর মস্তিষ্কের অসামান্য উর্ব্বরতা-জ্ঞাপক কালি-কলমের হিসাব নয়;—এ সব, অর্থাৎ গতির বণ্টনহার, অণুর পাড়ি, শক্তির সমতা,—ষ্টার্ণ, বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা কঠোর পরীক্ষায় যাচাই করা সত্য। এ বিষয়ে আর একটু বলা দরকার যে এ সব গণনায় ম্যাক্স-ওয়েল যা স্বীকার্য্য ব'লে ধরে নিয়েছিলেন তা অতি নগণ্য; যথা (১) অণুরা স্থিতিস্থাপক গোলক, সংঘর্ষে তাদের শক্তির অদলবদল হয় কিন্তু অপচয় হয় না, (২) গতিমুখ নির্ব্বিশেষে গতির বেগ সমান, (৩) সমান আয়তনে সমান সংখ্যক অণু বিরাজ করে। এটা লক্ষ্যের বিষয় যে, ব্যষ্টিসম্বন্ধে কতটুকু মাত্র স্বীকার্য্য ধরে নিয়ে সমষ্টিসম্বন্ধে কত মূল্যবান তথ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

সমষ্টি-গণিতের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণটি ধরা পড়েছে তাপকে ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে। তাপ ও ক্রিয়া মূলে এক, উভয়েই শক্তির (energy) ভিন্ন রূপ; তাপকে ক্রিয়ায় ও ক্রিয়াকে তাপে পরিণত করা যায়—তাতে শক্তির ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না। তাপ-বিজ্ঞানে বলে, বিশ্বের সমস্ত শক্তির পুঁজিতেও ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, কেবল রূপান্তর হ'য়ে এই বিশ্বলীলা প্রকাশ ক'রছে। কিন্তু তাপকে ক্রিয়ায় পরিণত করতে হ'লে উত্তপ্ত স্থান থেকে অনুত্তপ্ত স্থানে তাপকে পরিচালন করতে হয়। বিপরীত মুখে অর্থাৎ শীতল স্থান থেকে উত্তপ্ত স্থানে তাপ চালনা ক'রে কাজ আদায় হয় না বরং উল্টে কাজ ব্যয় করতে হয়। জগতের অধিবাসীর কাছে এর তাৎপর্য্যটা বড় জরুরী। যতদিন বিশ্বে উত্তপ্ত স্থান থেকে শীতল স্থানে তাপ চালনার সম্ভাবনা আছে—অর্থাৎ যতদিন বিশ্বে উত্তাপের অসমতা আছে, ততদিনই বিশ্বে ক্রিয়া সাধ্য হবে, যন্ত্রপাতি চালানো সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বে ও আমাদের যন্ত্রপাতিতে ক্রিয়া উৎপাদিত হ'য়ে উত্তপ্ত স্থান ক্রমে শীতল হ'য়ে আসছে। যেদিন বিশ্বে সমস্ত সমান

উত্তাপে পরিণত হবে সেদিন ক্রিয়া ও সৃষ্টি বন্ধ হবে। পক্ষান্তরে আমরা বিনা ক্রিয়ায়—অর্থাৎ বাইরে থেকে ক্রিয়া আনয়ন না ক'রে, যদি শীতল স্থান থেকে তাপকে উত্তপ্ত স্থানে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে বিশ্বের ক্রিয়া উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু যে কোন বস্তুসমাবেশই ধরা যাক্ না তার উত্তাপ আসছে শীতল হ'য়ে, কাজেই তার ক্রিয়াদানের অক্ষমতা যাচ্ছে বেড়ে; এই বন্ধ্যাত্বের নাম 'এণ্ট্রপি'। বিশ্বের শক্তি চির অক্ষুণ্ণ কিন্তু তার বন্ধ্যাত্ব ক্রমশ বর্দ্ধমান।

এই বন্ধ্যাত্ব বা 'এণ্ট্রপি' সমষ্টি-গণিতের দ্বিতীয় লক্ষণ: বাস্তবিক সমষ্টি-গণিতের প্রধান অনুসন্ধান দুটি জিনিষ নিয়ে, এক হ'ল বিভিন্ন বস্তুসমাবেশের বন্ধ্যাত্ব নির্ণয় আর এক হ'ল বণ্টনহার নির্ণয়। এ-বিষয়ে অর্থনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা সাদৃশ্য আছে। অর্থনীতিও দুটি জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায়—একটা অবশ্য বণ্টন, দ্বিতীয় ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল ও এণ্ট্রপিতে এই তফাৎ যে প্রথমটিতে বন্ধ্যাত্ব নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে।

গ্যাসের কথা ধরা যাক্। গ্যাসে অণুরা বিচঞ্চল, বস্তুত বিশৃঙ্খল; এ রকম ক্ষেত্রে একস্থান থেকে আর এক স্থানে তাপ পরিচালন বা ক্রিয়া আদায় হতে পারে না। কাজ আদায় করা যেতে পারত যদি সমস্ত অণুর গতিমুখকে একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হ'ত। ম্যাক্সওয়েল্ আর এক উপায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, যদি দ্রুতগতি অণুগুলিকে লঘুগতি অণু থেকে পৃথক করা যায় তাহলে দ্রুতগতির দল থেকে লঘুগতিদের দিকে তাপ চালনা করা ও ক্রিয়া আদায় করা সম্ভব। এর জন্য তিনি এক অলৌকিক ক্ষমতাবান জিনকে কল্পনা করলেন যে ফাঁদ পেতে ব'সে থেকে গ্যাসের দ্রুতগতি অণুগুলিকে একটা বিভিন্ন কামরায় আবদ্ধ ক'রে বৈজ্ঞানিকের হাতে এনে দেবে। পদার্থবিদ্যায় ম্যাক্সওয়েলের জিন আরব্যোপন্যাসের জিনের মতই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে,—কিন্তু গল্পে। মোট কথা বস্তুসমাবেশের উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার উপায় নেই; শৃঙ্খলা থাকলে পরে সে অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হ'য়ে শ্রম বা কাজের প্রকাশ হতে পারে কিন্তু বিশৃঙ্খলা হ'লে আর রক্ষা নেই। আর একটা চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে—যদি এক সেট্ লাল বল ও সাদা বল নিয়ে একটা বাক্সে পূরে ক্রমাগত নাড়া যায় তবে খানিকক্ষণ পরে শাদায় লালে মিশিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হবে কিন্তু তার পর যতই নাড়া যাক্ না কেন শাদাগুলি ফের একটি একটি ক'রে আলাদা হবে ও লালগুলিও এই রকম ক'রে একত্র হবে এ সম্ভাবনা অতি অল্প। গ্যাসের অণুদের বা ঐ বলদের বিশৃঙ্খলার পরিমাণই হ'ল 'এণ্ট্রপি'। ফলে, এণ্ট্রপি তাপবিজ্ঞানে ছিল বন্ধ্যাত্ব, সমষ্টিগণিতে তা হ'ল বিশৃঙ্খলা। এ উদাহরণ

থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় কেন বস্তুসমাবেশের বা বিশ্বের 'এণ্ট্রপি' বা বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলেছে। বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে বিশ্ব যে আমাদের সুবিধে ক'রে দিয়েছেন তা বড় নয়, তবে বৈজ্ঞানিকদের একটা সুবিধে ক'রে দিয়েছেন যে বিশৃঙ্খলার অবস্থা দেখে তাঁরা বিশ্বের বয়স নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা অণুসমাবেশ ক্ষেত্রে সমষ্টিগণিত প্রয়োগের আলোচনা করছিলাম। আলোক ও বিকীরণের ক্ষেত্রেও এই প্রয়োগ সম্পাদন করবার চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু সম্প্রতিমাত্র এটি সাধিত হয়েছে ও যে উপায়ে সাধিত হয়েছে তারই নাম বস্তুর সমষ্টিগণিত। এখানে এটি বলে রাখা ভাল যে বিকীর্ণ তাপ, রেডিও তরঙ্গ, আলোক ও আলোকাতীত উচ্চ ও নিম্ন স্তর সবই বিকীরণের অন্তর্ভুক্ত। এই আলোক ও বিকীরণকে বিজ্ঞান কিছুকাল আগেই শক্তির নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গরূপের পরিবর্ত্তে শক্তির বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিরূপে দেখার আভাস পেয়েছিল। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে দেখলেও তাকে সমষ্টিভাবে দেখবার কোন কৌশল খুঁজে পায় নি। কাজেই বিকীরণকে ব্যষ্টিভাবে দেখাটা বিজ্ঞান প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারে নি। যা হ'ক তার আগে থাকতেই তাপবিজ্ঞানে বিকীরণের ক্ষেত্রে গ্যাসের গতির বণ্টনধারার মত বিকীরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বণ্টনধারা আবিষ্কারের প্রয়াস হ'য়েছিল। বিকীরণের আদর্শ উৎপত্তিস্থল হিসাবে ধরা হয় চারিদিক বদ্ধ ছিদ্রহীন উত্তপ্ত খোল বা গহ্বর। এই গহ্বর থেকে বিকীরণ পালাবার পথ পায় না, খোলের দেয়ালে ক্রমাগত ধাক্কা লেগে তার ভেতরেই পরিভ্রমণ করে বেড়াতে থাকে; কতকটা গ্যাসের অণুদের মত। এ রকম বিকীরণকে আদর্শ কৃষ্ণকায় বস্তুর বিকীরণ—black body radiation—বলা হয়, কেননা আদর্শ কৃষ্ণবস্তু তাই যা যতখানি বিকীরণ গ্রহণ ঠিক ততখানি বিক্ষেপ করতে পারে। এই বিকীরণের বণ্টন কি রকম তাই গণনা করবার জন্য উইয়েন, বোলটজ্‌ম্যান, লর্ড রেলে, জিনস্ প্রভৃতি প্রত্যেকে এক-একটা সূত্রের প্রস্তাব ক'রে গেলেন কিন্তু পরীক্ষায় প্রত্যেকবারই দেখা গেল যে সূত্রগুলি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সর্ব্বাংশে মেলে না। অবশেষে প্ল্যাঙ্ক যে সূত্র দান করলেন দেখা গেল সেইটাই প্রকৃতক্ষেত্রে হুবহু মেলে। এই সূত্রের পত্তন ক'রতে প্ল্যাঙ্ক যা স্বীকার্য্য বলে মেনে নিলেন তাই হ'চ্ছে শক্তির বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিরূপ,—quantum,—যার আমরা অন্যত্র নামকরণ করেছি মাত্রা। মাত্রাবাদ Quantum Theory নামে পরিচিত কিন্তু মাত্রাবাদ বিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের পর যেমন পৃথিবীকে প্রাচীন ও নব্য জগত এই দু'ভাগে ভাগ করা হ'ত তেমনি মাত্রাবাদ বিজ্ঞানকে প্রাচীন ও নব্য দু'ভাগে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বস্তু যেমন

অণু দিয়ে গড়া, মূলপদার্থ যেমন ইলেক্‌ট্রণ দিয়ে গড়া—মাত্রাবাদের মূলকথা তেমনি আলোক ও বিকীরণের শক্তিকে মৌলিক উপাদানে গড়া ব'লে বিবেচনা করা। এ মতে শক্তির কমি-বাড়তি হয় ধাপে ধাপে, এই ধাপের মাত্রা হ'ল h-নামা প্ল্যাঙ্কাঙ্ক। শক্তির বৃদ্ধি বা ক্ষয় হবে h-এর পূর্ণ সংখ্যা অনুসারে, ভগ্নাংশ অনুসারে নয় বা অবিরত নয়। এতে প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় কেননা প্রচলিত মতে আলোক ও বিকীরণ তরঙ্গিত গতি, একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। বিশ্বব্যাপী কল্পিত ঈথর তা'র বাহক। মজার কথা ঈথরের কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। তার অবয়ব নেই, ভার নেই, চাপ নেই, গতি নেই। তার স্থিতি থাকলেও অন্ততঃ অন্য নৈসর্গিক বস্তুর সঙ্গে একটা আপেক্ষিক গতি থাকার কথা, কিন্তু মাইকেলসন-মর্লের বিখ্যাত পরীক্ষায় তাও কিছু ধরা পড়ল না। বস্তুতঃ আলোক ও বিকীরণই ঈথরের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে ঈথর ও ঈথর-তরঙ্গকে অস্বীকার করাই স্বাভাবিক কিন্তু তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই স্তূপাকার প্রমাণ যে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পক্ষান্তরে মাত্রাবাদের প্রমাণও কম জড় হয় নি। বিকীরণের বণ্টনহারের কথা ত বলাই হয়েছে; আর একটি প্রমাণ specific heat—তাপশীলতার (তাপ নেওয়া দেওয়ার ক্ষমতা) প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমে। তাপবিজ্ঞান আণবিক কম্পনের হিসাব ধ'রে মৌলিক পদার্থের তাপশীলতার সূত্র আবিষ্কার ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিল কিন্তু তাতেও অনেক ব্যতিক্রম ধরা পড়ল। এ বিপর্য্যয়ে ত্রাণকর্ত্তা হ'ল Quantum Theory। কিন্তু মাত্রার সঙ্গে স্পন্দনের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক অতি সহজ, স্পন্দন সংখ্যাকে h দিয়ে গুণ করলেই স্পন্দনের energy বা শক্তি-পরিমাণ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মাত্রাবাদের আর দুটি প্রমাণের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য,—প্রকৃতপক্ষে এরাই হ'ল দুটি মুখ্য প্রমাণ। প্রথমটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল্‌স্ বোর কর্ত্তৃক প্রদত্ত। এর আগে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে অণুর গঠনে ইলেক্‌ট্রণের ডিজাইন কতকটা সৌর জগতের মত, কেন্দ্রে তার যোগচিহ্নিত ইলেক্ট্রিসিটি,-প্রোটন ও চতুর্দ্দিকে তার ভ্রাম্যমাণ বিয়োগচিহ্নিত ইলেক্ট্রিসিটি,-ইলেক্‌ট্রণরা। এই মতে হাইড্রোজেনের ডিজাইনের আলোচনা ক'রতে গিয়ে নীল্‌স্ বোর দেখালেন যে হাইড্রোজেনে যে-একটি ভ্রাম্যমাণ ইলেক্‌ট্রণ আছে কয়েকটি বিভিন্ন কক্ষে তার পরিভ্রমণ সম্ভব;—এ ক্ষেত্রে সৌরজগতের গ্রহের কক্ষের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রণ কক্ষের পার্থক্য। যা হ'ক হাইড্রোজেনের ইলেক্‌ট্রণ কক্ষরা সজ্জিত আছে ধাপে ধাপে। এক ধাপ থেকে উচ্চতর ধাপে যেতে হ'লে ইলেক্‌ট্রণকে পূর্ণমাত্রা শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, নিম্নতর ধাপে যেতে হ'লেও পূর্ণমাত্রা শক্তি ব্যয় করতে হবে; ভগ্নমাত্রার উপযুক্ত

কোন কক্ষ নেই। এর প্রমাণ হ'চ্ছে এই যে কেবলমাত্র এই ডিজাইন অনুসারেই হাইড্রোজেনের বর্ণচ্ছত্রের পূর্ণ-ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্য উপায়ে অসম্ভব। ইলেক্‌ট্রণ উপরোক্ত উপায়ে নিম্নতর ধাপের কক্ষে নামবার সময় যে শক্তি ত্যাগ করে তাই আলোকরূপে বিকীর্ণ হয়, অর্থাৎ এ আলোক-শক্তি পূর্ণমাত্রার। তেমনি আলোক বা বিকীরণ থেকে শক্তি-মাত্রাকে পূরাপূরি গ্রহণ না ক'রে ইলেক্‌ট্রণ উচ্চতর কক্ষে উঠে যেতে পারে না। দ্বিতীয় যে প্রমাণের কথা আমরা উল্লেখ ক'রেছি তা' আইনষ্টাইন-দ্বারা ব্যাখ্যাত। এর নাম photo-electric effect, দেখা গিয়েছিল যে কয়েকটি ধাতুগাত্রে আলোকসম্পাত হ'লে তা থেকে ইলেক্‌ট্রণ বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু বর্ণচ্ছত্রের একটি বিশেষ বর্ণের নীচের বর্ণ দিয়ে হয় না। প্রকৃতকারণ নীচবর্ণের শক্তিমাত্রা—অর্থাৎ তার স্পন্দনসংখ্যার গুণিতক h—ইলেক্‌ট্রণকে পূর্ণমাত্রা ধাক্কা দেবার উপযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি ইলেক্‌ট্রণ মাত্রাক্রমে না হ'য়ে ক্রমশ শক্তি অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'ত তাহ'লে নীচবর্ণের অধিকক্ষণ ব্যাপী আলোকসম্পাতে নিশ্চয় বিচ্ছুরিত হবার উপযুক্ত ধাক্কা অর্জ্জন করত। এ ছাড়া আলোকের তীব্রতার ওপরও ইলেক্‌ট্রণ বিচ্ছুরণ নির্ভর করে না, এটাও আলোকের শক্তি-মাত্রার সাক্ষাৎ প্রমাণ। এ-প্রসঙ্গে আর একটু বলা দরকার যে অতি সম্প্রতি প্রচারিত, ডি-ব্রোগলীর তরঙ্গ-তত্ত্ব মাত্রাবাদকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। মাত্রাবাদ যেমন তরঙ্গকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করেছে, ডি-ব্রোগলীর তরঙ্গ-তত্ত্ব তেমনি ব্যষ্টিকে যথা ইলেক্‌ট্রণ, অণু পরমাণুকে, তরঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞানের এ নব-অধ্যায়ের নাম তরঙ্গগণিত। এখানেও সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে; ইলেক্‌ট্রণ, অণু পরমাণুর তরঙ্গধর্ম্মের ফটোগ্রাফ এখন প্রত্যেক বীক্ষণাগারেই গৃহীত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এখানেও তরঙ্গের কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই, এমন কি কোন বাহকও নাই, আছে শুধু মাত্রার সঙ্গে স্পন্দন-সংখ্যার সেই পূর্ব্ব সম্পর্ক। আপেক্ষিক-গণিতের মতে ইলেক্‌ট্রণ প্রভৃতির বস্তুমান (mass) তার স্বকীয় শক্তি-মান (energy) হ'তে অভিন্ন; আর শক্তি থেকে স্পন্দন-সংখ্যায় আসতে হ'লে শুধু 'h' দিয়ে ভাগ দেওয়া দরকার। অর্থাৎ বস্তুমান জানা থাকলে তার স্পন্দন-সখ্যাও (frequency) অবলীলাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয়।

আলোক ও বিকীরণের ব্যষ্টি-ভাব সম্বন্ধে আমরা বোধ হয় যথেষ্ট আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রধান কথা হ'চ্ছে এই ব্যষ্টিকে স্বীকার করলেও বা নানারকম ভাবে নাড়াচাড়া করলেও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিজ্ঞান একে সমষ্টির হিসাবে দেখতে সক্ষম হয় নি, অথচ বোধ করি আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পেরেছি যে এ হিসাবে না

দেখতে পারলে কোন কিছুকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণের পূর্ণ সার্থকতা নেই। ব্যষ্টির সমূহকে সমষ্টির গণিতে না গণনা করতে পারলে সে ব্যষ্টি বিজ্ঞানে সম্মানের পংক্তি পাবার যোগ্য হয় না। তাই যদিও প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইন আলোক ও বিকীরণকে ব্যষ্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তবু তার প্রতি সমষ্টিগণিতের প্রয়োগকৌশলের অভাবে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। সমষ্টিরূপে ব্যবহার করলেন সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসার বসু। এই পদ্ধতিই বিজ্ঞানে বসুর সমষ্টিগণিত নামে প্রসিদ্ধ। এ নিয়োগেরও অনুসন্ধান সমষ্টিগণিতের সেই পুরাতন অনুসন্ধান, অর্থাৎ বণ্টনহার ও "এণ্ট্রপি"। প্ল্যাঙ্ক যে বণ্টনহার নির্ণয় করেছিলেন তা কার্য্যতঃ ঠিক কিন্তু তাঁর পদ্ধতি ছিল সমষ্টির হিসাবসিদ্ধ নয়, বরং প্রাচীনগণিতের মতে। আইনষ্টাইন তা থেকে একটু উন্নত উপায় অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু তাও প্রাচীন গণিতেরই অন্তর্ভুক্ত। বসুর পদ্ধতি হ'ল কতকটা এইরূপ:— বিকীরণের 'টাল'---momentum—আছে একথা ম্যাক্সওয়েলের সময় থেকে জানা ছিল। একটা কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে যদি উপযুক্ত দৈর্ঘ্য দিয়ে এই টালের বিভিন্ন পরিমাণকে জ্ঞাপন করা যায় তবে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের টালের পরিজ্ঞাপক হয় একটা গোলক যার ব্যাসার্দ্ধ ঐ পরিমাণের সমান। গোলকের আয়তন তিন —three dimensional—অথবা বলা যেতে পারে টালের স্বাধীনতা বা অধিকার তিন প্রস্ত। স্পন্দনের টাল ছাড়া তার অবস্থিতিও ত্রয়ায়তনিক অর্থাৎ প্রতিস্পন্দনের অবস্থিতি ও টাল নিয়ে ছয় প্রস্ত স্বাধীনতা আছে। ছয় প্রস্ত স্বাধীনতা বলাও যা ছ'টি আয়তন বলাও তাই; তবে ছ'টি আয়তন হয়ত একটু কাল্পনিক ব্যাপার, কেননা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর জ্যামিতির মোটে তিনটি আয়তন। যাই হ'ক ছ'টি আয়তন ধ'রে একটা উত্তর-জ্যামিতি রচনা করা যেতে পারে ও উত্তর-জ্যামিতিক ষড়ায়তনিক ক্ষেত্রে টাল ও অবস্থিতি মিলিয়ে ছ'টি আয়তনযুক্ত একটা পরিবেষ্টন কল্পনা করা যেতে পারে; আরও কল্পনা করা যেতে পারে যে এই ষড়ায়তনিক পরিবেষ্টন প্রাথমিক কোষ দিয়ে গড়া,—যার মাপ হ'ল 'h³'। তা' হ'লে মনে করা যেতে পারে যে এই কোষগুলি দিয়ে গড়া ঐ পরিবেষ্টনটি স্পন্দনের লীলাক্ষেত্র। এখন সম্ভাবনামিতি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে কোষে স্পন্দনগুলি কি ভাবে বণ্টন করা আছে। কিন্তু বসুর হিসাব সাধারণ হিসাব থেকে পৃথক। প্রচলিত রীতিতে দেখা হ প্রত্যেক ব্যষ্টি কতগুলি অবস্থায় থাকতে পারে,—বসুর হিসাব প্রত্যেক অবস্থা কতগুলি ব্যষ্টিরূপ ধারণ করতে পারে। বসুর হিসাবে অনায়াসেই প্ল্যাঙ্কের বণ্টন-সূত্রে এসে পৌছান যায়। এই থেকে মাত্রাবাদ সিদ্ধিলাভ করে।

বস্থর সমষ্টি-গণিত প্রচারিত হয় ১৯২৪ অব্দে; ম্যাক্সওয়েল, বোল্টজ্‌ম্যান প্রভৃতির পর এই থেকে সমষ্টিগণিতের নবীন জীবন সুরু হয়। তখন সবে ডি-ব্রোগলীর তরঙ্গগণিত প্রচলিত হয়েছে। আইনষ্টাইন প্রস্তাব ক'রলেন যে বস্তুর যখন তরঙ্গ-ধর্ম্ম আছে তখন তরঙ্গের এই নব্য সমষ্টিগণিত বস্তু-সমাবেশ-ক্ষেত্রেও—যথা গ্যাসে,—প্রযোজ্য। আইনষ্টাইনের এই প্রয়োগের নাম বস্থ-আইনষ্টাইন-গণিত। সাধারণ অবস্থায় প্রাচীন সমষ্টিগণিতই গ্যাসের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু মহাশূন্যের কাছাকাছি হ'লে গ্যাসের degeneration,—আচরণে ব্যতয় হয়। তখন প্রাচীন গণিত অচল, তখন বস্থ-আইনষ্টাইন গণিত প্রয়োগ করা বিধেয়। অধুনা ফার্মি ও ডিরাক দেখিয়েছেন যে বস্তু-সমাবেশ-ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ ক'রলে একটু ত্রুটি থাকা সম্ভব কেন না বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে যা' তরঙ্গে বা মাত্রায় নেই। এ কারণ একটু 'ছাড়' দিতে হয় (exclusion principle)। ফার্মি-ডিরাকের সমষ্টি-গণিত ধাতুর ইলেক্‌টি্‌ক্ প্রবাহের ব্যাখ্যায় ও ইলেক্‌ট্রণ-গ্যাসের আচরণে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রেই সমষ্টিগণিতের প্রয়োগ আলোচনা ক'রলুম; কিন্তু আসলে ওই গণিতের প্রয়োগ ও কার্য্যকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। এই প্রবন্ধ লেখবার সময় মিঃ গোপাল আয়েঙ্গার সমষ্টিগণিতের একটা সার্ব্বভৌমিকসূত্র—generalised formula—প্রস্তাবিত ক'রেছেন।

বিজ্ঞানের কোন পাকা গণনা বা সিদ্ধান্তের একটি লক্ষণ হ'ল এই যে বিভিন্ন পংক্তি থেকে বিভিন্ন উপায়ে সেই গণনায় পৌঁছান যায়। ডি-ব্রোগ্‌লীর তরঙ্গগণিত থেকে momentum cell h^3-এ পৌঁছানো গেছে। সম্প্রতি Lindemann নামে একজন বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয় বিধি—uncertainty principle থেকে বস্থর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

এই প্রবন্ধ রচনায় প্রফেসার মেঘনাথ সাহার নব্য প্রকাশিত Text Book of Heat-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রুটির দেশ

(নেভেরফ্ হইতে)

প্রথমে গেলেন ঠাকুরদা, তারপর ঠাক্‌মা—সবশেষে বাবা। বাকি রইল মিস্‌কা, তার মা, আর ছোট দুটি ভাই। সব চাইতে ছোট যে তার বয়স চার, তার আগেরটির আট, আর মিস্‌কার নিজের বয়স বারো। এইতো সব বয়স, কি কাজই বা এরা করবে? শুধু মাঝে মাঝে চারটি ভিক্ষে করা আর ছুরি দিয়ে কাঠের টুক্‌রো খুদে নানারকমের খেলনা তৈরি করা—এ ছাড়া আর কিছুই তারা শেখেনি। তাদের মা না খেয়ে খেয়ে এমনি কাহিল হ'য়ে পড়েছেন যে একবার জল আনতে নদীতে গেলে ফিরবার শক্তি আর থাকে না। তারা সারাদিনই কেবল কাঁদে, কিন্তু তাতে লাভ কি? দুর্ভিক্ষের তো আর মায়া দয়া নাই। প্রথমে তারা একজনকে গোর দিয়ে এল, তার পরে একসঙ্গে একেবারে দুজনকে। এমনি কর্‌তে কর্‌তে মিখাইলো খুড়ো গেলেন। মেরিনা খুড়িই বা কি করেন? দু'দিন যেতে না যেতে তিনিও পিছু নিলেন। ঘরে ঘরে সবাই প্রস্তুত হচ্ছে, কবে যমের ডাক আস্‌বে। কিছুদিন আগে যাহ'ক্ ঘোড়া গোরু-গুলো ছিল, লোকের পেট ভরাতে সেগুলো সব শেষ হ'য়ে গেছে, বাকি শুধু কুকুর বেড়াল, ক্ষিদের জ্বালায় লোকে সেগুলোকেই তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে।

মিস্‌কা কেবলই ভাবে। এতবড় পরিবার, কাজ করবার লোক একেবারেই নাই বল্‌লে চলে। যদি কেউ কিছু কর্‌তে পারে সে মিস্‌কা নিজে। মরার আগে বাবা ব'লে গিয়েছিলেন, 'এদের সবার ভার তোকেই নিতে হবে, মিস্‌কা।'

মিস্‌কা পথে বেরিয়ে পড়ল। চাষারা সবাই বল্‌ছে ট্যাশ্‌কেণ্টের কথা। কি সস্তাই না সেখানে রুটি, যাওয়া একটু মুস্কিল বটে, কিন্তু একবার কোনো রকমে পৌঁছতে পারলে আর কথা নেই। যেতে পাঁচশো মাইল আর আসতে পাঁচশো—মোট হাজার। টাকা না হ'লে অসম্ভব—টিকিটের দাম আছে তো, তা ছাড়া ছাড়-পত্র চাই, তাতেও আবার টাকা লাগে।

মিস্‌কা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুন্‌ল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ছোট ছেলেরা সেখানে যেতে পারে?'

'কেন, তুমি চাও নাকি সেখানে যেতে?'

'কেনই বা চাব না? রেলে উঠে এক কোণে লুকিয়ে ব'সে থাকব, কেউ দেখতে পাবে না।'

চাষারা সবাই হেসে উঠ্‌ল।

'না, মিস্‌কা, তুমি বাড়িতেই থাকো। তোমার মতো যারা ছোট, তারা একবার গেলে আর ফেরে না। আরো পাঁচ বছর বড় হ'য়ে নাও, তারপর যেও।'

মিস্‌কার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না, অত ভয়টয় তার নেই। সে কেবল ট্যাশ্‌কেণ্টের স্বপ্ন দেখে—রুটির দেশ ট্যাশ্‌কেণ্ট।

আর নিজেই সে নিজেকে বোঝায়ঃ

'একবার চেষ্টা করেই দেখোনা বাপু, তুমি তো আর কচি খুকী নও। মাগ্‌না কেউ খেতে দেবে না, সেই মজুরি কর্‌তেই হবে। এই তো বাবা যাওয়ার পর সারা গ্রীষ্মকাল লাঙল চষ্‌লে। ছোট কেবল বয়সেই, কিন্তু যা খাটো জোয়ান লোকেরও তা সাধ্যি নেই।'

মিস্‌কা আবার খুব ক'রে ভাবে।

রুটির দেশ—ঘুরে-ফিরে তার কেবল এই কথাই মনে পড়ে। সে ক্রমাগত হিসাব করে—পাঁচশো মাইল—এমন কি আর দূর? অবিশ্যি হেঁটে গেলে অনেকটা পথ, কিন্তু একবার রেলগাড়িতে চেপে বস্‌লে ঠিক তিন দিন। আর ছাড়-পত্র না হ'লেও চলে। এ রকম ছোট্ট একটি ছেলে দেখ্‌লে সবাই বল্‌বেঃ

'আরে, ওকে কিছু বোলো না—ও হ'ল মিস্‌কা। দেখ্‌ছনা? না খেয়ে খেয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কতই বা ওর ওজন? সবশুদ্ধ বড় জোর—এই পোয়াটেক!'

যদি নিতান্তই গাড়ির থেকে নামিয়ে দেয় তাহলে সে দিন-দুই ছাদের উপর থাক্‌তে পারে। কাকের বাসা পাড়ার জন্যে সে কতবার গাছে উঠেছে, গাড়ির ছাদে ওঠার চেয়ে তা ঢের শক্ত, কিন্তু তবু সে কখনো পড়েনি।

হঠাৎ তার চোখে পড়্‌ল তার মাতব্বর বন্ধু সেরেজ্‌কা কারপুখিন, তার চাইতেও এক বছরের ছোট। বন্ধুকে দেখে তার কি স্ফূর্ত্তি! সে চেঁচিয়ে বল্‌লঃ

'ওরে! চল্‌, যাই।'

'কোথায়?'

'ট্যাশ্‌কেণ্টে। রুটির জোগাড়ে। দুজনে যাওয়াই ভালো। তোর কিছু হ'লে আমি আছি, আমার কিছু হ'লে তুই আছিস্‌। এখানে তো আর কিছু জুট্‌ছে না।'

সেরেজ্‌কার তো প্রথমে বিশ্বাসই হ'ল না।

'যদি বৃষ্টি হয়?'

'গরম কালে বৃষ্টিই তো ভালো, বেড়ে আরাম হবে।'

'যদি সেপাইরা তাড়িয়ে দেয় ?'

'আরে, সেপাইদের চোখ এড়ানো কিছু শক্ত না।'

সেরেজ্‌কা তবু ঠিক ক'রে উঠতে পার্‌ল না। সে বেশ খানিকটা নাক খুঁটে বল্‌ল ঃ

'না, মিস্‌কা, সেখানে কোনোকালে পৌছতে পার্‌ব না।'

মিস্‌কার ইচ্ছে হ'ল তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে খায়। সে বল্‌ল ঃ

'অবিশ্যি পৌছুব ! তবে, ভয় পেলে চল্‌বে না। লাল পল্‌টন তো এখন সর্ব্বত্র। তারা কিছু বল্‌বে না। বরঞ্চ আমরা উপোস ক'রে আছি জান্‌তে পেলে তারা আমাদের খেতে দেবে।'

'আমরা যে বড্ড ছেলেমানুষ—আমাদের ভয় কর্‌বে।'

তারা যে মোটেই ছেলেমানুষ নয়, মিস্‌কা এই কথা নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আরম্ভ কর্‌ল। না হয় সেরেজ্‌কা বয়সে তার চাইতে ছোট, তাতে কি ? মিস্‌কাই সব কর্‌বে—ট্রেণে জায়গা ক'রে বসা, ভিক্ষা ক'রে খাবার জোগাড় করা। হাজার হ'লেও কচি খুকী তো আর তারা নয়। যদি কিছু একটা নাহয় ঘটেই, তাতে দম্‌বে কেন ? নাহয় ট্রেণ থেকেই নামিয়ে দেবে, কুছ্‌ পরোয়া নেই, যতক্ষণ দুজনে একসঙ্গে আছে ভয় কি ? রাতটা তো ঘুমিয়ে কাটানো যাবে, সকালে উঠে না হয় একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে, তারপর যেই দেখ্‌বে কেউ দেখ্‌ছে না, এম্‌নি আবার সুড়ুৎ ক'রে ঢুকে বস্‌বে।

সেরেজ্‌কা জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'ফিরব কবে ?'

'শীগ্‌গিরই। বড় জোর যেতে চার দিন, আসতে চার দিন। সের দশেক রুটির জোগাড় হ'লেই হ'ল—বেশি বোঝা না হওয়াই ভালো।'

'আমি তো আধ মণ আনব।'

'অত দরকার নেই। বেশি দেখলে আবার কেড়ে নেবে। বরঞ্চ পথটা জানা হ'য়ে গেলে, আরেকবার গেলেই হবে।'

'তাহলে চল্‌, মিস্‌কা, যাওয়াই যাক্‌। কাউকে কিন্তু কিছু বলা হবে না।'

'বেশ।'

'শুধু জানো তুমি, আর জানি আমি, আর কেউ না। কষ্টিয়া, ভ্যান্‌কা, এরা সবাই শুন্‌লেই যেতে চাইবে, কিন্তু ওরা বড় ভীতু, ওরা থাকলে বেশি দূর যাওয়া হবে না।'

'তোর তো আর ভয় করছে না ?'

'আমি কখ্‌খনো ভয় পাই না। জানো, আমি দুপুর রাতে একলা গোরস্থান ঘুরে আসি।'

* * * * * *

মাঠের মধ্যে সব চুপচাপ। নীল আকাশে পাখীরা গান কর্‌ছে। নীচে, টেলিগ্রাফের তারগুলোতে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে, আর খুঁটিগুলো একটার পর একটা দূরে মিলিয়ে গেছে। এই খুঁটিগুলোর ঠিক পরেই ষ্টেশন, সেখানে একটা ট্রেণ দাঁড়িয়ে। মিস্‌কা এর আগে দুবার ট্রেণ দেখেছে—তার বাবার সঙ্গে সামারা যাবার সময়। অদ্ভুত ব্যাপার! কি রকম গুটিগুটি এগিয়ে চলে, আর কি ধোঁয়া, আর কি জোর বাঁশি!

মিস্‌কা তার বাবার কোট্‌ প'রে আর বাবার ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে চলেছে। কোট্‌টার সঙ্গে আবার একটা পল্টনের কোমরবন্ধ। তার পিঠের উপর মস্ত একটা বোচ্‌কা ঝুলছে। এই বোচ্‌কার মধ্যে রয়েছে লাল রঙের ছোট্ট একটা ব্যাগ, তার মা'র পোষাক ছিঁড়ে এই ব্যাগ তৈরি হয়েছে। ব্যাগটার মধ্যে রয়েছে একটা টিনের গেলাস, ন্যাকড়ায় বাঁধা খানিকটা নুন, ঘাসের রুটি এক টুকরো, আর তার ঠাক্‌মার একটা পুরোণো ঘাগ্‌রা। সহরে গিয়ে এই ঘাগ্‌রাটা সে বেচ্‌বে।

মিস্‌কার পাশে পাশে চলেছে সেরেজ্‌কা। তার পিঠের উপর এক জোড়া চটিজুতো আর তার ঠাক্‌মার পায়ের গুটিকয় লম্বা লম্বা মোজা ঝুলছে। চটিগুলোর সঙ্গে দুটো ব্যাগ এক সঙ্গে গোল ক'রে বাঁধা রয়েছে।

দুটি বন্ধু চল্‌তে চল্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল যে, যাই হোক, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। যদি একজনের অসুখ হয়, আরেকজন দেখ্‌বে। এক-জন কিছু পেলে, দুজনে তা ভাগ ক'রে নেবে।

ছোট্ট ষ্টেশনটা চোখে পড়তেই সেরেজ্‌কা বল্‌ল:

'ঐ দেখো, মিস্‌কা, কি রকম ধোঁয়া। ঐ কি আমাদের ট্রেণ নাকি?'

মিস্‌কা বল্‌ল: 'এখন সব ট্রেণই আমাদের, একটাতে চ'ড়ে বসতে পারলেই হ'ল।'

ছোট একটা পাহাড়ের উপর ব'সে তারা বিশ্রাম কর্‌ছে। নুন-বাঁধা ন্যাকড়ার পুঁটুলিগুলো খুলে তারা ঘাসের উপর রেখেছে। সেরেজ্‌কা বল্‌ল:

'তোমার চাইতে আমার বেশি নুন আছে।'

'কিন্তু রুটি আছে তো?'

'মা চারটে আলু দিছ্‌লেন।'

'শুধু আলুতে কি হয়—একটু রুটিও চাই।'

'কিন্তু আমার তো রুটি নাই।'

মিস্কার মুখ গম্ভীর হ'ল। তার ব্যাগে এক চাক্লা ঘাসের রুটি আছে। যদি সেরেজ্কারও থাক্‌ত বেশ হ'ত। দুজনেরই তাহলে সব সমান সমান থাকত। কিন্তু এখন মিসকার ভাগ থেকে খানিকটা দিতে হবে—বাকি যা থাকবে তা কতটুকুই বা, তিন কামড় খেলেই অর্দ্ধেকটা কাবার।

'এক টুকরো রুটি আনতে কি হয়েছিল ?'

সেরেজ্কা উপুড় হ'য়ে শুয়ে একটা ঘাসের কুটো চুষ্‌ছে। তার চোখ ছল ছল করছে আর থেকে থেকে তার ঠোঁট কাঁপছে। গ্রামের দিকে তাকিয়ে সে দেখল গীর্জ্জার চুড়ো আর দেখা যাচ্ছে না, এখন যদি ফেরা যায় তাহলে সন্ধ্যা লাগাৎও পৌঁছতে পারবে না।

সঙ্গীর জন্যে মিস্কার ভারি দুঃখ হ'ল। তার মনে পড়ল তারা চুক্তি করেছিল দরকার হ'লে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে সেরেজ্কার হাতে দিয়ে সে বল্‌ল :

'এই নাও। নাহয় স্টেশনে পৌঁছে আবার শোধ ক'রে দিও। এক টুকরো রুটির জন্যে তো আমার ভারি !'

সেরেজ্কার মুখে কথা নাই। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, পেলে পরে সে অমন আধ সের রুটি খেয়ে ফেলতে পারে, আর মিস্কা তাকে দিল কিনা ছোট্ট এক টুক্‌রো। যদি ষ্টেশনে কেউ কিছু না দেয়, তাহলে একেবারে সেই পরদিন সকাল—হয়তো বিকেল—পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে আবার গ্রামের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

সকালবেলায় টাশ্‌কেণ্টের গাড়ি ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। মিস্কা সেরেজ্কাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল, সে বেচারি তো ভয়ে যায়। কোনো-রকমে গাড়ির তলা দিয়ে হামাগুড়ি মেরে তারা চলেছে, মাঝে মাঝে চাকায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে।

'তাড়াতাড়ি চল।'

গাড়ির দরজাগুলো কি ভীষণ উঁচুতে, কিছুতেই তারা লাগাল পাচ্ছে না, ধরবার মতো একটাও কিছু নাই যে বেয়ে উঠ্‌বে।

'একটু উঠিয়ে নাওনা আমাদের।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে ? দুবার দুবার মিস্কা সারা ট্রেণের দুই পাশটা ঘুরে এসেছে, কিন্তু কেউ তাদের একটু সাহায্য করতে চায় না।

চাষারা সব বাফারগুলোর উপর ঘোড়ায় চড়ার মতন ক'রে ব'সে—এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত। বুড়ী, ছুঁড়ী, কেউ আর বাদ নাই, সবাই ঠিক ছেলেদের মতন পা ছড়িয়ে ব'সে। তাহলে ওখানে ওঠা যেতে পারে।

বাস্! আর কথাটি নাই। মিস্কা এক লাফে একটা বাফারের উপর চ'ড়ে ব'সে ডাকতে সুরু ক'রে দিল :

'এই, ওঠ্।'

সেরেজ্কা উঠ্তে চায় না।

'এই তো, আমার হাত ধ'রে উঠে আয় না।'

'পড়ে যাব।'

মিস্কার সত্যি ভারি রাগ হ'ল। দাঁত খিঁচিয়ে সে বল্ল : 'শক্ত ক'রে ধর্।'

সেরেজ্কা দুই হাতে বাফারের মাথা শক্ত ক'রে চেপে ধরল, ওপরে তাকিয়ে দেখ্তে তার সাহস হচ্ছিল না।

'ওখানে যে পিষে যাব।'

একটা পরদার আড়ালে একটা সেপাই চেঁচিয়ে চাষাদের বল্ছিল :

'এখান থেকে সব স'রে পড়ো।'

সেরেক্কা ভয়ে কাঁপছে, তার অবস্থা সঙ্গীন। 'ওরে, বাবা!'

'আরে চুপ! আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। কাশিস্ না।'

'কিছুতেই থাকতে পারছি না, হাত ফসকে যাচ্ছে।'

'চুপ! চুপ!'

'মিস্কা, আমি পড়ে যাচ্ছি।'

মিস্কা আর রাগ সামলাতে পারল না।

'যাঃ! পড়ে মর্। আমি একলাই যাব।'

সেরেজকার মুখে কথা নাই। একটা সেপাই হঠাৎ তার মাথাটা দেখ্তে পেল।

'ওখানে কে?'

সর্ব্বনাশ! এবার আর রক্ষে নেই।

'স'রে পড়ো বল্ছি।'

কি আর করা যায়? নামতেই হবে, তা না হ'লে একটা কৈফিয়ৎ চাই। মিস্কা সেপাইকে সব কথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল।

'ও আমাদেরই গ্রামের ছেলে, আমার সঙ্গে যাচ্ছে।'

'তুমি আবার কে?'

'আমার নাম লোপাটিন্স্ক্, বাড়ি বুজুলুক জিলায়। টাশ্কেণ্টে যাচ্ছি রুটির জোগাড়ে।'

"কই, তোমার ছাড়-পত্র কই?"

পিছন থেকে আর সব সেপাইরা চীৎকার ক'রে বল্ল :

'ওদের একেবারে পুলিশের হাতে দিয়ে দাও।'

মিস্কার তো একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম। পুলিশের হাতে! তাহলেই হয়েছে আর কি! এদিকে সেরেজকা প্রায় আধমরা। সেপাইটা তার হাত ধ'রে এমন হেঁচকা টান দিল যে ঘাড় থেকে প্রায় ছিঁড়ে আসে আর কি।

'এই ছুটো ক্ষুদে বদ্‌নাসের জ্বালায় ট্রেণ চলাচল যে বন্ধ হ'ল।'

এই তো! রুটির লোভে ট্যাশ্‌কেণ্ট যেতে গিয়ে শেষকালে কিনা পুলিশের হাতে? আর পুলিশের লোকদের তো জানাই আছে, একবার বাগে পেলে দোষী প্রমাণ করতে তাদের কতক্ষণ? চাষাদের কাছে পুলিশের লোকদের সম্বন্ধে এই ধরণের কত কথাই সে শুনেছে, ভুলেও কেউ কখনো বলে না যে পুলিশের লোক ভালো হয়। সেপাইটাকে ঘুষ দিয়েও যদি ছাড়া পাওয়া যেত, কিন্তু কি করবে, একটি পয়সাও সঙ্গে নাই। কাঁদাকাটির ভাণ ক'রেই বা কি হবে, লোকটা সব ধ'রে ফেলবে। এদিকে ট্রেণ তো ছাড়ে ছাড়ে। মিস্কার মাথায় নানা ফন্দী আস্‌ছে, কিন্তু একটাও জুৎসই নয়। হঠাৎ সেরেজ্‌কাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে ভাব্‌ল একটু চালবাজি করা যাক।

'কাঁদছিস্ কেন? কচি খোকা নাকি? এরা তো আর আমাদের জেলে দেবে না, কোত্থেকে এসেছি জান্‌তে পারলেই ছেড়ে দেবে।'

তারপর সেপাইটার দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে মিস্কা বললঃ 'কেন আমাদের সঙ্গে এরকম করছ? জানোই তো যেখানেই একটু সুবিধে পাই সেখানেই আমরা ঢুকে পড়ি অত আইনকানুন কি আমরা বুঝি?'

সেপাইটা কোনো উত্তর দিল না।

'লক্ষ্মী, আমাদের যেতে দাও না, আমরা একেবারে উপোস ক'রে আছি।'

'আজ ভাগো, কালকের ট্রেণে যেও।'

মিস্কা ভাব্‌ছে কি ক'রে লোকটার চোখে ধুলো দেওয়া যায়।

'ঐ দেখো, একজন চাষা উঠেছে।'

'কই?'

'ঐ তো, ঐ মালগাড়িটার পেছনে।'

সেপাইটা তাকিয়ে দেখল। তাদের কি কপাল, সত্যি একদল চাষী মেয়ে একটা গাড়িতে উঠে বসেছিল।

'এখান থেকে পালিও না কিন্তু।'

মিস্কার স্ফূর্ত্তি আর ধরে না, সেপাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে সেরেজ্‌কাকে বললঃ

'তাহলে এখানেই থাকা যাক। সারাক্ষণ আমাদের আগ্‌লাবার

মতো সময় কি আর সেপাইর আছে ?'

সেপাই মেয়েগুলোকে তাড়া ক'রে গেল—এদিক একেবারে খালি, কোথাও কারো চিহ্নটি নাই। এই তো চাই। মিস্‌কা সটান বোচকাটা কাঁধে তুলে চুপি চুপি সেরেজ্‌কাকে বল্‌ল: 'কাঁদিস্ না, এই নে, আমার হাত ধর্।'

তারপর একদৌড়ে তারা ষ্টেশনের পেছনে হাজির। সেখানে গোয়ালঘরের পাশে জায়গায় জায়গায় সব গোবরের স্তূপ। তারই উপর হোঁচট খেতে খেতে একটা জলের কলের পাশ দিয়ে তারা ট্রেণটার একপ্রান্তে পৌঁছেই মালগাড়ীগুলোর তলায় ঢুকল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল।

মিস্‌কা হঠাৎ হাতটা শুঁকে থুথু ফেল্‌ল।

'কে যেন এখানে ময়লা ক'রে রেখেছে—আর জায়গা পায়নি, ব্যাটার ছেলে! কিরে, তোর গায়ে-টায়ে লাগেনি তো?'

'হ্যাঁ, লেগেছে।'

'বলিস্ কি? আমাকে ছুঁস্‌নে তাহলে।'

দুজনে তাকিয়ে দেখ্‌ল—কোথাও একটি জনপ্রাণী নাই। ব্যাপার কি? দূরে লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'সেরেজ্‌কা, এখানে তো আর হামাগুড়ি দেওয়া চলবে না।'

তারা গিয়ে আরেকদিকে উঠ্‌ল—একবারে ইঞ্জিনের কাছে।

'দেখেছিস্ কোথায় এসেছি?'

চাষারা স্ত্রী-পুরুষ সব ইঞ্জিনে উঠ্‌ছে।

'হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠিস্ না কিন্তু।'

মিস্‌কা তার সঙ্গীকে ঠেলে তুলল।

'উঠে পড়্।'

'আর তুমি?'

'উঠে পড়্ বল্‌ছি—ফাজ্‌লামি কর্‌তে হবে না।'

মিস্‌কা হ'ল দলপতি। তর্ক ক'রে লাভ নাই। সেরেজ্‌কা কোনোরকমে ইঞ্জিন বেয়ে তো উঠ্‌ল, কিন্তু কোথায় যে ঢুক্‌বে ঠিক করতে পারল না। একটা জায়গা ছুঁয়ে দেখল বেজায় গরম।

'মিস্‌কা, এটা বুঝি বয়লার।'

'চুপ! চুপ!'

হঠাৎ ঠিক মাথার উপর ভীষণ জোরে বাঁশি বেজে উঠল—কানের পরদা প্রায় ছেঁড়ে আর কি! ট্রেণটা সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড লাফ দিল। তারপর পায়ের তলায় শুধ্ খটাং খটাং শব্দ।

*   *   *   *

ষ্টেশনের পিছনে মেলা উনুন। সবগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেঁয়াজের আর ফুটন্ত আলুর গন্ধ।

একটার পর একটা ট্রেণ আসে আর যায়। যাদের কপাল ভালো কেউ বাফারে, কেউবা ছাদে বসবার জায়গা ক'রে নিচ্ছে। যাদের কপাল মন্দ তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্টেশনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিকারঘোরে ছটফট্ করছে। ছোট ছেলেদের আঁকড়ে ধ'রে মা'রা কাঁদছে, বুকে দুধ একবিন্দু নাই যে তাদের মুখে দেবে।

মিস্কা ও সেরেজ্কা কার একটা উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে। মিস্কা একটা কাঠি দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলোকে মাঝে মাঝে নাড়্ছে। বিশ্রী নোংরা একজন চাষী মেয়ে চীৎকার ক'রে বল্ল:

'বলি, যমে কি নেয় না? এই সব হতভাগাদের আর শেষ নাই। একেবারে তিতিবিরক্ত হ'য়ে গেলাম।'

শক্ত ক'রে বোতাম-আঁটা ভেড়ার চামড়ার জামা-পরা এক চাষা মিস্কার দিকে তাকিয়ে দেখল।

'কি চাই?'

'কিছুই চাই না। এই একটু জানাশোনা লোকদের খোঁজ করছি।'

'তাহলে এখানে কেন? স'রে পড়ো।'

ষ্টেশনের এক কোণে একটা বেঞ্চির তলায় একজন লোক শুয়ে, তার মাথাভরা টাক্। ও হ'ল একজন তাতার। চারদিক কি রকম ঠাণ্ডা আর স্যাঁৎসেঁতে, কোথাও শব্দটি নাই, কেবল মাঝে মাঝে লোকটির চীৎকার শোনা যাচ্ছে: 'হা আল্লা! হা আল্লা!'

আর এক কোণে একজন চাষা হাত-পা ছড়িয়ে গড়াচ্ছে, তার লাল দাড়ি উকুনে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক একবার সে চোখ মেলেই আবার বুঁজ্ছে। তার একটা পা ঠিক কাঠের মত শক্ত হ'য়ে পড়ে আছে, আর একটা পা নড়্ছে। তার গোঁফের উপর মস্ত একটা গুবরে পোকা।

'ও ওরকম পড়ে আছে কেন?'

মিস্কা কোনো কথা বল্ল না।

লোকটির কাছে নোংরা একটুক্রো রুটি প'ড়ে, মিস্কা একমনে তাই দেখ্ছে। মিস্কা বুঝ্তে পারল লোকটির প্রায় হ'য়ে এসেছে। তার মনে হচ্ছিল:

'ঐ রুটির টুক্রোটা পেলে বেশ হ'ত। কেউ তো আর দেখছে না! তাতারটা তো মুখ ঢেকে আছে, আর দেখলেও সে কিছু বলবে না। আমি বেশির ভাগ নেব, আর সেরেজ্কা তো ছোট্ট, ওকে ছোট্ট একটুকরো দিলেই হবে।'

মিস্‌কা পা টিপে টিপে দেওয়াল ঘেঁসে আর একদিকে গিয়ে একবার ভালো ক'রে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। এই তার প্রথম চুরি, তার কি রকম অদ্ভুত লাগছিল, মনে হচ্ছিল পা দুটো যেন অসাড় হ'য়ে আসছে, আর কান আর মুখ যেন জ্ব'লে যাচ্ছে। সেরেজ্‌কার কানে কানে সে বলল ঃ

'ঐ দিকটা দেখে আয়!'

'কোন্ দিকটা?'

'ঐ যে, দরজাটার পেছনে!'

সেরেজ্‌কা দরজার ওপাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'মিসকা, কি দেখব?'

'কিচ্ছু দেখতে হবে না, হয়েছে।'

প্ল্যাট্‌ফরম্-এর উপর চাষারা সব ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়ে তাদের যেতে দেবার জন্যে অনেক সাধাসাধনা করছে।

'দোহাই, এইটুকু দয়া করুন।'

'আরে না, সে কি ক'রে আমি পারি।'

চাষাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়াতে তারা সব রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ সুরু ক'রে দিল।

মিস্‌কা বিজ্ঞের মতো বল্‌ল ঃ 'ব্যাটারা ঘুষ চায়।'

* * * * *

ষ্টেশনের একপাশে রোদের মধ্যে সেরেজ্‌কা প'ড়ে। তার জিভ একেবারে জ্ব'লে যাচ্ছে, আর তাই দিয়ে মাঝে মাঝে সে ঠোঁট চাটছে। দেখলে মনে হয় না তার শরীরে একটুও শক্তি আছে। তার গাল দুটো ব'সে গিয়েছে, আর নাকটা দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক লম্বা। পাশে মিস্‌কা ব'সে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে। পকেট থেকে সেই পুঁটুলিটা বের ক'রে মিস্‌কা একটু নুন জিভে ঠেকাল। তারপর কি রকম বিশ্রী মুখ ক'রে উঠে খানিকটা থুথু ফেলে ট্রেণগুলোর চারপাশে ঘুরতে সুরু করল। একটা জায়গায় নর্দ্দামার মধ্যে খানিকটা আলুর খোসা প'ড়ে ছিল। তাই তুলে নিয়ে সে মুখে পুরল। কিন্তু না খেয়ে খেয়ে সে এত কাহিল হয়েছিল যে তার চোয়াল আর নড়তে চায় না।

মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা একজন মেয়ে মিস্‌কাকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন। তিনি নার্স, ঐ সহরেই কাজ করেন। তাঁর হাতে ছিল পূরো এক চাক্‌লা কালো রুটি।

মিস্‌কার সব কষ্টের কথা তার দুই চোখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছিল।

নার্স মিষ্টি গলায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?'

মিস্‌কা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—না, তিনি ঠাট্টা করছেন না, তাঁর চোখের চাহনি কি রকম স্নিগ্ধ ! মিস্‌কা সময় নষ্ট না ক'রে সব কথা কবুল করল।

তারা দুজন ট্যাশ্‌কেণ্টে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল। কথা হয়েছিল পথে কেউ কাকে ছেড়ে যাবেনা। তার সঙ্গীটির শরীর বড় খারাপ, তাকে এক টুকরো রুটি দেবার কেউ নাই। সে নিজে যত তাড়াতাড়ি পারে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু বন্ধুর ওরকম অবস্থায় কি ক'রে তাকে ছেড়ে যায় ? একলা থাকলে সে নিশ্চয় মারা পড়বে—বেচারির বয়স একে কম, আর সে এর আগে কোথাও যায়নি, একেবারে কিছুই জানেনা, তার উপর আবার ইঞ্জিন দেখ্‌লে বেজায় ভয় পায়।

'কি হয়েছে ওর ?'

'খারাপ জল খেয়ে পেটের অসুখ হয়েছে, তার সঙ্গে জ্বর।'

'কই, তাকে দেখি।'

সেরেজ্‌কা একলা একলা শুয়ে ছটফট করছিল। মিস্‌কা নার্সকে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল :

'ঐ যে !'

নার্স সেরেজ্‌কাকে বেশ ভালো ক'রে দেখে বললেন :

'ওর তো শুধু জ্বর হয়নি, টাইফাস্‌ হয়েছে, বোধহয় বাঁচবে না।'

'তাহলে ও এখন কোথায় যাবে ?'

নার্স একটু ভেবে বললেন :

'তাইতো। আমাদের হাসপাতাল-গাড়ি যে একেবারে ভর্ত্তি, কিন্তু ওর জন্যে যেমন ক'রে হোক জায়গা করতেই হবে। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ওকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে, কি বলো ?'

মিস্‌কা ভারি খুসি হ'ল, সেরেজকাকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে ব'লে নয়, এই কথা ভেবে সে খুসি হ'ল যে পৃথিবীতে সত্যি ভালো লোক আছে, যদিও তাদের সহজে দেখা পাওয়া যায়না। মনের আনন্দে ক্ষিদের জ্বালা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নার্স যখন তাকে খানিকটা রুটি ছিঁড়ে দিলেন, স্ফূর্ত্তির চোটে তার প্রায় কান্না এল।

'কি মজা ! আপনি সত্যি এত ভালো !'

মনে মনে সে ভাবছিল :

'এরা যদি আমাকেও এই সঙ্গে নিয়ে যায়।'

নার্সটি মায়াবিদ্যা জানেন নাকি ? নইলে চট্‌ ক'রে মিস্‌কার

মনের কথা তিনি কেমন ক'রে বুঝে ফেললেন ?

'তুমি এখন কোথায় যাবে ?'

মিস্‌কা তাঁর দুটি স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে বল্‌ল ঃ

'দেখুন, আমার জন্যেও একটু জায়গা ক'রে দিন। আমি কাউকে বলব না।'

যাই বলো, পৃথিবীতে তাহলে সত্যিকারের দয়ালু লোক আছে।

* * * * *

প্ল্যাট্‌ফরম্‌-এর উপর ক্রমাগত পায়চারি ক'রে মিস্‌কার এমন অবস্থা হয়েছিল যে তার পা আর চলে না। তাই সে ক্লান্ত হ'য়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একটা রেলগাড়ির ধারে ব'সেছিল। তারপর কখন একটা চাকায় মাথা হেলান দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই সে লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। তাইতো! কাঁধটা এরকম হাল্‌কা লাগে কেন ? পিছনে হাত দিয়ে দেখে—ওমা! তার বোচ্‌কাটা নাই।

সে একবার রেলগাড়ির তলায় উঁকি মেরে দেখে, একবার সাম্‌নে ছুটে যায়—কোথাও তার বোচ্‌কা নাই। চার চারটে মালগাড়ির চারপাশ সে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখল—বোচ্‌কার নামগন্ধ নাই।

মিস্‌কার কপাল ঘেমে উঠ্‌ল আর তার মনে হ'ল যে দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

জিনিসটা চুরি গেল!

সে আর দাঁড়াতে পারলনা, লাইনের উপর ব'সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে সুরু করল। দারুণ দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তার আর একটি মাত্র জামা ছিল ঐ বোচ্‌কাতে; শুধু যে সেই বোচ্‌কাটি সে খুইয়েছে তা নয়, তার শেষ সম্বল—যে-আশা বুকে ক'রে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—তা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর মিস্‌কার মনে হ'ল একটা কিছু করা দরকার। চোখের জল ফেলে তার দুঃখের ভার প্রায় অর্দ্ধেক হাল্‌কা হয়েছিল। ষ্টেশনের পিছনে লাইনের উপর দিয়ে সে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল, যেমন ক'রে হোক এই জায়গাটার থেকে তাকে পালাতে হবে। খানিকটা দূর গিয়ে তার সেরেজকার কথা মনে পড়ল, তাকে তো একবার ব'লে আসা দরকার। হয়তো আর কখনো দুজনের দেখা হবে না, যদি কেউ দয়া ক'রে তার ভার না নেন তাহলে হয়তো এই শেষ!

হায়রে, খাবার মতো একটু কিছু যদি থাকত!

হাসপাতালের লোকরা মিস্‌কাকে বিশেষ আমল দিল না।

'কি চাই হে তোমার?'

'এখানে সেরেজ্‌কা আছে না, তাকে দেখতে চাই।'

'যাও, যাও, আজ হবে না, কাল এস।'

'একটুক্ষণের জন্যেও না?'

'সে এখানে নাই, সে ম'রে গেছে।'

'ম'রে গেছে!'

'আকাশ থেকে পড়লে নাকি? মানুষ মরে তা বুঝি তোমার জানা ছিলনা? তাকে গোর দেওয়াও হ'য়ে গেছে।'

সেরেজ্‌কার তাহলে সব শেষ হ'য়ে গেছে? কার মুখ দেখে মিস্‌কা আজ উঠেছিল? হাসপাতালের আঙিনায় একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে সে বসল। কপালের লিখন ছিল মন্দ! জামাটা গেল চুরি, খাবারের নামগন্ধও নাই। কাকগুলো অমন ক'রে ডাকছে কেন? গুটি গুটি এগিয়ে আসছে এটা আবার কি? ওমা, মস্ত একটা পোকা! বাড়িতে তো তারা বেড়াল কুকুর যা জুটত খেত, কিন্তু তাই ব'লে এই পোকাটাকে—তাইতো এটাকে কি করাই বা যায়?

ঐ যে ওখানে একটা চড়ুই দিব্যি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তাহলে চড়ুইরা এখনো সব নির্ব্বংশ হয়নি। হায়রে, যদি ইয়াস্‌কা থাকত, আর দেখতে হ'ত না, বন্দুক নিয়ে এক্ষুণি তাড়া করত।

ক্ষিদেয়, ক্লান্তিতে, দুঃখে মিস্‌কার সমস্ত শক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। তার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে রুটির নোনতা গন্ধ। কোত্থেকে এই গন্ধ আস্‌ছে?

একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে সে শুঁকে দেখল তাতে যেন কিরকম রুটি রুটি গন্ধ, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা ঘাসের কুটো ছিঁড়ে নিয়ে সে চিবোতে লাগল। তারপর অসহ্য কষ্টে তার চোখ আপনা থেকে বুঁজে এল।

মৃত্যু?···

*　　　*　　　*　　　*　　　*

শরৎকাল। পরিষ্কার দিন। বুজ্‌লুক আর সামারার মাঝামাঝি একটি ছোট্ট ষ্টেশনে ট্যাশ্‌কেণ্ট থেকে একটি ট্রেণ এসে থামল। গাড়ি থেকে একদল চাষা প্ল্যাট্‌ফরম্‌-এ লাফ দিয়ে পড়ল। ট্রেণটা বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, প্ল্যাট্‌ফরম্‌-এর উপর এক গাদি মোটা মোটা বস্তা নামিয়ে দিয়ে একটু পরেই

ছেড়ে দিল। বস্তাগুলো গমে ভরা, আর সেগুলোর গায়ে নানারকম মার্কা মারা আর বাঁকা বাঁকা হরফে কি সব লেখা।

এর মধ্যে তিনটে বেশ ভারি ভারি বস্তায় পেনসিল দিয়ে অস্পষ্ট ক'রে লেখা—মিখায়েল ডোডোনভ্।

মস্ত ছেঁড়া টুপি মাথায় একটি ছেলে এসে বস্তাগুলোকে ভালো ক'রে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখল, তাদের মুখের বাঁধন ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করল। ছেলেটি বেশ বলিষ্ঠ, মুখের রং রোদে-পোড়া, ধরণ-ধারণ একেবারে সত্যিকারের চাষার মতো।

আকাশ পরিষ্কার। শুধু ছোট্ট এক টুকরো মেঘ তরতর ক'রে ভেসে যাচ্ছিল, সূর্য্যের কোণ ঘেঁসে যাবার সময় একটুক্ষণের জন্য মাঠের ওপর তার ছায়া পড়েছে।

ছেলেটি খুব গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বস্তাদুটো দেখছিল। বেশ শক্ত ক'রে গিঁট দিয়ে তাদের মুখ বাঁধা। শরতের ঝরঝরে বাতাস তার বেশ ভালো লাগছিল, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা নেড়ে সে বল্‌ল ঃ

'বেশ দেখি ঠাণ্ডা ! বোধহয় রাত্রে বরফপড়া আরম্ভ হয়েছে।'

ছেলেটি মিস্‌কা।

ট্যাশ্‌কেণ্টে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, গাছতলায় ঘুমিয়েছে, যেখানে একটু জায়গা পেয়েছে সেখানেই থেকেছে।

বাঁচবার আশা সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তবু সে বাঁচল, পোকামাকড়, ভীষণ ময়লা, আর পেটের জ্বালা, এই সব সহ্য ক'রে। তার ছুরি আর কোমরবন্ধ বেচে সে খাবার কিনেছে, পেটের দায়ে পচা আপেল চুরি করেছে, দরকার হ'লে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেছে। ক্লান্তিতে, বিরক্তিতে, তার আর বাঁচবার সখ ছিল না। এমনি ক'রে কি আর গমের যোগাড় হয় ? অথচ সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল গমের আশায়—গম না হ'লে তাদের যে বাঁচা দায়।

অবশেষে এক ধনী লোকের জমিদারিতে তার একটা চাকরি জুট্‌ল। চাকরি পাবার কিছুকাল পরে বুজুলুকের কয়জন চাষার সঙ্গে তার দেখা হয়, তারা সব যাচ্ছিল মাঠে ঘাস কাটতে আর গম মাড়াই করতে। মিস্‌কা তাদের সঙ্গে জুটে পড়ল। তার মজুরি ঠিক হ'ল দু বস্তা গম, বস্তায় আধ মণ ক'রে। তারপর আবার এই চাষাদের সঙ্গেই সে বাড়ি ফেরে—মাগনা নয়, নগদ দশ সের গম রাহা-খরচা দিয়ে। চিরকালই কি আর সে ভিক্ষা ক'রে চালাবে ?

বাড়ি ফিরে মিস্‌কা দেখল তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটির কোথাও

কোনো সাড়া শব্দ নাই, জানলাগুলোর শার্সি সব শ্যাওলা প'ড়ে সবুজ হ'য়ে গেছে, ফটক খোলা প'ড়ে, আঙিনা ঘাসে ঢাকা, আর বেড়ার ধারে সব কাঁটার ঝোপ। এক কোণে প'ড়ে আছে একটা মরচে-ধরা জোয়াল।

কই, তার মা এসে তো তাকে আদর করছেন না? ইয়াস্‌কা, ফেড্‌কা, এরাই বা সব কোথায় গেল?

গাড়োয়ান তার গমের বস্তা দুটো ব'য়ে নিয়ে গিয়ে জানলার ধারে মাটির উপর রেখে দিল।

এখনো কেউ এলনা কেন?

তার বুক যেন কেমন ভারি ভারি বোধ হ'তে লাগল, আর তার দৃষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে এল।

পথের ওপারের ফটক থেকে বেরিয়ে ইগ্‌ন্যাশিয়াস্‌ ঠাকুর্দ্দা বস্তা আর গাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

'এসব কি দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি পাঠিয়েছে? আমাদের জন্যে বুঝি?'

সামনের ছোট্ট জানলা দিয়ে আরেকজন কে তাকিয়ে দেখছিল। মিস্‌কা খানিকটা গম বস্তা থেকে বের ক'রে গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর অস্থিসার বুড়োটির কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'ঠাকুর্দ্দা, আর সবাই কই?'

হাতের রুটিটা কোনো রকমে ধ'রে বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ-ছিলেন, তাঁর চোখের চাহনি কি রকম অদ্ভুত, মনে হয় যেন তাঁর মাথায় কিছু ঢুক্‌ছে না।

'এই যে! একটু রোসো। হঠাৎ কোত্থেকে?'

দুটি চাষার ঘরের স্ত্রীলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বস্তাদুটো বেশ ক'রে টিপে টিপে দেখে আর বাইরে যে দু-চারটে দানা প'ড়ে গিয়েছিল তা চট্‌পট্‌ কুড়িয়ে কোঁচড়ে তুলে তারা বল্‌ল:

'ছেলেটা কি এনেছে একবার দেখ! ভেলকি বাজী!'

নোংরা, খালি কুঁড়ে ঘরটার এক প্রান্তে একটা তক্তপোষের উপর তার মা শুয়ে; তাঁর মাথার উপর দেওয়ালের কোণে দুটো দেবদেবীর মূর্ত্তি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইয়াস্‌কা আর ফেড্‌কা মারা গিয়েছে।

মিস্‌কা তার মার গায়ে ঝুঁকে প'ড়ে বলল:

'উঠ্‌বে না মা? আমি এসেছি!'

তার মা চমকে উঠ্‌লেন, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। কোনো রকমে ঠোঁট নেড়ে তিনি বল্‌লেন:

'ওমা, মিস্‌কা! এসেছিস্‌?'

'তোমার জন্যে রুটি এনেছি মা।'

পকেট থেকে এক টুকরো ছাতাধরা রুটি আর এক মুঠো শুকনো আপেল বের ক'রে সে মার হাতে গুঁজে দিল।

'মা, এই নাও, খাও।'

'তুই সত্যি বেঁচে আছিস?'

'বেঁচে আছি বই কি—দেখছ না?'

মিস্কার মা ছেলের বুকে মাথায় তাঁর হাড়বেরোনো হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কি প্রকাণ্ডই না মিস্কা হয়েছে, আর রোদে পুড়ে তার কি রকম রং হয়েছে, চেনা দায়।

'আমার বাছা!'

পরে অনেকক্ষণ সে ঘাসে-ঢাকা শূন্য আঙিনায় এক্‌লা এক্‌লা ঘুরে বেড়াল। খালি আস্তাবল দেখে তার ঘোড়াটার কথা মনে পড়্‌ল—তাকে একটা নতুন ঘোড়া কিনতে হবে। মুরগির বাসাটার বিচলিগুলো ধূলো জমে কালো হ'য়ে গেছে, তারই উপর প'ড়ে আছে ছোট্ট দুটো পালক, দেখে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল, সব আবার নতুন ক'রে করতে হবে, না আছে ঘোড়া, না আছে মুরগি।

কোত্থেকে একটি চড়ুই এসে গোলাঘরের ছাদ থেকে লাফাতে লাফাতে বরগাটার উপর গিয়ে বস্‌ল; চড়ুইটা ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে কি যেন খানিকটা ভেবে নিল, তারপর মিট্‌মিট্‌ ক'রে মিস্কার দিকে তাকিয়ে রইল।

চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে মিস্কাও কি যেন একটু ভাবল। আঙিনা থেকে মরচে-ধরা জোয়ালটা তুলে এনে সে গোলাঘরের এক কোণে রেখে দিল। তারপর, গমের বস্তাগুলো যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আর আপন মনে আস্তে আস্তে বল্‌ল:

'কেঁদে কি লাভ? আবার নতুন ক'রে সব গ'ড়ে তুল্‌তে হবে।'

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

হাঁসপাতালে

(জে, ই ফ্লেকারের অনুভাবে)

সাতাট বৎসর যদি শুভ্রকেশ বৃদ্ধের মতন
এখানে শুইয়া থাকি, যন্ত্রণার শেষ হ'য়ে যায়—
সমুচ্চ মিনার হ'তে দেখি শুধু মুমূর্ষু স্বপন—
হেথা শুয়ে দেখি শুধু রিক্ত পাংশু দেওয়ালের গায়
টিক্‌টিকি উঠে, নামে ; শূন্য টুল পড়ে থাকে দূরে,
চেয়ার, মাদুর, জাগ্—রং উঠে গিয়েছে পর্দ্দায় !
শান্ত, পরিচ্ছন্ন সেই বুড়ী ঝি-টি আসে ঘুরে ঘুরে
চেনা মুখ ছায়া ঢাকা—কিছুই জানি না যেন তা'র—
নিঃশব্দে আসে সে হেথা চ'লে যায় ; সারা ঘর জুড়ে
আর কেহ কোথা নাই ; কেহ হেথা আসে না আমার
আত্মীয় অতিথি কোনো, বিন্দুমাত্র নাই চঞ্চলতা,
বাসনের শব্দ শুধু, ঝন্ ঝন্ খাবার ঢাকার !

বাহিরে চা'ব না আজ, লুপ্ত হ'য়ে যাক সব কথা—
সার্শিটি টানিয়া দিব দূরে ওই জানালার 'পরে ;
বায়ুর নিঃশ্বাস আর বর্ষণের স্নিগ্ধ মুখরতা
শুনিব, ভাবিব মনে, হয়ত বা নিমেষের তরে,
ফাল্গুন নিকটে এল, অগ্নিশিখা জড়ায়ে চরণে,
পাখীদের গানে, আর সূর্য্যবহ্নি যেথা ঝরে পড়ে
ধীরে যেন এ আমার মশারির পাশে ! ভয় মনে,
একে একে আসে যদি পুরাতন দিবা-স্বপ্নগুলি
মেঝেয় দাঁড়ায় এসে, গান গায় হাসিয়া গোপনে,
বাতাসে ভাসিয়া যদি উড়াইয়া পর্দ্দার ধূলি
খেলা করে, খ'সে যায় দিবসের যত দণ্ড-পল,
সুগোপন ছায়া নামে দীর্ঘতর ছায়ারে আকুলি' !
তখনি মিলা'য়ে যা'বে বহুদূরে দেওয়াল ধূসর—
জ্ব'লে ফেটে খুলে যা'বে —দেখা দেবে অগণিত তারা—
গোলাপে শিশির যেন দেখা দেবে স্বচ্ছ সরোবর !

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

পতঙ্গ

(ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের অনুভাবে)

নিশীথের বাতাসে বসিয়া
মৃদু তিমিরের গন্ধে লুকা'য়ে আনন,
বাহিরে আঁধার আর গোপন গুহায়
'স্বাগতম্' কহে হুতাশন !

বর্ণে আর পাখায় সুন্দর
কম্পমান্ সুকুমার লাবণ্যপ্রভায়
পতঙ্গ শিশির-শয্যা হ'তে
আমূর্চ্ছিত মুখ তুলি' চায়।

লোভনীয় চক্ষু দু'টি তুলি'
লঘুগতি পক্ষে দেহভার
কুহেলি-সহজ সুখে শূন্যে ঘুরি' ঘুরি'
পতঙ্গের চলে অভিসার।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

রাত্রে

(য়ালিস্ মেনেল্ হইতে)

স্বচ্ছ সুদূর দিগ্বলয়ের সীমা শেষ হ'তে ঘরে
সাঁতারি নীলিমা কোমল পক্ষ ভরে,
সারা দিবসের স্মৃতির বাহিনী বলাকা বাঁধিয়া আসে
ঘুমঘোর ভরা খোপে খোপে উল্লাসে।
বলত কাহারা মধুময় হেন গোধূলির আব্ছায়ে
ফিরিছে কুলায়ে মদির দখিণা বায়ে ?
সব চেয়ে দ্রুত সোজা পথে আসে বল, কারা ? অনুমানি,
—তোমার বাণী যে, তাহারা তোমার বাণী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বৈদান্তিকের প্রার্থনা

(শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী হইতে)

আত্মা মহীয়ান্,
হৃদয়ের নীরবতা মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যান ভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্ব্বান,
আছ শুধু তুমি!
হায়, তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে,
মেঘ উঠে ধূমি'
আলোর গগনে?
কেন মোরে বাসনা দুর্ব্বার করে শত ক্ষতাঙ্কিত?
কেন প্রতিক্ষণে
লালসা-পীড়িত
দগ্ধ দীর্ণ ক্ষুব্ধ হই, দূরে ফেলি তব শান্তি, হায়,
হই বিতাড়িত
প্রতি ঘূর্ণী ঘায়?
কেন পড়ি দুঃখের কবলে নিত্য, আবর্ত্তে শঙ্কার,
কামের দ্রংষ্ট্রায়?
করুণা তোমার
ফিরায়োনা, যদিও অতীত মোর আসে রক্ত মাখি'
মলিন আঁধার,
হে সত্য একাকী!
দিয়ো না সে দেবগণে তব ছদ্মরূপে দিতে মম
যৌবনেরে ফাঁকি।
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে
পিপাসার্ত্ত সম।
এ দীপ্ত মায়ারে
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে
যাহা নিজভারে।
দাও নির্ব্বিকার
দৃষ্টি মোরে, স্বচ্ছ হৃদি যৌবনের। তব তিরস্কারে
ঘুচুক আশার

তীব্র মুখরতা।
নাশো মম কলুষ-শতাব্দীরাশি, ফিরায়ে আমার
দাও পবিত্রতা।
জ্ঞানের তুয়ার
সুগোপন, খোলো খোলো আজ ! বীর্য্য, লভ সফলতা !
বর্ষ, প্রেমধার !

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

উপহার

তোমারে দেবার মত নাহি মোর কোন উপহার
তাই তব জন্মদিনে কি আনিব ভাবি বসি' মনে।
অন্তরে ঐশ্বর্য্য নাহি, নাহি বিত্ত বাহির ভুবনে।
নাহি শিল্পীচিত্ত যদি রচিবারে চাহি অলঙ্কার।
কেবল পরাণ ভরি' ভুলে-যাওয়া আছে বহু গান,
খণ্ড, ছিন্ন ভাসে তারা চিত্তাকাশে লঘু মেঘ সম।
অতীতের জানা সুর তাও আজি নাহি মনে মম,
যে সুর শুনিনি কভু তারাও উতলি' তোলে প্রাণ।
পেয়ে যাহা হারাইনু, আর যাহা আজো মেলে নাই,
তারি মাঝে চিত্ত মম রিক্তসম ফেরে ভিক্ষা মাগি !
ফেলিয়া আসিনু যাহা তারে ভুলে লুব্ধচিতে চাই
আজো যাহা অনাগত অলব্ধ রয়েছে দূরে দূরে,—
সেই মোর নিত্য-চলা মর্ত্ত্যদিগন্তের প্রান্তপুরে,
সে অতৃপ্ত চাওয়া মোর কম্প্র করে আনি তোমা লাগি'।

হুমায়ুন কবির

অন্ধ-পথিক

অন্তহীন অন্ধকার, তারি মাঝে খুঁজি আমি পথ
আমি পথহারা—
অস্পষ্ট-গতির ধ্বনি শুনিতেছি কোথা সেই রথ ?
কোথা ধ্রুব-তারা ?
চিরন্তন-বন্ধ-চোখে চিরন্তন-অন্ধতার ঘোর,
নিরাশার পুঞ্জীভূত শৃঙ্খলেতে অর্গলিত দোর ;
কোথা তুমি আলোরূপা, স্পর্শ-মণি ছুঁয়ে যাবে দ্বারে,
প্রাণহীন অন্ধকার খসে যাবে দীপ্ত পথ-ধারে—
কোথা তব সাড়া ?

অন্তহীন অন্ধকার, গুমরিয়া কেঁদে ওঠে প্রাণ,
দেখিব না আলো ?
প্রণয়ের ফল্গুধারা বালুতলে হারাইবে গান ?
বাসিব না ভালো ?
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠিবে না ?
ফোটার জগতে প্রাণ পরিপূর্ণ হ'য়ে ফুটিবে না ?
জরা এসে জড়াইবে যৌবনের না-ছোঁয়া এ দেহ ?
পথহারা পান্থ-পানে আঁখি তুলে চাহিবে না কেহ ?
শুধু ঘন কালো ?

অন্তহীন অন্ধকার, চিত্তে জাগে উন্মাদ বাসনা
উলঙ্গের মত,
নৃত্য করে রক্তে মোর বন্ধহীন অযুত কামনা
তপ্ত অসংযত !
সাধ যায় অন্ধকারে অঙ্গে মম আঁকড়িয়া ধরি ;
কৃষ্ণ দুই ওষ্ঠে তা'র চুম্বনের পানপাত্র ভরি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া দেই মম অন্ধ ভালবাসা,
নিরাশার বালুচরে ঢেলে' দেই তপ্ত তাজা আশা
উন্মাদের মত !

অন্তহীন অন্ধকার, অন্ধ আমি, চলি তবু পথ,
এ যে মোর নেশা ;
আশা নাই, তবু হেরি কল্প-চোখে দুরাশার রথ,
তাই প্রাণে ভাষা !

ধ্রুবতারা নাহি থাক, থাক পথ নিত্য দিশেহারা ;
থাক বালু, ফল্গু আমি তা'রি তলে দিয়ে যাব সাড়া ;
অন্তহীন অন্ধকার প্রাণহীন থাক চিরস্থির—
স্বপন পাথেয় মম, পথ চলি অন্ধ-মুসাফির,
দুরন্ত দুরাশা !

শ্রীসুমন্ত্র সেন

আগমন

(হার্বার্ট টেঞ্চ্ হইতে)

গোলাপ-কাননে দুপুর রৌদ্র, সে তখন নাহি আসে,
প্রখর আলোকে উজল যখন বেলা
সে আসে না কভু অন্তরতলে শান্তির নিঃশ্বাসে
সাঙ্গ না হ'লে সব কাজ, সব খেলা ।
গিরিশিরে যবে আঁধার ঘনায়, কলরোল গম্ভীর
ভেসে আসে যবে সুদূর সাগর হ'তে,
তারার আলোকে, প্রদীপশিখায় গতি তার অতি ধীর
সে আসে গোপনে স্বপন-আলোকপথে ।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাধবী পূর্ণিমা

দিনের দহনশেষে, সাকীসম, সিত সুরা লয়ে
মাধবী পূর্ণিমা যবে দেখা দেয় মোর বাতায়নে,
আত্মধিক্কারের জ্বালা শতগুণ হয় সে-সময়ে,
অবুঝ অন্তর মোর ব্যর্থতার রলরোল ভনে ।

বন্ধুরা বিস্ময়ে চাহে, প্রতিবাদ করে সমস্বরে,
কেহ বা প্রকাশে উষ্মা সকৌতুকে শুধায় কেহ বা-
কবিত্ব আমার ব্রত, তাই বুঝি কৌমুদীজগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা !

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার ;
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি, তাহে মোর হৃদয় উদাসী,
উত্থান পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার।

বিচ্ছেদ-বাদল-রাতে মিলেছিলো যে-শেষ চুম্বন,
রাকারে বিফল করে আজো তার নশ্বর স্মরণ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বন্দ্ব

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে ;
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ;
বস্তুর দুর্দ্দান্ত চিতা অনির্ব্বাণ শূন্যের সৈকতে ;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্দ্ধনে ;
সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলি সম্ভব স্বপনে ;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে ;
ছুটি মোরা মর্ত্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্ত্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে।

হার মানে খিন্ন মন। দেহ কিন্তু অক্ষয় উৎসাহে
পরিব্যাপ্ত ব্যবধানে রচে সদা বাসনার সেতু ;
তন্ময় মুহূর্ত্তমাঝে অনন্তের আবির্ভাব চাহে ;
দেখে, জন্ম-মরণেরে কণ্ঠাশ্লেষে বাঁধে মীনকেতু।

আজিকে দেহের পালা—রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো তাহারি কাছে প'ড়ে আছে অমরার চাবি॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

যার যেথা দেশ—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—প্রকাশক, ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।

একখানি উপন্যাস। সমগ্র উপন্যাস নয়, প্রথম ভাগ মাত্র। সুদীর্ঘ প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার স্বয়ং সূত্রধারের ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক আপন পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। এই মুখপত্র পড়িতে পড়িতেই বোঝা যায় তিনি কত বড় পণ্ডিত। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রস্তাবনার দুই কূল ছাপাইয়া আখ্যায়িকার অভ্যন্তরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে পাঠক গল্পের মধ্যে অতি জটিল মনস্তত্ত্ব ও নিপুণহস্তে তাহার বিশ্লেষণ চাহেন, তিনি আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থের রসগ্রহণ অসম্ভব। প্রথমত, আখ্যান বা plot বলিলে যাহা বোঝায় তাহার একান্ত অভাব। তাহার উপর, ভাসমান পুরী ও শ্বেতদ্বীপের জীবন বর্ণনায় এত সামান্য সামান্য অবান্তর ঘটনাবলী পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা বিলেত-ফেরত জাতি ব্যতিরেকে অন্য পাঠকের উপভোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য বঙ্গদেশে বাদল-জাতীয় যে কয়জন আছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা বিলেত তাঁহাদের দেশ, যাহাতে বিলেতী গন্ধ আছে তাহাই তাঁহাদের কাছে লোভনীয়।

কথাসাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান হয়ত গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট নয়, কিন্তু শিখিবার অনেক আছে এই গ্রন্থে। পাঠক গভীর জ্ঞান অর্জ্জন না করিলেও বর্ত্তমান সাহিত্য-জগতের ধুরন্ধরদের নাম জানিতে পারিবেন। এমন কি বঙ্গদেশে বিখ্যাত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখক এল, মুখার্জ্জিও বাদ পড়েন নাই। মোটের উপর পাঠককে আমার উপদেশ যে, ভূমিকা অংশটা সর্ব্বশেষে epilogue বা পরিশিষ্ট রূপে পাঠ করিবেন, এবং গল্পাংশ পড়িবার সময়ে মনে রাখিবেন যে সাধারণ মানব-মানবীর কথা পড়িতেছেন, দেবাসুরেরও নয়, কর্ণার্জ্জুনেরও নয়।

"যার যেথা দেশ" উপন্যাসের কোন শ্রেণীভুক্ত তাহা আমার মনে হয় অবান্তর প্রসঙ্গ। তবে এপিকের কোন লক্ষণই আমি ইহাতে দেখি না। নিরবচ্ছিন্ন গল্প-প্রবাহ আছে এই পর্য্যন্ত। বীরত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। প্রধান প্রধান পাত্র, বাদল, সুধী, ডাক্তার গুপ্ত, ইহাঁদের চরিত্রেও অতিমানবীয় গুণাবলীর চিহ্নমাত্র নাই। সমস্ত পুস্তকখানা যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া আবার চক্ষের সম্মুখে Clown, Harlequin, Pantaloon-এর ছায়া (নানা শ্রেণীর সং) অজস্র দেখিতেছি কিন্তু যবনবীর Hector, Ajax-এর কুটুম্ব একজনকেও দেখি না। আলোচ্য পুস্তককে সুরাসুরের বা ঈশ্বর ও সয়তানের মানবাত্মা লইয়া কাড়াকাড়ি বলা যায় কি না, এ প্রশ্নও অবান্তর। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাদল বিদ্রোহী হইলেও তাহার সহিত মিলটনের লুসিফার কি মধুসূদনের মেঘনাদের কোন সাদৃশ্য নাই। সে অতি নগণ্য ব্যক্তি।

গ্রন্থকারকে তাঁহার গভীর জ্ঞানের জন্য প্রথমেই অভিনন্দন করিয়াছি। জ্ঞানী-মাত্রেরই কথা-সাহিত্যে কি ললিত কলায় অধিকার থাকার কথা নয়, কিন্তু অন্নদাবাবু উজ্জয়িনীর যে মনোরম চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে মোহিত করিবে। অর্দ্ধশিক্ষিতা, শ্যামবর্ণা এই ষোড়শীটিকে দেখিয়াই চিনিয়াছি। সে আমাদের নিতান্ত

আপনার লোক। যখন প্রথম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তখন হইতে তাহার সুখ দুঃখই আমার প্রধান অনুধাবনের বিষয় হইল। পশু-হস্তে তাহার নিগ্রহ, নিঃসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় কালযাপন, অবশেষে বাণীর সঙ্গলাভ ও ধর্ম্মপুস্তককে আশ্রয়স্থল বলিয়া গ্রহণ, ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোথাও নাই, অথচ কাব্যের অভাব নাই।

উজ্জয়িনীর পিতা পদে সাহেব ডাক্তার হইলেও যথার্থ কল্পনালোকবিহারী। বাস্তব জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্প। সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠাকন্যাদ্বয় অন্যত্র দীক্ষা সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁহার মন্ত্রশিষ্যা, একাধারে দুহিতা ও বন্ধু। তিনি কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত বলিয়াই এই কন্যাকে বিসর্জ্জন করিলেন। যাহার চরণে বিসর্জ্জন করিলেন সে-ই বাদল। গ্রন্থকারের মত আমিও বাদলকে দেখিয়াছি। অদ্ভুত জীব! বিবাহ না করিলে বিলেত যাওয়া হইবে না বলিয়া বিবাহ করিল। বিবাহ করিল পত্নীকে ত্যাগ করিবে স্থির করিয়া। সে ইংরেজ হইবে। হইবে কি, সে ইংরেজই, আজন্ম ইংরেজ। বড় বড় কথাদ্বারা তাহার হীনতাকে ঢাকিবার জন্য সদা সচেষ্ট। বাড়ীওয়ালীকে কেটী (Katie) বলিয়া ডাকিয়া রোমাঞ্চ হইল! Oxford (অক্সফোর্ড) বা Cambridge (কেম্‌ব্রিজ) এ পড়িতে যাইবে না কারণ সেখানে প্রলোভন নাই, প্রলোভন জয় করিবার আনন্দ পাইবে না। কিন্তু বোঝা কঠিন যে, এই অপূর্ব্ব জীবের চক্ষে প্রলোভন কি? ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, (ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বা বলিলাম) ইহার চক্ষে আছে কি? প্রেমকে ত ইনি বলিয়াছেন "Glandular action"!

এ জাতীয় জীবের সত্য দেশ কোথায় তাহা অনেক ঋষিকল্প মহাপুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি উল্লেখ না করিলেও চলে। হয়ত সে দেশ তাহার পিতা রায় বাহাদুর মহিমের দেশেরই কাছাকাছি। পিতার গুণাবলী পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া উৎকটতর রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। তাহার শেষ বার্ত্তা, "সুধীদা, I am আমি আছি।" আছে ভালই, তাহার ধ্যান সফল হউক, এই জন্মেই সে ইংরেজত্ব লাভ করুক! কিন্তু তাহার কদর্য্য, কৃষকায়, কৃষ্ণবর্ণ, বিরল-কেশ, চশমা-পরিহিত অমানুষ মূর্ত্তিটি আমাদের দৃশ্যপটে যেন উদয় না হয়। উজ্জয়িনী বিধবার জীবন পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে, উজ্জয়িনীর পিতা হৃদরোগে মরিয়াছেন, রায় বাহাদুরের পুত্রশোকে মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই। বাদলের কথাতেই বলি, "অতএব মাভৈঃ।" হয়ত কোনদিন দেখিব, বাদল রোলাঁ, রাসেল, বা G. B. S.-এর শূন্য সিংহাসনে বসিয়াছে। কিন্তু আমাদের আজও তাহার জন্য যেমন দুঃখ হয় নাই সেদিনও তেমনই আনন্দ হইবে না।

সুধীর চরিত্র সেরূপ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয় নাই। খদ্দরের গলাবন্ধ কোটে আবৃত হইয়া লণ্ডন পরিক্রমণ করে। বাদলকে নানা উপদেশ দেয়, কখনও বা বাঁদর বলে, অথচ বাদলের মর্কটবৃত্তির প্রশ্রয় দেয় না একথা বলা যায় না। সে দেশভক্ত লোক অথচ সে যে একদিন সুজেৎকে লইয়া সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবে না তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। Namby-pamby জড়ভরত মনে হয়।

ইংরেজ-জাতীয় নানা লোকও চিত্রপটে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান কাজ বাদলের ক্রমবিকাশে সাহায্য করা। ইঁহাদের মধ্যে কাহাকেও পাঠকের

বিশেষ ভাল লাগিবার সম্ভাবনা নাই। এক কলিন্স্‌কে আমার বড় পছন্দ হইয়াছে, সে ইংরেজীতে যাহাকে বলে, a fine animal বলিয়া। আমি বর্ত্তমান বিলেতের কিছু জানি না তবে গ্রন্থকারের বিলেতী জীবনের বর্ণনা যথাযথ বলিয়াই মনে হয়। আমার কেবল দুঃখ যে, এতগুলি ভারতের লোক বিলেতে উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু একটিও মানুষের মত মানুষ নয়। সত্যই কি মানুষের এত অভাব ?

গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই ছিল কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের ভয়ে অধিক আর কিছু লিখিব না। ভাষা সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিয়া আমার আলোচনা শেষ করিব। অন্নদাবাবুর পুস্তকের বাঙ্গলা অনেক কঠিন কঠিন স্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে। তবে ইংরেজী শব্দের এত বহুল ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার মত লোক সাহায্য না করিলে আমরা নূতন নূতন প্রতিশব্দ কোথা হইতে পাইব ? ইংরেজীর কথায় কথায় অনুবাদও ভাল শোনায় না। আমি নীচে দুই-চারিটা নমুনা দিতেছি। পাঠক ও গ্রন্থকার দেখিবেন আমি বিনা কারণে অনুযোগ করিতেছি না।

৬৭ পৃঃ—"কান থেকে চশমাটাকে টেনে বের করে।"—মানে কি ?

"আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগ্‌লে বস্‌ল।"—ভাল শোনায় কি ?

৬৮, ৬৯ পৃঃ—"কত রকম অবস্থা পর্য্যায়", "খ্যাতিতে দুরত্ব হ্রাস করে"—স্পষ্ট বোঝা যায় না।

১৩৯ পৃঃ—"অতলস্পর্শী পরিবর্ত্তন"—এর অর্থ করা কঠিন।

১১৬ পৃঃ—"হাস্য পরিহাসের হাতল করলেন"—হয়ত ইংরেজী কিন্তু বাঙ্গলায় ভাল শোনায় না।

১১১ পৃঃ—""মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের উপর আঙ্গুল লাগ্‌লে যে রকম করে।"—শ্রুতিমধুর নয়।

১৬৩ পৃঃ—"উত্তরের মামুলীত্বের দরুণ অবহেলিত হয়।" এবং

১৬৭ পৃঃ—"বাদল ইন্‌ডিগ্‌নাণ্ট্‌ হয়ে বল্ল,"—এই দুই বাক্যই বাঙ্গলায় অচল।

আমার সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ তথাপি আমার যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিলাম, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অপরাধ লইবেন না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কামরূপশাসনাবলী।—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত এবং কামরূপ রাজাবলী বিষয়ক ভূমিকাসম্বলিত। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'তাম্রশাসন প্রাচীন ইতিহাসের ছিন্নপত্রস্বরূপ।' বস্তুতঃ যে দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, 'শিল', লেখ, কারিকা, কড়চা ও বুরঞ্জীর আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন সে দেশের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলনের উপায়ান্তর কি ? গ্রন্থকারের ২৫ বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ঘাটনে প্রচুর সাহায্য করিবে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

কামরূপের সুপ্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কথা আছে কিন্তু কামরূপের নামোল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর'কে 'কামরূপানাম্ ঈশঃ' বলা হইয়াছে। কালিদাস সম্ভবত পঞ্চম শতকের লোক। কালিকা পুরাণে কামরূপের এবং ঐ রাজ্যের ঐতিহ্য-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা নরকের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ বিবরণ রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা নিশ্চয় করা সহজ নয়।

মহাভারতে দেখা যায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্তেরও স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। অতএব ইঁহাদিগকে কাল্পনিক ব্যক্তি মনে করা যায় না। ইহার পর প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া কামরূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গ্রন্থকার 'কামরূপ-শাসনাবলী'তে ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসনকে প্রথম স্থান দিয়াছেন, ঐ তাম্রশাসনই কামরূপের প্রথম ঐতিহাসিক লেখ। ভাস্করবর্ম্মা সম্রাট্ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধন যখন গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন তখন ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে একথার উল্লেখ আছে। হর্ষের রাজ্যারম্ভ ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখনই ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের অধিপতি। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং কামরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও ভাস্করবর্ম্মার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার ঐ তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী এগার জন রাজার তালিকা দিয়াছেন। ঊর্দ্ধতন রাজার নাম ছিল পুষ্যবর্ম্মা এবং তাঁহার কাল চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ভাস্করবর্ম্মার পরেই কামরূপে এক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহারই সুযোগ লইয়া রাজপরিবারের সহিত অসংসৃষ্ট শালস্তম্ভ-নামক এক ব্যক্তি কামরূপের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ঐ হইতে প্রায় তিনশত বৎসর তদ্‌বংশীয় রাজগণ কামরূপের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গ্রন্থকার ঐ রাজাদিগের যে তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় ঐ বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ শালস্তম্ভ হইতে একবিংশতিতম। এই একুশজন রাজার মধ্যে তিনজনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম হর্জ্জরবর্ম্মা, দ্বিতীয় হর্জ্জরের পুত্র বনমাল এবং তৃতীয় বনমালের পৌত্র বলবর্ম্মা। হর্জ্জরবর্ম্মার তাম্রশাসনে ৫১০ গুপ্তাব্দ (৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) অঙ্কিত আছে। ঐ শাসন হারূপ্পেশ্বর স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। বনমাল ও বলবর্ম্মার শাসনেও হারূপ্পেশ্বরের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গ্রন্থকার ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে, শালস্তম্ভ-বংশীয়েরা প্রাচীন রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান তেজপুর সহরের নিকটস্থ হারূপ্পেশ্বরে স্থানান্তরিত করেন। গ্রন্থকার ঐ তিনখানি তাম্রশাসনের সহিত হর্জ্জরবর্ম্মার খোদিত একখানি পাষাণলিপিরও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ঐ লিপি হইতে হর্জ্জরবর্ম্মার নৌবাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্যাগসিংহের সহিত শালস্তম্ভ-বংশের অবসান হইলে প্রাচীন রাজবংশীয় ব্রহ্মপাল সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা দশম শতকের শেষভাগের ঘটনা। ব্রহ্মপালের পরবর্ত্তী ঐ পালবংশীয় ছয়জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষ রাজা ধর্ম্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। এই পালরাজাদিগের ছয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপাল, দ্বিতীয় তৎ পৌত্র ইন্দ্রপাল এবং তৃতীয় ইন্দ্রপালের

প্রপৌত্র ধর্ম্মপাল—প্রত্যেকের দুই-দুইখানি। ঐ সকল তাম্রশাসনের স্থানে স্থানে শালস্তম্ভ-বংশীয় রাজাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। এমন কি শালস্তম্ভের বিশেষণ 'ম্লেচ্ছাধিনাথ'। কিন্তু বনমাল, বলবর্ম্মা প্রভৃতির তাম্রশাসনে তাঁহারা নিজদিগকে নরকবংশজাত বলিয়াই দাবী করিয়াছেন এবং ম্লেচ্ছগন্ধ থাকিলেও তাঁহারা যে হিন্দুসমাজে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইয়া উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদভাজন ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

ধর্ম্মপালের শেষ বয়সে কামরূপ রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। কারণ, গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, গৌড়াধিপ রামপাল একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার প্রতাপী অমাত্য বৈদ্যদেব দ্বারা কামরূপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ বিজিত করেন। গৌড়ীয় পালবংশের তিরোধানের পর সেন রাজা বিজয় সেন ও লক্ষ্মণ সেনও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সম্বন্ধে এক শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে "বিক্রম বশীকৃত কামরূপঃ"।

এইবার আমরা বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের সন্নিকটে আসিয়াছি। ১১২৭ শকে (১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গবিহার-বিজেতা বক্তিয়ার খিলিজি প্রকাণ্ড মোসলেমবাহিনী লইয়া কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া বঙ্গে ফিরিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার একটি স্মারক-লিপি ঐ সময় পাষাণ-গাত্রে খোদিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাক ১১২৭

শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মায়য়ুঃ॥

এরূপে দেখা যায় গ্রন্থকার 'কামরূপ-শাসনাবলী'ভুক্ত শাসনসমূহ হইতে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। আসামের সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন কালে ঐ সকল উপকরণ অনেক কাজে লাগিবে। গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত তাম্র-শাসনসমূহের মূলপাঠ ও অনুবাদ টিপ্পনীসহ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল টিপ্পনীতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। তাছাড়া প্রায় বারখানি লিপি ও শাসনের প্রতিলিপি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকার প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর পথ সুগম করিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বনমর্ম্মর—নয়টি গল্পের সমষ্টি। শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

বইখানির বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া "প্রবাসী" বলিয়াছেন যে মনোজ বসু বয়সে কাঁচা হইলেও লেখার spirit-এ অতি-আধুনিক নহেন। আমার ধারণা, তাঁহারা অত্যুক্তি করেন নাই। অতি-আধুনিক লেখকদের সহিত মনোজবাবুর একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেটি হইতেছে তাঁহার চিন্তার ধারায় এবং গল্পের বিষয় নির্ব্বাচনে। তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও অশ্লীলতার আবিলতা নাই। একটু উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে!

বইখানির দ্বিতীয় গল্প "রাজা"য় একটি পাড়াগাঁয়ের বধূ লোকের মুখে শুনিয়াছে যে তাহার স্বামী সুধীর কলিকাতায় বড় চাকুরি পাইয়া রাজার মত লোকলস্কর লইয়া

বাস করিতেছে। অনেক দিন পরে এই স্বামী যখন বাড়ী আসিতেছেন এবং বধূর সহিত মিলনের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তখন বধূ কিন্তু সাজগোজের বাহুল্যে স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠেন নাই, তিনি ভাবিতেছেন, "যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারাণো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুসী হইয়াছেন যে, সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরাণী।" যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌছায় তাহা মনোজ বসুর আছে।

গল্পগুলির মধ্যে "বনমর্ম্মর" নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে লেখক যে লিপিকুশলতা, কল্পনাশক্তি, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। মনোজ বসু কবি না হইলে ঐরূপ গল্প সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে যে retrospect-এর উল্লেখ করিয়াছি তাহা-ও এখানে বিদ্যমান। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজবধূ মালতীমালা এবং এই বিংশ শতাব্দীর সুধারাণী যেন কালের যবনিকা অপসারিত করিয়া এক হইয়া মিলিয়াছে! এই যে অতীতে এবং বর্ত্তমানে যোগসূত্র গ্রন্থন, ইহাতে মনোজ বসুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিশাশেষের বনভূমির বর্ণনা কল্পনা এবং শব্দের প্রাচুর্য্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এত কথা বলিবার পরেও মনে হয় লেখক যদি শেষের দিকে শঙ্করকে ঘোড়া হইতে আছড়াইয়া না ফেলিয়া স্বাভাবিক ভাবে গল্পের পরিসমাপ্তি করিতেন তবে তাহা আরও জোরালো হইত। মনের সম্মুখের অতি-প্রাকৃত ঘটনা অতি-প্রাকৃত রাখিলেই চলিত, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজকুমার জানকীরাম যদি বিংশ শতাব্দীর ডেপুটি শঙ্করের ঘোড়াটি সম্বন্ধে লোলুপ না হইতেন তাহা হইলেই শোভন হইত।

কিন্তু "রাত্রির রোমান্স" গল্পটি এই হিসাবে আমার নিকট একেবারে নিখুঁত বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহাতে একবিন্দু কষ্টকল্পনা বা আতিশয্য নাই। একেবারে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক গল্প পরিপূর্ণ রসে টলটল্ করিতেছে। গল্পের শেষের প্যারাটি পড়িয়া পাঠক একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবেন। যে কিশোরী বধূটি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বামীর সহিত প্রেমালাপ করিয়াছে এবং নিদ্রাতুর স্বামী তাহার গল্পকে উপেক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া অভিমানে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইতে ইচ্ছুক হইয়া চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, যে কোমল-হৃদয় ভীরু স্বামী এই পত্রাংশকে সত্য মনে করিয়া প্রত্যুষেই স্ত্রীকে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া ফিরিতেছে, সেই অভিমানিনী মহিলাই রান্নাঘরে বসিয়া ননদীর সহিত লঙ্কা ও লবণ সহযোগে কাঁচা আম জরাইয়া নির্ভাবনায় গলাধঃকরণ করিতেছে দেখা গেল। মনোজবাবুর এইরূপ হাস্যরস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে তাহার আর দুই একটি প্রমাণ দিব।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হইতেছে—প্রভা বলিতেছে, "ওঃ সর্ব্বনাশ! তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা। আর একটুখানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখ্‌লে ভাববে কি?"

এক যাত্রাদলের যাত্রার বর্ণনায় মনোজবাবু বলিতেছেন, "আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ চিঁ করিয়া বলিতেছে—দুধ, দুধ খাব বাবা---আর দ্রোণাচার্য্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে একবার বেহালাদারদের

পশ্চাদ্দেশে একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এত অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট এল্যুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য্য কোনপ্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধকরি কেবলমাত্র তপঃ-প্রভাবেই সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন।"

বইখানির সব গল্প লিখিবার কালে ছোট গল্প লিখিবার টেক্‌নিক যে লেখকের পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই তাহা লেখা হইতে ধরা পড়ে। মনোজবাবু নব-বিবাহিত দম্পতির প্রেমালাপন চিত্রিত করিতে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও প্লটের দ্বন্দ্ব দেখিলাম না। জীবন স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত তর্ তর্ করিয়া বহিয়া গেলে সুখের হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তব জীবনে ত তাহা হইবার নহে। এখানে ব্যর্থতা আছে, নিরাশা আছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে কিন্তু মনোজবাবুর গল্পে সেরূপ কোন ঘটনা ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি সরলভাবে সোজা গল্প বলিয়া গিয়াছেন। পরে তিনি যে গল্প লিখিবেন তাহাতে মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বের অভাব থাকিবে না আশা করি।

প্রচ্ছদপট শিল্পী মনীষী দের অঙ্কিত। ভালই লাগিল।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

Poems—By Humayun Kabir (Basil Blackwell, Oxford).

কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা আমার কোনদিনই পছন্দ হয় না; আর যে-মুখবন্ধ দিয়া হুমায়ুন কবির মহাশয় তাঁহার ক্ষীণকায় কবিতাপুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন তাহার মতো বিরক্তিকর ভূমিকা আমি খুব কমই পড়িয়াছি। তাহাতে এই সংবাদটি দেওয়া আছে যে পুস্তকস্থ প্রায় সবগুলি কবিতাই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। মনে হয় এ তথ্যটি নিতান্ত বাহুল্য। যে-পাঠকের কিছুমাত্র রসবোধ আছে তিনি ইহার কয়েকটি কবিতা পড়িয়াই কাঁচা ও চঞ্চল হাতের পরিচয় পাইবেন। তাড়া-হুড়ার কাজে কত যে গলদ থাকিয়া যায় গ্রন্থকার যদি তাহা জানিতেন তবে নিম্ন-লিখিত লাইনগুলি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি থামিলেন না কেন,—

On the infinite waveless ocean of
unplumbed depths (Taj Mahal).

কিংবা

Till at last encircled by the flame
I saw my lost darling (The Quest)?

আর তিনি যখন মডার্নিষ্ট্ কবি নন্, তখন 'her'-এর সহিত 'far'-এর মিল দিবার পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল। (ভূমিকায় যখন তিনি যথাযোগ্য বিনয়ের সহিত Foreigner's uncertainty about English sound-এর কথা বলিয়াছেন, তখন আশা করি, তিনি ইহারই উল্লেখ করেন নাই।) এই মিলটি আছে তাহার Faith-নামক কবিতায়। মাত্র এই কবিতাটি সমিল; অনুবাদ নহে, মূলত ইংরাজীতে লেখা বলিয়া বোধহয়; এমন কি ইহা ১৯৩০-সালের Oxford Poetry-তে

স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি কবিতায় শিল্প-কুশলতার অভাব, চিন্তার দৈন্য ও রসালুতার বাড়াবাড়িকে তিনি যৌবনোদ্‌গমের দোহাই দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে এই যৌবনাবেগে গৌরববোধও করিয়াছেন। কিন্তু এ চেষ্টা তাঁহাদের কাছে খাটিবেনা যাঁহারা তাঁহার কবিতায় (তাঁহার ভাষায়) "যৌবনের জয়" না দেখিয়া, সোজাসুজি দেখিতে পাইবেন তাঁহার মানসিক অপরিণতি ও শিল্প-তন্ত্রের শিথিলতা। তথাপি বইটি একেবারে গুণ-শূন্য নহে। ১৯২৭ সালের কবিতাগুলি বাদ দিলে—এগুলি শুধুই কথার ঝুড়ি—তাঁহার কবিতায় অনেক লাইনে সুন্দর ভাব উপযুক্ত ভাষায় ও ছন্দে সজ্জিত হইয়া রূপ পাইয়াছে। 'জেহানআরা'র উপর কবিতাটি বা শেষ কবিতা 'জন্মদিনের উপহার'-কে আমি তাঁহার শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করি। সৌন্দর্য্যবোধের বা বুদ্ধির অভাব নিশ্চয়ই তাঁহার নাই, তবে, আধুনিক ভারতের অনেক তরুণ কবির মতো ইনিও অত্যন্ত রূপকপ্রিয় ও বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই প্রবৃত্তিকে বলা যাইতে পারে, অনুধাবনযোগ্য উপদেশনাকে এড়াইয়া গীতিরূপ সৃষ্টির ফাঁকা চেষ্টা। কবিরের প্রেমের কবিতাও এই দোষে দুষ্ট। স্থান কাল ও ঘটনার খুঁটিনাটি এত বেশী যে আসল গীতি-মূলটি বর্ণনাবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। য়ুরোপের তরুণতর কবিদের অতি-আধুনিক কবিতার যে দুটি প্রধান বিশেষত্ব—সরল, বিশেষণবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ গীতিময় প্রকাশ, ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত নাটকীয় রূপ তাহার একটিও প্রত্যাশা করা বৃথা। প্রতীকগুলি ভাবালুতায় ভরা; পটভূমিকায় প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনার অপব্যবহার শুধু রসোৎসের ক্ষীণতা লুকাইবার জন্যই। বাক্‌-জালের বিস্তারে কাব্যের সুমিষ্ট ফলটি আচ্ছাদিত।

কবির মহাশয়ের গ্রন্থ দুটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা করে। ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজীতে কবিতা লেখা উচিত কি? এ প্রশ্নের বিচার করা এখানে অসম্ভব। এটুকু আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়ের ইংরাজী কবিতা মাতৃভাষায় লিখিত কবিতার উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। শুধুই difference in atmosphere, tradition and background—যাহার উল্লেখ কবির মহাশয় করিয়াছেন—ইহার সম্পূর্ণ কারণ নয়। বোধহয়, আমাদের মেজাজ ইংরাজীভাষায় ভাবপ্রকাশের অনুপযুক্ত। ইংরাজীভাষার প্রকৃতি আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রিয়তার বিরোধী। অপর প্রশ্নটি এই, অনুবাদে মূলের গুণবৃদ্ধি হয় কি না। কবির মহাশয়ের ক্ষেত্রে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার লক্ষণই এই যে তাহা অননুবাদ্য। পরিমণ্ডলটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ড্‌ ওমর খৈয়ামের ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া লইয়াছিলেন। আমার বক্তব্য ইহা নহে যে প্রকৃত কাব্যের সারভূত বিশ্বজনীনতা মূলভাষাভাষীর পরিধির বাহিরে বোধগম্য হইবার নয়। রূপনার বিস্ময়করত্ব ও প্রকাশের যাথার্থ্য অন্য ভাষায় সংক্রমিত করা যায় না। কাব্যে ভাব ও ভাবচ্ছদ ভাষার সংযোগে এমনই প্রাণময় যে এক হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। কবির মহাশয় এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিবেন। ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচনায় সাফল্যের আভাস আছে। আর আছে বাংলা ও ইংরাজী দুভাষাতেই দক্ষ পরিচালন-শক্তির পরিচয়। কিন্তু যতদিন না তিনি স্বকীয়তর প্রতীকাবলী ও রচনারীতি অর্জ্জন করিতে পারেন, ততদিন তাঁহার কিছু না লেখাই ভালো।

শাহেদ সুরহ্‌বর্দ্দি

Akbar—By Laurence Binyon (Peter Davies Limited).

এই নাতিদীর্ঘ পুস্তকখানি সম্রাট আকবরের জীবন-কথা। যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাত নহেন। তাঁহাকে লোকে জানে কলাশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া। কিন্তু ইতিহাস লেখা তাঁহার পেশা নয় বলিয়াই আলোচ্য বইখানি এমন সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে যে বাদশাহ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, অনেক জিনিস বাদ পড়িয়াছে। তবু স্মিথ, তাঁহার পুস্তকে যাহা পারেন নাই বিনিয়ান তাহা করিয়াছেন, Perspective পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। ইতিহাস হিসাবে, স্মিথের গবেষণার পর এ বই পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইতিহাসই ত সব নয়। সাহিত্যের তরফ হইতে বিনিয়ানের পুস্তকের স্থান বহু উচ্চে। তাঁহার ভাষা এত সরস ও মনোরম যে পড়িবার সময় জানা যায় না শুষ্ক নীরস ইতিহাস পড়িতেছি। অথচ প্রাঞ্জলতার অভাব কোথাও নাই। ঘটনাবলীর পশ্চাতে লুক্কায়িত যে সনাতন নীতি বা সনাতন সত্য আছে তাহা, কোথাও তুলনার দ্বারা কোথাও বিনা দৃষ্টান্তে, গ্রন্থকার সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। শেষের দিকে মোগল বাদশাহীর অন্তর্নিহিত ট্রাজেডি পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া আকবর-চরিত্রের মহিমা সুস্পষ্টতর করিয়াছেন।

মোটের উপর, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া মনে হয় যেন একখানি সুন্দর চিত্রপট দেখিলাম। জ্যোতিষ্কখচিত ভারত-গগন। মধ্যস্থলে সূর্য্যোপম এক মহিমা-মণ্ডিত জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি। তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারই আলোকে উদ্ভাসিত গ্রহমণ্ডলী। বিনিয়ান আগে কল্পনা চক্ষে এই চিত্র দেখিয়াছেন, পরে তাহাই যথাযথ অঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকের জন্য। যুগাবতার বাদশাহের এই মূর্ত্তিকে পূর্ণগৌরব দান করিবার জন্য যে রঙ ফলান উচিত তাহাই ফলাইয়াছেন, যে কাঠামোর মধ্যে তাহাকে বসান উচিত তাহাই বসাইয়াছেন, যাহাতে চিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় এরূপ জিনিস চিত্র হইতে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু পটুয়ার বাহাদুরী এই যে পট দেখিয়া মনে এত আনন্দ হয় যে তাহা বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রবৃত্তি থাকে না।

আকবরের যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবলপরাক্রান্ত শক্তিমান্ নরপতির উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অবতার ছিলেন। মধ্যযুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত ও ভৌমিকদিগকে দমনপূর্ব্বক মহাজাতি সংগঠন করাই তাঁহাদের যুগধর্ম্ম ছিল। কিন্তু এই মহাবল নৃপপুঞ্জের মধ্যে চরিত্রে আকবরের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বিনিয়ান তাই তাঁহাকে "The greatest Potentate of his time in the world" বলিয়াছেন, আর তুলনা করিয়াছেন, সমসাময়িক কাহারও সহিত নয়, প্রাচীন ভারতের মগধসম্রাট অশোকের সহিত।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইংরেজ-লিখিত অনেক পুস্তকে দুই-চারিটা হাস্যাস্পদ ভুল না থাকিয়াই যায় না। বিনিয়ান সাহেবের ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় নাই, অথচ "আকবর"-এ এরূপ গলদ নাই বলিলেই হয়। একস্থানে (৯৬ পৃঃ) "হিন্দু, জৈন, পার্সী, জরথুস্ত্রী, ইহুদী ও খৃষ্টী," এইরূপ আছে। এ ভ্রম নিশ্চয়ই অনবধান-জনিত, কারণ পুস্তকের অন্য অংশ (১০৮-১০৯ পৃঃ) হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিনিয়ান জানেন, পার্সীরাই ভারতের জরথুস্ত্রী। আর এক কথা, ইংরেজ গ্রন্থকার ভারত-সম্বন্ধে লিখিতে গেলেই, কোন না কোন রকমে তাহার superiority complex

(বড়াই) প্রকাশ হইয়া পড়ে। আলোচ্য পুস্তকে এ দোষও প্রায় নাই। জেসুইট পাদরীদের মতামতের উপর হয়ত গ্রন্থকার একটু বেশী নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পক্ষপাতশূন্য বাহিরের লোক বলিয়া, সাহেব বলিয়া নয়। দু-এক স্থলে একটু ঠাট্টাও করিতে ছাড়েন নাই,

It appeared that Akbar had the utmost reverence for Christ and delighted in the Gospel: but when he heard that there are three persons in one God, and that God had begotten a son from a virgin, then 'the king's judgment was dulled and clouded.' (P. 97).

উপরে বলিয়াছি যে বিনিয়ান মুক্তকণ্ঠে আকবরকে সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়াছেন। ১৯ পৃষ্ঠায় আকবরের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন—

But a man shows his greatness by the measure in which he surpasses the standards of his age. Akbar's acts of cruelty, less cold-blooded than the cruelties of contemporary rulers in Europe—and even twentieth-century Europe cannot afford to give itself superior airs in this respect—these acts shock us because they were done by Akbar, who could be so singularly generous and forgiving.

এখানে পাঠক স্মিথের সহিত বিনিয়ানের তুলনা করুন। স্মিথ্ স্বীকার করিয়াছেন যে প্রথম জীবনে নানাপ্রসঙ্গে আকবর দয়াপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সম্রাটকে দয়ালু স্বভাব বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে আকবর প্রথম জীবনে নানা বিপদজালে বেষ্টিত ছিলেন বলিয়া ভয়ে লোককে শাস্তি দিতে সাহস করিতেন না। সমসাময়িক সাহেবেরা অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছেন যে আকবর ন্যায়পরায়ণ, সরলচিত্ত ও দয়াপরবশ ছিলেন। স্মিথ্ সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া এক Bartoli-র মত গ্রহণ করিয়াছেন যে বাদশাহ বাহিরে দেখিতে সরল ছিলেন কিন্তু অন্তরে স্বার্থপর ও মতলবী ছিলেন। ইতিহাস মিথ্যা কথা বলে না বটে কিন্তু ঐতিহাসিকেরা অনেক মিথ্যা কথাই বলেন। এই যুগেরই ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী একজন বিখ্যাত সদানন্দ নির্ভীক বীর ছিলেন। কিন্তু ক্যাথলিক ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ক্রমাগত বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সত্যের অপলাপের উদ্দেশ্য propaganda, কোন একটা বিশেষ মতের প্রচার। বিনিয়ান এরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া আকবরের জীবনকথা লিখিয়াছেন এমন মনে করিবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যদি কোন গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতে না পারেন যে মেরী ও এলিজাবেথের দেশের তুলনায়, বর্জিয়া মেডিচিদের দেশের তুলনায়, সেণ্ট বার্থলোমিউ হত্যাকাণ্ডের দেশের তুলনায়, প্রটেষ্টাণ্ট্ উন্মূলন বা Inquisition এর জন্মভূমির তুলনায় ভারতের দয়া-দাক্ষিণ্যের আদর্শ অনেক উচ্চে ছিল, তাহা হইলে সেই গ্রন্থকারকে Miss Mayo-র সমধর্ম্মী বলা ছাড়া উপায় কি? উপরে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতে পাঠক দেখিবেন যে বিনিয়ান এ বিষয়ে সত্য কথা বলিতে ভয় পান না। আর একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে পাণিপথের যুদ্ধের পর বিজিত হিন্দুবীর হেমুর মাথা কাটিয়া ফেলা হয়। যুদ্ধান্তে হেমু আহত অবস্থায় আনীত হইলে বেহরাম খাঁ বালক আকবরকে বলিলেন, "উহার মাথা স্বহস্তে কাটিয়া গাজী হও।" বিনিয়ান

অধিকাংশ সমসাময়িক লেখকের মতানুযায়ী হইয়া বলিয়াছেন, আকবর আহত শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে সম্মত হইলেন না। স্মিথ্ কিন্তু এই লেখকবৃন্দকে চাটুকার আখ্যা দিয়া এক আহম্মদ্ য়াদ্‌গারের কথা গ্রাহ্য করিয়া বেশ জোরের সহিত লিখিয়াছেন, আকবর হেমুর মাথা স্বহস্তে কাটিলেন। Propaganda বই আর কি? এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সত্য নির্দ্ধারণের জন্যও বিনিয়ানের পুস্তকের প্রয়োজন ছিল।

আকবর বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী তুর্কীযোদ্ধা তৈমুরের বংশধর। তাঁহার পিতামহী গুলবদন বানু নির্ম্মম নির্ভীক মোঙ্গলবীর চেঙ্গীসের বংশজাতা। তুর্কী ও মোঙ্গল এই দুই রক্তের ধারা আকবরকে যুদ্ধ-পাগল করিবে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যে মহাবীর ছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। বিনিয়ান তাঁহার সাহস ও বাহুবলের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী বশ করিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সশস্ত্র মহাবল আহমদ্ খাঁকে তিনি তাঁহার বজ্রমুষ্টির এক আঘাতে প্রায় বধ করিয়াছিলেন। চিতোর অবরোধের সময় বহুদূর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া জয়মল্লকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব হয়ত ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীও পারিতেন। আকবর যে শুধু মল্লবীর কি সেনানী কি দিগ্বিজয়ী ছিলেন তাহা ত নহে, তাঁহার হৃদয়ে অসংখ্য সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল। মাতা হামিদাবানুর রক্তের সহিত ইরাণের কাব্য, ইরাণের চিত্রকলা, ইরাণের স্বাধীন চিন্তা তাঁহার ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

পিতামহ বাবরশাহ জগজ্জয়ী বীর হইলেও কবি ছিলেন, সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিনিয়ান বড় সুন্দর কয়টি কথা লিখিয়াছেন ঃ

A man could win his heart by his love of poetry as surely as by his swordsmanship. Was he flying from his enemies in bitter weather with a handful of followers, he would compose a few couplets as he rode, and his spirits revived as by magic. But it was his intense delight in the beauty of the world which made so large a part of his unquenchable zest in life. Was ever such a lover of flowers? His first thought in a newly acquired territory was to make a garden.

পিতা হুমায়ুন যোদ্ধা ছিলেন না, বাবরের সাম্রাজ্য সহজেই হারাইলেন। তাঁহার নিকট হইতে পুত্র যুদ্ধবিদ্যা শেখেন নাই। কিন্তু ইরাণের culture- (কৃষ্টি) এর সহিত আকবরের মিলন তিনিই করাইয়াছিলেন। যখন পুত্রের জন্ম হয় তখন হুমায়ুন সাম্রাজ্যহীন সম্রাট, নানারূপে বিপন্ন। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করার চেষ্টা একদিনের তরেও ত্যাগ করেন নাই। গ্রন্থকার আকবরের বাল্যশিক্ষার বিবরণ অল্পকথায় কিন্তু সুন্দর ভাষায় দিয়াছেন। অক্ষর পরিচয় হইল না বটে কিন্তু হাফেজ্ ও রুমীর কবিতা আগা-গোড়া আবৃত্তি করিতে শিখিলেন।

একটা কথা বিনিয়ান বলেন নাই কিন্তু বলিতে পারিতেন। পরজীবনে আকবরের হিন্দুদের সহিত যে ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছিল তাহারও গোড়া-পত্তন পিতার চরিত্রে। হুমায়ুন চিতোরের কুমারী কর্ণাবতীর রাখী-ভাই ছিলেন। ধর্ম্মান্ধ হিন্দুবিদ্বেষী হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না। পরে যখন উমরকোটে আকবরের জন্ম হইল তখন হুমায়ুনের প্রধান সহায় ও দেহরক্ষক ছিলেন এক হিন্দু রাণা ও তাঁহার সৈন্যদল।

এইরূপ নানা কারণে আকবরের মনে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা সার্ব্বজনীন ভাব অল্প বয়সেই বিকশিত হইয়াছিল, ফৈজী ও তাহার ভ্রাতার সহিত পরিচয়ের অনেক পূর্ব্বে। ইহারই ফল ফতেহপুরের ইবাদতখানা ও নবধর্ম্ম দীন ইলাহীর প্রচার।

এ পর্য্যন্ত বোঝা যাইতেছে যে আকবর একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর ও সুফী ভাবুক। কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষাও মহৎ ছিলেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসের সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে কত স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বদা এই একই উদ্দেশ্যে যে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন আর সেই সাম্রাজ্যের চালনায় ভারতের সকল জাতি সকল সম্প্রদায়কে তাঁহার সহায় করিবেন। বিনিয়ান ঠিক বলিয়াছেন যে বিজিত স্বাধীন রাজাদের জন্য দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্রাটের উদ্দেশ্য যে কত মহৎ তাহাও আজিকার দিনে ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। যে সৌধ নির্ম্মাণ তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল তাহাই কি আজ আমাদের রাষ্ট্রনীতির মুখ্য কাম্য নয়? যদি এরূপ বলা যায় যে আকবর নিষ্কাম ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করিতেন, হয়ত কথাটা ভাল শুনাইবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে অনেক সময়ে সম্রাট শত্রুবধের পর গভীর অনুতাপে দগ্ধ হইতেন। দিল্লীতে জয়মল্ল ও পত্তের মূর্ত্তিস্থাপন বোধহয় এইরূপ পশ্চাত্তাপের দৃষ্টান্ত।

আকবরকে বিদেশী বিজেতা মনে করার মত ভুল আর কিছু নাই। তিনি বিদেশ হইতে আসেন নাই, এই দেশেই তাঁহার জন্ম। সিংহাসনে বসিয়া সারা জীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীর চক্ষে তিনি বিদেশী বা বিধর্ম্মী না থাকেন। হিন্দুকন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, গোঁড়া মুসলমান ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। পরিশেষে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। স্বধর্ম্মীদের প্রতি সদ্ব্যবহার হয়ত করেন নাই কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারাও রাজকার্য্যে সম্রাটের সমদর্শন, ধর্ম্মবিষয়ে সার্ব্বজনীন উদারমত বুঝিতে পারিতেন না। নিন্দাবাদও করিতেন, শত্রুতাচরণও করিতেন। সম্রাট মথুরাযাত্রীদের দেয় কর রদ করিলেন, জিজিয়া কর উঠাইয়া দিলেন, এ সব বাদৌনিপ্রমুখ মুসলমানদের কিরূপে ভাল লাগিবে? ভগবানদাস, মানসিংহ, টোডরমল্লকে বিশ্বাস করিয়া শাসকসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, ইহা মোগল আমীর উমারাওদিগের কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইবে? কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আকবর স্বজাতি স্বধর্ম্মীর বিরাগভাজন হইয়াও এই সব কাজ করিলেন সে উদ্দেশ্য ত সফল হইল। বাবর ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান বাদশাহেরা কেহই ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আকবর পারিয়াছিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী সে সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। আরও এক শতাব্দী আকবরের বংশধর দিল্লীর তক্ত অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যদিও সে তক্ত নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বিনিয়ান এ সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন এবং বারবার বলিয়াছেন যে আকবর অন্তরে সুফী ফকীর ছিলেন, স্বার্থপর ভোগী ছিলেন না।

তিনি একটা আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন। নানাসময়ে বাদশাহ যে অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিতেন তাহার মূল উদ্দেশ্য নিজের বাহাদুরী প্রকাশ নহে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। যেন তিনি ভগবানকে বলিতেছেন, "এই ত সুযোগ দিতেছি যদি আমি অযোগ্য হই আমার জীবন শেষ করিয়া দাও।" এইরূপ এক ঘটনা ৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তখন আকবর চৌদ্দ বৎসরের বালক। একদিন সংসারের

ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বাদশাহ আগ্রার নিকটস্থ মরু-প্রদেশে বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে কেহ নাই, সহিস পর্য্যন্ত নয়। সেখানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বসিলেন। উদ্দাম অশ্ব পলাইয়া গেল। বালক অনেকক্ষণ বসিয়া ধ্যানস্থ রহিলেন। কিছুকাল ভগবৎ-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রাণমন শান্ত শীতল হইল। কিন্তু একাকী কি করিবেন? কোথায় যাইবেন? এমন সময়ে দেখিলেন অশ্ব হায়রান হইয়া দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। প্রভুর নিকটে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যেন বলিতেছে, "হাজির জাহাঁপনা"। আকবর বুঝিলেন ভগবান তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন সিংহাসনে ফিরিয়া যাইতে। বিনিয়ান বলেন, "This adventure was the prelude to other experiences of a like nature"। রাজসিক চাঞ্চল্যের সহিত সাত্ত্বিক শান্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এই রাজর্ষিতে। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা বোঝা যায় না। প্রয়োজন বোধ করিলেই তিনি সংগোপনে ভগবানের আদেশ প্রার্থনা করিতেন, আর সেই ধ্যানলব্ধ আদেশ সত্য হউক বা কল্পিত হউক অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। ফতেহপুর সিক্রী নির্ম্মাণ করিবার জন্য চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কি আশ্চর্য্য উদ্দাম ও অধ্যবসায় দেখাইলেন। তারপর পচিশ বৎসর যাইতে না যাইতে হঠাৎ সেই বিশাল নগরী ত্যাগ করিলেন, চিরদিনের জন্য। মস্‌জিদের তোরণের উপর ক্ষোদিত বাণী সার্থক হইল, "ঈশা বলিয়াছেন, এই জগৎ সেতুস্বরূপ, ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাও কিন্তু কদাপি ইহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিও না।"

শেষ জীবনে সম্রাট কষ্ট পাইয়াছিলেন পুত্রদের জন্য। দানিয়ল মুরাদ অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া অকালে পরলোকে গেল। জ্যেষ্ঠ সেলিম বাবরের বংশে পিতৃদ্রোহ পাপের বীজ বপন করিল। তাঁহার চরম কুকীর্ত্তি আবুল ফজলের হত্যা। আকবর পুত্রবৎসল ছিলেন তথাপি এ মহাপাপ তিনি আমরণ মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই। অসীরগড় বিজয় যুদ্ধক্ষেত্রে আকবরের শেষ কীর্ত্তি। তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেলিমের জন্য প্রাণে শান্তি নাই। অসীরগড় দখল করার সময় তিনি এমন সব কার্য্য করিয়াছিলেন যাহা বীরজনোচিত বলা যায় না। বিনিয়ান একথা স্বীকার করিতে একটুও দ্বিধা করেন নাই। দাক্ষিণাত্য জয় স্থগিত রহিল। কিন্তু পুত্রকে বিশাল সাম্রাজ্য দিয়া গেলেন, আর রাজপুতদিগকে সেই সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার কাজে বহাল করিয়া গেলেন।

আমার সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবু হয়ত পাঠককে বিনিয়ানের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না। আমার একান্ত অনুরোধ, সকলে বইখানা নিজে পড়েন।

পুস্তকে সম্রাটের একখানি প্রাচীন চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্রখানি অতি সুন্দর। দেখিলে বোঝা যায় যে আকবর তুর্কী ও মোগল রক্তে জন্ম লইয়াও ভারতবাসী বই আর কিছু ছিলেন না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

The Fountain—By Charles Morgan (MacMillan & Co.).

সত্যসত্যই ভালো ইংরাজী নভেলের আজকাল এতই অভাব যে যুদ্ধের পর হইতে প্রকাশকদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশী লেখকের অনুবাদ ছাপিতে হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্পর্শও এ ঝোঁকের সহায়তা করিয়াছে। কাজেই মর্গ্যান্-এর ফাউন্টেন-এর মতো কোন যথার্থ ভাল নভেল সাধারণের নিকট উপস্থাপিত হইলে তাহাকে অভিনন্দন করাই কর্ত্তব্য। ইহাকে কোনক্রমেই মহৎ গ্রন্থ বলা চলেনা, যদিও মহত্ত্বের অনেক নিদর্শন বইটিতে বিদ্যমান। যে-ধরণের চমৎকার রচনা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আজ ইংলণ্ডে উপেক্ষিত; অথচ ইহা ইংরাজী নভেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারার সহিত নিকটসম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে আরো আছে সম্মোহন, প্রশান্তি ও চিন্তার গভীরতা—যাহা গ্রন্থকারের স্বকীয় বিশেষত্ব। যেখানে তিনি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেখানে আমরা এমন অন্তর্ভেদী, প্রায় নিষ্করুণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখিতে পাই যাহা সচরাচর ইংরাজী পুস্তকে চোখে পড়েনা ও যাহা হইতে গ্রন্থকারের য়ুরোপীয় রচনাপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়। তাঁহার জীবনদর্শনে ইংরাজিত্ব নাই বলিলেই চলে—দু'এক স্থানে ছাড়া; যেখানে তাঁহাকে ব্যবসায়-বুদ্ধির দিক দিয়া বইটির খুব কাটতির কথা ভাবিতে হইয়াছে, অথবা যেখানে লোকচিত্তের উপর আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের প্রভাবের পরিমাপ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ যখন হল্যাণ্ডের মনোরম বর্ণনাগুলি পড়া যায়—স্থবির, নিরপেক্ষ কৃষক-আভিজাত্যের ঘুণ-ধরা সাধুতাপূর্ণ হল্যাণ্ড—ও তাহার পর যুদ্ধশীল জাতিগুলির বিভিন্ন নরনারীর মানসিক বিশ্লেষণের অংশগুলির সহিত প্রতি-তুলনা করা যায়, তখন ভয় হয় মর্গ্যান্ বুঝি-বা সমর-সাহিত্যের সদ্য-স্ফীত ধারাকেই প্রবদ্ধনের চেষ্টায় আছেন। এই সমর-সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপে একটি বিশেষ অভাব পরিপূরণ করিতেছে; ইহা একদিকে যুদ্ধকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে; অন্যদিকে তাহার শোকাবহ করুণ স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চায় তাহাদের জন্য যাহারা পূর্ব্বতন সামরিকগণের অক্ষমতার বিষয়ে উদাসীন ও যাহারা ভুলিয়া যায় যে তাহারা উচ্চ-নিনাদিত মন্ত্রের নিকট আত্মাহুতি দিয়াছিল। কিন্তু মর্গ্যানের মতো ক্ষমতাশালী লেখক বিরল। তাই তিনি স্বীয় বৃত্তির অখণ্ডতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রেমবিষয়ক বিস্ময়কর পৃষ্ঠাগুলি লিখিয়া ফেলিলেন। মর্গ্যানের মনস্তাত্ত্বিক সত্যশীলতা গল্পটির ন্যায়সঙ্গত পরিণতি পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই বটে, শেষ মধুর মিলনের চিত্রটি প্রত্যাশিত ও দুর্ব্বল—তা সত্ত্বেও আমরা অনেক আবেগকম্পিত পরিচ্ছেদ পড়িতে পাই যাহাতে প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহার একমুখিনতা, তাহার প্রলয়ঙ্কর সমারোহ, তাহার আত্মসর্ব্বস্ব আত্মত্যাগ ও তাহার সন্ন্যাসময় সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় হল্যাণ্ডের প্রান্তস্থিত একটি দুর্গে একদল ইংরাজ সেনাপতি কথা দিয়া বন্দী আছে গল্পের আরম্ভ এইখানে। নায়কটি ঠিক সাধারণ সৈনিক শ্রেণীর নহে, যদিও সৈনিকোচিত সমস্ত গুণাবলী তাহার আছে। সে ছিল একটি ইংরাজ প্রকাশালয়ের অংশীদার। অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে খুঁজিতেছিল এমন সংকীর্ণ নির্জ্জন স্থান যেখানে সে মানব জীবনের চিন্তাগর্ভ মুহূর্ত্তগুলির সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিতে পারিবে। সেনাপতিরা শপথগ্রহণের পর বড় বড় সহরে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ইংলণ্ডে পলাইয়া গেল, কেননা তাহার

প্রাণ ছিল যুদ্ধোন্মাদনায় পূর্ণ, তাহার দেশ যখন যুদ্ধ করিতেছে তখন তাহার পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব। সম্প্রতিকার সামরিক সাহিত্যে সেনাপতিগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে লেখকদিগের অন্ধ আস্থা দেখা যায়। মর্গ্যানের পুস্তকেও দেখা যায়, সেনাপতিটি সাধারণ ফর্ম-এর অনুরূপ একটি প্যারোল্-ফর্ম ছাপাইল যাহাতে ফিরিয়া আসিবার দিব্য করার কথাগুলি ছাপা হইল না। দুর্গের অধ্যক্ষ অবশ্য সে-চালাকী ধরিতে পারিলেন না, কাজেই ইংরাজ সেনাপতিটির ধর্ম্মবোধ ও সমরবাসনা দুই-ই বজায় রাখা হইল। মর্গ্যানের মনের গতি দেখাইবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অসংলগ্ন ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। নায়কের পলায়নে ইচ্ছা নাই, তথাপি সহচারিত্বের উপরোধ, তাহারই শয্যাতল হইতে সুড়ঙ্গ খননে সহায়তা করিল ও এ প্রচেষ্টা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় মহাস্বস্তি পাইল। তাহার রচনায় সে একান্ত নিবিষ্ট, বিশ্ব জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত, এমন সময় হঠাৎ একদিন হলণ্ডের অতি প্রাচীন ভান্ লাইডেন বংশের এক ভদ্রলোক দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসায়, তাহার মনে পড়িয়া গেল একটি বালিকার কথা যাহাকে সে ইংলণ্ডে পড়াইত ও যাহার মাতা স্বামীবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ ভান্ লাইডেন-এর শিশুগুলির গভর্ণেস্ হইয়া আসিয়া পরে তাহাদের বিমাতৃত্বে উন্নীত হইল। দুর্গত্যাগের পর সে একটি বন্ধুর সহিত ভান লাইডেন জমিদারীতে বাস করিতে চলিল, তাহাদের বহুমূল্য গ্রন্থাগারের আকর্ষণে। এখানে তাহার প্রাক্তন ছাত্রী জুলি-র সহিত সাক্ষাৎ। তাহাদের পরস্পরের অনুরক্তি বাড়িবার কারণ এ নয় যে তাহারা কোন এক সময়ে মিলিত হইয়াছিল; কারণ এই যে জুলি ইংরাজকন্যা, সুতরাং যুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের তীব্রতা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিত। তাহার বিবাহ হইয়াছিল ফন্ নার্ভিৎস্-নামক একজন অভিজাত বংশীয় জর্ম্মান অফিসারের সহিত। জুলি তাহার নামই করিত না। স্বজাতীয় সমবেদনার জন্য সে শ্বশুরকুল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হল্যাণ্ডে মায়ের কাছে বাস করিতে আসিয়াছিল, তাহার স্বামীরই ব্যবস্থায়। জুলি কোনদিন তাহার স্বামীকে ভালোবাসিতে পারে নাই, কিন্তু প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করে; সে জানে তাহারই পূজার জন্য স্বামী নিজের হৃদয়কে প্রেমমন্দিরে পরিণত করিয়াছে। সন্দেহ জাগে, না ভালোবাসার কারণ সম্ভবতঃ এই যে কোন লোকপ্রিয় পুস্তকে ইংরাজললনার বিদেশীকে ভালোবাসিতে পারা অসম্ভব। অনেক মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণার পর ও সপ্তদশ শতক সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়নে সহকর্ম্মিতার ফলে (যে-পুস্তক নায়কের কারবার ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না) অ্যালিসন্ ও জুলি সহবাস করিতে সঙ্কল্প করিল। জুলির প্রেমপরায়ণতা ও আত্মসম্মানবোধ ইহাকে দেখিল যেন একটি ক্ষণস্থায়ী আনুষঙ্গিক ব্যাপার, চলমান জগতের একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা, প্রুসীয় প্রাসাদে আচারবহুলতার মধ্যে স্বামীপ্রেমে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে একটি মায়াময় উজ্জ্বল দৃশ্য। তারপর ফন্ নার্ভিৎস্‌কে আনা হইল ভান্ লাইডেনদের সংসারে। আর তিনি আগের মানুষটি নহেন, বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, দেহ যেন কতকগুলি খণ্ডাংশের সমষ্টি, সুধু দৃষ্টির সারল্য তাঁহার চোখে রহিয়া গিয়াছে। মর্গ্যান্ তাঁহার শিল্পকলার শীর্ষদেশে উঠিয়াছেন নার্ভিৎস্-এর অনমনীয় অভিজাত ধর্ম্মের বর্ণনায়, যাহা ষ্টোইক্ মহত্ত্বের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার ভিতর দিয়া গিয়া প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছে। জুলির খামখেয়ালী অথচ অপরূপ কোমল স্বভাব ইঁহার মহত্ত্বর

আত্মশক্তির নিকট নত হইয়া পড়িল। ইঁহার শারীরিক সংস্পর্শ সহ্য করিতে না পারিলেও, জুলি তাঁহাকে যে অনিচ্ছাবিহীন, ঋদ্ধিসম্পন্ন ও স্থায়িষ্ণু প্রেম নিবেদন করিল তাহাতে এমন একটি রিবিক্তি অথচ পরিপূর্ণতা ছিল যাহা সে কখনও তাহার প্রেমিককে উপহার দিতে পারে নাই। আর অ্যালিসন্ তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইল চিন্তাশীলতার শরীরী মূর্তি, বিশ্বের তরঙ্গাঘাতে যাহা প্রশস্ত দুর্গের মতো অটল স্থির হইয়া গিয়াছে। জলি যে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে তাহা স্বামীর অগোচর রহিল না। তাঁহার উৎসর্গীকৃত প্রেমই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিল; এখন নিজেকে অনাবশ্যক বুঝিয়া তিনি বাঁচিবার আগ্রহ ত্যাগ করিলেন। অনন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার ক্রমিক ক্ষয়প্রাপ্তি ও তাঁহার চরম অবসানের শেষ দৃশ্য বোধহয় বইটিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। পরিশেষে অ্যালিসন্ ও জুলি পরিণীত হইল।

মর্গ্যানের একটি বিশিষ্ট অভ্যাস আছে, কতকগুলি চরিত্রে ভাস্কর্য্যের উচ্চাবচতা প্রবর্ত্তন করা আর কতকগুলিকে প্রায় অখোদিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা। চরিত্রচিত্রণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায় সেইগুলিতে যেগুলিকে তিনি হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। জুলি, ফন্ নারভিৎস্, ও বৃদ্ধ ভান্ লাইডেন, সংযতবাক্, শক্তিমান্, সংকল্পিতমতি, ও কোমলচিত্ত,—এই চরিত্রগুলিকে তিনি প্রাণময় ব্যক্তিত্বের সজ্জায় সাজাইতে চাহিয়াছেন। গল্পের নায়ককে তিনি নিজ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন, তাই তাহাকে প্রত্যক্ষ করার মতো তথ্য আমরা পাই না। অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এ মন্তব্য আরো খাটে, যদিও মাঝে মাঝে তাহাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যে-দৃশ্যে জুলি বিস্রস্তবসনে তাহার ঘরে প্রেমিকের অপেক্ষায় আছে, অথবা যে দৃশ্যগুলিতে ফন্ নারভিৎস্ মানবাত্মার গৌরবের বর্ণনা করিতেছেন আর তাহারা তাহাদের গুপ্তপ্রণয়ের অপরিহার্য্য প্রকাশ-সম্ভাবনায় কম্পিতচিত্তে তাঁহার নিকট ঘেঁষিয়া বসিতেছে—এগুলির বর্ণনায় মর্গ্যান্ সামাজিক নীতিব্যবহারের যে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে নিঃসন্দেহে সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের প্রথমশ্রেণীতে বসানো যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অন্তর-বিশ্লেষণের সকরুণ ক্ষমতা যাহার সহিত মিশিয়া আছে নিষ্করুণ ন্যায়শীলতা ও জীবনপ্রবাহে জ্ঞান ও জ্ঞানাতীতের প্রতি সুগভীর অনুকম্পা।

শাহেদ সুরহবর্দ্দি

The Essential Shakespeare—By J. Dover Wilson, (Cambridge University Press).

সাহিত্যজগতে মতভেদের অন্ত নাই, মিলের চেয়ে গরমিলের উদাহরণই অতি সহজে চোখে পড়ে; ইহাদের অনুপাত পৃথিবীর স্থলজলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক বেশী। তবু একটি সাহিত্যিক সত্য হিমালয়ের উচ্চতার মতনই অবিসংবাদিত। তাহা এই, শেক্স্পিয়ার সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চেষ্টা হইয়াছে গ্রীসের প্রাচীন নাট্যকারত্রয় বা ইটালীর দান্তেকে তাঁহার সমকক্ষ প্রমাণ করিতে। কিন্তু কবিকে মানবজীবনের অখণ্ড সমগ্রতার অবিকার চিত্রশিল্পী হিসাবে দেখিলে এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র হোমারই

হয়ত এ সমকক্ষতার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রেও বলা যায় নাকি জীবনের বিস্তৃতিবোধে তাঁহার ক্ষমতা শেক্‌স্‌পিয়ারের সমশ্রেণীর হইলেও, জটিলতাবোধে শেক্‌স্‌পিয়ারের দৃষ্টি গভীরতর? ইংরাজের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্নজগতে যত ক্ষতি হইয়া থাকুক, মনোজগতে পরমলাভ এই শেক্‌স্‌পিয়ারের সহিত পরিচয়। ইংরাজীভাষার সম্যক অনুশীলন ব্যতীত এ পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হইতে পারে না। কোন্ অনুবাদে মূলের অভাব মিটাইতে পারে? আর অনুবাদকের হাতে পড়িয়া অনেক সময় বড় কবিদের কি দুর্দ্দশা হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের ফরাসী অনুবাদ।

জানিনা কেন, ইংরাজীভাষার প্রচুর আলোচনা সত্ত্বেও আমরা শেক্‌স্‌পিয়ারের নিকট হইতে যতটা শেখা উচিত ততটা শিখি নাই। বঙ্গসাহিত্য মিলটন বাইরন শেলী কীট্‌স্ স্কট-এর নিকট যতটা ঋণী, শেক্‌স্‌পিয়ারের নিকট তাহার সিকিও নহে। বাংলাভাষায় নাটক আছে নামে মাত্র। গুণবিচারে এমন তিনখানি নাটক পাওয়া যায় না যাহারা কোন বিখ্যাত ইংরাজী নাটকের পাশে দাঁড়াইতে পারে। নাটক না হইয়াও একটিমাত্র বাংলা পুস্তক অনাসক্ত কল্পনার সাবেগ স্ফুটনে শেক্‌স্‌পিরিয়ন্তের পর্য্যায়ে পড়ে—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। এ কথা সত্য নয় যে বাংলা নাট্যকারেরা শেক্‌স্‌পিয়ারের সহিত পরিচিত নহেন। বরং অনেকস্থলে তাঁহার অন্ধ ও অসংলগ্ন অনুকরণ হাস্য ও করুণার উদ্রেক করে। এই অক্ষমতার মূলে আছে শেক্‌স্‌পিয়ারের বিশাল প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব। এমন পাঠকের সংখ্যা বিরল নয় যাঁহাদের শেক্‌স্‌পিয়ার ভালো লাগে অবান্তর কারণে, যে বিশিষ্ট কারণে লাগা উচিত তাহার জন্য নয়। অনেক পাঠকের নিকট শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকাবলী নৈর্ব্যক্তিক শিল্পকুশলতার চরম নিদর্শন। ইহাদের পিছনে যে গতিশীল, প্রতিক্রিয়া-প্রবণ মানবীয় মন আছে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহারা যথেষ্ট সচেতন নহেন। কাব্য বুঝিতে গিয়া কবিপ্রকৃতিকে বুঝিতে চাহি না বলিয়া আমাদের কাব্যবোধ সম্পূর্ণ ও সৃষ্টি-সমৃদ্ধ হইয়া উঠে না।

এ ত্রুটি সুধু আমাদের দেশেরই বিশেষত্ব নয়. যে দেশে শেক্‌স্‌পিয়ারের জন্ম সেখানেও ইহা অল্পবিস্তর দেখা যায়। সেখানেও কবির কাব্যের আলোচনা হয় জীবনকে বাদ দিয়া, জীবনের আলোচনা হয় কাব্যকে বাদ দিয়া। সিড্‌নে লি লিখিত শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনচরিত কবির জীবন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। তথ্য ইহাতে বহুল আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারের যে-ছাপ ইহা মনে মুদ্রিত করিয়া দেয় তাহা বিশ্বের অদ্বিতীয় কবির নহে, যেন কোন সফলকাম বণিকপ্রবরের। ষ্ট্র্যাটফোর্ড-এর রাখাল বালক কেমন করিয়া লণ্ডনে আসিয়া কাব্যের ব্যবসা করিয়া, পয়সা করিল—ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য; নিজের ও কন্যা দুইটির সংস্থানসংগ্রহ ছিল যেন কবির সাহিত্য-সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে এক কথায় এই বলিয়া বর্ণনা করা যায়, ইহা সিড্‌নে লি-র জীবনচরিতের তীব্র প্রতিবাদ। অবশ্য ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নহে, দেড় শত পৃষ্ঠার মধ্যে তাহা আশা করা বৃথা। ইহা একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা, a biographical adventure। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, কেহ যেন গ্রন্থের নাম দেখিয়া ভুল না বোঝেন। "Here, in a nutshell, is the kind of man I believe Shakespeare

to have been " is what it is intended to convey । তাঁহার ধারণা, অগণ্য জীবনচরিতের মিথ্যার তলে সত্য শেক্‌স্‌পিয়ার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করিতে চান। তিনি জানেন, কোন জীবনচরিতই লেখক-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, লেখকের স্বকীয় ঝোঁক বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্রগঠন নিয়মিত করে। প্রত্যেক চরিতকারের মনে তাঁহার বিষয়-বস্তুর একটি আলেখ্য ফুটিয়া উঠে, তাঁহার লিখিত জীবনচরিতকে সেই আলেখ্যের অনুবর্ত্তী হইতেই হয়। ডোভার উইলসন্ বলেন, ষ্ট্রাটফোর্ড-এ শেক্‌স্‌পিয়ারের যে আবক্ষ মূর্ত্তিটি আছে তাহাই সিড্‌নে লি-কে ভুলপথে চালাইয়াছে। গারার্ট য়ানসেন্ কৃত এই প্রস্তর মূর্ত্তি সাধারণতঃ শেক্‌স্‌পিয়ারের যথার্থ প্রতিকৃতি বলিয়া গৃহীত; কিন্তু ডোভার উইলসনের মতে শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির পথে এই মূর্ত্তিটি সব থেকে বড় বাধা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মূর্ত্তিটিতে নাকি ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্ব্বোধ ও আত্মতুষ্ট বিত্তশালীর ভাব। লি অনেকবার ষ্ট্রাটফোর্ড-এ গিয়া এ মূর্ত্তিটি ধ্যান করিতেন। তাই তাঁহার রচনা হইয়া উঠিয়াছে, এ মূর্ত্তিটি সজীব হইলে যেরূপ মানুষ হইত তাহার, শেক্‌স্‌পিয়ারের নহে।

লি-র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহাভিযানের ধ্বজা ডোভার উইলসন্ তাঁহার গ্রন্থের মুখচিত্র হইতেই উড়াইয়াছেন। এ মুখচিত্রটি শেক্‌স্‌পিয়ারের নহে, তাঁহার একান্ত সমসাময়িক একজন যুবকের প্রতিকৃতি। ইহা "গ্রাফ্‌টন্ পোর্ট্রেট্" নামে পরিচিত। ছবিটির বিশেষত্ব এই, চিবুক, ঠোঁট, নাক ও প্রকাণ্ড কপাল মিলাইয়া দেখিলে শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রচলিত প্রতিকৃতির সহিত ইহার ঘন সাদৃশ্য আছে, অথচ ইহার মুখের ভাব শেলীর মুখের মতো কবিত্বপূর্ণ ও চোখের দৃষ্টি অপূর্ব্ব বিস্ময়কর। এমন কোন প্রমাণ নাই যে ছবিটি শেক্‌স্‌পিয়ারের। অথচ ডোভার উইলসন্ বলেন, তিনি যত এটিকে দেখেন, ততই তাঁহার লোভ হয় ইহাকে শেক্‌স্‌পিয়ারের মূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে। অন্ততঃ তাঁহার বিশ্বাস, এটিকে প্রকৃত বলিয়া ভাবিলে শেক্‌স্‌পিয়ারের কবিপ্রকৃতিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত নাই-ই, তাঁহার কবিত্বের মর্ম্মোপলব্ধি করার সম্ভাবনাই বেশী।

এই সূত্রে গ্রন্থকার শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে আরো দু-একটি সুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়া সজোরে খণ্ডন করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পিয়ার সর্ব্বকালের কবি ত বটেনই কিন্তু একথা সাধারণতঃ মনে রাখা হয় না যে তিনি তাঁহার সমকালের কবিও বটেন। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল তাঁহার সমকালবর্ত্তীদের আনন্দবিধান করা। তাই তাঁহার নাটক তৎকালীন ঘটনাবলীর সরল ও বক্র উল্লেখে পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। এরূপ অনেক উল্লেখ বৃত্তিকারেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তবু আরো কত যে লুকাইয়া আছে তাহার অবধি নাই। এলিজাবেথীয় ও জাকোবীয় যুগকে তন্ন তন্ন করিয়া না জানিলে এ সমস্ত আবিষ্কৃত হইবার নয়। আর এই সময়কার বাহ্য ও আন্তর ইতিহাসের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের আলোকে তাঁহার কাব্য পড়িতে হইবে, নহিলে তাঁহার কবিপ্রকৃতির রহস্য আমাদিগকে এড়াইয়া যাইবে। শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে আর একটি অতিপ্রচলিত ধারণা, তাঁহার ছিল চরম জ্ঞান ও পরম শান্তি। ছিলই ত, কিন্তু চিরদিনই কি তিনি এইরূপ জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন? তাঁহার তরুণ বয়সের কমেডিগুলি কি সাক্ষ্য দেয়? অভব্য অশ্লীলতায়ও তিনি ছিলেন ওস্তাদ এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে কি? তাঁহার জীবন সম্বন্ধেও কি একথা বলা চলে না যে " We cannot ascribe to Shakespeare that rigid

propriety of sexual conduct, the absence of which in more modern poets it has been too often the duty of their family biographers to conceal"?

এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ডোভার উইলসন তাঁহার ক্ষুদ্র চরিতাখ্যায়িকাটি লিখিয়াছেন। তিনি কবির জীবন দিয়া কাব্য বুঝিতে চাহিয়াছেন, আর কাব্য দিয়া জীবন। কীট্‌স্‌-এর এই উক্তিটি তাঁহার মূলমন্ত্র: "Shakespeare led a life of Allegory; his works are comments on it": শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবন একটি রূপক, ও তাঁহার রচনাবলী তাহার ব্যাখ্যা। প্রয়োজনমত তিনি অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক কবিচিত্তের বিকাশধারার উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডে যে মনোবৃত্তি Aldous Huxley-র Point Counterpoint-এ বা T. S. Eliot-এর The Waste Land-এ ফুটিয়াছে, তাহাকে আমরা বিশেষভাবে আধুনিক বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। অথচ দেখা যায় শেক্‌স্‌পিয়ার ইহার ভিতর দিয়াও কাটাইয়া গিয়াছেন। ফলে পুস্তিকাখানির আদ্যন্ত অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। শেক্‌স্‌পিয়ারের বিষয় নূতন বই হাতে পাইলে প্রায়শঃ পড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, সমালোচক সুধুই বাক্যের থলি উজাড় করিয়াছেন। কিন্তু ডোভার উইলসন একটি কথারও অপব্যয় করেন নাই। এত অল্প কথায় বেশী বুঝাইবার ক্ষমতা সমালোচনা গ্রন্থে কদাচিৎ পাওয়া যায়। জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি সর্ব্বদাই প্রণিধানযোগ্য। লীয়ার, হ্যামলেট, ফলষ্টাফ্ ইত্যাদির প্রসঙ্গে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, ও শেক্‌স্‌পিয়ারের শেষ যুগ সম্বন্ধে লিটন ষ্ট্রেচি-র মত খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। শাইলক্-এর চরিত্র-চিত্র বিষয়ে তিনি বলিতেছেন—

Shylock is the first unmistakable example of what may be called Shakespeare's tragic balance, the balance between pitiless observation, and divine compassion and understanding. He hides nothing. He shows us everything of Shylock's meanness, cunning and cruelty —vices which he himself detested above all vices—and notwithstanding, he compels the best of us, and the best in us, to cry out with Heine's "fair Briton" upon the Jew's exit, "By heaven, the man is wronged."

This is the quality that makes Shakespeare one of the great moral forces of the world, a world Saviour and Redeemer. "The great secret of morals is Love," Shelley writes, "or a going out of our own nature, and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action, or person, not our own.' A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively, the pains and pleasures of his species must become his own." Shakespeare is even more "greatly good" than Shelley suggests is possible; for he can identify himself with what he thought ugly and detestable, knocking all the time at our heart for pity and awe. No one but Dostoieffsky among the moderns can touch him here.

ডোভার উইলসন যাহাকে বলিতেছেন, "tragic balance", তাহাই শেক্‌স্‌পিয়ার-প্রতিভার মূলসূত্র। এইটিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে সাহিত্য ও জীবনের পর্য্যালোচনা আরম্ভ হইলে অচিরে উৎকর্ষলাভের সম্ভাবনা। অবশ্য সৃষ্টি-প্রতিভা, প্রকাশ-সামর্থ্য কাহারো নিকট হইতে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু স্রষ্টা হইতে

হইলে জীবনের পর্য্যালোচনা না করিলে চলে না ; সে পর্য্যালোচনা যত উচ্চস্তরের হইবে, ততই মঙ্গল। সৃষ্টিশিল্পের আদর্শ সম্বন্ধেও তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয়—অপরের সৃষ্টির বেলায় যদিই বা উদাসীন থাকা সম্ভব হয়, নিজের সৃষ্টির বেলায় কিছুতেই সম্ভব নয়। অচেতন শিল্পী কোনদিন বড় শিল্পী হইতে পারে না।

" L'ecrivain est classique qui porte un critique en soi-même, et qui l'associe intimement à ses travaux." (Paul Valéry.)

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Literary Mind—By Max Eastman (Scribner's).

The Physiology of Beauty—By Arthur Sewell (Kegan Paul).

কবি-পাঠকের সম্বন্ধই সাহিত্যের সনাতন সমস্যা। কাব্যবিবেচনার জন্মদিন থেকে প্রত্যেক সমালোচক হেরফের ক'রে যে-প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে এই : লেখক অধোগতির ধাপে নেমে পাঠকের পাশে দাঁড়াবে, না পাঠক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে লেখকের স্তরে উঠবে ? কিন্তু জিজ্ঞাসা এক হ'লেও, ভিন্ন যুগের উত্তর ভিন্ন রুচির পরিচায়ক। এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, কারণ সামাজিক জীবনের প্রতিনিধি হিসেবেই পাঠক কবির কাছে মর্য্যাদা পায় ; এবং জীবন যেকালে পরিবর্ত্তনশীল, তখন সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। প্লেটোর গণতন্ত্র থেকে অকারী বিবেচনায় কবিরা নির্ব্বাসিত হ'লে পরে, এরিষ্টটল কাব্যকে জীবনের দর্পণ ব'লে, আবার তাদের সমাজে স্থান দিয়েছিলেন। আজকে হয়তো সেই প্রাচীন আদর্শে সাহিত্যিকের আর নিষ্ঠা নেই, কিন্তু সৎসাহিত্যমাত্রেই যখন সুবিধামতো জীবন্ত-আখ্যায় দাবি ক'রে বসে, তখন সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হওয়া সাহিত্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী পাকে-প্রকারে জীবনের বশ্যতা মেনে নিলেও, সাধারণ পাঠককে সে অবজ্ঞা করতে ছাড়েনা। এই অবজ্ঞার অনেকটাই হয়তো প্রাপ্য ; কিন্তু তাহলেও পাঠকের পক্ষেও যে কিছু বলবার আছে, কাব্যের বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখে তার বঞ্চনাবোধও যে একেবারে গর্হিত নয়, সেই কথাটাকেই ম্যাক্স্ ইষ্ট্‌ম্যান তাঁর মনোজ্ঞ পুস্তকে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা মনে রাখতে হবে, যে কাব্য অতিমর্ত্ত্যের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রারম্ভ করেছিলো। কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে বাক্য ঐশিক ও সর্ব্বশক্তিময় ; তার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং তার প্রাক্তন রূপ ছন্দে। অবশ্য এই অলৌকিকতা চিরদিন টিঁকেনি ; পুরোহিতের প্রাধান্য খর্ব্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আর কাব্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের মায়া কাটিয়ে, আলাদা সংসার পেতেছিলো। তখন থেকে কাব্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার বদভ্যাসটা গেলো বটে, কিন্তু কবিকে ভগবানের প্রিয়পাত্র ব'লে ভাবার ধরণটা ঘুচলোনা। মানুষের জ্ঞাত ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রভাব যতখানি উগ্রতা দেখিয়েছে, তা অন্যত্র বিরল ; এবং সম্ভবত অতদিন ধ'রে সেই ধর্ম্মের একান্ত অনুগ্রহ পেয়েই কাব্যের আত্মগরিমা প্রায় অসীমে গিয়ে ঠেকেছিলো। সে স্বভাবতই ভাবতে পারলে যে পরিশীলনের অন্যান্য বিভাগ তার তুলনায় নগণ্য। কবিরা ঢাক পিটিয়ে রটিয়ে দিলেন যে তাঁরা শুধু শিল্পী নন, তাঁরা ভাবিকথক ; তাঁরা কেবল অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত হননা, স্বয়ং বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি চলে তাঁদেরই উদাহরণে।

সৌভাগ্যবশত তাঁদের গর্ব্ব তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত হলোনা। সভ্যতার তখন বয়ঃসন্ধি, জীবন সঙ্কীর্ণ, বিজ্ঞান তখনো অপ্রস্তুত। সুতরাং তখনকার পাঠককে সহজেই চমৎকৃত করা গেলো। ঐন্দ্রজালিক ছন্দের বশীকরণে সে যে-জাগ্রত সুপ্তাবস্থায় নিমজ্জিত হলো, তাতে কবিদের অপলাপকে আর্য্যসত্য ব'লে মানা ছাড়া তার গত্যন্তর রইলোনা; সম্মোহনের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনায় সে ভাবলে তাঁদের অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বুঝি অদৃশ্যভেদের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু মিথ্যার রাজ্যও অবিনশ্বর নয়। ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় হলো; গালিলিওর মন্ত্রণায় বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই যে-অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলো, সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়িয়ে সে ফিরে এলো নিউটনের জয়তোরণে; এবং স্বপ্নবিহ্বল কাব্য অচিরে আবিষ্কার করলে যে প্রবর্দ্ধমান জীবন সত্যই তার শিথিল কবল থেকে পালিয়েছে, তার মুষ্টিতে যা প'ড়ে আছে, সে কেবল জীবনের শৈশবসজ্জার ছিন্ন প্রান্ত। অভিমানে সে পণ করলে যে নিজের নাক কাটতে হয়, তাতেও সে রাজি, তবু পরের যাত্রা ভাঙবেই ভাঙবে। গালি-গালাজের বন্যা বইয়ে, বাজারে বাজারে সে ঘোষণা করলে যে জীবনের মতো দুর্বৃত্ত হট্টচারীর সংসর্গ তার আর সহ্য হচ্ছেনা, ভবিষ্যতে সে কেবল শিষ্টতার সঙ্গেই কুটুম্বিতা করবে; মানুষের মধ্যে যা ধ্রুব, যা সম্ভ্রান্ত, যা সুন্দর, কেবল সেই সমস্তই হবে তার আরাধ্য।

সেদিনে যে-আত্মহত্যার পালা সুরু হয়েছিলো, আজও তার শেষ দেখা যাচ্ছেনা। মধ্যে একবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ কাব্যকে গদ্যাত্মক করার ব্যর্থ প্রয়াসে কবিকে যুগচৈতন্যের আধার করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রিরাফেলাইট্‌দের স্বপ্নপ্রয়াণ ব্যাপারটাকে যাত্রাস্থলে ফিরিয়ে আনলে। তার পরে যখন আধুনিক কবিদের আমল এলো, তখন দেখা গেলো যে, অন্ধকূপের দরজা পাথর গেঁথে বন্ধ করা হয়েছে। এখনো বন্দীরা মাঝে মাঝে পথের আওয়াজ শোনে বটে, কিন্তু অর্থ বোঝার সামর্থ্য তাদের আর নেই; বংশপরম্পরায় অন্ধকারে কাটিয়ে, আলোকের অস্তিত্ব সুদ্ধ তারা ভুলে গেছে; মিথ্যাভিমানের উত্তরাধিকারে জন্মে, তাদের স্বার্থ হচ্ছে স্বাধীন সত্যকে অন্ত্যজ ব'লে ভাবা। সেইজন্যেই আজ তারা নিজেদের মধ্যে কথা কয় ব্যাসকূটের সাহায্যে, জিজ্ঞাসুকে নিরস্ত করে বিশুদ্ধ কাব্যের দোহাই দিয়ে, সমালোচনার জবাবে জপে "নিয়োক্লাসিজ্‌ম্‌," "নিউ হিউম্যানিজ্‌ম্‌", "মেটাবাইয়োলজি" ইত্যাদির নাম। পাছে তাদের কাব্য সাধারণভোগ্য হয়ে ওঠে, এই তাদের একমাত্র ভয়। সেইজন্যেই আজকে আর তারা কেবল ছন্দমুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, ব্যাকরণশুদ্ধিকেও বিড়ম্বনা ব'লে ভাবে। অজ্ঞাতকুলশীল পূর্ব্ববর্ত্তীদের রচনা-উদ্ধার, বিনা-প্রয়োজনে বিদেশী শব্দকোষ উজাড় করা, ছেদ-বর্জ্জন ইত্যাদি সমস্ত উপকরণই আধুনিক কাব্যের দুরূহতাপ্রীতির পরিচায়ক। এমন-কি একেও অনেকে যথেষ্ট মনে করেননা। তাঁদের প্রধান প্রতিনিধি ই-ই-কামিংস্‌ তো ঐতিহ্যকে পরিহসনীয় ব'লে ভাবেনই, অধিকন্তু মুদ্রাকার্য্যের চিরন্তন প্রথাকেও তাঁর অসহ্য লাগে। নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রচলিত প্রণালীতে ছাপা হ'লে পাছে পাঠক তাঁকে সুকবি আখ্যা দিয়ে বসে, তাই তিনি ওটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন:

Among
these
        red pieces of
day (against which and

quite silently hills
made of blueandgreen paper

scorchbend ingthem
-selves-U
pcurv　E,into
　anguish (clim
b)ing
s-p-i-r-a-
l
and, disappear)
　Satanic and blasé
a black goat lookingly wanders

There is nothing left of the world but
into this noth
ing il treno per
Roma si-gnori?
jerk.
lyr, ushes

এটি যে কোনো অতিশ্রান্ত মুদ্রাকরের দুঃস্বপ্ন নয়, একটি সহজ ও সুন্দর কবিতা, তা বিভীষিকাটিকে গদ্যের মামুলি সাজে সাজালেও চাপা থাকবেনা ঃ

Among these red pieces of day—against which, and quite silently, hills made of blue and green paper, scorch-bending themselves, upcurve into anguish, climbing spiral, and disappear—satanic and blasé, a black goat lookingly wanders. There is nothing left of the world, but into this nothing ' il treno per Roma signori? jerkily rushes.

এমন সুখপাঠ্য কবিতাসম্বন্ধে ও-ধরণের পাগলামির কৈফিয়ৎ চাইলেই, সম্প্রতিবিদেরা সমস্বরে ব'লে ওঠেন যে ওটা আসলে নূতনত্বের কোনো দাবিই রাখেনা, বরং গ্রীস-প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শের হুবহু নকল করে। ছোট-বড় অক্ষরের ওই অদ্ভুত সমাবেশ, কমা-সেমিকোলনের ওই ভয়াবহ স্বেচ্ছাচার, শব্দবিভাগের ওই উদ্ভট প্রকরণ, ও-সমস্তই নাকি পার্ব্বত্য রেলগাড়ির লম্ফঝম্পের যথাযথ অনুবাদ। এতেও যে-অন্ধেরা উক্ত কবিতায় কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার আক্ষরিক প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পায়না, তাদের জন্যে গালভরা নজির আওড়ানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যত মহারথীর নামই উল্লিখিত হোক্না কেন, এটা নিশ্চয় যে সনেটবিশেষে শেক্স্পীয়রের চ্ছেদ ব্যবহার অন্যমনস্কতা-সূচক ব'লেই সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় নয়, এবং কামিঙসের বিরামচিহ্ন রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও এ-কবিতাকে অমর বলা চলেনা। আসলে কামিঙস্-প্রমুখ আধুনিকেরা শেক্স্পীয়র অথবা অন্য কোনো পূর্ব্বগামীর অনুকরণে বদ্ধপরিকর নন; তাঁরা ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তা-প্রমাণে। বস্তুত ধ্রুপদী ঢঙ বর্ত্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র, তার তন্মাত্র হচ্ছে স্বকীয়তা, উদগ্র, আত্মজ্ঞ স্বকীয়তা।

এই স্বকীয়তাই, সাহিত্যের আধুনিক অনর্থের মূল। ওই মায়ামৃগের অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা বারেবারেই ভুলে যাই যে, সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে

লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্যকে জাগরূক করা। মানবচৈতন্য স্বভাবত অলস; কিন্তু তার মৌলিক জড়তা ধাক্কা না-খেলে যদিও বিদূরিত হয়না, তবু ধাক্কা যদি অবিরত চলতে থাকে, তাহলেও তার সাড়া পাওয়া অসাধ্য। অর্থাৎ বাহ্য উদ্দীপনার পরমায়ু দীর্ঘ হ'লে চৈতন্য তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে, এবং আলস্য অনায়াসেই আবার তার স্বাধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। কলিকাতার কলকোলাহলে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নজর ক'রে থাকবেন যে রাজপথের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর তাঁদের মনোযোগে ব্যাঘাত আনেনা; কিন্তু পাশের ঘরে যদি কেউ ফিসফিস ক'রেও কথা কয়, অমনি তাঁদের অভিনিবেশে বিঘ্ন ঘটে; তখন তাঁরা শুধু পারিপার্শ্বিক ষড়যন্ত্রকে নয়, সারা সহরের চিৎকারকে জাহান্নমে পাঠাতে চান। এই থেকে বোঝা যাবে শিল্পসৃষ্টিতে অতিমাত্রিক স্বকীয়তা কেন অপচিত হতে বাধ্য। নূতনত্ব ব্যতীত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যেমন শক্ত, আগোগোড়া নূতনত্বের সাহায্যে তার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখা তেমনিই অসম্ভব; এবং শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনমাত্রকে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীন-অর্ব্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চক্ষে পড়বে।

শেক্‌স্‌পীয়রের মতো মহাকবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বভাব বুঝতেন না, অথবা সাধারণ চ্ছেদপদ্ধতি তাঁর অবিদিত ছিলো, এমন বিশ্বাস অসঙ্গত। তিনি জানতেন যে ছন্দকে আপাদমস্তক নিয়মের নিগড়ে ঘিরে রাখলে, যথাসময়ে শ্রোতার সাড়া পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই হয়তো তাঁর পরমোক্তিগুলোয় অঙ্কের বালাই নেই, অমিত্রাক্ষরের কাঠামোতেও মিলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, গদ্য পদ্য অভিন্নহৃদয় হয়ে ওঠে। তাই হয়তো তিনি আলঙ্কারিকের উদ্যত তর্জ্জনীকে ঠেলে ফেলে, উপমাসঙ্করের চূড়ান্তে পৌঁছে, বিপদসমুদ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতেন যে অনন্ত স্বকীয়তা নিজের কলে প'ড়ে নিজেই মরে। তিনি দেখেছিলেন যে ঈর্ষ্যা-সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য নূতন নয়; সেইজন্যেই সেই সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তকে তিনি রূপায়িত ক'রে তুলেছিলেন ওথেলো ও ইয়াগোর মতো অসাধারণ চরিত্রদ্বয়ে। কিন্তু হ্যামলেটের ট্রাজিডি একেবারেই অভিনব, সম্পূর্ণ নিজস্ব: সেইজন্যেই ওই নাটকের আখ্যানভাগ তিনি সমসাময়িক গল্পভাণ্ডার থেকে নিঃকুণ্ঠচিত্তে ধার নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য বর্ণাড শ হৃদয়ঙ্গম করেননি; তাইতে অত দীপ্তি, অত মৌলিকতা, অত শিল্পকৌশল সত্ত্বেও 'ম্যান এণ্ড্‌ সুপারম্যান' পড়তে পড়তে ঘুম আসে। বিশিষ্টতার সুমিত প্রয়োগে ডিফো এবং সুইফ্‌ট্‌ শেক্‌স্‌পীয়রের অনুগামী। "রবিন্‌সন ক্রুসো"র আখ্যায়িকা এমনি অদ্ভুত, এতই বাহুল্যময় যে ডিফো বুঝেছিলেন তার উপরে আর অতিরঞ্জনের বোঝা সইবেনা; তাই সে-কাহিনী অত আড়ম্বরবর্জ্জিত, অত বৈচিত্র্যহীন, বৈজ্ঞানিক বিবরণের অত কোলঘেঁষা। পক্ষান্তরে গালিভারের আসল উপলক্ষ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমাজ, তাই তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে হলো অত বামন-দৈত্যের দেশ-বিদেশ ঘুরে। এই ধরণের শেষ কবি সম্ভবত ব্রাউনিঙ। কে জানে হয়তো নিজের কাব্যের অন্তর্ম দৈন্য তাঁর অগোচর ছিলোনা ব'লেই তিনি তার রূপকে অতখানি অসামান্য ক'রে তুলেছিলেন।

মানবচৈতন্যের এই পঙ্গুতার কারণ অদ্যাবধি ধার্য্য হয়নি, এমন-কি স্থির সিদ্ধান্ত করার মতো তথ্যসংগ্রহেও আমরা এখনো অপারগ। তবে চেষ্টা নানা দিক থেকেই চলছে, এবং অনুমিতির সংখ্যা বাড়ছে বই কমছেনা। এর মধ্যে আমার নিজের

পক্ষপাত পাভ্লোভ্-প্রমুখ জড়বাদীদের প্রতি। এঁরা অবশ্য কোনো ব্যাপক তত্ত্বদর্শনকে প্রশ্রয় দেননা; তবু এঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পৃষ্ঠপোষণে আর্থার সিউয়েল যে-মতবাদ খাড়া করেছেন, তা আমার বিবেচনায় সমীচীন। মতের গরমিল হ'লেও কোনো ক্ষতি ছিলোনা, কারণ স্বয়ং হগ্‌বেন যাঁকে অভিনন্দন করেছেন, তাঁর কথা কোনোমতেই অবজ্ঞেয় নয়। কিন্তু বইখানির দিকে এতটা ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, ওটিকে নিখুঁৎ বলতে পারলুম না। ওটির প্রধান দোষ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা। মাত্র দু শ পাতার বইয়ে পাঁচ হাজার বৎসর বয়সের দার্শনিক মতামত খণ্ডন, সদ্যস্তন খ্যাতনামাদের ছিদ্রান্বেষণ এবং আর্টসম্বন্ধে একটা অভিনব থিয়োরির বিস্তার কেমন যেন পণ্ডশ্রমের মতো ঠেকে। সিউয়েল-সাহেবের প্রকৃত বক্তব্য এক শ পাতার মধ্যে নিরেট-ভাবে ঠাসা, উপরন্তু তাঁর ভাষা প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। কাজেই সেই সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের সংক্ষেপসার দেবার ব্যর্থ প্রয়াস না-ক'রে, তার সাহায্যে বরং ইষ্টম্যানের অভিমতকে বিশদ করি।

পূর্ব্বোক্ত জড়বাদী মনোবিদেরা চৈতন্য বলতে কোনো ব্রহ্মোদ্ভূত আধিদৈবিক গুণকে বোঝেননা, তাঁরা ওই পদবীর দ্বারা মনুষ্যদেহের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াকেই নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে মানুষের শরীর (অতএব মন) একটা স্থিতি-স্থাপক যন্ত্রমাত্র। বাহ্য প্রবর্ত্তনার প্রভাবে যখনই তার তুলাসাম্য নষ্ট হয়, অমনি সমগ্র যন্ত্র বিচলিত হয়ে, আদিম স্থৈর্য্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, এবং স্বাভাবিক সঙ্গতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'লেই, তার প্রাক্তন আলস্য ফিরে আসে। কর্ম্মমাত্রের উদ্দেশ্য ইষ্ট-সিদ্ধি, সুতরাং সামঞ্জস্যবিধানেই যেখানে ইষ্ট, সেখানে সমীকরণের পরেও ব্যতিব্যস্ত হওয়া অকল্যাণকর। পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় মনুষ্যদেহের এই ধর্ম্মকে ন্যূনতম চেষ্টার নিয়ম অথবা "প্রিন্সিপ্‌ল্ অফ্ লীস্ট্ য়্যাক্‌সন্" বলা যেতে পারে। জগৎ-সম্বন্ধে আজ আমাদের যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, তাতে মনে হয় জড়তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকথা। অণু থেকে আরম্ভ ক'রে নীহারিকাপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকলেই শান্তিপ্রিয়; কাজের জন্যে কেউ কাজ করেনা; শুধু যতক্ষণ শান্তির মধ্যে কোনো বিঘ্ন থাকে, ততক্ষণই সংক্ষিপ্ততম পথে সেই বিঘ্নজয়ের ব্যবস্থা চলে, এবং বিঘ্নের সঙ্গে সঙ্গে আয়াসেরও অবসান হয়। এখানে সমস্ত জোর ওই সংক্ষিপ্ততম পথের উপরে; অর্থাৎ বস্তু-মাত্রেই প্রযত্নের পরিমাণকে আবশ্যিকতার অতিসঙ্কীর্ণ কোঠায় আবদ্ধ রাখতে চায়।

এইজন্যেই উত্তেজনার হেতু বিবিধ হ'লে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মনে করা যাক কেউ একটা পাহাড়ের খোঁচে পাথর আঁকড়ে ঝুলে আছে; তার নিচে খাত এবং খাতে মৃত্যু। এখানে মৃত্যুভয়ই সামঞ্জস্যসিদ্ধির মুখ্য প্রবর্ত্তনা; কাজেই এ-সময়ে যদি তার আঙুল হঠাৎ পাথরের ধারে ক্ষত হয়, তবু তার বাহুপেশীতে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা যাবেনা, কারণ তার দেহযন্ত্র স্বজ্ঞাগুণে জানতে পারবে যে এখন জ্বালার প্রতিকার করলেও, তার তুলাসাম্য রক্ষিত হবেনা, এক্ষেত্রে স্থিতি-স্থাপনের একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপায় হচ্ছে কেবল ঝুলে থাকা। এই কথাকেই ঘুরিয়ে কোনো কোনো জার্ম্মান মনস্তাত্ত্বিক মানুষের সমস্ত উদ্যোগকে একটা আদর্শ নির্ম্মাণের, একটা 'প্যাটার্ণ্ মেকিঙ্'-এর চেষ্টায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন, মানুষের বাতবহা নাড়ি উত্তেজনাগুলোকে মস্তিষ্কের যথাস্থানে

পৌঁছে দিলে, মস্তিষ্ক সেগুলোকে গোটাকয়েক পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতিমাণে চিত্রার্পিত ক'রে ফেলতে চায়। অতএব উত্তেজনাসমূহ থেকে কেবল সেই অংশই গৃহীত হয়, যা এই চিত্ররচনার উপযোগী; বাকিটা হয় ফেলা যায়, নচেৎ অব্যক্ত দূরদৃষ্টির কল্যাণে ভাণ্ডারজাত হয়ে, ভবিষ্যতে আবার কোনো সমধর্ম্মী অনুষঙ্গ-নির্ম্মাণের উপাদান জোগায়।

সৌভাগ্যক্রমে পাহাড় আঁকড়ে আত্মরক্ষার মতো রোমহর্ষক ব্যাপার আজকের দিনে অত্যন্ত বিরল। এমন-কি হয়তো এতদূর পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ঘটনাটি সিনেমা-চিত্রকরদের একান্ত প্রিয় না-হ'লে, ও-অবস্থাকে কল্পনা করাও কঠিন হতো। বস্তুত সভ্যসমাজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিবন্ধক; সংসারে তীব্র প্রবর্ত্তনা ও তার সহযোগী তন্ময়তার স্থান নেই; এবং শিষ্ট মানুষ যুগযুগান্ত ধ'রে পরের মুখে ঝাল খেয়ে, আজকে কাজের চেয়ে কথাতেই বেশি আত্মহারা হতে শিখেছে। এর ফলে আমাদের ভাষা যে কেবল পরোক্ষ অভিজ্ঞতার বার্ত্তাবহ হয়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রকৃতিও তার মধ্যে অল্পবিস্তর সংক্রামিত। অভিজ্ঞতামাত্রকেই দুটো মহলে ভাগ করা যায়: একটার নাম দেওয়া যেতে পারে সদর, অন্যটা অন্দর। সদরে যা ঘটে, তা সার্ব্বজনীন, শাশ্বত ও সহজ; অন্দরবাসিনীরা পরান্নজীবী ও অসূর্য্যম্পশ্যা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবর্ত্তনাই ব্যাবহারিক ও মানসিক বিভাগে বিভক্ত; প্রথম দিকটা আমাদেরকে কৃতকর্ম্মা ক'রে তোলে, বিশিষ্ট আচরণের নিমিত্ত জোগায়, এক প্রবর্ত্তনা থেকে অন্য প্রবর্ত্তনাকে আলাদা ক'রে চিনতে শেখায়; দ্বিতীয় দিকটা আমাদের আবেগ জাগায়, ছবি আঁকায়, স্মৃতির অন্ন-জলের ব্যবস্থা করে।

ভাষারূপ রূপান্তরিত প্রবর্ত্তনাতেও এই দ্বৈধভাব বিদ্যমান; এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দের স্বভাবকে লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধা ইত্যাদি স্তরে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে, সম্ভবত এই প্রভেদেরই ইঙ্গিত করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে নীল-শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই শব্দের যেটুকু সদরে বাস করে, অর্থাৎ যেটুকু সাধারণগোচর, সে হচ্ছে এই যে নীল বস্তু লাল বা অন্য বর্ণের বস্তু হতে পৃথক। কিন্তু নীলের অন্তরঙ্গ আবেগটুকু অনির্ব্বচনীয়। চণ্ডীদাসের মনে হয়তো তা রজকিনীর নীল সাড়ির সহযোগে প্রেমের কান্তিরূপেই প্রতিভাত হতো; স্বয়ং রামী সম্ভবত রঙটিকে নিজের পেশার সত্তা ব'লে ভাবতো; এবং আমার প্রথম পাঠ্যপুস্তক ওই রঙের হওয়ায়, আমি হয়তো নীলের মধ্যে আমার স্বর্গীয় গুরুমহাশয়ের জবাকুসুমসঙ্কাশ চক্ষুদুটিকেই প্রত্যক্ষ করি। বলাই বাহুল্য এক নীল-শব্দের দ্বারা এত রকম ভাব-গৌরব প্রকাশ করা অসম্ভব; এবং আধুনিক কবি ও কাব্যবিবেচকেরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান ব'লেই, তাঁদের রচনাকে ব্যঙ্গ্য করা অত সহজ। আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যেই শব্দ অর্থবাহক-রূপে ব্যবহৃত না-হয়ে, হয় আবেগবাহক-রূপে। অথচ আবেগ অন্তঃপুরচারী; তার বিশ্রম্ভালাপ সদরে শোনা গেলে, সোহাগের চেয়ে পরিহাসই বোধহয় স্বাভাবিক, পরিহাসই বোধহয় শোভন।

অবশ্য অনেকের মতে প্রগতি অধঃপতনেরই নামান্তর। সভ্যতা ছুৎমার্গ-বিরোধী, এবং শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুর অভিজাত পবিত্রতাই জনতার স্থূল হস্তাবলেপে কলঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমরা স্তরভেদে বিমুখ হয়েছি; আমাদের অধ্যয়ন চলে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের অবসর কাটে একই সিনেমায়, একই সংবাদপত্রের পথ্যে

আমরা মানুষ হয়ে উঠি। কাজেই মানুষমাত্রের মনোভাবেই আজকে একটা ঐক্য দেখা দিয়েছে; আর তার ফলে আমাদের অন্দরের দ্বার এখন অপেক্ষাকৃত মুক্ত। অর্থাৎ ভাষা যার প্রকৃতি মূলত বস্তুবাচক, তা কালক্রমে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাববাচক, গুণব্যঞ্জক। হিন্দু-শব্দের উল্লেখ ক'রে, দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আগে ও-কথার দ্বারা একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, একটা সুনির্দ্দিষ্ট আচার, একটা ঐতিহ্যনিষ্ঠ সমাজ বোঝাতো; কিন্তু শব্দটি এখন আর সেই পার্থক্যসূচক অথবা আচরণজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়না; এখন আমরা তাকে প্রয়োগ করি মনোভাব-প্রকাশে: আজকাল তার অর্থ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, বিশেষ থেকে সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; ও দিয়ে এখন আর আমরা অবচ্ছেদ বুঝি না, বুঝি ঐক্য। তাই জন্যেই ব্রাহ্মসমাজের ব্রাত্যেরাও আজকে গোঁড়া হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ান, এবং শুনতে পাই গোখাদক ক্রিশ্চানও নিজেকে ব্রাহ্মণ-উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভাষার স্বভাব উপরোক্ত ধরণে বিকারপ্রবণ ব'লে, কোনো-কোনো অধুনা-অনাদৃত কবি ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে, বর্ত্তমানের সমালোচনা ভুলতে চেষ্টা করেন। অবশ্য অনুগামীদের পূজা পাওয়া-না-পাওয়া নিশ্চয়ই অদৃষ্টের মর্জ্জি। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি একেবারে মিথ্যা না-হয়, তবে ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের চেয়ে উদারতর মনে করা অনুচিত। পরিবর্ত্তনই ভাষার ধর্ম্ম হ'লেও, সে-পরিবর্ত্তন কোনো বিশেষ কবিকে পক্ষপাত দেখাতে বাধ্য নয়। আসলে ভাষা বদলায় জৈব প্রয়োজনের তাগিদে; এবং যে-কবি কুমীররূপ জীবনের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, কালস্রোতে ভেলা ভাসাবেন, তাঁর ললাটলিপিতে নৈরাশ্যের স্বাক্ষর আছে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের প্রয়োজনেই শুধু তারতম্য ঘটে, তার প্রকৃতি বদলায়না। পাভ্‌লোভ্‌ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন যে কুকুরকে যদি খাদ্য-পরিবেশনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সুর শোনানো যায়, তবে কালে খাদ্য বাদ দিয়ে, কেবল সেই সুরের সাহায্যেই তার রসনাকে লালায়িত ক'রে তোলা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রেও একই উপায়ে উদ্বোধকের রূপান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত ও নির্ব্বিকার। অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে আমরা প্রাণী-বিশেষের অভ্যস্ত উদ্দীপনাকে নির্ব্বাপিত ক'রে, তার দেহদীপে একটা নূতন উত্তেজনার শিখা জ্বালতে পারি বটে; কিন্তু এমন করতে হ'লে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আনুকূল্য আবশ্যক।

কুকুর বা মানুষ অকারণে গান-সম্বন্ধে সচেতন হয়না; তারা সুরের মধ্যে বাছাই করতে শেখে তখন, যখন একটা বিশেষ সুর ব্যতিরেকে তাদের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিগত আবেগমাত্রেই একদিন সাধারণের জ্ঞানগম্য হবেনা; কেবল এমন আবেগ বিশ্বজনের আদর পাবে, যা বিশ্বের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক। ইতিপূর্ব্বে যে-দুএকজন কবি সমসাময়িকদের অবজ্ঞাভাজন হয়েও, পশ্চাদ্‌গামীদের বরণমালা পেয়েছেন, তাঁরাও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি। ডান্‌, ব্লেক্‌, কীট্‌স্‌, এঁরা নিজেদের দোষে উপেক্ষিত হননি, যে-যুগ এঁদের উপেক্ষা করেছিলো, দোষ ছিলো তারই। এঁরা মহাকবি, মানুষের সার্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন সন্ধানই এঁদের কাব্যপ্রেরণার মূলমন্ত্র ছিলো; কিন্তু যে-কাল এঁদের জন্ম দিয়েছিলো, সে ছিলো অত্যন্ত কৃত্রিম, তার মানসিক সংগঠনে প্রত্যক্ষ প্রবর্ত্তনার লেশমাত্র ছিলোনা। তখনকার পাঠক সহজ অনুভূতিকে একেবারে অবদমিত ক'রে ফেলে-

ছিলো; অতএব উক্ত তিন কবির কালাতীত সরলতা তার কৃত্রিম প্রয়োজনের খোরাক জোগাতে পারেনি, কেবল অর্জ্জন করেছিলো তার তিরস্কার।

দুঃখের বিষয় আজকে আর সেই প্রত্যক্ষ কাব্যপ্রেরণার চল নেই। আজকে আমরা যে যত জটিল লেখা লিখি, সেই তত আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। আমরা জানি যে বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ অসম্ভব, অথচ সভ্যতা-প্রসারের গুণে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যে সেও আমাদের সমকক্ষ্য। আগে পরমার্থের অগ্রদূত ব'লে কবির মর্য্যাদা ছিলো, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্‌বাণী এতবার অপূর্ণ রয়ে গেছে যে বর্ত্তমান জগৎ সত্যসমাগমের খবর এখন বৈজ্ঞানিকের কাছেই নিয়ে থাকে. একদিন কবিরা সভাসমিতির আনন্দবর্দ্ধনে অদ্বিতীয় ছিলো, কিন্তু সে-সব আসর হয় আজকে উঠে গেছে, নয় রাজনৈতিক বা সমাজসংস্কারকের প্রতিযোগিতায় সেখানেও কবি পরাজিত। এ-ক্ষেত্রে খামখেয়ালই তার নান্যপন্থা। তাই তার স্বকীয়তা এখন স্বেচ্ছাচারের ভেক নিয়েছে; তার বিশিষ্টতা অহংকারে পরিণত; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে আজ আঁকড়ে আছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে।

অবশ্য এমন হতে পারে যে এর জন্যে কবিরা মোটেই দায়ী নয়, দোষ স্বয়ং ভাষার। এরূপ কবি হয়তো আজও মেলে, কাব্যকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের পটভূমি করতে যার বিবেকে বাধে, যে আত্মরতির মোহ কাটিয়ে ম্যাথু আর্নল্ডের উপদেশমতো কাব্যকে যুগচৈতন্যের কষ্টিপাথর করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারই বিপদ হয়তো সমূহ। নিজের অতিসংবেদনশীলতাকে নিষ্ঠুরভাবে সংযত ক'রেও, সে হয়তো দেখে যে মানুষের অনুসন্ধিৎসা আজকে বচনাতীত লোকে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের উদ্ভাবকেরা ভাষার মৌল অক্ষমতার কথা মনে রাখেননি: কাজেই দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ছায়াচিত্র, রেডিয়ম ইত্যাদির অনুগ্রহে তাঁরা মানুষের দৃষ্টিকে যে দিব্যধামে উন্নীত করেছেন, সেখানে ভাষার ইন্দ্রিয়নির্ভরতা সহায়ক না-হয়ে, হয়তো অন্তরায়মাত্র। অবশ্য অনির্ব্বচনীয়কে বোধগম্য করাই উপমা-ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের কাজ। কিন্তু গণিতের সাঙ্কেতিক সুদ্ধ যেখানে লজ্জামৌন হয়ে যায়, সেখানে মান্ধাতাগন্ধী অলঙ্কারশাস্ত্রের বাচালতা কেবল হাস্যকর নয়, অসহ্য। সে যেন এই রঞ্জনরশ্মির যুগে ভিষগ্‌রত্নের আনুমানিক নাড়িজ্ঞান। এর পরে এলিয়টের মতো সাত্ত্বিক কবিও যদি শিশুমনোভাবের পরিচয় দেন, তবে অবাক হবার কিছু নেই। তিনি যেহেতু কবি, সেকালে জগৎসম্বন্ধে, বিশেষত আধুনিক জগৎসম্বন্ধে, সহজ বিস্ময় তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ আর ভাষায় সেই বিস্ময় প্রকাশের উপায় নেই; কাজেই পূর্ব্বের মহাকবিরা যেখানে তাঁদের শিশুসুলভ অভিজ্ঞতা দেবদুর্লভ বাক্যে অভিব্যক্ত করতে পারতেন, আজ সেখানে এলিয়ট তাঁর ত্রিকালজ্ঞ সম্বিৎকে হয় বচনাভাবে অব্যক্ত রাখতে বাধ্য, নয় শিশুদের মতো, অর্থবিনিময়ের অস্তিত্ব সুদ্ধ ভুলে গিয়ে অন্তরঙ্গ প্রতীক ব্যবহারে বাধ্য।

এর পরে কবিতার সত্যযুগ আবার ফিরে আসবে কিনা বলা শক্ত। ইষ্ট্‌ম্যান ও সিউয়েল, দুজনেই ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাবান। কিন্তু আমার লিখিত, অলিখিত অনেক মতই তাঁদের অনুবাদী হ'লেও, আমার কণ্ঠ সেই আগমনী-সুরের প্রতিধ্বনি করতে অপারগ। তাঁদের বিবেচনায় কাব্যের দুদ্দশার কারণ এই যে সে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন না-হয়ে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলো। কিন্তু এখনো

সন্ধিস্থাপনের উপায় আছে; সে যদি অবিলম্বে বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবে তার পরিণাম সার্থক হবে। এ-যুক্তিতে আমার মন সায় দেয়না। আমি বিশ্বাস করি যে শিল্প যদি তার স্বধর্মত্যাগে রাজি না-হয়,—এবং তাহলে তাকে শিল্প-নাম দেওয়া বৃথা—তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধের নিষ্পত্তি হবেনা। কলা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা তো করেই, এমন-কি এক দেবতাকেও সে দুবার সমান চোখে দেখতে পায়না। কিন্তু বিজ্ঞানের অদ্বৈতবাদ মুসলমানের নিরাকার সাধনার চেয়েও সাংঘাতিক। বিজ্ঞান হয়তো পরব্রহ্মকেও মানেনা, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিণত করতে চায় একটিমাত্র অনাত্ম্য নিয়মে। একই মন্দিরের একশখানা ছবি আঁকার দরকার হ'লে, শিল্পী চেষ্টা করে যাতে তার প্রত্যেক ছবিই অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হয়। কিন্তু হাজারখানা মন্দিরকে একটা অবিকার প্রতিমাণে অবরুদ্ধ করাই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সাধনা। বিজ্ঞান এখন যেদিকে ঝুঁকেছে, তা থেকে মনে হয় যে শিল্পের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ক্রমে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়াবে। বিশিষ্ট ব্যক্তি-সম্বন্ধে যে-সামান্য মমতাটুকু সে পোষণ করতো, গণগণিতের প্ররোচনায় আজ তাকেও সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানের এলেকার বাইরেও বহু ভূখণ্ড অনাথ অবস্থায় প'ড়ে আছে; এবং ইষ্ট ম্যানের প্রতিধ্বনি ক'রে এমন বলা হয়তো অসঙ্গত নয় যে এই নিরুদ্দেশযাত্রায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়েই সমান অধিকারী। কিন্তু সে-আশাও কুহকিনী। বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় যে-ভীম বেগে চলেছে, তাতে তার রাজসূয় সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ। তার পরেও সে যদি কোনো প্রদেশে বিজয়বৈজয়ন্তী স্থাপনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে-স্থানে তার প্রয়োজন নেই, সে-স্থান জীবধর্ম্ম পালনের পক্ষে অনুপযোগী। মানুষ যখন অনাবশ্যক ডাকে সাড়া দিতে সদাই অসম্মত, তখন সাহিত্য ভবিষ্যতে যতই বহির্ম্মুখ হোক, তার সম্বন্ধে আমি নিরাশ্বাস।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Recovery—By Sir Arthur Salter. (G. Bell & Sons, Ltd.).

The World's Economic Crisis and the Way of Escape: A Symposium—By Sir Arthur Salter, Sir Josiah Stamp, Mr. J. M. Keynes, Sir Basil Blackett, Prof. Henry Clay and Sir W. H. Beveridge. (George Allen & Unwin Ltd.).

এই অর্থসঙ্কটে সবাইকেই অল্পবিস্তর ভুগতে হচ্ছে। এমন কোনও দেশ নেই যেখানে এটা ছড়িয়ে পড়েনি। সেইজন্য নানা দেশে নানা ভাষায় নানা লেখক এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং করছেন। এ সম্বন্ধে দুখানা প্রামাণ্য বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সে দুটীর পরিচয় দেওয়া গেল।

Sir Arthur Salter পাঠকদের নিকটে বোধহয় অপরিচিত নন। Economic Council-এর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার জন্যে তিনি ১৯৩০ সালে (?) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি অনেক বছর ধ'রে League of Nations-এর Economic and Finance Section-এর Director ছিলেন। এ হেন লোকের

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের বিষয়ে লেখা মূল্যবান্ হবেই। বইটার আদরও হয়েছে যথেষ্ট। এই বছর এপ্রিল মাসে বইটা প্রথম বেরিয়েছে এবং জুনের মধ্যেই পাঁচ-পাঁচবার ছাপা হ'য়ে গিয়েছে।

Recovery বইটার একটা sub-title দেওয়া হয়েছে,—The second effort অর্থাৎ দ্বিতীয় চেষ্টা। গ্রন্থকারের মতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এর আগেই একবার হয়েছিল। এমন-কি তিনি বল্‌ছেন যে সে সময়ে অর্থনৈতিক প্রগতি আশাতীত বেগে চলেছিল। তাঁর মতে মাথাপিছু হিসাব ধর্‌লে দেখা যায় ১৯২৫ সালে সারা পৃথিবীতে ১৯১৩ সালের চাইতে বেশি জিনিস উৎপাদিত হোতো ও খরচ হোতো—অর্থাৎ জীবনযাত্রার আদর্শের অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক দশ বৎসর পরে, ১৯২৯ সালে, দু-চারটী দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হলেও মোট পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা তার চাইতে শুধু যে অনেক ভালো হয়েছিল তা নয়, অতি দ্রুতগতিতে এমন বিপুল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিল যা কখনো আগে কেউ কল্পনাও কর্‌তে পারেনি। (Recovery, p 4)

অন্যান্য লেখকেরা এই কথাটা হয়ত এত জোর দিয়ে এমন স্পষ্ট ক'রে বলেননি। কিন্তু তাঁদেরও মত এই যে, অর্থনৈতিক জগৎ থেকে যুদ্ধের ধ্বংসের চিহ্ন অনেকটাই মুছে গিয়েছিল। ১৯২৯ সালের শেষ থেকে যে অর্থসঙ্কট সুরু হয়েছে এবং এখনও চল্‌ছে তার থেকে উদ্ধারের চেষ্টাটাকেই দ্বিতীয় চেষ্টা বলা হয়েছে।

Salter সাহেব যুদ্ধের ফলে যে-ক্ষতি হয়েছে তার একটু বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বল্‌ছেন যে অনেক কল-কারখানা, বাড়ী-ঘর এবং লোকজনের প্রাণ গিয়েছিল বটে কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেকাংশে হয়েছিল। কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ না হওয়াতে এই বর্ত্তমান বিপত্তি ঘটেছে, সেটা উৎপাদনের (production) না বণ্টনের (distribution)। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। সকল দেশই প্রচুর ঋণ ক'রে যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে গভর্মেণ্ট চড়া ট্যাক্স বসিয়ে উৎপন্ন জিনিষের অনেকাংশ ঋণশোধ বা সুদের জন্য আদায় করতে বাধ্য হয়েছে। উৎপাদকের অর্থ মহাজনের (rentier) হাতে গিয়ে পড়্‌ছে। কিন্তু মহাজনেরা নূতন উৎপাদনের জন্যে টাকা খাটাচ্ছেন না,—এইটেই বর্ত্তমান সঙ্কটের একটী প্রধান কারণ।

অবশ্য শুধু উৎপাদনের দিক দিয়ে যে বিপত্তিটা ঘটেনি এ কথা প্রায় আর সকলেই বলেছেন। Blackett সাহেব খুব অল্প কথায় খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন যে, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের কারণ অভাব নয়, প্রাচুর্য্য। (Economic Crisis, p 13.)

বাস্তবিক এটা একটা অর্থনৈতিক প্রহেলিকা। প্রাচুর্য্যের মধ্যে এত দৈন্য কেন? শুনি বেদে আছে "অন্নং বহু কুর্ব্বীত।" হয়ত বৈদিক যুগে উৎপাদনের সমস্যাই বড় সমস্যা ছিল, এখন কিন্তু দেখি যে বণ্টনের সমস্যাই সব চেয়ে জটিল সমস্যা দাঁড়িয়েছে। এবং তার জন্যেই অর্থনৈতিক জগতে ভূমিকম্প চল্‌ছে এবং চল্‌বে।

এটী যে যুদ্ধ বা যুদ্ধঋণের ফলেই হয়েছে এমন নয়।

". . . . developments in the economic methods and the social desires of man already in progress before the War but accelerated

by it required us in some vital respects to rebuild on new foundations." (Recovery, p. 4).

বণ্টনের এই বৈষম্য কি কি রূপে প্রকাশ পেয়েছে ? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। Clay সাহেব বলেছেন—

". . . . the misdirection of industry has been the most important influence on industrial activity and an important, if not the only influence producing the general fall in prices."—(Economic Crisis, p. 127).

আবার অন্যান্য জায়গায় বলেছেন—

"Two elements of dislocation date from the war, which are of exceptional influence in explaining the world depression of the last two years—the uneconomical movement of exported capital, and the destruction of the balance in the world between agriculture and industry. . . . Since the war, the export of capital has been . . . . twice cursed. In one important case, in the case of reparation payments by Germany, capital has been taken out of a country in which it was urgently needed for local purposes for the ultimate benefit of France and America, which had a superfluity of capital (p. 134). . . . There has been ever since 1920, a tendency to overproduction in the chief agricultural staples." (Economic Crisis, p. 135).

এটা খুবই সত্যিকথা। আমরা অবশ্য (ইংল্যাণ্ডের মতন industrial) শ্রমশিল্পপ্রধান দেশে বেকারদের সাহায্য ক'রে শ্রমশিল্প বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাটাই বেশী ক'রে দেখ্‌তে পাই, কিন্তু অনেক কৃষিপ্রধান দেশেও গভর্মেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে ঐ ঐ দেশে ফসলের দাম ঠিক রাখার বিপুল চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়েছে,—আমাদের দেশে অবশ্য সে চেষ্টাও হয়নি এবং সে-চেষ্টা ব্যর্থও হয়নি।

বণ্টনের বৈষম্য টাকার দামের (purchasing power of money) হ্রাস বৃদ্ধি দিয়েই বেশী প্রকাশ পায়। যখন পাটের মণ ১০৲ থাকে তখনও চাষী সুদ বাবদ ৫৲ দেয়। আবার যখন পাটের দর ২॥৹ টাকায় নামে তখনও সে ৫৲ দেয়। কিন্তু সত্যিকারের ব্যাপারটা কি ? প্রথম বারে আধ মণ পাট বেচে দেয়, দ্বিতীয় বারে কিন্তু দুই মণ না বেচলে চলে না। অর্থাৎ কিনা উৎপাদকদের কাছ থেকে চার গুণ জিনিষ মহাজনের কাছে চ'লে গেল। অর্থনীতির এই দিকটা লক্ষ্য ক'রেই Beveridge সাহেব বলেছেন :—

"This is essentially a money crisis ; there is a breakdown in the machinery of exchange and the system of regulating production by prices." (Economic Crisis, p. 163).

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার তিনি একটা নতুন নাম দিয়েছেন, "anarchy of purchasing power"।

যখন বিনিময়ের কাজ অচল হয়, তখন অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্য সবই অচল। এর কারণ কি ? Salter সাহেব দেখিয়েছেন যে, অনেক দিন ধ'রে অনেক উপায়ে অর্থনীতির বিশাল সৌধের অধঃখনন চলেছে। এখন যে সেই সৌধ টলমল করছে তা'তে আর বৈচিত্র্য কি ? Salter সাহেব পুরোনো কথারই উল্লেখ ক'রে বল্‌ছেন

laissez-faire-এর মূলসূত্র হচ্ছে এই যে "the individual would work r the public advantage by pursuing his private profit."—(Recovery, p. 10)। এরই যখন ব্যতিক্রম ঘটে তখন আর laissez-faire থাকে কেমন করে? Trade union legislation, free education, poor-law maintenance, unemployment and health insurance, old age pensions—এ সব থেকে প্রমাণ হয় যে শুধু laissez faire-এ কুলুচ্ছে না, অন্য কিছু চাই। আবার অন্য দিকে "growth of combines, cartels, tariffs, control of immigration, sterilisation of gold" এগুলিও laissez-faire-এর কম ব্যতিক্রম নয়। শেষটির সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা দরকার। যদি কোনও কারণে কোনও দেশের জিনিষপত্রের দাম ক'মে যায় তবে সেই দেশের সস্তা জিনিষ অন্য দেশে খুব কাটে, কিন্তু অন্য দেশের জিনিষ সে দেশে বেচা চলে না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, সেই দেশে রপ্তানি হয় বেশী, আমদানি হয় কম। এবং এর জন্যে সেই দেশে সোনা আস্‌তে থাকে কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সোনাই হচ্ছে বিনিময়ের প্রধান উপাদান। সোনা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে টাকা (অর্থাৎ মুদ্রা বা নোট বা চেকের) প্রচলন বাড়ে এবং জিনিষপত্রের দামও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কিন্তু যদি সেরূপ না হয় তবে অবশ্য জিনিষপত্রের দাম সস্তাই থাকে। নানা কারণে এখন সোনার আমদানি রপ্তানি যুদ্ধের আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে। যুদ্ধের ঋণ দিতে হয়, সুদ দিতে হয়, অথচ অনেক উত্তমর্ণ (creditor) দেশেই অধমর্ণ (debtor) দেশের জিনিষের উপর চড়া শুল্ক বসিয়ে সেই সব দেশের জিনিষের আমদানি কমান হয়েছে; কারণ তা নইলে মহাজন-দেশের কৃষি বা শ্রমশিল্প অচল হ'য়ে পড়ে।

সুতরাং যতদিন খাতক দেশগুলি একেবারে দেউলিয়া না হ'য়ে যায় ততদিন মহাজনদেশে সোনা আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু তার ফলে টাকার প্রচলন বাড়্‌তে দেওয়া হচ্ছে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে সব জিনিসের দামের সমতা রক্ষার জন্য সোনার যে বিশেষ কাজটি ছিল সেটি একেবারে যেতে বসেছে। বর্ত্তমান দুর্গতির বিষয়ে ছোট বড় আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে সব কথার চেয়ে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেটাই বেশী মূল্যবান্ তাতে সন্দেহ নাই। এখানে কিন্তু গোড়ায় গলদ। কারুর মতে রোগী প্রায় চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। Keynes-এর কথাতেই বলি :—

"Competitive wage reductions, competitive tariffs, competitive liquidation of foreign assets, competitive currency deflations, competitive economy campaigns, competitive contractions of new development—all are of this beggar-my-neighbour description (Economic Crisis, p. 74) . . . . through lack of foresight and constructive imagination the financial and political authorities of the world have lacked the courage or the conviction at each stage of the decline to apply the available remedies in sufficiently drastic doses; and by now they have allowed the collapse to reach a point where the whole system may have lost its resiliency and its capacity for a rebound." (Ibid, p. 75).

অবশ্য যাঁরা Keynes-এর লেখা প'ড়ে থাকেন তাঁরা জানেনই যে Keynes

শুভবাদীদের মধ্যে একজন। বর্ত্তমান ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তিনি আলোর একটী সন্ধান দিয়েছেন ঃ—

"The outstanding ground for cheerfulness lies, I think, in this—that the system has already shown its capacity to stand an almost inconceivable strain. . . . This remarkable capacity of the system to take punishment is the best reason for hoping that we still have time to rally the constructive forces of the world." (Economic Crisis, p. 77).

কি ভাবে যে এইটী করতে হ'বে সে বিষয়ে Salter সাহেব সবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে উদ্ধারের প্রথম উপায় স্বর্ণমানের সংস্কার এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সমতা রক্ষা। এটী অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত। মতবিরোধ হয় এর উপায় নিয়ে। Salter সাহেবের মতে—

"Central Banks, consulting and co-operating through the Bank of International Settlements, could . . . . deal with the short-term fluctuations in the general price level. If the situation was getting beyond their control because gold was becoming too scarce or too plentiful. . . . Governments would lend their aid . . . . by securing a simultaneous change in the legal reserve ratios and, in case of necessity, a simultaneous change in the gold content of the currency standards. 'Devaluations' in time of gold scarcity, ... would not be open to the ordinary objections if made simultaneously by all principal countries, and so as not to increase prices but to keep them stable; for it would not alter exchange rates or create injustice to creditors." (Recovery, p. 291).

পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় ঋণপদ্ধতির (credit) সংস্কার। বাস্তবিক পদ্ধতি বলতে এখন কিছুই নেই। এতে যত রকমে ক্ষতি হয়েছে তার অনেক উদাহরণ বিভিন্ন দেশ থেকে Salter সাহেব দিয়েছেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী প্রায় ৪০০ কোটী ডলার ধার করেছে। তার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের আগে অর্থাৎ ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে এর অর্দ্ধেকেরও উপর ঋণ নিয়েছে। এবং সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ্ যে টাকা দিয়েছে ঐ ঋণ তার প্রায় আড়াই গুণ। ১৯২২ সালে ব্রেজিল বৈদ্যুতিক রেলওয়ের জন্যে ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ নিয়েছিল, কিন্তু কাজে তার কোনও চিহ্নই দেখা যায়নি। অবশ্য, এর ফলে দেশের কোনও লাভ হোক্ বা নাই হোক্, সেই সব শাসনকর্ত্তাদের বেশ কিছু লাভ কোন কোন সময়ে হ'য়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া অবশ্য কঠিন। কিন্তু একটা প্রমাণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"It was admitted . . . . that $415,000 had been paid to Don Juan Leguia, son of the deposed President of Peru, for his assistance in floating loans to the total value of $100 million for the account of the Peruvian Government." (Recovery, p. 103).

এর জন্যে Salter সাহেব বলেন—

". . . . loans to foreign Governments and public authorities need to be . . . . examined by a Joint Committee of the League of Nations and the Bank of International Settlements. . . . At home, similarly, the mechanism for directing the savings of the private

investor needs to be improved so as to prevent his money from being wasted." (Recovery, p. 293).

এই ঋণের আর একটা দিক আছে। সেটী ভবিষ্যতের নয়, অতীতের। যে-ঋণের ভারে সমস্ত দেশই এখন প্রপীড়িত,—তা সে যুদ্ধের জন্যই হোক্ বা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্যই হোক্—তার ভার লাঘব না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের ঋণসম্বন্ধে কোনও সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ইংল্যাণ্ডে আর ভারতবর্ষে দুইদেশেই সম্প্রতি Conversion ক'রে গভর্ণমেণ্টের ঋণের সুদের হার কমান হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া পৃথিবীর সমৃদ্ধি অসম্ভব, আর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় বিদেশী জিনিষের উপরে শুল্ক। প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯২৭ সালে যে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে সকলে একবাক্যে একথা স্বীকার করেন, Salter সাহেব তার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ফলে দেখা যায় যে শুল্ক কমা দূরের কথা, যে-সব দেশে শুল্ক ছিল না সে সব দেশেও শুল্ক আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য দেশে শুল্কের হার বেড়ে চলেছে। আবার অন্য উপায়ে যেমন exchange depreciation এবং rationing of exchang-এর দ্বারাও আমদানি কমানর চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটীর উদাহরণ ইংল্যাণ্ড এবং জাপান। দুইদেশেই নিজের নিজের টাকার (money) দাম কমানর ফলে বিদেশী জিনিষের মূল্য এত চড়েছে যে বিদেশী জিনিষের আমদানি কমেছে আর দেশী জিনিষের রপ্তানী বেড়েছে। আগে যে জিনিষ America-তে চৌদ্দ ডলারে তৈরী হ'ত, তা তিন পাউণ্ডে ইংল্যাণ্ডে বিক্রী হ'তে পার্‌ত ; কারণ তখন exchange-এর হার ১ পাউণ্ড= ৪$\frac{5}{6}$ ডলার ছিল ; এখন exchange-এর হার ১ পাউণ্ড=৩$\frac{1}{2}$ হওয়াতে চৌদ্দ ডলারের জিনিষ প্রায় চার পাউণ্ডে না বেচলে চলে না। Rationing of exchange-এরও ঐ একই ফল।

কিন্তু এর আশু প্রতিকারের কোনও উপায় দেখা যায় না। এ বিষয়ে সবাইকার এক যোটে কাজ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার অন্য দিকে শুল্ক একেবারে বাদ দেওয়াও অসম্ভব।

এই অবস্থায় যেটুকু সম্ভব সেই সম্বন্ধে Salter সাহেব বলেছেন :—

"We may therefore hope that, to an increasing extent, whatever be their height and general character, they will be part of a deliberate, general, and reasonably stable policy, and rarely be changed except after consultation with all those concerned, consumers as well as producers at home, and the representatives of foreign countries." (Recovery, p. 195).

কিন্তু আমরা Salter সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই, এটীও কি সম্ভব? যদি এটী সম্ভব হয়, তবে ত কোনও গোলযোগই থাকে না। কারণ তাহলে আগে যে-উপায়গুলির কথা বলা হ'ল সবই কাজে পরিণত হ'তে পারে। জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর চেষ্টা চল্‌ছে বটে কিন্তু তাতে বড় বড় দেশের কর্ত্তৃপক্ষের আস্থা বিশেষ কিছু আছে ব'লে মনে হয়

না। কারণ তা নইলে প্রকৃতপক্ষে লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জামের ব্যয়সঙ্কোচ কর্‌তে কেউই রাজী হন না কেন? সত্যি কথা বল্‌তে কি, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক্‌বার প্রবৃত্তির মধ্যেই বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মূলকারণ অন্বেষণ করা যেতে পারে। আমরা শুধু গভর্মেণ্টের খরচ এবং আয়-ব্যয়ের সমতার কথা বল্‌ছি না, যদিও সেটীও বড় কম কথা নয়। এর ফলে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে অশান্তি এবং অবিশ্বাসের বিষ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে জর্জ্জর করেছে এবং করছে।

Salter সাহেব অবশ্য লড়াইয়ের সময়ের কথা মনে করেই বলেছেন :—

"Which country of us has not but a few years since shown the resources we now require of courage, of personal devotion, of industrial and financial leadership, of public direction, in a need no greater and in a cause less worthy? . . . . Now, and now only, our material resources, technical knowledge and industrial skill, are enough to afford to every man of the world's teeming population physical comfort, adequate leisure, and access to everything in our rich heritage of civilisation that he has the personal quality to enjoy. We need but the regulative wisdom to control our specialised activities and the thrusting energies of our sectional and selfish interests. To face the troubles that beset us, this apprehensive and defensive world needs above all the qualities it seems for the moment to have abandoned—courage and magnanimity." (Recovery, p. 302).

এটী কি সুদূরের সাধনার বস্তু নয়? একি বাস্তব জগতে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে Blackett সাহেবের কথাও প্রণিধানের যোগ্য। তিনি এই ব'লে আরম্ভ করেছেন

"We are in immediate danger of finding ourselves the victims of a Frankenstein of our own creation ; the genius of man has outstripped his code of morals, both in the national and in the international sphere." (Economic Crisis, p. 91).

তবে আশার কথাটা এই,—এবং তাঁর ভাষাতেই বলি—

"Never in the World's history has there been so large and widespread a fund of human goodwill among men and women all over the world, anxious to serve their generation, and never have men and women felt more keenly the exasperating frustration which renders their good intentions and desires nugatory and unavailing." (Economic Crisis, pp. 100—110).

এই ট্রাজেডির (tragedy) কারণ কি? মনে হয় যে এই সব লোকদের রাষ্ট্রপরিচালনার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, সেটাই এই tragedy-র কারণ। Blackett সাহেবের মতে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নৈতিক শক্তির অভাব সত্ত্বেও economic planning সফল হ'তে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ফ্যাসিষ্ট ইটালি ও বলশেভিক রাশিয়ার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে দুইটী গুরুতর আপত্তি আছে। Bolshevism এবং Fascism দুইয়েতেই এখন নতুনের মোহ মাখান আছে। দুইয়েতেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে উদ্যম এখন দেখা যাচ্ছে সেটী হয়ত সাময়িক। এর পরিণতি কি হবে তা' বলা শক্ত। আর একটী আপত্তি এই যে দুইই একটী দেশে এবং জাতিতে

সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান সঙ্কট এবং তার কারণগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপক—একেবারে জগৎজোড়া। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য planning কতদূর সফল হবে তার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

এইজন্যেই Keynes সাহেব এমন দুটী উপায়ের কথা বলেছেন যা প্রত্যেক দেশ নিজের চেষ্টাতে অবলম্বন করতে পারে। একটী exchange depreciation, এর কথা আগেই বলা হয়েছে। আর একটী "wise spending"—অর্থাৎ বেশ বুঝে-সুঝে এমনভাবে খরচ করা যাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসাধনের ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সাহায্য হয়।

এর একটী উত্তর Blackett সাহেব দিয়েছেন।

" What has been wrong in recent years is not that there has been too much saving—there has been too little—but that owing to the breakdown of the monetary system and the catastrophic fall in prices the saving has not been effective in creating new capital." (Economic Crisis, p. 111).

আর একটী উত্তর Sir Josiah Stamp দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ "spending" কম হয় নি।

" . . . . when we have had reduced purchasing power by 15 per cent., our actual physical consumption of foreign imports has increased by 5 or 6 per cent., so that instead of going down *pari passu* it has gone up." (Economic Crisis, p. 62).

যাই হোক্ না কেন, যে দুটী উপায়ের কথা Keynes সাহেব বলেছেন তা সফল হ'লেও মাত্র একটী জাতির বা একটী দেশের অবস্থার আংশিক ও সাময়িক উন্নতি হ'তে পারে,—বর্ত্তমান জগৎজোড়া অর্থসমস্যার স্থায়ী সমাধান এতে মোটেই হ'বে না, বরং অন্ততঃ প্রথমটীতে অনিষ্টই হ'বে।

এই বিস্তীর্ণ আলোচনাতে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আর কোনও ফল হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। Beveridge সাহেবের কথাতেই বলি—

". . . . I would like to say that if there are any of you who are by now content to leave yourselves in the hands of Dr. Keynes with his regimen of high feeding or of Dr. Stamp with his policy of low feeding ; if there are any to whom the bedside manner of Dr. Clay has brought confidence ; if you think health will certainly be won back by taking Dr. Blackett's Planning Pills or Dr. Salter's International Elixir—then, in the name of Adam Smith, go home." (Economic Crisis, p. 162).

এই দুঃখেই তিনি বলেছেন—

" The way of escape from world crisis is barred and doubly barred—by disagreement among economists and by lack of international will among Governments." (Economic Crisis, p. 188).

তিনি যথার্থ ইবলেছেন—

" The world will not escape this crisis, not if escape means getting out of danger by deliberate thought and action . . . . the crisis will become less acute of itself long before we have done

anything to better it . . . . this deflation is the inevitable aftermath of inflation, the headache after the debauch, ... there is not much that anyone can do now to help us ; what is wanted ought to have been done five years ago. The most that we can hope for this year—really it is too much to hope for this year—is that the Governments will do something, not to cure the crisis but to remove some of its aggravations—will deal with reparations and war debts, with some of the obstacles to trade, with one or two needless rigidities." (Economic Crisis, pp. 186—7.)

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

Triumphal March—By T. S. Eliot (Faber and Faber).
The Orators—By W. H. Auden (Faber and Faber).
Rooming House—By Horace Gregory (Faber and Faber).
Poems—By Clere Parsons (Faber and Faber).
New Signatures—(The Hogarth Press).

শেষ বইটীর সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় প্রসঙ্গত বলেছেন যে নিছক গীতিকাব্য ছাড়া সব কাব্যেই কবির কর্ত্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা দুয়েরই আবশ্যক আমাদেরকে উপলব্ধি করানো। এবং কাব্য যদি মরমী অথচ বন্ধ্যা ধ্যানধারণায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, তাহলে কবিমাত্রেই Lear-রচয়িতার মতো কুশ্রীতা ও পাপের উচ্ছেদসাধনও যে আমাদের কর্ত্তব্য, সে বোধও আমাদেরকে দিয়ে যান। আরেক জায়গায় রবার্টস্ বলেছেন—এই রোমান্টিক-বিরোধী সংযত নৈর্ব্যক্তিকতা কেবল নির্লিপ্ততা মাত্র নয়, এর জন্ম অন্যের সঙ্গে একান্ত একাত্মবোধে। Good Citizenship-এর যে ধারণা গ্রীক্‌দের ছিল, এইখানে তা আবার কাব্যদেহ পেয়েছে। আর্টহিসাবে কাব্যের স্বাধীনতা এতে গেল কি ফিরে এল, তা নাকি রবার্টস্ এখনো বল্‌তে পারেন না। তিনি বলেন যে, এই প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা হচ্ছে মানবজীবন সম্বন্ধে এমন এক মতের জন্য, যে মতপ্রচার সার্থক হ'লে কবিরা খাঁটি কাব্য লিখতে পারবেন, অন্তত উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার্ লেখবার মতো আদর্শ পাবেন।

Marriage of Heaven and Hell-এর বিবাহভঙ্গের যে আশা রবার্টস্ করেছেন, সে আশা আমরাও রাখি। কাব্য জীবনের আলিঙ্গনবদ্ধ না হ'লেও, জীবনকে করস্পর্শ করা কাব্যের উচিত, সে আমারও বিশ্বাস। তাই আমার আপত্তি হলো New Signatures সফল প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা নয় ব'লেই। মনে হলো, এই নয়জন কবি ব্যর্থ হলেন, অক্ষমতা ও চালিয়াতিতে এঁদের প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ও কাব্য দুইই চাপা পড়েছে ব'লে। অবশ্য এঁরা কেউই এলিয়ট্ বা হার্ডি নন এবং এঁদের বয়স কম। কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পরিণত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও এই কবিরা ব্যর্থ হলেন, পাছে তাঁরা সাধারণের বোধগম্য ও সাধারণ হ'য়ে পড়েন, সেই ভয়ে। এলিয়ট্ বা হপ্‌কিন্সের কাব্যে লেখকের উদ্দেশ্য অনেকসময়ে স্পষ্টতায় বিফল হয়। ডানের বোধ্য হবার সময় ও প্রয়োজন ছিল না। এই কবিরা কিন্তু স্মার্ট ও উচ্চললাট

হবার সরল বাসনায় দুর্ব্বোধ্য চালিয়াতি করেছেন। বিনীত হ'লে তাঁরা যেটুকু ভালো লিখতে পারতেন, সেটুকুও তাই আর New Signatures-এ নেই।

তবে এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ, যথা, বেল্ অপেক্ষাকৃত সুস্থ সরল ভাবে লিখেছেন। এই মুক্তছন্দের দিনে বেলের বারো পৃষ্ঠা-ব্যাপী পোপের ছন্দের আলাপ সত্যই তারিফ্ করতে হয়। বলা বাহুল্য বেল্ ইংল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ইংরেজদের মতোই। আমাদের মনোরোচক একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—

A noble statesman once observed with tears
That Peterloo was won by volunteers,
But now at last, crowned with an equal fame,
The regulars can boast Amritsar's name.

* * * * *

You can discover from the *Daily Mail*,
Where all agree in telling the same tale :
"Throughout Bengal, if once broke free,
You would not find a virgin or rupee?"
Yet is not this a shade ridiculous?
What are Bengal Virginities to us?
And, really does it matter, after all,
Even in England—let alone Bengal?
Why keep a Fleet and Army at such cost
To save intact what might be better lost?

কিন্তু একে গ্রীক বা শেক্সপিয়রীয় মানবীয়তা বল্‌তে বাধে। এ বইটীতে ওরই মধ্যে অডেন, স্পেণ্ডর্ ও লুইসের মধ্যে যদি কিছু মানবীয়তা থাকে। এঁদের সম্বন্ধে ও অন্যান্য নবীন কবিদের কারো কারো সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে ইংরেজি কাব্যকে ন্যাকামি ও কবিয়ানা থেকে এলিয়ট্ যে মুক্তি দিয়েছেন, সে মুক্তির খবর এঁরা পেয়েছেন। তাই এঁরা পাহাড় পর্ব্বতের প্রেমে প'ড়ে লেখেন না—

Shepherds, dwellers in the valleys, men
Whom I already loved;—not verily
For their own sakes, but for the fields and hills
Where was their occupation and abode.

এই আধুনিক কবিরা অন্তত উদ্ধৃত কাব্যের পাত্র ন'ন—

And while midst lakes and mountains wild he ran
Full of himself and shunned the haunts of man
Taught her o'er each lone vale and Alpine steep
To lisp the stories of his wrongs and weep;
Taught her to cherish still in either eye
Of tender tears a plentiful supply,
And pour them in the brooks that babbled by—
Taught her to mete by rule her feelings strong
False by degrees and delicately wrong,
For the crushed Beetle, first—the widowed Dove,
And all the warbled sorrows of the grave,
Next for poor suff'ring Guilt—and last of all
For Parents, Friends, or King and Country's fall.

হ্যারিয়েট্, এলিসাবেথ্, মেরি, জেন্, এমিলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে কাব্যজীবী প্রেম ক'রে এঁরা বলেন না—

I said to my heart between sleeping and waking,
Thou wild thing that always art leaping or aching,
What black, brown or fair, in what clime, what nation,
By turns has not taught thee a pit-a-pat-ation?

এবং পরিণত মানুষ ছেড়ে তিনবছরের শিশু বা কুকুর-বিড়ালের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও আধুনিক কবিযশপ্রার্থীরা করেন না।

সেইজন্য Orators সব না বুঝতে পারলেও মোটামুটি ভালোই লেগেছে। প্রথম অধ্যায় Address for a Prizeday-টাই সবচেয়ে সহজ ও সমগ্র বইখানির সূত্র ধরিয়ে দেয়। এটী ও পরের গদ্যরচনাগুলিতে অডেনের গদ্যের কৌশলও মুগ্ধ করে। Argument, Statement ও Letter to a Wound-এর বক্তব্যও তৃপ্তিদায়ক। যে বুদ্ধি সব দেখতে পায় ও বিচার ক'রেও গ্রহণ করে, সেই শুভবুদ্ধির আভাস পেয়ে, এবং এইগুলিতে ও অন্যান্য যে সব রচনায় অডেন অস্পষ্ট ও অসাধারণ হতে যান্ নি তা প'ড়ে, আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু দীর্ঘ Journal of an Airman জয়স্ বা আর কার দোহাই দিয়ে যে ভালো লাগাব, ভেবে পেলুম না। তবে এই এলোমেলো ও পেশাদার বিমানবিহারীর ডায়েরিতেও মাঝে মাঝে কবিতায় বা গদ্যে, হাসি বা প্রীতিকর খাম্‌খেয়ালি ভাব, হয়ত বা গভীরতাও, এসে পড়েছে। শেষের ওড্-কটীর শিল্পনৈপুণ্য ছেলেমানুষি সত্ত্বেও অডেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা আনে। Assonance, dissonance, internal rhyme, aliteration প্রভৃতি যে সব কায়দা বর্ত্তমান সমালোচনায় খাতির পায়, তাও অডেনের আছে। যথা,

This life is to last, when we leave we leave all,
Though vows have no virtue, though voice is in vain,
We live like ghouls
On posts from girls
What the spirit utters
In formal letters.

গ্রেগরির মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত কবিদের দোষ আছে। কিন্তু ইংরেজির চেয়ে এমেরিকান কাব্য স্মার্টম্মন্যতায় ত ঢের বেশি পীড়িত। সে হিসাবে গ্রেগরি বরঞ্চ প্রশংসনীয়। জনৈক এমেরিকান্ কবি লিখেছিলেন—তুমি বড়ো মিষ্টি মেয়ে, আমি তোমায় ভালোবাসি; তুমি বড়ো মিষ্টি মেয়ে, আমি তোমার কানটা খাব; আর গ্রেগরি লিখেছেন—

Be for a little while eternal
singing with all the songs in your body
but making no sound.
The Rose of Sharon singing in an old city
was eternal suddenly
for a little while.

যদিও গ্রেগরির কবিতার বিষয় হচ্ছে ইহুদি, ডেম্‌সি, খুন, যৌনব্যভিচার, দোকানের পরিচারিকার প্রণয়, ব্যবসাদার ধার্ম্মিক, কয়েদী ইত্যাদি, তবুও মনে হয় গ্রেগরির কাব্যউৎস শুধু নব্যতাভিমান নয়। সেকালের মতোই তিনি লেখেন—

—Yes, we shall share
this everlasting earth.

গ্রেগরির প্রায় সমবয়সী ইংরেজ পার্সন্‌স্ তেইশ বছরে মারা যান। তাঁর স্বল্প কবিতার দাম কারুণ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিকায় পড়লুম—

Mallarmé for a favour
teach me to achieve
the rigid gesture won only with labour
and comparable to the ease
balance and strength with which the ballet-dancer
sustains her still mercurial pose in air.

মালার্মের অনুবর্ত্তন পার্সন্‌সের কতটা সার্থক সে বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে এই কবির রচনাবলীতে—মালার্মে বা কৈশোর, যার জন্যই হোক্, একটা অক্সফোর্ডের ছায়াশীতল স্বপ্নালু মন্থরতা আছে। অবশ্য রেস্তোরাঁয় কেমন ভদ্রলোকটী পরিচারিকার সঙ্গে সময় স্থির করলেন সে দৃশ্যও পার্সন্‌স্ দেখতে পারতেন এবং রোমান্টিক্ ও বোহিনীয় জীবনের শূন্যতাও এ কবি বুঝেছিলেন—

Living from day to day provides no clue
For certain happiness—it is a shallow
Youngster philosophy and easy to see through
Sirs, we know what usually it comes to—
The drunkard's bliss, the braggadoccio
'Admire me now triumphant over virtue'
The rake's bravado and tedious libido
Gin in small hours, praise for the cunning ruse.

ভবিষ্যতের আশা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে সিদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া যায় এলিয়টের সঙ্গে। Marina নামক আশ্চর্য্য কবিতাটীতে জেনেছিলুম যে জাহাজ-ডুবির পর এল নবজগৎ, নবজীবন; জেনেছিলুম যে কুকুরের দাঁত, ময়ূরের পুচ্ছছটা, আত্মতৃপ্তির শূকরপঙ্ক ও জীবক্রিয়ার পুলক অনিত্য। সেখানে এলিয়ট্ এই জীবন ত্যাগ করেছিলেন সেই নবজীবনের শান্তিতে। তারপরে Triumphal March-এ দেখি শোভাযাত্রা। দারুণ ভিড় আর কত কামান, বন্দুক, উড়োজাহাজ, সৈন্য—আরো কত কি। কয় লক্ষ কয় হাজার কি কি এল তার একটা সঠিক ফর্দ্দ এলিয়ট্ দিয়েছেন। তারপরে "তিনি" এলেন—হতাশা, ব্যর্থতা। কৃষ্ণমূর্ত্তি বুঝি মেসায়া হলেন না! কোথায় তাঁর চোখে সেই দীপ্ত প্রশ্ন! কোথায় সেই আলো! তারপরে বাড়ী ফিরে গিয়ে খাওয়া, সসেজ যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া। সৈন্যেরা তখন বেড়ার মতো সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে আলো এল না যে আলো আছে—

O hidden under the dove's wing, hidden in the turtle's breast,
Under the palm-tree at noon, under the running water
At the still point of the turning world. O hidden.

শ্রীবিষ্ণু দে

Fleche d'Orient—par PAUL MORAND (Nouvelle Revue Francaise).

Le Cercle de Famille—par ANDRE MAUROIS (Bernard Grasset).

Le Noeud de Vipères—par FRANCOIS MAURIAC (Bernard Grasset).

ইংরেজ, দেখছি, কাঞ্চনকে কামিনীর মতোই অস্পৃশ্য ব'লে ভাবতে প্রস্তুত। শোনা যাচ্ছে, এমেরিকা অবিলম্বেই যুদ্ধঋণের মায়া কাটাবে। অবশ্য, ফরাসীরা এখনো ক্ষতিপূরণের আবদার ছাড়তে পারেনি বটে, কিন্তু তাদের সাহিত্যে সম্প্রতি যে-বদল লক্ষ্য করেছি, তাকে, মহাত্মার পরিভাষায়, হাদ্য পরিবর্ত্তন বলাই উচিত। উত্তর-সামরিক যুগ তবে কি সত্যই শেষ হলো? জানি যে এ-প্রশ্নের জবাবে রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রবিশারদদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে যাবে। দুঃখবাদীরা হয়তো রুষের নবতন পঞ্চবার্ষিক উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়বেন, এবং বৈনাশিকেরা ব্যঙ্গ্যভরে নেবেন মাঞ্চুক্যোর নাম। কিন্তু তাহলেও মন্বন্তরের পালা ফুরিয়েছে ব'লেই আমার বিশ্বাস, কারণ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যাই বলুক, কালের স্বরূপ কেবল যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষেই অভিব্যক্ত হয়না; তার যথার্থ পরিচয় হয়তো আমাদের শিল্পে সাহিত্যে, আমাদের বিজ্ঞানে দর্শনে, আমাদের স্বপ্নে সঙ্কল্পে।

যুগরূপের চিত্রাঙ্কনে ফরাসীরাই সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য। অন্ততপক্ষে ফরাসীদেশে শিল্পবিষয়ক যত অভিজ্ঞানপত্রের উৎপাদন হয়েছে, অন্যত্র তার তুলনা নেই। উনিশ শতকের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলো ফরাসী প্রতীকী কবিরা, এবং বিংশ শতাব্দীর আগমনী গেয়েছিলো ভবিষ্যপ্রেমিক ফরাসী ফিউটুরিষ্ট্। ইদানিকার হিংস্র জাতীয়তার উদ্বোধন "শাক্সিয়ঁ ফ্রাসেজ্"-এর মধ্যস্থতায়, এবং সমরান্তরের প্রস্তাবনা ওই দেশেরই লক্ষণাবৃত্ত লেখকদের বিজ্ঞাপনে। এই সুর্-রেয়ালিস্ত্-নামক নব সম্প্রদায়ের পুরোধা ছিলেন পল মোরাঁ; এবং তাঁর "উভের লা নুই" ও "ফের্মে লা নুই" উপাধিধারী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পপুস্তক-দুটি প্রসাদগুণের পরাকাষ্ঠা না-হ'লেও, ঐতিহাসিক বিবরণ হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। এই কাহিনীগুলির অভূতপূর্ব্বতার সঠিক সমাচার দেওয়া শক্ত, কারণ সে-অসামান্যতা কোনো মুদ্রাদোষ থেকে উদ্ভূত নয়, সে কেবল পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলারই প্রতিভাস। অবশ্য এই প্রতিবিম্বন-প্রকরণে কতকটা স্বকীয়তা ছিলো, কিন্তু মোটের উপর তাও সিনেমা-চিত্রপদ্ধতির অনুগামী। অর্থাৎ মোরাঁর চারিত্র্যচিত্রণে সুসঙ্গতির কোনো বালাই থাকতোনা, উপাখ্যান রচিত হতো গোটাকয়েক বিশ্লিষ্ট ঘটনার পরম্পরায়। গল্প-গুলির অন্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো ভাষার: সে ভাষা অনেকটা আধুনিক বাঙালী লেখকদের রচনারীতির মতো—স্বদেশী ব্যাকরণের প্রকৃতিবিরোধী এবং ইংরেজি শব্দকোষের অধমর্ণ। এটা সম্ভবত তাঁর অক্স্ফোর্ড্-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-নবিসীর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

তার পরে মোরাঁ তাঁর পুরানো বন্ধুদের ভাসিয়ে দিয়ে, অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। এতে ক'রে হয়তো তাঁর অর্থবৃদ্ধি হয়ে থাকবে; কিন্তু 'ল বুদ্ধ ভিভাঁ'-র মতো এক-আধখানা রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সত্ত্বেও, তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রসিদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারেননি। প্রারম্ভে তাঁর রচনায় যে-ঔজ্জ্বল্যকে উপলব্ধির

উদ্দীপ্তি ব'লে মনে হতো, ক্রমে অভ্যাসদোষে তাকে ঝুটো জহরতের চাকচক্যের মতো লাগতে লাগলো; তাঁর নিরাসক্ত সমালোচনাশক্তি বহুব্যবহারে হঠকারিতায় গিয়ে ঠেকলো; অতিপরিচয়ের ফলে সেই বিশ্বব্যাপ্ত মনে কূপমণ্ডূকের লক্ষণ দেখা দিলো। এই অবস্থায় মাস দুয়েক আগে তাঁর "ফ্লেশ দরিয়ঁ।" প্রকাশিত হলো, এবং চমৎকৃত পাঠক উৎফুল্লচিত্তে আবার স্বীকার করলে যে মোরাঁর আর যাই অধঃপতন ঘটে থাকুক, পশ্চিমের দিক্‌নিরূপকদের মধ্যে তিনি এখনো অগ্রগণ্য। স্বদেশী সমালোচকেরা বইখানিকে মোরাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন, এবং এই অভিমতকে নতশিরে মেনে নেওয়াই বিদেশীর পক্ষে নিরাপদ; তবু আমার মনে হয় কেবল সাহিত্য হিসেবে, এর চেয়ে অনেক ভালো গল্প মোরাঁ ইতিপূর্ব্বে লিখেছেন। আসলে জাগ্রত কালজ্ঞানই বোধহয় পুস্তকখানির প্রধান সম্পদ।

"ফ্লেশ দরিয়ঁ।"-র আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই: এক প্যারিসপ্রবাসী, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন রুষ যুবক বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে, বিমানপথে বুদাপেস্তে কাভিয়ারে আনতে ছুটলো। ঘটনাক্রমে সে ফিরতি এয়ারোপ্লেন ধরতে পারলেনা, এবং বন্ধুদের উপরোধ না-এড়াতে পেরে, কয়েকদিনের জন্যে নৌকাবিহারে বাহির হলো। ফেরার দিন রাত্রে এক জিপ্‌সীর মুখে স্বদেশের গান শুনে, তার মন হঠাৎ মানসযাত্রী হংসের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো, এবং বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে, পত্নী-পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে, সেই শিষ্ট, শান্ত, সোভিয়ৎদ্বেষী যুবকটি উধাও হয়ে গেলো তার মাতৃভূমির ভয়ঙ্কর নিরুদ্দেশে।

যাঁরা মোঁরার পূর্ব্বতন রচনার সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা হয়তো গল্পের এই সংক্ষেপে কোনো যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন দেখবেননা। এটা নিশ্চয় যে কাহিনীর কাঠামোটি মোরাঁ-সাহিত্যে বারবার মেলে। "ল বুদ্ধ ভিভাঁ"-র রাজসিক নায়ক পৃথিবী-প্রদক্ষিণ ক'রে, অবশেষে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশের স্বৈর সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে অভিষিক্ত হলো; "লা মাজি নোয়ার"-এর নিগ্রো কুশীলবেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্তে উঠে, নিয়তির ঈষদ্ ইঙ্গিতেই স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করলে; এবং "ফ্লেশ দরিয়ঁ।"-র দিমিত্রিও দেশের আকর্ষণে সমাজ-স্বজনকে জলাঞ্জলি দিলে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্তু "ফ্লেশ দরিয়ঁ।"-র সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তীদের একটা বংশানুক্রমিক যোগ থাকলেও, আলোচ্য পুস্তকখানি যে-মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অদ্যাবধি মোরাঁর নায়ক-নায়িকার পদস্খলন বাহ্য প্রবর্ত্তনাতেই ঘটেছে। হয় প্রবঞ্চনার দুঃসহ ধাক্কা, নয় পরিবেষ্টনের দুর্নিবার বিকার, এই ছিলো প্রকৃতির প্রতিহিংসাতর্পণের দুটিমাত্র উপায়। কিন্তু দিমিত্রির ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটলোনা। তার স্ত্রীর, তার স্বাচ্ছন্দ্যের, তার সম্পত্তির সম্মোহন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রইলো। কেবল মহেন্দ্রলগ্নে সে বুঝলে যে শুচিগ্রস্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই হবেনা; তার জন্যে চাই মুক্তি, দিগন্তবিস্তৃত মুক্তি, তার জন্যে চাই স্বার্থত্যাগ, সর্ব্বস্বান্ত স্বার্থত্যাগ, তার জন্যে চাই গ্রহণ, বিঘ্ন-বিপদ, মালিন্য-কুশ্রীতা, দৈন্য-দুঃস্বপ্ন, সকলকে সাদরে গ্রহণ। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সজ্ঞান কৃত্রিমতার মধ্যে এই উপলব্ধি এমনি অপ্রত্যাশিত, এতই রোমাঞ্চকর যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকও আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য। রূপস্রষ্টা হিসেবে মোঁরার কীর্ত্তি এখনো হয়তো মহার্ঘ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তাহলেও তাঁকে যেহেতু আমি পশ্চিমাকাশের বায়ুবিদ্

যন্ত্র ব'লে বিশ্বাস করি, তখন তাঁর পূর্ব্বমুখী তীরের নির্দ্দেশ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে-অঞ্চলের হাওয়া বদলেছে।

আঁদ্রে মোরোয়া একজন ইংরেজ লেখককে য়ুরোপের জ্বরের কাঠি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি নিজে জু, এবং এরা এদের আন্তর্জ্জাতিক ধরণধারণের জন্যেই বিখ্যাত। সেই কারণেই তাঁর শেষ উপন্যাস "ল সের্ক্‌ল্ দ ফামি"-র মতো নিখুঁৎ বইয়ের নাম নিয়ে এই সমালোচনা সুরু করিনি। কিন্তু সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মোরাঁ-প্রমুখ প্রতিনিধিদের থেকে শিক্ষা-সংস্কারে পৃথক হ'লেও, মোরোয়া একালের আধিব্যাধির সংক্রমণ এড়াতে পারেননি। তাঁর হীরকতুল্য রচনারীতির মধ্যেও বৈদেশিকতার দোষ বিদ্যমান এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত আধুনিক উদ্বাস্তুদের নিরুদ্দিষ্ট চক্রমণকেই প্রতিবিম্বিত করে। তাঁর কল্পনাপ্রবণ চরিতাবলীর নায়কনির্ব্বাচন আমাদের বিপরীত খেয়ালের পরিচয় দেয়, এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁর বাগ্মিতা বর্ত্তমান আত্মশ্লাঘার অভিজ্ঞান। তিনি শেলিকে সঞ্জীবিত করেন, তার প্রচ্ছন্ন সামন্যতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে, এবং ডিজ্‌রেলির ছবি আঁকেন, তার অভাবনীয় উন্নতিতে রমণীদের করকৌশল দেখাবার উদ্দেশ্যে। তবে মসীচিত্র-দুটোর মধ্যে তফাৎ এই যে আলেখ্যকার শেলির চরিত্রে মহত্ত্বের লেশমাত্র খুঁজে পাননা, কিন্তু ডিজ্‌রেলির নাটকীয় দিকটা তাঁর শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ। তথাপি নিছক ধ্বংসোন্মাদনায় মোরোয়া সমসাময়িকদের সমকক্ষ হতে পারেননি। এই হয়তো তার কারণ যে আজকে স্বজাতির ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায় ব'লে, তিনি ঐতিহ্যশূন্যতার সমূহ বিপদ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন; কিম্বা বিশ্বব্যাপী প্রলয়কে আলোকিত করতে হ'লে যে-পরিমাণ আতসবাজি দরকার তা তাঁর ঘরে নেই। কারণ যাই হোক্, অন্তত উপন্যাস রচনায় মোরোয়া বরাবরই ফরাসীদের মহান আদর্শের অনুগত। অবশ্য এতদিন ধ'রে তিনি যত বই লিখেছেন, তাতে উক্ত আদর্শের অস্তিত্ব শুধু অভাবের দ্বারাই বিজ্ঞাপিত; কিন্তু "ল সের্ক্‌ল্ দ ফামি"-র উৎকর্ষে সবুরে মেওয়া ফলার যাথার্থ্য প্রমাণিত হলো। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই মোরোয়া নিজে তো পূর্ব্বে লেখননিই, এমন-কি অপরেও সম্প্রতি লিখেছেন কিনা সন্দেহ।

বইখানির পরম গৌরব হচ্ছে নায়িকা দেনিসের চরিত্র, কিন্তু ছবিটি রেখার এমন খুঁটিনাটিতে প্রাণবন্ত যে গল্পের চুম্বুক দেওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তবু আখ্যায়িকার সূত্র এইরূপ: দেনিস অল্প বয়সেই আবিষ্কার করে যে, তার মা উদ্বাহবন্ধনকে নগণ্য ব'লে ভেবে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা, মায়ের স্বার্থপর ঔদাস্য, পিতার দুঃখ ও পারিবারিক কলঙ্ক রটার দরুণ সামাজিক নিগ্রহ, এই কটা কারণে সে মাকে শত্রুরূপে দেখতে শেখে, এবং পণ করে যে নিজের জীবনে এই জঘন্য ইতিহাসের পুনরভিনয় সে কোনোমতেই ঘটতে দেবেনা। কিন্তু যুদ্ধকালীন ভাববিলাসের যূপে সে দেহকে উৎসর্গিত করতে বাধ্য হয়, অথচ যে-অপাত্রকে সে এই শ্রেষ্ঠদান দেয়, সে-ক্ষুদ্রমনা তার প্রেমের চেয়ে গুরুজনদের আজ্ঞাপালনকেই শ্রেয়স্কর মনে করে। তার পরে দেনিস দয়াপরবশ হ'য়ে এক প্রসিদ্ধ ধনিকপুত্রের সঙ্গে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়, এবং অবিলম্বেই আবিষ্কার করে যে প্রেমের অভাব করুণায় মেটেনা। প্রথম পদচ্যুতির চিত্তবিক্ষোভে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে বটে, কিন্তু ক্রমে তার উচ্ছৃঙ্খলতা এমনি দেশবিখ্যাত হ'য়ে পড়ে যে তার মা সুদ্ধ তাকে হিতোপদেশ দিতে বাধ্য হন। মায়ের এই অমার্জ্জনীয় প্রগল্‌ভতা সুরুতে

তার অসহ্য লাগলেও, দেনিস অচিরে প্রমাণ পায় যে তার মেয়েরাও তার সম্বন্ধে অনুকারী বৈরভাব পোষণ করছে। ফলে তার অভিসারের আয়োজন বন্ধ হয়, এবং পিতার মৃত্যুর পরে তার মা পূর্ব্বপ্রেমিককে বিবাহ ক'রে যে-নূতন সংসার পেতেছিলেন, সেই সংসারে দেনিস প্রায় ষোল বৎসর পরে প্রথম পদার্পণ করে।

বলা বাহুল্য এই ধরণের উপন্যাস আজ আর বড় একটা লেখা হয়না। এর বিপুল আকার, এর মন্থর গতি, এর চরিত্রচিত্রণের ব্যাপকতা, এর সাবেকি বস্তুনিষ্ঠা, এ-সমস্তের মধ্যেই একটা বাল্‌জাকী ভাব আছে। এমন-কি উপন্যাসটিকে হয়তো নীতিমূলক ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। অবশ্য সাহিত্যের এই গুণটি আজ আমাদের সন্দেহ জাগায়; এবং সেইজন্যে বিশুদ্ধ আর্টসেবীদের জানিয়ে রাখা ভালো যে মোরোয়ার নীতি মোহমুদ্গর-জাতীয় নয়, পরিপূর্ণ শিল্পদৃষ্টিতেই তার জন্ম। প্রকৃত শিল্পী নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিকৃতি গ'ড়েই ক্ষান্ত হয়না, সে চায় ওই অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে। কারণ রূপই প্রকাশের একমাত্র প্রণালী, তার ঘটকালি ব্যতিরেকে একের অনুভূতি দশের কাছে উপস্থাপিত হতে পারেনা। কাজেই স্বকীয় ভাবকে রূপ দেওয়ার মানেই হচ্ছে তাকে রসে উত্তীর্ণ করা, অর্থাৎ তার মধ্যে যেটুকু সার্ব্বিক তাই ছেঁকে নিয়ে, বাকিটুকুকে ফেলে দেওয়া। এইখানেই নীতির সঙ্গে রূপের যোগ, কারণ রূপের মতো নীতিরও কর্ত্তব্য হচ্ছে একককে ছেড়ে বহুকে বরণ করা, ব্যক্তির উপরে সঙ্ঘকে প্রাধান্য দেওয়া, বিশেষ থেকে সাধারণে উপনীত হওয়া। মোরোয়া এই নিরীহ রকমের নীতিকার। তাঁর মধ্যে গুরুগিরির অপ্রমাণ অহংকার তো নেইই, এমন-কি কতকগুলো দৃশ্যে,—বিশেষ ক'রে প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের বিবরণে, তাঁর নির্লিপ্তি স্তাঁদাল-এর পবিত্র নৈর্ব্যক্তিকতাকে স্মরণে আনে। এবং এই রক্ষাকবচের গুণেই তিনি ফরাসী আধুনিকদের মন্ত্রদাতা জীদের প্রভাবকেও এড়িয়ে গেছেন। জীদের নায়ক-নায়িকারা সংসারবিরত, সমাজাতিরিক্ত; আত্মার গূঢ় বৈশিষ্ট্যকে পরিব্যক্ত করার জন্যে তারা হয়তো নরহত্যায় সুদ্ধ পশ্চাদপদ নয়; তাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে মুক্তির একমাত্র পন্থা হচ্ছে সকলকে ত্যাগ ক'রে, নিঃসহায়-নিরুপায়ভাবে আত্মস্থ হওয়া; তারা মনে করে যে ব্রহ্মসাযুজ্য, সেও হয়তো মূলে একটা অনুভূতি, একটা বেদনা, একটা সম্ভোগ। তাই তারা বিকার-বিক্ষোভকেও বাদ দেয়না, তাদের লুব্ধ ব্যক্তিতা জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গবেষণা করে। কয়েক বিষয়ে জীদের সঙ্গে পুরানো গ্রীকদের ঐক্য দেখা গেলেও, এই মনোভাব যে ধ্রুপদী আদর্শের পরিপন্থী, তা বলা অনাবশ্যক। গ্রীকেরা ব্যক্তিত্বের বাড়াবাড়িকে বিপজ্জনক ব'লে ভাবতো; এবং ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারকে গ্রহণ করাই ছিলো তাদের ধ্যানধারণার সূত্র-সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয় পশ্চিমে আবার সেই উদাত্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্ততপক্ষে দেনিসের পারিবারিক চক্রে পুনরাগমনের প্রবর্ত্তনা যে তাই, সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এ-প্রসঙ্গে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক্-এর "ল ন্য দ ভিপের"-কে প্রামাণ্য মনে করা সঙ্গত কিনা জানিনা। মোরিয়াক প্রথম থেকেই ক্যাথলিক লেখকদের অন্যতম, এবং সেইজন্যে আমি তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত নই। যতদূর জানি তিনিও, পল ক্লোদেল্-এর মতো, সাহিত্যসৃষ্টিকে ভগবৎ-সেবার উপলক্ষ্য ব'লে ভাবেন, এবং তাঁর মতেও খৃষ্টোক্ত সদাচারপদ্ধতিই মোক্ষলাভের অনন্যপন্থা। শুনেছি তা সত্ত্বেও তিনি পোপের অনুমোদন পাননি, কারণ মোরিয়াক মনে করেন যে যাজকের আশীর্ব্বাদ ব্যতিরেকেও সদগতি

সম্ভব ; এর জন্যে শুধু খৃষ্টের প্রতি অচলা ভক্তিই যথেষ্ট, এবং তাও যদি দুঃসাধ্য হয়, তবে বাইবেলবর্ণিত একটা যে-কোনো গুণ আশ্রয় করলেই, অজ্ঞান-সজ্ঞান সমস্ত পাপকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্কে বিধর্ম্মীর মন স্বতই উদাসীন, স্বভাবতই নির্ব্বাক ; তাই ওই প্রসঙ্গই আলোচ্য উপন্যাসের ভিত্তি কিনা, তা বিচার না-ক'রে, বইখানি থেকে বরং আমার নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপকরণ জোগাই। কিন্তু উপক্রমণিকাতেই বলা বিধেয় যে লেখকের ধর্ম্ম যাই হোক, তার ফলে আখ্যানস্রোতে কোনো আবিলতা আসেনি। একদেশদর্শিতা তো দূরের কথা, "ল ন্য দ ভিপের"-এর ঘনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য্যব্যূহে লেখক, মোটের উপরে, কোনো অবান্তর মতামতের অবকাশ রাখেননি। মোটের উপর বললুম এই কারণে যে পুস্তকখানির শেষ ত্রিশ পাতা-সম্বন্ধে আপত্তি হ'লেও হতে পারে ; হয়তো এই পরিশিষ্টটা নিখাদ সাহিত্যের তাগিদে পরিকল্পিত হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে বাক্যব্যয় অশোভন, কারণ উক্ত ক্রোড়পত্রের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, গ্রন্থখানিতে যে-রস পেয়েছি, যে-পরিপূর্ণতা দেখেছি, তাতে, অন্তত আমার বিবেচনায়, 'ল ন্য দ ভিপের' অমর-জাতীয়।

প্রশংসা হয়তো অতিরঞ্জিত হয়ে পড়লো, এবং সেইজন্যেই কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করতে ভয় পাচ্ছি। চুম্বকে তার উৎকর্ষ ধরা পড়বেনা, কারণ অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর শিল্পসম্পদের মতো এ-গল্পেও বাহুল্য একেবারেই নেই। একে রূপান্তর করা তো চলেইনা, এমন-কি ভাষান্তরও বোধ হয় অসাধ্য। তা ছাড়া বইখানি ঘটনাভূয়িষ্ঠ নয়, নিটোল, নিবিড় গীতিকবিতার মতো আবেগপ্রধান। তবু তার আখ্যানসার এইরূপ : এক ধনাঢ্য কৃষকপুত্র সঙ্কীর্ণ পল্লীসমাজের ঈর্ষ্যা-অবজ্ঞায় বিষজর্জ্জরিত হ'য়ে, হঠাৎ এক অভিজাত খাতকের মেয়েকে বিবাহ ক'রে বসলো। এই প্রতিলোম কুটুম্বিতায় তার নিজের মায়ের সম্মতি ছিলোনা ; কিন্তু তিনি পুত্রের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাবেননা ব'লে, স'রে দাঁড়ালেন ; এবং সত্যই দেখা গেলো এই বর্ব্বর, হিংস্রস্বভাব যুবকটির অন্তরাত্মা প্রেমের আরতিদীপে জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠলো। এক মাধবী পূর্ণিমার রাত্রে সে স্ত্রীকে প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের কথা শুধিয়ে জানলে যে ইসার (অর্থাৎ তার স্ত্রীর) একটি সম্ভ্রান্ত সুদর্শন যুবকের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিলো, কিন্তু ইসার দুই ভায়ের ক্ষয়-রোগে মৃত্যু হওয়াতে, পাত্র-পাত্রীর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, বরপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায়নি। ইসা অবশ্য মুখে বললে যে সে-বিয়ে ভেঙে গিয়ে ভালোই হয়েছে, নচেৎ এমন স্বামী তো আর পাওয়া যেতোনা ; কিন্তু নায়ক এতে আশ্বস্ত হলোনা। তার মনে পড়লো যে সে যেদিন প্রথমে ইসার অধরস্পর্শ করে, সেদিন ইসার ক্রন্দনকে সহজে থামানো যায়নি। আত্মগরিমায় আত্মহারা হ'য়ে, সেদিন যে-অশ্রুকে সে প্রেমাশ্রু ব'লে ভুল করেছিলো, আজ বুঝলে সে-ক্রন্দন প্রাক্তন অনুরাগের স্মৃতিতর্পণ। চৈত্রী জ্যোৎস্না তার চোখে তমসাবৃত হ'য়ে গেলো ; মনে হলো পার্শ্ববর্ত্তিনী আর তাঁর মাঝে অনন্ত ব্যবধান মুখব্যাদান ক'রে আছে ; যুগযুগান্তের যত বিসংবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত ট্র্যাজিডি নিমেষমধ্যে তার বক্ষে জগদ্দলের মতো নেমে এলো। সে পণ করলে এই প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নেবেই। তাই ইসা আস্তিক ব'লে, সে নাস্তিক হ'য়ে উঠলো ; ইসা শিষ্টাচারী ব'লে, সে অত্যাচারের আশ্রয় নিলে ; ইসা সন্তানবৎসল জেনে, সে পুত্রকন্যাদের পর ক'রে দিলে। সমস্ত সংযম গত হওয়াতে তার কৃষকী কৃপণতা তাকে বীভৎস ও বিভীষণ ক'রে তুললে।

অদৃষ্টও তার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতে ছাড়লেনা। অতিপরিশ্রমে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যে-মেয়েটি পিতাকে নির্ভয়ে ভালোবেসেছিলো, গ্রাম্য চিকিৎসকের অজ্ঞতায় তার অকালমৃত্যু ঘটলো। এক ক্ষণিকার সংস্পর্শে তার আন্তর জীবন কিছু দিনের জন্যে মধুময় হ'য়ে উঠলো বটে, কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওয়াতে তাকেও আর কাছে রাখা গেলোনা। ইসার স্বর্গগত বিদ্রোহী ভগ্নীর একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন ক'রে, সে তার অসীম ক্ষুধা মিটাতে চাইলে, কিন্তু যুদ্ধ এ-ছেলেটিকেও বাদ দিলেনা। বার্দ্ধক্য তাকে স্থবির ক'রে তুললে; মৃত্যুর অগ্রদূত বারেবারে প্রভুর আগমবার্ত্তা ঘোষণা ক'রে গেলো। যে-অর্থের লোভে ইসা তার পাণিগ্রহণ করেছিলো, সেই উত্তরাধিকার থেকে ইসা ও ইসার সন্তানদের সে বঞ্চিত করবে, এই ছিলো তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই মুমূর্ষু অবস্থাতেও, তার প্রণয়িণীর কানীনপুত্রের সন্ধানে তাকে প্যারিসে যেতে হলো। কিন্তু এখানেও বিধি বাদ সাধলেন। বৃদ্ধের পরিবারবর্গের তর্জ্জনগর্জ্জনে সে-অপদার্থ ভয় পেয়ে, তাদের সঙ্গে চক্রান্ত করতে লাগলো; এবং ইসার জন্যে অন্য শাস্তি উদ্ভাবিত হবার পূর্ব্বেই, বৃদ্ধের সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়ে, ইসা গেলো মারা। বৃদ্ধের অসমাপ্ত জীবনের ভারকেন্দ্র পলকে ভেঙে পড়লো; অভিব্যাপ্ত সর্ব্বনাশের মধ্যে সে বুঝলে যে সে সঞ্চয়ের লোভে কৃপণতা অভ্যাস করেনি, উৎপীড়নের লালসায় ইসাকে নিঃসম্বল করতে চায়নি, বিদ্বেষের তাড়নায় সংসারবিমুখ হয়নি। সে চেয়েছিলো ইসার অখণ্ড হৃদয়, ইজার পরিপূর্ণ অনুকম্পা; ইসাকে সহকর্ম্মীরূপে পেয়েই তার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি, সে দাবি করেছিলো ইসার সর্ব্বমুখী সহধর্ম্মিতা। কিন্তু তার সহজ প্রত্যাশার দিকে ইসা দৃক্‌পাত করলেনা; তাই যত দ্বন্দ্ব, তাই তাকে সঙ্কল্প করতে হলো যে তার মৃত্যুর পরে ইজা যখন দলিল-দস্তখৎ খুঁজতে আসবে, তখন সে-সব কিছুই পাবেনা, পাবে কেবল তার ব্যর্থ জীবনের ব্যথিত ইতিহাস। কিন্তু এখন? এখন হিংসার আঘাতেও ইসার বিমুখতা ঘুচবেনা; তার প্রভূত সম্পত্তি এখন আর প্রহরণ নয়, কেবল ভার, কেবল বিড়ম্বনা। সে তৎক্ষণাৎ উকিল ডাকিয়ে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ছেলেমেয়েদের লিখে দিলে। ফলে তারা হয়তো বৃদ্ধকে পাগল ভাবলে, কিন্তু তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জীবনের পরম অভিপ্রায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। সে তন্ময় হ'য়ে বুঝলে, যদি বাঁচতেই হয়, তবে সকলকে বাঁচতে দিয়ে, সকলের আনন্দ-বেদনার মধ্যে অনাত্মভাবে বাঁচাই একমাত্র বাঁচা। তাই লব্ধকাম পুত্রকন্যারা তার সন্তজাগ্রত স্নেহ-সমবেদনাকে যখন নিতে পারলেনা, তখনো সে বিচলিত হলোনা; ভগবানের সঙ্গে আজন্মের বিবাদ সখ্যে পরিণত ক'রে, অনাবশ্যক আত্মজীবনী লিখতে লিখতে ভবলীলা সংবরণ করলে।

এই হ্রস্বীকরণ মুখ্যত আমার অক্ষমতারই পরিচয় দেবে, কিন্তু এর থেকেও বোঝা শক্ত হবেনা যে "ল ন্য দ ভিপের"-এর সঙ্গে আজকালকার উপন্যাসের প্রভেদ প্রকৃতিগত। যে-অপ্রতিভ হৃদয়হীনতা, যে-বক্রোক্তিপূর্ণ দীর্ঘসূত্রতা, যে-অতিচেতন ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আধুনিক কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য উপাদান, মোরিয়াকের রচনায় সে-সমস্ত চিরদিনই অবর্ত্তমান। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকের পুরাকালীন গাম্ভীর্য্যে চমৎকৃত হওয়া হয়তো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে-খৃষ্টানী ধার্ম্মিকতা তাঁর আখ্যানাবলীর সনাতন লক্ষণ, এখানে তার অভাব সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য পূর্ব্বেই বলেছি যে একটা অহৈতুক অধ্যাত্মনিষ্ঠা বইখানির শেষ কয়েক পাতাকে একটু অবান্তর ক'রে তুলেছে।

কিন্তু এই অংশের অনুপ্রেরণাও বোধহয় বোমপ্রসূত নয়, গ্রীসজাত। গল্পটি উত্তম-পুরুষে লিখিত হওয়ায়, তার মধ্যে খৃষ্টীয় চরমোক্তির ইঙ্গিত পাওয়া সহজ। কিন্তু প্রতিপক্ষে এটাও স্মরণীয় যে নায়ক আমরণ অননুতপ্ত, তার মনোভাবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যীশুকথিত দীনতার লেশমাত্র দেখা যায়না। যেটা দেখা যায় সে হচ্ছে খৃষ্টীয় চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের উল্টো গুণ, অর্থাৎ চিত্তের দ্বারমুক্তি, বিষকুণ্ডলীর ব্যবচ্ছেদ। অন্তঃকালে বৃদ্ধ ভগবানকে পেলে বটে, কিন্তু সে-পাওয়া পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে নয়, পরিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ; তার পারমার্থিক সার্থকতার সীমান্তে নির্ব্বাণের রহস্য নেই, আছে মনুষ্যধর্ম্মের রহস্য।

আমি জানি যে মাত্র তিনখানা বইয়ের সাহায্যে অর্দ্ধেক পৃথিবীর হার্দ্দ্য পরিবর্ত্তন প্রমাণ করতে যাওয়া দুঃসাহসেরই নামান্তর। উপরন্তু শিল্প-সাহিত্যকে ইতিবৃত্তের মর্য্যাদা দেওয়া আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু সাহিত্য যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, তাকে আমি লোকোত্তর মনে করিনা। তার মধ্যে জীবনের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যেমন অসম্ভব, সে-দর্পণে সমাজের দ্বিরায়তনিক ছায়া দেখাও তেমনি স্বাভাবিক। অতএব আমি যদি আমার অনুমিতির পক্ষ থেকে কৈবল্যের দাবি না-করি, তবে সিদ্ধান্তের সত্যতা-নিরূপণে এই তিনজন ভিন্নস্তর ও ভিন্নরুচি লেখকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি এতে সন্তুষ্ট নন, তিনি শ্লুম্বের্জে ও দ্রিয় লা রোচেল্-এর সর্ব্বশেষ উপন্যাস দুখানি, জালু-র সন্দর্ভাবলী, ফের্নাদেস্-এর জীদ্-সম্বন্ধে গবেষণা, পিয়ের আব্রাম্-এর প্রুস্ৎ-সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রভৃতির শরণ নিতে পারেন। এত লোক থাকতে আমি শুধু তিনজনের নাম করলুম এই কারণে যে, প্রথমত পাঠকের ধৈর্য্য অপরিমেয় নয়, দ্বিতীয়ত উল্লিখিত পুস্তকগুলির ইংরেজি অনুবাদ কেবল সময়সাপেক্ষ, তৃতীয়ত এঁরা তিনজনেই সুবিখ্যাত ও সাহিত্যজগতে সমবয়সী।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একটি বসন্ত—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, (এম, সি, সরকার, এণ্ড সন্স্)।

কবিতার বই। বইখানিতে ২৭টি ছোট কবিতা আছে। সম্ভবত কৈফিয়ৎ হিসাবেই গোড়ায় লেখা আছে—"এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯ সাল ও রচনাস্থল ইংলণ্ড। পরে কিছু পরিমার্জ্জিত হয়েছে।" ভালো কথা। কিন্তু পরিমার্জ্জিত যদি করাই হইল তবে "কিছু" করা হইল কেন তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। যথাসাধ্য পরিমার্জ্জিত করিয়া বাহির করিলে কাব্যেও রুচি প্রকাশ পাইত এবং জীবে দয়ারও কোনো ব্যত্যয় ঘটিত না।

প্রথম কবিতাটি যেন মানকুমারীর কবিতা—আঁচলে বাঁধা বেলফুল ফেলিয়া দিয়া একটু বিলাতী গন্ধসার মাখিয়া আসিয়াছে।

"ক্ষণেক বসো গো প্রিয়ে <u>পাশ</u>।"
"প্রথম হেরিনু <u>তোমা</u>"
"আহা এ যে <u>হরিষে</u> <u>বিষাদ</u>।"

প্রভৃতি আজকালকার দিনে অচল।

ইহার মধ্যে ৯টি কবিতা পয়ার ছন্দে ১৪ লাইন করিয়া বাঁধা। তাহা sonnet নয়—পয়ার চতুর্দ্দশী বলা চলে। পয়ারের আদিম গন্ধটুকু ইহাতে এখনো বজায় আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পয়ারেরই মত ইহার প্রত্যেকটি পংক্তি একএকটি unit।

"বিধাতারে অভিশাপ দিবনা দিবনা
আপনারে ধিক ধিক তাও বলিব না।
তখন স্মরিব তোমা হে আমার লতা
নিশিদিন যে সৌভাগ্য দিয়েছ সর্ব্বথা।"

সব পংক্তিগুলিই এইরূপ।

বলিবার কথা যখন সুনির্দ্দিষ্ট নয় অথচ জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষা যখন অত্যুগ্র সেই কাঁচা বয়সের লেখার মত এই কবিতাগুলিতে বহু অসংলগ্নতা-দোষ রহিয়া গিয়াছে। এবং দুর্জ্জয় গিরি লঙ্ঘন করিয়া আঙিনায় আসিয়া আছাড় খাওয়ার মত অধিকাংশ কবিতারই শেষ লাইনগুলি জোলো অর্থাৎ flat।

৬ নং কবিতায়—

…"আর কারো পানে
আনমনে চেয়ে রই…
সে আমার নয় ভালোবাসা
প্রেমের তিয়াসা নয় রূপের তিয়াসা।

এখানে বক্তব্য বোধহয়—রূপের তিয়াসা নয় প্রেমের তিয়াসা। আবার ১০ম পংক্তিতেও

"প্রেমের অন্যতা নয় তৃষার অন্যতা।"

এ স্থলেও বোধহয় প্রেম ও তৃষার স্থান পরিবর্ত্তনে অর্থসঙ্গতি হয়।

"অন্যতা" শব্দের ব্যবহারে সাহসের জন্য কবি প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

১০ নং কবিতা—

"তুমি মোর ব্রিটানিয়া। তুমি মৌন হাসি"

idea বেশ। কিন্তু কটুশব্দ ও গদ্যপদ প্রয়োগে ইহার অন্তর্নিহিত রসমাধুর্য্যটুকুকে কবি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিস্বাদ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

"ভাস্কর খোদিত মুখ"
"কুঞ্চনরহিত মুখ।"

বাংলা ভাষার উপর এত খোন্তা চালানো সহিবে না। নূতন শব্দ-প্রয়োগ করিতে হইলে বাংলার নিজস্ব ভাষা-সঙ্গীতে কান খুব দুরস্ত হওয়া চাই। নহিলে experiments গদ্যেও চলে না—কাব্যে ত দূরের কথা।

১৫ নং কবিতাটিতে কবি "জীবন ফাঁকিতে ফাঁকা" সুতরাং "হিয়ার হায় হায় থামিল না যে" বলিয়া কান্নাকাটি করিয়া সুরু করিয়াছেন। কবিতার মাঝামাঝি পৌছিয়া দেখি

"অপথে চলা মোর নয় বিফলা
সকলে ভালবাসে ভোলা পথিকে
ধন্য করে দিল জীবন মম"

এইরূপ সৃষ্টিছাড়া প্রলাপোক্তি আরো আছে। সব কথা ধরিতে গেলে পুঁথি শেষ করা যায় না।

১১ নং কবিতায়—

"ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয়"

বলিয়া আহ্বান করিয়া লইয়া, ক্রমে নানা ছবির লোভানি দেখাইয়া শেষ মহড়ায় অকস্মাৎ

"ছবির পসরা করিয়া উজাড়
প্রিয় রমণীর পায়
মন হ'তে তোর নেমে গেছে ভার
ওরে কবি ছুটে আয়।"

বলার অর্থ কি?

১৮ নং কবিতায়—

"আর কভু আমি কহিবনা কটু কথা"
"আর কভু আমি ভাবিবনা কুভাবনা"
"আর কভু আমি করিবনা হীনকায"

পড়িয়া মনে হইল খোকা দাঁড়াইয়া Sunday School-এ "হলপ" পাঠ করিতেছে। খোকার মনে কি আছে খোকাই জানে। ২০ নং কবিতাটি রজনী সেনের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া প্রিয়া প্রিয়া গো বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া মড়া কান্না কাঁদিতেছে। ২৬ নং কবিতাটি গো গো গো গো শব্দে অনন্যার প্রতি অনন্য প্রেমের চাপা ব্যথায় যেন গোঙ্‌রাইতেছে।

২৭ নং অর্থাৎ শেষ কবিতাটির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার শান্ত ছন্দ মনকে স্পর্শ করে—

"বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা"
"অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা"
"আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি
"চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে"

প্রভৃতি পংক্তিগুলির অন্তরে জ্বালাময় তীব্র প্রেমের প্রখর যৌবনতাপ জুড়াইয়া আসিয়া একটি আনন্দঘন পরম পরিতৃপ্তিময় শান্ত পরিণতির অনুভূতি পাঠকের ক্ষুব্ধ চিত্তকে ছায়াস্নিগ্ধ নিরাময় শান্তিরসস্পর্শ দান করে। এমন কবিতাটিতেও শব্দ-সামঞ্জস্যের অভাবে স্থানে স্থানে হোঁচোট খাইতে হয়; অর্থের দিশা পাওয়া দুষ্কর হয় এবং পড়িতে পড়িতে মনের মধ্যে অতর্কিত বাধার অতৃপ্তি জমিতে থাকে। তবুও ছন্দের অবন্ধুর পথে এক প্রকারে অগ্রসর হইয়া চলা যায়। কিন্তু শেষ পংক্তির শেষ কথাটিতে আসিয়া অকস্মাৎ একেবারে খাদে পড়িয়া কবিতাটি "তাই নিঃশেষে মোলো।"

এ ছাড়া বইখানিতে কানে বাজে এমন বেতালা শব্দ প্রচুর। সবগুলি এখানে তুলিয়া দেখানো সম্ভব নয়। কারণ লাইনের অন্যান্য শব্দের ঝঙ্কারের সঙ্গে যাহা খাপ খায় নাই তাহা, লাইনগুলি না তুলিয়া, দেখানো যায় না। তোমা, প্রবঞ্চিকা, কুঞ্চনরহিত,

স্মরাও সূর্য্যবদনা মেদিনী, আমার নাসার পাশে; মুচুকি, পীড়াভাগ, দুর্ল্লভা, ম'লো প্রভৃতি শব্দ শ্রুতিকটু। শিয়র শব্দের অর্থ মাথার দিকে। শিথান কি শিতান?

হাতের লেখা যাহাদের কাঁচা থাকিয়া যায় তাহারা যেমন নানা সময়ে ভালমন্দ নানা হস্তলিপির ছাঁদে লিখিয়া থাকে—কাঁচা হাতের কবিতাও তেমনি নানা লোকেরা নকলে বহুরূপীত্ব লাভ করে। সেই জন্য এই বইখানিতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মানকুমারী, পয়ারী মিলিয়া স্টাইল দাঁড়াইয়াছে বারোয়ারী।

Clever জিনিস লিখিবার চেষ্টা আজকাল কবিদের প্রায় একটা মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই বইখানিতে অনেকগুলি ঐরূপ লাইন আছে। সাধারণতঃ সেগুলি মন্দ নয়। যথা,

"একের মিলনে আমি অন্যের বিরহী"
"প্রেমের অন্যতা নয় তৃষার অন্যতা"
"আদিত্য সভায় খুঁজি আমার সমান।"
"দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন"
"প্রভাতে হেরিব তোমারি অচেনা মুখ"
"জেনো, প্রিয়ে, যা দিইনি সেও যে তোমারি"

এ সত্ত্বেও বইখানিতে যথেষ্ট কবিত্বের খোরাক আছে। এমন অনেক চমৎকার লাইন ও ভাবসম্পদে পূর্ণ এমন কবিতাও আছে যাহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়। নিচে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা আমার ভাল লাগিয়াছে এবং পাঠকেরও ভালে লাগিবে আশা করিতেছি—

১। তারা হতে তারকায়
আমার রথাশ্ব ধায়
রথচক্র রেখা মোর ছায়াপথময়।

২। তারায় তারায় খুঁজি রহস্যের আলো

৩। ভুঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়াছে ফুল
রূপসীর পদপাতে,
নবশিশু সম নাড়িছে আঙুল
সবুজীন আঙিনাতে।

৪। তার কণ্ঠের পারিজাত হার
খুলে পড়ে আর ফুল ফুটে যায় ঘাসে

৫। আমারে ঘেরিয়া করে তীর্থপরিক্রমা
কোটী তারা কোটী যাত্রীসমা
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
ওরা হানে কপালে কঙ্কণ।

৬। আকাশে রয়েছি চেয়ে—
এ-যেন অবর্ণা বর্ণ অচিত্রিত কিরণমার্জ্জিত
তপন-কেশর পদ্ম পূর্ণমুক্ত অনন্তশায়িত।
এ যেন স্ফটিকময় ময়সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থপুর
দীপাধারে রবি জ্বলে আভাচলে দিকপ্রান্তদূর

৭। আমার তনুময় বাণীর বীণা বাজে
পরশে বোঝনি কি সে ভাষা?

৮।　　　　এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা
　　　　　অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোল।।

এই লাইনগুলিতে কবির কাব্যরসোপলব্ধি ও প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিম্বা

আমারে কাঁদায় চির বসন্ত
　　কুসুমবন্ত রূপসুগন্ধবান।

ছন্দঝঙ্কারে চিত্তহরণ করে।

এই পুস্তকখানির মধ্যে এই লাইনগুলি যেন পঙ্কজ। যাহার মধ্যে জন্মিয়াছে তাহার সহিত ইহাদের গোত্র-সম্পর্ক নাই।

দিলদার হুসেন

সমাজতন্ত্রবাদ—শ্রীগোপাললাল সান্যাল। সান্যাল বুকষ্টোর। দ্বিতীয় সংস্করণ।

লেখক তাঁহার 'নিবেদন'-প্রসঙ্গে বলিতেছেন: "বর্ত্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী"। সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে লেখক ইংরাজীতে যে-সকল মতবাদকে সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া হয়, ব্যাপকভাবে তাহাই ধরিয়া লইয়াছেন মনে হয়। এই সকল মতের বিরোধী মতকে ধনিকতন্ত্রবাদ (ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্) বলা হয়—সাম্রাজ্যবাদ নয়। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা ধনিকতন্ত্রবাদকে মানিয়া লন—কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

বইখানির গোড়াতেই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে-অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, বইখানির ভিতরে তাহা ভালো করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজিতে 'সোশ্যালিজ্‌ম্' কথাটি অনেক সময় ব্যাপকভাবে নানা বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—অবশ্য এই সকল মতবাদ মোটামুটি এক জাতীয়। কিন্তু সোশ্যালিজ্‌ম্ কমিউনিস্‌ম্ প্রভৃতি বাক্যগুলি আবার বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়—আদর্শ মোটামুটি এক হইলেও সোশ্যালিজ্‌ম্ ও কমিউনিজ্‌ম্ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক এই বিভিন্নতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। 'কমিউনিজ্‌ম্' কি তাহা তিনি একেবারেই জানেন না মনে হয়। বহুস্থানে তিনি 'সমবায়-সাম্রাজ্য' বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে-প্রসঙ্গে তিনি এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও মনে হয় যে তাঁহার মতে সমাজতন্ত্র ও সমবায়-সাম্রাজ্য একই ব্যাপার। লেখক বোধ হয় জানেন না যে ইংরাজিতে 'Co-operation' কথাটি অর্থনীতিতে একটি বিশিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। এই মতবাদ সোশ্যালিজ্‌ম্ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও সোশ্যালিজ্‌ম্-এর ন্যায় ইহাও ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্-এর বিরোধী এবং ইহার প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক আদান প্রদান ব্যাপারে 'Profits' বা 'লাভ'-এর উচ্ছেদ সাধন। ইংরাজি Co-operation কথাটির বাংলায় অনুবাদ করা হয় 'সমবায়', সুতরাং 'সমবায়-সাম্রাজ্য' বলিতে বুঝায় 'Co-operative Empire'। ঠিক এই বাক্যটি ইংরাজিতে কোথায়ও পাইয়াছি মনে হয় না। তবে Co-operative Republic বা Co-operative

Democracy যথেষ্ট শোনা যায়। অন্তত সোশ্যালিষ্টরা যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে চান তাহাকে কিছুতেই সমবায়-সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে না; যদি গোপাল বাবু জোর করিয়া বলেন তাহা হইলে সমবায়বাদীরা তাহাতে আপত্তি করিবেন এবং যাঁহারা এই সকল বিষয় আলোচনা করেন তাঁহারা এই আপত্তি সমর্থন করিবেন।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌ কো-অপারেশন যে-সকল অর্থনৈতিক মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত লেখক সেই সকল মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত বলিয়া মনে হয়না। তাহার ফলে বইখানিতে লেখক যে-সকল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হয় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, নয় বলিতে গিয়া যাহা বলা উচিত তাহার একেবারে উল্‌টো কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু লেখকের প্রাঞ্জল বাংলা লিখিবার ক্ষমতা আছে। আলোচ্য বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝিয়া যদি তিনি বইখানির সংশোধন করেন তাহা হইলে বাংলা দেশের উপকার হইবে।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

তীর্থপথে—কবিতা (১৩৩১—১৩৩৮) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী (গুরুদাস লাইব্রেরী)

এই বইয়ের গোড়ায় লেখা আছে—"এই লেখকের লেখা দীপান্বিতার কবিতাগুলি মূল্যবান সাহিত্য সমালোচনায় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে।" দীপান্বিতা আমি পড়ি নাই। তাহার সমালোচনাও দেখি নাই। কিন্তু তীর্থপথে পড়িলাম। পড়িয়া মনে হইল যে লেখক বহুযত্নে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে নানা শব্দ, বাক্য ও ভাব চয়ন করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা গাঁথিয়া গিয়াছেন। অর্থ হইল কিনা সে দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। ছন্দের বেগে ছুটিয়া চলাই যেন তাঁহার লক্ষ্য। ফলে অধিকাংশ কবিতাই পড়িতে বাধে না বটে, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলেই মনে হয় যেন ধাঁধা পড়িতেছি—তাহার উত্তরটা যেন বোঝা যাইতেছে অথচ কিছুতেই মিলিতেছে না।

এক প্রকারের দুর্বোধ কবিতা আছে যাহার দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দপুঞ্জ ধ্বনির কুচকাওয়াজ করিয়া তাহার অর্থের দুয়ারে পাহারা বসাইয়া রাখে। সেখানে সাধারণের প্রবেশ অব্যাহত নয়।

আর এক প্রকারের দুর্বোধ কবিতা আছে যাহার অর্থ, সেই জালকাটা ঘরের মধ্যবিন্দুর ইঁদুরের মত। কোণের বিড়ালের তাহার নিকট যাওয়ার রাস্তা একটা আছেই কিন্তু যাইতে হইলে তাহাকে অনেক গোলোকধাঁধায় নাজেহাল হইতে হয়।

তৃতীয় প্রকার দুর্বোধ কবিতা সুস্পষ্ট প্রলাপের মত। পড়িলেই তাহার অনর্থপাত ধরা পড়ে।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সংমিশ্রণে আর এক চতুর্থ প্রকার দুর্বোধ কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত দিব না কারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সমগ্র কবিতা তুলিয়া দেখাইতে না পারিলে

context-এর অজুহাত তোলা অস্বাভাবিক হইবে না। তত স্থান এ সমালোচনায় নাই। তৃতীয়টির দু একটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রথম কবিতাটিতেই উত্তর বায়ুকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন

বহি' কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
এলে তুমি শীতের বাতাস ?

বায়ুরোগ খুব কঠিন না হইলে শীতের বাতাসও "তপ্ত" বোধ হয় না। বা

দেহের মন্দিরা-তারে অহরহ ঝঙ্কারিয়া যায়

মন্দিরা সেতার নয়। মন্দিরা কাংস্য নির্ম্মিত ছোট করতাল বিশেষ।

এইরূপ অজস্র আছে। কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত এই চতুর্থ প্রকার দুর্ব্বোধ কবিতার স্বরূপ ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার পার্থিব দুর্ব্বলতা লইয়াও সেই সকলের বহুঊর্দ্ধে যেন কল্পলোকে বিচরণ করিতেছে। পড়িলে অতর্কিতে মনে হয় যে ভাষা ও ছন্দের অন্তরালে যেন একটা চমৎকার ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে; কী যেন একটা গভীর কথা বলিবার আছে—আর একটু পড়িলেই যেন তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই প্রতীক্ষিত "আর একটু" আর আসে না—কবিতার পর কবিতা পড়া হইতে থাকে, এবং এ অন্তস্তলপরিশূন্য নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির আঘাতে, রেলগাড়ীর একটানা দ্রুততালের খঞ্জনীর মত, মনকে কখন অসাড় অন্যমনস্ক করিয়া ফেলে।

কবির চিত্তে তাঁহার কাব্য বিষয়ের পূর্ণ অনুভূতি ও সেই অনুভূতির আবেগে তাঁহার মানসচিত্রপটে তাহার ছবি সুস্পষ্ট না জাগিলে কাব্য রচনা অসংলগ্ন হয়। অথবা চেষ্টা পূর্ব্বক সংলগ্ন সুসমঞ্জস (logical) করিয়া প্রকাশ করিতে যাইলে তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। প্রাণে কবিতার আবেগমাত্র আসিয়াছে অথচ ছবি সুস্পষ্ট হইয়া মানসনেত্রে জাগে নাই এমন অবস্থায় প্রকাশের জন্য কবিতা না লেখাই শ্রেয়। কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই ছন্দের গতিবেগে ভাষা গাঁথিয়া যাওয়া মাত্র সার হয়। প্রাণের অন্তস্তলে যে ভাব, যে ছবি পারিপার্শ্বিক নিখিল জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া উঠে এবং অন্তর্নিরুদ্ধ সৃজনের বেদনায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই কবির কবিতা—চিত্রকরের আলেখ্য।

যাহাই হৌক, কবিতাগুলির অধিকাংশই পড়িতে ভালো এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কবিচিত্তাকাশে কবিতার নীহারিকার অবস্থা কাটিয়া যাইবে এবং নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির গৌরবে তিনি কবিসমাজে "বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন" করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীজীবনময় রায়

But for the Grace of God—By J. W. N. Sullivan. (Jonathan Cape).

সালিভানের প্রকৃতি অতি সরল। তিনি যে অতি সাধারণ লোক একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বই পড়িয়া মনে হয়না তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই উক্তি অস্বাভাবিক এবং অসরল বিনয়ের উচ্ছ্বাস। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনেও সময়ে সময়ে এমন অনেক ঘটনা, এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটে, যাহার

বিবরণ অন্যান্য সাধারণ এবং অসাধারণ লোকের আগ্রহের ও বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে। খানিকটা এই ভরসাতেই সালিভান তাঁহার জীবন-কাহিনী পুস্তকাকারে লিখিয়াছেন ও ছাপাইয়াছেন: 'খানিকটা,' কেননা তাঁহার প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহার জীবনের পরিসর এত ব্যাপক এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা সমূহের অর্থ এরূপ গূঢ় যে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানযুগের মানবমনের স্বরূপ পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু সালিভান সাধারণ লোক হইলেও বোকা নহেন, তাই তাঁহার নিজের জীবন সম্বন্ধে এই বিরাট কল্পনা তাঁহার নিজের কাছে যতই মূল্যবান হউক না কেন, তাঁহার পুস্তকের ভাবী পাঠকগণের নিকট হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হইবে এই কথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং ঠিক যে-ভাবে তিনি নিজের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন তাহার পরিকল্পনারও পরিবর্ত্তন হইল ও তাহার ফল দাঁড়াইল BUT FOR THE GRACE OF GOD।

দুঃখের বিষয়, লেখকেরা বই লিখুন যে-উদ্দেশ্যেই প্রকাশকেরা তাহা ছাপান পয়সার জন্য। তাই যে-কোনো ধরণেরই বই হোক্ না কেন, একটু হৈ-চৈর ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহরা ছাড়েন না। এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি সমালোচকবৃন্দ প্রকাশকদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের নানা বিজ্ঞ সমালোচকের মতে সালিভানের বইখানি নাকি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! একজন বলিতেছেন—এই পুস্তকে আমাদেরই সমসাময়িক এক ব্যক্তি তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবন অকপটভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং পূর্ব্বতন কোনো লেখক অপেক্ষা তিনি এই বিষয়ে কম যান নাই। এইরূপ সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় সেণ্ট অগষ্টিন, চেলিনি বা রুসো বোধহয় বিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে আবার আবির্ভূত হইয়াছেন, কিম্বা আরও রোমাঞ্চকর কোনো ব্যক্তি, হয়তো ক্যাসানোভার অতি-আধুনিক সংস্করণ।

যে-পাঠক এই ধারণা লইয়া সালিভানের বই পড়িতে বসিবেন তিনি নিরাশ হইবেন। বইখানির মধ্যে ভালো বা মন্দ এমন কিছু নাই যাহা পাঠকের মনে চমক লাগাইতে পারে। সালিভানের জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত। গরীবের ঘরে তিনি জন্মিয়াছিলেন, ছেলেবেলায় গরীবের ছেলের মতনই মানুষ হইয়াছিলেন। পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তাঁহার এক খুল্লতাত হঠাৎ মারা যান। তিনি কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফলে সালিভান কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর পংক্তি-ভোজনে আসনলাভের অধিকার অর্জ্জন করেন।

ছেলেবেলা হইতে দুইটি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল—বিজ্ঞান ও সঙ্গীত। কিন্তু অনুরাগ থাকিলেও, সঙ্গীতের চর্চ্চা তিনি বিশেষ করেন নাই। বিজ্ঞানের চর্চ্চা তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি করিয়াছেন, কিন্তু নিজের খেয়ালমতো চর্চ্চা করিলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে-একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন, বোধহয় তাহার অবসর তাঁহার ঘটে নাই। প্রথম বয়সে তিনি কিছুদিন এক কারখানায় কাজ করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হইত। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সহিত এই সামান্য সংস্রবও পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন।

সালিভান যে কৃতী সাংবাদিক তাহা অস্বীকার করা যায়না; কেননা, তাহার আত্ম-চরিত সুলিখিত। দক্ষ সাংবাদিকের ন্যায় তাঁহার রচনা বাহুল্য-বর্জ্জিত। কিন্তু

স্থায়ী সাহিত্যের উৎকর্ষ তাঁহার রচনাতে নাই। যে-আশ্চর্য্য শক্তির গুণে প্রকৃত শিল্পী জীবনের তুচ্ছতম অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যেও অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তোলেন, সে-শক্তির পরিচয় তিনি দেন নাই।

সালিভানের আত্ম-চরিতের পূর্ব্ব অংশ সুলিখিত হইলেও সর্ব্বত্র সুপাঠ্য নয়। বিজ্ঞানে গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক হন নাই। ফলে, বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক এই দুই জাতীয় মানুষ সম্বন্ধেই তিনি এমন অনেক মন্তব্য করিয়াছেন যাহা সত্য হইলেও সাহিত্য রচনার যোগ্য বিষয় বলিয়া কখনই স্বীকৃত হইবে না এবং যাহা মামুলী হইলেও আদৌ সত্য কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ উঠিতে পারে। কিন্তু লেখক সরল হইলেও অবিনয়ী নহে, তাঁহার এই সকল মতামত তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি বলিয়াছেন এবং এই অভিজ্ঞতা যে সকল দেশের সকল মানুষের অভিজ্ঞতা এমন কোনো দাবী তিনি করেন নাই। সুতরাং এই সব মতামত লইয়া তর্ক করা চলে না, শুধু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় এই জাতীয় মতামত বিজ্ঞের মতো প্রচার করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

শুধু বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয় মতামত মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—কেননা তিনি সরল প্রকৃতির লোক। একস্থানে ব্যক্তিবিশেষের কাব্যানুরাগের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

> তাঁহার কাব্যানুরাগের প্রধান কারণ বোধহয় এই ছিল যে কাব্যচর্চ্চার দ্বারা অত্যন্ত স্থূল এবং সাধারণ দৈহিক কামনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নিষ্পাপ উপায়ে পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু এই জাতীয় ব্যাপারে আমি বরাবরই অকপটতার পক্ষপাতী। প্রকৃত সঙ্গীতানুরাগ যাহাদের আছে তাহাদের সহিত আমি একবিষয়ে একমত—লোকে যে কেন শুধু কবিতার ধ্বনি-মাধুর্য্য লইয়া এত বাড়াবাড়ি করে তাহা আমি আদৌ বুঝিনা।.........শুধু ধ্বনি-মাধুর্য্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও একেবারে শ্রেষ্ঠ কবিতা অনেক সময়ে তুল্যমূল্য হইতে পারে—এবং সঙ্গীতের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে আমার মনে হয়, এই মূল্য নিতান্তই সামান্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের মনের উপর কবিতার যে-প্রভাব তাহার সহিত ধ্বনি-মাধুর্য্যের সম্পর্ক নগণ্য।

তর্ক না করিয়াও বলা চলে যে এই মত নিতান্তই অনধিকারচর্চ্চার পরিচায়ক। কিন্তু সালিভানের সব মতামত সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। অনেক স্থলেই তাঁহার মতামতের মধ্য দিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতার, নিজের জীবন সম্বন্ধে গভীর দায়িত্ববোধের, মানুষের সঙ্গে আচারব্যবহারে তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই মাঝে মাঝে তাঁহার বিজ্ঞতার ভাব যদি সীমা অতিক্রম করে পাঠক তাহা অনায়াসেই মার্জ্জনা করিতে পারিবেন।

সালিভান মানুষটির সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার পুস্তকের উত্তরাংশে। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বিজ্ঞভাব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া এই অংশে তিনি যে-সকল অভিজ্ঞতার অত্যন্ত অকপট বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মূল মানুষের যৌন-প্রবৃত্তিতে। সালিভানের পরিণত জীবনে এই প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক হইলেও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে নাই। এবং যদিও এই প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি অনেক

সময়ে এমনভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন যাহা মোটেই শাস্ত্রানুমোদিত নয়, তবু তিনি যে সাধারণ লোক এবং তাঁহার জীবন যে অত্যন্ত মামুলী ধরণের এই মত পরিবর্ত্তনের কোনো সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়না। যে-সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা তিনি করিয়াছেন তাহাতে বৈচিত্র্য বিশেষ না থাকিলেও তাঁহার পুস্তকের এই অংশে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা পূর্ব্বাংশে দুর্লভ। তাঁহার আড়ম্বরহীন আত্ম-পরিচয় ও তাঁহার আন্তরিক আবেগ পাঠকের মনকে স্পর্শ না করিয়া পারে না।

সালিভানের বই পড়িবার সময় লোকটি সম্বন্ধে যে-ধারণা জন্মে বই শেষ করিয়া সেই ধারণাই আরো বদ্ধমূল হয়। তিনি খাঁটি লোক, চিন্তাশীল লোক ও সরল প্রকৃতির লোক। বিজ্ঞান সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের যাহাই মূল্য হউক না কেন, গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু তাঁহার আর যে-ক্ষমতা বা অক্ষমতাই থাকুক, দার্শনিকের ব্যাপক দৃষ্টি বা সাহিত্যিকের রসবোধ তাঁহার নাই। তাঁহার সুখদুঃখের কাহিনী পাঠকের মনে যতই সহানুভূতি উদ্রেক করুক না কেন, যে অপরূপ আলোকসম্পাতে মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে দীপ্ত হইয়া ওঠে, সে আলোক-রশ্মির সন্ধান সালিভান পান নাই।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পরিশেষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

দেরিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এই সংখ্যায় ইহার সমালোচনা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যায় ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই জাপানী ধরণের—চমৎকার।

সঃ পঃ

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ছিল। সেই টিকির জন্যই এবার দেশে এই আড়াই মাস কাল এত ভাল লেগেছিল। সব ভাল লেগেছিল, এমন কি গ্রামের দলাদলি পর্য্যন্ত। গাঁয়ে এক ওলাইচণ্ডীতলা ছিল। সেখানে নানারকম কাণ্ড হত যার আজ কোন অর্থই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানতাম, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতাম। পূর্ব্বপুরুষদের বসান ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর ক্রিয়াকর্ম্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। ভালও লাগত। কিন্তু এত সাত্ত্বিকভাব সত্বেও বন্দুকের ঝোঁক ছাড়তে পারি নেই। একদিন আমরা দুতিনজন গোটাকয়েক কাঁদাখোঁচা মেরে কাছের এক গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছি। দুই বৃদ্ধা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন, আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "এরা কারা লো।" তিনি চুপিচুপি কি জবাব দিলেন। তখন প্রথম বৃদ্ধা বেশ চেঁচিয়ে বার দুই বললেন, "দেখ সে লো দেখ সে, কালীরায়ের ছেলেগুলো পাখমারা হয়েছে।" আমরা পাখীগুলো সেখানেই ফেলে দিয়ে মানে মানে চম্পট দিলাম। তামসিক আহারের হাত থেকে সেদিন নিষ্কৃতি পেলাম। এই একবার মাত্র ধরা পড়েছিলাম, তা নইলে রায়মহাশয়ের ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে দেবদ্বিজে ভক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ দেখে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছেলেরা এখন বললে বিশ্বাস করবেনা যে পূরো আড়াই মাস সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত খাদ্য খেয়েই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা প্রয়াস। দেশের অবনতি বন্ধ হলনা। কয়েক বছর পরে আমার ভ্রাতা যখন গ্রামে যেতেন তখন পাঁউরুটি কেক বাবত অনেক খরচ হত। হপ্তায় একদিন করে আমাদের গ্রামে হাট বসত। মহা উৎসাহে আমরা দরোয়ানের সঙ্গে তোলা আদায় করতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আদায় বেশ জোরেই করতাম। আদায় ব্যাপারটা সনাতন ধর্ম্মসঙ্গত কিনা, তাই আগ্রহের অভাব হতনা।

একদিন রাজেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাদের দূর কুটুম্ব। পরে ফকীর রাজেন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। দশভূজা মূর্ত্তি আর সন্ধি-পূজার বলি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করলেন যে গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমাদের কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। সনাতন ধর্ম্মের আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয়—জগাখিচুড়ী—ব'লে। তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আগেই শোনা অভ্যাস ছিল।

আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে ভীষণ বৃষ্টি নামল। দামোদরে বান এল। দেখতে দেখতে চারিদিক জলে জলময় হয়ে গেল। জল মরবার

আগেই ছুটি শেষ হল। কিন্তু নিরুপায়, ভেলায় চ'ড়ে ত আর সাগর পার হওয়া যায়না। সেজন্য মনে কিন্তু ক্ষোভ রইল না। আমার কোষ্ঠীর বৃহস্পতির ফলাফল দিন কয়েক মুলতুবী রইল মাত্র। ইতিমধ্যে বুধকে সহায় ক'রে ডিঙ্গীতে আর ভেলায় চেপে চতুর্দ্দিক তোলপাড় করতে লাগলাম। পাড়াগেঁয়ে ছেলে হলেও দিনে দশবার ঘোলা বেনো জলে ডুব দেওয়া অভ্যাস ছিল না। সইল না। কলকাতায় এসে দশদিন ডাক্তারবাবু কুইনিন হস্তে মেলেরিয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ ক'রে কোনও রকমে খাড়া করলেন। কুইনিনের প্রভাবে মেঠো রঙ্গটা গেল। একটা কাঞ্চনবর্ণ আভা মুখে দেখা দিলে। তখন সাহস ক'রে শহুরে কলেজে ঢুকতে পারলাম।

যে কেলাসে ঢুকলাম সেটার একমাত্র বর্ণনা হতে পারে—হরিঘোষের গোয়াল। লেক্‌চার হত কিন্তু শোনা যেত না। দুয়েকদিনেই বুঝতে পারলাম যে যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি ত সে ওখানে হবেনা, অন্যত্র। কিছুদিন পরে কেলাসটা দুভাগ হয়ে গেল। মোটামুটি একটা ভাগে হেয়ার ইস্কুল হিন্দু ইস্কুলের মার্জ্জিতরুচি ছেলেরা গেল, আর অন্যটায় আমরা শ' খানেক জঙ্গলী অর্থাৎ বাঙ্গাল, রেঢ়ো, মুসলমান গেলাম। কিন্তু এই সেক্‌শান্ ভাগা হওয়ার আগের একটা ঘটনা বলি।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালী মাষ্টার খুব কমই ছিলেন। তাঁদেরই একজনের কেলাসে কার্ত্তিকপূজোর দিন টেবিলের উপর ঠাকুর এনে রাখা স্থির হল। আমার অত্যন্ত লজ্জা হওয়া উচিত একথা স্বীকার করতে যে আমি ঐ ব্যাপারে সামিল ছিলাম, তবে চুনোপুঁটিরূপে। ধুরন্ধর যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন আজ নেই, আর একজন এখন যোগাভ্যাস করেন। মাষ্টার মশায় টেবিলাধিষ্ঠিত দেবসেনানীকে দেখে প্রথমটা রেগে কথা কইতে পারলেন না। দুই এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে তারপর বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকলেন, "তোমাদের ব'লে দিচ্ছি যে আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করবই, আর রাষ্টিকেট করাব।" এই না ব'লে, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু জান?' আমাদের দিকের প্রায় সত্তর আশীজন নির্ভীক বীরের মত বললাম, "না স্যার, আমরা কিছুই জানিনা।" তখন মাষ্টারমশাই আমাদের দিকে পেছন ক'রে অন্য দিকের ছেলেদের জিজ্ঞেস পড়া করতে লাগলেন। তাদেরও কয়েকজন 'না' বলার পরে যার কাছে মাষ্টারমশায় পৌঁছলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থ, মুখে ছোট্ট ছাগলদাড়ী, ঢাকা জেলায় বাড়ী, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম। আমাদের সেকালের ব্রাহ্মরা মিথ্যাকথা কইতেন না। অতএব এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে, একটু বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমি জানি, স্যার।" ব'লে

বোধ হয় নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমাদের ষড়যন্ত্রের একজন নেতা তাঁর কলমকাটা ছুরির ফলাটা খুলে একটু নাটুকে ভাবে সেটা ছোরার মত ভাঁজতে লাগলেন। দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটী ছুরি দেখবামাত্র মুখব্যাদন ক'রে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। জগতে আবার সত্যের নিগ্রহ, মিথ্যার জয় হল। জলখাবার ঘরের উড়িয়া বেয়ারাটার একটাকা জরিমানা হল। আমরা সেটা গোপনে দিয়ে দিলাম।

এ সব গল্পগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই দেখান যে ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ। একটা বে-পরোয়া ভাব, একটা চাঞ্চল্য, তার নিজস্ব। অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনি যে সেকালে আমরা গোপালের মত সুবোধ বালক ছিলাম, আর আজকালকার ছোকরারা হয়েছে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত বর্ব্বর। এটা নিছক রূপকথা। গোপালের দল আজও বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবে তাদের হাতে বঙ্গমাতার দুঃখ কতটা ঘুচবে তাতে আমার ঘোর সন্দেহ। মা পথ চেয়ে রয়েছেন লর্ড ক্লাইবের মত সোনার চাঁদদের জন্য।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকি তখন আমাদের বড় সাহেব ছিলেন খ্যাতনামা মিষ্টার টনী। তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। আমার নিজের তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয় নেই। তবে বড় সাহেব ব'লে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তিনি আর পাঁচজন বড় সাহেবের মতই দুরধিগম্য ছিলেন। মোটের উপর কলেজটা বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব, বড় বাবু, মেজ বাবু, ছোট বাবু অধিষ্ঠিত একটা প্রকাণ্ড সরকারী আফিসের মত ছিল। এঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক কিছুই ছিলনা। টনী মহাশয়কে বার দুই দেখেছিলাম ব'লে মনে আছে। একবার যখন তিনি আমাদের কেলাস শুদ্ধ বিনা দোষে জরিমানা করতে আসেন, আর একবার যখন সেই জরিমানা প্রত্যাহার করাবার জন্য তাঁর খাস কামরায় যেতে হয়েছিল। এই সাহেবের শেষ বয়সের কীর্ত্তি যে তিনি বিলেতে প্রকাশ্য সভায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে মিথ্যাবাদী—monumental liars—বলেছিলেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ঢাকার ছেলেদের কাছে ঢাকা কলেজে শিক্ষক ছাত্রের একসঙ্গে খেলাধূলোর গল্প শুনে আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হত। কারণ আমাদের খেলার ক্লাবে সাহেব বা বাঙ্গালী অধ্যাপক একদিনও কেউ খেলতে আসেন নেই। কলেজের বাঙ্গালী মাষ্টাররা সর্ব্বরকমে ইংরেজদের নকল করতেন। আমাদের সঙ্গে যদি কখনও বারান্দায় লাইব্রেরীতে কথা কইতে হত তা ইংরেজীতেই কইতেন। ধূতি প'রে কোন অধ্যাপকই কলেজে আসতেন না—পণ্ডিত মশায়রাও নয়।

এই সূত্রে বেশভূষার কথা একটু বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধুতির তখন বড় দুর্দ্দিন। সাহেবদের অবজ্ঞা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ত ছিলই। তাছাড়া সহরের নানাস্থানে ধুতি প'রে প্রবেশ নিষেধ ছিল। দুটো একটা জায়গার নাম করি। ইডেন গার্ডেনের গঙ্গার দিকটায় অনেকখানা জায়গা প্যান্টুলুন-ওয়ালাদের জন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকত। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ো খেলতে গেলেও ধুতি-পরিহিত লোকের অনেক বাধা বিপত্তি ছিল। আপিস সভা সমিতির ত কথাই নেই। এই সবে আমাদের নিজেদের মনেও ধারণা জন্মে গেছল যে কোনও সভ্যভব্য স্থানে যেতে হলে একটা ইজার চড়ানই চাই। বিদ্যাসাগর মশায় অবশ্য কখনও ইজার পরেন নেই। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, যিনি সর্ব্বত্র ধুতি প'রে ঘুরতেন, তিনিও টাউন হলের সভায় যেতে হলে একটা চাপকান চোগা প'রে নিতেন। কলেজের ছেলেদের বেশভূষার কথা একটু বলি। নানারকমের পিরান, পাঞ্জাবী ও মের্জ্জাই তখনও হয় নেই। আমরা গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা ধুতির সঙ্গে হয় কামিজ পরতাম, নয় খাটো গলাবন্ধ কোর্ত্তা। তবে গায়ে একটা চাদর সর্ব্বদাই থাকত। পায়ে অধিকাংশ ছেলেই ফিতে বাঁধা কালো জুতো পরত। নাগরা হিন্দুস্থানীদের একচেটে ছিল। আর মাদ্রাজী চটি মাদ্রাজীদের। বড়লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায় পরতেন ঠনঠনের চটি, মহেন্দ্রবাবু পরতেন তালতলা। আমাদের চটি প'রে নগর পরিভ্রমণ রেওয়াজ ছিল না। এই ত হল সাধারণ পোষাক। তবে ধনীলোকের ছেলেদের কি সাহেববাড়ীর ছেলেদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তখন জাতিভেদ প্রবল, আজই সব একাকার হয়ে গেছে।

কলেজে উঠে প্রথম বছরে বাবার হুকুমে জিনের ইজার ও গলাবন্ধ কোর্ত্তা প'রে যেতে হত। অনেকেরই এই সাজ ছিল। তাই বিশেষ খারাপ লাগত না। কিন্তু একদিন এক বিভ্রাট হল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেছি ঐ বেশে। গাড়ীর অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক সাহেব আমায় টিকিটবাবু মনে ক'রে ট্রেণ সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সাহেবকে ত কোন রকমে ভাগালাম, কিন্তু মনে বড় দুঃখ হল। দূর হোক্‌গে, আর কখন প্যান্টুলুন পরবনা। তার পরদিন থেকে ধুতি প'রে কলেজে যেতে লাগলাম। মা এতে খুশী হলেন বলেই মনে হল। বাবার অনুমতি তিনিই আনিয়ে দিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন বি এ পাশ করলাম তখন দুতিন জোড়া কোট প্যান্টুলুন সংগ্রহ করতে হল। বড় হয়েছি, পাঁচ রকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হবে ত! সে কোট-প্যান্টুলুন সাজও অপরূপ। মাথায় গোল টুপী গায়ে গলাবন্ধ পার্শীকলার খাটো কোর্ত্তা ও ফতুই। ভেতরে বিলেতী কামিজ, তার ছাতি

তক্তার মত শক্ত। ইজারটা পূরোপূরি ইংরেজী ফেশানের। আমার কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ! এত সাধের সভা কাপড় পরেও এমন বিপদে পড়লাম যে, বিলেত রওয়ানা হওয়া পর্য্যন্ত বাকী কটা দিন ধুতি প'রেই কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা বলি। মিসেস বেসাণ্টের তখন খুব নাম ডাক। তিনি কলিকাতায় এলেন বক্তৃতা করতে। টাউন হলে প্রকাণ্ড সভা জমল। আমি আমার 'মিটিংকা কাপড়া' প'রে গিয়ে একেবারে সামনের সারে জাঁকিয়ে বসলাম। বক্তৃতা চলল। বক্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। টাউন হল্ ভরা জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। এমন সময়, হঠাৎ মনে হল বক্তা আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে খুব জোরে বলছেন, And you there in your English costume, let me tell you, that behind your starched shirt front there beats a Hindu heart!' "আর তুমি বিলেতী সাজে সজ্জিত বাবু, তোমাকে আমি বলি যে তোমার ঐ বর্ম্মের মত কঠিন কামিজের বুকের ভেতর যে হৃদয় লুকানো আছে সেটা হিন্দুর হৃদয়।"

আশে পাশে সকলের নজর আমার উপর পড়ল। আমার Hindu heart (হিন্দু-হৃদয়) এমন দুড় দুড় ক'রে উঠল যে আমি চুপি চুপি হল্ থেকে বেরিয়ে বাড়ী পালালাম।

আবার কলেজের কথা বলি। আমাদের রসায়নের থিয়েটার ছিল একটা আলাদা একতলা বাড়ীতে। ঘণ্টা পড়লেই, সেইদিকে শ'খানেক ছেলে ঠেলাঠেলি ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, আমাদের একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে একদিন এই ঘোড়দৌড়ে আমি ফার্ষ্ট হয়ে কি গোল বাধিয়েছিলাম শুনুন। থিয়েটারে উঠতে হত পেছনে সরু এক কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে। আমি সেই সিঁড়ি বেয়ে দুড় দুড় ক'রে যেই উপরে উঠেছি, দেখি যে তখনও সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস চলছে। ডাক্তার রায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেলাস নিচ্চেন। আমায় দেখেই সেকেণ্ড ইয়ারের একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে খুব থিয়েটারী ঢঙ্গে হাত নেড়ে ব'লে উঠলেন, "ভগ্নদূত! কহ শুনি লঙ্কার সমাচার।" চারিদিকে হাসির রোল উঠল। আমি হুড়মুড় ক'রে আমার পিছনের ছেলের ঘাড়ে পড়লাম। এই ভদ্রলোক পরে একজন পেশাদার অভিনেতা হয়ে খুব নাম কিনেছিলেন। অনেক বছর বাদে একবার 'চোখের বালি' নাটক দেখতে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ 'বিহারী'র ভূমিকায় দেখে এই পুরানো গল্প মনে প'ড়ে গিয়েছিল। ফলে প্রায় দশ মিনিট হাসি থামাতে পারি নেই। সঙ্গীদের অনেক ক'রে বোঝাতে হয়েছিল যে রবিবাবুর 'বিহারী' চরিত্রে হাস্যাস্পদ কিছু নেই।

ডাক্তার রায়ের কথা বলতে বলতে মনে হল যে propagandist zeal (প্রচার কার্য্যে উৎসাহ), সেকালেও তাঁর বড় কম ছিলনা। তবে তখনও

তিনি দেশশুদ্ধ লোককে বৈশ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা আরম্ভ করেন নেই। উৎসাহ বেশী ছিল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে। রসায়নের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কার-রস আবিষ্কার করতেন, আর আমাদের সেই রস বিতরণ করতেন। ছুয়েকটা নমুনা দেব। অঙ্গার (carbon) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় আমাদের শেখালেন "অঙ্গার-পরমাণুর চারহাত, তোমাদের বিষ্ণুর মত।" সাবান তৈরী করা দেখিয়ে আমাদের গ্যালারীর দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, "এরই নাম সাবান, সেই মহামূল্য জিনিষ যা মেথরকে ব্রাহ্মণ করতে পারে।" আশ্চর্য্য রূপক! তবে হিন্দু ছাত্রের কেলাসে ব্রাহ্ম অধ্যাপকের এসব কথা না বলাই বোধ হয় সুশোভন হত। আমাদের কেউ কেউ একথা তাঁর কাছে নিবেদনও করেছিলেন। আচার্য্যদেব পরম পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে এ গল্প করা হয়ত অমার্জ্জনীয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে হিন্দু আজও যেমন তখনও তেমন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী।" নইলে, আচার্য্যদেব সেই অল্পবয়সেও দানশীল ও উন্নতমনা ছিলেন। কলেজের বাহিরে, ছাত্র সমাজের উপর তাঁর অসীম দয়া ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথা ছাত্রদের তৃণজ্ঞান করা। তিনিও কলেজের চৌহদ্দির ভেতর তা ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নেই।

কিছুদিনের জন্য বুথ সাহেব ব'লে আমাদের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এসেছিলেন। তিনি বিশালকায় জোয়ান ছিলেন ও খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। তবে আমাদের সঙ্গে কখন খেলেনও নেই, আমাদের কোনদিন খেলতে শেখানও নেই। তাঁর একটা গল্প মনে হচ্ছে, গল্পটার সঙ্গে টনী সাহেবের বাক্য—"monumental liars"-এর কিছু যোগ আছে। একদিন আমাদের কোন সহপাঠী গ্রন্থাগারে এক আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বই দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বন্ধু তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু সরলেন না। সাহেব তাঁর পেছনে পা ফাঁক ক'রে কলোসাসের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রহিলেন, তারপর রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাফ্‌টারী, ডাফ্‌টারী, নিকাল দেও।" দপ্তরী আমাদের নিয়মিত বখশিশ-ভুক্ প্রাণী, সে শ্যাম রাখি কুল রাখি ভাবে বন্ধুকে স'রে যেতে মিনতি করলে। বন্ধু স'রে গেলেন কিন্তু বাহিরে এসে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর সম্মানে বিষম ঘা লেগেছে। তখন বড় সাহেব ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব। তিনি বুথ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাইলেন। সাহেব বললেন তিনি বাবুকে কিছুই বলেন নাই, নিকলের (Nicoll) একখানা বই দপ্তরীর কাছে চেয়েছিলেন মাত্র। এ কৈফিয়তের টীকা অনাবশ্যক।

কিছুদিন টনী সাহেবের কথাগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত।

একদিন রো সাহেবের কেলাসে কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে দুমদাম ক'রে বই বন্ধ করাতে সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে করেছে?' কেউ যখন কবুল করলে না, তখন তিনি একগাল হেসে বললেন "Oh ! you monumental liars" ! এমন মধুর হেসে কথাটা বললেন যে কেউ রাগ করলে না। আর ভেবে দেখলে, একথা বলতে মেকলে থেকে কার্জ্জন পর্য্যন্ত কোন সাহেবই বা কসুর করেছেন? এই রো সাহেব ব্যবহারে বড় অমায়িক ছিলেন। মাঝে মাঝে কেলাসে বাংলা কথারও বুকনি দিতেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হলে সাক্ষীগোপাল, বিধুমুখী ইত্যাদি নানা নাম ধরে ডাকতেন। কেলাসে যে সব হাসি তামাসা করতেন তা কখনও কখনও আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়ত। এক আধটা উদাহরণ না দিলে হয়ত কেউ বিশ্বাস করবেন না। একদিন কেলাসে জিজ্ঞেস করলেন যে গ্রীক পুরাণের Graces ক'জন? উত্তর হল, চারজন। সাহেব হেসে বললেন, "চতুর্থটিকে হাজির করতে পার? তাঁরা বেশ সাজ করেন।" ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই গ্রীক্ দেবীরা তিনজন এবং তাঁদের মূর্ত্তি দিগম্বরী। আর একদিন নানা রকম Knight-দের কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ মেয়েদের Garter সম্বন্ধে যে রসাল টিপ্পনী কাটলেন তা আমার পাঠিকাদের ভয়ে এখানে ব্যক্ত করতে পারলাম না। একদিন এই সাহেব হাসি ঠাট্টার মাত্রা একটু বেশী চড়িয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু অন্য রকমে। ফলে মুসলমানরা (আমরাও পিছনে ছিলাম) তাঁকে মাপ চাইয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু তিনি মাপ চেয়েছিলেন যে ভাষায় সে অতি অপরূপ। "আমার কোন পোষা জন্তুকে আমি যা কিছু নাম দিতে পারি। তোমরা মূর্খ, ইংরেজী বোঝ না।"

রো সাহেবের নাম করলেই ওয়েব্ সাহেবের নাম মনে পড়ে। এই দুই সাহিত্যরথী, শুধু কলেজ কেন, সমগ্র বাঙ্গলাদেশকে ইংরেজী শেখাবার ভার মাথায় ক'রে নিয়েছিলেন। গালাগালও খেয়েছিলেন অনেক। তাঁদের সে বই আজ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আশ্রয় নিয়েছে, অন্যত্র আর দেখা যায়না। এ ছাড়া ওয়েব্ সাহেব নেটিব লোকদিগকে ইংরেজী আদব কায়দা শেখাবার মতলবে এক বই লিখেছিলেন। এক সময় সরকারের সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর টেবিলের উপর সে বই দেখা যেত। ওয়েব্ সাহেবের কাছে কখনও পড়ি নেই কিন্তু তাঁর আদব কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান কি রকম ছিল তার নমুনা পাঠককে একটা দেব। আমি বছর দুই Dr. Atkinson ব'লে এক সাহেবের কাছে পড়তে যেতাম। সাহেব এক বড় ইংরেজী কলেজের কর্ত্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যেন এটা

ভারত নয়, যেন আমি বিলেতের ছাত্র। একদিন পড়ার সময় তিনি বললেন, "আজ আমাদের চা খাওয়া এখানে নয়, ওয়েব্ সাহেবের বাড়ীতে। তাঁকে চেন ত?" আমি জানালাম, "চিনি, যে রকম প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক ছাত্রের পরিচয় হয়ে থাকে।" যথাসময় ওয়েব্ সাহেবের ওখানে চা খেতে গেলাম। সাহেব আমাকে সমস্ত সময়টা Baboo, Baboo, ক'রে কথা কইতে লাগলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার ভাত ও নেটিব তরকারীর অভাবে চা খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না ত? আমার তখন সব কথা বোঝবার হয়ত ক্ষমতা ছিলনা, কিন্তু Dr Atkinson নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কেননা তিনি বেরিয়ে যাবার সময় আমায় বললেন, "I am sorry I brought you here lad" (তোমাকে এখানে না আনলেই ভাল হত)। নিজের কলেজের নিন্দা আর কত করব? এম এ কেলাসে অবস্থার অনেক উন্নতি হল। হতে পারে আমরা বড় হয়েছি ব'লে, হতে পারে হাওয়া বদলাচ্ছিল ব'লে। নিন্দা ত অনেক করলাম, কিন্তু দুজন অধ্যাপক যাঁরা অন্ততঃ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাঁদেরও নাম করব, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক পেড্লার। যতদূর মনে আছে এই দুজনকে সকলেই ভালবাসত। প্রেসিডেন্সী কলেজের দমবন্ধ করা হাওয়ায় না থাকতে হলে এঁদের গুণ আরও ফুটে বেরোত।

আমাদের কলেজের সভাসমিতি ও খেলার ক্লাবের কথা পরে বলব। আমাদের সময়েই এখনকার Institute, Higher Training Society নাম দিয়ে আরম্ভ হল। তার প্রথম পাণ্ডা ছিলেন আমাদের অধ্যাপক উইলসন। আমার নিজের ঘটনাচক্রে higher training (উচ্চশিক্ষা) হলনা। সোসাইটীর ঘরে তাস খেলা সঙ্গত কিনা এই নিয়ে সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমাদের সোসাইটী ত্যাগ ক'রে অন্যত্র তাসের আড্ডা জমাতে হল। এই তাসের আড্ডার মেম্বার কেউ কেউ এখন ভারতের ভাগ্যবিধাতার মধ্যে গণ্য। তাঁদের নাম করলে রসভঙ্গ হবে।

এই সময়েই কলেজের Speech Day (বাৎসরিক উৎসব) সুরু হল। সেই উপলক্ষে Julius Cœsar-এর হত্যাকাণ্ড ও Merchant of Venice-এর আদালতের দৃশ্য অভিনয় হল। আমাদের উইলসন সাহেব ও Oxford Mission-এর ডগলাস সাহেব আমাদের শিক্ষক ছিলেন। অভিনয় ভালই হল, অন্ততঃ লাটসাহেব এলিয়ট তাই ব'লে গেলেন। একটা মজার কথা কেবল মনে হয়, যে সেদিন Cœsar-কে যাঁরা খুন করলেন তাঁরা অনেকেই আজ নিজেরা উচ্চ মসনদে অধিষ্ঠিত।

আর যিনি Portia হয়েছিলেন তিনি আদালতকে বহুদূরে ঠেলে রেখে আজ সরকারের আবকারী মালের হেপাজৎ করছেন। একমাত্র Antony তাঁর থিয়েটারের পার্ট কায়েম রেখেছেন। প্রিয়দর্শন Brutus-কে খুনে আসামী সেজে যা দেখিয়েছিল জজ্ সেজে তার চেয়ে অনেক ভাল দেখায়।

এলিয়ট সাহেবের নাম করতে মনে পড়ে গেল যে তিনি এক সময় বাংলাদেশে ধূম ধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রদেশ থেকে জুরীব বিচার তুলে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। কিন্তু এমন হৈ চৈ উঠল, যে কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না। এই সিভিলিয়ান লাট সাহেব শুধু যে দেশী লোকদের উত্যক্ত করেছিলেন তা নয়, ইংরেজ বড় হাকীমদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন। এক গল্প আছে যে একবার তিনি ষ্টীমারে সফরে বেরিয়ে, ষ্টীমার খুব দূরে নোঙ্গর ক'রে ডিঙ্গী বেয়ে পাবনার সদরে উপস্থিত হলেন, আর সোজা স্থানীয় হাকীমদের কাছারীতে চ'লে গেলেন। বড় হাকীম তখনও আসেন নেই, যদিও ১১টা বেজে গেছে। লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনে খুব ধমকে দিলেন, মাষ্টার যেমন ইস্কুলের ছেলেকে ধমকায়। কখন কাকে অপদস্থ হতে হবে এই ভয়ে কিছুদিন হাকীমবর্গ সন্ত্রস্ত থাকতেন।

একবার এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে এসেছিলেন। দেশী রাজ্যে লাটেরা যান প্রধানতঃ শিকার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারের জন্য। কিন্তু এই সময় মহারাজের নিজের ও রাজ্যের অনেক খরচ বেড়ে গিয়েছিল ব'লে কিঞ্চিৎ ধমকে দেওয়াও বোধ হয় এলিয়ট সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহেবের বাঁধা বুলি ছিল, "আমি জাঁকজমক আড়ম্বর দেখতে পারি না, আমি চাই কাজ।" এঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে বাবা সবই শুনেছিলেন আগে, প্রধানতঃ সেক্রেটারী মহল থেকে। তাই তিনি মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন যে দেখাবেন, কুচবেহারেও তাঁরা efficiency-র উপাসক—কাজের লোক। স্থির হল মহারাজ ষ্টেট-কর্ম্মচারীদের নিয়ে রাজবাড়ীতেই লাট সাহেবকে স্বাগত করবেন। আর বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন ১২ কোশ দূরে যেখানে সীমান্তে রেল থামে। যথা সময় ট্রেণ এল। ষ্টেশনে বাবা একজন মাত্র চাপরাসী নিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং খাকী চাপকান প'রে আর এক সাদা ছাতা বগলে, আর চাপরাসীর উর্দ্দী এক আধময়লা পটুর কোট ও ধুতির উপর পট্টী। লাট সাহেব অযথা জাঁকজমকের জন্য না ধমকাতে পেয়ে বোধ হয় একটু নিরাশ হলেন। তখন প্রায় দশটা। বাহিরে দুই হাতী তৈয়ার ছিল। বাবা সাহেবকে অভিবাদনাদি ক'রে বললেন

যে তিনি যদি শ্রান্ত না হয়ে গিয়ে থাকেন ত ধরলা নদীর চর দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে যেখানে তুই রাজ্যের সীমানা নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। সাহেব তার অদম্য উৎসাহ নিয়ে সব চরগুলো দেখে বারোটার সময় ওপারে ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন হল। আড়ম্বর কিছু ছিল না। একজন মাত্র খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। তারপর বাবা একটু siesta মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কথা তোলাতে সাহেব বললেন, "না, ও সব আলস্য আমার নেই। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।" বাবা বললেন, "যদি আপত্তি না থাকে ত পথে আপনাকে চওড়াহাট বন্দর দেখিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে রেলী, আপকার, এদের বড় বড় পাটের আড়ৎ আছে।" লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

চওড়াহাট ইত্যাদি দেখে যখন রাজধানীর প্রান্তে পৌঁছলেন তখন চারটে বেজে গেছে। সেখানে তোরসা নদীর পারঘাটে জঙ্গী ও পুলিশ কর্ত্তারা সাহেব বাহাতুরকে সেলামী দিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন বালক রাজকুমার ও একজন A.D.C. (মহারাজের পার্শ্বচর)। আবার দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন যে হুজুর সোজা রাজবাড়ী যাবেন, না পথে সেপাইদের ও সওয়ারদের লাইন (Lines) দেখে যাবেন। সাহেবের কার্য্যপিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নেই। বললেন যে পথে যা দ্রষ্টব্য আছে দেখে যাবেন। কাজ শেষ ক'রে পাঁচটায় রাজবাড়ী পৌঁছলেন। নেমেই মহারাজকে বললেন, "আপনার রাজ্যের চমৎকার বন্দোবস্ত। সর্ব্বত্র নিয়মিত কাজকর্ম্মের হাওয়া।" মহারাজ জানতেন, একটু হাসলেন। যা তুতিন দিন এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে রইলেন সেই একইভাবে এঁরা তাঁকে ঘোরালেন। ধূমধামও নিতান্ত মামুলী রকমের বেশী হল না। সাহেব এত আনন্দে সময় কাটালেন যে খরচ পত্রের জন্য টীকা টিপ্পনী কিছু আর করলেন না। ফেরবার আগে সাহেবের একজন কর্ম্মচারী মহারাজকে ব'লে এল, "আপনার দেওয়ানের এলিয়টের চেয়েও বেশী এলিয়টী চাল।" সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে একাধিক সিভিলিয়ান মহারাজকে খুব তারিফ করেছিলেন এই ব'লে যে "তোমরা দেশী রাজ্যে জান কাকে কি রকমে জব্দ করতে হয়।" এলিয়ট সাহেব নিজে দার্জ্জিলিঙ্গে বাবাকে ডেকে বললেন যে নূতন বছরে তাঁকে রাজা খেতাব দেবেন। বাবা নিজের দারিদ্র্য উল্লেখ ক'রে কোন রকমে পার পেলেন। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের কুমার বাহাতুর হওয়া এই রকম ক'রে ফস্‌কাল।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মুক্তের অবস্থা

গত বারের 'পরিচয়ে' মোক্ষের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯
'যাহার 'নাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আইসে।'

পুনশ্চ, মোক্ষ 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন'—কেন না, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (*Voice of the Silence*). অতএব মোক্ষ 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা। যিনি নির্ব্বাণী, তিনি 'is no-where and everywhere.'

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং
ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি।* —মজ্ঝিমনিকায়

যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সমুদ্রের মতই অগাধ, অনন্ত, অপ্রমেয়। সেইজন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক মোক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension. (Man, Visible and Invisible).

মোক্ষ = ভূমানন্দ

মোক্ষ সম্বন্ধে উহাই সার কথা—a level of peace and bliss, এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মনুষ্যধারণার বহু ঊর্দ্ধে। সেইজন্য মুক্তিকে পরা শান্তি এবং পরম আনন্দ বলা হয়।

ঐ আনন্দের দিক্ হইতে গীতা ইহাকে 'অত্যন্ত সুখ' বলিয়াছেন—ঐ সুখ 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'-জনিত।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—গীতা, ৬।২৮

অন্যত্র গীতা মুক্তের (ব্রহ্মযোগ-যুক্তের) সুখকে 'অক্ষয়' সুখ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে—গীতা, ৫।২১

উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমা' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (বৃহ, ২।১।১৯) (acme of bliss) বলা হইয়াছে।

---

*I am not anywhere whatsoever, to any one whatsoever, in anything whatsoever; neither is anything whatsoever mine, anywhere whatsoever, in anything whatsoever.—Majjhim Nikaya, II, 263.

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি—মুণ্ডক, ২।২।৭
যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং × × যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২০।১-২

অর্থাৎ মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দের অবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই ভূমানন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলের অধিপতি, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী—ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যলোকের চরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈ র্মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যানাং পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্ব্ব-লোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্ম্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের তাহা শত গুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্ম্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতি লোকের যে আনন্দ, আজানদেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতি লোকের আনন্দ তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র—

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার ঐ পরিমাণ আনন্দ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্ব্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষকোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মের যে আনন্দ সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ গুণ অর্থাৎ one hundred trillion times। অকামহত শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তের আনন্দ ঐরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য—তৈত্তি ২।৮

এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana, Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর-নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিম নিকায়) অর্থাৎ নির্ব্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—আনন্দং নন্দনাতীতম্। অন্যত্র বুদ্ধদেব পোট্ঠপাদকে বলিয়াছিলেন—

'Rather will all that I have mentioned happen, and then only joy, pleasure, quietude, earnest reflection, complete consciousness and *bliss* ensue.'——দীঘনিকায় IX।

এই আনন্দ যে পরম সুখ * (highest bliss), ধম্মপদে তাহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্গো, ৮
পস্সে চ বিপুলং সুখং—পকিণ্ণক বগ্গো, ১

মুক্তি = পরা শান্তি

মুক্তি শুধু পরম আনন্দ নহে—মুক্তি পরা শান্তি—

'that peace that passes understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled' (Rhys Davids, p. 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ৫।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীর ব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান—যাহার ফলে অচিরে পরা শান্তি।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা, ৪।৩৯

---

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাইস ডেভিড্স্ (Professor Rhys Davids) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

One might fill pages with the awestruck and ecstatic praise lavished in the writings of the early Buddhists upon the glorious *bliss* and peace of the mental condition it (Nirvana) involved. They had endless love-names for it.—Lectures on Buddhism, pp. 150-151.

গীতায় ভগবান্ ইহাকে 'শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং' বলিয়াছেন (৬।১৫)। হংস-উপনিষদের বর্ণনায় যিনি মুক্ত, তিনি 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illuminated), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণের পরা শান্তি লক্ষ্য করিয়া, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—

'Blissful tranquility' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace' 'eternal peace' 'eternal rest, eternal stillness, the great peace.'—(The Doctrine of the Buddha, pp. 350 & 356).

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অশান্তির নিদান কি? কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা। নির্ব্বাণ দশায় যখন—যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২) সমস্ত তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয় (মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্ব্বাণীর অশান্তি আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অকাম-হত' বলিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম' এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে বিশেষিত করিলেন (বৃহ, ৪।৪।৬) এবং বলিলেন তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কেবল প্রশান্ত নহেন, তিনি কামের ও শোকের অতীত।

যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২।
অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ, হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

অন্যান্য উপনিষদেরও ঐ কথা—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং—মুণ্ডক, ৩।২।৯
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি—কঠ, ২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পরমাত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকের অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাসভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার মর্ম্ম এই যে, ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তন্‌হা-বিজয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সর্ব্বসঙ্‌খারসমথে সব্বুপধিপটিনিস্‌সগ্‌গো তন্‌হক্‌খায়ো বিরাগো নিব্বাণংতি—মজ্ঝিমনিকায়

অর্থাৎ 'This is the peaceful, this is the exalted: the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all *Upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Niroda, Nibbana.'

'In him who dwells in the insight into the transitoriness of all the fetters of existence, thirst (তন্‌হা) is annihilated; through the annihilation of thirst, উপাদান (grasping) is annihilated; through the annihilation of grasping, ভব (becoming) is annihilated; through the annihilation of becoming, জাতি (birth) is annihilated; through the annihilation of birth, old age, sickness, death, pain, lamentation, suffering, sorrow and despair are annihilated.'

অশান্তির আর একটি কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এক কথায় কর্ম্মবিপাক, যাহার ফলে সুখ দুঃখ, 'হ্লাদ পরিতাপ'।

তে হ্লাদ পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যাহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্তপুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত—

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪
তিনি পুণ্যপাপ-প্রহীন (ধম্মপদ, চিত্ত বগ্‌গো, ৭)

তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বা ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৮

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম'—এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।' কারণ তিনি

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই—

এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপং অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ × × আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্‌মা তরতি সর্ব্বং পাপ্‌মানং তরতি। নৈনং পাপ্‌মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্‌মানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইঁহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না। এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। × × যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি, আত্মক্রীড়' (মুণ্ডক ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে ? ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্য্যা কিরূপ ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—'*By living as chance may determine*' অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ (গীতা)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্ম দ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন কেন ?'

ইহাকেই বলে, সঞ্চিতের বিনাশ—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যদ্ ইহ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্ব্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—বৃহ, ৫।১৪।৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

---

* বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের ঐরূপই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পথামন্তীং ন শোচতি।
সংজাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ॥—উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad;
The monk, from longing all released
Him do I call a Brahmana.

ছান্দোগ্যের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—৫।২৪।৩

'যেমন ঈষিকা বৃক্ষের তুলা (fibre), অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞানীর সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয়।

ইহার সহিত ধম্মপদের নিম্নোক্তি তুলনীয়ঃ—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনিঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

—ধম্মপদ, পকিণ্ণক বগ্গো, ৫

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শুধু সঞ্চিতের বিনাশ হয় না—ক্রিয়মান কর্ম্মেরও 'অশ্লেষ' হয়।

তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩ *

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করে না।' ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্র মিবাম্ভসা' বলিয়াছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেইজন্য বলিলেন—

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—২

অর্থাৎ এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মান) কর্ম্মের আর সংশ্লেষ হয় না। বাদরায়ণ মুক্ত পুরুষের কর্ম্মসম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৩

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্ম (যাহা সাধারণতঃ বন্ধের কারণ) বন্ধের হেতু হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) একটি বিশেষণ দিলেন 'বিচিকিৎস'। বিচিকিৎসার অর্থ সংশয় (doubt)। ইহাও অশান্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, কারণ তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন, সত্যের তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—পাশ্চাত্যেরা

---

* ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water: just so, Brahmin, I am born within the world, but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.—অঙ্গুত্তর নিকায় II

ইহার পালি মূল এইঃ—সেয্যথাপি ব্রাহ্মণ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্ঠং উদকং অচ্চুগ্গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ! লোকে জাতো লোকে সংবট্ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন।

যাহাকে temperamental reaction to the vision of reality বলিতেছেন। অতএব—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—মুণ্ডক, ২।২।৬

ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (৩।১৪।৪)—'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয় না অর্থাৎ 'The illusion, when once it has been penetrated can no longer delude.'

তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া ছান্দোগ্য আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে—অপহতপাপ্মা এষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৮।৪।১-২

'যিনি পরমাত্মা, তিনি সেতু—এই সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু। ঐ সেতুকে দিবারাত্রি, জরা মৃত্যু, শোক, সুকৃত দুষ্কৃত, উত্তরণ করিতে পারে না।

অতএব যিনি এই সেতু উত্তীর্ণ হন, তিনি যেন অন্ধ ছিলেন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন অক্ষত হন, রোগী ছিলেন অরোগী হন।'

ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়ঃ—

এবমেব খো মহারাজ! ভিক্‌খু যথা ইণং যথা রোগং যথা বন্ধনাগারং যথা দাসব্যং যথা কন্তরদ্ধানমগ্গং ইমে পঞ্চ নীবারণে অপ্পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি, সেয্যথাপি মহারাজ! যথা আনণ্যং যথা আরোগ্যং যথা বন্ধনা মোক্‌খং যথা ভুজিনং যথা খেমন্ত ভূমিং এবমেব খো মহারাজ! ইমে পঞ্চ নীবারণে পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি—দীঘনিকায়

'Even thus, O king, as a debt, as an illness, as imprisonment, as thraldom, as a desert journey, does the monk regard these Five Impediments, while as yet they are not banished from within him. But, like a cancelled debt, like recovery from illness, like release from prison, like being a freed man, like safe soil—even so does the monk regard the banishing of these Five Impediments from within him.'—Digha Nikaya, II.

যিনি নির্ব্বাণের তোরণে উপনীত হইয়াছেন, বুদ্ধদেব অন্যত্র তাঁহার অবস্থা (attitude) এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেনঃ—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্‌খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্‌খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতাতি পজানাতি।

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি ; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি . সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি।—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত'। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

গীতার সেই প্রাচীন কথা—উদাসীনবদ্ আসীনং × × অসক্তং তেষু কর্ম্মসু।

বুদ্ধদেবও ঐ মর্ম্মে আনন্দকে বলিয়াছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্উভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখকো বিহরেয্যং সতো সংপজনো তি উপেখকো তত্থ বিহরতি সতো সংপজানো এবং খো আনন্দ অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিয়ো—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (Repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া উপেক্ষক (উদাসীন ভাবে=with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি 'অরিয়' (আর্য্য=saint) তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই যে 'Equal Mind,' গীতা ইহাকেই 'সমত্ব' বলিয়াছেন—সমত্বংযোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

সেই অবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদ্ আসীনং গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহা 'অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণম্,' নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত বিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেনযো কোপিন বিজ্জতি॥

সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বথ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপরং ॥
—চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ আমার নিকট তুল্য মূল্য যশঃ ও অযশঃ। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)।

সেই গীতার কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মেস্থিত--তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত 'ব্রাহ্মণে'র অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত'।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৪।৪।২১

কারণ, এইরূপ 'প্রাজ্ঞ' ব্রাহ্মণই—শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

তস্মাদ্ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বম্ আত্মানং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।২৩

সন্ন্যাস-উপনিষৎ-সমূহে এ অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-উপনিষদ্ বলেন 'তাঁহারই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত।'

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

এইরূপ ব্রাহ্মণের লক্ষ্য—পরম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।
গুহাং প্রবেষ্টু মিচ্ছামি পরং পদম্ অনাময়ম্।

এইরূপ ব্রাহ্মণ পরম-হংস-পদারূঢ়।

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহ ও জরামৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্রের ছয়টি উর্ম্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি নিন্দাগর্ব্ব হিংসাদম্ভদর্প ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জ্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্ব্বক) নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ূর্মিবর্জ্জং নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করেন ?' ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প হিংসা মমত্ব অহংকার অসত্য সর্ব্বথা বর্জ্জন কর।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ—আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন ?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে ন স্পৃহা ত্যাগো রাগে, সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন সর্ব্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষরাগ-বর্জ্জিত।'

তিনি নিন্দা স্তুতির অতীত—

স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস ৪

তাঁহার সম্পর্কে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য্য মানাপমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জ্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী 'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি বর্জ্জন করিয়া তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।"

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয় ?

সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি—পরমহংস উপনিষদ্।

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন—কৃতকৃত্য হন।'

এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক পরমধামে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার জন্য 'বৈতরণী'র ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, (ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী ৬।২৮), তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ ॥—অমৃতনাদ ২

যিনি এই অবস্থায় উপনীত হন, তিনি বুদ্ধদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্ম চরিয়ং; কতং করণীয়ং নাপরং ইথত্তা যাতি—মজ্ঝিমনিকায়

'পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন অবসিত হইয়াছে, করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই।'

যোগসূত্রে এইরূপ পুরুষকে 'চরিতাধিকার' বলা হইয়াছে—তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (২।২৭ সূত্র)—'তাঁহার সপ্তবিধ প্রজ্ঞা উদিত হয়'। কি কি ?

(১) পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়ম্ অস্তি—'হেয়' পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর কিছু পরিজ্ঞেয় নাই। (২) ক্ষীণাঃ হেয়হেতবঃ, ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যম্ অস্তি—'হেয়-হেতু' ক্ষয়িত হইয়াছে, আর কিছু ক্ষয় করিবার নাই। (৩) সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্ নিরোধ-সমাধি দ্বারা 'হান' অধিগত হইয়াছে। (৪) ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—বিবেকখ্যাতি-(প্রকৃতি পুরুষের ভেদবিজ্ঞান-) রূপ 'হানোপায়' উপলব্ধ হইয়াছে।

(প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্য্য-বিমুক্তি—ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্য-বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—আর ত্রিবিধ চিত্তবিমুক্তি লইয়া সপ্তবিধ প্রজ্ঞা)

(৫) চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধির করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। (৬) গুণা গিরিশিখরতটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেন অস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং প্রবিলীনানাং পুনরস্তি উৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ইতি—গিরিশৃঙ্গ-চ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রয় গুণত্রয় স্বকারণ প্রকৃতিতে অস্তোন্মুখ হইয়াছে—প্রয়োজনের অভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না। (৭) এতস্যাম্ অবস্থায়াং গুণ-সম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—আর পুরুষ ? ঐ অবস্থায় তিনি গুণসম্বন্ধের অতীত (অসঙ্গ) হইয়া স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃ), অমল, কেবলী হইয়াছেন।—ব্যাসভাষ্য।

অধ্যাপক ডয়সান এইরূপ 'চরিতাধিকার' পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া, উপনিষদের ভাষায় বলিয়াছেন—

'He who has recognised 'Aham Brahma asmi' 'I am Brahman,' he already is, not will be delivered; he sees through the

illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম)।

মোক্ষশব্দের নিরুক্তি

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, মোক্ষশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি। মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি (Release, Liberation, Emancipation)। কিসের বন্ধন (Bondage)? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন। ইহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধ ভাব—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)—মোহের অধীন হইয়া ঈশ্বর ভাবের অভাব হয়। অতএব ইহারা Fetters, knots, bands, bonds that bind the soul to the objects of sense; এবং ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা-বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের উন্মূলন হইলেই জীবের মুক্তি (Deliverance)।

> তখন—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২।২।৮
> তখন গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯
> তখন স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২
> তখন জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১

অতএব ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ (Summum Bonum)। সেইজন্য মুক্তির নাম নিঃশ্রেয়স। ধম্মপদের ভাষায়,—নিব্বাণং যোগক্ষেমং অনুত্তরং (অপ্পমাদবগ্গো, ৭)

উপনিষদ্ প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ
> তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ—কঠ, ২।১

প্রেয়ঃ প্রবৃত্তির পথ (Primrose Path of dalliance)—শ্রেয়ঃ নিবৃত্তির পথ। আর মোক্ষ নিঃশ্রেয়স—নিবৃত্তি পথের goal (গম্যস্থান)। সেই জন্য বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'the highest, holy freedom' বলিয়াছেন; কারণ—যিনি নির্ব্বাণী, তিনি

already in this present life, has actually realised complete deliverance from everything that is অনাত্মা —has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্হা)—he has burst all the fetters, 'whether refined or gross.'—(Grimm, p. 333).

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলিয়াছেন—মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তিঃ ন পরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৬।২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি। কি অন্তরায়? কামনা বাসনা, শোকমোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরা মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১)

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্ব্বাণ বলিলেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন।

সেয্যথাপি ভিক্খবে! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝাযেয্য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্চেয্য ন বট্টিং চ উপসংহরেয্য। এবং হি সো ভিক্খবে! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্স পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে! সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিনো বিহরতো তন্হা নিরুজ্ঝতি, তন্হানিরোধা উপাদাননিরোধোপি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি *—সংযুক্ত-নিকায়, ২

'হে ভিক্ষুগণ! যেমন তৈল ও বর্ত্তি সংযোগে প্রজ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ আর তৈল ও বর্ত্তি যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের' (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred, the annihilation of delusion.†

অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে।

Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ— of desire, hatred and illusion—What is Buddhism, p. 60?

This epithet is Nirvana, 'the going out' that is to say the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dullness.'—Rhys Davids, p. 151.

---

* সেয্যথাপি ভিক্খু! তেলং চ পটিচ্চ, বট্টিং চ পটিচ্চ, তেলপ্পদীপো ঝায়তি তস্স এব তেলস্স চ বট্টিয়া পরিযাদানা অঞ্ঞস্স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বায়তি—মজ্ঝিম নিকায়—১৪০ সুত্ত

† 'Nibbana, Nibbana, so they say friend Sariputta! Now what means Nibbana?' 'That which is the vanishing of desire, the vanishing of hate, the vanishing of delusion—that, friend, is called Nibbana.'

—সংযুক্ত নিকায়, IV

সব্বরাগ দোস মোহ নিহিত নিংনীতকসাবো—He (the Delivered One) is entirely free from greed, hate and delusion.—মধ্যম নিকায়, III

এই যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তন্‌হারই প্রকট মূর্ত্তি, সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার 'তন্‌হা-নির্ব্বাণকে'ই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।*

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্‌হা) to remain in contact with the world.'—Grimm, p. 339.

অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্ব্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো, তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো, তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তর-নিকায় I।

'এক দিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। এক দিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

*Desire, hate and delusion represent the three modes of manifestation of thirst. Accordingly in the Canon, we find frequent direct mention of Tanha-Nibbana, thirst-extinction.—Grimm, pp. 338-9.

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বর্ত্তমান জগৎ *

শরৎকালের সকাল, প্রবাসীর মনে সহজেই দেশের ভোরের শিশির-ভেজা ঘাসের কথা মনে পড়ে, নদীর তীরে কাশবনের উপর রৌদ্রছায়ার খেলা, আঙিনায় খঞ্জন পাখীর চপল নাচ, আসন্ন পূজোর ছবি নদী গিরি প্রান্তর অতিক্রম করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম দেশের আকাশে মেঘেরা বারিবর্ষণ নিঃশেষ করে বহুদিন ফিরে গিয়েচে, সেখানে নীল আকাশে শাদা মেঘের টুকরো উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে যায় না। এমনি দিনে সুরেশ তানপুরো নিয়ে রাগালাপে ব্যস্ত। দরজার ফাঁকে গুটিকয়েক করবী আর শিউলি গাছ দেখা যায়, তার দিকে চেয়ে সুরেশের মনে হল যে ললিতরাগের গান্ধার থেকে ধৈবতের করুণ মিড়ের সঙ্গে যেন এই স্নিগ্ধ শারদ প্রাতের নিগূঢ় যোগ আছে। যদিচ রাগবিশেষে কোন নির্দ্দিষ্ট রসের স্থাপনায় তার কোন আস্থা ছিল না, তবুও এ অনুভূতি তার তীব্র হয়ে উঠেছিল যে সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় মনের যে উচ্ছ্বাসকে মানুষ মূর্ত্ত করতে চায়, সঙ্গীতে মনের দুই কূল ছাপিয়ে তা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ললিতরাগের ধৈবত স্বরসঙ্গতির কারণে কোমল ও তীব্র ধৈবতের মধ্যে সঞ্চরণ করে, কোথাও তার স্থির থাকবার যো নেই। "প্যারি তেরে নৈন রগে মগে নিসপিয়া সৌংগ জাগে"—এই বিলম্বিত খেয়ালের আলাপে যখন মগ্ন হয়ে পড়েচে, তখন প্রবেশ করল তার বন্ধু, চোখে চশমা, মুখে সিগারেট, হাতে একখানা ইংরাজী বই। রমেশ ঢুকেই বল্ল—"সেই সৈঁয়া সৈঁয়া সুরু করেচ। ওস্তাদি গান এখন রাখ। মান্ধাতার আমলের রাগরাগিণী রেখে নবযুগের বাণী শোনা অভ্যাস কর।"

সুরেশ—নবযুগের বাণীটা কি ?

রমেশ—সেটা এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু বোঝা যায় তোমাদের রাগগুলি অত্যন্ত পুরোনো এবং অতিশয় পরিচিত হয়ে পড়েচে।

সুরেশ—এই ত সকালে গৌরী মিশির আর ছম্মন সাহেবের সঙ্গে মল্লার ও সারঙ্গের ঘর নিয়ে আলোচনা হল, কই তারা ত কিছু বল্ল না।

রমেশ—তোমার কথা শুনে রাগ হয়। তারা নিরক্ষর, এসব খবর কোথা থেকে পাবে ?

---

* হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এ প্রবন্ধের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চ সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী এই কয়েকটি ধরে নিতে হবে।

সুরেশ—তবে তুমি কোথায় এ সব শুনলে ? রাগ পুরোনো হয়ে পড়লে ত এরাই প্রথম খবর পাবে।

রমেশ—শিক্ষিত লোকের চেয়ে তোমার গৌরী মিশির আর খাঁ সাহেবরা বোঝেন বেশী ?

সুরেশ—তাই বল, শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেচ। আচ্ছা, এই সব শিক্ষিত লোকেরা হিন্দুস্থানী গান জানেন ?

রমেশ—তাঁরা বুদ্ধিমান, শুনলে বুঝতে পারেন না ?

সুরেশ—আমরা গান করি, ১৫।১৬ বছর শোনার ও রেয়াজের পর আমরা রাগের খবর পাই, আর তোমার শিক্ষিত লোকদের কাছে শুধু লেখাপড়ার জোরে দু-একবার শোনার পর রাগ সুপরিচিত হয়ে পড়ে, এতে যদি আমার সন্দেহ হয় ত সেটা কি গুরুতর অপরাধ হল ? কিন্তু সে কথা থাক, তোমার হাতে বইটা কি ?

রমেশ বইটীর মাঝামাঝি একটা পাতা খুলে বল্ল, "এইটে পড়ে দেখ।"

পড়বার বিশেষ কিছু ছিলনা, তবু সুরেশ চোখ বুলিয়ে দেখলে জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের সম্বন্ধে খবর পেয়েচেন যে সেটা static ও traditional এবং তা কোন উচ্চশিক্ষিতের কাছে। এরকম কিছু সুরেশের চোখেও পড়েচে, কিন্তু সে এসবে বড় একটা কান দিত না। সে জানত হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের গায়ক বা বাদক এরকম কোন আশঙ্কা কখনও প্রকাশ করে নি এবং এরা সামান্য হিন্দি উর্দ্দু জানলেও বুদ্ধিমান।

সুরেশ—Static ও traditional-এর উত্তর আমি পরে দেবো। কিন্তু যাঁরা বলচেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইংরেজ পর্য্যটকের কোন দোষ দিই না, এ মত তাঁর নিজের নয়, দেশ থেকে নেওয়া। তুমি যদি ইংরেজ ও ভারতীয়ের লেখা স্কুল ও কলেজপাঠ্য ইতিহাসের বইগুলো তুলনা কর, দেখবে প্রায় প্রত্যেক বিদেশী গ্রন্থকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যথাসাধ্য খোঁজখবর নিয়ে লিখেচেন, কিন্তু ভারতীয়ের মধ্যে শতকরা একজনের সম্বন্ধেও একথা খাটে কিনা সন্দেহ। Sir W. Hunter ও Mr. Havell-এর বই দেখলে আমার কথা সুবোধ্য হবে। Sir William Jones সঙ্গীতের পুঁথি উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগের তৎকালীন প্রকারভেদের অনুসন্ধান করতে ভোলেন নি। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে কখানা বই পাওয়া যায়, তাদের গ্রন্থকারগণ, যেমন Capt. Willard, Fox Strangways, Mr. Clements ইত্যাদিরা সকলেই বিদেশী। হাজার সহানুভূতি ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিদেশীর কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত দুর্ব্বোধ্য হয়েচে, কিন্তু সে ত্রুটিটুকু স্বীকার করেও তাঁদের অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে আমার নালিশ আছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চসঙ্গীতের মজলিশে ব্রিজ খেলেন, খোশগল্প করেন এবং পান-ভোজনে ব্যস্ত থাকেন এবং নিতান্ত উত্যক্ত হলে গাইয়েকে পয়সার জোরে ক্রমাগত ঠুংরী ও গজল গাইতে বাধ্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, যার যা রুচি। শিক্ষিতের মাঝে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান, বোঝবার ক্ষমতা রাখেন।

রমেশ—এদের বিরুদ্ধে কথা বলবার আগে একথাটা তোমার মনে রাখা উচিত, বোঝবার মত করে তোমরা কখনও সঙ্গীতের কথা আলোচনা কর নি।

সুরেশ—কারুর বিরুদ্ধে কথা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলিনে। তোমরা বাদবিসংবাদ বাধাবে, যদি প্রতিবাদ করি, বলবে ঝগড়াটে, এ অপবাদ দেওয়া তোমার সাজে না। কিন্তু তুমি যে অনুযোগ করেছ তা একবর্ণ অসত্য নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা মানে এদেশে অধিকাংশ স্থলে নাদব্রহ্মের দ্বাবিংশতি নাড়ীর ও খাঁ সাহেবদের অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও অপরিপক্ক উদ্গীরণ। যদি কিছু বলতে যাও শুনবে 'বাপরে, ঋষিদের উপরে কথা'! ভারতের সুজলা সুফলা ভূমিতে ঋষিরা অতি সুলভের কোঠায় উপস্থিত হয়েচেন। যাঁদের লেখবার বা বোঝবার শক্তি আছে, তাঁদের হয় গান শোনা হয় না, না-হয় পুস্তকের অভাব ঘটে। নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীতরত্নাকর, রাগতরঙ্গিনী, সঙ্গীতপারিজাত, হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ, রাগতত্ত্ববিবোধ, সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা, রাগমঞ্জরী, স্বরমেলকলানিধি, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা, সঙ্গীতসারামৃতম্, রাগলক্ষণম, অনূপবিলাস, অনূপসঙ্গীতরত্নাকর, অনূপাংকুশ, রাগবিবোধ—এই কখানি বই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে সঙ্গীতশিক্ষার্থীর ব্যবহারে আসতে পারে। প্রায় সবগুলিই তিনি নিজ ব্যয়ে মারাঠি ও গুজরাটি অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করেন, অধিকাংশই বিক্রী হয়ে যাওয়াতে অল্প কয়েকটী মাত্র কিনতে পাওয়া যায়। এগুলির পুনরায় ছাপা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েচে। সবগুলিই পুস্তিকা বললেই হয়, সুতরাং ব্যয় অধিক হবে না। এ হল প্রাচীন সঙ্গীতের কথা, যার মূল্য বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক। আধুনিক সঙ্গীতের সম্বন্ধে দু একখানা বই লেখা হয়েচে, যা পড়লে সঙ্গীতের যা কিছু বোধগম্য, তা বোঝা যায়। বাংলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' ও বাংলার বাইরে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি"। এগুলি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচলিত স্বরলিপি-সম্বলিত চারিখণ্ড 'ক্রমিক পুস্তক' থেকে আলাদা।

রমেশ—দ্বিতীয়টী কোন ভাষায় লেখা?

সুরেশ—মরাঠিতে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে এটা একমাত্র প্রামাণ্য ও সুলিখিত গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয়না। কৃষ্ণধনবাবুর বই অনেকদিন আগে লেখা, অনেক অধুনা প্রকাশিত সংস্কৃত বই তিনি কাছে পান নি, তাই অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েচে। রাগরাগিণী সম্বন্ধেও তিনি বিস্তৃত ভাবে লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বই তীক্ষ্ণবুদ্ধির, বিশৃঙ্খলকে সুসম্বদ্ধ করার চেষ্টার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

রমেশ—তবে দাঁড়াল যে একখানা বই আছে তাও মরাঠিতে লেখা, আমাদের দোষ কতটুকু তুমি নিজেই ভেবে দেখ।

সুরেশ—অন্য কোন দেশ হলে এ বই এতদিন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যেত। মরাঠি আমি সামান্য বুঝি, এবং এটুকু বলতে পারি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই সহজ, সরল এবং অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমানুষিক পরিশ্রমের নিদর্শনটা অবোধ্য হবে না। এ ছাড়া 'লক্ষ্যসঙ্গীতম্' বলে একটা ছোট সংস্কৃত বই তিনি লিখেচেন, তার দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। বরোদা কনফারেন্সে অভিভাষণ ও কয়েকটা প্রবন্ধ ছাড়া পণ্ডিতজী ইংরাজীতে কিছু লেখেন নি।

রমেশ—আচ্ছা শিক্ষিতদের কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু জনসাধারণ তোমাদের কতটুকু বুঝতে পারল? মানুষের স্বাভাবিক জল বায়ু মাটির সংস্পর্শ ছেড়ে কৃত্রিম আবহাওয়ায় তোমরা সঙ্গীতকে লালন করলে, এখন দোষটা অন্যের ঘাড়ে ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চাও। পথের মানুষ যা বুঝল না, সংসারের গুটিকয়েক লোকের মধ্যে যার সমাপ্তি হল, তুমি বলবে তাই বড়।

সুরেশ—তোমার উক্তির পেছনে ফরাসী বিপ্লবের equality, fraternity ইত্যাদি বলশালী কথাগুলির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। টলষ্টয়ের শেষ জীবনে আর্ট সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু গোটাকতক তথ্য তুমি সত্য বলে ধরে নিয়েচ, স্থির হয়ে বিচার কর, তোমার অভিজ্ঞতার সায় পাবে না। তোমার প্রথম কথা সকলের সব কথা বুঝতে হবে এবং দ্বিতীয় এই যে যেই কোন কিছু সাধারণের দুর্বোধ্য হতে আরম্ভ করল অমনি হল কৃত্রিম। সাধারণকে ভালবাস ক্ষতি নেই, বিশ্বপ্রেম কথাটা অত্যুক্তি নয়, কিন্তু যার যা আয়ত্তের বাইরে, সে ভার যদি তার উপর চাপাও, সেই মুহূর্ত্তে তা দুর্ভর হয়ে উঠবে। টাকা, জমি, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সমানভাবে বণ্টন কর আপত্তি নেই, কিন্তু জন্মগত অধিকারসূত্রে মানুষ যা পায় সেখানে হস্তক্ষেপ চলে না। পারিপার্শ্বিককে হাজার নিয়ন্ত্রিত করলেও তুমি শেলির মত কবি বা আইনষ্টাইনের মত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমার প্রথম অভিযোগের উত্তর,

এই জগৎ যাঁদের বড় বলে মেনে নিয়েচে, তাঁরা সাধারণের বুদ্ধির বাইরে রয়ে গিয়েচেন। কিন্তু যদি বল সেই কারণে তাঁরা কৃত্রিম ত আমি প্রতিবাদ করব। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বা 'ঘরে বাইরে' গ্রামের লোকে বুঝবে না, কিন্তু এ কি তুমি বলতে পার, তাঁর বইয়ের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের অনুভূতির কোথাও যোগ নেই? কৃষক তার উপলব্ধি হয়ত ভাষায় সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, তার জীবনে প্রেম নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর অনুভূতির মূল সত্তা কি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির থেকে পৃথক? হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীত ওস্তাদদের হাতে সংস্কৃত হলেও সঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিকভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তা সে হারায় নি। ঠুংরী বলে যা গাওয়া হয়, তার পনরো আনা গ্রাম্য সঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বড় খেয়ালী ধ্রুপদীরা তা গাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

রমেশ—তবু একটা কর্ত্তব্য কি নেই? লোকে যদি শুধু নিজের প্রতিভাবিকাশে ব্যস্ত থাকে, সেটা কি নিছক স্বার্থপরতা নয়?

সুরেশ—জগতে অনেকগুলি নিয়ম আছে তা নিষ্ঠুর কিন্তু তা বলে অস্বীকার করলে শেষ পর্য্যন্ত শুভ হয় না। পাপিয়ার গান তোমার ভাল লাগা বা না-লাগার অপেক্ষা করে না, সে গেয়ে যায়, সেটা তার ধর্ম্ম। তুমি যদি তাকে মেরে ফেলতে চাও মার : কিন্তু সে কোনপ্রকারেই অন্যকে বোঝাবার মত কোন পরোপকার বা কর্ত্তব্য করতে পারবে না। তুমি ত দর্শনের অনুরাগী, শুনতে পাই স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভালবাস। তাঁকে ক্যাণ্টের Critique কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে দেখতে পার। ভাল-বাসার, কর্ত্তব্যের কোন কথাই এখানে আসচে না। বিষয়টা নির্ভর করচে গ্রহীতার যোগ্যাযোগ্যতার উপর। হাজার বছর ধরে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গড়ে উঠেচে, সেটা কিঞ্চিৎ দুরূহ হবেই। সমস্ত বিদ্যা সাধনার অপেক্ষা রাখে, আর গান শুনলেই বুঝতে পারা যাবে এমন কোন কথা নেই। কানে শুনতে পেলেই তা সহজ হয়ে যায় না, ঠিক করে শোনা শিখতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা এখনও বলা হয় নি। সাধারণকে বোঝাবার জন্যে কোন বড় চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। মাত্র রাশিয়ায় তার সূচনা হয়েচে। এর ফলাফল কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না। ললিতকলার চর্চ্চটা কতদূর ব্যাপক হতে পারে, এর প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। লেলিন এদিকে কিছু ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর লেখা জীবনী থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় সাহিত্যের সম্বন্ধে যে কথাটা আছে, সঙ্গীতেও তা প্রযোজ্য হতে পারে—

" But while working hard to assure that he conveyed his ideas to the workers in the clearest and best possible form, Ilyich at the

same time remonstrated against all vulgarisation, all attempts to narrow the question down for the workers, to simplify its substance.

Ilyich wrote in 'What is to be done?' (1901-1902) "Attention must be devoted principally to the task of *raising* the workers to the level of revolutionists, but without in doing so, necessarily *degrading* ourselves to the level of the 'labour masses,' as the economists wish to do . . . . . . I am far from denying the necessity for popular literature for the workers, especially popular (but, of course, not vulgar) literature for the especially backward workers. . . . . You, gentlemen, who talk so much about the 'average workers,' as a matter of fact rather insult the workers by your desire to *talk down* to them, to stoop to them when discussing labour politics or labour organisation. Talk about serious things in a serious manner."

(Memoirs of Lenin by N. Krupskaya, p. 193).

এখন সেইজন্য কৃষক ও শ্রমিক সকলে নিয়মিত উচ্চ সঙ্গীতের concert-এ যেতে আরম্ভ করেচে। কিন্তু এত বড় বিশাল দেশে চট করে সবরকম সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, তাই এখনও যে সকলে পর্য্যাপ্ত সুযোগ পেয়েচে এমন বলা যায় না। ভারতের প্রত্যেক গ্রামে যদি একটা রেডিও সেট থাকে, রমেশ, কি বল তুমি ?

রমেশ—লোকগুলো কিছু শুনতে পায়, অন্ততঃ কলকাতার বম্বের ব্রডকাষ্টিং-এর যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু রাশিয়ার সাহিত্যে ও নাটকে যূথবদ্ধ সমাজের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া সোভিয়েটরা আর যে কিছু লিখতে দেয় না, এখানে কি তোমার কথাটা খাটচে ?

সুরেশ—মানুষের চিন্তাকে যেখানে সক্রিয় হতে দেয় না সে দেশে বাঁচার মত দুর্ভাগ্য কমই আছে। রাশিয়ার নিজের উপর নির্ভর এত কম কেন বুঝতে পারিনে। আর্টেও তার প্রোপাগাণ্ডা চালান চাই। লোকে অনুশাসন অনুযায়ী সাহিত্য লিখবে একথা ভাবতে ভয় করে। চিন্তা মানেই মনের স্বাধীনতা, একটা ছাড়া অন্যের কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু আমরা অবান্তর বিষয়ে এসে পড়েচি। সঙ্গীতে ব্যক্তিক ও সামাজিক ভেদ করা কঠিন, নইলে আজ সারা রাশিয়ায় কমিউনিজম-মার্কা সঙ্গীত চলত।

রমেশ—মহাত্মাজী ত শুনি বলেন গানের মধ্যে ভজনই যথেষ্ট আর ছবির বদলে আকাশের তারা দেখলেই চলবে।

সুরেশ—মহাত্মাজীর মত কি আমি জানি না, কারণ তিনি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন নি। সেদিন কাগজে দেখলাম তায়াবজীর কন্যা উপবাসের সময় তাঁকে গান শুনিয়ে প্রীত করেচেন। লোকমুখে শুনতে পাই তিনি সুগায়িকা ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর শিষ্যা। সুতরাং উচ্চ অঙ্গের গান হয়ত ভাল বলতেও পারেন।

কিন্তু শিক্ষিত এবং সাধারণ নিয়ে তর্ক করতে করতে আমরা অনেক দূর এসে পড়েচি, তোমার static ও traditional কথাটার উত্তর দিতে হবে আমি ভুলে যাই নি। সাধারণের পক্ষে আমি এইটুকু বলতে পারি, উচ্চ সঙ্গীতের শ্রোতার ও গায়কের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে, শিল্পীর সংখ্যাও কিছু বাড়বে।

রমেশ—শিল্পীর বেলায় কিছু কেন ?

সুরেশ—ওপথ চিরকালই কিঞ্চিৎ দুর্গম রইবে এমন ভাবা অসঙ্গত নয়। য়ুরোপে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট, কিন্তু আর্টিষ্ট সেই অনুপাতে বাড়ে নি, কিছু কমেচে। সেটার হেতু যোগ্য মানুষের অভাব বা যুগপ্রভাব, এ বলা শক্ত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চ কেন যারা শুনতে ভালবাসে তারাও একরকম শিল্পী। মনস্তত্ত্বের বইতে পাওয়া যায় প্রবুদ্ধ শ্রোতা ও গায়কের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাধারণ যদি এসব সুকুমারবৃত্তি থেকে বঞ্চিত থাকত ত বহুপূর্ব্বে কলাবিদ্যার প্রাণবিয়োগ ঘটত।

রমেশ—তোমার কথাগুলো অনেকটা প্রবোধবাক্যের মত শোনাচ্চে। তবে হিন্দুর সংস্কারে অধিকার ভেদের কথা জড়িয়ে আছে, ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। আর্টিষ্ট যা সুখ পায়, তার বদলে তার যে দাম দিতে হয়, সেটাও বিবেচ্য। কিন্তু এখন আসল কথায় আসা যাক।

সুরেশ—ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে পড়েচে, বেলাও হল। সহধর্ম্মিণী আমার রাগালাপে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন, দেরি হলে তাঁর মেজাজটা যে বিলক্ষণ তিক্ত হবে বলা বাহুল্য এবং সে কারণে বক্তব্যটা সংক্ষিপ্ত করলে তোমার এবং আমার বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা। Static ও traditional-এর বাংলা যদি 'চলৎশক্তিহীন' ও 'গতানুগতিক' করি, তোমার আপত্তি আছে ?

রমেশ—অনুবাদটা একটু নিরঙ্কুশ হয়ে পড়ল, যাক মানেটা বোঝা যাক।

সুরেশ—প্রাচীন সঙ্গীতের সধ্বনি বিবরণ দেওয়া যায় না কারণ একেত সে সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না ও দ্বিতীয়তঃ ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার হয় নি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে বরাবর চলে এসেচে, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে পুষ্ট হয়েচে, কোথাও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি একথা বোঝাতে হলে পুঁথির সাহায্য নিতে হবে। এ পরিচ্ছেদটা শুধু প্রমাণের জন্য হাজির করাতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত হবে, সাঙ্গীতিক পরিভাষার আশ্রয় নিতে হবে, সুতরাং অস্পষ্ট হলে তুমি রাগ কোরো না। সামবেদে তিন প্রকার স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম, ঋক, গাথা যথাক্রমে

এক দুই তিন স্বরের সমষ্টি ছিল ও এক প্রকার ৪ স্বরের স্কেল ব্যবহার হত তার নাম ছিল স্বরান্তর। এইসব স্বরের পরস্পরের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ তারা আমাদের 'সা, রে, গা, মা'র মত ছিল, না অন্য কোন-প্রকার ছিল তাও বোঝা যায় না। সামবেদী ব্রাহ্মণেরা এখন খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছর পূর্ব্বের গান করেন না, সুতরাং জানার কোন উপায় নেই। তারপরই আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাই, সেটী পঞ্চম খৃষ্টাব্দে লেখা। এর মধ্যে ৪ স্বরের স্কেল বেড়ে ৭টী স্বরে পৌছেচে, কিন্তু রাগরাগিণী সম্ভবতঃ দেশে উপস্থিত হয় নি। গান খুব সম্ভব ছিল, কোন স্কেলে স্বরগুলি পর পর গেয়ে যাওয়া। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রত্নাকরের সময় রাগের নাম পাওয়া গেল, নাট্যশাস্ত্র আর রত্নাকরের মধ্যে কোন বই পাওয়া যায় না। এখন আমরা রাগ বলতে যা বুঝি তখন তা গাওয়া হত না। যা গীত হত, তার ধরণ ছিল সম্ভবতঃ অনেকটা বর্ত্তমান দক্ষিণী সঙ্গীতের মতন, কম্পন ছিল বেশী। আমার একটী মরাঠী বন্ধু অনুমান করেন এর স্বল্প চিহ্ন এখনও বাংলা ও মরাঠী গ্রাম্য সঙ্গীতে পাওয়া যায়, কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়। রত্নাকরের সময় নানাপ্রকার নিয়মের ভারে রাগ আড়ষ্ট ছিল, সেটা অবশ্য আমাদের মতে, নইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিশ্চয় খুব হৃষ্টচিত্তে সে সব গাইতেন সন্দেহ নেই। নাট্যশাস্ত্র এবং রত্নাকরের শুদ্ধ স্কেল তাঁদের দুরধিগম্য জটিলতার কারণে বোঝা গেল না। ঠিক এই সময় থেকে মুসলমান প্রভাব আমাদের গানে পড়ে। তাঁরা কাঠামটী রাখলেন হিন্দু, কিন্তু গানের চাল দিলেন বদলে, স্বরগুলি স্থির হতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভব এই কারণে হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতে কম্পন বা tremolo-র স্থান নেই বল্লেই হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর রাগতত্ত্ববিবোধেও পারিজাত রাগের আরোহ অবরোহের সূচনা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তার 'উদ্‌গ্রাহক' তানের মধ্যে বর্ত্তমান রাগের পকড়ে-র (সংক্ষেপে যে কয়টী স্বরকে সংহতিকে কেন্দ্র করে রাগ নিজেকে প্রকাশ করে যেমন বেহাগে নিসাগমপ, গমগ বা হমীরে গমধ, নিধ, সা) ছায়া পাওয়া যায়। পারিজাত তাঁর শুদ্ধ স্বরগুলি তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দিয়ে দিলেন, সুতরাং তাঁর শুদ্ধ স্কেল ও রাগগুলির স্বর পাওয়া গেল। এর পর দুশ বছর ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু স্কেল যে আবার বদলেচে, অনেক রাগ লুপ্ত হয়েচে, কিছু পরিবর্ত্তিত হয়েচে, কিছু নতুন তৈরি হয়েচে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গত ১৬।১৭ বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে বিস্তর বদলেচে একথা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এখনও কি বলতে চাও হিন্দুস্থানী গান আজ

অচল অনড় হয়ে স্থাণুর মত বিরাজ করচে। কিন্তু এসব কথা ছেড়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে static হলে কি হিন্দুস্থানী গান এক-ঘেয়ে হয়ে আপনি মরে যেত না? জোর করে অচল জিনিষকে আর কোথায় চালান যায় কিনা জানি না, অন্ততঃ আর্টে এতদিন এ প্রবঞ্চনা চলত না এটা ঠিক।

রমেশ—কিন্তু স্বর ত তোমাদের মোটে বারটী, তাদের দিয়ে কত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি তুমি করবে? লোকে সাধে traditional বলে।

সুরেশ—বাংলা ভাষায় অক্ষরগুলির সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী নয়, কিন্তু তা দিয়ে শব্দবিন্যাসের অন্ত আছে? অঙ্ক কষে এ বৈচিত্রের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। গান যদি করতে ত বুঝতে পারতে রাগে বারটী স্বরের ব্যবহার কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হতে পারে। তারপরে অনেক রাগে এ বারটী স্বর ছাড়া অন্য স্বরেরও দরকার হয়। এই জন্যেই কি গতানুগতিক বলতে চাও? সুরের মধ্য দিয়ে নিজের emotion প্রকাশ করাই সঙ্গীত, যদি অন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর আশ্রয় নেও, তাকে অন্য নাম দিও। আমি এইটুকু বলতে চাই যদি static বলে স্বীকার না কর, তাহলে traditional-এর যুক্তি সেই সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে। আমেরিকান সভ্যতার পেছনে tradition না থাকাতে কি অসুবিধা হচ্চে সে তর্ক আজ নাই বা তুললাম।

রমেশ—যাক, ওকথা ছাড়, বাংলা গানে যে সুন্দর ভাব, কবিত্বের পরিচয় পাই, এ ত তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দিতে পারবে না।

সুরেশ—কবিত্ব একেবারে নেই একথা বোলোনা। প্রকৃতির, মানুষের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, ভালবাসা, অভিমান, ঈশ্বরে ভক্তির বর্ণনা নিয়েই হিন্দুস্থানী গান। আমাদের সুসভ্য কানে তত উচ্চ কাব্যের খোরাক সে জোগায় না, কিন্তু মানুষের চিরন্তন আদিম প্রবৃত্তির বর্ণনা কোনদিনই নীরস হবে না। সূক্ষ্ম কাব্যরসপূর্ণ কবিতা হিন্দী লেখকগণ আরম্ভ করেচেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমরা যারা গান করি শব্দমাধুর্য্যের অভাব কখনও বোধ করি না। কত গান ১৫০।২০০ বছর গাওয়া হচ্চে, এখনও একটুও পুরোনো মনে হল না। কিন্তু কথার সংস্কৃত মাধুর্য্য যদি না থাকে, তাহলে সঙ্গীতের কি কোন ক্ষতি হল? সঙ্গীতের সম্বন্ধে তোমরা মস্ত ভুল কর, কথা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করবার emotion যেন সুরেতে থাকতে পারে না। কথায় তুমি নিজের যতটুকু বিকীরণ কর, সুরের আবেদন তার চেয়ে গভীরতর স্তরে গিয়ে স্পর্শ করে। বাংলা গানেও যে সুরই বেশী চাও, বাংলা গান থেকেই তা প্রমাণ করতে পারি। বাংলা গানে সুর যেই পুরোনো হয়, সেই মুহূর্ত্তেই লোকে তাকে ভুলতে

আরম্ভ করে, শত কবিত্ব-সম্ভারও তাকে তুলে ধরে রাখতে পারে না। বাংলার প্রত্যেক গান তাই স্বল্পায়ু। কথার অংশ সঙ্গীতে নিতান্তই গৌণ। Lowes Dickinson তাঁর After Two Thousand Years নামে বইতে Plato এবং Philalethes-কে যথাক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে দাঁড় করিয়েচেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের মতামতটা উদ্ধৃত করলে মন্দ লাগবে না—

"PLATO—In them (Greek music), at any rate, you can hardly deny an ethical character since there the words determine the music.

PHILALETHES—Not so much as with you, for with us the music is more important than the words. And perhaps that is as well, for, as our songs are sung, we can seldom hear the words at all." (P. 158).

রমেশ—বাংলা গানে কত নতুন মিষ্টি সুর তৈরি হচ্চে এটা তুমি স্বীকার কর কিনা।

সুরেশ—করি, তার খানিকটা হিন্দুস্থানী রাগ থেকে নেওয়া, খানিকটা গ্রাম্যসঙ্গীতের কাছে পাওয়া, বাকিটা বিলিতি মেলডির অনুকরণ। এতে আমি কোন দোষ দেখি না, সব দেশের গানেই এসব মিশেল থাকে। কিন্তু যদি বল নতুন সৃষ্টি ত আমি আপত্তি করব। বাংলা গান যদি য়ুরোপের নকল করে, হার্ম্মনি (স্বরসমূহের যুগপৎ সুমিষ্ট ব্যবহার) এসে পড়বে, যে ক্ষীণ চেষ্টা কখনও কখনও এদিক ওদিক দেখতে পাই। হার্ম্মনিতে য়ুরোপীয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে যাওয়া আর বামনের চাঁদে হাত দেওয়া একই কথা। মেলডির (স্বরসমূহের পর পর ব্যবহার) দিকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত তার বিশাল সমৃদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা গানের সৌন্দর্য্য নেই এমন বলি না, নিজের স্থানটীতে অর্থাৎ বাংলার মর্ম্মস্থানে সে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জগতে এরকম গান ছড়িয়ে আছে; চীনে আছে, কঙ্গোর অরণ্যে আছে, মেক্সিকোতে আছে, সুইস আল্পসে আছে ও ভারতে সর্ব্বত্র আছে। এগুলো হচ্চে গান, রাগ ভিন্ন জিনিষ। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতে মেলডির এইদিকে পরিণতি হয়েচে।

রমেশ—হিন্দুস্থানী গানে যদি হার্ম্মনি আসে ?

সুরেশ—কি করে আসবে ? রাগ মুখস্থ করে গাওয়া যায় না। প্রত্যেক গাইয়ে প্রতিবার একই রাগ গাইতে পারে, অথচ একরকম করবে না। স্রোতের গায়ে অলঙ্কার দিতে হলে, প্রতি মুহূর্ত্তে হার্ম্মনির সৃষ্টি করতে হয়, মানুষের তা সাধ্যাতীত। ভারতে গাইয়েরা রাগ মুখস্থ করেন না, বা অন্যের composition য়ুরোপীয়ের মত interpret করেন না। বস্তুতঃ দুই সভ্যতার সাঙ্গীতিক মনোভাব আলাদা।

রমেশ—তার মানে ভারতীয় রাগ কোনকালেই পুরাতন হবে না।

সুরেশ—ভবিষ্যতের কথায় অনুমান করাই ভাল, কোন স্থির সিদ্ধান্তে না আসাই শ্রেয়ঃ। কখনো হবে না একথা কি করে বলি? মানুষের রুচির স্থৈর্য্য কতটুকু তা কে বলতে পারে? অনেক সময় শুধু অত্যধিক পরিণতির ভারে মানুষ শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন হাতের কাছে যা পায়, তারই মাঝে বিশ্রান্তি বিরাম চায়। আমার মনে হয় সাহিত্য, চিত্রকলার ললাটে ক্লান্তির যে গভীর রেখা পড়েচে, সঙ্গীতেও তাই হবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আরম্ভ হয়েচে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেও নতুন experiment-এর যুগ এল বলে।

রমেশ—তোমার কি মনে হয় না এ নিরুদ্ধ বেদনায় কোন নবসৃষ্টির আবির্ভাব সূচিত হচ্চে।

সুরেশ—নবসৃষ্টির আবির্ভাবকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় বর্ত্তমান সৃষ্টির মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। জগতে অনেক সভ্যতার লোপের কত কারণ বার হয়। কেউ গেল বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে, কেউ অনুন্নতের সঙ্গে বিবাহ করে, কেউ সাম্রাজ্য সামলাতে না পেরে, কেউ ম্যালেরিয়া, কেউ অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির আক্রমণে, এমনি কত কি। আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি জাতি মরে যায়, তার মনের সম্পদ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। গ্রীসের দর্শন বিজ্ঞান স্থাপত্য, রোমের ব্যবহার-বিধি কি সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে নি? ভারতে যদি হিন্দুস্থানী গান মরে যায়, সে পরবর্ত্তী সঙ্গীতের মাঝে কোথাও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে এ আশা আমার আছে।

রমেশ—এর মধ্যে সব জাতগুলো যদি যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এসব বালাই বড় একটা থাকবে না। তবে সম্ভবতঃ মানুষ সে পথে যাবে না। কিন্তু হিন্দুস্থানী খেয়াল গাওয়া উঠে গিয়েচে, আর তুমি বেঁচে আছ এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

সুরেশ—মানুষের স্বভাব আজন্ম যাতে পুষ্ট হয় তাকে ছাড়তে পারে না। সে অনাগত ভবিষ্যতে আমি ব্যথা পেতে পারি, কিন্তু আশ্চর্য্য হব না।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

গদ্যের ছন্দ *

পদ্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্পাধিক চর্চ্চা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ছন্দ কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার কলারই লক্ষণ। সুলিখিত গদ্যও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ্য রূপ আছে, ধ্বনি-বিন্যাসের কৌশলে তাহা যে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতে ও আবেগের দ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একটা বোধও আমাদের অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গদ্যছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। Aristotle বলিয়া গিয়াছেন যে গদ্যেরও rhythm অর্থাৎ ছন্দঃ আছে, কিন্তু তাহা metrical অর্থাৎ কাব্যছন্দের সমধর্ম্মী নহে। গদ্য-ছন্দের ও কাব্য-ছন্দের পরস্পর পার্থক্য কিসে—এতৎসম্বন্ধে Aristotle-এর মতামত জানা যায় না। যাঁহারা Latin ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারা Cicero প্রভৃতি সুবক্তা ও সুলেখকগণের রচনায় ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত cursus ব্যবহার ইত্যাদি রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। Latin ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে Vulgate Bible-এর প্রভাব যথেস্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গদ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বাংলা গদ্যছন্দ লইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে।

ইংরাজী উচ্চারণে accent-এর গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া accent-এর অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পদ্যছন্দের ন্যায় ইংরাজী গদ্যছন্দেও accentই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্তু বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদ্যছন্দ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা লেখকের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

করে। দুই যতির মধ্যবর্ত্তী শব্দসমষ্টি বা পর্ব্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গদ্যেরও উপকরণ—এক এক ঝোঁকে (impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য)

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময় —এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গদ্যছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গদ্য—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্য রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ হয় সুপরিচিত। সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে।

যতি মাত্রাভেদে দুই প্রকার—অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া এক একটি পর্ব্ব গঠিত হয়, এবং এবম্বিধ পর্ব্বের পর একটি অর্দ্ধযতি পড়ে। কয়েকটি পর্ব্ব সহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির পর্ব্ব বিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

[। চিহ্নের দ্বারা অর্দ্ধযতি এবং ॥ চিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করা হইবে]

১ম বাক্য - সত্য, । সেলুকস্ ॥
২য় " - কি বিচিত্র । এই দেশ ॥
৩য় " - দিনে । প্রচণ্ড সূর্য্য । এর গাঢ়-নীল আকাশ । পুড়িয়ে দিয়ে যায় ॥
৪র্থ " - আর । রাত্রিকালে । শুভ্র চন্দ্রমা এসে । তাকে । স্নিগ্ধ জোৎস্নায় । স্নান করিয়ে দেয় ॥

৫ম বাক্য - তামসী রাত্রে। অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে। যখন। এর আকাশ। ঝলমল করে॥
৬ষ্ঠ " - আমি। বিস্মিত আতঙ্কে। চেয়ে থাকি॥
৭ম " - প্রাবৃটে। ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি। গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে। প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মতন। এর আকাশ ছেয়ে আসে॥
৮ম " - আমি। নির্ব্বাক্ হয়ে। দাঁড়িয়ে দেখি॥
৯ম " - এর। অভ্রভেদী। ধবল তুষার-মৌলি। নীল হিমাদ্রি। স্থিরভাবে। দাঁড়িয়ে আছে॥
১০ম " - এর। বিশাল নদনদী। ফেনিল উচ্ছ্বাসে। উদ্দাম বেগে। ছুটেছে॥
১১শ " এর। মরুভূমি। বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত। তপ্ত বালুরাশি নিয়ে। খেলা কর্চ্ছে॥

পদ্যের পর্ব্বের ন্যায় গদ্যের পর্ব্বও দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি পর্ব্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্যের পদ্ধতির অনুরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা syllable এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক কথায়, গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক। * এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে, মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতি একেবারে বাঁধাধরা নয়, আবশ্যক মত আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেও দীর্ঘীকরণ করা যাইতে পারে।

গদ্যেও এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়।

গদ্যে পর্ব্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ থাকিবে। গদ্যে শব্দাংশ লইয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠন করা চলে না। সুতরাং বলা বাহুল্য যে গদ্যের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে।

পদ্যের পর্ব্বের সহিত গদ্যের পর্ব্বের প্রধান পার্থক্য এই যে পদ্যে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের

---

* পয়ারজাতীয় ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ অভিযোগপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ইহা লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন। বাংলায় লিখনের একটি বিশিষ্ট প্রথা হইতে না কি ইহা উৎপন্ন। এমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ছন্দোবোধ দৃষ্টিগত নয়, শ্রুতিগত। লিপিচাতুর্য্য দিয়া কানকে ঠকান যায় না। বরং বলা যায় যে বাংলার স্বাভাবিক মাত্রাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই বাংলার লিপিপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ণকায় বর্ণসংখ্যা হইতে মাত্রাসংখ্যা বুঝা যায়।

মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে; কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

			পর্ব্বসংখ্যা
১ম বাক্য -	[২] । [৪]	...	২
২য় „ -	(১ + ৩-) ৪ । (২ + ২-) ৪	...	২
৩য় „ -	[২] । (৩ + ২-) ৫ । (২ + ৪ + ৩-) ৯ । (৩ + ৪-) ৭	...	৪
৪র্থ „ -	[২] । (২ + ২-) ৪ । (২ + ৩ + ২-) ৭ । [২] । (২ + ৩-) ৫ (২ + ৩ + ২-) ৭	...	৬
৫ম „ -	(৩ + ২-) ৫ । (৩ + ৩ + ৪-) ১০ । [৩] । (২ + ৩-) ৫ । (৪ + ২-) ৬	...	৫
৬ষ্ঠ „ -	[২] । (৩ + ৩-) ৬ । (২ + ২-) ৪	...	৩
৭ম „ -	[৩] । (৪ + ৪-) ৮ । (২ + ৩ + ৩-) ৮ । (৩ + ৫ ? + ২-) ১০ । (২ + ৩ + ৪-) ৯	...	৫
৮ম „ -	[২] । (৩ + ২-) ৫ । (৩ + ২-) ৫	...	৩
৯ম „ -	[২] । (২ + ২-) ৪ । (৩ + ৩ + ২-) ৮ । (২ + ৩-) ৫ । (২ + ২-) ৪ । (৩ + ২-) ৫	...	৬
১০ম „ -	[২] । (৩ + ৪-) ৭ । (৩ + ৩-) ৬ । (৩ + ২-) ৫ । [৩]	...	৫
১১শ „ -	[২] । (২ + ২) ৪ । (৩ + ৫? + ২-) ১০ । (২ + ৪ + ২-) ৮ । (২ + ২-) ৪	...	৫
			৪৬

এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার সুবিধা হইবে।

এখানে মোট ৪৬ টি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ব্বগুলির দুই দিকে [ ] চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। এইরূপ ১৩টি পর্ব্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ একটি পর্ব্ব থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পর্ব্বে একটি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে ইহাদের ছন্দের পর্ব্ব বলা উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ছন্দের অতিরিক্ত (hypermetric) এক একটি শব্দ মাত্র। ইহাদিগকে বাক্যের মধ্যে যেখানে নূতন একটি ছন্দ-প্রবাহের আরম্ভ তাহার পূর্ব্বে পাওয়া যায়। কদাচ ছন্দ-প্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়া এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়।

পদ্যেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু গদ্যেই ইহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বহুল। *

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পদ্যে তিনটি পর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব্ব গঠিত হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ব্বাঙ্গ পর্ব্বের আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গদ্যে কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্ব্বের ব্যবহারেই গদ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্ব্বে তিনটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অনুযায়ী ("অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে," "গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে," "ধবল-তুষার-মৌলি")। কিন্তু "শুভ্র চন্দ্রমা এসে" "তপ্ত বালুরাশি নিয়ে" ইত্যাদি পর্ব্বের ব্যবহার পদ্যে চলে না।

এতদ্ভিন্ন গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে, পদ্যে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব্ব উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় ("এর গাঢ়-নীল আকাশ", "প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত", "এর আকাশ ছেয়ে আসে" "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত")। অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। "এর গাঢ়-নীল আকাশ" এই পর্ব্বটিতে মধ্যে এবং "এর আকাশ ছেয়ে আসে" এই পর্ব্বটিতে অন্তে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটির স্থান হইয়াছে।

("প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত" ও "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত" এই দুইটি পর্ব্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত ৩+৫+২, সুতরাং এই দুইটি পর্ব্বে যেন গদ্যছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, 'বিরাট্ স্বেচ্ছাচার এর্‌মত' এই ধরণে।)

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু পদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইয়া থাকে।

পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর

---

* অনেক সময় পদ্যের মধ্যে গদ্যের আভাস আসার জন্য নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় এবং পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গূঢ় রহস্য। পদ্য ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা গদ্যের আভাস আনিবার অন্যতম উপায়।

ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্ব্বটি পূর্ণ বিরামের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময় অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর হয়। যে স্থলে পর পর পর্ব্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যের-ই প্রাধান্য। পর পর পর্ব্বগুলি সমান না হওয়া কিম্বা কোন নক্সার অনুসরণে পর্ব্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাময়িক আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু বাক্যের শেষে পৌঁছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্ব্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গদ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধৃতাংশের পর্ব্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রথম বাক্যটির দুইটি পর্ব্বই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন। শুধু এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্ব্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব্ব থাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যে এইরূপ প্রতিসম বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং ইহাতে বিশিষ্ট গদ্যছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গদ্যছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্ব্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গদ্যসুলভ উত্থানশীল (rising) ছন্দের ভাব আসিবে। তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত শব্দের উপর ঝোঁক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্ব্বগুলি বিশিষ্ট গদ্যছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে (waved rhythm) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছন্দ-প্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপান্ত্য পর্ব্বে পৌঁছিয়া পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব্ব সন্নিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখা যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে। দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন উত্থানশীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়ই ছন্দ-প্রবাহের ঝোঁক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ যেমন ১০ম বাক্যে, পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। ক্বচিৎ প্রতিসম পর্ব্বের যোজনা দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যবহার গদ্যছন্দে খুব কম।

অন্যান্য আদর্শের ছন্দ-প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে।

পর পর পর্ব্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ সন্নিবেশের দিক্ দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের দিক্ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দারা সমান মাত্রার ও একই সঙ্কেতের দুইটি পর্ব্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য রক্ষা হইয়া থাকে।

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বিবাহ-বিধি

যে নিয়মে চন্দ্রসূর্য্য দেখা দেয়, বাতাস বহে, গাছে ফুল ফোটে, সেই নিয়মের শাসনেই মানুষের কাজ ও সমাজের গতি শাসিত হয়, ইহা বেশির ভাগ লোকে মানে না। আমাদের বিবাহ হয় নিজের ইচ্ছায়, না-হয় বড় জোর অভিভাবকদের ইচ্ছায়, আর স্বেচ্ছায় কত লোক অবিবাহিত থাকে; এ অবস্থা দেখিয়া অনেকে ভাবে এই যে চলিয়াছে সামাজিক বিধি যে, মেয়ে-পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্থায়ী জোড় বাঁধিতে হইবে আর সেই বৈধ নিয়মে জোড় না বাঁধিলে সন্তানেরা সমাজে আদৃত হইবে না, সে নিয়ম ইচ্ছা করিলেই উল্টাইয়া বা উঠাইয়া দিয়া সমাজকে কুশলে চালাইতে পারা যায়।

বিবাহ প্রথা যে এক সময়ে সুবিধার খাতিরে মানুষে চালাইয়াছিল, এই প্রবাদ অনেক দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন প্রবাদে পাই যে একদিন একজন ঋষি অস্থায়ী যৌন আকর্ষণে শ্বেতকেতুর মাকে শ্বেতকেতুর চোখের সাম্‌নেই ডাকিয়া নিলেন; শ্বেতকেতুর হইল লজ্জা ও ক্রোধ, আর তিনি তৎক্ষণাৎ এই অমোঘ বচন উচ্চারণ করিলেন যে, সমাজ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আর চলিবে না,—সকলকে বিবাহের আইন মানিতে হইবে। বিবাহটা নাকি সেইদিন হইতে চলিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ প্রবাদ পাই প্রাচীন মিসরে ও প্রাচীন চীনদেশে। গোড়ায় ছিল উচ্ছৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাচারিতা, তার পরে সামাজিক অবস্থার ফলে নানা দেশে নানা ধরণের বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথা ষাট সত্তর বছর আগে ইউরোপের কয়েকজন সমাজতত্ত্বজ্ঞেরাও বলিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতদের মতের সমালোচনার আগে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ইতিহাস দিতেছি, যে ভ্রান্ত ধারণায় মানুষে ভাবে যে, বিশ্বের সুসম্বদ্ধ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বের উপাদানগুলি ছিল অতি বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো অবস্থায় বা chaos রূপে; এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মিবার কারণ দেখাইতেছি।

মানুষে যখন ঘর বাঁধে তখন এখানকার কাঠ সেখানকার পাথর মাটি বহু চেষ্টায় ও শ্রমে কুড়াইয়া আনে; প্রায় সকল প্রয়োজনের কাজেই মানুষকে অনেক জোড়া-তালি দিয়া কাজ গুছাইয়া নিতে হয়। নিজেদের কাজ বা সৃষ্টিকে উপমেয় ভাবিয়া লোকে মনে করে যে এলোমেলো উপাদান জুড়িয়াই বিধাতাকে সুসম্বদ্ধ বিশ্ব গড়িতে হইয়াছিল। যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বের উপাদানের প্রকৃতি জানেন তাঁহাদের পক্ষে chaos কল্পনা করা অসম্ভব। ইথর বল বা শূন্যসাগর বল বা যে নামেই নামকরণ কর, দেখিতে পাইবে যে তাহারই মধ্যে অবিরাম কম্পন বা তরঙ্গ চলিয়াছে,

আর তাহার নির্দ্দিষ্ট বাঁধা গতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে বিদ্যুৎ-গর্ভ কুঁড়ি, যে কুঁড়ির বিকাশে জন্মিতেছে পরমাণু। এই পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম অণুতে অণুতে সেই ধর্ম্ম আজন্ম জড়াইয়া আছে, যাহার ফলে পরমাণুগুলিকে নিরন্তর বিশ্ব গড়িয়াই চলিতে হইবে,—অতি ক্ষুদ্র কাল্পনিক মুহূর্ত্তেও সে তাহার অঙ্গের নিয়ম বা ধর্ম্ম এড়াইয়া এলোমেলো অবস্থায় থাকিতে পারে না। আলো হউক, জল হউক হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই আদি অথবা অনাদিকাল হইতে আকর্ষণাদি নানা নিয়মে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়া চলিয়াছে। ঐ যে পরমাণু নিত্য আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে উহাদেরই এক ধরণের যোগে যে আমাদের উৎপত্তি, আমাদের আপন-পর বুঝিবার চৈতন্যের উৎপত্তি ও জীবনের সকল শ্রেণীর কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তির উৎপত্তি, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ভারতবর্ষ মাসিকে "মরণ ভোল" প্রবন্ধে দিয়াছি। উহার পুনরুক্তিতে পুঁথি বাড়াইব না।

এমন অনেক জীব আছে যাহাদের মধ্যে বিকাশের অল্পতার দরুণ সেই ধরণের চেতনা জাগে নাই যাহাতে আত্মবোধ জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া চলিয়াছে খাইয়া ও আত্মবংশ বাড়াইয়া চলিয়াছে আপনাদের শারীর উপাদানের টানে। শরীরে নানারকমের টান বা প্রবৃত্তি আছে আর সেই টান বা প্রবৃত্তির ফলেই তাহারা কাজ করে; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির টান আত্মজ্ঞানরূপে বিকশিত চেতনার আওতায় ঘটে না বলিয়া সেই ভাবের জন্ম হয় নাই, আমরা যে ভাবের নাম দিয়াছি ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি। উহারা ক্ষয়ের বা মরণের অবস্থার স্পর্শে আসিলে উপাদানের ধর্ম্মেই কোঁচ্‌কাইয়া দূরে যায়, আর স্থিতির অনুকূল অবস্থার স্পর্শে শরীর ফুলাইয়া অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের মত ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অনুভব করে না। এইজন্যই অন্য জীবের আলোচনা করিয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য তাহার অচ্ছেদ্য শিকড় কিভাবে রহিয়াছে আমাদের অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান-ধর্ম্মে জড়াইয়া। অর্থাৎ বুঝিয়া নিতে হইবে যে আমাদের কোন্ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে শরীর ও সমাজ ধ্বংস না করিয়া বদ্‌লাইতে পারা যায়, আর অন্যদিকে কিরূপ মৌলিক ব্যবস্থাকে বদ্‌লাইতে গেলে আমাদের ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়। তত্ত্বের খোঁজের গোড়ার কথায় সক্রেটিসের উপদেশ ছিল—know thyself, আপনাকে জান। এখানেও সেই কথা; জীবনের ও সমাজের কর্ত্তব্য বুঝিবার গোড়ায় আপনার উপাদানকে চিনিয়া নাও, আপনাকে চিনিয়া নাও।

জীব শ্রেণীর অতি নীচের স্তরে এমন অনেক জীব আছে যাহারা সারা শরীর দিয়া খায় ও পুষ্ট হয়, আর উপযুক্ত সময়ে তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া দুখানা হয় ও সেইরূপে দুইটি জীবের উৎপত্তি হয়। এই প্রথায়

ঐ জীবদের বংশ বাড়িয়া চলে। এই জীবদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের কোনও রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন নাই; তবু উহারা এক দলে এক সঙ্গে বাস করে। নীচের দিকের এমন অন্য একটু উচ্চতর জীব আছে যাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে আর বংশবৃদ্ধির জন্য স্ত্রীপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট কালে জোড় বাঁধে। আত্মজ্ঞানের চেতনাশূন্য এই জীবেরা কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে জোড় বাঁধে কি-না তাহা এখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ধরা যায় নাই; তবে যতটুকু জানা গিয়াছে, পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একে ত এই জীবগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চেহারা দেখিয়া একটিকে অপরটি হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখা কষ্ট; তাহার উপর আবার মানুষে যখন উহাদের গতি-বিধি পরীক্ষা করিতে বসে, তখন উহাদের স্বাভাবিক স্থিতির পদ্ধতি উল্টাইয়া যায়। মানুষেরা প্রায় জোর করিয়াই একটি পুরুষ জীবকে অন্য স্ত্রী জীবের সঙ্গে মিলায়; কিন্তু যদি ঐ জীবেরা মানুষের হস্তক্ষেপ না পাইত, তবে তাহাদের প্রাকৃতিক টানে কিভাবে একটি অন্যটির সঙ্গে জুটিত, তাহা ধরা যায় না। একথাটি কিজন্য বলিলাম, তাহা বুঝাইতেছি। এমন অনেক বড় বড় জীব আছে, যাহারা বন্য থাকিবার সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথায় জোড় বাঁধে, কিন্তু মানুষেরা যখন তাহাদিগকে গৃহপালিত করে, তখন আর সে নিয়ম পালিত হয় না। আমরা জোর করিয়া ঘোড়া, গরু প্রভৃতির পক্ষে প্রাকৃতিক ভাবে দল বাঁধিয়া থাকার সুবিধা উড়াইয়া দিয়াছি আর উহাদের বংশ-বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রয়োজনে যেমন খুসী তেমন করিয়া জোড় বাঁধিয়া দিই আর ঐ জন্তুরাও যৌন আকর্ষণে পরস্পরে মেলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন যে মানুষের শাসনে যাহারা প্রাকৃতিক অবস্থায় নাই ও যাহারা হইয়াছে degraded বা অধঃপতিত, তাহাদের দৃষ্টান্তে জীবের জোড় বাঁধিবার আইন ধরা কঠিন। তবুও গৃহপালিত পশুদের প্রাকৃতিক টান কিরূপ, তাহা যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বলিব। মানুষ জাতির মধ্যেও কোন কোন জাতি এমনভাবে কোণ-ঠেসা হইয়াছে যাহাতে তাহাদের নিজের দলের পুষ্টি ও প্রসার নষ্ট হইয়াছে। ইহারা দায়ে ঠেকিয়া যৌন আকর্ষণের টানে আপনাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে এমনভাবে জোড় বাঁধে, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের বেলায় অস্বাভাবিক। ইহারা যে এই দায়েপড়া অবস্থার জন্য ধ্বংসের পথে চলিতেছে সে দৃষ্টান্ত পরে দিব। এখানে শুধু এইটুকু বক্তব্য যে এই সকল দৃষ্টান্তের অল্প উল্লেখের পর অন্যান্য জীবের মধ্যে লক্ষিত সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত দিতেছি সেই নীচের স্তরের জীবের যাহাদের আত্ম-জ্ঞান অস্পষ্ট, আর যাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে। পণ্ডিত

Maupas এই শ্রেণীর জীবদের কয়েকটি বংশে ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন যে যদি উহাদের এক স্থানের দলের জীবেরা অন্য স্থানের দলের জীবদের কাছে যাইতে না পায়, আর যদি এক স্থানের স্ত্রী-জীবদের সঙ্গে দূরের অন্য পুরুষ-জীবদের জোড় বাঁধা না ঘটিতে পায় তবে ঐ জীবেরা ক্ষয়ের পথে বা মরণের পথে অতি শীঘ্র অগ্রসর হয়। এই জীবদের অপেক্ষা খানিকটা উন্নত মৌমাছিদের সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে এক চাকের মাছিরা অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখে, যদিও অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া বাস করে না। নিজের দল ছাড়িয়া অপরিচিত অন্য দলের জীবদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাই যে জীব-সাধারণের মধ্যে সাধারণ নিয়ম, তাহাই অনুসন্ধানের ফলে নিত্য নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গৃহপালিত পশুদের অধঃপতিত অবস্থার কথা ও মানুষের ইচ্ছায় তাহাদের ক্ষণিক যৌনসম্বন্ধ-স্থাপনের কথা বলিয়াছি। যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই পশুদের শরীরের ও গুণের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী তাঁহাদের মধ্যে এবিষয়ে কোনও মতভেদ নাই যে, যেখানেই যত কাছাকাছি রক্ত সম্পর্কে পশুদের যৌন সম্পর্ক হয় সেখানেই পশুদের বংশে তত পরিমাণে ক্ষয় দেখা দেয়। আবার ইহাও সযত্নে লক্ষ্য করিবার জিনিস যে কাছাকাছি রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও এক পালের পশুরা আপনাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইতে না পারিলেই অধিক সুখী হয়, আর অপরিচিত সমজাতীয় পশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অধিক হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ Heape লিখিয়াছেন—All breeders will agree that animals when brought into contact with strangers experience increased sexual stimulation। অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

এবারে দিব পক্ষী-জাতির মধ্যে জোড়-বাঁধার দৃষ্টান্ত বা স্থায়ী বিবাহের দৃষ্টান্ত। যে সকল পণ্ডিত অতি নিপুণভাবে পক্ষী-জাতির আচরণ-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Marquis de Brisay, Brehm ও Hermann Muller-এর পাকা অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনাইব। আমরা সকলেই লক্ষ্য করি যে পাখীরা তাহাদের জাতি অনুসারে দল বাঁধে আর এক সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ও এক গাছে রাত্রি কাটায়। যাহাকে বলে কাজের বেলায় সহযোগিতা পাওয়া, ইহাদের মধ্যে তাহার ত কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উড়িতে শিখিবার পর যে যাহার নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে ও বিপদে পড়িলে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তির পথ খোঁজে। যৌন আকর্ষণে

যে এক-এক জোড়া পাখীকে কাছাকাছি থাকিতে হয়, তাহাও ত বছরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কালে ঘটে। তবুও পক্ষী-জাতিদের বেশির ভাগ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে ও ঝাঁক বাঁধিয়া ওড়ে। আমরা এক জাতির এক পাখীকে অন্য পাখী হইতে আলাদা করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারি না, তাই কি নিয়মে কে কাহার সঙ্গে জোড় বাঁধে তাহা ধরিতে পারি না। আন্দাজে ভুল করিয়া ভাবি যে এক জোড়া পাখী এক বাসায় যে এক জোড়া ডিম পাড়িল তাহারই পুরুষ ও মেয়ে ছানা বড় হইবার পর বুঝি এক সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষরূপে জোড় বাঁধে। যে সকল পণ্ডিতদের নাম করিয়াছি তাঁহারা নিপুণ পরিদর্শনে দেখিয়াছেন যে মুরগী জাতীয় ও আর দু-একটি জাতীয় পাখী ছাড়া পাখীদের মধ্যে ভাই-বোনে জোড় বাঁধা নাই। পাখীরা বড় হইয়া যখন দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায় তখন এক বাসার পাখীরা অপরিচিত অন্য বাসার পাখীদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। একবার জোড় বাঁধিবার পর বা বিবাহ হইবার পর ইহাদের বিবাহ ভঙ্গ হয় না ও আশ্চর্য্য এই যে জোড়ার একটা মরিয়া গেলে অপরটি অনেক সময়েই সারা জীবন বিবাহ করে না। Captain Forsyth একবার সম্বলপুরের পশ্চিমভাগে একজোড়া চখা-চখী দেখিয়া গুলি করিয়াছিলেন ও তাঁহার গুলিতে একটি মরিয়াছিল। অপরটির দুঃখ-যাতনা দেখিয়া সেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একুশ দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। তিনি ঘুরিয়া দেখিয়াছিলেন যে বিপত্নীক বা বিধবা পাখীটি নদীর চড়ায় চখা-চখীদের দলের কাছে অথচ দল হইতে দূরে একা বসিয়া থাকিত। ঘুঘুদের ও পায়রাদের জোড় বাঁধা ও প্রেমের কথা আমাদের দেশে অনেকে আন্দাজে খানিকটা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমের একনিষ্ঠ আকর্ষণে যে একা মানুষেরাই ধন্য নয় তাহা এক পণ্ডিতের ইংরেজী উক্তিতে এইভাবে আছে—This absorbing passion for one is not confined to the human race। পক্ষী জাতির মধ্যে অসম্পর্কিত বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া পণ্ডিত Brehm বিস্ময়ে বলিয়াছেন যে যথার্থ একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy) পক্ষী জাতিতেই সর্ব্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার উক্তিটি ইংরেজীতে এইরূপ আছে—Real genuine marriage can only be found among birds।

শরীরের স্বাভাবিক টানের আগ্রহকে চেতনার মধ্যে ইচ্ছারূপে সাজাইয়া হউক আর নাই হউক জীবদের মধ্যে এই যে বিবাহের গতি ও পদ্ধতি চলিয়াছে তাহার অচ্ছেদ্য মূল শরীরের সেই উপাদানের ধর্ম্মে চলিয়াছে, যে উপাদানের নাম জৈবনিক বা germplasm। এই জৈবনিক নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলের জীবনে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভিত্তি ;

ঐ ভিত্তিকে না বদ্‌লাইলে অর্থাৎ শরীরকে না মারিয়া ফেলিলে ঐ টান ও টানের পদ্ধতিকে কাহারও বদ্‌লাইবার সাধ্য নাই। জৈবনিকের এই লীলা নানা ইতর জন্তুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল; এখন দেখিব সেই জীবদের আচার যাহারা মানুষদের পূর্ব্বপুরুষদের একটু দূর সম্পর্কে পিতৃব্য ও ভ্রাতৃব্য স্থানীয় অর্থাৎ শিম্পাজী, গরিলা প্রভৃতি কিম্পুরুষ বা বনমানুষদের আচারের উল্লেখ করিব। শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি যে জীবনে স্থায়ী জোড় বাঁধে ও এক এক পরিবার সন্তান-সন্ততি নিয়া একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়া থাকে ও নানাস্থানে বিচরণের সময়েও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরা বড় বড় সন্তানগুলিকে সঙ্গে করিয়া বেড়ায়, ইহা সকল পরিদর্শকেরাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সংস্কার নীচ জীব হইতে কিম্পুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শরীরে ও মনে বদ্ধমূল, তাহা যে কিম্পুরুষদের কিঞ্চিৎ দূর সম্পর্কিত আদি মানবের সহজজ্ঞান বা সংস্কাররূপে স্থায়ী ছিল, তাহা স্বীকার না করিবার যুক্তি পাওয়া যায় না। আদিম কালের মানুষের খাঁটি আদিম সমাজ আর নাই,—তাহাদের উত্তরাধিকারীদেরও সমাজ অনেক লক্ষ বছর আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আচার প্রভৃতিও পরবর্ত্তী সময়ে পরিবর্ত্তিত সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়; তবে যে ধারা জৈবনিকের ধর্ম্মে সারা জীবশ্রেণীতে বহিয়া আসিয়াছে তাহা যে জৈবনিকে গড়া মানুষের উত্তরাধিকারক্রমে চলিয়া আসে নাই, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

মনুষ্যেতর প্রায় সকল জন্তুর মধ্যেই সন্তান-সঞ্চার করাইবার এক-একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বা ঋতু আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে এই কাল বা ঋতু সারা বছর ধরিয়াই চলে, বলিতে পারা যায়। অন্য জন্তুর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে যে কেবল নির্দ্দিষ্ট কালে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইলেই চলে, কিন্তু মানুষের বেলায় একেবারেই তাহা নয়। তবুও দেখা যায় যে অন্য জীবেরা নির্দ্দিষ্ট কালে মিলিবার সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া আলাদা আলাদা থাকে না; একেবারেই যৌবনে স্থায়ী জোড় বাঁধিয়া চলে ও প্রয়োজনের বেলায় সেই জোড়-বাঁধা জীবেরাই বংশ বৃদ্ধি করে, আর অনিশ্চিতভাবে উপযোগী ভবিষ্যৎ মিলনের পথ চাহিয়া থাকে না। সন্তান পালনের কাজের সময়টুকু পর্য্যন্ত নীচের শ্রেণীর সকল জীব জোড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকে না,—সারা ভবিষ্যতের জন্য জোড়-বাঁধা বজায় রাখে। কাজেই মানুষের বেলায় বিশেষ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে যাহারা প্রতিনিয়ত যৌন আকর্ষণের টান অনুভব করে ও যাহাদের পক্ষে অনেক বছর ধরিয়া সন্তান পালনের কাজ চালাইতে হয় তাহারা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত উপযোগী মিলনের অনিশ্চিত আশায় না থাকিয়া যৌবনেই পাকা জোড় বাঁধে বা স্থায়ী বিবাহ

করে। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে প্রাণের টান বা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপে মানুষে স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গী পাইতে পারে না বা সন্তানদের রক্ষক পাইতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুন্নত ও উন্নত মানব-সমাজ পরিদর্শন করিয়া সমাজের ক্রমবিকাশের যে আইন বা নিয়ম কিছুদূর পর্য্যন্ত ধরা গিয়াছে, সেই নিয়মের আলোকে মানুষের বিবাহ-পদ্ধতির বিকাশ ও বিচিত্রতার আলোচনা করিতেছি। বিবাহের সংস্কার ও পরিবার-পালনের সংস্কার যে আদিম মানুষ পাইয়াছিল উত্তরাধিকারসূত্রে, অর্থাৎ সুবিধার বিচার করিয়া কোন এক সময়ে নূতন প্রথা গড়ে নাই—তাহা স্বীকার করিবার অনুকূলে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এবারে প্রথমে মানুষের যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তির বিশিষ্টতার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আগেকার কালে মানুষেরা যখন বনে পাহাড়ে স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিত অথবা অল্প পরিমাণে চাষের কাজ করিতে শিখিয়াছিল, তখন এক-একটি পরিবারের পোষণের জন্য অতি অধিক স্থানের প্রয়োজন হইত। একটা বড় জেলার মত আয়তনের স্থান অল্প কয়েকটি আলাদা-আলাদা পরিবারের পক্ষে হয়ত যথেষ্ট হইত না; কাজেই একটি পরিবার হইতে অন্য পরিবার অনেক দূর দূরে বাস করিতে বাধ্য হইত। কোন একটা বিশেষ বড় বনে শিকারের কাজে সফল হইবার জন্য যখন অনেক লোকের প্রয়োজন হইত, তখন অনেক স্থানের অনেক মানুষকে এক সঙ্গে জুটিতে হইত ও শিকারের পরে আপনাদের ভাগ নিয়া যে যাহার দূর স্থানে চলিয়া যাইত। ঠিক এই রকমে দূরে দূরে বাস করা ও সময়ে সময়ে মেলার প্রথা এখনও উড়িষ্যার জঙ্গলের পাবুদিয়া ভুইঞাদের মধ্যে আছে ও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জুয়াঙ্গ প্রভৃতি ক্ষয়শীল জাতির মধ্যে ছিল। ইহা আমার নিজের দেখা কথা। কি ভাবে এক-একটি গ্রামে কেবল একটি পরিবারের এক ঘর মানুষকে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা ১৮৮৫ অব্দে তখনকার 'পতাকা' নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। অতি প্রাচীনকালে এই ধরণের স্থিতির সময়ে তরুণ-তরুণীরা যৌন আকর্ষণে পড়িত তখন, যখন দৈবে অপরিচিত স্থানের তরুণী-তরুণদের সঙ্গে দেখা-শোনা হইবার সম্ভাবনা হইত। মনের প্রকৃতির কিরূপ মৌলিক অবস্থার ফলে, দূরের অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার উপর যৌন-অনুরাগের বিকাশ নির্ভর করিত, তাহা বুঝিয়া নিতে হইবে।

শিশুরা মা-বাপের আশ্রয়ে 'যখন বাড়ে, তখন মা-বাপের মনে যে শ্রেণীর দয়া-মিশ্রিত স্নেহ জন্মে তাহা যে অন্য সম্পর্কের স্নেহ-মমতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর সেই ধাতুর স্নেহের সহিত যে অন্য ধাতুর মমতার আকর্ষণ

জুড়িতে পারে না তাহা সকল বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করেন ও সাধারণ সকল লোকেই স্বীকার করিবে। অন্যদিকে অসহায় অবস্থায় যে ধরণের স্নেহ-মমতায় শিশুরা বাড়িয়া উঠিবার সময় মা বাপের প্রতি প্রাণের গভীর টান বাড়াইয়া চলে, সেই টানের বা আকর্ষণের ধাত্ বা ধাতু অন্য যে কোন ধরণের আকর্ষণের প্রকৃতি হইতে এত স্বতন্ত্র যে স্বাভাবিক নিয়মে সে আকর্ষণের গায়ে অন্যবিধ আকর্ষণ লাগিতেই পারে না। এই কথাটিও সর্ব্ববাদিসম্মত ও মনস্তত্ত্বের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বীকৃত। তবুও ইহার উল্লেখ করিতে হইল এই জন্য যে ফ্রয়েড্ ও তাঁহার দুই-একজন চেলা ইহার বিরুদ্ধে একটি কুপরীক্ষিত কথা বলিয়াছেন। এখানে সে তর্ক তুলিব না; তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে অনেক বড় বড় দক্ষ পণ্ডিতেরা ঐ মতের অসারতা ও ভুল ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। বাপ-মায়ের প্রতি মনের যে ভাব সৃষ্টি করিয়া ও পুষিয়া শিশুরা যৌবনের সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে, সেই ভাবের গায়ে (আর কিছু না হউক, কেবল অধিক পরিমাণে বয়োধিকদের প্রতি) এমন ভাব আসিয়া জোড়া লাগিতে পারে না যে ভাবের প্রথম অঙ্কুর হয় যৌবনের বিকাশে। ফ্রয়েড পরীক্ষা করিয়াছেন বিকৃত মস্তিষ্কদের মনের অবস্থা, আর সে পরীক্ষাও হইয়াছে অতি কুপরীক্ষিত। অন্যান্য অনুরাগের প্রাকৃতিক বিকাশের ইতিহাসে পাঠকেরা এই মতবাদের অসারতা পরিপূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই অনেক নীচ শ্রেণীর জীবদের জোড় বাঁধার প্রকৃতির আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি যে যৌন আকর্ষণ বাড়ে অপরিচিত বা stranger-কে দেখিয়া, ও নিজের দল বা বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াই বহু শ্রেণীর জীবকে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। যদিও পৃথিবীময় সকল জাতির সকল সমাজেই এই অভিজ্ঞতা ও সংস্কার আছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে কখনও ভাই-বোনে প্রেমের আকর্ষণ জন্মে না, তবুও Westermarck প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে ভাই-বোন ত অতি দূরের কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুরা যাহাদের সঙ্গে অতি পরিচিত, যাহাদের সঙ্গে একত্র খেলা করিয়া বাড়িয়াছে তাহাদের প্রতিও যৌন আকর্ষণ জন্মে না। যৌন আকর্ষণ যে যৌবনে অপরিচিতের নূতন মুখ দেখিয়া প্রথম জন্মে, আর ঐ ভাব যে সঙ্গীদের প্রতি সঞ্চারিত স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ অননুরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় Havelock Ellis এইরূপ লিখিয়াছেন—Between those who have been brought up together from childhood all the sensory stimuli of vision, hearing and touch have been dulled by use, trained to

the calm level of affection, and deprived of their potency to arouse erethistic excitement which produces sexual tumescence। এই সকল কারণেই যাহাকে বলে incest বা অবৈধযোগ তাহার প্রতি মানুষের আছে স্বাভাবিক গভীর ঘৃণা, যাহাকে পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে বলিয়াছেন deep-seated natural aversion।

যৌবনের প্রথম বিকাশে প্রেমের নূতন ভাব বাড়ে নূতন মুখ দেখিয়া। যুবকের চোখে তখন নূতন যুবতী রক্ত-মাংসে গড়া জীবের কিছু উপরে; she is a phantom of delight—সে আনন্দের মানস-প্রতিমা। একসঙ্গে বাসের প্রয়োজনে এই আকর্ষণের কথা বাপ-মাকে জানাইতে হয়, কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম এই যে একথা নিয়া তরুণ-তরুণীরা দশজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারে না; নিজেদের কথা গোপনে রাখে, যেযুগে এদেশে প্রেমে পড়ার প্রকৃতি সামাজিক অবস্থার দরুণ জানা ছিল না, সেই যুগের কবিতাতেই রাধাকে 'সখি রে, সখি রে' বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে দেখি। মানুষের প্রকৃতিতে যে এই ব্রীড়া স্বাভাবিক, তাহা এ প্রসঙ্গে অন্য কথা বুঝিবার সময়ে প্রয়োজন হইবে। Companionate Marriageএর অবৈজ্ঞানিক জজ্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে মেয়েরা তাহাদের একাধিক পুরুষ-সেবার গোপন প্রেম-লীলার কথা অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিয়াছে। এই মেয়েরা যে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা আত্মব্যবহারে ধ্বংস করিয়া লজ্জা ছাড়িয়াছে তাহা প্রেমের ভাবের বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। জজ্ গ্রন্থকার যৌন সম্পর্কের লজ্জার ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি অনায়াসে যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন লেখকের সমক্ষে নগ্ন হইতে পারেন। এই উক্তিটুকুই প্রমাণ করিতেছে যে তিনি স্বাভাবিক প্রেম-বিকাশের ও লজ্জার উৎপত্তির ইতিহাস একবিন্দুও জানেন না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি নিভৃত জঙ্গলেও অসভ্য জুয়াঙ্গেরা গাছের পাতা গাঁথিয়া পরিয়া চিরকাল লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। বিবাহের ইতিহাসের প্রসঙ্গে এবিষয়ের পূর্ণ বিচার এখন না করিলেও চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিকাশে যে নূতনত্বটুকু হয় প্রেমিকদের প্রার্থনীয় ও আকর্ষণের বস্তু, তাহার সঙ্গে এই লজ্জার ভাবও অনেকখানি জড়াইয়া আছে।

আমাদের সমাজে বিবাহ হইত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার পূর্ব্বেই—শৈশবে; 'বিবাহ হইত' লিখিয়াছি এইজন্য যে এখন সর্দা আইন পাস্ হইয়াছে। শৈশবে বিবাহ হইবার পর বৌকে আসিয়া থাকিতে হইত স্বামীর বাড়ীতে বা শ্বশুর বাড়ীতে; যে কারণেই হউক নিয়ম ছিল ও আছে যে, বৌকে সর্ব্বদাই ঘোম্টা দিয়া চলিতে হইবে। পরোক্ষভাবে ইহাতে এই উপকার হইত যে স্বামীটি বাড়ীর বোনেদের মত বাল্যেই তাহার স্ত্রীকে

সর্ব্বদা কাছাকাছি পাইয়া তাহার প্রতি যৌন আকর্ষণের ভাবটুকু নির্ম্মূল করিতে পারিত না ; ঘোম্‌টায় নূতনত্ব রক্ষা করিত। নূতনত্বে আকর্ষণ জন্মে, ইহা প্রায় সকলেই বুঝি ; কাজেই এ বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা করিব না।

অল্প পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আদিমকালের সমাজে যখন এক-এক পরিবারের লোক আপনাদের দলের অন্যান্য পরিবারের বাসস্থান হইতে দূরে বাস করিত, তখন তরুণ-তরুণীরা কোন-কোন প্রয়োজনে আপনার বাসগৃহ হইতে দূরে গিয়াই প্রেমে পড়িবার সুবিধা পাইত। আকর্ষণ পাকা হইলে যখন বিবাহ হইত তখন বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবারের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে বরকে বা তরুণ পতিকে হয় তাহার মা-বাপের ঘরে পত্নীকে আনিয়া বাস করিতে হইত, না হয় শ্বশুরের ঘরে গিয়া থাকিতে হইত, আর না হয় ত নিজে একখানি নূতন গ্রাম বসাইবার মত নিজের বাসভবনের কিছু দূরে পত্নীকে নিয়া নূতন ঘর-সংসার পাতিতে হইত। যে-যে বিভিন্ন অবস্থায় এই ভিন্ন-ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা হইত, তাহা এখানে খুঁটাইয়া না বলিলে চলে। এই যুগের তরুণ-তরুণীরা এমনভাবে আপনাদের ঘর-সংসারের কাজে লাগিত, যাহাতে দূরের অন্যান্য পরিবারের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে (কালে-ভদ্রে ছাড়া) মিলিয়া মিশিয়া আলস্যে সময় কাটাইবার বা দীর্ঘ সময় ধরিয়া গল্প-গাছা করিবার সময় পাইত না। যেখানে তরুণ-তরুণীরা আলাদা নূতন সংসার পাতিত সেখানে ত দিন-রাত্রি নিজেদের কাজে সময় কাটাইত। তাহার পর ঘাড়ে পড়িত শিশু-সন্তান পালনের ভার। না ছিল তখন একালের মত যখন-তখন অপরিচিতদের সঙ্গে বৈঠক বসাইবার সুবিধা, আর না ছিল কাজকর্ম্মে ব্যাপৃতদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমে যৌনভাবের নূতন-নূতন উত্তেজনা পাইবার সুবিধা। সময়ে-সময়ে আনন্দের উৎসবে নানা দলের লোকে মিলিত বটে, কিন্তু এই সকল নানা-বয়সী লোকের দঙ্গলে উপরে লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিতে পারিত না। ঐ উৎসবের সময়ে নূতন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তাহারা সুবিধামত দেখা-শোনা করিয়া প্রেম বাড়াইত, কিন্তু যাহারা বিবাহিত হইয়া নিজেদের নূতন দায়িত্বের কাজে লাগিত তাহারা কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া নূতন প্রেম বাধাইবার প্রবৃত্তি ও সুবিধা পাইত না। অতি সেকালের এই সকল অবস্থার চাপে (স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেও বটে) সমাজের প্রথম যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথাই (monogamy) বিকশিত হইয়াছিল। বেরার প্রদেশের সীমান্তে সাতপুরা পাহাড়ের কুর্কু সম্প্রদায়ের লোকেরা ও সম্বলপুর রাঁচী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রদেশে ঐ কুর্কুদের জ্ঞাতি মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকেরা সর্ব্বদাই একনিষ্ঠ বিবাহ-

রীতি চালাইয়া আসিয়াছে; কেবল রাঁচী অঞ্চলে হিন্দুদের প্রভাবে ক্বচিৎ-ক্বচিৎ ঐ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই জাতির লোকেদের বিবরণ আমি যে গ্রন্থে লিখিয়াছি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে আদিম জাতির গতি-বিধির অনেক কথা আছে।

একালের উন্নত ও জটিল সমাজে স্ত্রী পুরুষে যেভাবে ঘরে বসিয়াই সুড়সুড়ি দেওয়া সাহিত্য পড়িয়া ও অন্য দশ রকমে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে, সে অবস্থা যখন ছিল না তখনও প্রবল জাতির পীড়ন-প্রভৃতিতে অনেক স্থানের অসভ্য জাতির লোকেরা নিতান্ত কোণ-ঠেসা হইয়া পড়িয়া স্বাভাবিক বিকাশের সুবিধা হারাইয়া যৌনসম্বন্ধে অনেক স্বৈরাচারের ও দুরাচারের হাতে পড়িয়াছে। এ বিষয়ে মেলানেসিয়ার দৃষ্টান্ত অতি উপযোগী। বিখ্যাত পণ্ডিত মালিনওস্কি উহাদের স্বৈরাচারের বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; কিন্তু ঐ মনীষী গভীরভাবে সকল অবস্থা বুঝিয়া লিখিয়াছেন যে এখনও উহারা স্থায়ী বিবাহকেই জীবনের আদর্শ মনে করে ও অনেক দুরাচারের মধ্যেও একনিষ্ঠ বিবাহের আদর্শকে যথার্থ আদর্শ মনে করে। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম যুগে স্বাভাবিকভাবে একনিষ্ঠ বিবাহই জন্মিয়াছিল আর ঐ প্রথাই মানুষের মনে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আদর্শরূপে রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হরবর্ট্ স্পেন্সর সমাজতত্ত্ব লিখিবার সময়ে ভুলভাবে সংগৃহীত স্বেচ্ছাচারের বিবরণই বেশি পাইয়াছিলেন; তবুও গভীরভাবে সকল অবস্থার বিচার করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন যে, মানব সমাজের গতি একনিষ্ঠ বিবাহের দিকে ও মানুষেরা ভবিষ্যতে ঐ বিবাহপ্রথা পাইয়াই ধন্য হইবে।

সমাজের কি-কি অবস্থায় প্রাচীনকাল হইতেই নানাস্থানে একনিষ্ঠ বিবাহের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার আলোচনাতেও একনিষ্ঠ বিবাহের স্বাভাবিকতা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কোথাও দেখা দিয়াছিল ও এখনও চলিয়াছে বহুপত্নীগ্রহণের বহু বিবাহ, আর কোথাও চলিয়াছিল ও চলিতেছে বহুপতিত্ব। এই সকল প্রথার উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে যে, সামাজিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ বিবাহই শ্রেষ্ঠতম কি-না ও একালের কোন-কোন সভ্য সম্প্রদায়ের মতের অনুসারে বিবাহ-প্রথা উড়াইয়া দিয়া বা শিথিলতর করিয়া মানুষের সমাজ রক্ষা করা চলে কি-না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ *

হর্বর্ট্ স্পেন্‌সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জ্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত : একপাতা ছাপা গদ্যের চারদিকে যে পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ ; হয়তো সেইজন্যেই ওই ধরণের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা না-কেটে, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে! কিন্তু প্রণালী-দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট হোকনা কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারিনি ; বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার পরিপূর্ণ সঙ্গমই সাহিত্য-তীর্থ-নামে বিদিত। এ-মতটি প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত ব'লে বোধ হয়, তব্ এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। গদ্যবিলাসীরাও লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধিবিবেচনার পাহারা এড়িয়ে, একেবারে তাঁদের অন্দরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন তার থেকে কাব্যকে পৃথক করা কেমন যেন আর সার্থক মনে হয়না। কাব্যামোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী। প্রায়ই এমন কবিতা তাঁর হাতে এসে পড়ে, যার মধ্যে, ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মিলেনা, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্ম্মুহু উঁকি পাড়তে থাকে। এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই, সেখানে গদ্য পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা এবং কার্য্যকারণের সুসঙ্গতি। এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, সেকালে, আমার মতে, গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের্-এর একজন নায়ক শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না-জেনে গদ্য ব'লে আসছেন। আমাদের মতো আষ্টপ্রহরিক মানুষেরা হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যতবার কবিতায় কথা বলি, তার তালিকাও কিছু কম বিস্ময়কর হবেনা।

উপরে যা বললুম তাতে গদ্য-পদ্যের ঐক্য প্রমাণিত হলোনা জানি ; এবং সে-চেষ্টাও আমার নেই, কারণ সকল সভ্য মানুষই এদের দ্বৈধ স্বীকার ক'রে এসেছে। যতদূর মনে পড়ে, এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহকরূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায়।

---

* পরিশেষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)
পুনশ্চ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

এবং আমি যেহেতু ভাষার অতিমর্ত্ত্যতা মানিনা, মনে করি মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ের মতো ভাষাও আবশ্যিকতার চালনে গ'ড়ে ওঠে, তখন আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে এ-দুটো অভিধার মধ্যে অর্থের বৈষম্য সহজ ব'লেই ওদের আক্ষরিক চিহ্ন বিভিন্ন হয়েছে। কিন্তু গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব এসে পড়ে, তখন আর এই সুনির্দ্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকেনা; তখন তারা তাদের স্বকীয় মূলধন একত্র ক'রে যে-যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা। কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গে আজ বোধহয় আর মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তার মধ্যে আর প্রতর্কের স্থান থাকেনা। সে-পরিচয়ের বাচনিক অভিব্যক্তি হয়তো নেতি নেতি হতে পারে, কিন্তু তার কেন্দ্র নঙর্থক নয়, একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু অজ্ঞেয় সে কোনোকালেই নয়। কথাগুলো হয়তো মরমীদের অতিশয়োক্তির মতো শোনাচ্ছে; কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটার সঙ্গে কার্য্যত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত,—প্রায় সকল জাদুকরই তাদের ভেল্‌কিবাজি সম্পন্ন করে এই উপায়ে। ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতীর শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে এমনি অসূর্য্যম্পশ্য ক'রে তোলে যে তাকে অলৌকিক ভাবা ছাড়া মোহমুগ্ধ দর্শকের গত্যন্তর থাকেনা। সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে দর্শক বা পাঠকের মনে একটা আবিষ্ট তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, যেটা স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ। এই ধরণের অর্দ্ধসুপ্তি সঞ্চারণ ক'রেই সাপুড়ে আনে সাপকে বশে, হিষ্টিরিয়া রোগীকে হিপ্‌নোটিষ্ট্‌ চালায় স্বাস্থ্যের পথে, কারণ এ-অবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর অনিকামতা, এর বাধ্যতা ও ব্যঞ্জনা-প্রবণতা। তবে পালনীয় আদেশমাত্রের যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তার ব্যতিক্রম চলেনা,—অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আজ্ঞাকারীর মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আজ্ঞায় সহজবোধ্য নিশ্চয়তা একেবারেই অপরিহার্য্য। কাব্যের গদ্যময় অংশ এই প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাপৃত থাকে, এবং পদ্য নেয় পূর্ব্বোক্ত সমাধি উৎপাদনের ভার। Cover her face, mine eyes dazzle, she died young—জাতীয় একটা নিরালম্ব পঙক্তি যদি হঠাৎ বাস্তব জীবনে শোনা যায়, তবে তাকে পাগলের প্রলাপ ব'লে মনে হ'লেও হতে পারে। কিন্তু এই লাইনের অহৈতুক প্রভাব নিয়ে অরসিকেরা যখন হাসাহাসি করেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে ওয়েব্‌ষ্টর কেবল ওই কটা কথাকে পরপর সাজিয়েই ক্ষান্ত হননি, ওই বাণী যাতে

দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাও করেছেন পূর্ব্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচনারীতিও অনুরূপ। সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতেই অতিবাহিত হয়। তার পরে যখন পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে তন্দ্রালু হয়ে পড়ে, তখন আসে কবির দুর্নিবার্য্য প্রত্যাদেশ—Absent thee from felicity awhile। ততক্ষণে তার অন্তরের সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সুতরাং তখন এই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটাকেই পাঠক ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ব'লে ভাবতে বাধ্য; সে মনে করতে বাধ্য যে হ্যাম্‌লেটের চিরপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্কেও, কিছু দিনের জন্যে নয়, চিরকালের মতো, যবনিকাপতন হলো।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্ত্তব্য হ'লেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অমূলক। তবে এক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত; কিন্তু গদ্য সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধান মানেনা। এই স্বাধীনতার দরুণ গদ্যের কোনো লোকসান হয়নি, একথা বললে অন্যায় হবে কিন্তু এতে ক'রে তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছে, তাও একান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাকনা কেন, ললিত কলায় এখনো অর্থই অগ্রগণ্য; এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই কনিষ্ঠ হয়েও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে আজ পদ্যের অগ্রণী। অবশ্য পদ্য এখনো একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েনি, ভাবের ছায়াময় রাজ্যে আজও সেই পুরোধা; এবং যৌবন-সুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালেভদ্রে এই রাজত্বের সীমানায় এসে পড়ে, তখন তাকেও জ্যেষ্ঠের কাছ থেকেই এখানকার হালচাল-সম্বন্ধে উপদেশ নিতে হয়। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন সুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। জগৎ এক স্তরে ঢালাই করা হয়নি; তার মৌলিক তত্ত্ব জানতে হ'লে হয়তো সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই ব'লেই, উপরের স্তরগুলো অবজ্ঞেয় নয়, বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং জীবনের দর্পণ হয়ে ওঠাই যদি কাব্যের চরম সার্থকতা হয়, তবে সেই প্রতিবিম্বে স্থূল স্তবকগুলোরও স্থান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বলাই বাহুল্য যে গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্ম্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই

রচিত হতে পারেনা। তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনো বাচবিচার নেই, যাতে খুসিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্ম্মিত আধারটির নামই মুক্তচ্ছন্দ—Free Verse। এতে নূতন পুরাতন সকল বয়সের সুরাই ইচ্ছামতো মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাট্‌বারও কোনো ভয় থাকেনা। এ-ছন্দকে উপলক্ষ্যের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো যায়, আবার অবস্থান্তর ঘটলে গদ্যের দীর্ঘায়িত গম্ভীর গতিও এতে বেমানান হয়না। ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেনি বটে, কিন্তু তাই ব'লেই যে সময়ে সময়ে গৈরিকধারণ করেনা এমন কথা বলতে পারিনা। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে ওর অঙ্গে তিলার্দ্ধ স্থান অনাবৃত নেই। ওর কণ্ঠে "সাধারণ মেয়ে"-র সুস্থ সরল উক্তিও যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, "বিশ্বশোক"-এর মহানুভবতাও তেমনি শোভন লাগে। ওর প্রশস্ত পথে "ছেলেটা"-ও খেলে বেড়ায়, আবার "শিশুতীর্থ"-এর যাত্রীরাও মিছিল ক'রে এগিয়ে চলে। ওর প্রাঙ্গণে "মাঝে মাঝে মরচে-পড়া কালো মাটি"-র সীমান্তেই দেখা যায় "রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী রুষ্টরুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো"। অল্প কথায় ওর "গর্জ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরলতালে" শোনা যায় "চিরকালের স্তব্ধতা আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।" ভাষার সহজ বৈচিত্র্য এ-ছন্দকে শক্তি যোগায়, তাই সহস্র স্বৈরাচরণের মধ্যে সে কেবল এইটুকুর হিসাব রাখে যে তার লম্ফঝম্পে যেন অর্থগৌরবের কোনো হানি না-হয়। এই কারণেই হয়তো গদ্যের সঙ্গে এর বেশি মিল, কিন্তু তাহলেও পদ্যের সঙ্গে এর অহি-নকুল সম্বন্ধ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনেও পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর, এমন-কি হয়তো এতদূর পর্য্যন্ত বলা যায় যে এতে যে-গদ্য ব্যবহৃত হয়, তাও একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে ; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্বসিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্ম্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দের প্রশস্তি প'ড়ে, অনেকেই হয়তো বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পের দান, সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আর কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠেনি? বলাই বাহুল্য আদিকবিরা তাঁদের কাব্যে জীবনকে যে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন, অর্ব্বাচীনেরা তার ত্রিসীমানাতেও পৌঁছতে পারেনি। অবশ্য এই বৈকল্যের

জন্যে আধুনিক লেখকদের দায়ী করা হয়তো অনুচিত; এমন হতে পারে যে ইতিমধ্যে জীবন এত বহুলাঙ্গ হয়ে পড়েছে যে কোনো একটা রচনায়—এমন-কি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তাকে চিত্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু দোষ যদিও বা সদ্যস্তন লেখকদেরই হয়, তবু তাদের পদ্ধতি সত্যসত্যই নিরপরাধ। পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের সঙ্গে মুক্তচ্ছন্দের তুলনা করলে, কোনো দ্বন্দ্ব ধরা পড়বেনা ব'লেই আমার বিশ্বাস। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে জগৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকেনা, কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে। অচেতন বিবর্ত্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসরব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্ত্তমান কাব্যের বহিরেখায় যদি অল্পাধিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তবে বিস্মিত হওয়া অসঙ্গত। আসলে সাহিত্যের সত্তা অবিকৃতই থেকে গেছে, এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে-স্বাধীনতার দাবি করছেন, তা ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সেকালের কবিরা একালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেননা; এবং এইজন্যে শেক্স্পীয়র-প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তা ইংরেজিনবিশমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমেনি, তা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান-কাল-ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা অনেক বেশি। এমন-কি, সারি-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষরের অভাবনীয় সম্প্রসারণ দেখে, মনে হয় যে ছন্দসম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্ত্তী। অবশ্য সে-যুগে, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চলতোনা। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হতো, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব। যদিও তখনকার গীতিকবিতায় সাম্প্রতিক আত্ম-নির্ভরতা ছিলোনা, তবু ছন্দকে তাঁরা কখনো কারাগাররূপে দেখেননি, তাকে গণ্য করেছিলেন কাব্যপ্রেরণার প্রণালীরূপে। ফলে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনো গণিতের বশ্যতা স্বীকার করেনি। সে-শাসন সুরু হলো মিল্টনের আমলে। তাঁর মহাকাব্যও নবাবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষরে লিখিত; কিন্তু প্যারাডাইস্ লষ্ট্-এর ছন্দ প্রবীণ শেকস্পীয়র ও নবীন বোমন্ট্-ফ্লেচারের ছন্দের জ্ঞাতি, এমন কল্পনাও কষ্টকর। অবশ্য ওই কবিত্রয় সম্ভবত বাধ্য হয়েই ছন্দোমুক্তি বরণ করেছিলেন, কারণ তাঁদের আবেগপুঞ্জ শেষের দিকে এতই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলো যে অমিত্রাক্ষরের পাঞ্চপর্ব্বিক স্বাচ্ছন্দ্যেও তাকে কুলানো যায়নি। সুতরাং এঁদের নাম না-নিয়ে, যদি মার্লোর মতো সাম্যবিলাসী ছান্দসিকের সঙ্গেই মিল্টনের তুলনা করি, তবু

একটা অকারণ বিষণ্ণতার পীড়নে মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায়, এত বড় মহাকবিকে ছেড়ে, প্রাণ চায় হেরিকের মতো গ্রাম্য কবির আসঙ্গ; বুদ্ধি যদিও নতশিরে মানে যে লুপ্তস্বর্গের বার্ত্তা কেবল এঁর কাছেই মিলতে পারে, তবু অন্তর খোঁজে মার্ভেল্-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পাথিবার ছলাকলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে।

জানি, মিল্‌টনকে খর্ব্ব করার প্রবৃত্তিও হাস্যকর, এবং সে-প্রয়াস আমার নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না-পাড়লেও, কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাইলেই সে মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে। এ-ঋণ এমনি বিশ্বব্যাপী যে অখ্যাত বাঙলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারেনি। কিন্তু তাহলেও একথা বলা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের তনুবাত শিখরে আমার মতো জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতই সংক্ষিপ্ত। মিল্‌টনী কাব্যের নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যে মানুষী দুর্ব্বলতার স্থান নেই; তার মর্ম্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্য বিরাজমান; তার সম্ভ্রান্ত বন্ধুমণ্ডলীর মুখপাত্র স্বয়ং বিধাতা। কাজেই যে-নাট্যশালায় মিল্‌টনী ট্রাজিডির অভিনয় হয়, সেখানে মর্ত্ত্যচারীর প্রবেশ কোনোমতেই সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকে বলেন যে একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। আমি কিন্তু এ-মত গ্রহণে অক্ষম। কথাটা যদি একেবারে মিথ্যা নাও হয়, তবু তার একাদশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্য-দুটির সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্—তাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিল্‌টনী পবিত্রতার ছায়া নেই। এই কাব্য-দুটির বাণী মুখ্যত অনুবাদের মধ্যে দিয়েই আমার কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হবে। কিন্তু তাহলেও এ-সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক চলেনা যে ওই আদি কবিদ্বয়ের দৃষ্টি বর্জ্জনের দিকে নিবদ্ধ ছিলোনা, অঙ্গীকারের জন্যেই উন্মুখ ছিলো। তাঁরাও কিছু তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেননি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারগুলিও অমর অধিকর্ম্মাদের উৎপাত থেকে অব্যাহতি পেতোনা। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে এই অতিমর্ত্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনি তার এতদিনের জড়তা কেটে যায়, অমনি বুঝি চিরন্তনী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু মৃত সে কখনই হবেনা। এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্-

অনুবাদকেরাই অনুভব করেননি, যিনিই প্রাচীন কাব্যকে ভাষান্তর করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ। ষোড়শ শতকে ইংরেজি ভাষা যখনও সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠেনি, তখন সে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছেছিলো, আজকের পরিবর্দ্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও আমরা তার অনেক নিচে প'ড়ে আছি। সুতরাং এমন মনে করা অনুচিত নয় যে অপ্রচলিত হয়ে প'ড়ে যত শব্দ আজ আভিধানিক জাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে, কর্ম্মজীবনে তাঁদের অত ঘটা ছিলোনা। দূরত্ব চিরদিনই গৌরবপ্রসূ, কাজেই মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনো আধুনিক অনবদ্য ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে ভাষা যে অতিশুদ্ধির পরিচায়ক ছিলো, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব পোষণীয় হবেনা।

সে যাই হোক, এতদিন অপ্রতিহত প্রতাপে অনাচার ক'রে এসে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ তার অমায়িক অবৈধতা পরিত্যাগ করলে। এই উৎক্রান্তির ইষ্টানিষ্টের ভার যদিও মুখ্যত মিল্‌টনকেই বহন করতে হবে, তবু আসলে তিনি উপলক্ষ্যমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের "শ্রমবিভাগ"-ও অনেক দূর এগিয়েছিলো। ড্রাইডেনের অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরেজি গদ্যে যে-অপূর্ব্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিললো, তার পরে পদ্যকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করার আর সার্থকতা রইলোনা। দেখা গেলো, গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য, যা এতদিন অগত্যা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরে নিতে হতো, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পন্ন হয়। উপরন্তু ঠিক এই সময়েই জীবনের স্থূল দিকটাও খুব বিস্তৃত হয়ে পড়লো। রিনেসেন্সের পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে কর্ষণ আরম্ভ করেছিলো, তাতে অভাবনীয় ফল ফল্‌লো, এবং বোঝা গেলো যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফতে কোনোমতেই লোকসমক্ষে উপস্থিত করা যাবেনা। এ-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য্য পদ্যকেও তাঁরা বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে দ্বিধা করতেননা। কিন্তু অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলোনা, তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটিকে অজ্ঞাতবাসে না-পাঠিয়ে, তাকে দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে ছুটি দেওয়া হবে; কিন্তু যখন উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় আসবে, তখন মিছিলের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করবে সে-ই।

আমার বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন এই সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ। যতদিন অলি-গলিতে ছাপাখানার আবির্ভাব হয়নি, যতদিন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি কেবল গ্রন্থাগারেই বিরাজ করতো, ততদিন কাব্যের ইচ্ছাবিহার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিলো, কারণ ততদিন যারা কাব্যের মজলিসে আসন পেতো, তারা অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তার দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ। কিন্তু এখন থেকে যারা ভিড় ক'রে এলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ধৈর্য্য তাদের ছিলোনা। সাহিত্য তাদের অবসরের সাথী হয়ে উঠলো, এবং যেহেতু সে-যুগের প্রলোভন যে-মাত্রায় বেড়েছিলো, অবসর সে-অনুপাতে বাড়েনি, তাই লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করার মতো সময় তারা ক'রে উঠতে পারলেনা, আভরণের পারিপাট্যকে প্রকর্ষতার চিহ্ন ব'লে ভুল করলে। এই শ্রেণীর পাঠক, বিশেষ ক'রে এই শ্রেণীর অনুকারকের কাছে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচারে পরিণত হতে পারে, কাজেই সন্ত্রস্ত কবিরা কাব্যকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করলেন। ফলে হিরোয়িক কাপ্‌লেটের শৃঙ্খল নির্ম্মাণ হলো, স্থান-কাল ঘটনার নির্ব্বাসিত সঙ্গতি রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করলে, বিবেচকেরা জানালেন যে ট্রাজিডির জাতিরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে রাজসিক আড়ম্বরে বর্ম্মাবৃত করা। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও এত গম্ভীর হয়ে উঠলো যে জনসাধারণ শ্রুতিমাত্রেই বুঝলে এই রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যের উপক্রম সুদ্ধ দণ্ডিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত এত ক'রেও অভিষ্টসিদ্ধি হলোনা, ফল দাঁড়ালো ঠিক উল্‌টো। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যের প্রকৃতিবিরোধী। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডন-পোপের পরে ইংরেজি কাব্যের অতি উর্ব্বর ভূমিও, বহুদিন পর্য্যন্ত উষর রয়ে গেলো। আত্মপ্রকাশের প্রণোদনা যাদের সক্রিয় ক'রে তুললে, তারা বরণমালা দিলে গদ্যের গলায়। অন্যেরা গ্রে-র আক্ষেপকে সার্থক ক'রে, অব্যক্তির সোনার খনিতে গেলো মৌরসি স্বত্বের খোঁজে। অবশ্য ব্লেকের মতো দু-একজন হঠকারী গোল বাধাতে ছাড়লেনা বটে, কিন্তু সমসাময়িক সুধীমণ্ডলী তাতে বিচলিত না-হয়ে, তাদের ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ব'লে ক্ষমা করলেন; এবং অতিবড় খেয়ালীকেও একথা মানতে হবে যে তাদের কবিত্ব-সম্বন্ধে সহধুরীদের মত যতই ভ্রান্ত হোক, তাদের চিত্তবিকার-সম্বন্ধে সেকালের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

এর পরের ইতিহাস সুবিখ্যাত। আঠারো শতকের শেষ দশায় ফরাসীদেশে যে-উপনিপাত সুরু হলো, তার ধাক্কা রুচিবাগীশেরা সামলাতে পারলেননা, কণ্ঠাগত-প্রাণে স্বীকার করলেন যে উপেক্ষিত বর্ব্বরেরা সত্যই যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে স্বয়ং বিধাতারও নিস্তার নেই। ফলে কলিন্স্‌-এর

গৌরব পোপের প্রতিপত্তিকে ছাড়িয়ে গেলো, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ চলতি ভাষাকে কাব্যের ভূষণ ব'লে প্রচার করলেন, অভিজাত বাইরণ দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন, রথপতাকায় বর্ণ্‌স্‌-এর কৃষকী প্রবচন লিখে। দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা কমে, পদ্যের প্রসার বেড়ে গেলো, শুভবাদীরা জোর গলায় হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভারে ঊনিশ শতক এলিজাবেথীয় যুগকেও হার মানাবে, এবং যেন তাঁদের আত্মশ্লাঘার শাস্তিস্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন এক কবির দেহান্তর ঘটলো যিনি শেক্‌স্‌পীয়রের সমকক্ষ না-হলেও, পদমর্য্যাদায় ঠিক তাঁর নিচেই আসন পেলেন। এর পরে কাব্যকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হলো। নিরবচ্ছিন্ন সুসময়ের ফলে কবিরা আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। গদ্য-পদ্যের পুনর্বিবাহে পৌরহিত্য ক'রেও ব্রাউনিঙ জাতিচ্যুত হলেননা, টেনিসন্‌ গ্রাম্য ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস পেলেন, এবং স্বয়ং সুইন্‌বর্ণ্‌ বিদ্রোহী হুইট্‌ম্যানকে কাব্যের ত্রাণকর্ত্তা ব'লে উপাধি দিলেন। অবশ্য মুক্তছন্দের এই আদিপুরুষটির যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড সেদিনেও বোঝেনি, আজও ঠিক বোঝেনা; এবং অল্প দিন যেতে-না-যেতেই সুইনবর্ণ্‌ সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্রের প্রত্যাহার ক'রে, নিজের অমার্জ্জনীয় ভুল নিষ্কুণ্ঠ-চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও সুইনবর্ণের পরে যে-কবিদের আবির্ভাব হলো, তাদের কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব দেখা দিলে। ইয়েট্‌স্‌-প্রতিষ্ঠিত "রাইমার্স্‌ ক্লাব"-এর সভ্যেরা যে-কবিতা লিখতে লাগলেন তার অঙ্গে গদ্যের পাপস্পর্শ হয়তো লাগলোনা, কিন্তু সুইন্‌বর্ণের রসালু বহুলতাও প্রশ্রয় পেলেনা। রক্ষণশীলেদের উপহাস কুড়িয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয়, যতটা শ্রাব্য। এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলোই, উপরন্তু লিখিত সাহিত্যের যেটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অর্থাৎ অচলয়াতন পারিভাষিকতা, তাও কেটে গিয়ে সঞ্জীবিত কাব্য আবার ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালো। দেখা গেলো যে কাব্যকে আবৃত্তির যোগ্য ক'রে তুলতে হলে, তার অলঙ্কারের ভার হালকা করা দরকার। সুতরাং ছন্দের গ্রন্থী আলগা ক'রে, ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্যকে অব্যাহতি দেওয়া হলো, রূপকের মোহ কাটিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চললো. অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় অত্যাসঙ্গের পরিতৃপ্তির কাছে মাথা নোয়ালো। অবশ্য এত করা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কবিরা ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছতে পারলেননা; তার জন্যে আরো পনেরো-বিশ বছরের দেরি ছিলো। তবু এই বিদ্রোহবাহিনীর শিরোমণিদের অকালমৃত্যুর পরেও, সাইমন্‌স্‌ ফরাসীদেশ থেকে যে-নববিধানের নমুনা ইংরেজি কাব্যে আমদানি করতে লাগলেন, তা দেখে আর সন্দেহ রইলোনা পরিবর্ত্তন আসন্ন। এর পরের ঘটনা

আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়, সমসাময়িক পক্ষপাতের অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। কাজেই তার ভবিতব্য-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া নিশ্চয়ই মূঢ়তা হবে। তবে একটা কথা বোধহয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে; সে হচ্ছে এই যে কাব্য আর মুক্তি, এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং এরা পরমাত্মীয়; যদি নিরাসক্ত ভাবে সাধনা করা যায় তবে অরাজকতার মধ্যে দিয়েও কাব্যের নির্দ্বন্দ্ব লোকে উপনীত হওয়া যাবে।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমার উদ্‌ভট অনুমান যে কেবল ইংরেজি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবেনা, তা আমি জানি। অপরাপর সাহিত্যকে সাক্ষী ডাকা আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু তাহলেও একটা অন্ধ ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনা যে সমস্ত পাশ্চাত্য কাব্যই আমার সমর্থন করবে। প্রাচীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কারণ এ-অঞ্চলে মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি কেবল আধ্যাত্মচিন্তাতেই নিমগ্ন থেকেছে। ফলে এদেশের কাব্য হয় চিত্তবিনোদনের নিঃসার উপাদান, নয় তত্ত্বদর্শনের আধার। কাজেই যেখানে অচিন নূতনের অগমন-আশঙ্কায় আমাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পায়নি; আবার যেথায় উপদেশকে সারগর্ভ মনে হয়েছে, সেথায় উপদেশবাহকের বিষয়ে আমরা নিরুৎসুক থেকেছি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির প্রতিকূল, কারণ জীবনের সকল হিসাবনিকাশের মতো ললিত কলার খতিয়ানেও দেনা-পাওনায় যোগবিয়োগ হয়ে কেবল শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। তবু যতদূর জানি ও শুনেছি, তাতে মনে হয় পূর্ব্বের উদাসীনতাও আর অটল নেই। চৈনিক জীবনের সর্ব্বত্র প্রথাপসারণের ফলে যে-সর্ব্ব-নাশের সূত্রপাত হয়েছে, চীনে কবিতায় তার ছায়া দেখিনি; এবং জাপানী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরোক্ষভাবেও পরিচিত নই, তাই তাদের বিষয়ে মন্তব্য করা আমার অসাধ্য। কিন্তু বাঙলা সাময়িকীতে বাকবিতণ্ডার বহর ও ঝাঁঝ দেখে মনে হয় যে এদেশ পাণ্ডববর্জ্জিত হলেও, কালাতিক্রান্ত নয়। অবশ্য বাঙলা কাব্যে খুব বেশি ভাঙাচোরার দরকার হয়নি, কারণ তার গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনোদিনই অত্যধিক ছিলোনা। কিন্তু এই ব্রাত্যতার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতটা আবশ্যিক, তা বলা কঠিন। আমার বিবেচনায় উনিশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙলা গদ্যের নামমাত্র জানা ছিলোনা ব'লেই এখানকার ছান্দসিকেরা বাধ্য হয়ে পদ্যকে অবারিত-গতির অধিকার দিয়েছিলেন। নচেৎ যারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেদের কামাগ্নিকে দেবতার আড়ালে লুকাতে দ্বিধা করেনি, তারা

যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দ্দেশ মানবে, এমন ভাবা সহজ নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প ; কিন্তু যখন তার বংশকরিকার কথা স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কারণ বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্ব্বই হচ্ছে এই যে তার ভাষা দেবভাষা, অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা। নৃতত্ত্ববিদেরা ব'লে থাকেন মন্ত্র বিবর্ত্তিত হয়েই কাব্যে দাঁড়িয়েছে। এক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে হবে। অবশ্য আর্য্যাজাতীয় দু একটা ছন্দ শুনে, এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে হয় যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম ছিলোনা। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য, ঈষদ্ মনোযোগেই ধরা পড়ে আর্য্যার আপাত-স্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যায়ামকুশলী সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক-একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনি। নেপথ্য থেকে প্রযোজক ইঙ্গিত করেছেন, তাই অনুগত নর্ত্তকের দল পূর্ব্বাভিনীত ভঙ্গীতে সার ভেঙে, শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের চেষ্টা করছে।

আমাদের বিধিলিপিতে এতখানি দুর্দ্দশা লেখা ছিলোনা বটে, তবু পয়ারের পদ্মমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও নেহাৎ অল্প বিব্রত হননি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধহয় অশেষ ছিলো, তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন, এবং পোষাকের এমনি গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠলো। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের বিপ্লবপ্রবৃত্তি যতটা ছিলো, কবিপ্রতিভা ততখানি ছিলোনা ; কাজেই মেঘনাদ-বধ যে-পরিমাণে গর্জ্জন করলে, তার তুল্য বর্ষণে অপারগ হলো। মাইকেলের উপরে মিলটনের প্রভাবও অত্যল্প ছিলোনা। এবং রুগ্ন কাব্যকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে এই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল কেবল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই ক্ষান্ত হলেন, বুঝলেননা যে ভাষা প্রাকৃত না-হলে প্রকৃত কাব্য লেখা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনোকালেই উদাসীন ছিলেননা। তৎকালীন পুঁথিগত বাঙলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো ; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তাঁকে যদি শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোশেরই শরণাপন্ন হতে হয়ে থাকে, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবেনা, অসংস্কৃত বাঙলার আত্যন্তিক দৈন্যও মেনে নিতে হবে। অবশ্য এই দারিদ্র্যের জন্যে আমরা লজ্জা অনুভব করতে

বাধা নেই, কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞায় যে অপাঙক্তেয় হয়েছিলো, সেই কাঠবিড়ালী যদি লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধূলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের এক-আধটা ছিদ্রও ভরাতে পেরে থাকে, তবে সেটাই তার প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তির পরিচয়, অন্য সমস্তই একান্ত বাহ্য। উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে একথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি ইংরেজিশিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ, এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিলো তখনকার চিৎপ্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাঙলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেননা, তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবাই ক'রে গেছেন, তাকে সুস্থ করতে পারেননি। এ-অনুমান মিথ্যা হলেও এটা অন্তত সত্য যে বাঙলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবত ত্রৈমাত্রিক মনে করায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ ব'লে ভাবায় সে-পরিমাণের বিধর্ম্মিতা নেই। কিন্তু এ-আলোচনার মূল্য খুব বেশি নয়, কারণ মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে মহাকবি না-হলেও নিয়ামক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয়, এবং যতদিন বাঙলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, ততদিন তাঁর নামকীর্ত্তনে লোকাভাব হবেনা। কারণ মাইকেল শুধু মৃয়মাণ বাঙলা কাব্যকে উদ্দীপিত ক'রেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছিলো, তারা নিতান্তই আকাশ-প্রদীপ। তবু বাঙালী মনীষীরা এই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘনিবেদনের মতো।

মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না-পেলে বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতোনা, এমন কল্পনাও পাগলামি, কারণ তাঁর সমান কবি শতযুগে একবার জন্মায়, এবং তাদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাহলেও একথা অতিসত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্যের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে জাজ্বল্যমান না-থাকলে, তাঁকে অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে বহু শক্তি ব্যয় করতে হতো। ভুললে চলবেনা যে শুধু আবেগাতিশয্য বা অফুরন্ত কল্পনা দিয়ে কাব্যরচনা হয়না, তার জন্যে রূপায়ণও অপরিহার্য্য। আমার মনে হয় রূপই কবিতার প্রধান উপকরণ, এবং এ-রূপ যদি যথার্থই উপযোগী রূপ হয়, তবে কল্পনার ন্যূনত্বেও বিশেষ আসে যায়না। অবশ্য ঐশ্বর্য্যমাত্রেই বর্জ্জনীয় নয়। কিন্তু যেমন অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে প্রভূত সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ও ভালো, তেমনি মস্তকে সুমেরু প্রমাণ কল্পনা বয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো। এ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনই সুস্পষ্ট, তাই তাঁর সাহিত্যে

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি তা অন্যত্র দুর্লভ মনে হয়। বলাই বাহুল্য এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভারই প্রসঙ্গকে বইতে হয়, কারণ প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জ্জন ছাড়া কোনো মধ্যপন্থার অবকাশ নেই। অতএব যা তাকে ধারণ করে, অর্থাৎ ছন্দ, ভাষা ও প্রতীক, স্থিতিস্থাপকতা চাই তাতে। এইখানেই পূর্ব্ববর্ত্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার—ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায়তা করেছিলো। সত্যে পৌঁছানোর পথ যদিও একটি, তবু তার স্থিতি গোলকধাঁধায় হওয়াতে, বারম্বার পথচ্যুতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই বিপথগুলো যদি পদচিহ্নে পরিপূর্ণ থাকে, তবে ঠিক পথটাকে চিনে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টক্রমে নান্যপন্থায় পদার্পণ করেন বটে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথকে হাতড়ে বেড়াতে হলোনা, প্রথম যৌবনেই তিনি চিত্রাঙ্গদার মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের এলেকায় উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন, তখন কেবল চিত্রাঙ্গদা-লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই খালাস হতে পারিনা, সেই প্রাক্‌রৈবিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাঙলা ভাষা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলে।

কাব্যের ধনিকতন্ত্রে জন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জ্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত হয়েছেন, এমন উদভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। তাঁর কর্ম্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রসাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে কী পরিমাণে অবদমিত করলে, তবে তাঁর মতো ছন্দস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা অকবিদের সুদ্ধ বোঝা উচিত। তাছাড়া প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয়েই যে প্রতিভার সম্ভব হয়, এ-তথ্যও আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও এমন বিশ্বাস হয়তো যুক্তিসঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হননি। মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ, এ-কথা মানার জন্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা অনাবশ্যক। মহত্ত্ব, তা সে যে-প্রকারেরই হোকনা কেন, সুযোগব্যতীত ব্যক্ত হয়না ; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব প্রকাশের সুসময় হচ্ছে ভাষার শৈশবাবস্থা। সম্প্রতিবিদরা মুখে যতই বড়াই করুন, মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে। মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতেই ক্ষয় ধরেছে, এমন বিশ্বাস টিঁকবেনা। তাই আমরা মনে করতে বাধ্য যে

কাব্যের উপাদানে এখন আর সে-নমনীয়তা নেই, যাতে মহাকবির মহানুপ্রেরণা মূর্ত্তিমান হয়ে উঠতে পারে। এই সিদ্ধান্ত যাঁদের কাছে অলীক ব'লে ঠেকবে, তাঁদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করতে বলি। সফোক্লিস্, লুক্রিশিয়স্, শেক্‌স্‌পীয়র, গোয়টে, এবং সম্ভবত কালিদাস, এতগুলি মহাকবির মধ্যে কেউই যে পরিপুষ্ট ভাষার পরিচর্য্যা করেননি, তা নিছক দৈবযোগ হতে পারেনা। তাঁরা প্রত্যেকেই যখন এসেছিলেন, তখন তাঁদের স্ব স্ব ভাষার বয়ঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকের শাসন তখনো সুরু হয়নি, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা তখনো কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনার অবাধ প্রান্তর। অথচ অতীত তখন আর নিতান্ত নগণ্য নেই, তার পরিণতির পূর্ব্বাভাস ইতিমধ্যেই সূচিত হয়ে গেছে, অসংখ্য ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে সে প্রত্যুষের অনিশ্চয়তা ছেড়ে সবেমাত্র প্রভাতের আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় মহাকবির আগমন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি স্বাভাবিক; এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেও আমি এই ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

এখনি যা বললুম, তার থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আমি আধুনিক কবিদের সুযোগের প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে ভুল হবে। সে তো দূরের কথা, আমি বরং মনে করি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যের প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোনোদিনই বিরল নয়, রচনাশক্তির প্রাখর্য্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে পারেন; কিন্তু তাঁদের অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেরও হার মানায়। তাই যদি কখনো সুযোগের সাহায্যে তাঁরা সমকালীন পাঠকের শ্রদ্ধায় অধিকারী হন, তাহলে সেই শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে তাঁদের রূপকারী বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে যে-উপায়ে একদিন পাঠকের হৃদয় জয় করেছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য জেনেও তাঁরা উপায়ান্তর উদ্ভাবনে অক্ষম হন, এবং এই অক্ষমতার জন্যেই অকৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষপাত হারান। কাব্যের সত্তা কি, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে, কিন্তু মীমাংসা হয়নি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না-ক'রে, শুধু এইটুকু বলাই নিরাপদ যে কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রই যখন বৈচিত্র্য-ব্যতিরেকে বাঁচতে পারেনা, তখন তাকে বাদ দেওয়া কাব্যের পক্ষেও নিশ্চয়ই অকল্যাণকর। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী হতে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আরও একটা বাড়তি গুণ থাকে, যেটা কালাতিরিক্ত। সুযোগ যেমন আসে, তেমনি যায়, সুতরাং তার সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য লেখা না-ই যায়, তবে মহাকবিকে এমন কোনো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে, যাতে অতীত সুযোগ প্রয়োজনমতো পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য নাম

দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিমদেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো, একটা সমষ্টিগত রূপ তার অবশ্যই আছে, এবং সেটাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এইখানেই তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনা ; বহুবার শুনে যখন তার সমগ্র বহিরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তখন সুরু হয় তার বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিরায়তনিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, সাময়িক শিল্পের আপাতরমণীয়তা হয়তো তাতে থাকেনা, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্য সৃজন চলে। হিন্দুসঙ্গীতের নির্দ্দেশে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগরাগিণীর মধ্যে ভাগ ক'রে দিলে কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস-অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবীর তানে খ্যাতিসূর্য্য উদিত হয়েছিলো ব'লে যে-সুগায়ক সারাদিন কেবল ভৈরবীই ভাঁজতে থাকেন, তাঁর আসরে শ্রোতার সংখ্যা যে অচিরেই শূন্যে এসে ঠেকবে, তা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সুবিদিত ব'লে লাগছে, কার্য্যত ততটা সুস্পস্ট নয়। এমন-কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্, শেলি, টেনিসন ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেননি ; তাঁরা কাব্যকে তাঁদের নির্ব্বিকার ব্যক্তিত্বের ভারবাহীরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও প্রতিভায় শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ হয়েও, এঁরা সম্ভবত লোকোত্তর অমৃত-লোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে গেছেন। শিল্প-সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক বিশেষণ নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে, তাই এইখানেই ব'লে রাখা ভালো যে ঐ শব্দের দ্বারা আমি কোনো অমানুষিক লক্ষণের ইঙ্গিত করছিনা, শুধু সেই ধরণের শিল্পসামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের চেষ্টাই বেশি পরিস্ফুট। উদগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি যে কবিও যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনাবেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে অল্পবিস্তর প্রকাশ পেতে বাধ্য। তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখতে পাই যার প্রবর্ত্তনা কবি-পরিচিত নয়, কেবল সৃষ্টি। আমার বিবেচনায় "টেম্পেষ্ট্" মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত হয়েছিলো। শেক্‌স্‌পীয়রের তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে ওই রচনায় স্থান পায়নি, তা হলফ ক'রে বলতে পারবোনা বটে, কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে টেনিসনের জীবনকাহিনীর ছায়াতিরিক্ত হয়েও "আইডিলস্ অফ দি কিঙ্" যে-ভাবে টেনিসনকে ধরিয়ে দেয়,

প্রস্‌পেরো কখনো ঠিক তেমনি ক'রে আত্মবিস্মৃত হয়না। সে যাই হোক্, এই রকমের আরও অনেক উদাহরণ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে উক্ত নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণ ব্যতীত কাব্য উপাদেয় হতে পারে কিন্তু অমর হয়না, কারণ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুকনা কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্ত্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনো অর্থ নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্যসংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত, কাব্যকে সে যদি চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দিতে চায়, তবে উৎকেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া তার গতি নেই। বিশ্ব অবশ্যই অমিত নয়, কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগৎকেই তার অনন্ত লাগে; ঘটনার ঘূরন্ত চক্রের দিকে চেয়ে সে এতই দিশাহারা হয়ে পড়ে যে একই ঘটনা বহুবার ফিরে আসছে কিনা তা বোঝবার তার সামর্থ্য থাকেনা। কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বকে আশ্রয় করে, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু সর্ব্বদাই বিষয়ের সঙ্গে ছুচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকার দেখা যায়না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মহতের এতাদৃশ নিয়মলঙ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত; এবং প্রাচীন গ্রীস থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারত পর্য্যন্ত এই প্রয়োগ একদিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিম থেকে সুরু ক'রে আধুনিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আজও তার তেমনি সমাদর।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথও এই আর্ষপ্রয়োগক্ষম কবি, এবং সেইজন্যেই তিনি আবাল্য তাঁর কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয়, কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে। যা রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য লক্ষণ, সে হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য্য, তাঁর অশেষ পরিবর্ত্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি। অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা দেখা যায়: একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে উপনীত হন, এবং একবার গন্তব্যে পৌঁছলে তাঁদের আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকেনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন

সন্তোষ অবর্ত্তমান; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্রস্বভাব দেখে মনে হয় তিনি পরিপূর্ণতায় আস্থা রাখেননা। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য, এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে বরেণ্য হতে পারতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"-য় এসে চূড়ান্তে পৌঁছলো, তখন কবি হঠাৎ তাতে বীতরাগ হয়ে পড়লেন। তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কেন স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন, তা বোঝা শক্ত। অবশ্য পিছনের পানে চেয়ে আজ মনে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া মিলবেনা; কিন্তু যেদিন "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা লিখিত হয়েছিলো, সেদিনে এমন প্রত্যয়ের কোনো কারণ ছিলোনা, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিলো সমূহ। ততদিন রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন, এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে যে-ঝঙ্কার পাঠকের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, সে হচ্ছে সংস্কৃতির ধ্রুপদ। এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দোবদ্ধ করার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা। এই অগ্নিপরীক্ষায় কেবল তিনিই আত্মসমর্পণ করতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই; যিনি নিজের ইষ্টের চেয়ে কাব্যের মঙ্গলকে অধিক কাম্য মনে করেন।

"ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর। ক্ষণিকার উদ্ভব যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই হয়ে থাক, ওই পুস্তক প্রকাশের পরে আর কোনো সন্দেহ রইলোনা যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনো জন্মগত যোগ নেই। কিন্তু ছন্দসম্বন্ধে এখনো সংশয় রয়ে গেলো। একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছন্দ কখনো নিগড় হয়ে ওঠেনি, বেজেছে নূপুরের তালে। তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দবৈচিত্র্য যদিই বা কারুর কাছে অনবধানতা-প্রসূত ব'লে ঠেকে, মানসীর "নিষ্ফল ক্রন্দন"-এ যে কবি সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ব্ববাদিসম্মত। অবশ্য বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে আর ব্যবহার করেননি; তাহলেও ছন্দের গাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বন্ধ ধ্রুপদী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লিখিত হতে পারে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে যথার্থ মুক্তচ্ছন্দের আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে, তাতে সন্দেহ নেই, এবং একথা রবীন্দ্রনাথেরও জানা ছিলো। তাই দেখি "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতিসম্বন্ধে গবেষণা শেষ ক'রে, "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপসন্ধানে নামলেন। "বলাকা"-র ছন্দ একেবারে বন্ধনমুক্ত হলোনা। সেখানে তেমন হওয়াও হয়তো বিপজ্জনক ছিলো, কেননা, বলাকার বিচরণ মর্ত্তসীমার বাইরে, সেই নিরালম্ব লোকে যদি মাধ্যাকর্ষণের নির্দ্দেশও না-থাকে, তবে কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে পরিণত

হতে পারে। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা অটুট রেখেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজসের পরিচয় দিলে, যা দেখে আর সন্দেহ রইলোনা যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্য ভাবতে হবেনা। মানুষের যেগুলো উর্দ্ধগ আবেগ, তার অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমন-কি ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নেই। গদ্য থেকে বহু দূরে হয়েও, এ-ছন্দ স্বকীয় গতিভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনো হারিয়ে যায়না। তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে জগৎ কেবল ভাবের উপাদানেই নির্ম্মিত হয়নি, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্ব্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের সংসর্গে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ হয়ে আসে ; মনে হয় বেয়াদবের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দারকার এমন এক মুখরাকে যে অমর্য্যাদায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়বেনা, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে। "পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দের সৃষ্টি করলেন। এর মধ্যে ছন্দসম্বন্ধে আর কোনো ভেদবুদ্ধি রইলোনা, যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগলো। মিল এখনো পরিত্যক্ত হলোনা বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেলো যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইলোনা। সে-পর্ব্বেরও আর দেরি ছিলোনা। "পলাতকা" লেখার সময়ে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ গদ্যে ক'বতা রচনা সুরু করেছিলেন। এগুলি "লিপিকা"-র প্রথমাংশের অন্তর্গত।

"লিপিকা" প্রকাশের পর দেখা গেলো হর্বর্ট স্পেন্‌সর্ একেবারে মিথ্যা বলেননি। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাককে যদিই বা কেউ ময়ূরের সঙ্গে ভুল করে, তবু গদ্যবেশী কাব্যকে তার যথার্থ উপাধি দিতে সকলেই নারাজ। কবির নিজের মনেও হয়তো এই বইসম্বন্ধে দ্বিধা ছিলো, কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলিকে যে-মুহূর্ত্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, অমনি তাদের কাব্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্যরচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সব্যসাচী, এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতেই কৃতজ্ঞ। তাহলেও অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণে", কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য হয়ে ওঠেনি, কাব্যগন্ধী থেকে গেছে ; অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্যাদর্শে পৌঁছেছে। এই অসাধ্যসাধন কি ক'রে সম্ভব

হলো, তা বলা আমার কর্ম্ম নয়। কিন্তু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের বিচার করলে হয়তো এই রহস্যের খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হবে। সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্য-উপমার সঙ্গে তাঁর পদ্য-উপমার কোনো মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ ক'রে থাকেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, এখানে উপমার সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়। কিন্তু কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতি অথবা ধ্বনিমাধুর্য্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমায় অর্থ তো স্পষ্ট হয়না বটেই, এমন-কি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতার অভাব ঘটে। তাহলেও এতে কাব্যের ক্ষতি হয়না, কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, শুধু নিষ্ঠাই অপরিহার্য্য; এবং কাব্যে উপমার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া। নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসেনা, আসে প্রত্যক্ষতার আকর্ষণে; তাই ব্রহ্মের নির্গুণতা-সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তারকেশ্বরের মতো জাগ্রত দেবতা। এই সনাতন সত্যের নির্দ্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপনবিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞাপন-চিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর স্থান ক্রমশই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন। দেখা গেছে ছবিটি যদি দ্যোতনাপূর্ণ হয়, তবে পণ্যসামগ্রীর গুণকীর্ত্তনের প্রয়োজন থাকেনা, বরং তর্কের কোনো সুযোগ না-পেয়ে দর্শকের মন কল্পনা-প্রবণ হয়ে ওঠে, এবং এ-অবস্থায় সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে ভোলা আর সহজ হয়না। কবিও তাঁর উপমা ব্যবহার করেন এই রকমে। বলাকার পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপ্সররমণীর অনুষঙ্গে বেশি পরিস্ফুট হওয়া দূরে থাকুক, বরং একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ওই কথাকটার জাদুতে পাঠক চিত্ররচনায় এমনি মনোনিবেশ করে, যে এ-অসঙ্গতির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তার সাধ্যে কুলায়না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করে, নচেৎ সজোরে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলেঃ একেবারে প্রলাপ! "লিপিকা"-র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা, তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত। সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠককে মোহাবিষ্ট ক'রে তোলে, "লিপিকা"-য় তেমনি উপমা আলেখ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার তর্ক-প্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেইজন্যেই "লিপিকা"-র বেশ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমার বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কারণ শুধু এ নয় যে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙলা মুক্তচ্ছন্দের একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যেতো; উপরন্তু প্রাকৃত বাঙলার প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রথম এইখানেই আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও "লিপিকা"-র

দুর্ব্বলতা নিতান্ত অল্প নয়; এ-কবিতাগুলির প্রসঙ্গ-নির্ব্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুর পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি জানি বিষয়ের উপরে প্রভুত্ব চলেনা; সে আসে তার নিজের খেয়ালমতো: সময়ে সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রেও তার সাক্ষাৎ মিলেনা, আবার মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহারের অবকাশ সুদ্ধ মুছে যায়। তাছাড়া রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন হলেও, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেরণাপ্রসূত। কিন্তু এ-সমস্ত মনে রেখেও "লিপিকা"-র সম্বন্ধে নালিশ চোকেনা, প্রশ্ন ওঠে, বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলেনা, তবে ছন্দকে জীবন্মুক্ত করার সার্থকতা কোথায়? এবং একথা না-মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখাতে পেরেছে, ছন্দোমুক্ত হ'য়েও "লিপিকা" তাতে বঞ্চিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় এই পুস্তকের সাফল্য-সম্বন্ধে কবির নিজের মনেও দ্বিধা ছিলো। বাঙলা কবিতার ছন্দোমুক্তি এতদূর পর্য্যন্ত সইবে কিনা, তা তাঁর জানা ছিলোনা ব'লেই, তিনি "লিপিকা"-র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছেন; সেইজন্যে বেছে বেছে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যা সকল রকমে নির্গুণ হয়েও, কেবল কৌলিন্যের জোরেই রসোত্তীর্ণ হতে পারে। "লিপিকা"-র পরবর্ত্তী পুঁথি-কখানিতে এ-সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়। "শিশু ভোলানাথ", "প্রবাহিনী", "পূরবী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভা যদিও শুধু এগিয়েই চলেছে, তবু প্রকরণ ও পরীক্ষার প্রতি কবির যেন আর দৃকপাত নেই। তার মানে এ নয় যে এই বইগুলির কাব্যসম্ভার বা কলাকৌশল শিথিল, তার মানে শুধু এই যে এগুলির রচনারীতি নবাবিষ্কৃত নয়, পুরাতন রীতিরই পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে-পথেই চলুন তাঁর অব্যর্থ প্রয়াণ প্রতিবারই অমৃতলোকে এসে থামে। উপরোক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদের সাক্ষাৎ মিলে, তারা প্রায় সকলেই উর্ব্বশীর গোত্রসম্ভূত, তাদের মুখে অনন্তযৌবনের অপার সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অজানার অভ্যাঘাত তাদের চোখে নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রীর পক্ষে এই অচলায়তন উৎকর্ষে স্তিমিত হয়ে বসে থাকা বেশিদিন সম্ভব হলোনা, তিনি আবার স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এবারে বোধহয় আর অমরাবতীর চক্ষু নিরশ্রু থাকেনি, নিঃসঙ্গ হয়নি কবির প্রত্যাবর্ত্তন; স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁর আকর্ষণে এই ধূলির ধরণীতে নেমে এসেছেন। অবশ্য দেবীর কণ্ঠে সেই অভ্যস্ত মন্দারমালা নেই, তাঁর মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত ক'রে চলেছে; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁর দিকে চেয়েই

বুঝতে পারি যে বহিরাঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না-থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র। আমি এমন কথা বলছিনা যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি কবি পার্ব্বত্য প্রদেশ পছন্দ করেননা, তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্ব্বত্রিক উর্ব্বরতা। এ-খবর যদি তাঁর রুচিসম্বন্ধে মিথ্যাও হয়, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য, কারণ সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, সে হচ্ছে অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখর-গহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও, এমন মনে হওয়া অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগুনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিরোধ দূর করবার চেষ্টা করে এসেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গী জীবনের মতোই পরিবর্ত্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্ব্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয়; চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি স্বয়ং বসুধার দুহিতা সীতা। স্বরাজ্য মজ্জাগত না-হয়ে গেলে নৈরাজ্য কেবল অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের হাতে তা সর্ব্বনাশে পরিণত হবেনা তো?

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কার্‌স্‌টা

(কাইজারলিঙ্‌ হইতে)

অল্প অল্প বরফ গলা আরম্ভ হয়েছে। গীর্জ্জার পথ নভেম্বরের নরম ভিজে তুষারে ঢাকা, একটি 'শ্লে'-গাড়ি হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে তাল সামলিয়ে এই পথে ছুটেছে। তাতে যাত্রী চারজন, ম্যারি, ক্যাটি, ইল্‌সে ও কার্‌স্‌টা—যার মা এ্যান্‌লিসে একটি কুঁড়েঘরে থাকে। চারজনই মেয়ে, গীর্জ্জা থেকে বিয়ে ক'রে তারা ফিরছে, তাদের স্বামীরা 'রংরুট'—সবে সৈন্যদলে তারা নাম লিখিয়েছে, কালই তাদের ব্যারাকে চ'লে যাবার কথা। চারটি বড় নীল রুমাল চারজনের মাথার উপর চূড়ো ক'রে বাঁধা—গাড়ি চলার তালে তালে এই চারটি চূড়ো একবার উঠছে একবার নামছে। গাড়ি চালাচ্ছে র‍্যুবেন জেজ। লোকটি বেজায় টেনে এসেছে আর নির্দ্দয়ভাবে ঘোড়াদের চাবুক মারছে। এদের স্বামীরাও ঠিক পিছন পিছন আস্‌ছে, একটি শ্লেতে দুজন দুজন ক'রে। তাদের ভাঙা গলার চীৎকার ও গান শুনলে বোঝা যায় তাদেরও অবস্থা র‍্যুবেনেরই মতন। মেয়ে চারটি কিন্তু শান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে, কেবল গাড়ির দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীল রুমালে-বাঁধা মাথাগুলো দোল খাচ্ছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট কার্‌স্‌টা। তার টুকটুকে গোলগাল মুখ, তার দুটি গোলগোল হালকা-নীল চোখ, আর তার গোল নাকের ডগা দেখলে তাকে একেবারে শিশু ব'লে মনে হয়; কিন্তু যে-সব চাষার ঘরের মেয়ে অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে, সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাট যাদের পোয়াতে হয়, ঠিক তাদের মতন তার ঠোঁটের কোণ টোল-খাওয়া। কার্‌স্‌টা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল চারদিক কুয়াসায় ঢাকা, এই ধূসর পটভূমিকার উপর জুনিপারের ঝোপ ও কাকগুলিকে অদ্ভুত রকমের কালো দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে এক একটি পাতা-ঝরা লালচে অল্‌ডার গাছ ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত পথ এই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বর্ণহীন দৃশ্য কার্‌স্‌টার চোখের সামনে ধীরে ধীরে দুলছে, যেন সে ইষ্টারের মেলায় দোলনায় ব'সে আছে আর খুব আস্তে আস্তে তাকে কেউ দোল দিচ্ছে।

পথে প্রত্যেক ভাঁটিখানায় তারা থামতে থামতে এসেছে। প্রতিবারই, কার্‌স্‌টার স্বামী টোম্—দেখ্‌তে সে প্রকাণ্ড লম্বা—ঝুঁকে পড়ে তার কার্‌স্‌টার খবর নিয়েছে, আর "কি? একেবারে জমে গেছ নাকি?" এই ব'লে ব্র্যাণ্ডির বোতল এগিয়ে দিয়েছে। কার্‌স্‌টা সত্যি প্রায় জমেই গিয়েছিল; কোনোরকমে একটু হেসে সে বোতলটা হাতে নিয়ে খানিকটা খেয়ে ফেল্‌ল। বাস্তবিক ব্র্যাণ্ডি খেলে শরীরটা বেশ তাজা হয়ে ওঠে,

আর কি আরামই না হয়, আর সব চাইতে মজা এই যে মনের সব ভাবনা চিন্তা একেবারে চ'লে যায়। কারস্টার চোখের সামনে এই কুয়াসায় ঢাকা অস্পষ্ট পৃথিবী আরো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠল, এমন কি তাদের গাড়ির কোচম্যান জেজের মস্ত পিঠটা যেন ক্রমশই দূরে চ'লে যেতে লাগল। কিন্তু সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিনের প্রত্যেকটি ঘটনা বারবার তার হুবহু মনে হ'তে লাগল, একটির পর একটি, যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনি। বিয়ে! সকাল থেকে তারই আয়োজন। সব প্রথম ক'নের সাজ, মখমলের মতন কোমল, দুধের মত শাদা, সেমিজ দিয়ে সাজের আরম্ভ; উঃ, কি পাৎলা আর কি ঠাণ্ডা! তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল। আর তার মাথার গয়নাগুলো কি জোরেই না চেপে দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয় দাগ প'ড়ে গিয়েছে। তারপর একেবারে গীর্জ্জায়; জায়গাটি কি ভীষণ ঠাণ্ডা আর কি অটল তার গাম্ভীর্য্য। পাথরের মেজের উপর নতুন জুতো জোড়া বিশ্রী রকমের খট্‌খট্ শব্দ করছিল, কারস্টার ভয় হচ্ছিল সে পা পিছলে উলটে না পড়ে। পাদ্‌রির মুখটি একেবারে গোল আর টক্‌টকে লাল; এমন কপ্ কপ্ ক'রে ভদ্রলোক কথা বলেন মনে হয় যেন খুব মুখরোচক একটা কিছু খাচ্ছেন। কিন্তু যাই বলো, তাঁর উপদেশ ভারি সুন্দর! তাদের স্বামীরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে, সে সময় তাদের সতীত্ব যেন অবিচলিত থাকে—এই সব অনেক কথা তিনি বল্‌লেন, আর বল্‌লেন ভগবানের কথা ও মানুষের প্রতি তাঁর কি বাণী তারই কথা। এই সব কথা কারস্টার মনকে এত স্পর্শ করেছিল সে না কেঁদে পারেনি। যারা যুদ্ধে যাবে তাদের বউরা বিয়ের সময় অমন কেঁদেই থাকে। আর এরকম কাঁদা নিশ্চয়ই খুব ভালো, একেবারে এমন কাঁদা যে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে ও চোখের জলে ভিজে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা যে সেমিজের বোতাম প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া হয়। কারস্টা যে সব চাইতে বেশি কেঁদেছিল পরে যখন এ বিষয় কথা হচ্ছিল তখন খুব জোর ক'রেই সে তা বল্‌তে পারত। বিয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর সবাই মিলে গেল গীর্জ্জার সামনের ভাঁটিখানায়, এই একটু শরীরটা তাজা ক'রে নেবার জন্যে। সেখানে পুরুষগুলো আবার একটি ঝগড়া বাধিয়ে দিল। ঠিক বিয়েতে যেমন হওয়া উচিত প্রত্যেকটি ব্যাপারই তেমনি হয়েছিল, কোনো ত্রুটি হয়নি। বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! জেজের ছোট্ট ঘোড়াগুলোর গলার ঘণ্টা টুন্ টুন্ ক'রে কেবল এই এক কথাই বলছে। কারস্টার স্বপ্ন আবার আরম্ভ হল—সেই সেমিজ পরা থেকে। আর তিনটি মেয়ে চুপ চাপ ব'সে, তাদের স্থির দৃষ্টি কুয়াসার উপর নিবদ্ধ, তাদের চোখের ভাব দেখলে মনে হয় না তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে বা দেখবার চেষ্টা করছে।

কেবল মাঝে মাঝে এক একটি খরগোস মাঠ থেকে এসে এক দৌড়ে যখন রাস্তা পার হচ্ছে, চারজনই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ছ্যাখো, ছ্যাখো খরগোস !' তারপর কোনোরকমে একটু হেসে আবার সব চুপ চাপ !

গ্রামের সরাইখানার সামনে তাদের গাড়ি থামল ; সেখানে বেশ একটা ভিঁড় জ'মে গিয়েছিল, বিয়ের উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিরা ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক প'রে সেখানে জড় হয়েছে। মেয়েদের ও ছোট ছেলেদের দল জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখছিল, সবাই ক'নেদের দেখতে চায়। কার্‌স্‌টার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেও ক'নে, তার মন উৎসবের আনন্দে ভ'রে উঠল। বিয়ের দিন মানুষের জীবনে সব চাইতে সুখের দিন, বিয়ের ক'নে হওয়া কি কম গৌরবের কথা !

কার্‌স্‌টা দরজার কাছে তার স্বামীর জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, তাদের দুজনের একসঙ্গে ভিতরে যাবার কথা। সে ভারি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারের বুড়ীটির সঙ্গে কথা বলছিল। গ্রামের মাতব্বর পর্য্যন্ত তাকে ডেকে কথা বললেন, আর ছোট মেয়ের দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে তার সাজসজ্জা দেখতে লাগল। কার্‌স্‌টার মা এ্যান্‌লিসে ছিল অতি সাধারণ লোক, ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে তার বাস। সবার কাছে এরকম সম্মান কার্‌স্‌টার ভাগ্যে কখনও জোটেনি। সে ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র ও গরীব ও নগণ্য, তার সম্বল ছিল একটিমাত্র ছাগল, কিন্তু বিয়ে ক'রে সেও আজ একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছে। গর্ব্বে তার ছোট্ট শিশুর মতো মুখখানি আপেলের মতন লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে পুরুষের দলও এসে পড়ল, তাদের গান আর চীৎকার তখনো সমানে চলেছে। টোম্‌ গিয়ে হটাৎ কার্‌স্‌টাকে জড়িয়ে একেবারে তুলে ধ'রে বল্‌ল, "ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, কিন্তু ওজনে যেন এক-বস্তা ময়দা আর কি !" সবাই হেসে উঠল। আনন্দে কার্‌স্‌টার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর টোমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভ'রে গেল।

সরাইখানার সব চাইতে বড় ঘরটিতে খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেখানে সকলে জড় হয়ে কাঠের টেবিলগুলোর পাশে যে-যার জায়গা ক'রে বসল। কারো মুখে কথাটি নাই, সবাই গম্ভীরভাবে খেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এল সুরুয়া, তারপর শূয়রের মাংস, তারপর ভেড়ার মাংস, তারপর আবার শূয়রের মাংস। একেবারে সদ্য তৈরি খাবার, এত গরম যে তখনও ধোঁওয়া বেরোচ্ছে ; ক্রমে এই ধোঁওয়ায় ঘর গেল ভ'রে। কার্‌স্‌টা একমনে খেয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে তার পেট এত ভ'রে গেল যে কোনোরকমে জামার নীচের বোতামগুলো আলগা ক'রে সে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার মনে হচ্ছিল, এই তো চাই, বিয়েতো একেই

বলে—খাসা! টোমের জামার হাতায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে ভাবছিল, এখন থেকে টোম্ তার নিজের লোক হোলো, একেবারে সম্পত্তির সামিল, বাস্তবিক স্বামী থাকা কি সুখের! টোম্ও বারবার তার স্ত্রীকে বলছিল, "খেয়ে নাও গো, ভালো ক'রে খেয়ে নাও।"

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঘরে মোমবাতির ব্যবস্থা হোলো, খালি মদের বোতলগুলো হোলো বাতিদান। ব্যাণ্ডে পোলকা নাচের সুর বেজে উঠল। কারস্টা খুসী হয়ে ভাবল, কি মজা! এবার নাচ। একটুক্ষণের জন্যে সে একবার বাইরে গেল--চারদিক অন্ধকার, সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢাকা, আর তারই উপর জলো হাওয়া হুহু ক'রে বইছে; ধূসর মেঘের ভার পৃথিবীর উপর নেমে পড়েছে। কারস্টা ভাবল, কাল নিশ্চয়ই বরফ পড়বে।

গ্রামের স্তব্ধ রাস্তার দুই পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘরগুলি ভিঁড় ক'রে রয়েছে—মাঝখানে এক একটা জানলায় মিটমিট ক'রে একটা আলো জ্বলছে, কোথাও বা ছোট ছেলে কাঁদছে আর মা গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে--সেই মামুলি একঘেয়ে সুরে। রাস্তার এক প্রান্তে ঐ যে বিশ্রী কালো ছোট্ট কি একটা দেখা যাচ্ছে ঐ হোলো এ্যান্‌লিসের কুঁড়ে। কাল সব শেষ হয়ে যাবে—যেন কোনোদিন কিছু হয়নি। কারস্টা আবার তার মার কাছে গিয়ে থাক্‌বে আর—দুই হাতে সে মুখ ঢাকল। আজ কেন তার এত কান্না পাচ্ছে? কাঁদার সময় সে কাল যথেষ্টই পাবে।

কারস্টা ভিতরে গিয়ে নাচ সুরু কর্‌ল। একজন বলিষ্ঠ পুরুষ যদি দুই হাত দিয়ে প্রায় আঁকড়ে ধ'রে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়ায় তাতে কি মজা! তার হাতের স্পর্শে সমস্ত শরীরটা তাজা হয়ে ওঠে। ভাবনা চিন্তা সব যে কোথায় উধাও হয়, শুধু থাকে রক্তের উদ্দাম প্রবাহ আর বুকের মধ্যে প্রচণ্ড তোলপাড়! কারস্টার চোখে সব অস্পষ্ট হয়ে এল, যেন সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। একপাল লোক ক্রমাগত বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে, চুরুটের ঘন ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে তাদের কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে, আর পুরুষের দল মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে,—শব্দ শুনে মনে হয় ঢেঁকিতে যেন ধান কোটা হচ্ছে। কারস্টা ভাবল, "একটু স্ফূর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক। আর তো কখনো এমন দিন আসবে না।" ক্রমে পুরুষদের মধ্যে একটা ঝগড়া বেধে উঠল, তারপর ঘুঁষোঘুঁষি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে কারস্টাও গিয়ে তাতে যোগ দিল। আর যাকে সামনে পেল তারই চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আর চেঁচিয়ে সে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করল—তার স্বামীর পক্ষ হয়ে সে লড়ছে, কি তার গর্ব্ব! ক্রমে সব শেষ হল। গ্রামের যুবক যুবতীর দল গান গাইতে গাইতে নব-

দম্পতীকে রাস্তার প্রান্তে এ্যান্‌লিসের কুঁড়েঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল, সেখানে আজ তাদের বাসর-শয়ন।

কার্‌স্‌টা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতে না জ্বালতে টোম্ গিয়ে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—সারাদিন মদ খেয়ে তার এমনি অবস্থা হয়েছিল যে যেই শোওয়া অমনি ঘুমে একেবারে বেঁহুস। কার্‌স্‌টা গিয়ে আস্তে আস্তে তার জুতো খুলে বালিশটা ঠিক ক'রে তার মাথায় গুঁজে দিয়ে তার পাশে শুল। ক্লান্তিতে তার গা হাত পা টন্‌টন্ করছিল, চোখ বুজে মনে হোলো খাট্‌টা যেন নৌকার মত দুলছে। কিন্তু তবু তার ঘুম এল না, সে কেবল স্বপ্ন দেখে গীর্জায় তাদের বিয়ে হচ্ছে, কিম্বা সরাইখানায় বোঁ বোঁ ক'রে সবাই মিলে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার খোপার ফিতেগুলো চাবুকের মত সোঁ সোঁ ক'রে বাতাসে উড়ছে—আর বারবার সে চমকে জেগে ওঠে। খানিকক্ষণ সে চোখ মেলে চুপ ক'রে থাকল—চারদিক অন্ধকার, নিঝুম। কি যেন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তার জীবনে আসছে—কিন্তু কি? ওঃ তাইতো, কাল তার স্বামী তাকে ছেড়ে যাবে, আর তারপর আবার সেই একঘেয়ে জীবন সুরু হবে; বিয়ের পালা ফুরোলো—এখন বহুদিন তার জীবনে আমোদ প্রমোদ একেবারে থাকবে না।

ক্রমে ভোর হোলো, জানালার শার্সিগুলো নীল হয়ে উঠল। কার্‌স্‌টা উঠে বসে দেখল টোম্ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার সুন্দর কোঁকড়ান চুলগুলো তার কপালের উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে, তার মুখ তখনো বেজায় লাল। কার্‌স্‌টা আস্তে আস্তে তার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ছোট্ট ছেলেটির মতো তাকে আদর করতে লাগল। তার স্বামী—একেবারে তার নিজের ধন, ঠিক যেমন তার সেমিজ, তার সেলাই, তার ছাগল—না, ছাগলটার থেকেও বেশি নিজের, কেন না ছাগলটা তো শুধু তার একলার নয়, তার মা'রও। এই তো হওয়া উচিত। সব মেয়ের যা নিত্যকার কামনা—স্বামী—আজ সে তা পেয়েছে—আর স্বামীর মতন স্বামী—কি বলিষ্ঠ বিপুল তার চেহারা! কিন্তু লাভ কি হোলো? পেতে না পেতেই তো তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কি দারুণ দুঃখ! ভাবতেও পারা যায় না। কার্‌স্‌টা আর বসে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি উঠে দুধের ভাঁড় নিয়ে ছাগলটাকে দোহাতে চ'লে গেল।

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে আর তুষার পড়ছে। ভোরের নীল আলো আকাশ ছেয়ে পৃথিবীর উপর লুটিয়ে পড়েছে। বহুদূরে দিগন্তে বনের কালো রেখার উপর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে—একেবারে শাদা তার রঙ্। কার্‌স্‌টা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে দুধের ভাঁড়,

আর এক হাত দিয়ে সে চোখ আড়াল ক'রে আছে যাতে আলো না লাগে। ক্রমে চারদিক পরিষ্কার হোলো। গ্রামের রাস্তার দুইপাশে ছোট ছোট মেটে রঙের বাড়িগুলোর সামনে আরো অনেক মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবার হাতে দুধের ভাঁড়, সবাই কার্‌স্‌টার মত বিষণ্ণ মুখে ভোরের আলোর দিকে তাকিয়ে—এই যে দিনটি এল, এদিনে যেন কি একটা ঘটবে, তারই প্রতীক্ষায় সকলে দাঁড়িয়ে।

কার্‌স্‌টা হঠাৎ শিউড়ে উঠে এক দৌড়ে গিয়ে গোলাবাড়িতে ঢুকল; বাড়ি অবিশ্যি নামে, আসলে একটা নীচু ছাদওয়ালা গুদোম ঘর বিশেষ; ছাগল, শুয়োর ও মুরগীদের এই হোলো আবাস। বাড়ির ভিতরটা গুমট হয়েছিল। কার্‌স্‌টার পায়ের শব্দ পেয়ে মুরগীগুলো ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'রে উঠল। শূয়রটা আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে আপন মনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিল। কার্‌স্‌টা ছাগলটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দোহাতে আরম্ভ ক'রে দিল—তার আঙ্গুল বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ল, টাট্‌কা দুধের স্পর্শ তার বেশ লাগছিল। তার চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে এল। ছাগলটার পিঠের উপর মাথা রেখে কার্‌স্‌টা কাঁদতে আরম্ভ করল—বিয়ের সময় যে রকম ভাবে সকলকে জানিয়ে সশব্দে কেঁদেছিল কিম্বা আজ তার স্বামী চ'লে যাবার সময় সহরের মধ্যে সবার সামনে যে ভাবে কাঁদবে ঠিক সে রকম কান্না নয়—সে একটি ছোট্ট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের জলে তার মুখ ভেসে গেল, দেখলে মনে হয় যেন সে মুখে গরম জলের ছিটে দিয়েছে; আর তার নিজের জন্য দুঃখে মন উঠল ভ'রে—খুব গভীর দুঃখে। এই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ছাগলটা যেমনি ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, শুধু মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে এই ঘুমন্ত মেয়েটিকে ঠিক মার মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখছিল।

হঠাৎ তার মার গলার আওয়াজ পেয়ে কার্‌স্‌টার ঘুম ভেঙে গেল, সে শুনল তার মা বলছেন, "ওমা, মেয়ে যে দেখি দুধ দোহাতে দোহাতে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোর কি দরকার ছিল আজ দুধ দোহাবার বল্‌তো?"

কার্‌স্‌টা ঘুমের ঘোরেই জবাব দিল, "কাউকে তো দোহাতে হবেই।" এ্যান্‌লিসে ব'লে উঠল, "তা তো বটেই! তাই কিনা দুধ দোহাতে গিয়ে ঘুমোতে হবে।"

এই প্রবীনা নারীটির কথাবার্ত্তা বরাববই এই রকম কর্কশ, কিন্তু তবু কার্‌স্‌টার মনে হোলো আজ যেন তার মার গলার স্বরে একটু চাপা হাসির আর একটু সম্ভ্রমের ভাব রয়েছে। তাতো হতেই হবে, একজন

কুমারীর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা চলে একজন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে তো আর সে ভাবে কথা বলা চলে না। কার্স্টা যে এখন বিবাহিতাদের দলে।

"যা, গিয়ে আগুন টাগুন জ্বালা, তোর স্বামী এতক্ষণে নিশ্চয়ই উঠেছে।" কার্স্টা লাফিয়ে উঠল। তাই তো! আজকের দিন আর অন্য দিন তো সমান নয়। আজকে যে সে তার সেরা পোষাক প'রে গাড়ি হাঁকিয়ে সহরে যাবে, সবার চোখে সে আজ পড়বে আর তার দুঃখে সবাই দুঃখ পাবে। এ সব ভেবেও আনন্দ।

প্রকাণ্ড এক শ্লে-গাড়িতে ক'রে গ্রামের মাতব্বর রংরুটদের সহরে নিয়ে যাবে এই কথা হয়েছে। তাদের বাপ মা ও স্ত্রীরা পিছন পিছন ষ্টেষণ পর্য্যন্ত তাদের পৌঁছতে যাবে।

খেতে বসে টোমের মুখে মোকদ্দমা ছাড়া আর কোনো কথা নাই—কি করতে হবে না হবে স্ত্রীকে সে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা এই। গ্রামের বনের কাছে ডাণ্ডুরের যে ছোট্ট জমী ছিল পিটার রুজ তা দখল ক'রে বসেছিল, কিন্তু আসলে এই জমীটি পাবার কথা কার্স্টার; কেননা রক্তের সম্পর্ক ধরলে সে ছিল এই সম্পত্তির পূর্ব্বেকার মালিকের সব চাইতে নিকট আত্মীয়, আর পিটারের দাবী তার সৎমেয়ের স্বামী হিসাবে। কার্স্টাকে বিয়ে ক'রে টোমেরও এই জমীর উপর দাবি হয়েছিল—সে চায় তার অনুপস্থিতিতেও কার্স্টা নিজের অধিকার সাব্যস্ত করে। "জ্যাকসন ব'লে যে উকীল আছে তার কাছে যাও। য়িহুদীদের মাথা খুব পরিষ্কার হয়, আর তার ফিও বেশি না। দেখো, ওরা যেন কিছুতেই তোমাকে না ঠকায়।" নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কার্স্টা খুব সজাগ। খুব গম্ভীরভাবে সে বলল, "নিশ্চয়। আমি সব ঠিক ক'রে দেব—আমি তো আর বোকা নই।" "বোকা হলে কি আর আমি তোমায় বিয়ে কর্তাম?" এই ব'লে টোম এই বিষয়ে আলাপ শেষ করল।

বেজায় চ্যাঁচামেচি ও তামাসা করতে করতে রংরুটের দল গাড়িতে উঠল। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা চারদিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, সবার চোখেই জল। চারটি কনে আবার একটি 'শ্লে'-তে চড়ে চলেছে। বরফ আরো বেশি পড়ছে। কনেদের মাথার চূড়োগুলি ঠিক কালকের মতো উঠছে আর নামছে, কিন্তু বরফ পড়ে তারা একেবারে শাদা হয়ে গেছে।

গাড়ি বনের কাছে পৌঁছাতে ম্যারি বল্‌ল, "এতে লাভটা কি হোলো? কাল থেকে তো আবার যেমন তেমনি!" আর তিনজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "উপায় কি?" যখন তারা সমুদ্রের ধারের রাস্তার উপর গিয়ে পড়ল, ইল্‌সে বল্‌ল, "যা অবস্থা দেখছি মনে হয় ক্ষেতের ফসল

একেবারে যাবে।” তাতে আর সবাই ব’লে উঠল, “এমনিতেই যা দিন যাচ্ছে, তার উপর ফসল নষ্ট হ’লে তো বাঁচাই দায় হবে।” এর পর সহরে পৌঁছানো পর্য্যন্ত আর কেউ কথা বলেনি।

সহরে পৌঁছে এত জিনিষ দেখবার ছিল যে একটু সুস্থির হয়ে দুঃখ করবার অবসরও তাদের হোলো না। তারপরে টাউন-হলের সামনে পুরুষদের জন্য অনেকক্ষণ তাদের দাঁড়াতে হয়েছিল, সেখান থেকে সবাই মিলে সরাইখানায় গিয়ে খাওয়া, তারপর আবার মদ ও কেক খাবার পালা, আর সব শেষে ষ্টেশনে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীদের ট্রেণে তুলে দেওয়া, এই সবের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

যাবার আগে টোম্ কার্‌সটার পিঠ চাপড়ে বল্‌ল, “ভয় কি? এটুকু জেনো আমরা কেউ মরছি না। খাবারের বড় অভাব—মাঝে মাঝে টাকা পাঠিয়ো কিন্তু।” “নিশ্চয়।” “আর মোকদ্দমাটার কথা ভুলো না—শীগ্‌গিরই উকিলের সঙ্গে দেখা কোরো!” “নিশ্চয়।” “বেশ ভেবে চিন্তে বুদ্ধি ক’রে সব কাজ কোরো। ফিরে এসে যেন বোকা না বনি।” “নিশ্চয়।”

ট্রেণ ছেড়ে দিল। কার্‌স্‌টা ও তার সঙ্গিনীরা স্থির হয়ে প্ল্যাটফর্‌ম্-এ দাঁড়িয়ে, তাদের পা আর চলে না, তাদের মুখে শুধু এক কথা, “ভগবান্—একি করলে।”

সব প্রথম কার্‌স্‌টা চুপ করল, তাকে যে উকিলের বাড়ি যেতে হবে।

উকিলের বাড়ি কার্‌স্‌টাকে খানিকক্ষণ বসতে হয়েছিল, বেশ সুন্দর আর গরম একটি ঘরে। উকিল লোকটি দেখতে ছোট্ট খাট্টো, কথা মিষ্টি। কার্‌স্‌টার কাছে সব শুনে তিনি আশ্বাস দিলেন, কোনো ভয় নাই, মোকদ্দমায় জিতের সম্ভাবনা খুব বেশি। তার উপর আবার একটু রসিকতা করতেও তিনি ছাড়লেন না। কার্‌স্‌টার চিবুক ধ’রে তিনি বললেন, “সেপাইর গিন্নি, আর এই রূপসী, তার কপালে কিনা এতদিনের বিরহ। হায়রে!” কার্‌স্‌টা ভাব্‌ল, যা হোক্ মোকদ্দমার গতিক ভালো।

যখন শ্লে-গাড়ির দল লম্বা সারবন্দী হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হোলো, তখন বেলা পড় পড়, অন্ধকার হয়ে এসেছে, মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন আগুনের ডোরা, আস্তে আস্তে সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য ডুবছে—র‍্যাস্‌প্‌বেরির মতো টক্‌টকে লাল তার রং, ধূসর জল যতদূর দেখা যায় লাল হয়ে উঠেছে, ঢেউয়ের মৃদু গর্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক যেন রেশমের খস্‌খস্ শব্দ।

সারাদিন হেঁটে, দাঁড়িয়ে, মদ খেয়ে, আর কেঁদে সেপাইর স্ত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনে তাদের স্ফূর্ত্তি নাই,—চুপ ক’রে ব’সে তারা দেখছিল

সূর্য্যাস্তের রঙের ছটা ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। বনের ভিতর অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল আর পাইন গাছের ঝাঁকরা চুলের মতো কালো মাথার ওপর চাঁদ দেখা দিল, এই চারটি নারীর মনের ভার অসহ্য হয়ে উঠল। কাঁদার শক্তি আর তাদের ছিল না, তাই তারা গান ধরল—যে গান তাদের সব প্রথম মনে পড়ল। তারই করুণ সুরে বন ভ'রে গেল।

কি লাভ হোলো এই বিয়ে ক'রে? এ্যান্‌লিসের কুঁড়েঘরে জীবনের ধারা ঠিক তেমনি বইছে। কার্‌স্‌টা রোজ ছাগল দোহায়, বনে বনে কাঠ কুড়ায়, তাঁতে কাপড় বোনে। ডিসেম্বর মাসের ছোট দিন, তিনটের সময় অন্ধকার হয়, কার্‌স্‌টা ঠিক ছ'টায় গিয়ে তার বিছানায় শোয়, তার সেই ছেলেবেলার ছোট্ট খাট্‌টিতে, সেটাকে আর বদলান হয়নি, বদলাবার দরকারই বা এমন কি ছিল? ওদিকে রাত চুটো বাজতে না বাজতেই তার ঘুম ভেঙে যায় আর সে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আবার তাঁতে বসে। দিন আসে দিন যায়, কিন্তু এই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনের আর কোনো নড়চড় হয় না, ঠিক ছাই রঙের পশমের সুতোর মধ্যে তাঁতের মাকু যেমন চলে—এদিক আর ওদিক, এদিক আর ওদিক। কার্‌স্‌টার যে বিয়ে হয়েছিল তার একমাত্র চিহ্ন সে এখন বিনুনির বদলে খোপা করে। ছুটির দিন সে আর সবার সঙ্গে নাচতে যায় না, আর শনিবার রাত্রে তার কোনো ছেলে-বন্ধু লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। মেয়েদের জীবনে যা প্রধান ব্যাপার, ছেলেদের কথা ভাবা, তাদের জন্য অপেক্ষা করা, আর মাঝে মাঝে তাদের জন্য কাঁদা—কার্‌স্‌টার তা ফুরিয়ে গিয়েছে। কেইবা আছে তার গল্প করবার লোক আর কি গল্পই বা সে করবে? যে-সব মেয়েদের বিয়ে হয়নি তারা বলে তাদের ছেলে-বন্ধুদের কথা, আর যাদের বিয়ে হয়েছে তারা বলে স্বামীর কথা, ছেলেপিলের কথা, আর ঘরকন্নার কথা। কার্‌স্‌টার তো এসব কিছুই নাই। তাই সে মুখ ভার ক'রে চুপ ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে তার আর কিছুতেই ঘুম আসে না, বিছানায় শুয়ে সে শুধু ছট্‌ফট্‌ করে। চারদিক নিস্তব্ধ। জানলার ছোট্ট শার্সির ভিতর দিয়ে সে দেখতে পায় শীতের আকাশে তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। পাশের কুঁড়ে-ঘরগুলোর প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট তার কানে আসে। ঐ যে বিলির ছোট্ট ছেলে কেঁদে উঠল। জেজ্‌ মাতাল হয়ে সবে বাড়ি ফিরছে, ঘরে পা দিতে না দিতে চৌকাঠের উপর সে হোঁচট খেল। এবার সে বিলিকে ধরে মারছে, বিলি চ্যাঁচাচ্ছে আর বকছে। কার্‌স্‌টার মনে হয় সে বড় একা। তার কেন এসব কিছু নাই? সে চায় তার স্বামীকে—তার টোমকে। তার চুই চোখে জল ভ'রে আসে, বালিশে মুখ গুঁজে মড়ার মতো সে পড়ে থাকে।

তবু যা হোক মোকদ্দমাটা ছিল। তার মন একেবারে জুড়ে ছিল এরই ভাবনা, আর এর জন্যে তার কদর বেড়ে গিয়েছিল। সপ্তাহে একদিন সে চারঘণ্টার পথ হেঁটে উকিলের বাড়ি যেত। রাস্তার ধারের প্রত্যেকটি গাছ, এমন কি প্রত্যেকটা পাথর পর্য্যন্ত তার জানা। তার পথের এই বোবা সাথীগুলোর সঙ্গে তার এমনি নিবিড় পরিচয় যে যেমন দিনই হোক না কেন সে ঠিক তাদের চিনতে পারে। যদি ঠাণ্ডায় তার হাতের আঙুলগুলো একেবারে জ'মে যাবার মতো না হয়, তাহলে সে পথ চলতে চলতে মোজা বোনে। মাথায় লাল রুমাল জড়িয়ে যখন সে উকিলের বাড়ি যায় তখন তাকে চিনতে পারে না এমন লোক ও অঞ্চলে নাই, আর কেইবা না জানে তার মোজা বোনার আর তার মোকদ্দমার কথা?

কাঠুরের দল তাকে দেখতে পেলে চেঁচিয়ে বলে, "বলি, ও সেপাইর গিন্নি, একলা একলা লাগে কেমন?" প্রশ্ন শুনে কারস্টা থমকে দাঁড়ায়, তারপর জামার হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, "মন্দ কি? বেশ তো আছি।"

"টোমের আসতে তো আরো বছর ছয়েক হতে পারে, না?" "তা হোক না, আমার তাতে ভারি।" এই জবাব শুনে বনের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। কাঠুরের দল বলে, "দেখি ভারি একলা থাকার সখ! বলি, মোকদ্দমা চলছে কেমন?" "চমৎকার! যার দিকে স্বয়ং ধর্ম্ম, তার ভাবনা কি?" "বলো কি?"

একটি লোকের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয়—এই বনের যে তদারক করে তারই সহকারী। কালো গোঁফ, সবুজ কোটের কলার আর রূপোর ঘড়ির চেন—এই হোলো তার পরিচয়। বয়স অল্প। লোক খাসা। সে প্রতিবারই কারস্টাকে ডেকে কথা বলে আর ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করে, "সেপাইর গিন্নির খবর কি?" কারস্টার মুখ প্রায় লাল হয়ে ওঠে, তার দিকে ফিরে কারস্টা জবাব দেয়, "কেন, বেশ ভালো।"

"স্ত্রী না হলেও টোম্ তাহলে বেশ আছে—একেবারে এতদিন পর্য্যন্ত।" "তার ভাবনা কি? য়িহুদী আর পোল মেয়ের কি আর তার অভাব হবে?" "তোমারই বা কি ভাবনা? এখানেই কি কিছু পুরুষ মানুষের অভাব নাকি?" "তাতো বটেই।" "তা যাই বলো, তোমার মতো অমন টুকটুকে তরুণীটি হলে আমি কি আর পথ চেয়ে ব'সে থাকতাম যে কবে আমার সেপাই স্বামীটি ফিরবেন?" "কে বললে আমি ব'সে আছি?" এই ব'লে কারস্টা হো হো ক'রে হেসে ওঠে—কেউ রসিকতা করলে যেমন ভাবে হাসা উচিত ঠিক তেমনি ক'রে।

লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। সে ব'লে উঠল, "ওঃ তাই নাকি? তা তোমাতে আমাতে মানায় ভালো, তুমি কেমন ছোট্ট খাট্টো আর আমি তেমনি লম্বা।" "যা বল্লে। এই যে পার্ব্বন আস্‌ছে, তখন তোমাতে আমাতে একটা চুক্তি করা যাবে।" এই বলতে বলতে কার্‌স্‌টা আবার পথ চলা সুরু করে। একদিন লোকটি কার্‌স্‌টাকে ধ'রে আদর করে আর কি! কার্‌স্‌টা জোর ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়। কিন্তু সারাদিন এই কথা যতই ভাবে ততই তার হাসি পায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার কেবল মনে পড়ে লোকটির চোখ, আর যখন সে শোনে ছেলেরা সব যে-যার মনের মতো মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে, তখন তার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার চোখের ঘুম যায় চ'লে।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সহরে যাওয়া আসার ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। পরিষ্কার ঝরঝরে বিকালগুলো, দেরিতে সন্ধ্যা হয়, বাড়ি ফিরবার পথে তাই তার কোনো তাড়া থাকে না। সে প্রায়ই খুব আস্তে আস্তে পথ চলে, একবারে পা পা ক'রে হাঁটার মতো, যেন সে প্রাণে ধ'রে বন ছেড়ে যেতে পারে না। তার মনে হয় "এতো দেখি ভারি মজা! এই বসন্তকালের বিকালবেলায় মানুষকে কি আলসেমোতেই না ধরে। এমনি আলসেমো যে মোকদ্দমার কথা পর্য্যন্ত আমার ভাবতে ইচ্ছা হয় না। অদ্ভুত!"

লম্বা লম্বা ফারগাছের সারি, তারি মাঝে এক একটি বার্চ্চ নতুন পাতায় ছেয়ে গেছে, যেন একটা সবুজ কানাৎ দিয়ে কেউ ঢেকে দিয়েছে; কোথাও বা বনের মধ্যে শাদা রঙের কি একটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে, ঠিক যেন কেউ শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওটা হোলো বুনো বেরি গাছ, একেবারে ফুলে ছাওয়া, এক মাইল দূর থেকে এর গন্ধ নাকে আসে।

বনের পাশে মাঠের মধ্যে কালো হরিণগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; মেয়েদের গানে পাহাড় আর মাঠ ভেসে যায়। কি গান যে তারা গায় কার্‌স্‌টা তা খুব ভালো ক'রেই জানে। বসন্তের রাতে প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে এমন মেয়ে ক'জন আছে? ঘুমোবার চেষ্টা করা বৃথা। কার্‌স্‌টা তাও জানে। সেও এমনি কত রাত গান গেয়ে কাটিয়েছে—তার গলার সুর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। উৎসুক হয়ে সে অপেক্ষা করেছে—কেউ কি সাড়া দেবে না? একটি সুন্দর মুখের নিবিড় স্পর্শে কি তার তৃষিত অধর তৃপ্ত হবে না? কার্‌স্‌টা পথ চেয়ে কান খাড়া ক'রে শোনে বনের ভিতর কোনো আওয়াজ পায় কি না; অতীতের স্মৃতিগুলো ঠিক ছবির মত তার চোখের সামনে জেগে ওঠে।

একদিন বনের মধ্যে মর্‌মর্‌ শব্দ শুনে কার্‌স্‌টা চমকে উঠল। একটা হরিণ ভয় পেয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল। আবার সেই মর্‌মর্‌ শব্দ—কার্‌স্‌টা তাকিয়ে দেখল তার বনের বন্ধু তার সামনে দাঁড়িয়ে।

কার্‌স্‌টাকে সে কতই সোহাগ ক'রে ডাকল। চাঁদ তখন ঠিক মাথার উপর, তারই আলোয় লোকটির মুখ আর চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আবার বুঝি সহরে যাওয়া হয়েছিল?" কার্‌স্‌টা থেমে দাঁড়াল,—তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল, হ্যাঁ, সে সহরে গিয়েছিল বৈকি—নইলে তার আর বেরোনোর দরকার কি? "কি সুন্দর হয়েছে। হেঁটে বেড়াবার মত রাত বটে।" "হ্যাঁ, সত্যি ভারি সুন্দর!"

লোকটি হেসে উঠে একবার কার্‌স্‌টার মুখের দিকে তাকালো, তারপর চুপ ক'রে রইল। কার্‌স্‌টাও কোনো কথা বলল না, শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকল। অবশেষে কার্‌স্‌টাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে বল্‌ল, "চলো, যাই—শুধু আমরা দুটি—আর কেউ না।"

"তাই তো, তোমার হোলো কি?" কথাটা কার্‌স্‌টা বেশ খর্‌খরে গলায় বলবার চেষ্টা করেছিল, যেন সে ছেলেদের সঙ্গে তামাসা করছে —কিন্তু তার স্বর কেমন যেন আপনা হতে কোমল হয়ে এল। তারপর তারা যখন গাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল আর লোকটি তার মস্ত হাত বুলিয়ে কার্‌স্‌টাকে আদর করছিল, তখন তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল, সে ভাবল লোকটি যাই চাক্‌না কেন, না বলবার সাধ্য তার নাই।

ভোর হোলো। কার্‌স্‌টা যখন বেশ পা চালিয়ে গ্রামের দিকে চলেছে, তখন পাখীর ডাকে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠেছে।

সে পথ চলে আর ভাবে, "যদি বনের ভিতর একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে রাত কাটানো যায়—তাহলে যা হবার তা হবেই। আবার কি!"

এরপর সহর থেকে ফেরার পথে কার্‌স্‌টার সঙ্গে লোকটির প্রায়ই দেখা হয়, আর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। কার্‌স্‌টার মা এ্যান্‌লিসে বলেন, "তোর দেখছি দেরি ক'রে বাড়ি ফেরা একটা রোগ হয়েছে— ব্যাপার কি?"

কার্‌স্‌টা জবাব দেয়—"ব্যাপার মোকদ্দমা। অত চট্‌ ক'রেই কি আর তা হয়, এতো আর রান্না নয়।"

মেয়েরা গান গায়, ছেলের দল তাদের বাড়ির দরজায় হানা দেয়, কিন্তু কার্‌স্‌টার মন আর এতে চঞ্চল হয় না।

ফসল কাটবার সময় কার্‌স্‌টা জানতে পারল তার সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে। মোটেই সুবিধার কথা নয়। এখন উপায় কি? সে গোলাঘরে

তার ছাগলটার কাছে গিয়ে সবার চোখের আড়ালে খানিকক্ষণ কাঁদল, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে কাজে মন দিল। লোকটির সঙ্গে দেখা হতে সে খুব রাগ ক'রে তাকে যা'তা' বলল, কাঁদাকাটি করল। কিন্তু এ ক'রে আর লাভ কি ?

সে ধীরভাবে তার কাজ ক'রে যায়, তার মুখে কথা নেই, তার রং ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। গ্রীষ্মের সময় কাজের চাপ খুব বেশি, কিন্তু কোনো কাজ সে ফাঁকি দেয় না। কেবল মাঝে মাঝে তার মেজাজ বিগড়ে যায়, তখন সে মার সঙ্গে খিটিমিটি করে, কিম্বা ছাগলটাকে ধ'রে মারে। আর মোকদ্দমার কাজ থাকুক বা না থাকুক ঘন ঘন সহরে যায়। যদি মোকদ্দমায় হার হয় তাহলে তার দফা শেষ, টোম্ এসে তাকে আর তার ছেলেকে আস্ত রাখবে না। তাই তো, ছোট ছেলেটা যে আসছে, তার কি দশা হবে ? কি আর হবে ? অমন ছেলে পৃথিবীতে কতই হয়—আর ম'রেও যায়। টোমের আসতে তো এখনো অনেক দেরি। কিন্তু তবু সে তার ছেলের কথা না ভেবে পারে না ! তার কেমন টুক্‌টুকে একটা দোলনা হবে, তার বিছানায় কেমন ধব্‌ধবে চাদর পাতা হবে,—আর অমন ছোট্ট একটি নরম জিনিষ একেবারে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে কেমন লাগবে ! "দূর ছাই ! ছেলে না বাঁচলেই ভালো !"

আলুর ক্ষেতে যখন ফসল ধরল, কার্‌স্‌টা তার অবস্থা আর গোপন রাখতে পারল না। সে একটি একটি ক'রে আলু তুলে তার আঁচলে রাখে আর শোনে পেছনে বিলি বলছে, "কার্‌স্‌টা দেখছি টোম্ বাড়ি ফিরলে তাকে দেবার মতো একটা কিছু জোগাড় করেছে—অমন জিনিষ পেলে টোম্ কি আর খুসী না হয়ে পারে !" এই কথায় অন্য মেয়েরা হেসে ওঠে, আর তাদের হাসি দেখতে দেখতে মাঠময় ছড়িয়ে পড়ে। কার্‌স্‌টা ভাবে, "এরকম যে হবে জানাই তো ছিল আর হোলোও তাই।" তার হাঁটু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, তার আঁচল থেকে আলুগুলো মাটিতে পড়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে সে সবার দিকে তাকায়—কিন্তু জানে সে অসহায়। আবার সে তার কাজে মন দেয়। তার লাঞ্ছনার আর শেষ নাই। যখন মাঠ পার হয়ে সে আলুর বোঝা গাড়িতে তুলতে যায়, চারদিক থেকে তাকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, "বল্ না, কার্‌স্‌টা, এমন রত্ন পেলি কোথায় ? সহরে নাকি ? তা সহরে খুব সস্তাতেই ওসব জোটে। এ বুঝি মোকদ্দমার ফল ? না তোর টোম্ ডাকে পাঠিয়েছে ?" কার্‌স্‌টা নিরুত্তর।

একদিন না একদিন লোকের কথা থামবেই। তখন সে একটু সোয়াস্তি পাবে। তার মাও কম যায় না—সারাদিন তার ঘ্যান ঘ্যান আর

মুখ-ঝাট্‌কা লেগেই আছে। বকাবকি ক'রে লাভ কি ? কার্‌স্টা ভাবে যা ঘটে মেনে নেওয়াই ভালো। মানুষের কপালে দুঃখ আছেই—এই ভেবে তবু সে মনে একটু বল পায়।

একদিন শীতকালে বনের ভিতর কাঠ কুড়োতে গিয়েছে এমন সময় তার ব্যথা উঠল। মেয়েরা সবে মিলে যখন তাকে একটি শ্লে-গাড়িতে তুলে টানতে টানতে গ্রামে নিয়ে এল, তখন তাদের সে কি উদ্দাম হাসি ! কার্‌স্টার একটি মেয়ে হোলো। সে এতদিন যার অপেক্ষায় ছিল—যাক্, অবশেষে তিনি হাজির ! কই, মরবার নামও তো নেই। কেমন পুষ্ট শরীরটি ! আর ছোট্ট কচি মুখটি দেখলে মনে হয় যেন কত ভাবনাই তাঁকে ভাবতে হয়, আর মিষ্টি দু'টো চোখ একেবারে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। কেউ আর ঠাট্টা করে না। করলেই বা কি যায় আসে ? মোকদ্দমা ছাড়াও কার্‌স্টার জীবনে এখন এমন জিনিষ আছে যার জন্যে সে বেঁচে থাকতে পারে। অবিশ্যি মোকদ্দমার তদ্বির করা তার প্রধান কর্ত্তব্য—কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটিকে যে সারাদিন না দেখলে চলে না। এঁর কাজ কি কম—এঁকে দোল দেওয়া, এঁকে দুধ খাওয়ানো, আর গরম দিনে কোলে নিয়ে দোর-গোড়ায় ব'সে গান গাওয়া।

টোমের চিঠি এল। সে লিখেছে—"খবর খারাপ। অসুখে পড়েছি। এরা আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আসছে সপ্তাহেই পৌঁছাব। সাবধানে থেকো। ইতি তোমার টোম্।"

শীতকালে ঘরে আগুন জ্বালা হয়েছে, তারি আলোয় কষ্টে কার্‌স্টা চিঠিটা পড়ল। মা জিজ্ঞাসা করল, "কি লিখেছে ?" "কি আর লিখবে ?" এই ব'লে কার্‌স্টা আগুনের কাছে বেঞ্চির উপর ব'সে পড়ল, সে আর দাঁড়াতে পারছিলনা। মা আবার জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ? ভালো আছে তো ?" কার্‌স্টা কোনো জবাব দিল না। চুপ ক'রে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল। "জবাব দিচ্ছিস না কেন ? কি লিখেছে টোম্ বল্‌তেই হবে।" আস্তে আস্তে শুক্‌নো গলায় কার্‌স্টা বল্‌ল, "শীগগিরই ফিরছেন।" কার্‌স্টা ভাবছিল, "আর যাই হোক ছেলেটাকে যদি কিছু না বলে।" তার মার মনেও ঐ এক চিন্তা, কেন না সে বল্‌ল, "দোলনাটা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন যেতে আস্‌তে সব সময় তার চোখে না পড়ে।" কার্‌স্টা বল্‌ল, সে ব্যবস্থা সে করবে। খানিকক্ষণ তারা দু'জন পাশাপাশি চুপ ক'রে বসে থাকল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে যে-যার বিছানায় গিয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে মা মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "মোকদ্দমা ভালো চল্‌ছে তো ?" "ভালো না চ'লে উপায় আছে ?" "আচ্ছা—তাহলে"—এই বল্‌তে বল্‌তে এ্যান্‌লিসে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন শনিবার, বিকাল বেলা, কার্‌স্‌টা সরাইখানার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল। যে-সব সেপাই ছুটি পেয়েছে তারা আজ ফিরবে, সহর থেকে শ্লে-গাড়িতে ক'রে তাদের আসার কথা। অসহ্য শীত! টক্‌টকে লাল সূর্য্য কাচের মত স্বচ্ছ আকাশে অস্ত যাচ্ছে। গ্রামের মেয়ের দল সব সেখানে জড় হয়েছে। কোঁচরের মধ্যে হাত গুঁজে তারা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে আর ব্যগ্র দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। ঐ যে—সেপাইরা আসছে! তারা টুপি নেড়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করল।

কার্‌স্‌টার সঙ্গে দেখা হতে টোম্ বল্‌ল, "তেমনি ছোট্টটি, কিন্তু যাহোক তবু ত বেঁচে আছ।" কার্‌স্‌টার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল টোম এমন জোয়ান। তার কি রকম লজ্জা করতে লাগল। কোনো রকমে একটু হেসে বলল, "না বাঁচার কি হয়েছে।" কিন্তু তার চোখে জল ভ'রে এল, সে টোমের জামার হাতায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর বল্‌ল—"চলো, খাবার তৈরী।" "খাবার—তা বেশ" ব'লে টোম্ হালকা মনে হাসল। "আমি বোধ হয় এখনো যথেষ্ট মোটা নই, তাই গিন্নির এত উৎসাহ আমাকে ভালো ক'রে খাওয়ানোর।" এই ভাবে গল্প করতে করতে তারা বাড়ি চল্‌ল—আগে আগে টোম্, পিছন পিছন কার্‌স্‌টা।

সবুজ পাতা দিয়ে তাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরটি সাজানো হয়েছে, আর তাতে আলো দেওয়া হয়েছে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে; টেবিলের উপর একটা পরিষ্কার শাদা চাদর পাতা, সরু সরু পাইন পাতা মেজেতে ছড়ানো। আগুনের উপর হাঁড়ি চড়ানো, এ্যান্‌লিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাতে কাঠি দিচ্ছে।

"তাই তো, মা এখনও ঠিক রয়েছেন। বুড় হাড়ের তেজ আছে!" এ্যান্‌লিসে বল্‌ল, "এখনো কিছুকাল এতেই চ'লে যাবে। যা হোক্, তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে।"

টোম্ টেবিলে গিয়ে বসল। তাকে শূয়োরের মাংস খেতে দেওয়া হোলো। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে সে খেতে লাগল। ভরা মুখে কার্‌স্‌টার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "জমীদার, ডাণ্ডুরের জমীদার।" ঠিক তার সামনে ব'সে কার্‌স্‌টা ভাবছিল, "একজন পুরুষ মানুষের চেহারা কি এত সুন্দরও হতে পারে, আশ্চর্য্য!" টোমের মুখ রোদে এমনি পুড়ে গিয়েছিল যে তার গোঁফগুলো প্রায় সাদা দেখাচ্ছিল, কিন্তু কি রকম তার কাঁধের বহর, আর দুটি বিশাল বাহু, আর গলা! এমন বলিষ্ঠ স্বামী পাওয়া কি আনন্দ!

টোমের ক্ষিদে মিটেছে। হাত দিয়ে মুখ মুছে সে চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে বল্‌ল, "তাহলে এবার মোকদ্দমার খবরটা শোনা যাক।"

কার্‌স্‌টা খুব গম্ভীর মুখে সব খবর ব'লে যেতে লাগল। উকিল কি রকম সব বুদ্ধিমানের মতো কথাই না বলেছেন, আর সেই বা কি কম গিয়েছে—কি কথায়, কি কাজে! সম্পত্তিটা প্রায় তারই বলা চলে। টোম্ মন দিয়ে সব শুনে বল্‌ল, "একরত্তি মেয়ে—কিন্তু বাপ! কি মাথা।" কার্‌স্‌টাকে আর পায় কে—সে গড়গড় ক'রে ব'লেই চলেছে। দূরের কোণ থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ শোনা গেল। কার্‌স্‌টার কথা থাম্‌ল না। ঠিক কলের পুতুলের মতন উঠে গিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে জামার বোতাম খুলে তাকে খাওয়াতে লাগল। কেবল তার গলার স্বর একটু চড়ে গেল, যাতে ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে শোনা যায়। হঠাৎ কথার মাঝখানে সে থমকে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে এ্যান্‌লিসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কার্‌স্‌টা ভাবল, "এবার আমার দফা শেষ।" টোম্ আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছিল—তার ভাব দেখে মনে হয় একটা কি যেন সে ধরার চেষ্টা করছে। মেয়েটাকে দোলনায় শুইয়ে কার্‌স্‌টা সেটা আগ্‌লে দাঁড়ালো, তার রং ফ্যাকাশে, তার চোখের দৃষ্টি ভয়কাতর! তার হাত দুটো এমনি কাঁপছিল যে সে দুই হাত পেটের উপর শক্ত ক'রে চেপে ধরেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, "অবশেষে যা হবার তা হতে চল্‌ল।" টোম্ জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি?" তার গলার স্বর চাপা, যেন কেউ টুঁটি চেপে ধরেছে। "কি মনে হয়?" "এই ছোট্ট মেয়েটা কোত্থেকে এল?" "কোত্থেকে আবার আস্‌বে?" কথাগুলো খুব জোর দিয়ে সে বল্‌ল—যেন কারো তোয়াক্কা সে রাখে না, কিন্তু ব'লেই দুই হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, যেন একটি ছোট ছেলে দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

"ও! তুই কিনা এই রকম। আচ্ছা।" এই ব'লে টোম্ তার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে তাকে নিয়ে গেল। "স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা! মজা টের পাওয়াচ্ছি! দুজনকেই যদি খুন না করেছি।" নির্দ্দয়ভাবে সে কার্‌স্‌টাকে ধ'রে পিটোতে আরম্ভ করল। কার্‌স্‌টা চ্যাঁচাতে লাগল আর সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ল স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পেতে। তার মনে হচ্ছিল, "একেবারে লোহার মত হাত! বাপ্‌রে! কি জোর! আমাকে নিশ্চয় মেরেই ফেল্‌বে—কি সর্ব্বনাশ!" কিন্তু গায়ে যতই ব্যথা লাগুক, মনে সে তৃপ্তি পাচ্ছিল। হ্যাঁ—তার যে একজন স্বামী আছে তার হাতের মার খেয়ে সে আরো স্পষ্ট ক'রে তা' বুঝল।

টোম্ হাঁপিয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে টেবিলের ধারে গিয়ে ব'সে পড়ল। কার্‌স্‌টা মেজেয় গড়াচ্ছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। টোমের দিকে আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখছে তার মার শেষ

হয়েছে কিনা। সে যে অমন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, তার দিকে ফিরেও চাইবে না, তার চেয়ে বরং মারধোর সওয়া যায়। টোম্ ছুই হাতে মাথা ধ'রে ভাবছে। কার্স্টা কষ্টে উঠে আগুণের ধারে ব'সে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আপন মনে কাঁদছে আর ভাবছে—"বেচারি! সত্যি ওর কি দুঃখ!"

মোমবাতিগুলো পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বরফ পড়ছে, জানলার শার্সির উপর ছোট ছোট বরফের টুকরোর টপ্ টপ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আগুণের সামনে একটা ঝিঁঝি প্রাণপণ ডাকছে। কার্স্টা ভাবছিল—"ও করবে কি? আবার রাতে আমাকে মারবে নাকি?"

টোম্ ঢক্ঢক্ ক'রে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেল, তারপর মস্ত এক হাই তুলে জুতো খোলার ব্যবস্থা করছিল। কার্স্টা উঠে নিজেই তার জুতো জোড়া খুলে দিল। তারপর পোষাক ছেড়ে টোম্ বিছানায় ধপ্ ক'রে গিয়ে শুল, তার বিপুল দেহের চাপে খাট্টা এমনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে লাগল যে মনে হোলো ভেঙে পড়ে আর কি! খুসিতে কার্স্টা মুখের হাসি চাপতে পারল না। "কি রকম ভারী শরীর!" বাতি নিবিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে আগুণের ধারে সে বসল। তার খালি পা ছুটো আগুণের আভায় গোলাপী দেখাচ্ছিল। স্তব্ধ হয়ে উৎসুক মনে সে ব'সে—তার স্বামীর প্রত্যেকটি নিশ্বাসের শব্দ সে কান পেতে শুনছে।

হঠাৎ বিছানার উপর থেকে টোম্ বলে উঠল—"এই! ওখানে ব'সে কেন? শোবে না?" কার্স্টা অস্বাভাবিক রুক্ষ গলায় জবাব দিল—"না শুয়ে করব কি?" কিন্তু বিছানার কাছে যেতে না যেতে তার মন আবেগে ভরে গেল—সেও এখন অন্য স্ত্রীদের মতন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত এই ছোট্ট কুঁড়েঘরটিতে শান্তি ছিল না। মাঝে মাঝে টোমের মনে পড়ে যেত তার স্ত্রী তার প্রতি কি অন্যায় করেছে, আর সে একেবারে ক্ষেপে যেত। কি মারধোর আর চীৎকারই না তখন হোতো। ভাঁটিখানায় সে শপথ করল যে স্ত্রী ও তার মেয়ে ছুজনকেই সে খুন করবে। মেয়েটাকে তার কাছ থেকে কেবলই লুকিয়ে রাখা হ'ত। কার্স্টা কিন্তু বলত, সব সয়ে যাবে, পুরুষরা সবই এক রকম—তার আর নড়চড় নাই। সত্যি, যতই দিন যায় টোমের মুখে মেয়েটার কথা ততই কম শোনা যায়, সে কেবল বলে মোকদ্দমার কথা। জমীটা পেলে তারা কটা গোরু রাখবে, আর কটা শূয়োর, এই সব আলোচনাতেই তাদের সময় কাটে—তাছাড়া আরো কত কি! ক্রমে মেয়েটা যে আছে সে কথা সে এক রকম ভুলেই গেল। কার্স্টাকে এখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে হয় না।

সেদিন মানব সত্তা লভিবে কি শান্তি ?
অনির্ব্বাণ মহানন্দে হবে জ্যোতিষ্মান ?
হয়ত সেদিন এক নবতর ক্লান্তি
নামি ভারাক্রান্ত তার করিবে পষাণ !
পূর্ণতা সেদিন তার মনে হবে ভ্রান্তি,
মাগিবে নিয়তি হস্তে অপূর্ণতা দান ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন।

জ্যোৎস্নায়

আজ চোখে ঘুম নাই ! আকাশেরো ঘুম নাই যেন।
নরম ঘুমের মত জ্যো স্না জেগে রয়।
ভেবে ছ্যাখো একবার—এমনি মদির জ্যোৎস্নারাতে
মালিনীর স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রূপালী বাতাসে :
উটজে ফেরেনি শকুন্তলা,
চেয়ে আছে, কোন্ পথে এসেছিল দুষ্মন্তের রথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায়
দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজের স্বপ্ন চোখে তার।
সেদিনো এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাত—
ট্রয়ের পাষাণপুরী পরিশ্রান্ত পশুর মতন
ঘুমায়ে পড়েছে ; শুধু জেগে আছে হেলেনের চোখ—
জেগে আছে—দ্রুতগতি সমুদ্রের পাখীর পালকে,
জেগে আছে—দূরান্তের অর্দ্ধস্ফুট ঢেউয়ের সঙ্গীতে !

ঘুম ? আজ না-ই হোল ঘুম ! থাক' জেগে।
এই রাতে ঘুমায়নি ইস্লুফ জুলেখা।
নেমে এসো অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নার বর্ষণে।
নগ্ন আকাশের তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমের মত স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায়।
আজ আর না-ই হোল ঘুম !

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

নব আবাহন

সৃষ্টির আকাশে সাজে
ভীষণ দুর্য্যোগময়ী বিস্রস্ত-ভূষণা অমানিশা।
নাহি গ্রহ নাহি তারা,
ক্ষণে ক্ষণে জাগিতেছে
মেঘপুঞ্জে বিদ্যুন্ময়ী করালীর ভয়াল ভ্রূকুটি,
তাণ্ডব-অশনি-মন্দ্রে ঘোর অট্টহাসি !
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নৃত্যক্লান্ত ঝঞ্ঝার নিঃশ্বাসে
অসহায়া ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে লাগে দোলা,
অরণ্যের দ্রুমে দ্রুমে উৎপাটন-উৎসব-মর্ম্মরে
বাজে যেন উচ্ছৃঙ্খল দামামা দুন্দুভি !

গৃহহারা পথহারা লক্ষ্যহারা মানবের মর্ম্মে জাগে
দুবিষহ অরুন্তুদ একী আর্ত্তনাদ !
একী আন্দোলিত করুণ প্রার্থনা !

"ওগো প্রভু,
রুদ্ধশ্বাস ভীত বক্ষে বেদনার বহ্নিজ্বালা
সহে না—সহে না
নয়নের ক্ষীণ দীপ্তি নাহি হেরে সম্মুখের পথরেখা আর !
দাও, দাও, কোথা প্রভু, খুলে দাও আলোক-নির্ঝর,
প্রাচীর ললাট-দেশে মুক্ত কর স্বর্ণপ্রভ প্রভাতের দ্বার,
মুছে নাও ধরা পৃষ্ঠে মৃত্যুর কালিমা,
মুছে নাও নির্ম্মম নিষ্ঠুর ঘোর রাক্ষসী-আক্রোশ !
দাও প্রভু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের পরম আস্বাদ,
সুষমা-সুরভি বায়ে পূর্ণ কর দিক,
দীপ্ত কর জীবনের অপ্সরা-সঙ্গীত !"

হে মহিমময়,
আর কত কাল রবে অপাবৃত রহস্যের মোহিনী মায়ায়,
যোগনিদ্রাতুর ?
অসুন্দর-অন্তরালে মহিমা তোমার
কত কাল রবে আর অস্ফুট কোরক ?
মানবের চেতনায় ভাস্কর দীপ্তিমা তব
কত কাল রবে আর কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা ?

আর নহে
জীবনের সিন্ধুতীরে ফেনশীর্ষ অজ্ঞানের তরঙ্গ-কল্লোল।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকার ধাঁধা,
শ্রান্তির ক্লান্তির ক্লেদ-জর্জ্জরিত মুহ্যমান্ প্রাণে
সুন্দরের দারুণ লাঞ্ছনা,
নাহি নাহি প্রেম প্রীতি
দুর্দ্দম দুরন্ত ক্ষিপ্ত অরণ্য পশুর
নগ্নতার কাম-পঙ্কে কামনা বিলাসে,
শোণিত-পিপাসা-মত্ত উৎকট উল্লাসে,
সৌন্দর্য্যের শুভ্রতার ক্রূর নিষ্পেষণে !
ক্ষুদ্রতা-সঙ্কোচ-ভয়-অহমিকা-অসরল-অন্ধ কারাগারে
মোহের তিক্ততাবাহী উদগ্র সুরায়
প্রেম-দেবতার, হায়, হয় না আরতি !
পঙ্কিল-পিচ্ছিল-বক্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল পথে
সুন্দরের অভিসার হয় না কখন !

হে দেবতা,
যুগে যুগে তব পূজা হ'ল যত বিশ্বের দেউলে
লক্ষ কোটি তীর্থ-যাত্রী হৃদয় নিঙাড়ি
প্রীতি-ভক্তি-অর্ঘ্য-ডালা স্থাপিয়াছে তব বেদী 'পরে,
নয়নের তপ্তজলে ধুইয়াছে চরণ তোমার,
তবু তুমি দাও নাই বিশ্বমাঝে ধরা,
সখারূপে বন্ধুরূপে সর্ব্ব মানবেরে
লহ নাই বক্ষে তব টানি।
তাই দিল তারা প্রতিশোধ,—
কহিল তোমারে ডাকি
"তব সৃষ্টি মিথ্যা-মায়া-দুঃখ-শোক-জ্বরা-ব্যাধিময়
নাহি সত্য নাহি শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হেথায়,
ফলে ফুলে ভরা এই বিশাল পৃথিবী—
একখানি দুঃস্বপ্ন বিরাট
ভ্রান্তিময় মরু-মরীচিক !"
দিল তারা প্রতিশোধ তোমার সৃষ্টিরে
জীবনের মাঝে তব সিংহাসন 'পরে
নিক্ষেপিল ধূলারাশি প্রস্তর কঙ্কর !

কিন্তু আর নহে—আর নহে,
নূতন সৃষ্টির প্রাতে সে খেলার হোক্ অবসান !
সুধাসিন্ধু ওগো,
আত্মার গগনাঙ্গনে নিঃশব্দ নির্জ্জন দেশে,
ছিন্ন কর এইবার বিদেহীর বেশ !
বিশ্বমানবের দ্বারে
তোমার প্রেমের হোক্ পরীক্ষা কঠোর !

হে সুন্দর
চাহি আজ অগণিত মানবের হৃদয়-কমলে
জাগ্রত প্রতিষ্ঠা তব,
তোমা সাথে চোখে চোখে মুখোমুখী অন্তহীন অন্তরঙ্গ কথার ভাষায়
দর্শন-স্পর্শন-সুখ-সম্ভোগ আস্বাদ,
অফুরন্ত জ্যোতিঃ-শক্তি-আনন্দের ত্রিবেণী-সঙ্গমে
পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন !

ওগো প্রেমময়,
সেই প্রেম নির্ম্মুক্তির স্থির নীলিমায়
লক্ষ বাহু প্রসারিয়া ঊর্দ্ধলোকে ধায়,
বিশ্বের হৃদয় কূলে বহি' আনে অমৃত প্লাবন,
দেবতারা মর্ত্তানরে দান করে স্বর্গের আসন,
যেই প্রেমে মহাব্যোমে আবর্ত্তিত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা আদি
রক্ষা করি' পরস্পর প্রলয় সংঘাত
ভুবনে ভুবনে বর্ষে দিবা-নিশা কুসুম-সম্ভার,
বিশ্বজয়ী মৃত্যুজেতা সেই প্রেম খুলে দাও বিশ্বের মানবে।

ওগো ভগবান,
আজি চাহি তোমার মিলন
অন্তর-লক্ষ্মীর সাথে অঙ্গে অঙ্গে চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন
মর দেহে মর প্রাণে,
ধমনীর রক্তদোলে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
প্রতি কর্ম্মে প্রতি পদে জীবনের বহুধা বিকাশে,
রূপে রসে গন্ধে গানে,

আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভাষে রোমাঞ্চ-পুলকে,
বক্ষের যৌবন-মত্ত মদির উল্লাসে
চাহি তব শরীরী পরশ,
চাহি তব পূর্ণ প্রকটন !

হে অসীম,
দাও ধরা সসীমার ব্যগ্র বাহুপাশে
কম্পিত অধরে তার আঁকি দাও অমর চুম্বন
কণ্ঠে দাও মিলনের বৈজয়ন্তী পারিজাত-মালা !

ওগো জ্যোতির্ম্ময়,
যেই অন্ধ গুহা মাঝে পশে নাই আদিম আলোক,
গলিত শবের গন্ধে আকুল পিশাচ আর যত শিবাদল
ভ্রমে মহাসুখে,
অচলায়তনরূপী সে পাতালপুরে
সত্যের ভাস্কর দীপ্তি হোক্ অভ্যুদিত !

হে পরম,
কত কবি কত ঋষি কত বেদ বেদান্ত পুরাণে
নিরূপি' স্বরূপ তব গাহিল বন্দনা,
শিল্পীর প্রতিভাদীপ্ত লক্ষ তুলিকায়,
ভাস্কর্য্যের চারু প্রতিমায়,
স্থানুশৃঙ্গে গুহাবক্ষে প্রস্তরে পর্ব্বতে,
যত রূপে তব পূজা হ'ল সমাপন,
আজি এসো সর্ব্বরূপে সর্ব্বভূতে সকল সঙ্গীতে
নব সৃষ্টি লাগি'।
মানুষেরে দেবজন্ম-দ্বিজত্ব প্রদানি'
সত্য কর অস্তিত্ব তোমার !

একী অশরীরী দৈববাণী আজি শুনিনু চকিতে,
"আসিতেছি—আসিতেছি
তপোমগ্না আমাবস্যা-রজনীর তপস্যার শেষে।
আসিতেছি সাফল্যের স্বর্ণচ্ছটা-বিচ্ছুরিত
উষার উন্মেষে।"

দামিনী আরত্তি দীপে আকাশের গায়
কী অপূর্ব্ব এ আখর !
"মৃত্যু কভু সত্য নহে,
ঝঞ্ঝা নহে জীবনের চরম প্রকাশ !
শান্তি—শান্তি—শান্তি !"

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথের প্রতি *

'না' বলিয়া হাসিয়া উড়াতে
পারি না যে 'হাঁ' তোমার ! হয়ত বা লুকানো তাহাতে
হেন ঋদ্ধি, যার তুলনায়
আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব মরে লাজে তুচ্ছ নিঃস্বতায় ।
বিস্ময়ে পরাণ ভরি উঠে
হেরি যবে তোমা সম অভিজ্ঞের সহজ আনন্দ নাহি টুটে,
তবু জানি, অন্ধ তুমি নহ,
দেখিছ সকলি অহরহ ।
সত্য করি কহ মোরে, সুদক্ষিণ নিরিখে তোমার
নিদাঘের দীর্ঘ দিবা, গহন নিশীথ অন্ধকার
কর কি নির্ণয় ?
আত্ম-ভোলা যে করুণা তোমার আননে উথলয়,
কুশাগ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্পীর নিখুঁৎ নিপুণতা,
যাহা কিছু রিক্ত হিয়া উল্লসিয়া সবা 'পরে জাগায় মমতা,
—এরা কি লিখিল চারুচিহ্ন তব করতল পরে ?
আঁকিল কি আলিপনা পাখ্‌না-পরাগে
ভীতি-কম্প্র প্রজাপতি তোমার অঙ্গুলি পুরোভাগে
প্রায় মুঠিগত যবে ঝলমল চিত্রপক্ষ তার ?
চেষ্টা তব পূর্ণ হ'লে বুঝি তার ছিল না নিস্তার !

---

* Sturge Moore-এর To Rabindranath Tagore-নামক কবিতার অনুবাদ।

আত্মার গরিমা
বিজ্ঞজননিরূপিত মহিমার সীমা
উল্লঙ্ঘন করিয়া কি উড়িয়া পলায়,
মুক্তপক্ষে অপ্সরীর প্রায় ?
মহীয়সী প্রচেষ্টার বলে
তারে ধরিবারে গিয়া মোরা শুধু লভি কি কবলে
দুচারিটি সুনীল পালক ?
—আত্মাপলাতক।

সত্য কি অক্ষম মোরা অতি
রূঢ় স্পর্শে অণুমাত্র করিবারে তার কোনো ক্ষতি ?
—রূপমুগ্ধ শিশু যথা পতঙ্গেরে অপটু মুঠিতে
আঁটি আঁটি পারে না আঁটিতে,
বিস্ময় পুলক বিমোহিত,
স্পর্শিবারে দ্বিধান্বিত চিত !
সে পতঙ্গ শোনে যদি প্রেমাকুল আবাহন তার,
সাহসিকা উপযাচিকার
দুর্ব্বার আবেগ ভরে লুটায়ে কি পড়িবে অধরে,
হারা-সুখ ফিরিবে কি ঘরে,
উৎসুক ভাবনা মাঝে মরমের ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
লভিতে কুলায় ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পুস্তক-পরিচয়

মৌরীফুল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
"এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে"—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।
মৃত্তিকা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (নাথ ব্রাদার্স, ২৩সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট)।

বিভূতিবাবুর উপন্যাস "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় ও জয়নির্ঘোষে বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশ যে রকম মুখরিত হয়ে উঠেছিল তাতে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম যে, বিভূতিবাবুর গল্পের দাবীও কম নয়। বোধ হয় সেই শ্রেণীর বাঙ্গলা সাহিত্যামোদীর সংখ্যা অল্পই হবে যাঁরা বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর উমারাণীর গল্প পড়ে মনে মনে তাঁকে বিজয়মুকুট পরিয়ে দেন নি। অথচ এই উমারাণী সম্বলিত প্রথম গল্পের বই "মেঘমল্লার" যখন প্রকাশিত হল তখন পাঠকের দৃষ্টি তেমনভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হল বলে। মনে হয় নি। এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক স্তিমিত হয়েছে, এই অবসরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই "মৌরীফুল" প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গল্পের পরিচয় নেওয়ার সহজ অবকাশ উপস্থিত হবার কথা।

মৌরীফুলের উপাদান সংগ্রহ হয়েছে পল্লীগ্রাম ও আমাদের জীবনের সামান্য অনাড়ম্বর ঘটনা-সমাবেশ ক্ষেত্র থেকে। অথচ অনাড়ম্বর ঘটনা সন্ধানের চেষ্টায় মাঝে মাঝে একটু বেশী করেই আড়ম্বর এসে পড়েছে—মেঘমল্লারেও এটুকু বাদ যায় নি। যা হোক্ মৌরাফুলের পল্লীগ্রাম বিভূতিবাবুর হাতের গড়ন পেয়েছে। একদিকে গ্রাম্যতা, অজ্ঞতা, নির্ম্মমতা প্রভৃতির সঙ্গে সরলতা, আতিথ্য, সৌহার্দ্দ্য, প্রীতির অপরূপ সমন্বয়, আর একদিকে উদার গ্রাম্য প্রকৃতির অকুণ্ঠিত সুসার ও অসার দান,—গ্রামের এই রমণীয় পরিচয় বিভূতিবাবুর গল্পে বিফল হয় নি। নদীর ধারের মৌরীর ভরা ক্ষেত থেকে পরিব্যাপ্ত মৌরীফুলের সুতার গল্প আর প্রবাসে মাঠের মাঝখানে ব্রাঞ্চ লাইনের ষ্টেশনের ধারে ষ্টেশনবাবুদের নিরানন্দ বিরল জীবনযাত্রা—এ দুটি চিত্র যে কোন পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। প্রথম গল্প মৌরীফুলের নাম থেকেই বইটির নামকরণ। এই গল্পটিতে চরিত্র-গত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল হয়েছে। দরিদ্রের সংসারে গৃহস্থের নির্ম্মমতায় গ্রাম্যবধূ সুশীলার সুকুমার মনোবৃত্তি অন্তর্হিত হয়েছিল; স্বামী-কিশোরীর বিবাহিত জীবনের প্রথম উত্তপ্ত অনুরাগ অকালেই গ্রামের তাস পাশা ও যাত্রার আড্ডায় সমাধিস্থ হওয়াই তার প্রধান কারণ। শ্বশুর শাশুড়ীর হাতে নির্য্যাতনের অন্ত ছিল না, স্নেহের কাঙাল সুশীলা এই নির্য্যাতনের ফলে নিজেও হয়েছিল মুখরা, কাণ্ডজ্ঞানহীন। এ সত্ত্বেও সুশীলা তার স্বামীর হারানো প্রণয় পুনর্জীবিত করবার জন্য চেষ্টা ক'রতে ছাড়ে নি, কিন্তু যে আদর সোহাগ একদিন আপনা থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল আজ তার কাঙাল হতে গিয়ে লাঞ্ছনাই সার হল। বিক্ষুব্ধ ভীত সুশীলা অতঃপর লোভে পড়ে যা করে বসল তার পরিণাম হল অনুচিত অখ্যাতি ও অকালমৃত্যু। এই করুণা-বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অন্তর্বেদনাপূর্ণ গ্রাম্য বধূটির জন্য সকল পাঠকেরই হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই,—অথচ বিশেষ করে কাউকে দোষ দিতেও মন সায় দেবে না। শ্বশুর

শাশুড়ীর সামান্য বিবেচনার অভাব, নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবকের স্ত্রীর প্রতি নির্ম্মম অমনোযোগিতা ও সমস্ত সমাজের একটা কর্ম্মনাশা নিস্পন্দতা আজও আমাদের জীবনের সামনে যে কুয়াশার অন্তরাল সৃজন করে রেখেছে,—দোষ তারই।

অন্য গল্পগুলির মধ্যে "রোমান্স"টিও অনেককে মুগ্ধ করবে। দুই বোনের বালিকা-মনের ঈষৎ প্রেমের ইসারা ও তারতম্য এই গল্পটিকে রঙীন ও সুষমা-মাণ্ডত করেছে। 'রাক্ষসগণ'-এ সেবাপরায়ণ রেণুর নিঃস্বার্থ রমণীসুলভ অন্তরঙ্গতার চিত্র পাঠককে অন্যমনা করবে। দুঃখের বিষয় এ তিনটি ছাড়া বইটির বাকি সাতটি গল্পের মধ্যে আর কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়। 'জলসত্র', 'খুঁটিদেবতা', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'গ্রহের-ফের' প্রভৃতি হয় অতি-কল্পিত, নয় গল্পের উপযুক্ত উপাদানের অভাবে নিরর্থক পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। এতে বইটি বড় অসম প্রকৃতির হয়েছে।

"গ্রহের ফের" সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এর নায়ক অধ্যাপক রাজচন্দ্রবাবুর গাণিতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে করা হয়েছে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বাণীকার। লেভেরিয়ে ও অ্যাড্যামস্ কর্তৃক নেপচুন গ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়ে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থিওরীর জয়জয়কার হয়েছিল বটে, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা অতি নির্দ্দিষ্ট ও তাদের আবিষ্কারকদের নাম জগদ্বিখ্যাত, তার মধ্যে একটি বাঙ্গালীরও নাম পাওয়া যায় না। এ হেন গল্পের অবতারণা করে লেখক রাজচন্দ্রবাবুকে 'বিরিঞ্চি বাবা'র সমকক্ষ করে তুলেছেন। যা অতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে খণ্ডন করে বা যা সর্ব্বজনবিদিত নজিরকে নাকচ করে তা নিয়ে গম্ভীর গল্প উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি নিবেদন করি।

১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কোন বাঙ্গালী এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে উঠেছিল বা ব্র্যাড্‌মানের রেকর্ড স্কোরিংকে পরাভূত করেছিল—এ নিয়ে কি গম্ভীরভাবে গল্পরচনা চলতে পারে? বলা বাহুল্য অন্য হিসেবে গল্পটি অসাধারণ হয়েছে। রাজচন্দ্রবাবুর তন্ময়তা ও মস্তিষ্ক-বৈকল্য মনকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি ধূমকেতুটির আবিষ্কারের উদ্যোগ ও সাফল্যও মনকে নিগূঢ়ভাবে অভিভূত করে।

আর এক কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি। মৌরীফুল গল্পে সুশীলার অপমৃত্যু অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়েছে—একেবারে দায়ে পড়ে খুন করা। 'রাক্ষসগণ' গল্পে রেণুর অকাল-বৈধব্য-ফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নায়কের উল্লাস—সার্থক নয়, রূঢ় হয়েছে। যদি গ্রন্থকার নায়ককে এই উল্লাসের উপযোগী করে গড়তেন,—ইতর বা হৃদয়হীন করতেন, সে আলাদা কথা, পক্ষান্তরে তিনি করেছেন তাকে রেণুর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ। বিভূতিবাবুর মত পাকা লেখকের কাছ থেকে এসব কাঁচা হাতের কাজ একটু বিসদৃশ লাগে।

বিভূতিবাবুর বিভিন্ন গল্পগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বোধ হয় তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। আমার মনে হয়েছে বিভূতিবাবুর পল্লীজীবন বা আমাদের অবান্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাবলীর চিত্র খুব নিখুঁৎ, রমণীয় কিন্তু অনতিগভীর,—surface deep। যদি শরৎবাবুর লেখার সঙ্গে তুলনা ক্ষমার্হ হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীর সেখানে শরৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীর হতেও গভীরতর!

নানা কারণে বুদ্ধদেববাবুর নূতন উপন্যাস "এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে" সন্দিগ্ধচিত্তে গৃহীত হবে। এতে অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক যুবতীদের যে অবাধ

মেলামেশা ও প্রেমালাপের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠককে হতভম্ব হতে হবে। বোধ হয় মানুষের স্বভাবের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করে কোন শিথিল ব্যবহার বহুদিন ধরে আয়ত্ত না করলে তার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে স্বীকার্য্য আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ হয় কিন্তু 'এরা আর ওরা'র পাত্র-পাত্রীরা যে রকম অসঙ্কোচে শিথিল প্রেম ও দৈহিক কামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে বাঙ্গলার মার্জ্জিত সেট্‌কে স্বাধীন প্রেম সাধনায় বহুযুগ সিদ্ধ বলতে হয়। গল্পে উদ্দাম কল্পনাশক্তিকে কতখানি মুক্তি দেওয়া সম্ভব বা তাতে সমাজের অলঙ্ঘনীয় গণ্ডীকে কতখানি স্বীকার করে নিতে হয় তা সাহিত্যের বৈয়াকরণিকরা বিচার করবেন। আমার কিন্তু আশা হয় যে অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এরা আর ওরার যুবক যুবতীদের অসংযমে পাঠকের মন সায় দেবে না। আধুনিক মার্জ্জিত সেট্‌রা যদি কালচার কৌলিন্যে পাকা হয়ে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার চেষ্টা করেন তবে সমাজ এই সেট্‌কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্কৃতি দেবে না। অতএব যেখানেই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ছবি আঁকা হবে সেখানেই সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিশোধের ছবি দেখাতে হবে,—ইঙ্গিতেই হোক বা স্পষ্ট করেই হোক। এটা গল্প বা উপন্যাস লেখকের অবশ্যকর্ত্তব্য! পক্ষান্তরে সমাজের পটভূমিকাকে একেবারে বিলোপ করে সখের পাত্র-পাত্রীদের অবতারণা হতে পারে না, যদি না তা ব্যাপক হয়।

এটুকু বাদানুবাদ ত্যাগ করলে "এরা আর ওরা" সম্বন্ধে অনেক গণ্ডগোল মিটে যায়। যদি মেনে নেওয়া যায় যে বাঙ্গলা সমাজের মার্জ্জিত সেট্-এর পক্ষে সব রকম পরিপক্কতাই স্বাভাবিক তা হলে "এরা আর ওরা"র শর্ব্বরী, অতনু, সাবিত্রী, অমিতা ও লুসী, ললিতাদের বরণ করতে বাধবে না—অন্ততঃ তাদের স্পর্দ্ধা, আত্মম্ভরিতা ও তথাকথিত মার্জ্জিত রুচির চাক্‌চিক্যের জন্য।

বইটির একটি প্রশংসনীয় জিনিষ তার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের উপকরণ। এটাও মানতে হবে যে, যে আধুনিক রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্যে ঘটনা সন্নিবেশের বদলে চিত্তের আবর্ত্তময় গতিকে অধিকতর প্রকট করা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় সে রীতির পরিকল্পনায় বুদ্ধদেববাবু অগ্রণী ও ওস্তাদ। তা হলেও সাহিত্যের রূপ ও রসসৃষ্টিতে বুদ্ধদেববাবুর মনে শৈথিল্য এসেছে মনে হয়।

উপরোক্ত দুইখানি বই শেষ করে কেউ যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন গল্পের বই "মৃত্তিকা" পড়েন ত নিশ্চয় স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বেন। গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রেই জানেন যে প্রেমেন্দ্রবাবু গল্পলেখায় ধ্রুব প্রেরণা লাভ করেছেন; "মৃত্তিকা" পড়ে সে ধারণা একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। তাঁর ভাষায় যেমন বাইরের চাকচিক্য নেই, তেমনি গল্পের সঙ্গেও তার বিরোধ নেই। ভাষার ও গল্পের এই নিবিড় সংযোগ বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। বহুল পরিমাণ সংযম ও রস না থাকলে এটা ঘটে ওঠা সম্ভব হয় না। তাঁর চরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যময়;—যে সব চরিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে উপেক্ষিত ও অজানা ছিল তাদের তিনি খুঁজে বার করে সমুজ্জ্বল, সার্থক ও আমাদের আত্মীয় করে গড়েছেন। গল্পগুলির মধ্যে বোধ হয় 'মৃত্তিকা'ই বরমাল্য পাবে;—এটে ধীরে ধীরে পাঠকের মনকে নিয়ে গিয়ে হৃদয়-রহস্যের এক নিবিড় কন্দরে হাজির করে। 'সুরু ও শেষের' তুল্য অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আধুনিক বাঙ্গলা গল্পে অতি অল্পই চোখে পড়ে। "শবযাত্রা"য় শবযাত্রীদের বিভিন্ন মনোভাব মানবমনের দু'একটি গুপ্ত দ্বারোদ্ঘাটন

করেছে। "প্রতিবেশিনী"র ম্যাট্রিক পাশ বিমলার স্নেহার্দ্র উদ্দাম হৃদয় দরদী মনে অহৈতুকী করুণার প্রতিধ্বনি জাগাবে। সমাজ এই বালিকার আচরণ বুঝবে না কিন্তু প্রেমেন্দ্রবাবুর পাঠকের কাছে তা অবোধ্য থাকবে না। প্রেমেন্দ্রবাবুর এই সব গল্পে নিশ্চয় কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিন্তু সে সকল ত্রুটির কথা উত্থাপন করবার প্রয়োজন হবে না যদি তিনি আমাদের মনে যে আশার সঞ্চার করেছেন তা আধুনিক অন্যান্য গল্প-উপন্যাস-লেখকদের মত অকালে বিনাশ না করেন।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Necessity of Communism.—BY JOHN MIDDLETON MURRY, Jonathan Cape, 136 pages. 3s. 6d.

On Marxism To-day.—BY MAURICE DOBB, No. 10 of the Day to Day Pamphlets. Published by Leonard and Virginia Woolf. The Hogarth Press, 48 pages. 1s. 6d.

The Teachings of Karl Marx.—BY V. I. LENIN, No. 1 of the Little Lenin Library, Martin Lawrence, Ltd. 48 pages. 9d.

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল্ মার্ক্স্ মানুষের ইতিহাসের যে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক কমিউনিজ্ম্ বা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা তারই উপর। তাঁর মতবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছিল কারণ সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তা-ধারার প্রতি সাধারণ লোকের অবজ্ঞা স্বাভাবিক। প্রচলিত ধারণা ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন বা তর্ক না করাই নাকি প্র্যাক্‌টিকাল্ মানুষের লক্ষণ। যে মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভর ক'রে সমসাময়িক সমাজ গড়ে উঠেছে সে সমস্ত নির্ব্বিচারে মেনে চলা এই মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু যখন আর্থিক পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তখন চিরাভ্যস্ত বিশ্বাসেও নাড়া পড়ে—তখন বাধ্য হয়ে সকলকেই রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা কিম্বা যুক্তিসঙ্গত সমর্থনের চেষ্টা দেখতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য জগতে মার্ক্স্-তত্ত্বের বিশদ চর্চ্চা এই সাধারণ নিয়মের উদাহরণ।

ইংল্যাণ্ডে এই নূতন উদ্যমের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য বই তিনখানির নাম করা যেতে পারে। লেখক তিনজনই খ্যাতনামা—পুস্তকগুলি সুখপাঠ্য না হলেও শিক্ষাপ্রদ। আজকাল সাহিত্যিক-সমাজে মিড্‌লটন্ মারির সুনাম আছে; সম্প্রতি ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট লেবার পার্টিতে যোগ দিয়ে লেখা ও বক্তৃতার সাহায্যে তিনি প্রবল উৎসাহে প্রচার-কার্য্যে নেমেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বই লেখার হেতু। মরিস্ ডব্ শিক্ষক ও সুপণ্ডিত; তাঁর নব্য রাশিয়ার আর্থিক ইতিহাস তাঁকে সুপরিচিত করেছে। মার্ক্সের ভক্ত হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ, তাই গুরুর মতামত সম্বন্ধে তাঁর পুস্তিকাখানি প্রণিধানযোগ্য। লেনিনের পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত; মার্ক্সের মতবাদ বিষয়ে তাঁর ছোট গ্রন্থটি রুষভাষায় একটি বিশ্বকোষের অন্তর্গত। প্রবন্ধ হিসাবে ১৯১৪ সালে নির্ব্বাসনে লিখিত হয়। মস্কোর লেনিন্-ইন্‌ষ্টিটিউট্

সম্পাদিত লেনিনের গ্রন্থাবলীর ইংরাজি অনুবাদ মার্টিন্ লরেন্স্ লিমিটেড্ ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশ করছেন। সময়সাপেক্ষ সেই কাজ সম্পন্ন হবার আগেই লেনিনের প্রধান লেখাগুলি বহুল প্রচারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করা স্থির হয়েছে।

মিড্ল্‌টন্ মারির প্রধান বক্তব্য তাঁর বইখানির বিজ্ঞাপন ও মুখবন্ধে অল্প কথায় পাওয়া যায়। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডে সাম্যতন্ত্র স্থাপন অবশ্যম্ভাবী। সাম্যবাদ ভিন্ন তাঁর স্বদেশের ধ্বংসোন্মুখ সমাজের উদ্ধারের অন্য আশা নেই। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম্ যে আকারে আজ পৃথিবীতে পরিচিত—সেই রুষদেশজাত বল্‌শেভিজ্‌মের অমানুষিক রুদ্ররূপ বরণ করা ইংরাজদের পক্ষে অসম্ভব। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার যে অবস্থায় বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল সুসভ্য সংযত ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তার অনুরূপ দুর্দ্দশা মিড্ল্‌টন্ মারি অভাবনীয় মনে করেন (১০৭ পৃষ্ঠা)। মস্কোর উপদেশ ইংল্যাণ্ডের অনুকরণযোগ্য নয়। অতএব সে-দেশে নব-সাম্যবাদের প্রয়োজন আছে এবং সেই অভাবই মিড্ল্‌টন্ মারি পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর মতভেদ নেই—তিনি নিজেকে মার্ক্সের শিষ্যরূপেই গণ্য করেন। লেনিনের প্রচারিত মার্ক্স-তত্ত্বের বিশ্বজনীনতা অস্বীকার ক'রে ইংল্যাণ্ডে অন্ততঃ নূতন প্রণালীতে সাম্যতন্ত্র গড়ে তুলবার স্বাধীনতার দাবী মিড্ল্‌টন্ মারির প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখার স্বচ্ছতা, ভাষার আবেগ ও লেখকের আন্তরিকতা মারির বইখানিকে উপভোগ্য করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থশাস্ত্রবিশারদ কীন্‌সের মতখণ্ডন (১১৪, ১৩৬ পৃষ্ঠা), লণ্ডন স্কুল্ অব্ ইকনমিক্‌সের সমালোচনা (১২১ পৃষ্ঠা) এবং ব্রিটিশ শ্রমিক-নেতাদের প্রতি বিদ্রূপ (৮০, ১০০ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে তিনটি ভাবের ধারা নির্দ্দেশ করা সহজ। তার মধ্যে সাম্যতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতা ও সাম্যবাদের ইংরাজি সংস্করণের চেষ্টা সম্বন্ধে অনেক কথা স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক আলোচনা—যীশুর জীবনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা—মানুষের জীবনে জড়জগতের বহিঃস্থিত শক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচকের কিছুই বলবার নেই। ধর্ম্ম-প্রধান বিশ্বাস তর্কের বাইরে। মার্ক্সের নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তির সঙ্গে মারির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। ধনিক ও শ্রমিকের সঙ্ঘর্ষ-সমস্যায় মারি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত স্বার্থ পরিহার ক'রে শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত হবার উপদেশ বারবার দিয়েছেন। সন্দেহ হয় যে এই বিপুল আত্মবিসর্জ্জনের বাণীর উৎস আত্মার কল্যাণ বা মানসিক শান্তির সন্ধান। সাম্যবাদে বিশ্বাস করতে পারলে ডি এইচ্ লরেন্সের জীবন, মারির মতে, ট্র্যাজেডিতে পরিণত হত না (১২৮, ১৩০ পৃষ্ঠা)।

বর্ত্তমান ধনিক-সমাজের অনিবার্য্য পরিণতি সাম্যতন্ত্র—মিডল্‌টন্ মারি মার্ক্সের এই বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন বটে কিন্তু তাঁর লেখাতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও যুক্তিপ্রয়োগের অভাব থেকে গেছে। শুধু ইংল্যাণ্ডের সমস্যার পরিধির ভিতর তাঁর চিন্তা আবদ্ধ এবং সমাজের পুনর্গঠনে যাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাদের লক্ষ্য করেই তাঁর বই লেখা একথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। অবশ্য ধনতন্ত্র মানব-সভ্যতাকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে চলেছে সপ্তম পরিচ্ছেদে একথা বোঝাবার চেষ্টা আছে। হেন্‌রি ফোর্ড্ প্রচারিত সুনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের আদর্শে যুক্তির ফাঁকটুকু ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় ধরা

পড়েছে—ডিট্রয়টের শ্রমিকদের উন্নতির ফল দেখা যায় কভেন্ট্রি র বেকারসংখ্যার বৃদ্ধিতে। এইচ্ জি ওয়েল্স প্রভৃতির 'বুর্জোয়া' আন্তর্জাতিকতার ভ্রান্তি ও নিষ্ফলতা প্রদর্শিত হয়েছে (৭০ পৃষ্ঠা)। তবুও মারির বইখানিতে মার্ক্সের মূলসূত্রগুলি সম্যক্ আলোচিত হয়েছে বলা চলে না। মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষে—যে কোন যুগের প্রচলিত চিন্তার ধারা ও সাধারণ মতামত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই যুগের প্রভুশ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত—শ্রেণীবিশেষের প্রভুত্বের বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত—ভবিষ্যতে শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠাতেই এই সংগ্রামের অবসান—মার্ক্সের এই সকল মত মরিস্ ডব্ ও লেনিনের পুস্তকে এবং লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে : ধনতন্ত্র যে মানুষের ন্যায়বুদ্ধিকে পদে পদে আঘাত করে একথা বার্ণার্ড্ শ তাঁর সোশ্যালিজ্মের ব্যাখ্যায় যেমন ক'রে পরিস্ফুট করেছেন ;—মিডল্টন্ মারির লেখাতে তার পরিচয় নেই। তিনি নিশ্চয় এ সব বিশ্বাস করেন, কিন্তু অন্যকে বোঝাবার চেষ্টার অভাব পাঠকের মনকে পীড়া দেয়। ধনতন্ত্র অচল হলেই যে সাম্যতন্ত্র স্থাপিত হবে এর স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শনের দায়িত্ব লেখকের। ভুল্লে চলবে না যে কমিউনিজ্ম্ ছাড়াও অন্যপ্রকারের সোশ্যালিজ্ম্ সম্ভব। মারি সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করবার পর বইখানির 'সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা' নামকরণ সঙ্গত হয় নি বলতে হবে।

মার্ক্সের মতের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। মিড্ল্টন্ মারি নিজের মনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের চেষ্টায় তার বিকৃতি ঘটিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস। এই বিকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মারির বইএর একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডে বিনা বিপ্লবে সাম্যতন্ত্র স্থাপন সম্ভব। মত সমর্থনের জন্য এঙ্গেল্স্-এর রচনা থেকে যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন (১২৭ পৃষ্ঠা) তার পরবর্ত্তী অংশটুকু বোধহয় তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। মারির বিশ্বাস হয়ত সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে কিন্তু তাকে মার্ক্সের মত ব'লে প্রচার করা উচিত নয়। কার্ল্ কাউট্স্কির সঙ্গে তর্কযুদ্ধের সময় লেনিন্ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন সম্বন্ধে মার্ক্সের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল। এই ধারণা আধুনিক সাম্যবাদীদের মনে বদ্ধমূল। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি মিড্ল্টন্ মারির বিতৃষ্ণা জার্ম্মান সোশ্যাল্ ডিমোক্রাট্দের মতের অনুরূপ। মরিস্ ডব্ লিখেছেন (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)—বের্ণ্‌ষ্টাইনের যে "সংশোধিত" সাম্যবাদ ইউ-রোপে প্রতিপত্তি হারিয়েছে ইংল্যাণ্ডে নবীন বুদ্ধিজীবিগণ তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

মারির মতে বিরাট ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে মার্ক্স্-মন্ত্রে দীক্ষিত করাই সাম্য-বাদীদের প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের সংখ্যাধিক্য হলেই সাম্যতন্ত্রের গোড়াপত্তন হবে। মার্ক্সের গোঁড়া শিষ্যদের দৃঢ়বিশ্বাস এ আশা অমূলক। মারির ধারণা যে ইংল্যাণ্ডে ইটালীয় ফ্যাসিজ্ম্ বা জার্ম্মাণীর নাজি-আন্দোলনের অনুরূপ শাসক-শ্রেণী-পরিচালিত কোন সশস্ত্র বাধা সোশ্যালিজ্মের পথরোধ করবার চেষ্টা করবে না। প্রকৃত মার্ক্স্-তত্ত্ব অনুসারে এই নির্ভরশীলতার কোন হেতু নেই।

মিড্ল্টন্ মারির নিজের বিশ্বাসকে মার্ক্স্-প্রদর্শিত পন্থা ব'লে প্রচারের প্রতিবাদ করা আমার এই সুদীর্ঘ সমালোচনার উদ্দেশ্য। তাঁর আর একটি ভ্রান্তির উল্লেখ ক'রে

আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করব। মার্ক্সের জীবনের নিঃস্বার্থপরতা তাঁর মতের যথার্থতাকে আংশিক ভাবে অপ্রমাণ করে এ মন্তব্য নিরর্থক—কেননা স্বার্থবুদ্ধি সকল শ্রেণীকে চালিত করে এই কথার অর্থ এ নয় যে প্রতি শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বার্থপর। কিন্তু সকল আপত্তি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে মারির বইখানি অত্যন্ত মূল্যবান। ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীল লোকেরা যে যুগসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তার সুন্দর নিদর্শন। লেখার গুণে মারির বইখানি অনেক পাঠককে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে শেখাবে—কোন লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বেশী সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

মরিস্ ডবের নূতন বইখানির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি তার প্রাঞ্জলতার অভাব। বইখানির ক্ষুদ্র আয়তনই বোধহয় এর জন্য দায়ী। কোন কোন প্রসঙ্গে তিনিও এবার গোঁড়া মার্ক্স্-পন্থীদের বিরাগ-ভাজন হবেন ব'লে আশঙ্কা হয়। কিন্তু তাঁর বইটিতে অল্পের ভিতর মার্ক্সের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা শিক্ষাপ্রদ হয়েছে বলা যেতে পারে যদিও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ল্যাস্কির লেখার সরসতা ও প্রসাদগুণ এ বইএ নেই। ইতিহাসের যে ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্ভব ও আবশ্যক এবং ইতিহাস সম্বন্ধে মার্ক্সের ধারণার যেটি বৈশিষ্ট্য মরিস্ ডব্ তা সযত্নে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

লেনিনের পুস্তিকাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কার্ল্ মার্ক্সের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; তারপর তাঁর মতবাদের বিবরণ; পরিশেষে মার্ক্স সম্বন্ধে সকল ভাষায় প্রধান প্রধান লেখার তালিকা। ইংরাজিতে সাম্যবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থই প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হবে সন্দেহ নেই। মরিস্ ডব্ পর্য্যন্ত অনেকাংশে লেনিনের অনুসরণ করেছেন।

হেগেলের দর্শন থেকে মার্ক্সের চিন্তাধারার উৎপত্তি। কিন্তু যেখানে হেগেল্ 'আইডিয়া'র লীলা দেখেছিলেন, ফয়রবাকের প্রভাবে মার্ক্স সেখানে দেখলেন জড়শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত। সমাজের পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রও মার্ক্স হেগেলের dialectics-এর থেকে পেয়েছিলেন—thesis, antithesis ও synthesis-এর রূপ তিনি সমাজের বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন। এর থেকে মার্ক্সের বিশ্বাস হ'ল যে মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ ক'রে আসছে ও তদনুসারে মানুষের সভ্যতা ও চিন্তার আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। প্রত্যেক যুগে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে শাসিত-শ্রেণীর বিদ্রোহ মাথা তুলতে বাধ্য এবং সে সঙ্ঘর্ষের ধ্রুব পরিণাম শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ অথবা সাম্যতন্ত্র। অর্থনীতির আলোচনা ক'রে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত হ'ল যে শ্রমিকই সমস্ত ধনোৎপাদনের মূল, কারণ আমরা যাকে মূলধন বলি শারীরিক শ্রম ব্যতীত তার উৎপত্তি অসম্ভব। অথচ শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য পায় না। বিনামূল্যে এই অতিরিক্ত ধনোৎপাদনই ধনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন। রাষ্ট্রশক্তি নিরপেক্ষ নয়—ধনিকের স্বার্থসিদ্ধি মাত্র তার উদ্দেশ্য; এমন কি গণতন্ত্রেও তার অন্যথা হয় না। সেইজন্য স্বল্পসংখ্যক সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে বলপূর্ব্বক সমাজের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা মার্ক্স-নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

এই সকল মত খণ্ডনের চেষ্টা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। লেনিন্ ও মরিস্ ডবের মার্ক্স সম্বন্ধে অখণ্ড বিশ্বাস কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ে তাঁদের উৎসাহ অন্য লোকে সংক্রামিত হবে কিনা সন্দেহ। অল্পের ভিতর মার্ক্সের মতের পরিচয় এবং সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা দূরীকরণই তাঁদের বই-এর সার্থকতা।

মরিস্ ডবের দৃঢ় বিশ্বাস যে সাম্যবাদ ভিন্ন অন্য প্রকার সোশ্যালিজমের ভবিষ্যতে কোন আশা নেই। আজকাল তাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক দলের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাঁর শেষ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য—

"Indeed, apart from Historical Materialism, what other than a petulant desire for newness should demand a transformation of the basis of the existing social order? Save as Marxist Socialism or Communism, Socialism seems emphatically to have no future as an historical force. . . . . It is hard to deny that of most of the significant events of recent history the Marxist has made sense where ordinary bourgeois thought has made wrong forecast or has found only bewilderment. . . . . . Was the pre-war Marxist analysis of capitalism and war or that of the *Great Illusion* the more realistic? . . . . . There are points in history when traditional concepts come into conflict with contemporary experience; and at such times wise men think that history has gone mad. But it is thought, not history, that is unreasonable, and only the barrenness of thought that thinks otherwise."

শ্রীসুশোভন সরকার

Alexanderplatz.—BY ALFRED DOBLIN (Martin Secker).
Etzel Andergast.—BY JACOB WASSERMANN (George Allen & Unwin, Ltd.).

বর্ত্তমান জার্ম্মান এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখকদের একজন অগ্রণী হচ্ছেন আলফ্রেড্ ড্যবলিন্। বার্লিনের এই চিকিৎসক-লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস "ভালেনষ্টাইন" লিখে সুবিখ্যাত হন। "আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্" উপন্যাসখানি তাঁর এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখন রীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বার্লিনে আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্ নামে একটি জায়গা আছে, সেটি নগরের সম্ভ্রান্ত সভ্য পল্লীকে চোর, ডাকাত, খুনী, বদমায়েসের বস্তি হতে বিভিন্ন করেছে; সহরের দুই বিভিন্ন জাতের মধ্যভূমিতে মানবজীবনের আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস হচ্ছে এই উপন্যাসখানি, সেজন্য ডাবলিন উপন্যাসের নাম দিয়েছেন শান্ত সভ্য নগর ও underworld-এর মধ্যবর্ত্তী স্কোয়ার আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্।

উপন্যাসের আরম্ভ হচ্ছে: ফ্রান্ত্স্ বিবারকফ্ নামে এক বার্লিনের মজুর টেগেল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পথে বাহির হয়েছে, বার্লিনের জনতাভরা পথ, তার কাজ নেই, বন্ধু নেই, অন্তরে শান্তি নেই; কিন্তু সে সৎ জীবন যাপন করতে মনস্থ।

ফ্রান্ত্স্ খবরের কাগজ বেচবার কাজ নিলে; তার মেয়ে-বন্ধু হল; নারীর প্রেমে জীবন আনন্দিত হল। তার সঙ্গীরা তাকে প্রলুব্ধ করে চুরি করবার জন্যে, একবার দলে পড়ে সে চুরি করার সহায় হল, কিন্তু নিজের অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে। সে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে ভেবে চোরের দলের সর্দ্দার তাকে চলন্ত মোটরগাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিলে; যদি সে মরে যায়, তাদের চুরির সাক্ষী থাকবে না। সে মরল না, তার

একটি হাত ভেঙে গেল, কিন্তু তার অন্তর এ আঘাতে দমল না; সে জীবন-সংগ্রাম আবার নতুন করে আরম্ভ করলে, সে যোদ্ধা. সে আলোর পূজারী, অন্ধকারকে জয় করবে।

চোরের দলের সর্দ্দারকে সে ক্ষমা করলে। সে এক প্রণয়িনী লাভ করলে, তার অনুরক্তা সেবিকা; সেই প্রেমই তার শক্তি, তার জীবনের অঙ্গ। কিন্তু তার এক বদমায়েস বন্ধু তার বান্ধবী মিত্‌সেকে ভুলিয়ে এক বনে নিয়ে গেল; মিত্‌সে তাকে ভালবাসে না, সে কামুকের প্রস্তাবে রাজী হল না; কামোন্মত্ত রাইনহোল্ড মিত্‌সেকে খুন করলে, বনের এক গহ্বরে মৃতদেহ পুঁতে পালাল।

এই নিদারুণ আঘাত ফ্রান্ত্‌সের বুকে বড় বেদনায় বাজল, তার প্রেমকে তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হত্যা করলে। কিন্তু তবু ফ্রান্ত্‌স্ বিবারকফের আত্মা হার মানল না; অন্ধকারের অনুচরেরা তাকে ভুলাতে চায়; বেদনায় তার অন্তর ভেঙে গেল বটে কিন্তু মানবাত্মা জয়ী হল।

গল্পটি সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্ উপন্যাসখানির শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখনভঙ্গী, এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পীর দৃষ্টিতে মানবজীবনকে নবভাবে সত্যরূপে দেখা। খুনের চেষ্টা, কামলালসার জন্য হত্যা, প্রতিহিংসার জয় ইত্যাদি যে সব রোমহর্ষক ঘটনা, অন্তরের উদ্বেলতাময় অবস্থা আছে, কোন রোমান্টিক বা রিয়েলিষ্ট লেখক সেগুলি কি ভাবে লিখতেন তা আমরা অনেক উপন্যাসেই পড়েছি।

এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ কি, তা না বুঝলে উপন্যাসখানি বোঝা যাবে না। রোমান্টিক লেখকগণ জীবনের বাস্তবতা, তার কদর্য্যতা, বীভৎসতা, বেদনাময় সত্য হতে পালিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যালোক জীবনের রঙীন কল্পলোক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন: তার প্রতিক্রিয়ারূপে হল রিয়ালিজ্‌ম্ ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্,—জীবনকে যথাযথ সত্যভাবে আঁকতে হবে তার নগ্ন কদর্য্যতা উদ্ঘাটিত ক'রে; ভাবের রসের রঙীনতার দুর্ব্বলতা চলবে না; আর্ট হবে জীবনের প্রতিবিম্ব, সাহিত্য হবে জীবনের ফটোগ্রাফি।

ইম্‌প্রেশনিজমের নগ্ন বাস্তবতা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণভারাক্রান্ত সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন একদল এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখক। তাঁরা বল্লেন, মানবজীবনকে ভাসা-ভাসা দেখে ইম্‌প্রেশনিষ্ট তার ছবি এঁকেছে, জীবনের সত্যকে তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করে নি, বাহিরের আবরণ ভেদ ক'রে মানবাত্মার শক্তি ও সৌন্দর্য্যলোক তারা দেখেনি। আর্ট রোমান্টিকের অলীক রঙীন স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবে না বা রিয়ালিষ্টের জীবনের ফটোগ্রাফিক ছবি আঁকবে না; প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে যে অনন্ত গূঢ়শক্তি আপনাকে বিকশিত করছে, আর্ট তারি কথা বলবে, অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্ঘাটন করবে।

এক্সপ্রেশনিষ্টের এই নব দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তি প্রতি বস্তু এক নব সত্তা লাভ করল, অনন্তের সঙ্গে তার যোগ। এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পী যখন এক রোগীর গল্প বলে, যে রোগী হয়ে ওঠে পৃথিবীর সকল রোগীর প্রতীক, মানবজীবনের ব্যাধির বেদনা সে বহন করছে; সে একা, ভিন্ন নয়; বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে ভাঙন যে ব্যাধি রয়েছে, সে তারি রূপ; তার যাতনা নিখিল মানবাত্মার বেদনা; তার সংগ্রাম, মানবাত্মার সংগ্রাম। রিয়ালিজমের নগ্ন বাস্তবতা, কদর্য্য বীভৎসতার তলে মানবাত্মার সৌন্দর্য্যলোক রয়েছে, এক্সপ্রেশনিষ্ট শিল্পী তারি কথা বলেন।

মানবজীবনকে নবদৃষ্টিতে দেখার প্রয়াসে উপন্যাসের সব চরিত্র ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়ে উঠল প্রতীক। আলেকজাণ্ডারপ্লাৎসের ফ্রান্ত্‌স্ বিবারকফ শুধু বার্লিনের এক

মজুর নয়, সে মানব-যোদ্ধা, মানবসভ্যতার সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে সয়তানের শক্তিগুলির সঙ্গে।

রিয়ালিজমের সাহিত্যে যে নিরাশা, হতাশ্বাস, সভ্যতার বিকৃতি, ভাঙনের রূপ পাই, এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্‌ তার প্রতিবাদ; নিরাশার অন্ধকারে সে সত্যের আলোর জন্য সাধনা করছে, প্রেমের আনন্দলোক উদ্ঘাটিত করছে, মানবাত্মার জয়গান গাইছে।

ফ্রান্ত্‌স্‌ বিবারকফের গল্প মানবাত্মার সংগ্রামের কথা; আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সে দমল না, হার মানল না।

উপন্যাসের শেষ অংশের প্রথমে ড্যবলিন লিখছেন, The man's broken. But a new Biberkopf will now be shown, far superior to the man we have known, and who, we may expect, will make a better job of things.

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার লিখছেন, The way leads to freedom, to freedom it goes, the old world must crumble. Awake, wind of dawn!

And march in step, right, left, right, march on, march on, we march to war, a hundred minstrels march before, with fife and drum, drrum, brrum, for one the road goes straight, for another it goes crooked, one stands fast, another falls, one rushes past, another falls, drrum, brrumm, drrumm!

এৎসেল আনডেরগাষ্ট আমাদের পূর্ব্বপরিচিত; Maurizius Case-এ বালক এৎসেলের কথা পড়েছি। এক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়েছে আর সেই দণ্ডদানের সহায়ক ছিলেন তার পিতা, এই ভেবে বালক আনডেরগাষ্টের মনে শান্তি রইল না; দণ্ডিত ব্যক্তি সত্যি দোষী না নিরপরাধী, তা জানাবার জন্য কিশোর এৎসেল গৃহত্যাগ করে বাহির হয়ে গেল। ব্যক্তি ও সমাজের সংগ্রামে নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি অবিচারে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব ও বেদনা জাগল, তা ভাসারমান পরম শক্তির সহিত বর্ণনা করেছেন Maurizius Case উপন্যাসখানিতে।

"Etzel Andergast" উপন্যাসে এৎসেল যুবক; তার অন্তর শান্তিহারা; মহাযুদ্ধাগ্নিদগ্ধ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনের সত্য, আত্মার আনন্দ, পৃথিবীভরা শান্তির সুর খুঁজতে গিয়ে সে দিশাহারা হয়ে গেছে। একবার সে ভাবল, হয়ত মানুষের জ্ঞানের পথে সে সত্যের সন্ধান পাবে, সে তিন শত প্রধান প্রধান পুস্তকের তালিকা তৈরী করল, দিনরাত বইএর পর বই পড়ে যেতে লাগল,—দর্শন, ধর্ম্মের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, জীব-বিজ্ঞান, কত রকমের বই; কিন্তু তার সত্যানুসন্ধিৎসু মন কোথাও শান্তি পেল না; চারিদিকের সমাজ ও জীবনে অবিচার, অপ্রেম, ভাঙন, ব্যর্থতা দেখে ব্যথিত অন্তরে যে সব প্রশ্ন জাগে, তার কোন উত্তর পেল না।

বই পড়া ছেড়ে এৎসেল আবার মানবজীবন দেখতে বাহির হল। সরল সহজ জীবন নয়, যেখানে মানবজীবন দুঃখে ভেঙে পড়েছে, অত্যাচারে দ্বন্দ্বে কামনায় কদর্য্য বীভৎস, সেই underworld তাকে আকৃষ্ট করল—গরীবদের বস্তি, কুলিদের সহরতলী, বারবনিতাদের পাড়া—সভ্য ভদ্র ধনী সমাজের প্রান্তদেশে দুঃখদারিদ্র্যের নীতিহীন বিশৃঙ্খল নরনারীসমাজ, সেখানে সে তার যৌবন-হৃদয় নিয়ে জীবনের সত্য খুঁজতে গিয়ে পেল শুধু বেদনা।

এই সময় সে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সংস্পর্শে এল। এক শক্তিমান চরিত্রের শান্ত প্রভাব আর এক অশান্ত চরিত্রে কিরূপ ক্রিয়াবান হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখি, ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সঙ্গলাভে এৎসেলের চরিত্রের পরিণতিতে।

ব্যাপারটি এইরূপ: রোডেরিশ্ লুটগেন্ নামে এৎসেলের এক বন্ধু আত্মহত্যা করে; মহাযুদ্ধের শেষে যখন জার্ম্মানীর সব যুবকদের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, জীবন অর্থহীন, যুদ্ধের জন্য সকল ত্যাগ দুঃখভোগ ব্যর্থ, সেই সময় কোন ব্যর্থপ্রেমিক যুবক যে আত্মহত্যা করবে, তাতে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু মুস্কিল বাধল জেসিকে নিয়ে; জেসি রোডেরিশ্‌কে ভালবাসত; ঘরে গ্যাস ভরে সেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে; রোডেরিশের বোন হিল্‌ডে তা জানতে পেরে জেসির বাড়ী এসে তাকে বাঁচায়; কিন্তু জেসি আত্মহত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সুতরাং এৎসেলের সাহায্যে হিল্‌ডে জেসিকে তাদের বাড়ী নিয়ে এল, জেসিকে ঘরে বন্ধ ক'রে হিল্‌ডে ও এৎসেল পালা ক'রে দিনরাত তাকে পাহারা দিতে লাগল। দু'দিন এমনি পাহারা দেবার পর, ডাক্তার কেয়ারকোভেনের নাম শুনে এৎসেল তাঁর কাছে যায়, তিনি যদি জেসির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। ডাক্তার কেয়ারকোভেন সত্যিই অদ্ভুদ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; তাঁর সংস্পর্শে তাঁর কথাবার্ত্তায় জেসির মন বদলে গেল, ডাক্তার তাকে তাঁর হাস্পাতালে নিয়ে গেলেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের সঙ্গে এৎসেল আনডেরগাষ্টের পরিচয় আরম্ভ হল। এৎসেল তখন গৃহহারা; সে কোন এক স্থানে স্থির থাকতে চায় না; এক রাত এক বন্ধুর বাড়ীতে অপর রাত অন্য বন্ধুর বাড়ীতে, এমনি ক'রে সে রাত কাটায়।

ডাক্তার কেয়ারকোভেন এৎসেলকে সেক্রেটারী নিযুক্ত ক'রে নিজের বাড়ি এনে রাখলেন। এৎসেলের নবজীবন সুরু হল। সে পেল নারার প্রেম। ডাক্তার কেয়ারকোভেনের স্ত্রীর সঙ্গে তার ভালবাসা হল। এই প্রেমের মধ্যে সে জীবনের সার্থকতা, সত্য, আনন্দ হয়ত খুঁজে পেত; কিন্তু সে প্রেম তার নতুন জীবনে আবার নব দ্বন্দ্ব নব বেদনা আনলে; প্রেমের সত্য খুঁজতে গিয়ে সে এক দম্পতির শান্তির গৃহ ভেঙে আনলে দুঃখের আগুন; যে আগুনে এৎসেলের অন্তরও দগ্ধ হল। সত্যের সন্ধানপথে সংঘাতের পর সংঘাতের ব্যথায় শ্রান্ত হয়ে কেয়ারকোভেন-পরিবারের ভাঙা ঘর হতে সে পালাল অনুশোচনায়; তার মায়ের স্নেহময় গৃহে সে শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গেল। এইখানে গল্পের শেষ।

উপন্যাসখানিতে যে সব চরিত্রগুলি এৎসেলের জীবনপথে দেখি, তাদের কেহই সহজ, সুস্থ নয়: কেহ সমাজের অত্যাচারে বিকৃত, কেহ জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় করুণ, কেহ কামনার লালসায় বীভৎস, কিন্তু সবার অন্তরে যে দ্বন্দ্বলীলা দেখতে পাই, তা অপূর্ব্ব।

চঞ্চলচিত্ত সত্য-সন্ধানী গৃহ-হারা এৎসেল আন্‌ডেরগাষ্ট; সুখান্বেষ্টা, বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন শক্তিপূজারী লরিনেয়ার, সে একদিন Kapp Putch-র দলে ছিল, তারপর হল কমিউনিষ্ট ডন্-জুয়ান: নীতিবোধহীন অভিনেত্রী নর্ত্তকী এমা স্পেয়ারলিং, তার জন্যে রোডেরিশ আত্মহত্যা করল, সেজন্য সে বিশেষ ব্যথা অনুভব করেনি, সে আইন জানে না, বিচারবোধ তার মনে জন্মায়নি। এই অসুস্থ চঞ্চল জগতের মধ্যে ডাক্তার কেয়ারকোভেনের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুস্থ শক্তির স্থির ভূমির মত; কিন্তু

সে ভূমিতেও ভাঙন ধরল; এই মহান পুরুষের সত্তার ধ্বংসের ট্রাজেডির সম্মুখে মাথা নত হয়ে আসে। Spiritual Crisis, মানবাত্মার দুঃখময় সংঘাতের ট্রাজেডির কথা এমন শক্তির সহিত, হৃদয়ের বেদনার সহিত ভাসারমানের মত খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Western Influence in Bengali Literature.—

By Priyaranjan Sen (Calcutta University).

Western Influence in Bengali Novel.—

By Priyaranjan Sen (Calcutta University).

পাশ্চাত্যমনের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপথে সমগ্র জগৎ আজ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের শতধারার সম্মিলনে আমাদের সাহিত্যের মৌলিক ধারাটি এক অভিনব রূপ নিয়েছে, যার ব্যাপকতাও যতো বেশী, গভীরতাও ততো। এই নবরূপটির আবির্ভাব হতে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বহিঃশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এর ওপর চলে এসেছে—তার কতোখানি আমরা আমাদের সহজ প্রতিভায় আত্মসাৎ করেছি এবং সে-ই বা আমাদের কতোখানি আত্মসাৎ করেছে তার একটা সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের এই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ভার নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। ডক্টর সুশীলকুমার যে-পঁচিশটি বছরের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা করেছেন, সে হলো গৌরচন্দ্রিকার যুগ—Formative Age। শশাঙ্কমোহন রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এসেছেন তাঁর 'বঙ্গবাণী'তে। এ বইখানি কতকটা ঐতিহাসিকতার দাবী করতে পারে; কতকটা,—কারণ, আধুনিক যুগের আলোচনায় ধারাবাহিকতা ঠিক রক্ষিত হয় নি। তাঁর 'বাণীমন্দির'-এর প্রবন্ধগুলি Obiter Dicta জাতীয়। 'মধুসূদন' Dowden-এর 'Shakespeare—His Mind and Art'-এর অনুসরণে লিখিত—ভালো বই। শশাঙ্কমোহনের তিনখানি বইই মূল্যবান্, যদিও তাঁর লিখনভঙ্গীতে এমন একটা অবাঞ্ছিত বক্রতা আছে যে মনে হয় অনেক জায়গায় তাঁর বক্তব্য ঠিক স্পষ্ট হয় নি অথবা বক্তব্য বিশেষ না থাকায় ভাষা ফেনিল হয়ে উঠেছে। তবু স্বীকার করতেই হবে বিচারসাহিত্য হিসাবে এগুলি অভিনব সৃষ্টি। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর 'Western Influence in Bengali Literature' বইখানিতে দুটি বস্তু লক্ষ্য করলাম—ঐতিহাসিকতা আর প্রভাবের হেতু—তথা স্বরূপ-বিচার। ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা কখন্ কোন্ পথে বয়ে এসেছে এবং ওই বিশিষ্ট পথ দিয়েই বা কেন এসেছে গ্রন্থকার সূক্ষ্মভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য অনেকস্থলেই তাঁকে ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিষয় এতো ব্যাপক যে চারশো পৃষ্ঠার একখানি বইএ সব কথা বিশদভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

প্রথমেই আছে পাশ্চাত্যপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাঙলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। এ-আলোচনা অবশ্যম্ভাবী ; নইলে প্রভাবের স্বরূপ ও পরিমাণ বোঝা অসম্ভব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশটি 'Contact with the West: before the Christian era' আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ব'লে মনে হয়: কারণ, এযুগের সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু গ্রন্থকার বল্‌তে চান বাইরের প্রভাব আত্মসাৎ করার শক্তি সকল দেশের থাকেনা, এদেশের আছে—'India was not so stolidly impervious to outside influences'; এবং আছে বলেই ১৫০ বছরে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে এমন বিপুল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে।

আসল বিষয়বস্তুর সূচনা হোলো তৃতীয় পরিচ্ছেদে—ইংরাজ আমলের প্রথম অংশে নবপ্রভাব কোন্ কোন্ পথে এলো তারি হিসাব নিকাশ (Channels of the new influence)। এই অংশে প্রাথমিক প্রেরণার বিভিন্ন প্রবাহগুলি আলোচিত হয়েছে এবং ভাবীকালের বিপুল সম্ভাব্যতার বীজ কেমন ক'রে এই সঙ্কীর্ণ সীমার প্রভাবের ভিতর অনুস্যূত হয়েছিল তার বিচার করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। এইটিকে বলা যেতে পারে সূত্র এবং পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলি এরি ভাষ্য। ইউরোপীয়, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডীয় বহুমুখী চিন্তাধারার সঙ্গে এই সময় হতেই এদেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আরম্ভ। পরিচ্ছেদটির নাম Bengal's Favourite Authors। 'Favourite' শব্দটির মূল্য অত্যন্ত বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই 'favourite'-কে আবিষ্কার করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ, সেটি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কাল এবং নবরূপের আকস্মিক আবির্ভাবে স্বাভাবিক মূঢ়তার দিন। তখন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বৈদেশিকদের ক্রিয়াশীলতাই ছিল বেশী। কাজেই 'favourite'-কে চিনে নিতে পঞ্চাশ বছরেরো বেশী সময় লেগে গেল। এই 'favourite'-দের প্রভাব আমাদের নবতর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই কাজ করেছে। সেদিনকার সেই আরব্ধ সাধনা আজো নানানতররূপে সিদ্ধিলাভ করছে। মধুসূদনে যার অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তাই পুষ্পিত হয়েছে। অতি আধুনিকদের সাধনার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত, যদিও এ সাধনার গতি এবং প্রকৃতি বলিষ্ঠ নয়। তবু, আজ না হোক্, দুদিন পরেও পুষ্প তার স্বভাবধর্ম্মে ফলে উত্তীর্ণ হবেই। প্রিয়রঞ্জনবাবু এই অংশটির আলোচনায় একটি বিষয়ে নজর দেন নি বলেই মনে হোলো। এদেশে যখন মধু-বঙ্কিমের যুগ এলো, ইংরাজী সাহিত্যে তখন Victorian Age। তবু আমাদের মধু-বঙ্কিমের সাহিত্য এতো পেছিয়ে পড়ল কেন? তাঁদের সাহিত্য এদেশের পক্ষে নতুন হতে পারে, কিন্তু সাগরপারে antidated। পরিচয়ের আংশিকতা এর কারণ বলে সহজেই মনে হবে। কিন্তু এর চেয়ে সঙ্গততর কারণ দীর্ঘদিনের অনুশীলনের অভাবে জাতির মানসিক জড়তা। স্বাধীন দেশের চিন্তধারার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলা পরাধীন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আজো তাই আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার ঠিক সুরটি লাগ্‌ছে না; বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দনের বড়োই অভাব দেখছি। তথাকথিত প্রগতির ভিতর দুর্গতির লক্ষণই বেশী। শরৎ-রবির পর থেকে এ-সাহিত্যে স্বতন্ত্রতার চেয়ে পরতন্ত্রতার রূপই অধিক মিল্‌ছে। আত্মস্থ করে বিশিষ্টতা দেওয়ার প্রতিভার অভাবে আবর্জ্জনাই জমে উঠছে। প্রথম পরিচয়ের যুগেই এমনি হওয়া স্বাভাবিক

ছিল; কিন্তু ঠিক তা হয়নি। এতো কাল পরে, যখন বাঙলা প্রিয়রঞ্জনবাবুর মতে "may be believed to have developed her own tendencies," তখন এ-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? প্রিয়রঞ্জনবাবু ভেবে দেখবেন।

এইবার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আর অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা। প্রথম তিনটিতে আছে চতুর্থ পরিচ্ছেদের রৌপিক ফলশ্রুতির অর্থাৎ 'favourite author-দের প্রেরণা কিভাবে আমাদের কাব্যে, নাটকে এবং গদ্যসাহিত্যে রূপায়িত হয়ে এসেছে, তারি বিবরণ। অষ্টমে আন্তর ফলশ্রুতি অর্থাৎ 'Matter and Spirit'-এর বিচার।

কাব্যের 'Sonnet'-রূপের আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য', 'দেবতার বিদায়', 'নৈবেদ্যের' কবিতা প্রভৃতিকে 'Sonnet'-এর পর্য্যায়ে ফেলেছেন। আমি এগুলিকে চতুর্দ্দশপদী পয়ার ব'লে মনে করি। মধুসূদন Sonnet-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই প্রতিশব্দটীর সৃষ্টি হয়েছিল। Sonnet—সনেট্; কোনো প্রতিশব্দের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। আরেক কথা। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী', 'মেঘদূত', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতিকে 'accurately as blank verse' ব'লে ধরা যায় না; 'but rhyming lines which are run on or unstopped'—সত্যি কথা। কিন্তু 'jingle of similar sounds is not altogether absent'—কোথা থেকে? তাছাড়া 'altogether' শব্দটির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হোলো না। 'But never prominent'—'never' কি ঠিক? 'মানসসুন্দরী'র

'ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে গন্ধবাষ্প তার,
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার'

—এ তো বিশুদ্ধ পয়ার; এমন কি যতিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত। বোধহয় 'never' নয়, 'not always' গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। 'এবার ফিরাও মোরে', 'সমুদ্রের প্রতি', 'হিমালয়' প্রভৃতিরো এই ছন্দ; কেবল পঙ্‌ক্তির অক্ষর সংখ্যা চৌদ্দ না হয়ে আঠারো।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' কি নিখুঁত Epic-লক্ষণাক্রান্ত? 'সাহিত্য-দর্পণ'-কে তিনি মানেন নি; কিন্তু 'Paradise Lost'-কেও যে ঠিক মেনেছেন তা মনে করি না। 'মেঘনাদবধকাব্য' সংস্কৃত মহাকাব্য আর ওদেশের Epic-এর মিলনফল।

নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের আলোচনাটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সর্ব্বাঙ্গীন। গ্রন্থকার যথাসম্ভব প্রমাণপ্রয়োগের ওপর আপনার বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিষয়ের ওপর thesis লিখে সেদিন এক ভদ্রলোক বিলাতী Ph. D. নিয়ে এসেছেন যা প'ড়ে আমরা কিন্তু হতাশ হয়েছি। প্রিয়রঞ্জনবাবু যে স্মৃতির ওপর নির্ভর করেননি বা অযথা কল্পনার রঙ ফলিয়ে মরীচিকার সৃষ্টি করেননি এতে আমরা আনন্দিত। অনেকের ধারণা রাশিয়ার Gerasim Lebedeff-এর প্রভাব আমাদের শিশুনাট্য-সাহিত্যের ওপর খুব বেশী, গ্রন্থকার তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন বাঙলা নাটক তথা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব এবং প্রগতির মূলে এদেশে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী Theatre-এর প্রভাবই বেশী। আমরাও তাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। Lebedeff বাঙলা বই ('Disguise' আর 'Love is the Best Doctor'-এর

বাংলা অনুবাদ) অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বেলেঘাটার বাগানবাড়ীতে যে-বই নিয়ে প্রথম Theatre করেন, তা বাঙলা নয়, ভবভূতির সংস্কৃত নাটক 'উত্তররামচরিতে'র Wilson-কৃত ইংরাজী অনুবাদ। ওর সঙ্গে ছিল Julius Caesar? লক্ষ্য করবার বিষয় নয় কি?

এর পরে থিয়েটারে অভিনয়যোগ্য বাঙলা নাটকের আবির্ভাব হয়। তা সত্ত্বেও ইংরাজী নাটকের অভিনয় বহুদিন ধরে চলেছিল। সেই থেকে পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের সাহিত্যে অসংখ্য নাটকের সৃষ্টি হয়েছে; বিদেশী নাটকের অনুবাদও হয়েছে প্রচুর। গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা নাট্যসাহিত্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেও যথেষ্ট। প্রিয়রঞ্জনবাবু কি খুব আশাবাদী? তিনি 'নাট্যমন্দির' 'নাট্যনিকেতন' প্রভৃতি নামে বাঙালীর আত্মস্থতার লক্ষণ দেখে সুখী হয়েছেন; বলেছেন এই নামকরণ 'has a significance of its own'। কিছু significance হয়তো আছে এবং শিশিরবাবুর মতন প্রতিভাশালী নটের আবির্ভাবও হয়েছে দেশের সৌভাগ্যের ফলে। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে decadence লাগ্‌লো কেন? সেই থোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িথোড় ১৯১২ সাল থেকেই চল্‌ছে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য আর মন্মথবাবুর একাঙ্কিকা বাদ দিয়ে। আত্মস্থ বাঙালীর প্রতিভাও কি উদরস্থ হয়ে গেল? আমাদের সাহিত্যের এই অতিআধুনিক যুগটি অদ্ভুত!

এইবার গদ্যসাহিত্যের কথা। সকল দেশেরি মতন আমাদেরো গদ্যসাহিত্য বয়সে সকলের ছোটো। প্রাক্‌পাশ্চাত্যযুগে এর অস্তিত্ব ছিল না বল্‌লেই চলে। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি এর বহুরূপ—উপন্যাস, ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্যবিচার, গদ্যকাব্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, আত্মচরিত,-ব্যাকরণ, অভিধান, হাস্যকৌতুক নানান্ দিকে গদ্যধারা প্রাণের প্রাচুর্য্যে শত তরঙ্গে আবর্ত্তিত হতে হতে চলেছে। এই দিকেই পাশ্চাত্যপ্রভাব যতো অতল, ততো ব্যাপক। মাত্র দেড়শো বছরে কি আশ্চর্য্য শক্তিই এ পেয়েছে! শরৎ-রবির গদ্যে যে বিশ্বদীপন জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়েছে, নিমানন্দ-চণ্ডীদাস-রমাইপণ্ডিতের গদ্যে কি তারি latency ছিল? বৈদেশিকের হাতে যার প্রথম ব্যাকরণ অভিধানের জন্ম হলো, বৈদেশিক যার চলার পথ বাৎলে দিলে বিলাতী Syntax-এর ছাঁচে ঢালা কিন্তুত-কিমাকার রূপের সৃষ্টি ক'রে, তাই আজ বিশ্বমনের নাট্যশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে! আশ্চর্য্য! প্রিয়রঞ্জনবাবু এই অতিপ্রয়োজনীয় অংশটিকে বড়োই সংক্ষিপ্ত করেছেন, মনের ক্ষুধা ঠিক মিটলো না।

অবশ্য উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর একখানি পৃথক্ বই আছে—'Western Influence in Bengali Novel'। এইটিই তাঁর প্রথম বই। ছোটো বই, তবু চমৎকার। সামান্য একআধটু অসামঞ্জস্য যা চোখে পড়েছে, তারি আলোচনা করি।

বাঙলার কথাসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টিলগ্নে একদিকে বিশেষতঃ 'Vernacular Literature Society'-র কল্যাণে হতে লাগ্‌লো অজস্র ইংরাজী বইএর অনুবাদ; অন্য দিকে বিদ্যাসাগর ইত্যাদির নজর রইলো সংস্কৃতের ওপর এবং আরেকদল ঝোঁক দিলেন পার্শী, আরবি, উর্দ্দুর দিকে। শেষদলের চেষ্টা নিষ্ফল হলো; কারণ, ওঁদের সাধনা 'failed to capture the imagination of the public'। প্রিয়রঞ্জন-বাবু এর কারণ বলেছেন—'Incidents described in these books take

place as a rule outside India···heroes and heroines have strange, outlandish names' ইত্যাদি। কিন্তু, তাই কি ? বিলাতী বইএর 'incidents'-ও তো এদেশী নয় এবং তারো 'heroes and heroines'-এর নাম আমাদের কাছে 'strange'। তবে এ কথাটা অবশ্য সত্যি যে আরবী পার্শী বইগুলি অবাস্তব রোমান্সধর্ম্মী। একটা কথার অর্থ বুঝলাম না—'The facts, mentioned above, will support the theory that even without the help of English, or for the matter, western literature in general, the Bengali novel would have come to its own'। কিন্তু 'above' যা 'mentioned' আছে তা হচ্ছে—আরবী পার্শী গল্পে মন ঠিক সাড়া দিলে না ব'লে 'the demand for western stories was so strong that···' ইত্যাদি। পরের প্যারাতেও রয়েছে—'It is not a fact that only in translation or in plot or in style only, our writers were influenced by western authors . Even in the matter of ideas the Bengali novelist learnt much and accepted much from England and other countries···'

স্বর্ণকুমারীর কথাও আলোচিত হয়েছে দেখ্‌লাম। অনুরূপা নিরুপমা কি পাশ্চাত্যপ্রভাবের অতীত ? প্রিয়রঞ্জনবাবুর গণ্ডীর বাইরে ব'লেও তো তাঁদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-বিচারে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের ধারা এসে মিশেছে। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার রসায়নে সকলগুলির এক আশ্চর্য্য কেমিক্যাল্‌ কম্পাউণ্ড্‌ তৈরী হয়েছে। প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'He (Rabindranath) is not pre-eminently a novelist ; he is a poet first. Hence in the history of Bengali novels he does not occupy the same position as he does in his poetry'--খুবই সত্যি ; তবু, তাঁর উপন্যাস, বিশেষ ক'রে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', এমন কি সেদিনকার 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' পর্য্যন্ত (অবশ্য শেষ দুটির কথা প্রিয়রঞ্জনবাবু আলোচনা করেন নি) আদর্শের দিক্‌ দিয়ে যাই হোক্‌, শিল্প হিসাবে চমৎকার। 'ছোটো গল্পে' তিনি 'not only the pioneer but also the best'—আমরাও তা মানি। কিন্তু একি তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি ? প্রিয়রঞ্জনবাবু কিছুই বলেন নি। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন ফরাসীর কাছে ; কিন্তু পরে রাসিয়া, বিশেষতঃ Turgenev আর Tchekov, তাঁর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে। Scandinavian-দের কাছে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঋণী ; কিন্তু ছোটো গল্পে ওঁদের কৃতিত্ব কম বলেই আমার বিশ্বাস। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জনবাবুর বেশ কৃতিত্ব দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন নন ; কাজেই তাঁর পাশ্চাত্য ঋণ সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করতে হয়। এবং তাতে পাণ্ডিত্যের তথা অন্তর্দৃষ্টির দরকার। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

'The assimilation of western idea and ideals is more and more thorough and the borrowing, if any, is more and more

indirect, ideas are so closely assimilated that it is not at all possible to distinguish if they are eastern or western'।

খুব চমৎকার। তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের ওপর ইংরাজী প্রভাব কম, রাসিয়ান্ আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ই বেশী।

ছোটো গল্প সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রায় নীরব। এ নিয়ে অনেক কথাই কিন্তু তাঁর বল্‌বার ছিল।

এইবার প্রথম বইখানির অষ্টম পরিচ্ছেদ। এখানে সাহিত্যের 'matter' আর 'spirit'-এর আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মানুষের স্থান খুব উচ্চে। এর মূলে Comte-র নিরীশ্বর মানববাদের (Positivism) প্রভাব খুবই বেশী একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। Fichte-এরও কিছু আছে। James-এর Pragmatic Philosophy আর Whitman-এর কাব্যও এই দিক্ দিয়ে আমাদের সাহিত্যে প্রচুর কাজ করেছে ব'লে মনে করি। এঁদের কথার উল্লেখ না দেখে একটু বিস্মিত হয়েছি। পাশ্চাত্য সংস্পর্শের গোড়া থেকেই আমাদের সমাজের নারীদের ওপর আমাদের নজর পড়েছে। বিদ্যাসাগর ভূদেব বঙ্কিমের ভিতর দিয়ে নবীনচন্দ্রে এমন কি চিত্তরঞ্জনেও নারী যে-রূপ পেয়েছেন, তার মূলে বিলাতী নারীর আদর্শ যথেষ্ট থাক্‌লেও এদেশী আদর্শ একেবারে মুছে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের নারী অপরূপ সৃষ্টি। সেকালের 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'উর্ব্বশী'র ভিতর দিয়ে অপরূপের মধ্যে আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলেছে!

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে দেশাত্মবোধের কথা। দেশাত্মবোধের যে-রূপটির সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত, তার মূলে যে পাশ্চাত্য প্রেরণা আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বাত্মবোধে পরিণত হয়েছে; প্রিয়রঞ্জন-বাবুর ভাষায় 'nationalism merging in internationalism,' কিন্তু এতে পশ্চিমা Percentage-ই কি বেশী নয়?—অন্ততঃ আজকাল?

ধর্ম্মেও পাশ্চাত্য প্রভাবের বহু মুখফলের কথা গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। Dogma-র স্থানে আজ বিচার এসেছে। ওদেশের rational philosophy এদিকে যথেষ্ট কাজ করেছে মানি; কিন্তু Science-এর প্রভাবও কি খুব বেশী নয়? ইউরোপের মধ্যযুগের Scholastic Philosophy ছিল Dogmatic—Bacon-এর সময় থেকে হোলো Rational। Bacon ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ গণিতজ্ঞ। পুরানো সংস্কৃতির মূলেও বিজ্ঞানের প্রভাব যথেষ্ট ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানজ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি তাঁর 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় হয়তো জগদীশচন্দ্রের প্রভাব আছে।

প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'The theosophical and spiritual movements, both western in origin।' আড্যিয়ারে Theosophical Society-র প্রতিষ্ঠাত্রী Madam Blavatsky রাশিয়াবাসিনী, কাজেই 'western'; কিন্তু Theosophy-কে 'western in origin' ব'লে মনে করি না। গীতার 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি'—এই তো 'Immanence of God' এবং এরি ফল হোলো 'Solidarity of Man'—'অহং তং ন প্রণশ্যামি'। আর Spirit-এর

কথা পুরাণে তো আছেই ; 'ব্রহ্মসূত্রে'ও পাই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এদুটির জন্য পাশ্চাত্য দেশই আমাদের কাছে ঋণী। Movements-ই শুধু বিলাতী। তা ছাড়া, হীরেন্দ্রনাথের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-কে Theosophy-র দ্বারা প্রভাবিত বল্‌তে আমার আপত্তি আছে ; এখানিকে আমি সর্ব্বদর্শনসমন্বয়রূপেই দেখেছি।

নবম বা উপসংহার পরিচ্ছেদে প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—

The receptivity of the Bengali mind deserves some credit ···who will say that this receptivity has been all for good ?

সত্যিই ভাব্‌বার কথা। এর ভালোমন্দ দুটো দিকই প্রবল। বিশেষতঃ এই অতিআধুনিক যুগের সাহিত্য দেখে ভয়ই হয়।

শেষে একটা কথা ব'লে রাখি। বইখানির ২৮৪ পৃষ্ঠায় দেখলাম—

'Still, a sentence like the following which is either English or Sanskrit, but certainly not Bengali···'

'নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল। (সীতারাম, ৮ম পরিচ্ছেদ)'

সংস্কৃতে বাক্যবিন্যাস এমন হতে পারে না। অসমাপিকা আর সমাপিকা ক্রিয়ার সমানকর্ত্তৃকত্ব হতেই হবে।

এইবার আমার উপসংহার। প্রিয়রঞ্জনবাবু বিশেষতঃ এম্‌-এ পরীক্ষার পাঠ্য হিসাবেই বইদুখানি লিখেছেন ; কিন্তু আমাদেরো অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদেরো এতে যথেষ্ট উপকার হয়েছে। অনুরোধ করি 'Ten More Plays of Shakespeare-এর মতন আরেকখানি বই তিনি আমাদের যেন উপহার দেন। আমাদের অতিআধুনিক সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের মাত্রাও বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে। আলোচিত বই দুখানি থেকে তাঁর শক্তির ওপর আমার বিশ্বাস জন্মেছে বলেই এ ভার তাঁকে দিলাম অর্থাৎ নেবার জন্য অনুরোধ কর্‌লাম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি : বই দুখানি বাঙলায় লিখলেই কি ভালো হতো না ? আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যও তাতে বেড়ে যেতো আর অশিক্ষিত অর্থাৎ ইংরাজী-না-জানা অভাগ্য বাঙালীদেরো উপকার হতো। অবশ্য তাতে জুবিলি রিসার্চ প্রাইজ্‌ বা পি, আর্‌, এস্‌, মিল্‌তো না আর—থাক্‌। মোটের ওপর বাঙলা অনুবাদের সময় যায় নি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

নীল-লোহিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—কমলা বুক ডিপো।

এগারটী ছোট গল্পের সমষ্টি। অধিকাংশ গল্পের plot বা আখ্যান-ভাগ নাই বলিলেই হয়। তথাপি তাহাতে অন্য জিনিস এত আছে যে পুস্তক পাঠ করিয়া কেহই নিরাশ হইবেন না। প্রমথবাবুর লিখনভঙ্গী গৌড়জনের সুপরিচিত। সেই লিখনভঙ্গী পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহাই সমজদার পাঠককে ভরপূর আনন্দ দান করিবে।

প্রথম তিনটী গল্পের নায়ক স্বয়ং নীল-লোহিত। এই মুখরনয়ন গল্পবাগীশ নায়ককে খুব গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকের পছন্দ নাও হইতে পারে। তবে আমার Tartarin

de Tarascon বা Baron Munchausen অপেক্ষাও নীললালকে বেশী ভাল লাগিয়াছে। মাত্র তিনটী গল্পে আশা মিটে নাই। সাধারণ পাঠকের তরফ হইতে আমার আবেদন যে প্রমথবাবু নীল-লোহিতের মুখে যত গল্প শুনিয়াছেন সবগুলি এক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।

বাকী গল্পগুলি সম্বন্ধে আমার বেশী বক্তব্য নাই। সবগুলি এক দরের নয়। সরেসও আছে নিরেসও আছে। প্রাণবন্ধু, সিতিকণ্ঠ ও বীরবলের চিত্র নীললোহিতের মত সমুজ্জ্বল না হইলেও খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পূজার বলি, দিদিমার গল্প ও ভূতের গল্প এ পুস্তকে না দিলেই ভাল হইত, কেন না ইহাদের plot নিতান্ত মামুলী ধরণের এবং চৌধুরী মহাশয়ের সর্ব্বজনবিদিত রচনাচাতুর্য্যও ইহাতে বিশেষ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

তবে প্রমথবাবুর লেখায় গল্পটা উপলক্ষমাত্র। আখ্যান ছাড়াও অনেক জিনিস এই পুস্তকে আছে। নানা স্থানে যে সব শ্লেষোক্তি আছে, তাহা সত্যই সুন্দর। কেহই বাদ পড়েন নাই, ক্ষত্রিয়ত্বকামী বঙ্গীয় কায়স্থসন্তান হইতে সুরতের লাড্ডু পুরী পর্য্যন্ত। গ্রন্থকারকে নানা বিদ্যায় পারাধিগত বলিয়া সকলেই জানেন। তবু তামাক সাজা, হাতী ধরা, ঘোড়ায় চড়া, ঘুড়ী ওড়ান ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে বলিয়া কেহই সন্দেহ করেন নাই। তবে জানা বস্তুটাই ত সব নয়। তামাক সাজা ও ঘুড়ী ওড়ান আমরা পাঁচজন হয়ত চৌধুরী মহাশয়ের চেয়ে ভালই জানি কিন্তু বিদ্যা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

মোট কথা, আলোচ্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দর হইয়াছে। আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Shakespeare through Eastern Eyes—By Ranjee G. Shahani with an introduction by J. Middleton Murry, and an appreciation by Emile Legouis (Herbert Joseph, London).

অমর কবি শেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব প্রাচ্যের হৃদয় স্পর্শ করে কি না সে কথা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল নীতি,—কাব্য সার্ব্বভৌম নয়; রস সার্ব্বভৌম, কিন্তু সে রসকে প্রকাশ কর্ত্তে গেলে, প্রকাশভঙ্গী স্থানকালপাত্রের অনুযায়ী পৃথক পৃথক আকার ধারণ করে। প্রাচ্য এতদিন তোতাপাখীর মত পাশ্চাত্যের শেখানো বুলি আউড়েছে, নকলনবিশী ছিল এতদিন ধরে প্রাচ্যের আধুনিক শিক্ষার মেকী মাপকাঠী, কিন্তু এখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মেকী ধরা পড়েছে, সে আজ ভাল ক'রে দেখে শুনে জীবনের পথে চল্‌তে চায়, যাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে সে শিখে এসেছে তাঁর কথাই ভেবে দেখ্‌তে চায়,—বাস্তবিক তিনি প্রাচ্যের আদর্শেও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি কিনা। ডক্টর সাহানী এই বিষয় নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করেছেন; প্রাচ্যে, ভারতে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক কি ভাবে পড়ানো হয়, কি ভাবে

অনুবাদ করা হয়, কি ভাবে অভিনয় করা হয় সে সব ভাল ক'রে দেখে শুনে এবং অতীন্দ্রিয়ের প্রতি প্রাচ্যের সহজ অনুরাগের কথা মনে ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচ্যের চক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের আসন অত্যুচ্চে নয়। তা ছাড়া বাস্তবিক কথা, ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জীবনের কোনও সমস্যার বিষয়ে গভীর চিন্তা ক'রে কোন সমাধান করতে পারেন নি, সাহিত্যের কোনও বিশেষ রূপ সৃষ্টি ক'রে যাননি, নোতুন পথে চলবার ও চালাবার যে প্রতিভা, সে প্রতিভা তাঁর ছিল না ; সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়র এতদিন যে উচ্চ সিংহাসনে বসে ছিলেন আসলে তা তাঁর মোটেই প্রাপ্য নয়।

ডক্টর সাহানীর এই আলোচনায় এক দিক থেকে মূল্য আছে ; প্রাচ্যই হোক্ আর পাশ্চাত্যই হোক্ ভাল ক'রে পূর্ব্বগামীদের মত পরীক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে ; সুতরাং দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্যানুকরণের মোহ যদি কাটতে আরম্ভ করে, আমাদের নিজের চোখ দিয়ে যদি আমরা জগৎকে দেখতে আরম্ভ করি তবে আমাদের সেটা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নেই। আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, মঙ্গলের পথে আমাদের নিয়ে যাবে ; পরবশ্যতা বিবিধ দুঃখের মূল ; এ কথা আমরা যতই বুঝ্‌তে পারবো ততই ভাল। কিন্তু নিজের পায়ে চলতে পারাই পরম পুরুষার্থ নয়, ঠিক পথে যাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাত, মিষ্টিক সাধনা ছাড়া আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—এ সব কথা ব'লে যাঁরা ভারতের জাতীয়তাকে একটা বিশেষ রূপ দিতে চান, তাঁরা হিন্দু সভ্যতার একটা মনগড়া আদর্শ স্থির করেছেন। হিন্দু চেয়ে এসেছে ধর্ম্মার্থকাম একত্র এই তিনেরই সেবা,—"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ, যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ—কবির মধ্যে কালিদাসকে সে শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে, শেক্‌স্‌পীয়রকেও সেইরূপ অন্তরের ভক্তি উপহার দিতে পারে সে, দেশগত রুচিভেদ তার পথে অন্তরায় নয়। সাহিত্যের নোতুন প্রকাশভঙ্গীর সৃষ্টি তো কালিদাসও করে যাননি, কালিদাসও তো মিষ্টিক সাধনা শ্লোকে প্রকাশ ক'রে প্রাচ্য পাঠকের চিত্ত জয় করেননি, তাঁরও তো শব্দ-চয়ন ও সরসতা, নব নব চিত্রের সৃষ্টি ও সমাবেশ, পরম সম্পদ। সুতরাং ডক্টর সাহানীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রাচ্য হয়েও আমরা একমত হতে পারলাম না।

লেখকের উপকরণও অভ্রান্ত নয়। তিনি শেক্‌স্‌পীয়র যে আমাদের দেশে ভাল ভাবে অধ্যাপনা হয় না তার নজীরস্বরূপ শিক্ষাগারের ব্যঙ্গ্যচিত্র উদ্ধৃত করেছেন ; সেরূপ ব্যঙ্গ্যচিত্র আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই সৃষ্টি করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পত্রে রবীন্দ্রনাথের সুললিত রচনার দুর্দ্দশা কি ভাবে হয় তার যাঁরা পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা একথা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার করবেন। আর, ভারতীয় ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের আক্ষরিক অনুবাদ যে হতে পারে অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে,—গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথ্‌।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

The Meaning of Modern Sculpture—By R. H. Wilenski
(Faber and Faber).

বিলেন্সকি আজকালের শিল্পজগতে পরিচিত একজন উঁচ্‌কপালে শিল্পজ্ঞ বলে। কিন্তু রজার ফ্রাই-র আধুনিক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধে যে ফিলিষ্টিয়াদ্বেষী নাসিকাকুঞ্চনে ভয় পেয়েছিলুম, সে স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব বিলেন্সকির নেই। তার উপরে বিলেন্সকি বলেছেন যে ভালো ভাস্কর্য্যের ছবি দেখেও নাকি তৃপ্তিলাভ সম্ভব। কারণ ভালো মূর্ত্তির যথাযোগ্য আকার নাকি স্বতই ফোটোদর্শনেও মনে আসে।

অবশ্য এ বই সমালোচনার অধিকার তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জোরালো তর্করসাল রচনা হিসাবেও বইটী ভালো লেগেছে। প্রধানত গ্রীক শিল্পের মাহাত্ম্য ধ্বংসেই বিলেন্সকির মনোযোগ। কয়েকজন অসত্যবাদী ব্যবসাদার গ্রীক্ পণ্ডিত দীর্ঘকাল ধরে গ্রীক্ উৎকর্ষের কল্পিত কাহিনী চালিয়ে লোকের ভাস্কর্য্য-জ্ঞান বিকৃত করেছেন, এই হল বিলেন্সকির প্রতিপাদ্য। ধরা যাক্ ফিডিয়াস্‌কে। তাঁর কোনো কাজ নেই এবং তিনি পার্থেনন্‌-শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন ওবরসিয়র। অথচ আজো ফিডিয়াস্‌-জয়ন্তীতে বহু পণ্ডিত প্রমত্ত। যে সব বিখ্যাত গ্রীক্ ভাস্করদের কোনো কাজ কেউ দেখেনি, তাঁদের দিব্যদর্শক ভক্তদের বিলেন্সকি উপভোগ্য ঠাট্টা করেছেন। এবং কয়েকটী প্রস্তর-ব্যবসায়ী কি রকম উলঙ্গ মূর্ত্তি তৈরি করিয়ে হাতটা বা পাটা ভেঙে মাটিতে রেখে তারপরে গ্রীক নামে বিক্রি করত, তার ইতিহাসও সুখপাঠ্য। তাছাড়া অনেক তথাকথিত গ্রীক্ মূর্ত্তিই নাকি বনেদী রোমানদের ফরমায়েসে করা—মূর্ত্তিটী উলঙ্গ পুরুষ বা মেয়ে হবে, তা নাকি তাদেরই ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করত। এবং তাছাড়া যা গ্রীক্ ভাস্কর্য্যে থাকে, তা direct carving নয়। বিলেন্সকির মতে একেবারে পাথর খোদাই না করলে ভাস্কর্য্য হয় না। কারণ ভাস্কর্য্য হচ্ছে বিয়োগের কাজ, চিত্রকলা বা clay modelling যোগের কাজ। কঠিন প্রতিযোজক বস্তুর সঙ্গে সহযোগিতায় ভাস্কর্য্যের জন্ম। ভাস্কর্য্যের রূপ তাই খানিকটা পাথরের টুকরার মধ্যেই থাকে। গ্রীসে ছিল চিত্রকলারই প্রাধান্য, ভাস্কর্য্যের নয়।

এই গ্রীক্ ভূত মধ্যযুগে য়ুরোপের ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছিল বটে। কিন্তু রেনেশাঁস্ আবার একে আনে। অবশ্য তখনও মাইকেল এন্‌জেলো ছিলেন। কিন্তু মাইকেল এন্‌জেলোর স্বকীয় প্রতিভান্বিত কাজও গ্রীক্ নামে বেচতে হত। এক ব্যবসাদার তো ধরা পড়ে গিয়ে শাস্তিভোগই করে। তারপরে এল রোমান্টিক্ মুখের উপরে ঝোঁক্, এল অসম্পূর্ণতা, শিল্পহীন চরিত্রচিত্রণ। বিলেন্সকির মতে এর চূড়ান্ত হল এপ্‌ষ্টাইনের অসাধারণ প্রতিভায়। এপ্‌ষ্টাইনের ব্রন্‌জ্ কাজের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি ঝোঁক দিয়ে, তাঁর পাথরের কাজের উপর বিলেন্সকি অন্যায় করেছেন। যাই হোক্, তারপরে এলেন সত্যকার শিল্পীরা, বিলেন্সকির বন্ধুরা—মূর্, বেড্‌ফর্ড, গদিয়ে, মোদিল্লিয়ানি, জাড্‌কিন্ ইত্যাদি। মাইওল বা ডবসনের শুধু নামোল্লেখ করা হয়েছে—যদিচ তাঁরা মূর বেড্‌ফর্ড্ আদির চেয়ে বেশি সফল, বেশি শক্তিশালী। বোধ হয় তাঁরা বিলেন্সকির বিশেষ বন্ধু নয়। এখানে বলা যাক্—পাছে দর্শক শিল্পাতিরিক্ত গুণে মুগ্ধ হয়, সেই ভয়ে মাইওল্ বা ডব্‌সন্ মূর্ত্তির শরীর বা মুখ বিকৃত গতশ্রী করেন না। এবং পোর্ট্রেট্ করা যে পাপ নয়, ডব্‌সনের লিডিয়া লোপোকোভা নামে মিসেস্ কেন্‌সের প্রতিমূর্ত্তি দেখেও তা বোঝা যায়।

অবশ্য শিল্প তথা ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিলেন্সকির সাধারণ মতামতে ভুল নেই। তিনি নিজেই সক্রেটিসের ঘন. বক্ররেখা ও গোলের নিছক্ সৌন্দর্য্যের কথা উদ্ধৃত করেছেন। রাস্কিনও অক্স্ফর্ডে একটী স্ফটিক দেখিয়ে তার মধ্যেই ভাস্কর্য্যের প্রধান গুণের কথা বলেন। এড্না সেণ্ট ভিন্সেণ্ট্ মিলে তো তাই কবিতাই লিখেছেন Euclid alone has looked on beauty bare। আর যদি রেনল্ড্সের কয়েকটী কথাও উদ্ধৃত হয়, তাহলেই বিলেন্সকি সাবেককেলে হয়ে পড়েন। অবশ্য চৈনিক, পারসীক, নিগ্রো, সুমেরীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিলেন্সকির সশ্রদ্ধ জ্ঞান আছে। কিন্তু Gudea বা Chertihotep বা অনুরাধাপুরের বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে তাঁর বন্ধুদের কাজের ছবি প্রায় অর্থহীন ছেলেমানুষী বল্লেই হয়—আধুনিক ভাস্কর্য্যের ছাপ পড়া সত্ত্বেও। অবশ্য দোষ এ সব শিল্পীদের একলার নয়। ভাস্কর্য্য স্থাপত্যেরই প্রধান অঙ্গ। আর স্থাপত্যশিল্প বলে কোনো শিল্পই আজ নেই। তাই আধুনিক কাব্যের চেয়েও আধুনিক ভাস্কর্য্য ভিত্তিহীন ও বাহুল্যময়। অধিকন্তু এই সব শিল্পীরা এপ্ষ্টাইনের অসাধারণ দক্ষতাও পান নি। আর পাছে কোনো ভাস্কর্য্যবর্জ্জিত বিশেষত্ব তাঁদের পেয়ে বসে, পাছে জনচৈতন্য তাঁদের কাচের জানলা ভেঙে দেয়, এই ভয়েই এই শিল্পীদের সময় যায়। এই নেতি-র শুষ্ক অভ্যাসেই এঁদের রচনা প্রায়ই ব্যর্থ ও অনেক সময়েই বিরক্তিকর হয়ে পড়ে—বিশেষ করে বিলেন্স্কিদের জন্যই। বিলেন্স্কি বলেছেন—The modern sculptors have lost faith in the nineteenth century attitude. They no longer value contacts with local and individual manifestations of life ; they seek comprehension of universal and constant characters divined behind the individual manifestations। সাধু অন্বেষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়ত বা বিশ্বের এই অন্তর্রহস্য ধরবার মতো যথেষ্ট পরিশ্রম এঁরা করেন নি বা সে অধিকার এঁদের নেই। কিম্বা হয়ত সমাজ ও সমসাময়িক মানসিক অভ্যাসের বাইরে গেলেই শিল্প ব্যর্থ হয়। কবিতাতে তো তাই পিওর পোয়েট্রি খুঁজলে এডোয়ার্ড লিয়ারের কাছে যেতে হয়। এবং যে দেশের শিল্পে এঁরা মুগ্ধ ও যার অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করে থাকেন, সেই মিশরীয় নিগ্রো ভারতীয়াদি শিল্প কিন্তু বরাবর সমসাময়িক ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মেনেছে।

অবশ্য এ সত্ত্বেও বিলেন্সকির বইটী ভালো লাগে। তাতে শিক্ষাও পাওয়া যায়। কিন্তু অজন্তা ও মহামল্লপুরমে এক জাতের কাজ নেই ও লিঙ্গরাজ মন্দির আছে ভুবনেশ্বরে, ভুবনেশ্বরীতে নয়।

শ্রীবিষ্ণু দে

Texts and Pretexts.—BY ALDOUS HUXLEY (Chatto and Windus).
Poems and Translations.—BY ROBIN FLOWER (Constable).
Thirty Poems.—BY NORA NISBET (Basil Blackwell).
A Tale of Troy.—BY JOHN MASEFIELD (Heinemann).

সকল দেশেই এক জাতীয় লোক আছে কাজ করিতে না পাইলে যাহারা হাঁপাইয়া উঠে, কর্ম্মবিরতি যাহাদের নিকট অনস্তিত্বের নামান্তর। ভালো হউক, মন্দ হউক, একটা কিছু প্রত্যক্ষগোচর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেই হইবে, নহিলে সময় বৃথা নষ্ট হইল। এ ধরণের লোকের সাক্ষাৎ পাইলে অলডাস্ হাক্স্লি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ্যে জর্জ্জরিত করিতে দ্বিধা করেন না, অথচ "টেক্স্ট য়্যাণ্ড প্রিটেক্স্ট্" পড়িতে পড়িতে ভয় হয়, লোকে তাঁহাকেই এই দলভুক্ত ভাবিলে খুব অন্যায় করিবে না। অলডাস্ হাক্স্লি কৃতী পুরুষ। বয়স তাঁহার আজও চল্লিশ পার হয় নাই, ইতিমধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের উচ্চচূড়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অক্স্ফোর্ড হইতে তিনি বাহির হইলেন সাফল্যের ধ্বজা উড়াইয়া। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ উপলক্ষে মায় এ অধম ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত মৌলিক তাঁহার রুচি, তাই তাজমহলের রূপরেখা তাঁহার নিকট ব্যর্থ। চরকা-আন্দোলনের ফলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের তন্তুবায়গণের দুর্দ্দশা হইবে, অহিংসা-নীতির প্রবর্ত্তক তাহা বোঝেন না বলিয়া হাক্স্লি তাঁহার খর্ব্বদৃষ্টির খর সমালোচনা করিয়াছেন। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, বড়নভেল, ভ্রমণকাহিনী, শিল্পবিচার, সাহিত্য-প্রবন্ধ, দার্শনিক গবেষণা, রচনার এহেন কোন বিষয় আছে যাহাতে তিনি আপন নামাঙ্কিত পুস্তক প্রকাশ করেন নাই? তাই আজ ইংলণ্ডের আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। অবশ্য তিনি এমন কবিতা, বা নাটক, গল্প বা উপন্যাস আজও লেখেন নাই যাহা কবিতা হিসাবে, নাটক হিসাবে, বা গল্প হিসাবে প্রথম শ্রেণীত্বের দাবী করিতে পারে; এমন কোনো দার্শনিক মতবাদের অট্টালিকা গড়েন নাই যাহাতে মানবমনের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি যথাযথ সমাধান লাভ করিয়া নির্ব্বিরোধে বিশ্রাম করিতে পারে; রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির এমন কোনো তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেন নাই যাহাতে জাতিবৈষম্য বা সম্পত্তিবৈষম্যের নিরাকরণ হয়। এই স্তরের প্রতিভা হাক্স্লির অনায়ত্ত। তাঁহার প্রতিভা ধ্বংসপ্রবণ, অভাবদ্যোতক। বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ তাঁহার প্রধান প্রেরণা। জীবনে, সাহিত্যে, চিন্তায়, সাধনায় যেখানেই মেকী, অস্বচ্ছতা, অগভীরতা, সংকীর্ণতা আসন পাতিয়াছে, হাক্স্লির তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টি সেখানেই আলোকপাত করিয়া তাহাদের অকাম্য কদর্য্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান বিত্তসিদ্ধ আত্মতুষ্টির যুগে, গণমনের রঞ্জন-ব্যবসার যুগে, ইহা অত্যন্ত গৌরবের কথা। এ মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনার আকর্ষনী-শক্তি। মনে হয় পরিশীলিত সমাজের আলোচনার এমন কোনো বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে তাজা ও নির্ভরযোগ্য নহে। আর লেখার চমকপ্রদ দ্যুতিমান ভঙ্গীতে, পরিহাসের আপাত-নিরীহ রুদ্রতায়, ও বক্তব্যের অনাবৃত স্পষ্টতায় তিনি ইতিমধ্যেই রাসেল বা শ-এর সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিতাসংগ্রহ, একটু নূতন ধরণের—an anthology with commentaries। সংগ্রহে ইংরাজী কবিতার সংখ্যাই অত্যধিক, তবে ফরাসী,

ইতালীয়, লাতিন কবিতার সংখ্যাও কম নহে। এগুলির ইংরাজী অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হাক্‌স্‌লি বোধ করেন নাই, যেহেতু এ ভাষাগুলির সহিত তিনি পরিচিত। অথচ গ্রীক ও জর্ম্মান হইতে বচন বা শ্লোক উদ্ধার করিবার সময় মূল না দিয়া অনুবাদ দিয়াছেন, বোধহয় নিজে জানেন না বলিয়া। যে হাক্‌স্‌লি এত জিনিস জানেন, এ দুটি বিখ্যাত ভাষা তাঁহার জানা নাই ইহাতে দুঃখ ও আনন্দ দুইই হয়। দুঃখ, তাঁহার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতায়; আনন্দ, তিনিও সীমাবদ্ধ মানুষ ভাবিয়া, যে কথা হাক্‌স্‌লি-উপাসকেরা প্রায়ই ভুলিয়া যান। ইংরাজী কবিতা নির্ব্বাচনে হাক্‌স্‌লি পরপদাঙ্কিত মার্গে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, ইংরাজী কাব্য-সমুদ্র হইতে এমন কবিতা-মৎস্য (তাঁহার স্বকীয় উপমা) তুলিতে চান যাহা পলগ্রেভ, কুইলার-কাউচ ও ব্রিজেস-এর জালে ধরা পড়ে নাই।

স্বীকার করিতে হইবে কবিতা হিসাবে বইটি ভালোই হইয়াছে। সুপরিচিত কবির সহিত অপরিচিত কবির, সুপরিচিত কবিতার সহিত অপরিচিত কবিতার স্থান করিয়া দিয়া হাক্‌স্‌লি আপন বিদ্যাবিস্তারের ও উদার রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ইহাতে তাঁহার হাক্‌স্‌লিত্ব ফুটে না। তাই কবিতা-গুলিকে বিষয়ভেদে প্রায় ত্রিশটি গুচ্ছে বিভাগ করিয়া তিনি তাহাদের উপর নানা মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়াছেন। মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন—

In a rapidly changing age, there is a real danger that being well-informed may prove incompatible with being cultivated. To be well-informed, one must read quickly a great number of merely instructive books. To be cultivated, one must read slowly and with a lingering appreciation the comparatively few books that have been written by men who lived, thought and felt with style.

In the course of last half century, the conceptions in terms of which men interpret their experience have been altered by science out of all recognition. Superficially, therefore, much of the great poetry of the past is out of date. But only superficially; for the fundamental experience remains almost unaltered. It is not difficult to decode, as it were, the older interpretations, to translate them into our own terms. This is one of the things I have tried to do in my commentaries.

এইখানেই তাঁহার স্পর্দ্ধিত অভীপ্সা ও তদনুরূপ সাধনার স্বল্পতা ধরা পড়ে। এমন নহে যে তিনি কোনো ভালো কথা বা চিন্তাযোগ্য টিপ্পনী করেন নাই। হাক্‌স্‌লির কোন লেখাই একেবারে তুচ্ছ হইতে পারে না। কিন্তু হাক্‌স্‌লি বলেন, তিনি এই পুস্তকে দিতে চাহিয়াছেন সমসাময়িক মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ—দান্তে যাহা মধ্যযুগের বেলায় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার "দিভিনা কোমেদিয়া"য়, It would have been better, I repeat, to write both poetical text as well as commentaries oneself—a new Divine Comedy;

দান্তের কবিত্বশক্তি তাঁহার থাকিলে তিনি নিশ্চয় তাহা করিতেন ; তবে তিনি সবিনয়ে স্বীকার করিতেছেন যে সে-শক্তি তাঁহার নাই। এই হীনতায় তিনি লজ্জিত নহেন, যেহেতু বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে এ শক্তি পাঁচ ছয় জন নরনারী ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে জোটে নাই। অতএব হাক্‌স্‌লির আত্মতৃপ্তি বজায় রহিল। তিনি নির্ভাবনায় প্রাচীন কবিতার সহিত আধুনিক মন্তব্য গাঁথিতে লাগিলেন।

ভুলিয়া গিয়াছি কোন দার্শনিক একবার বলিয়াছিলেন, মুর্খে একঘণ্টায় যত প্রশ্ন করিতে পারে, জ্ঞানীব্যক্তি সারা জীবনেও তাহার উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না। হাক্‌স্‌লিকে মূর্খ বলার দুঃসাহস কাহারও থাকিতে পারে না ; তবু এ বইটি পড়িবার সময় বার বার সেই কথাটাই মনে আসে। জীবন, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, কিন্তু যে স্বতঃবিরোধহীন সুসঙ্গত মীমাংসা সুগভীর সাধনার ফল, তাহা কোথায় ? ভাষার চোখ-ঝলসানো ছটা তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কাব্যে স্পষ্টতা কাহাকে বলে, ও অস্পষ্টতার দোষ গুণ লইয়া চিরন্তন তর্ক চলিয়া আসিতেছে। হাক্‌স্‌লি অস্পষ্টতার বিরোধী—
I like things to be said with precision and as concisely as possible
অতি সুস্পষ্ট উক্তি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সেই সঙ্গেই জুড়িয়া দিয়াছেন—
This does not mean, of course, that I would like all poets to say their say in four line epigrams and the style of Voltaire. Certain things (কোনগুলি ?) can only be expressed at considerable length and in terms of the most improbable metaphors, an abracadabra of magic syllables. There are occasions when the poet who would write precisely must be (by the standard of text-book prose) obscure and fantastic.। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হাক্‌স্‌লির অতি-আধুনিক বিজ্ঞতা সত্ত্বেও, পুরাতন সমস্যা যেখানেই ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল। সমস্ত বইটি এইরূপ অন্যমনস্ক ও ব্যস্তসমস্তভাবে লেখা। নবযুগের দান্তের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে চাহিলে গভীরতর সমাহিত সাধনার প্রয়োজন।

সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার মতো সাহিত্যের বাজারে তেজী-মন্দী-র খেলা চলে, একথা সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন। হাক্‌সলির মতে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কাব্য-রচনায় মন্দা লাগিয়াছে। কথাটা সত্য। কাব্যরচনার পরিমাণ কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া লাগে না, বরং বোধ হয় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে ; ইহাও বলা চলে না যে যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অকবি। তবু একথা মানিয়া লইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মুখ্য কবি নহেন, গৌণ কবি। কাব্যে মুখ্য-গৌণের সীমা রেখা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে, অসম্ভব বলিলেই হয়। টেনিসন, ব্রাউনিং, রোজেটি, সুইন্‌বার্ণ, ইঁহারা মুখ্য কবি কি না, ইহা লইয়া অনন্তকাল তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু ইঁহাদেরও অনুরূপ প্রতিভান্বিত কবি আজকাল ইংলণ্ডে কেহ লিখিতেছেন কিনা সন্দেহ। বহুশতাব্দীব্যাপী কাব্যসাধনার ফলে ইংরাজীভাষার সম্পদ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে অনুপ্রেরণার অভাব অনায়াসেই শিল্পচাতুর্য্য দিয়া লুকানো যায়। তাই আজকালকার কবিদের রচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও অনেকাংশে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানে অবশ্য সেই সব কবির কথা বলা হইতেছে যাঁহারা উদ্ভট মৌলিকতার চর্চ্চা করেন না।

কিন্তু সৃজনী-প্রতিভার স্থান কখনই মার্জ্জন-পরিপাটিত্ব দিয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ইহাতে যে-তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার আড়ালে থাকে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। এই ভাবিয়া দুঃখ হয়, যাঁহারা এত সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদের বলিবার কথা কেন আরো গভীর, আরো বিশাল হইতে পায় না।

রচনাভঙ্গীতে আপাত-সারল্য ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কত যে বিচিত্র কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহা মিস্ নোরো নিস্‌বেট্-এর "থার্টি পোয়েম্‌স্"-এর যে কোনোটিতে চোখ বুলাইয়া গেলে বুঝিতে পারা যায়। অথচ ইনি নবীন কবি, এই ত্রিশটি কবিতার গুচ্ছ হাতে করিয়াই কাব্যলোকে ইঁহার প্রথম প্রবেশ-পদক্ষেপ। আশা করা যায়, কালক্রমে ইনি আরো অগ্রসর হইবেন। ইঁহার রচনায় সংযমের দৃঢ়তা ও রুচির সৌকুমার্য্য প্রশংসনীয়। স্বশীল ও স্বেতর—সাব্‌জেক্‌টিভ্ ও অব্‌জেক্‌টিভ্—গীতি-কবিতার এই দুই বিভাগেই তাঁহার কৃতিত্বের উদাহরণ স্বরূপ, দুটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল—

DARK STAR.

Lovely are these:—
The morning light on trees,
Blue satin seas
With white embroidered sails,
Moon-drunken Nightingales . . .
Thick honey, dropping slow.
Lovely are these . . .
But I was born
Under a strange, dark star,
I am a foamless wave forlorn
Drawn upwards for a space ;
Striving to reach
The moon's untroubled face,
And doomed to die
Defeated by the terror of the sky.

THE DEFAULTER.

Dawn through a narrow window steals apace
Spilling cold light upon the sleeper's face.
One hand is flung back and upward, with the fingers
Uncurled as though to seize
Something that fled with night. A shadow lingers,
Like a caress, upon heavy eyes
That mock our busy world with faint surprise.

ব্রিটিশ মিউজিয়মের হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ রবিন্ ফ্লাওয়ার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ, ধীরত্ব। সে গুণ ইঁহার আছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইনি কবিতা লিখিতেছেন, অথচ প্রকাশ করিবার জন্য তাড়াহুড়া করেন নাই। সস্তা ছাপাখানার যুগে এ প্রকাশকুণ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভ্রমের যোগ্য। "পোয়েমস্ এণ্ড ট্রান্‌স্‌লেশনস্"-এর স্বল্পাংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, অধিকাংশই নূতন। ইনি জাতিতে আইরিশ। অনুবাদখণ্ডে ইনি অষ্টম শতাব্দী হইতে

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন আইরিশ ভাষায় লিখিত গীতিকবিতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে একটি লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সাহিত্যসেবীগণের নিকট ইহা কম লাভের কথা নহে। অনুবাদপন্থা সম্বন্ধে ইনি বলেন—

Some apology is perhaps necessary for the substitution of simpler English lyrical measures for the intricate and subtly interwoven harmonies of alliteration and internal rhyme in the Irish. But the attempt to borrow these qualities of verse could only end in a mechanic exercise, which might be a metrical commentary, but could not be poetry. And to translate poetry by less than poetry is a sin beyond absolution.

অনুবাদ করার জন্য ডাঃ ফ্লাওয়ারকে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না বলিয়া বোধ হয়। মূল জানা না থাকায় মূলের প্রতি তাঁহার অনুবাদ কোন অবিচার করিয়াছে বলা যায় না, তবে সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই সুখপাঠ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিগতযুগের সুপণ্ডিত শিক্ষক উইলিয়ম্ করি-র কথা মনে পড়ে, যিনি অনেকগুলি গ্রীক কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আয়োনিকাস্'-এ করির যে সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ডাঃ ফ্লাওয়ার তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। করি-র অনুবাদ ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাব্যচয়নগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে। এ সৌভাগ্য ডাঃ ফ্লাওয়ার-এর পক্ষে ভাবা শক্ত।

মৌলিক কবিতাতে ফ্লাওয়ার শক্তির আভাস দিয়াছেন কিন্তু বড় কবি হইয়া উঠিতে পারেন নাই, সাধারণের অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কিন্তু অসাধারণত্ব তাঁহাকে এড়াইয়া গিয়াছে। বাঙালীর সহিত আইরিশ-এর প্রকাণ্ড মিল, প্রখর দেশাত্মবোধে। তাই ফ্লাওয়ার-এর স্বদেশ-প্রীতি-মূলক একটি কবিতা এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল।

THE PASSAGE.

The dark cliff towered up to the stars that flickered
And seemed no more than lights upon its brow,
And on the slippery quay
Men talked—a rush of Gaelic never-ending.
I stepped down to the boat,
A frail skin rocking on the unquiet water,
And at a touch she trembled
And skimmed out lightly on the moonlit seaway.
I lying in the stern
Felt all the tremble of water slipping under,
As wave on wave lifted and let us down.
The water from the oars dripped fiery ; burning
With a dull glow great globes
Followed the travelling blades. A voice rose singing
To the tune of the running water and loud oars:
"I met a maiden in the misty morning,
And she barefooted under rippling tresses,
I asked her was she Helen, was she Deirdre?

She answered: 'I am none of these, but Ireland.
Men have died for me, men have still to die,' "
The voice died then and, growing in the darkness,
The shape of the Great Island
Rose up out of the water hugely glooming,
And wearing lights like stars upon its brow.

আর একটি কবিতায় ফ্লাওয়ার বলিতেছেন তিনি একরাত্রে ঘুমাইয়া পড়েন The Trojan War's Economic Causes নামক বইটি পড়িতে পড়িতে—জানিতে ইচ্ছা করে কার্ল্ মার্ক্স্-এর কোন ভক্ত শিষ্য বইটি লিখিয়াছে, সন্দেহ জাগে হয়ত এ ব্যাপারটা কবিকপোলকল্পিত ! ঘুমের ঘোরে--কবিকে স্বপ্নে পাইল।

Then, as the hours of night grew deep
A dream came through the passes of sleep
Of the silly stories of Homer's telling:
The press of the ships, the gathering hum,
Iphegeneia dying dumb,
The Greek tents white on the Trojan shore,
Achilles' anger and Nestor's lore,
The dabbled hair of the heroes lying
Mid the peace of the dead and the groans of the dying,
Hector dragged through the battle's lust,
The locks of Priam down in the dust,
Andromache's agony, Ilion's fall
And, over all,
The lovely vision of naked Helen.

ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয় যে তিন হাজার বছর পূর্ব্বেকার এক অন্ধ (?) কবির "silly stories" আজও ইউরোপের কবিচিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এ প্রভাবের প্রতাপ প্রতিপন্ন হয় মেস্‌ফিল্ড্-এর 'এ টেল্ অব্ ট্রয়' পড়িলে। মেসফিল্ড আজ ইংলণ্ডের রাজকবি, কিন্তু তাঁহার কবিযশ বহুদিন হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এরূপ উচ্চপদস্থ কবিও ট্রয়ের আবাল্য পরিচিত কাহিনী লইয়া কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন নাই। হোমার, ভার্জ্জিল, গ্রীক নাট্যকারত্রয় প্রভৃতি মহাকবিগণের সমকক্ষতা করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ বিভিন্ন ছন্দে রচিত এগারোটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা এই ট্রয়-কাহিনী মেস্‌ফিল্ড্ এমনভাবে সাজাইয়াছেন যাহাতে আদ্যোপান্ত গল্পটি বলিয়াও পূর্ব্বগামী কবিগুরুদিগের পুনরাবৃত্তি অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না হয়। যে ঘটনাটিতে মেস্‌ফিল্ড্ সকলের চেয়ে বেশী সময় ও মনোযোগ দিয়াছেন তাহা বোধহয় পূর্ব্বতন কোন কবিরই দৃষ্টি যথেষ্টভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই--অর্থাৎ সেই সুবিখ্যাত কাষ্ঠঘোটকের অনুষ্ঠানটি। ইহার বর্ণনায় তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই—ট্রয়-কাহিনীতে ইহা অযথা প্রাধান্য পাইয়াছে। বেশ বোঝা যায়, আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অক্সফোর্ডের প্রান্তস্থ সুরম্য বোর্‌স্ হিলে শান্তশিষ্ট হইয়া বসবাস করিলে কি হইবে, তাঁহার যৌবন-প্রারম্ভের সামুদ্রিক জীবনের চঞ্চলতা ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা এখনও তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আর ভাষা, মেসফিল্ড-এর ভাষা এমনই গদ্যধর্ম্মী যে স্বয়ং ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনিলেও চমকিত হইয়া উঠিতেন। "এ টেল্ অব ট্রয়"-এর আরম্ভ এইরূপ :—

Menelaus, the Spartan King,
Was a fighting man in his early spring,
With a war-cry loud as a steer's bellow,
And long yellow hair, so the poets sing.

হোমারের সাগর-গম্ভীর ষট্‌পর্ব্বিকাকে স্মরণ করিলে এ ছন্দ কানে অত্যন্ত লঘু ঠেকে সন্দেহ নাই, মনে হয় ইহা সূর্য্যের পাশে জোনাকির মতো নিষ্প্রভ, তথাপি মেসফিল্ড অকারণে ইহাকে ব্যবহার করেন নাই। তিনি জানেন ব্যালাড্-জাতীয় ছন্দের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে গল্পের গতি অত্যন্ত দ্রুত করিয়া তোলা যায়, আর তিনি যে ভুল করেন নাই তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত যাইবার পূর্ব্বে বোঝা যায় —

But he wearied of war, and longed to bide
In quiet at home by his fireside ;
He wooed and wedded the beautiful Helen
And carried her home to be his bride.

And little delight was hers, poor thing,
To be tied till death to the Spartan King,
She moved in a cage of the Spartan court
Like a bright sea-bird with a broken wing.

Paris came from a Trojan glen,
The prince of the world's young famous men,
With a panther's eye and a peacock air,
Even the goddesses wooed him then.

He came from Troy to the Spartan port,
He moored his galley: he rode to court
In a scarlet mantle spanged with gold
On a delicate stallion stepping short.

Helen and he knew each from each
That a red ripe apple was there in reach,
The loveliest girl and the loveliest lad
Ready to learn and ready to teach.

He said, " O Helen, why linger here
With the King your husband year by year?
What life is this to a star like you,
The brightest star in the atmosphere?

O beautiful girl, I love but you,
And a life of love is your rightful due:
Come with me over the sea to Troy,
Where Queens shall ride in your retinue."

She said to him, " O Paris, my own,
Since I married him I have lived so lone
That life is bleak as a withered bone,
O take me hence into light and life,
My spirit within me turns to stone."

Then Paris said, "But we will not fly
Like thieves that have heard a step draw nigh.
You are the Queen and I am I;
I'll carry you off to my golden ship
At noonday under your husband's eye."
So it was planned, so it was done,
Paris and she were there at one,
The sentry bribed and the door undone,
With a waiting ship and a rising wind
Helen was off with Priam's son.

মেসফিল্ড এ কথা ভোলেন নাই যে সর্ব্বত্র এ ছন্দ সুপ্রযোজ্য নয়; তাই ভাবভেদে তিনি ছন্দবিভেদ অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। ষটপর্ব্বিকা ইংরাজী কাব্যে খুব সুপ্রচলিত নয়, অথচ ক্লাইটেমনেষ্ট্রার উক্তিতে মেসফিল্ড তাহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ দিয়াছেন;—

I am that Klytaimnestra whom Agamemnon wedded,
Queen of a beautiful land in a city rich in gold.
Would that my happy fortune might strike me suddenly dead.

কিন্তু মেসফিল্ড তাঁহার কবিত্ব শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইয়াছেন এই বইটির পরিশিষ্টে—

Though many died and many fled
To live as beasts do, without bread,
Or home, or bed,

Yet many, like myself, am slave,
Weeping the life the spirit gave
Into the grave.

However long our lives may be,
There is no hope of getting free
To such as we.

Swallows will come again, and flowers,
Not Troy, who guarded with her towers
That life of ours.

What help in giving way to tears?
To those most hurt by Fortune's spears
A spirit nears.

The spirit whom the prisoner knows,
And broken wretches faint from blows:
It comes most close.

And though I tread the unknown stair
Up, into Death, I shall not care,
It will be there.

ভুবনবিখ্যাত নগরীশ্রেষ্ঠ ট্রয়ের অগ্নি-ধ্বংসের পর বিজিত ক্রীতদাসীকৃত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা রাজকুমারী কাসাণ্ড্রার এই মর্ম্মস্পর্শী খেদোক্তি মানবের ও নিয়তির নিষ্ঠুর হত্যালীলার উপর একটি সকরুণ ভাবঘন প্রশান্তির যবনিকা টানিয়া দেয়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Letters of D. H. Lawrence (Heinemann).
Apocalypse—BY D. H. LAWRENCE (Secker).

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য সৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে স্বতঃস্ফূর্তিতে, যে প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলীর অনেকগুলিতেই। লরেন্স্ মারা যাবার পর দুটী বই বেরোয়। প্রবন্ধটীতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনোযোগ ছিল, তা নিছক্ সাহিত্যিক মূর্তি পেয়েছিল The Man Who Died-এ। Apocalypse তারই আরো স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য গদ্য ভূমিকা-লেখক অলডিংটনের মতো সবাইকেই অভিভূত করে। ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কি ছন্দ আনা যায় ও কি যুক্তিহীন কাব্যালোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করেছে, সেই প্রাণশক্তির আভাস এ দুটী বইয়েও ক্ষণে ক্ষণে পেলুম—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় ও প্রবন্ধটী টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটী বই পড়ে আমার মনে হল যে লরেন্স্ সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও রূপদক্ষতাই। লরেন্স্ ছিলেন ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, পাস্কালেরা, গান্ধীরা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের মতামতে যে লাভ হয় না, তা নয়। লরেন্স্ বা ব্লেকের মস্তিষ্কহীনতাবাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মতবাদে যেটুকু অনুকরণীয় সে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধী যেরকম একদেশদর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স্ নিজেকে ঠকান্ নি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেন নি শুধু তার মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি রোমান্টিক্ উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অলডাস্ হাক্স্লির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসরিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও হাক্স্লির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হাক্স্লি জানেন যে সে ভাব একেবারেই কাম্য নয়। তাই সাদা ও কালোর মতো হাক্স্লি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সব চেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলীর ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—He might propose impracticable schemes, he might say or write things that were demonstrably incorrect or even, on occasion (as when he talked about science), absurd. But to a very considerable extent it didn't matter. What mattered was always Lawrence himself, was the fire that burned within him, that glowed with so strange and marvellous a radiance in almost all he wrote। এবং ডায়েরির থেকে—" He is one of the few people I feel real respect and admiration for. Of most other eminent people I have

met I feel that at any rate I belong to the same species as they do. But this man has something different and superior in kind, not degree." . . . A being, somehow, of another order; more highly conscious, more capable of feeling than even the most gifted of common men। এবং যদিচ লরেন্স্ ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported to one of the frontiers of human consciousness। এই আশ্চর্য্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই, কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে ও অনেকাংশে জীবনকে অদ্ভুত করেছে। কারণ লরেন্সের প্রকাশক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হাক্স্লির একথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিষ্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়াও যে গৌণ, তাও আমি জানি। আবেগজীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিলো। লরেন্সের মন ছিল হুইট্ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন পৃথিবীতে নূতন ক'রে চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness, বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈততা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলীআলোয় এই অমাবস্যার রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্ব্বোধ্য লাগ্তে পারে। বিশেষ করেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতাসংস্কারের ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেটকে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স্ লেখেন—
" . . . but somehow, that which is physic—non-human in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent. The certain moral scheme is what I object to.' In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead. When Marinetti writes: 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet. The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women'—then I know what he means. He is stupid, as an artist, for

contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman. Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat: it is the inhuman will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of the word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word: but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will), instead of what she feels according to the human conception. . . . You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element. (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say, 'Diamond, what! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon.)" চৈতন্যের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্যের কঠিন অন্যতা—otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেজার্ ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায় অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাক্‌তে পারে। ভুল বোঝার সে সম্ভাবনা লরেন্স্ও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হাক্‌স্‌লির ভাষায় daimon তাঁকে তবু মুক্তি দেয়নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চান্ নি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্নেট্‌কে লিখেছিলেন Sons and Lovers প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স্ বহু বাধা থাকলেও কখনো অপমান করেন নি, করতে পারেন নি। আর্টিষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্স্‌কে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব খুবই বন্ধুতাপ্রবণ, খুবই হৃদ্য। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সঙ্গলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্ কার্সোয়েলকে তিনি যা লেখেন, তা তার নিজের সম্বন্ধেও খাটে— "I think you are the only woman I have met who is so intrinsically detached, so essentially separate and isolated, as to be a real writer or artist or recorder. Your relations with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you,

I think.· You were never made to meet and mingle, but to remain intact, essentially, whatever your experiences may be."

কিন্তু হাক্স্‌লি যে ভাবে মারির ঈষদ নাটকায় Son of Woman-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সে ভাবে বোধ হয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ীর ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স্ যে হাক্স্‌লি হলেও হাক্স্‌লির মতো না লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, একথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এসব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্‌ল্‌-ব্যাখ্যাও আমরা না মান্‌তে পারি। খৃষ্টধর্ম্ম যে মানুষের স্বার্থপরতা ও কর্ত্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে ছেড়ে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে, তার প্রতিবিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি ?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এসব তত্ত্ব শিরোধার্য্য না হয় নাই করলুম। বর্ত্তমান য়ুরোপ ছেড়ে অজ্ঞাত ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্যতা কি ? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হাক্স্‌লিদের, গার্নেটদের বা মোরেল এস্‌কিথ্‌কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, কেম্‌ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিতপূজারী রাসেল্‌কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গান্ধীর মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিলো— What man most passionately wants is his living wholeness and his living unison, not his own isolate salvation of his "soul." Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is in the flesh and potent. For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. Whatever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel of being alive in the flesh. The dead may look after the afterwards. But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time. We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos. I am part of the sun as my eye is part of me. That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea. My soul knows that I am part of the human race, my soul is an organic part of the great human soul, as my spirit is part of my nation. In my own very self, I am part of my family. There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sun on the surface of waters. (পৃঃ ২২২—৩, Apocalypse).

শ্রীবিষ্ণু দে

The Secret of the Golden Flower (a Chinese Book of Life)—translated and explained BY RICHARD WILHELM with a European Commentary BY C. G. JUNG (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.).

চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের ন্যায় প্রাচীন চীনেও যোগসাধনা প্রচলিত ছিল—There exists an esoteric movement, which has devoted itself with energy to the psychological method, that is, meditation, Yoga practice (Wilhelm).—গুরু-পরম্পরাক্রমে চিনা সাধকেরা ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেন ; এবং তাঁহাদের সাধনার সৌকর্য্যের জন্য যোগ-মার্গের পথপ্রদর্শকরূপ 'যোগদীপিকা'-সমূহ সঙ্কলিত হইত। 'আই-চিন্' (I Chin) —এই 'Secret of the Golden Flower' যাহার অনুবাদ—ঐরূপ একখানি দীপিকাগ্রন্থ। উহার পূরা নাম 'T'ai I Chin Hua Tsung Chih'। আই-চিন্ অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ— ইয়ুং (Dr. Jung) ইহাকে a pearl of great insight বলিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি নহে।

এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে 'তাও'-সাধক (Taoist adept) লু ইয়েন (Lu Yen) কর্ত্তৃক গ্রথিত হয়। লু ইয়েন বলেন ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে—চৈনিক অষ্ট চিরজীবীর অন্যতম সিদ্ধপুরুষ কুয়ান্ ইন্‌সি (Kuan Yin-hsi) (যাঁহার আদেশে লাওট্‌জ—Lao Tze—প্রখ্যাত Tao Te Ching সংকলন করেন)—তিনিই এই আই-চিন্ গ্রন্থের আদিম উৎস। সে যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্তা নিজ গ্রন্থে প্রাচীনতর Yu Ching, Su Wen, Yin-Fu-Ching, লঙ্কাবতার সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বুদ্ধদেব, কন্‌ফুচি ও লাওট্‌জের স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বেই চৈনিক চিত্তক্ষেত্র মহাযান-বুদ্ধধর্ম্ম, লাওট্‌জের তাও-ধর্ম্ম ও কন্‌ফুচির আশ্রমধর্ম্মের ত্রিবিধ ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এ গ্রন্থ ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমের সাক্ষাৎ ফল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এ অমূল্য গ্রন্থ পাশ্চাত্য পাঠকের অগম্য ছিল। পরে Legge ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে অনুবাদ নহে—'হনুবাদ'। সে অনুবাদে মূলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। ঐ বিকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যেরা এ গ্রন্থকে কতকগুলা ভোজবাজি ও আবর্জ্জনার নিবিড় জঙ্গল মনে করিতেন। অত্রাবস্থায় রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম ১৯২৯ সালের শেষার্দ্ধে সংক্ষিপ্ত টীকাসহ ঐ আই-চিনের জার্ম্মান অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কেবল বিশেষজ্ঞের নহে, সর্ব্ব-সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। ঐ টীকাসহ বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী (Psycho-analyst) ডক্টর ইয়ুংয়ের European Commentary (পাশ্চাত্য বার্ত্তিক) সংযুক্ত ছিল। ১৯৩০, ১লা মার্চ্চ উইল্‌হেল্‌ম মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার ঠিক এক বৎসর পরে জার্ম্মান ভাষাভিজ্ঞ কেরি বেনস্ (Cary Baynes) জার্ম্মান হইতে ঐ মূলগ্রন্থ, টীকা ও বার্ত্তিকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। তৎসহ উইল-হেল্‌মের শোকসভায় তাঁহার বন্ধু উক্ত ডক্টর ইয়ুং যে অভিভাষণ পাঠ করেন (In Memory of Richard Wilhelm), তাহারও অনুবাদ সংযুক্ত হয়। এ ইংরাজি গ্রন্থ সুধী-সমাজে বেশ সমাদৃত হইয়াছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠকের তৎসহ পরিচয় হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ রিচার্ড উইল্‌হেল্‌মের কথা বলি। তিনি মিশনরি-রূপে চিনদেশে বসতি করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অচির মধ্যে চৈনিক প্রজ্ঞা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। তাহার ফলে তিনি চিনের ধর্ম্মগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কেবল চিনা-বিদ্যায় বিশারদ (Sinologue) হন, তা নয়—কিন্তু চৈনিক কৃষ্টির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করেন। (Penetrated deeply into the secret and mysterious life of Chinese Wisdom—Dr. Jung).

তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধু ইয়ুং তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—In that vast territory of knowledge and experience, Wilhelm worked as master of his profession. . . . . . No sooner had he encountered the secret of the Chinese soul than he perceived the treasure hidden there for us.

অধিকন্তু উইল্‌হেল্‌ম was an initiate in the psychology of Chinese Yoga, to whom the practical application of the I. Ching was an ever renewed experience (Dr. Jung). ইহাকেই বলে—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—এরূপ যোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন আই-চিনের মত গ্রন্থের অনুবাদক হইবার যোগ্যতা কাহার?

কিপলিং বলিতেন—

For East is East and West is West
And ne'er the twain shall meet.

—প্রাচ্য-সে প্রাচ্যই রবে প্রতীচ্য পশ্চিম
কভু না মিলিবে দুহুঁ কালেও অন্তিম।

উইল্‌হেল্‌ম ইহার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন— East and West are no longer to remain apart। বস্তুতঃ আদর্শের উচ্চ ভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই বিধাতার অভিপ্রেত—সেই জন্যই তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটাইয়াছেন। ডক্টর ইয়ুং এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The European invasion of the East was a deed of violence on a great scale and it has left us the duty—nobblesse oblige—of understanding the mind of the East। তিনি বলেন ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল—রোম প্রাচী বিজয় করিয়াছিল বটে—ফলে? What happened when Rome overthrew the near East politically. The spirit of the East entered Rome and out of the most unlikely corners of Asia Minor, came a new spiritual Rome। এবারও ইতিহাসের সেই আবর্ত্তনই হইবে—আবার প্রাচ্য প্রতীচ্যকে আপনার অধ্যাত্মশক্তিতে অভিভূত-পরাজিত করিবে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন—

The spirit of the East penetrates through all our pores and reaches the most vulnerable places of Europe.—Dr. Jung.

If we but briefly investigate the fields covered to-day by, what is called, ' occult thought,' (we find) millions of people are included in these movements and Eastern ideas dominate all of them.—Cary Baynes.

যাঁহারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া প্রাচ্যের প্রজ্ঞাধারা প্রতীচ্যে অবতারণ করাইয়াছেন, রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্‌ তাঁহাদের একজন মুখ্যতম। তাঁহার যোগ্যতার প্রধান নিদর্শন এই যে, প্রতীচ্যসুলভ সঙ্কীর্ণতা ও হঠকারিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। He was able to let the European in himself to slip into the background. . . . Towards the foreign culture of the East, Wilhelm displayed an extraordinarily large amount of *modesty*—something unusual in an European। বাস্তবিক শিষ্যভাবে উপসন্ন না হইলে—শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ না বলিলে, প্রাচ্য ভারতী প্রতীচ্যের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত হন না। অথচ সাধারণ প্রতীচ্য মানবের attitude কি? All mediocre minds in contact with a foreign culture, either lose themselves in blind self-deracination or in an equally uncomprehending, as well as presumptuous, passion for criticism (Dr. Jung)। রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্‌ এরূপ mediocre mind ছিলেন না—সেই জন্যই তিনি চৈনিক প্রজ্ঞায় নিষ্ণাত হইতে পারিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এত 'পণ্ডা'-বাদ বলা সত্ত্বেও বার্তিককার ডক্টর ইয়ুং পাশ্চাত্য অহমিকার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বার্তিকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—The aim of my commentary is the effort to build a bridge of psychological understanding between East and West. —'আমার বার্তিক রচনার উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বুঝা-পড়ার একটা সেতুবন্ধন করা'। তাহাই যদি হয় তবে তিনি সমস্বরে বলিলেন কেন?—We should do well to confess at once that fundamentally speaking, we do not understand the utter unworldliness of a text like this (I. Chin)—indeed we *do not* want to understand it.

ইহাকেই বলে—'গোড়ায় গলদ'—ভাষ্য রচনা করিব অথচ মূল বুঝিতে চাহিব না! বাস্তবিক ইয়ুংয়ের European Commentary ভাষ্যও নয়, বার্তিকও নয়—উহা তাঁহার অভিমত 'Unconscious'-এর উপর একটা প্রকাণ্ড প্রবন্ধ। ঐ প্রবন্ধে আত্মমত সমর্থন জন্য ইয়ুং কোথাও কোথাও চিনা গ্রন্থ হইতে মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে কদর্থ বা কষ্ট কল্পনার সাহায্যে ঐ Unconscious-এর থিওরির সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। Unconscious বা অব্যক্ত সংবিৎ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির সহিত সুপরিচিত ভারতীয় দার্শনিকের নিকট একেবারেই অভিনব নয়; ইহাকেই ম্যায়ার, লজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা subliminal Consciousness বলিয়াছেন। ঐ 'Unconscious' ডক্টর ইয়ুংয়ের ব্যসন (hobby)—যেমন Repression of sexuality (কাম-প্রচ্ছদ) তাঁহার গুরুকল্প ফ্রয়ডের (Freud) ব্যসন। শিশুকন্যা যখন মাতার স্তন্যপান করে, সেটা তার প্রচ্ছন্ন কামক্রিয়ার অব্যক্ত অভিব্যক্তি! ফ্রয়ড ও ইয়ুং ঐ অব্যক্ত সংবিদ্‌ (Uncons-

cious বা Psyche) সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—সেজন্য আমরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ বটে। ইয়ং বলিয়াছেন—There can evolve spontaneously out of the Unconscious, contents which the conscious cannot assimilate। ঠিক কথা—কিন্তু পাগলের পাগলামি ও যোগীর যোগবিভূতি কি এক উৎস হইতে উদ্ভূত? ঐ subliminal consciousness ছাড়া জীবের যে একটা supraliminal consciousness আছে—যে সংবিৎ কলাবিদের কলাসিদ্ধিতে এবং ধ্যানীর সমাধিতে অভিব্যক্ত হয়—একথা বোধ হয় ইয়ুং এখনও আবিষ্কার করেন নাই। ইংরেজ অনুবাদক কেরি বেনস্ যথার্থই বলিয়াছেন—Much has been taught him in recent years about the hitherto unsuspected elements in his psyche, but the emphasis is all too often on the static side alone, so that he finds himself possessed of little more than an inventory of contents। আমরা জানি, প্রত্যেক জীবের অভ্যন্তরে অব্যক্ত শক্তিপুঞ্জ নিহিত আছে—ঐ শক্তিসমূহের অভিব্যক্তিই প্রকৃত যোগ (Development of the powers latent in man)। বেনস্ একথা লক্ষ্য করিয়াছেন—He contains within his psyche a store of unexplored forces, which, if rightly understood, would give him a new vision of himself and help safeguard the future for him। এজন্য যোগপ্রণালীর গভীর অনুশীলন এবং আই-চিনের মত যোগদীপিকার প্রগাঢ় অনুধাবন আবশ্যক। ইয়ুংয়ের বার্ত্তিকে কিন্তু ঐরূপ অনুশীলন ও অনুধাবনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইয়ুং বলেন—The Western man is innocent of his own apparatus। ভারতীয় ও চৈনিক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে এ অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইতে পারে। ইয়ুং আরও বলেন—We veil from ourselves our real human nature with all its dangerous, subterranean elements and its darkness।—সেই subliminal consciousness-এর কথা। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন 'আসুরী সম্পৎ' ছাড়া জীবের কি দেবী সম্পৎ নাই—lifegiving empyrean elements নাই—যাহাকে আমরা supraliminal consciousness বলিলাম? যাহার জ্যোতিঃ ঐ অন্ধতমস ভেদ করিয়া ধ্যানধারণা-সমাধিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

ইয়ুং সারা জীবন 'Practice of Psychiatry and Psychotherapy' করিয়াছেন (ইহা তাঁহার নিজ মুখের কথা)।—যাঁহার কেবল Pathology-র সহিত পরিচয়, যিনি Anatomy চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই—তিনি যে দেহবিজ্ঞান আংশিক ভাবেই জানিবেন ইহা বিচিত্র নহে। অতএব ইয়ুংয়ের ঐকদেশিক দৃষ্টির কাছে যদি যোগের প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিভাত না হইয়া থাকে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইব কেন?

ইয়ুং লিখিয়াছেন—The art of letting things happen, action in non-action, letting go of one-self became a key to me, with which I was able to open the door to the 'way.' The key is this: We must be able to let things happen in the psyche. . . . Consciousness is for

ever interfering, helping, correcting and negating, and never leaving the simple growth of the psychic processes in peace। অতএব কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? Allow the psychic processes to go forward without interference—to put aside the activity of the concious-ness। এই যে wise passivity—উদাসীন নির্যোগ—ইয়ুংয়ের মতে ইহাই প্রকৃত যোগ এবং ইহাই আই-চিন্ গ্রন্থকারের অনুমোদিত! এই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া তিনি নাকি অনেক মনোরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন—This detachment is an effect which I know very well from my professional practice; it is the therapeutic effect par excellence, for which I labour with my students and patients। কিন্তু মনোরোগী—বিশেষতঃ মনোরোগিণীর পক্ষে যাহা সুব্যবস্থা, ধ্যানী-যোগীর পক্ষেও কি তাহাই?—চৈনিক ও ভারতীয় যোগশাস্ত্রে দেখা যায় যে, চিত্তকে পরিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে * এবং পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—পৌরুষেণ প্রযত্নেন লম্ভনীয়া শুভে পথি। বস্তুতঃ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ জন্য যে শুভ ও সার্থক উদ্‌যোগ, তাহাই 'যোগ'। এজন্য যমনিয়ম চাই, অভ্যাস বৈরাগ্য চাই। আই-চিন্ গ্রন্থে Laziness and Distraction ক্ষালন জন্য এ সম্পর্কে বহুবিধ উপদেশ আছে।† আরও চাই আসন (Sit like a withered tree before a cliff—sit quietly with upright body and fix the heart in the centre.—I Chin); চাই প্রাণায়াম (In order to steady the heart one begins by cultivating the breathing power. . . . But the deeper secrets cannot be effected without making the breathing rhythmical.—I Chin);—চাই প্রত্যাহার—আবৃত্তচক্ষুঃ হওয়া—(If one closes the eye and reversing the glance directs it inward. . . Only when one looks and harkens inward, does the organ nor go outward nor sink inward.—I Chin); চাই ধারণা—one-pointedness—(When you fix your heart on one point, then nothing is impossible for you.—I Chin); চাই ধ্যান (Meditation)—প্রত্যয়ের একতান প্রবাহ (If for a day you do not practise meditation, this light streams out who knows whither?—I Chin) এবং সর্ব্বশেষ চাই সমাধি—(The Light is contemplation. Fixation without contemplation is circulation without Light. Fixating contemplation is indispensable, it ensures the strengthening of illumination).

এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে ইয়ুং বড় চিত্তক্ষেপ করেন নাই—তাঁর preoccupation—মনোনিবেশ—ঐ Unconscious লইয়া। ঐ অধমতারণ Unconscious-এর সাহায্যে তিনি সমস্ত জগৎসমস্যার সমাধান করিতে চান। তাঁহার মতে যোগ একটা

*It is the washing of the heart and the purification of the thoughts; it is the bath.—I CHIN.

†The veil of *Maya* cannot be lifted by a mere decision of reason, but demands the most thorough-going and wearisome preparation, consisting in the right payment of all debts to life.

abnormal psychic condition. Our way begins in European reality and not in Yoga practices, which would only serve to lead us astray as to our own reality.*

আই-চিনের গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যোগবিদ্যা রহস্য রাখিতে হইবে—'গোপ্যা কুলবধূরিব'—'Disciples! Keep it secret and hold to it strictly!' 'Make the Light circulate: that is the deepest and most wonderful secret.'সেইজন্য তিনি অনেকস্থলে 'সন্ধ্যা'-ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা বহির্দৃষ্টিতে হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। 'Red blood becomes milk. The fragile body of the flesh is sheer gold and diamonds.' 'In the purple hall of the city of jade, dwells the god of utmost emptiness and life.' 'Create an immortal body by melting and mixing.' 'The Heavenly Heart lies between sun and moon.' 'Look at the end of your nose'—(সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং—গীতা)—'Fix on the point which lies exactly between the two eyes' (ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্‌—গীতা)। ইয়ুং এ সকলের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিবেন কি করিয়া ?

প্রাচ্য প্রজ্ঞার মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার পক্ষে ডক্টর ইয়ুংয়ের প্রবল বাধা তাঁহার superiority-complex (তাঁহার গরিমা-গ্রন্থি)। উইল্‌হেল্‌মে আমরা যে বিনীত শিষ্যভাব প্রত্যক্ষ করি, ইয়ুংয়ে তাহার অত্যন্ত অভাব। তাঁহার ঔদ্ধত্য প্রাচ্য পাঠককে পীড়া দেয়। দুই একটা নমুনা দেখুন—'Measured by the Western intellect, Eastern intellect can be described as childish.' (অথচ অধ্যাপক Cowell-এর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই intellect-এর পুষ্পফল দেখিয়া বলিয়াছেন—It makes the 'European head dizzy!')—'The East came to its knowledge of inner things with a childish ignorance of the world.' 'There could be no greater mistake than for a Westerner to take up the direct practice of Chinese Yoga'। (অথচ তাঁহার বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ঐ যোগসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন)। কোন কোন প্রাচ্যের অন্তরে যেমন লঘিমাগ্রন্থি (Inferiority-complex) খুব প্রকট—তাঁহারা প্রাচ্য দেশের কোন কিছু ভাল ভাবিতে পারেন না,—তেমনি ইয়ুংয়ের মত পাশ্চাত্যের অভ্যন্তরে ঐ গরিমা-গ্রন্থি। উহা এত জটিলভাবে জড়িত, যে তাঁহারা চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রভাব এড়াইতে পারেন না। তাই ইয়ুং স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছেন—We will investigate the psyche and its depths by a tremendously extensive historical and scientific knowledge. . . . . We are already building up a psychology to which the East found entrance only through abnormal psychic conditions.

* এ কথার অর্থ কি ? Western way জুদা হইল কিরূপে ? ইয়ুং ত নিজেই বলিয়াছেন—The psyche possesses a common substratum × × As a common human heritage, it transcends all differences of culture and consciousness and does not consist merely of contents capable of becoming consciousness, but of latent dispositions toward identical reactions (p. 83).

সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বুদ্ধির বড়াই! অথচ বার্গসঁ, অয়কেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যেরাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বুদ্ধি (Intellect) চরম সত্য নির্দ্ধারণে অপারগ। ইহার সম্বল—তর্ক, যুক্তি, ব্যাপ্তিজ্ঞান—তত্ত্বের তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। সে জন্য বুদ্ধির পর বোধি চাই—Intellect-এর উপর Intuition চাই। ঐ বোধি যোগসাধনাসাপেক্ষ—উহা বিজ্ঞান-বামনের অধিগম্য নহে।

ইয়ুং নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—Intellect does in fact violate the soul, when it tries to possess itself of the heritage of the spirit. It is in no way fitted to do this (p. 81).

বিজ্ঞানের প্রয়োগ নাই, তা নহে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যেমন বুদ্ধির উপর বোধি—তেমনি বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ। Scientific method must serve: it errs when it usurps a throne. . . It is not the only way of comprehending—(Dr. Jung).

অর্থাৎ বিজ্ঞানের স্বধর্ম্ম প্রজ্ঞানের অনুচর হওয়া—যে দাস, সে যেন প্রভুর আসন অধিকার না করে। এ প্রসঙ্গে কেরি বেনস্ বেশ কথা বলিয়াছেন—We have to see that the spirit must lean on science as its guide in the world of reality and that science must turn to the spirit for the meaning of life.

যোগশাস্ত্রের প্রচারকেরা ঠিক ইহাই করিয়াছেন—যোগ অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিক কোন কিছু নহে—It is rigidly scientific—ইহার ভিত্তি মনোবিজ্ঞানের সুদৃঢ় তথ্যের উপর প্রোথিত—তবে উহা psychic মাত্র নহে—যোগ metapsychic—অতি-বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রজ্ঞান। ইয়ুংয়ের কথায় বলি—It does not consist of sentimental, exaggeratedly mystical, institutions, bordering on the pathological and emanating from ascetic recluses and cranks; the wisdom of the East is based on practical knowledge coming from the flower of Chinese intelligence, which we have not the slightest justification for undervaluing (p. 78).

এই যোগের লক্ষ্য কি? আই-চিন্ বলেন, ইহার লক্ষ্য 'তাও'-সিদ্ধি। তাও (Tao) কি? It is the undivided One—It is that which has nothing above it (যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ) —It is the fixed pole in the whirl of phenomena (অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ), It is that which exists through itself—the final world principle, the primordial spirit (পরিভূঃ স্বয়ংভূঃ)—the creative Light, the Light of Heaven, the Light of the Essence (জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ)—এক কথায় বেদান্তের ব্রহ্ম। It is that land that is no-where, which is our true home—তদ্ধাম পরমং মম—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ব্রহ্মের মত তাও-ও দেশকালের অতীত—' Overcomes time and space.' ' It is incorporeal space where a thousand and ten thousand places are one place. . . . . It is immeasurable time when all the æons are

like a moment—কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী—নিমেষঃ কশ্চ কল্পঃ স্যাৎ। The 'Tao,' though motionless (অনেজদ্ একং), is the means of all movement and gives it law—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ। স্যৎ ও ত্যৎ, রয়ি ও প্রাণ, জীব ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ যেমন ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার (modes of manifestation)—Yang-Yin, Hsing-Ming, Kun-Chien, Hun-Po অর্থাৎ Logos-Eros, Animus-Anima, Essence-Life, পুং-স্ত্রী—ঐ তাওর bipolar phenomena এবং তাও spirit ও matter-এর দ্বন্দ্বমুক্ত একাকার অদ্বৈত তত্ত্ব—যিনি ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। যিনি যোগসিদ্ধ—'he penetrates the magic circle of polar duality and returns to the undivided Tao.' অতএব তাও-সিদ্ধি ও ব্রহ্মসাযুজ্য একই কথা—ইহাই প্রকৃত 'শূন্যতা'-সাধন। 'The Confucians call it the centre of emptiness, ... and in our Taoism the expression is 'to produce emptiness'। ইহাই বুদ্ধদেবের—সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো—(ধম্মপদ)

আই-চিন্ গ্রন্থের পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থকার অনেক স্থলে 'The backward-flowing movement of the life forces -এর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"The meaning of the Golden Flower depends wholly on the backward-flowing method. If it is not allowed to flow outward but is led back by the force of thought, so that it penetrates the crucible of the creative and refreshes heart and body and nourishes them, that also is the backward-flowing method. Therefore it is said: The meaning of the Elixir of Life depends entirely on the backward-flowing method. . . . This is the sublimation of the seed into power. If we reflect on this, we see that the ancients really attained long life by the help of the seed-power present in their own bodies, and did not lengthen their years by swallowing this or that sort of elixir. But worldly people lose the root and cling to the tree top. . . . The fool wastes the most precious jewel of his body in uncontrolled pleasure, and does not know how to conserve the power of his seed. . . . The seed that is conserved is transformed into power, and the power, when there is enough of it, makes the creatively strong body."

ইহাকেই এদেশে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া বলে। আমরা মানব অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ কিন্তু পাদপেরা ঊর্দ্ধস্রোতঃ। মানবকে যোগের দ্বারা ঊর্দ্ধস্রোতঃ হইতে হইবে। তখন তাহার রেতঃ ওজে পরিণত হইবে। ইহাকেই পতঞ্জলি কায়সম্পৎ বলিয়াছেন। কায়সম্পৎ কি ?

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ—৩।৪৬

রেতঃ ওজে পরিণত হইলে কেবল যে, দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হইবে তাহা নহে, শরীর হইতে একটা ছটা বিচ্ছুরিত হইবে। উইল্‌হেল্‌ম্ তাঁহার টীকায় এই লাইটের কথা বলিয়াছেন কিন্তু এই সম্পর্কে চিনা গ্রন্থের সহিত ভারতীয় গ্রন্থের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য

করেন নাই। চৈনিক বিদ্যাতে তিনি বিশারদ ছিলেন কিন্তু যতদূর বুঝা যায় হিন্দু প্রজ্ঞার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না।

আর একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া এই আই-চিনের পরিচয় শেষ করিব। সেটি spirit-fire-এর উজ্জ্বলন এবং ঐ রসায়ন দ্বারা শরীরের নবীকরণ (Rejuvenation)। এই চৈনিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেকবার উল্লেখ আছে। "This influence is intended to strengthen, rejuvenate and normalise the life processes. . . . If this method of ennobling is not applied, how will the way of being born and dying be escaped? . . . Only after the completed work of a hundred days will the Light be real, then will it become spirit-fire. The circulation of the light is the epoch of fire. . . . The heart is the fire; the fire is the Elixir."

ইহাকেই আমরা এদেশে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলি। মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া এই ত্রিবলীরূপিনী Serpent-fire মেরুদণ্ডের সুষি (Canal) পার হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে সদাশিবের সহিত সঙ্গতা হন। ইহাই কঠোপনিষদের নাচিকেত-অগ্নি। যিনি ত্রিনাচিকেতঃ হন তিনি, 'তরতি জন্মমৃত্যু'—তাঁহার যোগাগ্নিময় শরীর হয় এবং তিনি জরা, রোগ ও মৃত্যুর অতীত হন।

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

আধিভৌতিক দিক্ হইতে যোগসিদ্ধ পুরুষের এই অবস্থা হয়। আর আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে? আই-চিনের ভাষায় বলি, "Then the Golden Flower begins to bud. Eternal is the Golden Flower which grows out of inner liberation from all bondage to things.—That Golden Flower blooms in the purple hall of the city of jade. The Heavenly Heart rises to the summit of the creative, where it expands in complete freedom. Then one has the ability always to react to things by reflexes only. Then body and heart are completely controlled and one is quite free and at peace, letting go all entanglements, untroubled by the slightest excitement, with the Heavenly Heart exactly in the middle.

ইহাকেই আই-চিন্ "action in inaction" বলিয়াছেন—গীতার শারীরং কেবলং কর্ম্ম। য়ুং ইহাকে "reunion with the laws of life represented in the unconscious" বলিয়াছেন। সে অবস্থায় "Instead of being in it, one is above it।" * ইহাই প্রকৃত নির্দ্বন্দ্ব হওয়া—The union of the opposites on a higher level of consciousness। এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত

*What, on a lower level, had led to the wildest conflicts and to emotions full of panic, viewed from the higher level of the personality, now seemed like a storm in the valley seen from a higher mountain top. —DR. JUNG, p. 88.

পুরুষ "outgrows, that is, raises the level of consciousness to a higher plane।" ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন—প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ। তখন তিনি সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র হন, কর্ত্তা বা ভোক্তা থাকেন না। ইহাই জীবন্মুক্তের দশা। যিনি জীবন্মুক্ত—তাঁহার আই-চিন্ বা কনক কমল পূর্ণ বিকশিত।

এই Golden Flower বা কনক কমল কি? It is the immortal spirit body—the Heavenly Heart, terrace of life, the light of Heaven—উপনিষদের হৃৎপদ্ম বা দহরাকাশ। তদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। এই যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ ইহাই ব্রহ্মের পরম আলয়—যদন্তরা তদুপাসিতব্যম্ (ছান্দোগ্য)। কারণ, হৃদি-অয়ম্—সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ঐ কনক কমলে নিত্য বিরাজিত আছেন।

হৃৎপদ্মকোশে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্।

'The Golden flower is the Light and the Light of Heaven is *Tao*'.

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা :—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কয়েকটী নতুন কবিতা
একটী কথা :—বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটী নতুন কবিতা

দুটীই গ্রন্থকারমণ্ডলীর তরফ থেকে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা প্রকাশিত ও এম্, সি, সরকারের দোকানে প্রাপ্তব্য। প্রত্যেকটীর দাম চার আনা।

প্রকাশকদের অনুগ্রহ থেকে কবিতাকে (যা বাংলা দেশে চলে না) বাঁচাবার জন্যে এই দুই বিখ্যাত কবি ও তাঁদের আরো কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু মিলে গ্রন্থকারমণ্ডলী করেছেন। উদ্দেশ্য—প্রকাশকের ব্যবসাদারী চাল ছেড়ে শুধু সাহিত্যিক কারণে ও অতি সস্তায় বই বার করা। বুদ্ধদেব বাবুর "বন্দীর বন্দনা" ও অচিন্ত্যবাবুর "অমাবস্যা" পাঠে তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, সে ধারণা অসম্পূর্ণ। মাসিক পত্রিকায়ও তাঁদের অজস্র কবিতা আছে। "একটী কথা", "বন্দীর বন্দনা"-র কবিতা থেকে স্বতন্ত্র এবং "আমরা" ও অমাবস্যা"য় কোনো মিল নেই। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থধারায় আরো বই বেরোবে। আশা করি আপাততঃ কাব্যামোদীরা গ্রন্থকার-মণ্ডলীর এই সুলভ বই দুটী কিনে, পড়বেন। বই দুটীর পুনর্মুদ্রণ হবে না। এবং কবি দুজন তো পরিচিত।

শ্রীবিষ্ণু দে

Hitler—BY EMIL LENGYEL (George Routledge & Sons).

হেলীর ধূমকেতু যখন আকাশে প্রথম দেখা গিয়েছিল, তখন তার উজ্জ্বল পুচ্ছের বহর দেখে পৃথিবীর অনেকেই ভেবেছিলেন যে আরও কাছে এলে সেই লেজের ঝাপটে পৃথিবী একদিন চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধিক্ষণ পার হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে সে পুচ্ছ বাষ্পগুচ্ছ বই আর কিছুই নয় এবং সেটি পৃথিবীর ধাক্কায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে অতিসৌরলোকে অনির্দ্দেশ যাত্রা সুরু করেছে।

জার্ম্মানীর রাজনৈতিক আকাশের এই বর্ত্তমান জ্যোতিষ্কটিকে Dr. Lengyel ভাষায় না হোক অন্ততঃ ভাবে ধূমকেতুর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে Hitler-এর প্রবর্ত্তিত নাজীমতবাদের মূলে গঠনমূলক বা প্রগতিশীল পরিবর্ত্তনের লেশমাত্র নেই। নাজীমতবাদ অন্তঃসারশূন্য—তার মূলে আছে, জাতিগত দ্বেষ এবং দাম্ভিকতা। ঋণপীড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব ও বন্দী জার্ম্মানীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বাস্তবতার কঠিনস্পর্শে নাজীমতবাদের ধূমপুচ্ছ বেশী দিন অবিভক্ত থাক্‌বে না এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই ধরণের ছেলেভুলানো মতবাদের যা পরিণতি হয়ে থাকে তা লাভ করবে।

টিউটন্ আজ আত্মহারা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে চৈতন্য ও চিন্তাধারা তার জীবনকে প্রণোদিত করেছিল আজ আর তা কার্য্যকরী নয়। সেগুলির মূলে ছিল তখনকার জার্ম্মানীর বিরাট শক্তি এবং উদ্দীপ্ত ও জীবন্ত সাম্রাজ্যবাদ। সে শক্তির মূলোচ্ছেদ করেছে টিউটনের জাতিশত্রু এবং জ্ঞাতিশত্রুর দল; আর সে উদ্দীপ্ত সাম্রাজ্যবাদের মূলে বিষপ্রয়োগ করেছে জার্ম্মানীর বিভিন্ন সাম্যপন্থী জনমণ্ডলী। তাই আজ জার্ম্মানী Bismarck-কে ফিরিয়ে চাইলেও পাচ্ছে মাত্র Hitler-কে; আজ সে অতিমানুষের প্রার্থনা করে, উত্তরে পাচ্ছে বনমানুষ। তার কারণ, গোবরে পদ্মফুল ফোটে না।

দুর্ব্বহ কর এবং দুস্তর ঋণের ভারে জার্ম্মানী আজ মুমূর্ষু। Hitler আশ্বাস দিয়েছেন, "বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে আভ্যন্তরিক কর কমাব; ঋণ বা সুদ শোধ করব না; চাইলে লড়ব।" তাই আজ জার্ম্মানী আশার নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

গত মহাযুদ্ধের সমস্ত গ্লানি এবং পরকালীন অপমান জার্ম্মানীর উপরে চাপান হয়েছে; টিউটন্-গর্ব্ব আজ আহত; নিজ দৌর্ব্বল্যে ক্ষুব্ধ। হিট্‌লারের বাণী—"চাইলে লড়্‌ব"—তার মৃতপ্রায় আত্মাভিমানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই নাজীদলের এই সংখ্যাপুষ্টি।

সুদ ও ঋণ ধনবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। য়িহুদিরা গত যুদ্ধে উভয়পক্ষেই প্রচুর অর্থলাভ করেছে; তারাই টাকা দিয়ে লড়াই চালিয়েছিল। তারা সুদ এবং রক্তপাত উভয়ের জন্যই দায়ী। Hitler বলেন, "অতএব য়িহুদিপীড়ন করো।" জার্ম্মানী সমর্থনসূচক ঘাড় নেড়ে বলে, "হাঁ, তাই করবো; কারণ সুদ ও ঋণ শোধ দেবার শক্তি আমাদের নেই।" এ-সমস্ত কথাই ধনবাদের প্রতিকূল, অথচ Hitler প্রকাশ্যে ধনিকতন্ত্রের শত্রু নন। সোভিয়েটবাদ তাঁর দুই চক্ষের বিষ। তাঁর মতে ধনবাদ ভাল যতক্ষণ সে ধনভার নর্ডিক জাতির উপর ন্যস্ত আছে; য়িহুদীর অর্থ জার্ম্মানীকে সর্ব্বনাশের পথে চালিয়েছে।

Hitler-এর অনুগত নাজীদলের সংখ্যাধিক্যের কারণ দেখিয়েছেন Lengyel উপরের যুক্তিগুলি দিয়ে। কিন্তু Lengyel বলেন, জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থায় বহিঃসাহায্য ভিন্ন লড়বার সামর্থ্য নেই, এবং বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপালে সে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা দুরাশায় পরিণত হবে।

ফলকথা Lengyel বলতে চান যে Hitler একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ ; সে ধাপ্পাবাজি আজও রাষ্ট্রশাসনরথ টানার কাজে প্রযুক্ত হয়নি ব'লে তার স্বরূপ ধরা পড়েনি ; অতএব সাধু সাবধান! Hitler-কে লোকচক্ষে ভুল বোঝাবার জন্যই হয়ত Lengyel-এর লেখা জীবনী সৃষ্টি হয়েছে। Hitler সমাজপন্থী এবং য়িহুদিদের উপর খড়্গহস্ত, যদিও হাতে তাঁর খাঁড়া নেই এবং Lengyel-এর মতে কখনো আসবেও না। খৃষ্টানদের প্রতিও Hitler যে সুপ্রসন্ন নন তার প্রমাণ তিনি Ludendorf-এর সহযোগী এবং Ludendorf চান প্রাচীন টিউটনদের পৌত্তলিকতার প্রত্যাবর্ত্তন। Hitler-এর সাম্যপরিপন্থিতা, য়িহুদি ও খৃষ্টান বিদ্বেষ, সোভিয়েটভীতি প্রভৃতির একটাকেও সুনজরে দেখেন না বলেই Lengyel হয়তো এই জীবনী নিরপেক্ষভাবে লিখতে পারেন নি। জীবন্ত সমসাময়িকের নিরপেক্ষ জীবনী শুধুচোখে লেখা দুরূহ ; অথচ এভাবের রাজনৈতিক অনুবীক্ষণযন্ত্র চোখে লাগিয়ে তার সহজ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

রাজনৈতিক মতবাদের ভাঙ্গাগড়া আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চল্‌ছে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ তার নিজের মতে পৃথিবীকে নতুন এবং সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে অথবা পারবে না, একথা জোর গলায় হেঁকে বলা বিপত্তি ও আপত্তিজনক, ঐতিহাসিক রীতিবিরুদ্ধ তো বটেই। আরও বিশেষ যখন এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি এখনও পর্য্যন্ত এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পায়নি যার ব্যবহার বা অপব্যবহারের দ্বারা সে জার্ম্মানীর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে জেগে ওঠে। Hitler-এর রাজনৈতিক মতগুলি বিশেষ ক'রে ফ্রান্স্ ও আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচাররীতির খুব প্রচলন হয়েছে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বহিঃ ও অন্তর্সঙ্কটের নিরাকরণের একমাত্র উপায় মনে হয় বিস্‌মার্ক-প্রবর্ত্তিত যুগে ফিরে যাওয়া ; গায়ের জোরে বাহিরের দাবী নাকচ করা এবং গায়ের জোরেই সেই ভাবে আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা এবং ঐক্য স্থাপনা করা যে ভাবে এক তথাকথিত চৈনিক রাজা তাঁর রাজ্য হতে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ করেছিলেন। Hitler-এর সাফল্য নির্ভর করছে নাজীদলের সংখ্যার উপর এবং তাদের সমবেত শক্তির উপর। তবে কেন Lengyel হিট্‌লারের আশুপতনের ব্যগ্র বায়সবাণী করলেন? সন্দেহ হয়!

তবু বইখানি উপভোগ্য হয়েছে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, গ্রাম্য জীবনাদি, মূল চরিত্রের বিশেষত্ব ও ঘটনাবলী আঁকার ফাঁকে ফাঁকে, নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হিট্‌লারের বিরুদ্ধে প্রচার হিসাবে লেখকের এ বিষয়ে দক্ষতার প্রশংসা করতে হবেই। তবু নিরপেক্ষ ভাবী ঐতিহাসিক এরই ভিতরে অনেক উপযোগী মালমশলা পাবেন।

Hitler রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যখন Landsberg-এর দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময়ের লেখা Mein Kampf-এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু তত্ত্ব

পাওয়া যায়,—কিন্তু সম্পূর্ণ বোধগম্য ভাবে নয়। Dr. Lengyel-এর বইখানি Hitler-বিরোধী হলেও, Mein Kampf-এর পাশাপাশি পড়লে সম্ভবতঃ হিটলার-স্বজীবনীর অবোধ্য অংশগুলি সরল হয়ে আসে।

Mein Kampf-এর অসাধারণ কিশোর বা বালকটি যা হিটলার পাঠককে স্বীয় Vienna প্রবাসকালীন প্রতিকৃতি ব'লে বিশ্বাস করাতে চান্,—Dr. Lengyel-এর কলমের খোঁচায় তার চেহারা দাঁড়ায় একজন সাধারণ ছোক্‌রা রাজমজুরের। হিটলারের বাবা ছিলেন অষ্ট্রো-ব্যভেরীয় সীমান্তের সামান্য শুল্কবিভাগীয় নায়েব। তাঁর মা ছিলেন জাতিতে Czech; বংশগত টিউটন্ আভিজাত্য—বা নর্ডিক প্রাধান্যবাদের মূলে যে সহজ বীজ থাকে হিটলারের ভিতর তা নেই। হিটলার্ নর্ডিক্ নন্; তিনি যে মিশ্র আল্পীয়, তা আমরা তাঁর চেহারা এবং বংশাবলী থেকে জান্‌তে পারছি। একজন আল্পীয়ের পক্ষে নর্ডিক্ প্রাধান্যবাদ প্রচার করা যে শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক—তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশেও আমাদের পরিচয় আছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দুপ্রাধান্য, এ্যাংলো-স্যাক্সন্ বা টিউটনের পক্ষে নর্ডিকপ্রাধান্য অথবা নিগ্রোর পক্ষে নিগ্রোপ্রাধান্য বিশ্বাস করা স্বাভাবিক,—যদিও অপরের পক্ষে তা কষ্টকর। কিন্তু মঙ্গোলীয়ের পক্ষে য়িহুদিজাতির প্রাধান্য প্রচার করা অশোভনীয় ও অস্বাভাবিক, অপরের পক্ষে কষ্টকর তো বটেই। হিটলার্ চরিত্রের এই বিশেষ বিকৃতিগুলি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ববিদদের অনুশীলনযোগ্য।

শ্রীপ্রতাপকুমার বসু

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

পরিচয়

মুক্তি বা 'অস্তং গতং'

মুক্তি=ব্রাহ্মী স্থিতি

মোক্ষবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভবন।

> ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
> ব্রহ্ম বিদ্বান ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
> ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহারই নামান্তর অমৃতত্ব-সিদ্ধি—

> বিদ্বান্ ব্রহ্ম, অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭
> যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—বৃহ, ৪।৪।১৪
> তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—শুক্ল যজুঃ, ৩১।১৮

ঐ ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি যে দেহান্তে পরলোকেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই—দেহসত্ত্বে ইহলোকেও হইতে পারে।

> এবং মুক্তি-ফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২

কেননা, মোক্ষ প্রতিবন্ধ-ক্ষয় বা 'অন্তরায়ধ্বস্তি'র উপরই নির্ভর করে।

ঐহিক বা ইহলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি—

> অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র (অর্থাৎ ইহলোকে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে—বৃহ, ৪।৪।৭
> ইহ (এখানে) চেদ্ অবেদীদ্, অথ সত্যম্ অস্তি—কেন ২।১৩

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

> অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫
> তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
> পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।৬।২

এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যা-জন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহার ফলে মুক্তি) প্রতিবন্ধ-ক্ষয়াপেক্ষয়া স্থিতম্ ইতি

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্ দর্শনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

কিন্তু ঐ মুক্তি ঐহিকই হউক আর আমুষ্মিকই হউক, এভাবে দেখিলে, উহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

'মোক্ষের অনন্তর, মুক্তির নিরন্তর ব্রহ্ম-সংপত্তি'—সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি (ছান্দোগ্য, ৬।৮।১)

তখন সেই সনাতন চিরন্তন, অজর অমর অক্ষর সতের সহিত, ব্রহ্মের সহিত, জীবের একীভাব হয়।

ঐ একীভূত ব্রহ্মিষ্ঠকে, ঐরূপ ব্রহ্মে স্থিত পুরুষকে যাজ্ঞবল্ক্য 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।—বৃহ, ৪।৪।১৩

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে, তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'।

'প্রতিবুদ্ধ' কেন? যেহেতু, তিনি মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছেন। তাই শাক্যসিংহের সার্থক নাম বুদ্ধ কারণ, তিনি সম্বুদ্ধ—সম্যক্ জাগরিত—'The fully wake One'।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥—মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১৬

'অনাদি-মায়া-ঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, * তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্ন-হীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

মজ্ঝিমনিকায়েরও ঐ কথা—

ধম্মং দেসিয়মানে চিত্তং পক্খন্দতি, পসীদতি সংতিট্‌ঠতি বেনিঞ্চ্ছতি।

'তখন চিত্ত উদবুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়, সন্তুষ্ট হয়, অক্ষোভিত হয়।'

সেইজন্য কঠ-উপনিষদ্ মোক্ষকামীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—কঠ, ৩।১৪

'উঠ, জাগ, প্রবুদ্ধ হইয়া সদ্গুরুর সকাশে 'বোধি' সঞ্চয় কর'—ইহ-জীবনে স-শরীরেই কর—

---

*He *awakes* of the long dream of life, dreamt during *Sansara* and finds (it) resting upon the delusion that his real essence has something in common with the components of his personality (অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ). —The Doctrine of the Buddha, pp. 334 and 340.

এই Delusion বা মায়া অনাদি-সিদ্ধ (অনাদি মায়য়া সুপ্তঃ)—সেইজন্য Grimm ইহাকে ' Gigantic and *incessant* self-mystification ' বলিয়াছেন।

ইহ চেদ্ অশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ—কঠ ৬।৪

'যদি শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বেই প্রবুদ্ধ হইতে পার,' তবে—

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

—প্রতিবোধ-বেদ্য সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে' জানিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভ করতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইবে! ইহারই নাম মোক্ষ।

ব্রহ্মে স্থিতি না স্বরূপে অবস্থান ?

অন্য ভাবে দেখিলে, মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের 'স্ব-রূপে অবস্থান' বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ 'মোক্ষে জীবের স্ব-রূপ-আবির্ভাব।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষং আপদ্যতে, স স্ব-রূপাবির্ভাবরূপঃ, ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজ ভাষ্য।

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য-উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং জীবের 'স্বেন ভাসা, স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৯)।

বৌদ্ধেরা, জীবের এই 'স্ব রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণ-দশার বর্ণনায় বলেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence. (Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 359.)

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests. (Ibid, p. 196).*

---

* সম্ভবতঃ এই 'Inscrutable, Essence'ই বুদ্ধদেবের কথিত 'বিজ্ঞানধাতু', as opposed to 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। মৈত্রেয়ী-উপনিষদ্ ইহাকে 'প্রত্যক্ ধাতু' বলিয়াছেন—

অনন্দাক্ষিয়ঃ পরঃ সোঽহমস্মি

প্রত্যক্ ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি—১।১১

ঐ 'বিজ্ঞানধাতু' বিজ্ঞানস্কন্ধ নহে। বিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি এই :—বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং—(দীঘনিকায়, ১১)

অর্থাৎ বিজ্ঞানধাতু 'is invisible, boundless, all penetrating'

ঐ বিজ্ঞানস্কন্ধ অন্যান্য চারিটি স্কন্ধের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের 'Personality' রচনা করে। ঐ Personality আমার প্রকৃত 'আমি' নহে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'তং ন এতং মম, ন এসোহম্ অস্মি, ন মে সো অত্তাতি— This does not belong to me, this am I not, this is not myself (মজ্ঝিমনিকায় 28th Discourse); কারণ, our true essence lies behind our personality (Grimm, p. 227). *All* determinants within us have nothing to do with our *essence*, which is not subject to the laws of arising and passing away (Ibid, p. 312).

এই Inscrutable Essence-ই হিন্দুর লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ,' জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্মা অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্—বৃহ, ৪।৩।২১
অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬ ও ৪।৩।২২

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫
যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন) —তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে ?

সেই আত্মা যে, নেতি নেতি—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪
'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দ্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কখনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition. × × × The true one is therefore not to be discovered as an object of cognition × × it is transcendent. (Grimm's Doctrine of the Buddha, pp. 499 and 515).

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট পল যাহাকে Soul বলিয়াছেন সেই soul নহেন, ইনি প্রত্যগাত্মা (Monad)—সেণ্টপলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন এই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই। আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)—বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্ (বৃহ, ৪।৪।১৭) 'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

জীবের স্বরূপে অবস্থানেরও ঠিক্ ঐ ফল—কারণ, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার ঐ ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্ব-রূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি—যোগসূত্র, ৪।৩৪

তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাস-ভাষ্য

ইহাই মুক্তি—তখন পুরুষঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে (১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

তুরীয় ও মোক্ষ

আমরা জীববাদের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়। (পরিচয়, প্রথম বর্ষ ৫৫৭-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং তখন ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ—সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। তত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is × × from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one.—Deussen, p. 142.

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে—সর্ব্বসার-উপনিষদ্ অর্থাৎ—'the spiritual then subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things.'

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বভাবজ—কিন্তু এই সমাধি যোগজ, সুদীর্ঘসাধন-সাপেক্ষ।

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক, আর সমাধিই হ'ক, সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপে-অবস্থান অস্থায়ী (a transcient union) ঐ যোগ 'প্রভাবাপায়ৌ'- উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীয়ের উপরের যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition) যাহাতে ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।—বৃহ ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী, * Sole Subject without Objects) এবং অ-দ্বৈত (One without a second)। হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে, state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এখানে ব্রহ্ম-লোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোস্য পরমোলোকঃ এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমাগতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

---

*He (মুক্ত পুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality.'—The Doctrine of the Buddha, p. 336.

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর, আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তান্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—বৃহ, ৪।৫।১৩

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড (lump of salt) অনন্তর—অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্ব্বত্র রসঘন—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর অবাহ্য কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন। অর্থাৎ 'নুর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায় ভূত হইতে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য) তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন. 'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন! আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছুই বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'—অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪) —আত্মার উচ্ছেদ নাই বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষদশার কথা বলিলাম, সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject ও object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে (i.e. the pure objectless knowing subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে

কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই অন্যত্র একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়, 'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয় —তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? অতএব—

ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।

অর্থাৎ মুক্তদশায় বিদেহী আত্মা—The imperishable, indestructible Atma (অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা আত্মা) has no further consciousness of objects, because as knowing Subject, he has everything in himself, nothing outside of himself—consequently 'has no longer any contact with matter' (মাত্রা-অসংসর্গস্ত্ব অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিনশাখা)—Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp. 349-50.

ঐ মর্ম্মে অধ্যাপক ডয়সন অন্যত্র বলিয়াছেন—

It is the condition (of deep sleep) in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. × × × 'In it, there is no duality, no subject and object and consequently no consciousness in an empirical sense.'— কারণ, 'To be conscious means: There are objects for me' (Schopenhauer)—সেই কথা 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'।

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম্ এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন—

If we come to the true view of recognising everything as Anatta and thereby denying every predicate to our ego, then in that moment the ego ceases to be the subject, (i.e., being without object) ceases from its introduction by means of the I-idea into the world of experience. It vanishes again into nothing.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 187.

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything.'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন।

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি—মজ্ঝিমনিকায়।

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

পুন চ পরং ভিক্‌খবে! সারিপুত্তো! সব্বসো বিঞ্ঞানানং চায়তনং সমতিক্কমা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ! হে সারিপুত্র। (নির্ব্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, 'কোন কিঞ্চিৎ নাই' এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায়—sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি? কারণ, 'Where all phenomenon has ceased, naming is gone' (Grimm).

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি'—'মোক্ষদশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এ সকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংবদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসীদিগকে অধ্যাপক গ্রিম কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence (The Doctrine of the Buddha, p. 164).

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ 'shallow thinker'রা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহা বিচিত্র মানিবার কারণ আছে কি? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা চিরদিনই অবিনাশী 'অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'। সেইজন্য মোক্ষের অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন ঃ—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। নহি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যদ্ বদেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ শৃণুয়াৎ।

যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত।

যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ,—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না। দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে?

ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আস্বাদন করেন না, বচন করেন না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির স্বাদ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মনন-শক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ হয় তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী, কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন?' অর্থাৎ আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ
—প্রশ্ন, ৪।৯

মুক্ত স্বধাম-গত

আর এক ভাবে দেখিলে, মুক্তিকে স্ব-রূপে অবস্থান না বলিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

হে জীব! 'অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস!'

আমরা এখন যেমন বলি সূর্য্য অস্ত গেলেন—'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন বলিয়াছেন ঃ—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে চলিলেন,

—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন 'অস্তে'র অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্‌বেদ্ ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের 'অস্তে' (গৃহে) প্রবেশ করে।'

উপনিষদের স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব
সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি—ছান্দোগ্য, ১।৯।১
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বা অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা-মলিনতা পরিহার করিয়া 'অস্তে' ফিরিয়া আইস'। আমরা দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিরঞ্জন—'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহরূপ 'পুরে'র সহিত সংযুক্ত হইয়া সে 'পুরঞ্জন' হয়—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

সেইজন্য জীবের নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহার বসতি। ঐ পুরের 'অঞ্জন' (stain) যেন তাহাকে উপরক্ত করে;

স বা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে —বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপরাগ ধৌত করিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া, 'নিরবদ্য নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এইরূপ স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনি অস্তং গতঃ।* বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

—অত্থং গতস্স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেয়ুঃ) তং তস্স নত্থি (সুত্তনিপাত, ৫)

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—

—For him, who has gone home, there is no standard of measure এবং আমাদের স্মরণ করাইয়াছেন যে, 'Those acquainted with the older sans-

* গেটের Faust মহা নাটকেও আমরা এই ধরণের একটা কথা শুনিতে পাই। ফাউষ্ট বলিতেছেন—

Two souls alas! reside within my breast.
কে কে?—একজন মর্ত্ত্যবিহারী, অন্যজন বিমানচারী—
One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust, the world in its embraces.
The other strongly sweeps, (this dust above),
Into the high *ancestral* spaces,
Ancestral Spaces ই জীবের নিজ ধাম—তাঁহার 'অস্ত'।

krit literature will see at once that in the Pali word ' Attam gatassa ' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, ' Astamgata,' the root meaning of which is " gone home."

বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন যে, পরিনির্ব্বাণী (মুক্ত পুরুষ = the Delivered One) 'is submerged in the Deathless'—

—তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্হ লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা—(সুত্তনিপাত)। গ্রিম্ বলেন—

' Neither this deathless Nirvana is thus my I; it is rather home in which I am submerged (The Doctrine of the Buddha, p. 519). কেননা, মুক্তিতে কি হয় ? (We) reach that realm (ধাম) our own proper realm (প্রকৃত স্ব-ধাম), " where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair." (The Doctrine of the Buddha, p. 197).

নির্ব্বাণের এই বর্ণনার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার তুলনা করুন—দেখিবেন, দুইটি একই সুরে বাঁধা।

যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১
'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত।'

আমাদের গন্তব্য স্ব-ধাম কি ? আমাদের 'মুলুক' (Real Home) কোথায় ?

কোন্ মুলুক্‌সে আয়সি হংসা ? (কবীর)—হে হংস (জীব)! তুমি কুতঃ আয়াতঃ—তোমার আয়তি কোথা হইতে ? কুতঃ কোথা হইতে ? ব্রহ্ম হইতে—
From God who is our Home.—WORDSWORTH.

অতএব ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম—

ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২

'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎসৎ') বিচ্ছুরিত হইয়াছে'

For, man who is from God sent forth.—WORDSWORTH.

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ—মুণ্ডক, ২।১।১
(ভাবাঃ = জীবাঃ—শঙ্কর)
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তি, ৩।১

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াই জীব সংসারচক্রে বিবর্ত্তন করে—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে- শ্বেত. ১।৬

এই ব্রহ্মচক্রের প্রথমার্দ্ধের নাম প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে জীব খনিজ (Mineral), স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, (Vegetable), অণ্ডজ (Fish, Reptiles, Birds) ও জরায়ুজ (Beasts) প্রভৃতি বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানবযোনিতে প্রবেশ করে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নব লক্ষং চ দশ লক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ,

অর্থাৎ, 'স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পরে জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে।'

ইহাকেই বলে Evolution (বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ)। এইরূপে বিবর্ত্তনের সরণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া জীব বহু দিনে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

That spark through æons of the time became a human being * * At first that human being was in the shape of a savage. (J. Krishnamurti).

সেই অসভ্য ক্রমশঃ অর্দ্ধ সভ্য হইয়া ধীরে ধীরে সভ্য হয়। এখনও কিন্তু সে প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। বিবর্ত্তনচক্রের বিবর্ত্তনে একদিন সে 'মোড়' ফিরিয়া (turning point pass করিয়া) নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। এতদিন জীব বহির্মুখ ছিল, এইবার অন্তর্মুখ হইতে আরম্ভ করে—এতদিন সে ব্রহ্ম-বিমুখ ছিল (His face was turned away from God)—এখন সে ব্রহ্ম-সম্মুখ হয় (His face is turned Godward)—ব্রহ্মবৈমুখ্য ঘুচিয়া এইবার তাহার ব্রহ্ম-সাংমুখ্য হয়। এতদিন তাহার পক্ষে নিয়ম ছিল—আদান (He grew by grasping)—এখন হইতে তাহার নিয়ম হয় প্রদান (ত্যাগ বা বিসর্গ) (He now grows by giving)। এতদিন তাহার লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয়—এখন হইতে তাহার লক্ষ্য হয় নিঃশ্রেয়স। আমরা দেখিয়াছি এই নিঃশ্রেয়স বা Summum Bonum-ই মুক্তি। এতদিন সে ছিল প্রেয়ের পথে—এখন সে প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে প্রবেশ করে। এই প্রেয়ের পথই মোক্ষ-মার্গ।*

* অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নিব্বাণগামিনী।
(অন্যা হি লাভোপনিষৎ অন্যা নির্ব্বাণগামিনী)
'লাভের পথ এক, নির্ব্বাণের পথ আর।'

ইহারই চরমে নিঃশ্রেয়স। মানব প্রকৃতপক্ষে 'সুসভ্য' না হইলে এ পথে বিচরণ করিতে পারে না।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ, 'পূর্ব্বোক্ত যোনি সকল ভ্রমণ করিয়া জীব ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।'

এইবার মানব অতি-মানব হইতে আরম্ভ করে—normal evolution-এর সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া super-normal evolution-এর তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এ পথ অতি দুর্গম পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—

যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—Straight is the gate and narrow is the way and few there be that find it.

এতদিন সে আত্মবিস্মৃত ছিল*—সে যে রাজপুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী ছিল 'Gods in exile'—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া, অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭৷২৬৷২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থেরও উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth
Doth again to God return.

---

* যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন—

হেতুবিহরণে তস্য আত্মবিস্মরণাদ্ ঋতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধো! জন্মান্তর ফলপ্রদঃ॥ —উৎপত্তি, ৯৫।৮

'জীবের জন্মান্তর বা সংসৃতির একমাত্র হেতু তাহার আত্মবিস্মৃতি।' ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর রূপকের রূপে বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জন (জীব) আত্মবিস্মৃত হইয়া পুরের সহিত সারূপ্য স্থাপন করিয়া শোকমোহের অধীন ছিল। অন্তিমে তাহার সত্য সখা, নিত্য সখা নিরঞ্জন (দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া) উপনীত হইয়া তাহার স্তম্ভিত স্মৃতির উদ্বোধন করাইলে সে 'নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্' এবং তখন স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুস্থ ও সুস্থির হইল।

We resemble children, who though living in a comfortless region (এই 'দুঃখালয়' সংসার), look, full of fear and trembling, upon the immense dark forest that stretches out before them, and cannot be brought by any inducement to enter it,—while, all the time, behind it, in the midst of green meadows, bathed in smiling sunshine stands their parents' house, from which they set out at first. —The Doctrine of the Buddha, p. 195.

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তং গত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এইদিনে The wheel has come full circle and I am here. (Shakespeare)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark.—J. Krishnamurti's 'By What Authority,' p. 29.

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪
'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্ম-ধামে প্রবেশ করে।'
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—মুণ্ডক, ১।৩
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ বিষ্ণোঃ পরমং পদম—মুণ্ডক, ১।৩

সেই বিষ্ণুর পরম পদ—যাহা সংসার পথের পার—সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন, 'অস্তং গত' সেই পদে প্রত্যাবর্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—ঋগ্বেদ

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬)—তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি—মুণ্ডক, ২।১।১

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১।১

'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।'

সেই বেদের প্রাচীন বাণী—

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্বম—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

মোক্ষ = শূন্যতা-সিদ্ধি

এই যে ব্রহ্মধামে প্রবেশ বুদ্ধদেব ইহাকেই শূন্যতাসিদ্ধি বা নিরোধ-সমাপত্তি বলিয়াছেন—

নত্থি কিঞ্চিতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি

(He has won to the sphere of Nothingness (শূন্যতা)

এই শূন্য কি ? এই শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৬)। ইহ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্য—ন সৎ নচাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহে, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ২।১৪

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে অন্য ; কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'

—এক কথায় 'সর্ব্বকার্যাধর্ম্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)*—তখন তিনি 'শূন্য'বই আর কি ?

স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন ; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (Plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (Vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ব বেদান্ত-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাঞ্চ যৎ—যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

উপনিষদে এই শূন্যভাব-সাধনের উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃত, ১১
শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

*The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought. × × The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4.

বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহার 'শূন্য' Nihilum নহে—নাস্তি নহে।* তিনি বলিতেন 'Beyond this seeming 'Nothing'—the true and real is hidden' (Grimm p. 457) তাঁহার নিজের মুখের উদাত্ত বাণী একবার মানস-কর্ণে ধ্বনিত করুন—

অত্থি ভিক্‌খবে! অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্‌খবে! অভবিস্‌স অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্‌খবে! অত্থি অজাতং অবভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞায়েতি তি।

অত্থি ভিক্‌খবে! তদ্‌ আয়তনং যত্থ ন য়েব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানং চায়তনং ন বিঞ্‌ঞানানং চায়তনং ন অকিঞ্চন্নায়তনং ন নেব সন্না না-সন্নায়তনং, নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিয়ো। তদ্‌ অহং ভিক্‌খবে! ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্পতি টঠং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্‌খস্‌সেতি—উদান, ৮।১, ৩

ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bhikkhus, That which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved. Unless, O Bhikkhus, there were That, which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing-out of what is born, has become, is created and evolved. And surely, because, O Bhikkhus, there is That, which is unborn, has not become is uncreate and unevolved—therefore is cognisable the out-springing of what is born, has become, is created and evolved.' (Translation in 'Light from the East,' p. 51).

ঐ Unborn Uncreate Unevolved—ঐ 'অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং'-ই উপনিষদের নির্গুণ নিরুপাধি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অস্তং গত (স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত) হইলে—সেই ব্রহ্মের সহিত, সেই শূন্যের সহিত সুনিশ্চল সাযুজ্য হয়। ঐ সাযুজ্যই মুক্তি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

*The *nothing* (শূন্য), that we regarded so long as the measureless black pall spread over the abyss of absolute annihilation, into which every living being must one day fall—now becomes the mysterious veil that lies over our own *innermost essence*.—The Doctrine of the Buddha, p. 195.

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই এলিয়ট সাহেব গৌণভাবে আমার অদৃষ্টচক্র ফিরিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমার এত ভাল ক'রে মনে আছে। গল্পটা উল্লেখযোগ্য শুধু এই দেখাবার জন্য যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা আতঙ্ক ছিল যে আমাকে একদিন ভারত শাসনের ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা হবে। উঠতে বসতে এই কথা আমায় শুনতে হত। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর পাঁচরকম কারণে আশা হচ্ছিল যে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাব। ইতিমধ্যে লাট-বাহাদুরের কুচবেহারে শুভাগমন হল, রাজ্যের কর্ত্তাদের কারদানির জন্য সাহেব তুষ্টও হলেন। পিতাঠাকুর পাকা রাজনীতিবিৎ ছিলেন। রাজ্য চালনার প্রধান নীতি হচ্ছে এই যে লেন-দেনের হিসাব ঠিক থাকবে, অর্থাৎ অপর পক্ষ ফাঁকি দিয়ে কিছু মেরে না নেয় সেইটে দেখতে হবে। কুচবেহার কর্ত্তৃপক্ষের সেবার চেষ্টা হল যে এত কষ্ট ও খরচ যখন করা গেছে তখন কিছু সুবিধা ক'রে নিতে হবে। ওই রাজ্যে একটা গোলমাল বহুদিন থেকে চলে আসছিল। অমাত্য দুজন ছিলেন। একজন আমার বাবা, অন্যজন এক সাহেব। এই diarchy-র দরুণ ষ্টেটের অনর্থক অনেক-গুলো টাকা খরচ হয়ে যেত। যখন এলিয়ট সাহেব বাবাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন বাবা ষ্টেটের এই দুঃখের কথা তুললেন, "কাজ দুজনের মত যখন নেই, তখন আমাদের একজনকে সরিয়ে দেবার অনুমতি দিন।" খানিকক্ষণ আলোচনার পর সাহেব বললেন—"নেটীব রাজ্যে একজন নেটীব দেওয়ান চাই। কাজেই তোমার যাওয়া হতে পারেনা। তুমি যদি সিবিলিয়ান হতে, তাহলে না হয় সাহেবকে সরিয়ে নিয়ে তোমার একার উপর সব ভার দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হিন্দুস্থান সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।" তারপর খুব সৌজন্য ক'রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলে সার্বিসে ঢুকছে, না?" বাবা কলকাতায় এসে আমায় আদেশ করলেন যে সিবিলিয়ান আমায় হতেই হবে। ফলে, ইস্পাতের ফ্রেমে একখণ্ড কর্কের ছিপি বসান হল। ফ্রেমের অদৃষ্ট!

ছিপিরও গ্রহের ফের। কোথায় ঘরের কোণে বোতলে আঁটা পড়ে থাকবে, তা না এক প্রকাণ্ড কারখানার ষ্টীল ফ্রেমের ওজন পড়ল তার ঘাড়ের উপর। কর্কের তৈরী বলেই পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় নেই। বহুদিন থেকেই ফ্রেমের জন্য এদেশী পেরেক সংগ্রহ হচ্ছিল। ইস্পাত না

হলেও কাঁচা লোহার পেরেক অনেক মিলছিল। কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে লাটের নিরর্থক সৌজন্যের ফলে একটা কর্কের ছিপিকে সেই কাজে লাগানো হল, তাঁকে আমি অভিনন্দন না ক'রে থাকি কি ক'রে? তাঁর বিদ্যার কথা জানি না, তবে তাঁর কীর্ত্তিকে অঘটনঘটনপটীয়সী বললে দোষ কি?

আমার ছেলেবেলার শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলেছি। মন্ত্রীপুত্রের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নই স্বাভাবিক। সে স্বপ্ন অনেক দেখতাম। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হাকীম হওয়ার উচ্চাশা কখনও হয় নেই, যদিচ আমায় ক্রমাগত লোভ দেখানো হত যে নেটীব সিবিলিয়ান ত এইবার কমিশনার হয়েছে, আর দু-পাঁচ বছরে লাটও হবে। লাট হওয়ার লোভ কিছুতেই হত না। ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রাধান্য তখন সবে একশ বছরের। তাই তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার উৎসাহ ছিল না। বরং খুব ইচ্ছা হত যে একটা দেশী রাজ্য হাতে নিয়ে গ'ড়ে তুলি। কে জানে ভবিষ্যতে কি সুযোগ হবে। এদেশের পাঁচহাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্থান ও পতন ত কত শত হয়ে গেছে। চাকরী সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ দেখি নেই। প্রথম বয়সে মাত্র একজন বড় চাকরী নিয়েছিলেন। অধিকাংশের নজর সেদিকে ছিল না। আজ যে তাঁরা অনেকেই বর্ত্তমান ভারতের টোডরমল মানসিংহের পদে অধিষ্ঠিত সে কেবল দেশের হাওয়া বদলেছে ব'লে, সরকার দেশের লোককে শাসনকার্য্যে সহায় হতে ডেকেছেন ব'লে।

আমাদের এক Bohemian Society, ভবঘুরে সমিতি, ছিল। তার বৈঠক বসত প্রধানত বন্ধুবর প—র গোয়াবাগানের বাসায়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের উপদ্রব ছিল না। এক পণ্ডিত মশায় ছিলেন। তিনি চমৎকার লোক। আমাদিকে সর্ব্বদা ভূরি ভোজনে তৃপ্ত রাখতেন। আমাদের সমিতির সাধারণ কার্য্যক্রম ছিল তাসখেলা ও জলযোগ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে প্রোগ্রামও বিশিষ্ট রকমের হত। "গোড়ায় গলদ" পাঠ ও অভিনয় আমাদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। দুয়েকবার Variety Programme-এর মত হয়েছিল। কমিটি ঠিক করলেন কে কি অভিনয় করবে। অভিনেতাদের পারদর্শিতার দিকে কমিটির ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আদেশ অনুসারে কেউবা বাংলা গান করতেন, কেউ ইংরেজী সঙ্গীত চর্চ্চা করতেন, কেউবা তিব্বতী ভাষায় অভিনয় করতেন। সব কথা এখন মনে নেই, তবে ভূ— এমন সরসভাবে "আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে" আবৃত্তি করেছিলেন যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকলেই তখন নববিবাহিত। বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের

কবিতা আবৃত্তি অল্প বিস্তর সবাইকেই করতে হত। তবু এমনটি কখনও শুনি নেই। আমাদের ডাক্তার বন্ধু এক ইংরেজী গান করলেন। এ বিষয়ে সেইদিন তাঁর হাতে-খড়ি হল। পরে বিলেতে কতবার শুনেছি, স্নান করতে করতে তিনি খুব জোর ইংরেজী গান গাইছেন। আমার অদৃষ্টে পড়েছিল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধের প্রায় সবটাই কড়ি ও কোমল, মানসী ও সোনার তরী হতে চুরী। কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্য এমনই জিনিস যে মণ্ডলীর সকলেরই বেশ ভাল লেগেছিল, অর্থাৎ আমায় কেউ বই বা দোয়াত ছুঁড়ে মারেন নেই।

আমাদের কলেজের কবছর রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-মহলে খুব দেখা দিতেন। তিনি নানাস্থানে প্রবন্ধপাঠ করতেন। আমরা দল বেঁধে যেতাম, আর পাঠ হয়ে গেলেই 'গান, গান' ক'রে চীৎকার করতাম। এই সব সভাতেই "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা", "আমায় সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও" ইত্যাদি গান প্রথম বের হয়। কবিবর তখন আমাদের রবিবাবু ছিলেন। কর্ত্তারা তাঁকে নেক নজরে দেখতেন না। অনেক বাড়ীতে তাঁরা বলতেন যে রবি ঠাকুর বড় মানুষের ছেলে, কাজ নেই কর্ম্ম নেই, ব'সে ব'সে ছেলে বখাচ্ছে। যখন এ সব ব্যাপারের হিসেব নিকেশ হবে, তখন হয়ত দেখা যাবে যে, প্রথম বঙ্কিম, তা'পর কবি সত্যিই তিনপুরুষ বখিয়েছেন। খুব ভালই করেছেন, কেননা সুবোধ বালকের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হয়েছিল।

একটা বিষয়ে আমার কবিবরের বিরুদ্ধে নালিশ আছে। অত বড় লোককে যখন কাঠগড়ায় খাড়া করছি তখন আমার কেসটা খুলে বলা দরকার। বালিকাবধূর সঙ্গে প্রেমচর্চ্চাকে তিনি ঠাট্টা করেছিলেন, সেজন্য আমাদের কারও মনে ব্যথা লেগেছিল, এ আমি শুনি নেই। বরং কেউ কেউ সেই কবিতা থেকেই লাইন তুলে প্রেমপত্রে নিজের ব'লে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ফিরিঙ্গীরা যে পথে ঘাটে দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতন করত সে বিষয়ে কবি কোন কথা লিখলেন না। কিন্তু কোথায় কোন্ জায়গায় একবার দুচারজন কাপুরুষ ছেলে মুক্তি-ফৌজের সাহেবকে মেরেছিল তাই উপলক্ষ্য ক'রে লম্বা কবিতা বের হল। এ জিনিসটা তখনও একচোখোপনা মনে হত, এখনও হয়।

ফিরিঙ্গীরা কিংবা গোরা সেপাইরা সেকালে লোকের সঙ্গে যে কি ব্যবহার করত তা হয়ত একটু বয়স্থ লোক সকলেরই জানা আছে। আমাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু এতে যে রাজার গৌরব হানি হয়। তবু, কর্জ্জন সাহেবের আগে কোন লাট গোরাদের জুলুমের প্রতিবিধান করতে সাহস করেন নেই। আজ এ অত্যাচার

খুব কমে গেছে। হয়ত লোকেও আর বরদাস্ত করবে না, সরকারও করবেন না। কিন্তু আমি যখন চল্লিশ বছর আগের কথা লিখতে বসেছি, তখন আমার এ সব অপ্রিয় কথা না লিখেও উপায় নেই। অপ্রিয়, কেননা নিজেদেরই বদনাম। অপমান হজম করাতে ত কোন গৌরবই নেই! আমি বড় বড় ব্যাপারের, অর্থাৎ খুন খারাবীর, কথা প্রত্যক্ষ কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে কিছু বলছিনে না। তবে আমাদের যে কারণে দলবদ্ধ হয়ে ময়দানে চলতে ফিরতে হত, সেটা একালের ছেলেদের জানা ভাল। ছেলেবেলায় ইংরেজদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে তারা ন্যায় যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় যুদ্ধ জানে না। হয়ত ভদ্রবংশীয় ইংরেজ সম্বন্ধে এটা সত্যি, কিন্তু আমাদের আমলের গোরা সেপাই কি মেটে সাহেব যে ন্যায় যুদ্ধের উপাসক ছিল না তার প্রমাণ খুব সুলভ।

একদিন আমরা জনাতিনেক ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল স্কোয়ারের ভেতর হাল্লা। দূর থেকে দেখি, তিন-চারজন ইংরেজী কাপড়-পরা লোক একটি বাঙ্গালীর ছেলেকে মারছে, লোক জমে গেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। আমরা নির্ব্বিরোধী লোক। শুধু দেখবার জন্য বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেই দিকে দৌড়ালাম। ততক্ষণে পেণ্টুলুন-পরা লোকগুলো গলিতে ঢুকে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটি বছর চৌদ্দর ছেলে জখম হয়ে ভুঁইয়ে পড়ে, আর পাশে একটা হোঁৎকা গোছের লোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, বর্ণনা করছে কি হয়েছিল। তার মাথায় খুব ঢেউ খেলান তেড়ী, গায়ে জালের গেঞ্জী, পরণে মালকোঁচা মারা-ধুতি। বক্তৃতা শেষ ক'রে সে খুব জোরে নিজের বুক চাপড়ে দুতিনবার বল্‌লে, "ধিক্! বাঙ্গালীর জীবনে ধিক্!" আগেই বলেছি আমরা ছিলাম নিরীহ লোক। মাথা হেঁট ক'রে চলে গেলাম। সে লোকটাকেও পিটিয়ে দিতে পারলাম না। শত ধিক্!

আর একদিন গড়ের মাঠে খেলা ভাঙ্গবার পর আমরা কয়েকজন ফিরছি এমন সময় দেখি যে এক বাঙ্গালী ছাত্রকে দুটো ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে খুব ঘুষো লাথি মারছে। পাশে আরও দুতিনজন ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে স্বজাতিকে সাবাস দিচ্ছে। আমাদের দল নেহাৎ ছোট ছিল না। দুএক-জনের হাতে বংশদণ্ডও ছিল। তৎক্ষণাৎ আমরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে গেলাম আর ফিরিঙ্গীদের বললাম, "এ চলবে না। একজন একজন লড়াই কর।" তাই করতে হল। বাঙ্গালীটি বাহাদুর ছেলে ছিল। খুব ঠুকলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শেষ তার বুকে ব'সে মাপ চাইয়ে ছাড়লে। এ পর্য্যন্ত নালিশ করবার মত কিছু হয় নেই। কিন্তু ফেরবার পথে মনুমেণ্টের কাছে আবার ছেলেটিকে কজন ফিরিঙ্গী ঘিরে দাঁড়াল। বোধ হল সেই

প্রথম দলই। ভাগ্যিস আমরা পিছনেই ছিলাম। আমরা হুঙ্কার ছাড়তেই তারা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলে।

আমার নিজের কখনও রণে ভঙ্গ দিতে হয় নেই। ধাক্কা ধুক্কি যা খেয়েছি এক-আধবার, সে অতি সামান্য ব্যাপার। তা সে ঋণও গায় রাখি নেই। তবে একবার passive resistance করতে হয়েছিল। ঘটনাটা গল্প হিসেবে মন্দ নয়। আগেই বলেছি, মাঠে আমরা বড় একটা একা একা ঘুরতাম না। একদিন ডালহৌসির মাঠে খুব বড় খেলা ছিল। কথা ছিল আমরা সকলে ক্লাব থেকে যাব। কিন্তু আমি যখন পৌঁছলাম, তখন একটু দেরী হয়েছে। সকলে চ'লে গেছে। ইতস্ততঃ করছি এমন সময় রাস্তার ওপারের মাদ্রাসা ক্লাবের ছেলেরা বললে, "চল বাবু, ম্যাচ্ দেখতে যাবে না?" গেলাম তাদের সঙ্গে। তখনকার দিনে পয়সা দিয়ে ম্যাচ্ দেখার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। মাঠের তিনদিক খোলা থাকত। একটা জায়গা বেছে আমরা চারজন সামনে দাঁড়ালাম। খানিক পরে পেছনে বিজাতীয় আওয়াজে চীৎকার শোনা গেল, "Make room, হট যাও।" হঠাৎ আমার মাথার উপরে এক বেতের ঘা পড়ল। বেতটা হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। ফিরে দেখি, Buff পলটনের জনা পঁচিশেক বীর যোদ্ধা বেগে লোক সরিয়ে দিচ্ছে। অবহেলে সরিয়ে দিলে। যতক্ষণে তারা দুই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ততক্ষণ আমার মাদ্রাসার সঙ্গীরা অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। আমি একা পড়লাম সেই সেপাইদের লাইনের সামনে। অবস্থা সঙ্গীন। এক মুহূর্ত্ত ভাবলাম মার খাব, না স'রে পড়ব। তারপর মনে হল স'রে ত পড়ছিই আজ কত শ' বছর, না হয় মারই খাই। কে জানে হয়ত বুড়েমিই ধরল, কে আবার সরে। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে মাঠের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখন আমিও, "একা কুম্ভ," পেছনে ঠেলতে আরম্ভ করলান। গ্রাম্য ইংরেজীতে নানা রকম শ্লীল অশ্লীল ঠাট্টা তামাসা কানে আসতে লাগল। দুএকটা গাঁট্টাও মাথায় খেলাম। আমার পেছনে ঠেলা কিন্তু বন্ধ হল না। ইতিমধ্যে একজন linesman "পিছে, পিছে হট্ যাও" বলতে বলতে নিশান হাতে এসে পড়ল। সেও Buff সেপাই। হয়ত তার সাঙ্গাতদের সঙ্গে চোখে চোখে কিছু ইসারাও হয়ে থাকবে। যাই হোক, লোকটা যেই আমাকে "পিছে, বাবু," ব'লে ঠেলা মারলে, অমনি পশ্চাতের দুজন সেপাই ফাঁক হয়ে গেল। ফলে আমার দেহের উপরটা পেছনে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু আমি আগে থেকেই গোড়ালি কাদায় গেড়ে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই পড়ে গেলাম না। তখন সেই অবস্থায় আমাকে সেপাই দুটো টিপে

ধরলে। আমি দুই কনুই দিয়ে তাদের পাঁজরার উপর passive resistance বার দুই চালাতেই তারা কোঁক ক'রে আবার ফাঁক হয়ে পড়ল। সুবিধা পেয়ে আমি পিছিয়ে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার খেলা দেখার মত অবস্থা ছিল না। পিছন থেকে লাথি, গাঁট্টা, ধাক্কা ক্রমাগত খাচ্ছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও যে চাঁট দু-চারটে মারি নেই তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি জবাব দিচ্ছিলাম মোটামুটি দুধারের পাঁজরার উপরে। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কোন পক্ষেই ক্রোধের উদ্রেক হয় নেই। তারা যা করছিল অভ্যাস দোষে, আমি যা করছিলাম ভয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট এই রকম ধস্তাধস্তি চলল। আর বেশীক্ষণ চলে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করছে। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, "Let him be, Jim" (ছেড়ে দে, জিম)। এতক্ষণ আমার মুখ দিয়ে ভাল মন্দ একটি কথাও বের হয় নেই। এখন ফিরে বললাম, "Thank you"। আমার ডান পাশের সেপাইটি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধ'রে বললে, "You are a plucky lad"। আমি তাকে জানালাম যে আমার প্রায় হয়ে এসেছে। সে আমায় ভুঁইয়ে বসবার জায়গা ক'রে দিয়ে বললে, "আমার পাঁজরাগুলো তোমায় সহজে ভুলবে না।" আরাম ক'রে ম্যাচ্ দেখে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলাম।

কোন রকম জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জাতি-বিদ্বেষ সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য জিনিস। তাছাড়া, সেকালের যা সমস্যা ছিল আজকের সমস্যা তা নয়। সুতরাং আমার গল্প থেকে আজকের প্রযোজ্য কোন নীতি কেউ টেনে বের করলে আমার উপর অবিচার হবে। যে কালের কথা আমি বলছি তখন ব্যায়াম চর্চ্চার দরকার ছেলেদের মনে খুব জেগে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বেই শোভাবাজার ক্লাব ফুটবলে আর টাউন ক্লাব ক্রিকেটে অনেকটা এগিয়ে গেছল। আমাদের সময়ে প্রথমে মোহনবাগান, পরে ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে নামল। বুট প'রে খেলা চলে গেল প্রধানতঃ ন্যাশনালের উদাহরণে। নন্দলাল শুধু-পায়ে shinguard পরা দুচারটে পা ভাঙ্গার পর ভয় ভাঙ্গতে লাগল। ক্রমে বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব খেলার ধারা তৈরী হয়ে উঠল। শোভাবাজারের right wing, বড়বাবু, অবশ্য চিরকালই শুধু-পায়ে খেলতেন। ক্রিকেটে বাঙ্গালী কখনও বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। তবু ঢাকার সুধন্বা বাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি ক'রে গেলেন। যতীনবাবুর (বাখড়ার) বিখ্যাত সেকেলে underhand (তিনি বলতেন,

ছেঁচড়া) bowling প্রমদারঞ্জনের scientific bowling-এর সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। ক্রিকেট খেলায় একটা নীরব সাধনার দরকার। হয়ত সেটা বাঙ্গালী প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফুটবলে কিন্তু যে গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো বোধহয় বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। উপরন্তু ফুটবল-প্রীতির আর একটা কারণও দেখা যেত। আমাদের অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস ছিল কেল্লার গোরাদের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ, বলপরীক্ষা। এই কেল্লার গোরা আমাদের চোখে ছিল মূর্ত্তিমান পশুবল। এদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না হলে নিজেদের পশুবলের উৎকর্ষ সাধন কি ক'রে হবে! এমনও দেখেছি যে ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা ব'সে ব'সে হিসেব করছে কে কটা গোরাকে আছাড় দিয়েছে। যেন সেটা গোল দেওয়ার চেয়েও দরকারী জিনিস! শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে দর্শকের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ ঘায়েল করতে পারতেন ব'লে। বাঙ্গালীর ঘুষো খেলা তখন সবে সুরু হয়েছে। তবু ওটা যে কলকাতার নিত্য জীবনে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস তা সকলেই বুঝত। শেখার সুযোগের অভাব ছিল। যারা খুব উৎসাহী তারা অনেক পয়সা গুজে কেল্লায় শিখে আসত। পাঠককে একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার যে বর্ত্তমান লেখক সব খেলা খেললেও নিতান্তই হাতুড়ে চিরদিন।

আমি যে বছর কলেজে ঢুকলাম তখন পর্য্যন্ত কলেজ ক্লাব ছিল না। ক্রমশঃ সেটা গ'ড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকের এত অভাব ছিল যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্লাবটাকে জমকাল করতে পারি নেই। খেলা সম্বন্ধে প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে আনতে হত অন্য বড় বড় ক্লাব থেকে। যাই হোক, ক্রমশঃ আমাদের নিজস্ব খেলার দল খাড়া হল, দুচারটে ম্যাচও খেলা হতে লাগল। ফুটবলের রঙ্গীন জামা তৈরী হল। এখন দেখতে পাই আমাদের অত সাধের লাল নীল রঙ্গের বদলে কলেজ টীম নিতান্ত prosaic নীল রঙ্গের জামা পরেন। রঙ্গীন জামা প'রে প্রথম ম্যাচটা আমার বেশ মনে আছে। আমি ব্যাকে খেলছিলুম। হটাৎ এক ষাঁড় দূর থেকে জামার ঝকঝকে গোলাপী রঙ্গ দেখে আমাকে শিঙ্গে চড়াবার মৎলব ক'রে চড়াও হয়ে এল। আমার নজর ছিল বলের দিকে। গোলকীপার তাড়াতাড়ি গোলের ডাণ্ডাটা খুলে নিয়ে ষাঁড়কে মেরে আমায় রক্ষা করলেন। কাজটা সহজে হল না। কথায় বলে, red rag to a bull। আমাদের বড় সাহেব পয়সার বেশ সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। প্রথম কড়া নিয়ম জারী হল যে বিকেলে সবাইকে কসরতের আখড়ায় হাজিরা দিতেই হবে। তারপর হুকুম হল যে যারা ক্লাবে খেলবে তাদের

কসরৎ না করলেও চলবে। শতকরা আশী জনের অঙ্গ সঞ্চালন করার কোন ইচ্ছাই ছিল না, কি ক্লাবে, কি আখড়ায়। কিন্তু তাদের ক্লাবে ঢোকার পথ আমরা বেশ সুগম ক'রে দিলাম। ফটকের কাছে খাতা হাতে ধরণা দেওয়া নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। এই রকম ক'রে যত টাকা সংগ্রহ হত, বড় সাহেব সরকার থেকে আবার তত টাকা মঞ্জুর করতেন। এত সুবিধা না ক'রে দিলে ক্লাবটি আঁতুড়েই মারা যেত। গ্রিফিথস্ সাহেব আমাদের সুখ দুঃখ বুঝতেন ব'লেই তাঁকে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। ছেলেপিলে ত একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে।

এই ফুটবলের নেশা কিন্তু সবাই ভাল চোখে দেখতেন না। একদল কর্ত্তা-ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বলতেন হাডুডু, কপাটি, গুলি-ডাণ্ডাই বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশস্ত। বিদেশী খেলায় তার কিসের দরকার। আর একদল আবার এঁদের চেয়েও গোঁড়া। তাঁদের মতে আড্ডা মাত্রই ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, তা সে তাসের আড্ডাই হোক, আর ব্যায়ামের আড্ডাই হোক। ওসব স্থানে গেলে ছেলেরা সিগারেট খেতে এবং শা— ব'লে গালাগাল দিতে শেখে। এই মর্ম্মে একবার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এসব কুসংস্কার যাঁরা ভেঙ্গে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান আমার বন্ধুরা। ভূ— মালকোঁচা মেরে ফুটবলেও যেতেন, পরীক্ষাতেও ফার্ষ্ট হতেন। পরের জীবনে চাকরে মানুষের কাম্যলোকে উঠেও তার মোহনবাগান-প্রীতি মন্দা হয় নেই। সুহৃদ ন—রও ঐ দশা। তাঁকে আদালত ছাড়া কোন ব্যাপারে পাওয়া কত কঠিন তা সবাই জানেন। অথচ ক্রিকেট, ফুটবল, কি সাঁতারের স্থানে দরকার হলে এটর্ণি ফিরিয়ে দিয়েও তিনি সেখানে হাজির হন। আবার আমার মত মানুষও ছিল যারা খেলার হুজুগে পরীক্ষা ভাসিয়ে দিলে, আর বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত খেলা খেলা করেই কাটিয়ে দিলে। মোটের উপর আমাদের মধ্যে দেহচর্চ্চার (দেহতত্ত্বের নয়) হাওয়াটা জোর বয়েছিল। তবে আমাদের হাত পা ছোঁড়াই সার হল, সাফল্য পেলে পরবর্ত্তী ছেলেরা।

কলেজে একটা Debating Society ছিল, যেখানে নানাবিষয়ে তর্ক বিতর্ক হত। আমাদের দলের কেউ সেখানে বিশেষ নাম করেছিলেন ব'লে মনে নেই। এটা আশ্চর্য্য, কেননা আমাদের অনেকেই পরের জীবনে হাইকোর্টে বক্তৃতা ক'রে যেমন জজকে তেমনি মক্কেলকে অক্লেশে ঘায়েল করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় যে এক প্র— ছাড়া রাজনৈতিক সভায় কেউ সুবিধা করতে পারেন নেই। আমাদের ঠিক আগের দলের সুরেন মল্লিক, নীরদ চাটুয্যে প্রভৃতি বেশ ভাল বক্তা ছিলেন। এই তর্ক-সভার কর্ত্তা ছিলেন উইলসন সাহেব। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাদের

সঙ্গে খুব মিশতেন। আমাদেরও তাঁকে খুব ভাল লাগত। কিন্তু কি হল কে জানে, আস্তে আস্তে ছেলেরা তাঁর ওপর নারাজ হয়ে গেল। শেষ একদিন হল কি, তিনি হোষ্টেলে যে ঘরে ঢুকতে লাগলেন, ছেলেরা জাত যাবে ব'লে তাদের জলের কুঁজো ফেলে দিতে লাগল। এই নিয়ে একটু গোলযোগও হয়েছিল। একদিন আমাদের সভায় হিন্দুর বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে তর্ক হচ্ছিল। আমি হিন্দুর বিলেত গেলে জাত যায় এই মর্ম্মে আমার সাধ্যমত একটা ছোট-খাটো বক্তৃতা করলাম। উইলসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। সভার পরে তিনি বাইরে এসে মহা গরম হয়ে আমায় বললেন, "তোমরা সবাই hypocrite, মনে এক, মুখে এক। তুমি নিজে বছরখানেক বাদে বিলেতে যাবে, অথচ আজ সভায় বললে বিলেত যাওয়া উচিত নয়। সেদিন হোস্টেলের ছেলেরা হঠাৎ এমনি হিন্দু হয়ে উঠল যে আমি ঘরে ঢুকতেই তাদের জল নষ্ট হয়ে গেল।" আমি নিবেদন করলাম, "স্যার, হোষ্টেলের কথা আমি জানি না, আমি সেখানে থাকি না। কিন্তু তর্ক-সভায় তর্কের খাতিরে মানুষ যা বলে সেটা তার মত ব'লে কেউ ধরে না।" তাতেও সাহেব ঠাণ্ডা হলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক লিটল্ সাহেব। তাঁর বদ মেজাজী ব'লে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তর বড় ভাল ছিল। তিনি উইলসনকে একটু চেঁচিয়েই বললেন, "এ তুমি কি রকম কথা কইছ? আমাদের কেম্‌ব্রিজ, অক্‌সফোর্ডে কি হয়? ইউনিয়ানের সভায় যার যেদিক ইচ্ছা তর্কের সময় ত সেইদিক নেয়।" তখন আমিও সুবিধা পেয়ে উইলসন সাহেবকে বললাম, "মশায়, আর এক কথা, আপনি জাত তুলে গালাগাল দেন কেন? যা বলবেন আমাকে বলুন, তোমরা তোমরা তোমরা করেন কিসের জন্য?" লিটল সাহেব বল্‌লেন, "খুব ঠিক কথা। সেদিন আমি এই ছোকরাকে দুষ্টুমি করার জন্য ধরেছিলাম। ওর বাঁদরামীর জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে বাঁদর বল্‌লে অবশ্য দোষ হবে।" আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না। আমরা এম এ ক্লাসে এক বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেছিলাম। সেখানে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান, তাঁরাও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তেন।

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। সেইজন্য বি এ পাশ হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা থিয়েটার দেখার অনুমতি পাই নেই। বাই নাচ দেখা ত ইহজীবনে হল না। কিন্তু দুবার বিলেত থেকে ইংরেজী কোম্পানী এসেছিল শেক্স-

পীয়ারের নাটক প্রয়োগ ক'রে দেখাতে। একবার Milne, আর একবার Potter-Bellew। সে অভিনয় আমরা অনেকবার দেখেছিলাম। বাড়ী ও কলেজ দু জায়গা থেকেই, শুধু অনুমতি নয়, আদেশ পেয়েছিলাম। এই সব কোম্পানীর অভিনেত্রীরা সাধুচরিত্র, এদের দেখলে দোষ নেই, এই বোধহয় অভিভাবকদের সংস্কার ছিল। এ সংস্কারটা যে নেহাৎ কুসংস্কার তা অনেক পরে জানলাম। কিন্তু যেদিন আমরা হ্যামলেট দেখতে প্রথম যাচ্ছি, আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, তবে যে তোদের থিয়েটার-দেখা বারণ ?" আমি তখন উত্তর দিলাম, "সে বাঙ্গালা থিয়েটার।" মা বল্‌লেন, "কে জানে, বাবু ? বাংঙ্গলা ইংরেজীতে কি এসে যায় ?" মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অনেক logical, ন্যায়সঙ্গত, হয়ে থাকে। তখন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয় এই ইংরেজী অভিনেত্রীদের বিলেতেই এত নীচ জাতি মনে করত যে গির্জ্জায় সাধারণ কবরস্থানে এদের মাটি দেবার হুকুম ছিল না। মোট কথা, আমাদের সময়ে কলকাতা সমাজে একটা শুচিবাই বেশ প্রবল ছিল।

রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা একটু বলি। কলকাতার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৮৯০ সালে। লর্ড রিপনের রাজত্বের ও ইলবার্ট বিলের জের তখনও চলছে। ছোট জাতের সাহেবদের যে নেটীব বিদ্বেষের কথা বলেছি সেটা এরই ফল। কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তখন বহু পুরাতন ব্যাপার। বছর পাঁচ-ছয় আগে বড়লাটের শুভ আশীর্ব্বাদ নিয়ে কংগ্রেস মহাসভার বোধন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মত দুয়েকজন নামকাটা সেপাইএর দৌলতে উক্ত মহাসভা সরকারের চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনা কারণে, কেননা কংগ্রেসের কর্ত্তারা নিরীহ জীব ছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। Consent Bill-এর দরুন যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল সেটা কতকটা অন্য ধরণের। তার মূলে একটা দুর্দ্দম জাতিবিদ্বেষ ছিল। সরকারও সেটা বুঝতেন। তাই বঙ্গবাসীর দলকে ধ'রে রাজদ্রোহের জন্য সাজা দিলেন। আমার দুজন সহপাঠী কলকাতা কংগ্রেসে সেবক হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁরা কলেজে বেশ প্রকাশ্যভাবে বঙ্গবাসীওয়ালাদের নিগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করতেন। কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ তখন বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এঁদের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের

অনেক কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে যেমন এক পলিতিক দল উঠে আস্তে আস্তে দুরকমেরই গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমাদের কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিকদল হিতবাদী কাগজ বের করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন দুই গোঁড়া দলকে "হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ" শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আকাশ ছেয়ে ফেললে। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ দুই রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিতবাদীর দল রইলেন না, কারণ হিতবাদী প্রথম দুই একজন সম্পাদকের পরেই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এরকম কেউ আমাদের সময় ছিল না। যারা ইংরেজকে শত্রু ভাবত তারাও বিক্টোরিয়াকে মহারাণী ব'লে মানত। এটা খুব স্পষ্ট বোঝা গেছল কয়েক বছর পরে। মহারাণীর মৃত্যু হলে গড়ের মাঠে যে অপরূপ দৃশ্য সে সময় একদিন দেখা গেছল, তার একমাত্র মানে এই হতে পারে যে জনসাধারণ রাণী বিক্টোরিয়াকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। সেই দৃশ্য দেখেই ত লাট কার্জ্জন বলেছিলেন, "If it is real, what does it mean ?" ১৮৯৫ সালে ইংলিসম্যান কাগজে এক উড়ো চিঠি, A Rampant Epistle, নামে ছাপা হয়। সে চিঠির লেখককে ধরলে দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ এ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া চলত। কিন্তু একটা মস্ত ভাববার কথা হচ্ছে এই যে তাতে সম্পাদকের জাত ভাইদের বলা হয়েছিল, "তোমরা স'রে পড়। আমরা মহারাণীর নামে এদেশ শাসন করব।" অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর পাগলাদের মনেও তখন ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার ভাব আসে নেই। চিঠিখানা নিতান্ত নগণ্য, তবে ইংলিশম্যান তার খুব সদ্ব্যবহার বছরখানেক ধ'রে করেছিলেন। আর দেশী কাগজওয়ালারা সেটাকে ইংলিশম্যান আফিসের জাল ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। কেননা ওরকম সংযত পাগলামীও তাঁদের কল্পনার বাহিরের জিনিস ছিল। চিঠিটা জাল নয়, কারণ তার খসড়া আমি দেখেছি। পাঠকের মনে একটা ধারণা ক'রে দিতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের ছাত্র-জীবনে রাজনৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নেই। কে জানে, হয়ত সে হাওয়াকে সময় থাকতে কল চালানোর কাজে জুড়ে দিলে, আজ ইউরোপের ঝঞ্ঝাবায়ু এদেশ বিধ্বস্ত করত না।

রাজনীতি চর্চ্চা আমার অধিকারের বহির্ভূত। মাঝে মাঝে লোভে প'ড়ে গণ্ডী পার হয়ে যাই, পরে পস্তাতে হয়। এই বেলা আর একটা গল্প জুড়ে দেওয়াই ভাল। আমরা কলেজে থাকতে বোডিসিয়া ব'লে এক রণতরী গঙ্গায় এসে লাগল। পেছনে পেছনে এল একটি ছবির মত

সুন্দর টরপিডো বোট, নাম মারাথন। এই তুই জাহাজের মাল্লারা শহরের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধবধবে সাদা কাপড়, হাসিহাসি মুখ, হেলেদুলে চলন, দেখে আমি ত মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হত এইসব লোক নিয়েই দোর্দ্দণ্ড বোডিসিয়া একদিন রোমানদের হায়রান ক'রে তুলেছিলেন, এরাই হয়ত মারাথনে ইরানের দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহকে হটিয়ে দিয়েছিল। একদিন এদের মাত্র তুজন আমাদের চুনাগলির পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন মেটে সাহেবকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। আমাদের বাড়ীর পাশে এক চেলা কাঠের দোকান ছিল সেইখান থেকে ক্ষেপনীয় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে শত্রুদের উপর বর্ষণ করতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! যুদ্ধজয়ের পর কাঠের দোকানে গিয়ে, আবার একটা দশ টাকার নোট খেসারত দিয়ে গেল। আমি স্থির করলাম এরা সাহেবের সেরা, এদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পরদিন তুজন মারাথনের মাল্লাকে ধরলাম ইডেন গার্ডেনে। ব'সে ব'সে তারা আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলে। তাদের মাল্লার জীবন যে কি সুন্দর আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে। আমরা ধরলাম, "চল, তোমাদের জাহাজ দেখাও। আমরা টরপিডো বোট কখনও দেখি নেই।" একজন বললে, "আজ নয়, কাল এসো। জাহাজে উঠে আমাদের ডাক দিও। আমার নাম বার্বার, ওর নাম উড। মনে থাকবে? Barber is one who shaves, and Wood is something you can't shave with!"

পরদিন গেলাম। বড় জাহাজটা ত বেশ দেখা হল। কিন্তু মারাথনের সামনে যে গোরা পাহারা দিচ্ছিল সে ঢুকতে দিলে না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা খোট ছাড়লে না, "No orders!" ইতিমধ্যে খুব জরিঝব্বা পরা এক বড় সাহেব বোডিসিয়া থেকে বেরিয়ে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি স্বয়ং নৌ-বহরের অধিনায়ক। তাঁর কাছে নালিশ করলাম। তিনি গোরাটার সঙ্গে কথা কয়ে এসে খুব ভদ্রভাবে বললেন, "তোমরা নেটীব কাপড় প'রে এসেছ তাই ঢুকতে দিচ্ছেনা। ও কেল্লার গোরা, ওর ওপর আমার কোন অধিকার নেই। I am sorry, boys!" তবু দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে। সাহেবদের মজলিসে আমাদের কত হোমরা-চোমরা কর্ত্তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তীর্থের কাকের মত, আমাদের কিসের লজ্জা! আমরা প'রে এসেছিলাম গরম ইজার আর সার্জের গলাবন্ধ কোট। অর্থাৎ আমাদের অফিসকা কাপড়া। তাকে বললে কিনা নেটীব ড্রেস! হঠাৎ দেখি তুই বন্ধু বেরিয়ে আসছেন মারাথন থেকে। তাঁদের আমাদেরই মত পোষাক, শুধু মাথার উপর, আমরা

যাকে monkey cap বলতাম, সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তাদের শিরস্ত্রাণ চেয়ে নিয়ে আমরা মাথায় দিলাম। গোরাটা হেসে বললে, "এই ত এইবার বেশ সাহেবী কাপড় হয়েছে, চলে যাও ভেতার।" ভেতরে গিয়ে আমাদের সেই দুই বন্ধুর সন্ধান করলাম। তারা এক গাল হেসে উঠে এল, ঘুরে ঘুরে আমাদের সব দেখালে। চা খাওয়ালে, সিগারেট দিলে পর্য্যন্ত। আসবার সময় আমার ভাই দুটো টাকা তাদের দিতে গেল তারা কিছুতেই নিলে না। বললে, We don't rob boys। পরের জীবনেও মানোয়ারী গোরাদের সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে বড় আনন্দ পেয়েছি। একেবারে ছোট ছেলের মত প্রকৃতি। গল্পটা থেকে পোষাকের মাহাত্ম্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হল ত? আমার ত হয়েছিল। ঘটনাটা আমার স্মরণীয় কেননা জীবনে সেই প্রথম ইউরোপীয়ান ড্রেস পরা। একবার কাশী বেড়াতে গেছলাম সেখানেও পোষাক-বিভ্রাট ঘটেছিল। ব্যাস-কাশীতে রামনগরে কাশী-নরেশের কেল্লা। সে কেল্লার অনেক স্তুতিবাদ শুনে দেখতে গেলাম। কিন্তু ফটকের প্রহরী আটকে দিলে। বললে, "নাঙ্গা শির অন্দর যানে কা হুকুম নেহি।" তাড়াতাড়ি মলমলের টুপী জোগাড় ক'রে আনিয়ে প'রে কেল্লা দেখা হল। বাঙ্গালীর মাথাকে এত ভয় কেন সকলের?

১৮৯৫ সালে রাজদরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। মহারাজের হুকুম এল যে আমি বড় হয়েছি, এবার আমাকে যথারীতি তাঁর দরবারী হতে হবে। কুচবেহারে গেলাম। আবার পোষাক-বিভ্রাট! আমার সে সার্জের গলাবন্ধ কোর্ত্তা ত চলবে না। চুড়িদার পায়জামা ও আঙ্গরাখা প'রে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে গিয়ে দরবারে হাঁটু গেড়ে বসলাম। যখন ডাক পড়ল তিনবার কুর্ণিশ ক'রে রাজসিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আতর-মাখা রুমালের উপর এক আশরফি রেখে মহারাজের সামনে ধরলাম। তিনি ঈষৎ হেসে আমার নজর স্পর্শ করলেন। আবার কুর্ণিশ ক'রে পিছু হেঁটে নেমে এলাম। রোমান্টিক প্রকৃতি হওয়ার অনেক জ্বালা! নিজের আসনে ব'সে একটু ক্ষণ চোখ ঢেকে রইলাম। সব যেন বেঠিক হয়ে গেছে। কোথায় রয়েছি, এ কোন শতাব্দী, কে রাজা, কে আমি? চকিতের মত মনে হল যেন আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। তবে স্বপন আর কতক্ষণ থাকে।

কলকাতার অনেক কথাই আমার বলা হল না। প্রথম যখন আসি তখন খুব কম লোকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। যে কজন চিনতাম তাঁরা আমাদের আত্মীয়, আমাদের জেলার লোক। তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশবাবু ও ক্ষুদিরামবাবু। দুজনেই অধ্যাপক ছিলেন, আর দুজনেই জানতেন যে ছেলেপিলের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, পুরোমাত্রায় কি

ক'রে আদায় করতে হয়। সকলের হেনস্তার জিনিস ধুতিকে যাঁরা আজ সম্মানের পদবীতে তুলেছেন গিরীশবাবু তাঁদের মধ্যে প্রধান। সেকালের বিলেত-ফেরৎ, কিন্তু ফিরে এসে অবধি একদিনও ইজার পরেন নাই। অথচ তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে কোনদিন নড়বড়ে ঢিলেঢালা মানুষ বলতে পারে না। ক্ষুদিরামবাবু নামে হিন্দু হলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, যাঁরা কখনও খোসামোদ করতেন না, মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার জানতেন না। এ দুজনের কাছে ছাত্রজীবনে অনেক আশীর্ব্বাদ, অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আমার বিবাহসূত্রে কলকাতার অনেক বনেদীঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা হল। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। সেকালের কলকাতার exquisites, সেকালের কাপ্তান, আজ আর নেই। একদিন তাঁদের কথা বলব। হয়ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব। তাতে পাঠক যদি আমায় ধামাধরা বলেন তাহলেও রাগ করব না।

আমার ছাত্রজীবনের যথার্থ গুরুর নাম এইবার করব। তাঁর কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখতে পেরেছিলাম বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু আরও অনেক জিনিস শিখেছিলাম যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরে। তাঁর নাম বললে অনেকেই চিনবেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বিলেতে পাশ করি তিনি লিখেছিলেন, "এত আমার গুরুদক্ষিণা হল না, বাবাজী। সেটা বাকী রইল, ভুলো না।"

আমার বিদ্যার্জ্জন-নামক প্রহসনের খুঁটি-নাটি চেপে যাওয়াই ভাল। কোনরকমে বিএ পরীক্ষার মোহানা পার হয়ে গেলাম, কিন্তু Post-Graduate নদী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা বানচাল! বন্ধুরা সকলেই বিজয়পতাকা উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জীবন সংগ্রামে যাত্রা করলেন। আমাকে নিয়ে আমার কর্ত্তৃপক্ষ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেকালে যদি কোন ছোট ছেলের কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগ হত না, তাকে কটন ইস্কুলে পাঠান হত, যদি না সে নিজের বুদ্ধির জোরে সরকারী reformatory-তে ঢুকে পড়ত। তেমনি একটু বয়স্থ ছেলেদের চালিয়ে দেওয়া হত বিলেতে, কেননা সেখানে তখনকার দিনে বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা যেত। আমার সার্ভিস পরীক্ষা পার হওয়া সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হলেন। কিন্তু তাঁদের আশা, পাস হয়ে যায় ভালই, নইলে ব্যারিষ্টার ত হবে। এদিকে আমি প্রাণপণ টানাটানি করছিলাম যাতে বিলেত না যেতে হয়। শেষে একদিন শুনলাম যে বিলেত যদি না যাই ত ডেপুটী কলেক্টর হতে হবে। হাকীমী আমার অদৃষ্টে বাজছে। ভাবলাম, তাই যদি হয় ত তপ্ত বালির পূজা কেন করি, দীপ্ত সূর্য্যের উপাসনা করা যাক। বাবাকে জানালাম

যে আমি বিলেত যেতে রাজী আছি। এর ভেতর আর একটা কথা ছিল সেটা প্রকাশ করি। ব্রেজিলের সেনানী সুরেশবাবুর নাম সকলেই শুনেছেন। তাঁকে আমি খানদুই চিঠি লিখেছিলাম আমায় সেই দেশে একটা গতি ক'রে দিতে। মনে করলাম, বিলেত থেকে ব্রেজিল যাওয়া সোজা হবে। কিন্তু অদৃষ্ট কি এড়ান যায়? আমি ছমাস কাল bar-এ জমা দেওয়ার টাকাটা ধ'রে রাখলাম। শেষে শুনলাম সুরেশবাবু মারা গেছেন। সেপাইগিরি অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে? এত কথা ত আর কলকাতায় থাকতে জানতাম না। কাজেই শ্বেতদ্বীপে পাড়ি জমাবার জোগাড়যন্ত্র করতে লেগে গেলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও সম্পত্তির স্বরূপ

চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। তার মধ্যে কারা যেন সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলছে। আলো নেই, বাতাস নেই—পাতালপুরীর মূর্চ্ছাহত জীব অঙ্গারের মত নিঃশ্বাস ফেলছে। চক্ষে তাদের ধ্বংসের ইঙ্গিত, কশ বয়ে উত্তপ্ত শোণিত ঝরে পড়ছে, পাতালের ক্লেদ গায়ে মেখে দংশন করতে উদ্যত, গরলের ভার বহন করতে পারছে না, শুধু উন্মত্ত জিঘাংসায় পাষাণের গায় আছড়ে পড়ছে।

অন্ধকার গুহার মুখে প্রভাতের আলো দেখা যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হয়ে এল। দূরে ধানভরা মাঠে প্রকৃতির নবান্ন-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, প্রকৃতির বুক রসভারে ভরে উঠছে। বর্ষার জলভরা নদীর সে উদ্দামতা নেই—তীরের কারাশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবার তপস্যা তার শেষ হয়েছে। গুহামুখে প্রভাতী গান শোনা যাচ্ছে, "জীবন মরণ-জয়ী হে রহস্যময়ী দ্বার খোলো, খোলো দ্বার।"

জীবন-নাট্যের এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাবার চেষ্টা যুগযুগান্তর ধরে চলছে। প্রকৃতির জীবনে যে মঙ্গল-রূপটি ফুটে উঠছে তা মানুষের জীবনে সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল না। মানুষ অনাদিকাল থেকে সেই রহস্যময়ীর দ্বারে করাঘাত করছে কিন্তু ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলার অবসান বুঝি কখনও হবে না।

কিন্তু রহস্যময় জীবন-নাট্যের আর একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে যা আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। পাতালপুরীর পাষাণ-ভিত্তির উপর একটা হাস্যমুখর সোনালী রাজ্য গড়ে উঠেছে। সেখানে কত রঙ, কত ঐশ্বর্য্য, কত সহস্র প্রকারের বিলাস-সজ্জা—সেখানে মানুষের কামনার অন্ত নেই, কর্ম্মপ্রেরণার শেষ নেই—এ যেন সর্ব্বগ্রাসী বর্ণবিলাসী দানবের স্বর্ণপুরী।

তিনটি দৃশ্যের এই যে অপূর্ব্ব নাট্য এর যবনিকা কেমন করে পড়বে তা এই নাট্যের নাট্যকারই জানেন। কিন্তু মানুষকে এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে হবে এটাই হল চিন্তার দিক দিয়ে তার নবযুগের সাধনা।

একটা কথা কিন্তু খুব সহজেই মনে আসে; সেটা এই যে পাতালপুরী ও স্বর্ণপুরী এই দুটোই মানুষের সৃষ্টি। স্বর্ণপুরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাতালপুরীর অন্তঃস্থলে। স্বর্ণপুরীর মানুষ তার জীবনের রস ও সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করছে অস্বাভাবিক উপায়ে এবং ভোগও করছে অস্বাভাবিক উপায়ে। এ যেন খনির মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থ আহরণ করা। যা

যায় তার ক্ষতিপূরণ নেই। বৃক্ষ যেমন করে পৃথিবীর গোপন স্তর থেকে রস আহরণ করে তেমন করে জীবনীশক্তি আহরণ করার কোন ব্যবস্থা নেই। তা যদি থাকত তা হলে মানুষের জীবনে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা দেখতাম না, তার ভোগ ও কামনায় এতখানি শক্তিক্ষয় ও অপচয় দেখতাম না, তার জীবনে পরদেহাশ্রিত পরান্নজীবী parasitic-এর ঘৃণ্যতাও দেখতাম না।

গ্রীক দার্শনিক Aristotle মানুষের জীবনের এই অস্বাভাবিক কার্য্যে পরিণতির একটা কারণ নির্দ্দেশ করেছিলেন। ভোগ জিনিষটা মানুষের ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ। ভোগের মধ্যেই তার কল্পনা, সুকুমারবৃত্তি, শিল্পসাধনা ও সৃজনীশক্তি মূর্ত্তি পেয়ে থাকে। তাই মানুষ অর্থনৈতিক জীবনে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে অথবা ব্যবহার করে সে সকলের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বটাকেই খুঁজে পায়। কিন্তু সমাজ-জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-বিনিময়ের (exchange) সুবিধার জন্যে যখন মুদ্রার প্রচলন হল তখন থেকে দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হয়ে লাভ ও লোভনিবৃত্তির উপায় হয়ে দাঁড়াল। নিজের পরিশ্রমে ধন উৎপাদন করার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি দেখতে পাই তা ক্রমশঃ লোপ পেলে এবং সমাজের অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাধারণের স্কন্ধে ধন উৎপাদন করবার ভার চাপিয়ে দিয়ে অবসর ভোগের চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক অনৈক্যের সৃষ্টি হল এবং সমাজের স্তরবিভাগে এই অনৈক্যটা বদ্ধমূল হয়ে দেখা দিল।

কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরাজী প্রবন্ধে এই সমস্যার আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মত হচ্ছে এই যে সমাজ-জীবনের অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থায় property ছিল মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির বাহন-স্বরূপ, উহা সমাজের সংযত শক্তিকে জাগিয়ে রাখত এবং সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে নিয়োজিত হতে পারত। এই অবস্থাটা Aristotle যাকে মুদ্রা-প্রচলনের পূর্ব্বের অবস্থা বলেছেন সে অবস্থা কখনই নয়; কারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় property জিনিষটা সঞ্চিত ও সংহতরূপে দেখা দেয় এবং তখনই সেটা একটা institution বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতে পারে। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটাকেই মানুষের সহজ জীবন যাপনের অবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন। তারপর তিনি বল্‌ছেন যে magnanimity ও extravagance এই দুটো প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং প্রাচীন কালের রাজাদের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও অতিরিক্ত ব্যয় এই দুটো প্রবৃত্তিরই চরম প্রকাশ। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলে ভুল করলে চলবে না। এই অমিতব্যয়িতার মধ্যে নাকি বিংশ শতাব্দির ক্ষুদ্র মানুষের স্বার্থপর

লোলুপতা নেই, কারণ সেকালে property জিনিষটা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং সমষ্টির মঙ্গলসাধন করত।

তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বা আদর্শবাদের দিক দিয়ে institution of property-র সমর্থন করা খুব শক্ত নয়। এ সম্বন্ধে দার্শনিক Green-এর মতবাদ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববাদিসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। Green-এর মতে property-টা হচ্ছে "realised will" অর্থাৎ বহির্জ্জগতে আত্মোপলব্ধির বাহ্য প্রতীক। "Will" কথার অর্থ সাধারণ ইচ্ছা নয়—will বল্‌তে তিনি ধরে নিয়েছেন একটা "constant principle in virtue of which each seeks to give reality to the conception of a well-being which he necessarily regards as common to himself with others"। অর্থাৎ মানুষ অন্তরে যেটাকে সত্যি সত্যি শ্রেয় বলে মনে করে সেটা সাধারণভাবেও শ্রেয় বটে, কারণ ব্যষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের সহিত সমষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের কোন বিরোধ নেই—এই শ্রেয়কে মানুষ বহির্জ্জগতে উপলব্ধি করে property-র মধ্য দিয়ে। মানুষ যে property-কে কামনা করে তা শুধু আধিভৌতিক জীবনের অভাব নিবৃত্তির জন্য নয়—"it is different from mere provision to supply a future want"। Property শুধু "instrument of satisfaction" নয়—উহা "instrument of expression"-ও বটে এবং সেই হিসাবে property হচ্ছে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই মানুষের একটা অপরিহার্য্য অংশ।

পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠানের মূলেই এমন একটা আদর্শ থাকে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা। কিন্তু সমাজ-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যে কোন প্রতিষ্ঠান তার আদর্শসম্মত রূপ গ্রহণ করতে পারে না অথবা হারিয়ে ফেলে। মানুষ শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়েছে সভ্যতার ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুবই পাওয়া যায়, এবং যা এক সময়ে ছিল শিব তা কালক্রমে বানরে পরিণত হয়েছে তারও পরিচয় আমাদের সমাজে খুবই মেলে। আদর্শবাদী Green আদর্শবাদের ঝোঁকে এই মোটা কথাটা ভুলে যাননি। তাই তিনি বলেছেন—"When one set of men are secured in the power of getting and keeping the means of realising their will in such a way that others are practically denied the power, in that case it may truly be said that property is theft"। বাস্তবিক ইতিহাসে institution of property-র বিকাশ ও বিবর্ত্তনের যে পরিচয় পাই তার থেকে একথা বলা চলে না যে property সমাজের

সমন্বয়শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছে অথবা মানুষের "realised will" বা সমষ্টির মঙ্গলের প্রতীক হতে পেরেছে। তাই সভ্যতার ইতিহাসকে Karl Marx-এর মত যাঁরা অর্থনীতির চোখ দিয়ে দেখছেন তাঁরা institution of property-র সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না।

রবীন্দ্রনাথ Green-এর মত যে শুধু আদর্শ বা তত্ত্বচিন্তার দিক্ দিয়ে property-র স্বরূপনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন তা নয়; তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রাচীনকালে বিশেষ করে আমাদের দেশে property জিনিষটা ব্যষ্টির ধন ও সমষ্টির মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল। তার কারণ এই যে ধনীর ধন সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কথাটা নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ এটা শুধু আদর্শবাদী দার্শনিকের উক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সভ্যতার কথা তুলেছেন, ইতিহাসের নজীর দিয়ে নিজের মতের সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন কালের property-র ঐশ্বর্য্যময় রূপটা প্রকাশ পেয়েছে extravagance-এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যাকে extravagance বলেছেন সেই স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীনকালের দেবমন্দির নির্ম্মাণে। প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের বিরাট সমৃদ্ধির মূল প্রেরণা এসেছে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে এ কথা তিনি বোধহয় অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যখন শুনি যে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য ও দরিদ্র ব্যক্তিও এই সমৃদ্ধির মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন কথাটা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। কবির রঙীন চশমা এঁটে যাঁরা প্রাচীন সভ্যতার ঐশ্বর্য্যরূপ নিরীক্ষণ করেন তাঁদের পক্ষে কথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত সহজ। আধুনিক যুগের যন্ত্রমূলক সভ্যতা সাধারণ মানুষের সৃজনীশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে এইরূপ একটা অভিযোগ কবি ও দার্শনিকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্থান কতটুকু ছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়। প্রাচীন craftsmanship বা শিল্পকৌশল আমাদের কবিত্বকে মুগ্ধ করে। হিন্দুর মন্দিরের কারুকার্য্য, বৌদ্ধের চৈত্যের গৌরবময় ঐশ্বর্য্য, মিশরের পিরামিডের বিশালতা, মুসলমানের তাজের শিল্প-নৈপুণ্য প্রাচীনকালের শিল্পসাধনার নিদর্শনরূপে আজও এই কলকারখানার যুগের মানুষকে বিস্মিত করে দেয়। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষ এই বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের সমৃদ্ধি থেকে বহু দূরেই অবস্থান করত। জনসাধারণ বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা চিরকালই সভ্যতার ভারবাহী পশু ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের Gothic শিল্প সম্বন্ধে Webb দম্পতি বলেছেন—"What a multitude of labourers quarried the stones and the stones of the cathedral walls

on which half a dozen skilled and artistic masons carved gargoyles"।

আধুনিক যুগে পারস্য দেশের rug ও carpet শিল্পের অসাধারণ সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বের উৎস খুলে দেয়। কিন্তু যখন ভাবি যে পাঁচ কিংবা ছয় বৎসরের শিশুকে দিনের মধ্যে বার-চোদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়ে এই carpet তৈরী হয়, যখন ভাবি শিশুর রক্তে এই carpet রক্তরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয় তখন মনে হয় যে এই Art-এর মধ্যে মানবজাতির মঙ্গল নেই। স্বর্ণপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবতে গিয়ে পাতালপুরীর দাসত্ব-জর্জ্জরিত দরিদ্র শ্রমজীবীর কথা কবিত্বের ঝোঁকে ভুলে যাওয়া খুবই সহজ। তাই মনে হয় যে তাজমহলের কবি কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল যে এক বিন্দু অশ্রুজল দেখেছিলেন সে অশ্রুজল শাজাহানের নয়—সে অশ্রুজল শত শত অত্যাচারিত মানুষের যারা সভ্যতার বা Art-এর ভারবাহী পশু বলে গণ্য হয়ে এয়েছে। প্রাচীনকালের যে extravagance বা স্বেচ্ছাচারিতা Art-এর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তাতে করে সাধারণ মানুষের বা সমষ্টির মঙ্গল সাধিত হয়েছিল এ কথা বিশ্বাস করা যায় না: কারণ এর মূলে ছিল exploitation, পরান্নজীবী parasite-এর জঘন্যতা —এর মধ্যে welfare বা সমষ্টির মঙ্গল কিছুতেই থাকতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রাচীন যুগের শিক্ষা, রোগীর সেবা, অন্নসত্র, রাস্তাঘাট এসবের জন্যে ধনীরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন; তাই তখনকার কালে property জিনিষটা ছিল সামাজিক কর্ত্তব্যবোধের প্রতীক ও বাহন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এই প্রকার সদনুষ্ঠানের প্রেরণা এসেছে ধর্ম্মের দুর্দ্ধর্ষ শাসন থেকে। সাধারণ মানুষকে exploit করে অবসরভোগী অভিজাতশ্রেণীর যে সঞ্চয় সেই সঞ্চয়কে ধর্ম্ম সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করেছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। ইউরোপেও মধ্যযুগে church-এর অক্ষুণ্ণ প্রভাব মানুষের অত্যাচারী প্রকৃতিকে কতক পরিমাণে প্রশমিত করেছিল এবং ধনীর social responsibility বা তার সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করে রেখেছিল। কিন্তু ধনীর exploitation বা শোষণ সমাজের কাজে লেগেছে বলেই তার সকল দোষ নষ্ট হয়ে গেল তা আর যে কেউ স্বীকার করুক অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ কখনই করবেন না। বাস্তবিক কোন প্রতিষ্ঠানের utility বা কাজে লাগাটাই আসল কথা নয়। তা যদি হত তা হলে যে ব্যক্তি সারা জীবন জুয়াচুরী করে এবং পরকে শোষণ করে ধন সঞ্চয় করলে সে যদি মৃত্যুকালে তার সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে দান করে যায় তা হলে তাকে দানবীর বলতাম। এই ধরণের দানটাই যে বড় জিনিষ নয় এইটাই

সকল দিক দিয়ে বোঝার সময় এসেছে। আধুনিক মানুষ এই প্রকার দানকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে চায়; কারণ যে সমাজ এই প্রকার দানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে সে সমাজকে কখনও সুস্থ ও সবল বলব না। ধর্ম্ম প্রাচীন যুগের ধনীর শোষণকে আপনার কাজে লাগিয়েছে; ঠিক তেমনি করেই তা মানুষের রক্তলোলুপ হিংস্র প্রকৃতিকেও কাজে লাগিয়ে শক্তিসক্ষম করবার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এই শোষণ-ব্যবস্থাকে দূর করবার চেষ্টা ধর্ম্ম কোন দিনই করেনি। ধনীর উপর আপনার সম্মোহিনী শক্তি বিস্তার করে ধর্ম্ম তাকে পদানত করেছে, আবার দরিদ্রকেও "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven", এই প্রকার মাথা পেতে অত্যাচার সহ্য করবার বাণী শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বীর্য্য করে রেখেছে। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সে প্রাচীন কালের বিরোধ, চাপা দিলেই তা নষ্ট হয় না এবং সেকালের শোষণজাত property কতকটা দরিদ্রের জন্য ব্যয়িত হত বলেই তা বড় হয়ে ওঠে না।

বাস্তবিক একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন সভ্যতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এতটা কাঁচা ছিল যে তার উপর একটা ঐশ্বর্য্যময় ইন্দ্রপুরী গড়ে তোলা বিশ্বামিত্রের স্বর্গসৃষ্টির মতই একটা নিরর্থক প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির রঙীন মায়ায় অন্ধ হয়ে property-র অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে ভুলে গেলে চল্‌বে না। অবসরভোগী অভিজাতসম্প্রদায় ও সাধারণ শ্রমজীবীর মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ সভ্যতার সকল স্তরেই দেখতে পাওয়া যায় সেই শ্রেণীবিভাগের উপরই প্রাচীন সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমেরিকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ Veblen বলেছেন যে এই শ্রেণীবিভাগের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মানুষের বর্ব্বর অবস্থায় যখন নারী ছিল দাসী এবং পুরুষ ছিল সেই সম্পত্তির ভোক্তা ও রক্ষক। ক্রমশঃ এই শ্রেণীবিভাগ সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। Property-র ভোগের মধ্যে যে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পায় একথা সে ভুলে গেল। Property বা সম্পত্তি সম্মান বা প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে উঠল। ধনসঞ্চয়ের মধ্যে মানুষের কর্ম্মপ্রেরণার যে বিচিত্র প্রকাশ তা অন্তর্হিত হল এবং property জিনিষটা অপরের উপর প্রভুত্ব করবার উপায় হয়ে দাঁড়াল। তাই Veblen বলেছেন, "By a further refinement wealth acquired passively by transmission from ancestors or other antecedents presently becomes even more honorific than wealth acquired by the possessor's own effort"। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিণতির একটা দিক আছে যা বিশেষ করে লক্ষ্য করার

জিনিষ। সেটা এই যে শ্রমবিমুখতাই ক্রমশঃ মানুষের কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল, কারণ বর্ব্বর মানুষ কায়িক পরিশ্রমকে দাসত্ব ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলে মনে করতে শিখলে। এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর একটা বড় জিনিষ গড়ে উঠতে পারে না। প্রাচীনকালের এই শোষণজাত সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ছিল এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল বালির ভিত্তি। এ যেন একটা অভ্রস্পর্শী পিরামিড্—যার চারিদিকে শুধু মরুভূমির তৃষ্ণা ও নগ্নতা। এই জন্যই সেই বর্ণবিলাসী যুগের রক্তরাঙা রঙ্গালয় মহাকালের ফুৎকারে বুদ্‌বুদের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। অতীতের উৎসবরাত্রির কত গান, কত নৃত্য, কত রঙ বেরঙের বাতি, নূপুরের রিণিঝিণি, সারেঙের স্বপ্নভরা তান—মোহমদির কণ্ঠে রূপসীর কত হাসিগান, মর্ম্মর হর্ম্ম্যবুকে কামনার তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা—এসকলই মসীলিপ্ত একাকার হয়ে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে।

বাস্তবিক property জিনিষটাই এমন যে তাকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখলে তা সমাজের সমন্বয়শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলে, তার সৃজনীশক্তির উদ্বোধনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই property-র ঐশ্বর্য্যরূপটা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। তাই তিনি বলেছেন, "Property is the objective manifestation of our taste, our imagination, our constructive faculties, our desire for self-sacrifice"। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে property-র objective manifestation-টা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। Veblen যাকে "conspicuous waste" বলেছেন সেই সুস্পষ্ট অপচয়ই প্রাচীন যুগের Art-এর মধ্যে অতিকায় হয়ে ফুটে উঠেছে। ভাবী কালের Art জীবনের সৃজনীশক্তির বাহন হয়ে উঠবে তখনই যখন property-টা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের লোলুপতাকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের দুর্ব্বল জাতিসমূহকে আপনার লোলুপতার যূপকাষ্ঠে বলি দেবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে আছে। তা ছাড়া আজকালকার সহরের সভ্যতাও পল্লীজীবনকে শোষণ করে বেঁচে আছে। কিন্তু এই শোষণ বা exploitation-এর সমস্যাটা আসলে সেই প্রাচীন কালেরই সমস্যা—এটাকে আধুনিক সমস্যা বললে ভুল করা হবে। পূর্ব্বে বলেছি যে প্রাচীনকালে ধর্ম্ম এই সমস্যাকে আপনার মন্ত্রবলে চাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মন্ত্রের আর সে শক্তি নেই, তাই exploitation-এর নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং ধনিক ও শ্রমিকের সেই আদিমকালের বিরোধটা নৃশংস হয়ে জেগে উঠেছে। আধুনিক

সভ্যতার বিপুল ঐশ্বর্য্য মানুষের সঙ্ঘজীবনের কর্ম্মচেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। তাই সাধারণ মানুষ আর সভ্যতার ভারবাহী পশু হয়ে থাকতে চায় না। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যে তার অংশ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Where the temptation of high living, normally confined to a negligible section of the community, becomes widespread, its ever-growing burden is sure to prove fatal to civilisation"। রবীন্দ্রনাথ যাকে high living বল্‌ছেন তারই ভিত্তির উপর প্রাচীনকালের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগে যে রাজসিক ভোগ-প্রবৃত্তি একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে এইটাকেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসের লক্ষণ বলে মনে করেন। কিন্তু এই high living চিরকালই পরদেহাশ্রিত parasite-এর ঘৃণ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা ভাবী কালের নূতন সমাজ গড়ে তুল্‌তে চান তাঁরা মনে করেন যে এই পরজীবিতার ধ্বংস হবে সর্ব্বসাধারণের অপব্যয় প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধের আলোচনা করছি সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরেই তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। রাশিয়ার নূতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্যোগ-পর্ব্ব চাক্ষুষ দেখে তাঁর কবিচিত্ত যে বিশেষ-ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার প্রমাণ "রাশিয়ার চিঠি"তে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার, অভিজাতশ্রেণীর মানুষ, তা ছাড়া তাঁর চুলও পেকেছে। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ রাশিয়ার প্রাচীন-সংস্কার-বিবর্জ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা দেখে পুলকিত হয়ে উঠবে এরূপ আশা করা অন্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাঁকে লোকে আর যাই বলুক Die-hard বলতে সাহস করবে না, কারণ তিনি নবীনের পূজারী, সত্যের পূজারী, সমাজের অন্ধ সংস্কার থেকে চিরকাল নিজেকে আশ্চর্য্যভাবে মুক্ত রেখেছেন। এত বড় মন নিয়ে তিনি রাশিয়ার নব-বিধানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রাচীন মতামত বদ্‌লেছে কি না এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে আমার প্রসঙ্গ শেষ করব।

রবীন্দ্রনাথ তার সর্ব্বপ্রথম চিঠিতে লিখেছেন, "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই।" তারপর বলেছেন, "আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হয়েচে এর কোন উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে

থাকার দরকার আছে।" তাঁর উক্তিটা পড়ে হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি Aristotle-এর মতই Philosophy of Leisure-এর ব্যাখ্যা করে পাতাল-পুরীর ভিত্তির উপর যে অবকাশের স্বর্ণপুরী গড়ে উঠেছে তারই মহিমা কীর্ত্তন করছেন। তিনি বল্‌ছেন, "জীবিকানির্ব্বাহ করার জন্যে ত মনুষত্ব নয়, একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে প্রায় এই প্রকার তর্কের সাহায্যেই Aristotle-এর মত অত বড় rational দার্শনিকও দাসত্বপ্রথার সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় culture-এর পূজারী কথাটাকে নিঃসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি বলছেন, "যাই হোক আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।" কবির এই উক্তি থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট করেই মনে হয়। সেটা এই যে কবির মনে একটা দ্বিধা ও সংশয় জেগেছে। Institution of property-র যে রূপটা রবীন্দ্র-নাথের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল সে রূপটা যে তার আসল রূপ নয় এরূপ একটা সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছে। Private property বা ব্যষ্টির ধনসম্পত্তিই আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। এই বৈষম্যের সমস্যাটা প্রাচীন যুগে এতটা প্রবল হয়ে ওঠে নি, কারণ ধর্ম্ম ও অন্ধ সংস্কার মানুষকে এই বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল এবং wealth বা ধন যে সমাজের সংহতিশক্তির ফল এ ধারণাটাও সর্ব্বসাধারণের মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু মূল সমস্যাটা চিরকালই রয়ে গেছে। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে "সভ্যতার পিলসুজ" বলেছেন তারা নীচের অন্ধকারকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে উপরের আলোর সন্ধানে। তাই "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে।" অবশ্য এ জিনিষটা রাশিয়ায় সম্ভব হয়েছে একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের সাহায্যে। যে সকল প্রাচীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার বৈষম্যকে সমর্থন ও পালন করে এসেছে সেই সকল সনাতন জিনিষকে রাশিয়ার বিপ্লবীরা "একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে।" অর্থনৈতিক জীবনে private property-কেও তারা জটে ধরে টান মেরে নির্ম্মূল করার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "সমস্ত মানব সাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ

করো—মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং—কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ।" Abolition of private property-র এই প্রকার সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু এই কথাটাকে শুধু একটা ব্যাখা বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। এই বিরাট আদর্শকে কবি খুব স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন, কারণ তিনি বল্‌ছেন যে "মা গৃধঃ" ও "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ"। উপনিষদের এই দুইটি কথার তাৎপর্য্য তিনি রাশিয়ায় গিয়ে স্পষ্ট করে বুঝেছেন। শুধু আদর্শের দিক দিয়ে নয় অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার দিক দিয়েও কবি private property-র অস্তিত্বের কোন সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। কবি বলেছেন যে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য অনেকের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকায় ধনের সে "পুঞ্জীভূত রূপ" যেখানে সবচেয়ে বড় করে চোখে পড়ে তাকে কবি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন। তার কারণ এই যে "এই সমৃদ্ধি যদি সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো তা হলে তখনই ধরা পড়তো, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাতকাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে (অর্থাৎ রাশিয়ায়) ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই—আছে অকিঞ্চনতা।"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অমরু-শতক

অমরু-শতক—অমরু কবির প্রেমের কবিতা।

কিন্তু প্রথমেই এক বিপুল সমস্যা—অমরু নামে নাকি কোনো কবি ছিলেন না এবং কবিতাগুলির রচয়িতা নীরস অদ্বৈতবাদী দার্শনিক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

এ জাতীয় অনুমানের কারণ কি আগে তারই আলোচনা করি—অবশ্য সংক্ষেপে।

মাধবকবির 'শঙ্করদিগ্বিজয়' নামে একখানি কাব্য আছে। শঙ্করাচার্য্যের জীবনের একটি চমৎকার রসাল উপাখ্যান এর এক স্থানে দেখ্‌তে পাই। শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত; উদ্দেশ্য মিশ্র-প্রবরকে তর্কে পরাজিত ক'রে স্বমতে অর্থাৎ অদ্বৈতমতে দীক্ষিত করা। মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী (শারদা)—ইনি নাকি নারীরূপিণী সরস্বতী—ক'রলেন পূর্ব্বপক্ষের উপস্থাপন। পূর্ব্বপক্ষটি আদিরসঘটিত। আজন্ম ব্রহ্মচারী শঙ্কর আদিরসের ধার ধারেন না। কিন্তু পরাজয়, বিশেষতঃ নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়, মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শঙ্কর একমাসের সময় নিয়ে বেরুলেন আদিরস চর্চ্চা ক'রতে। সুযোগও মিলে গেল। আকাশপথে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শঙ্কর দেখলেন মৃগয়া ক'রতে এসে হঠাৎ রাজা অমরক মারা গেছেন এবং তাঁর শবদেহ ঘিরে তন্বীতরুণী রাণীরা (সংখ্যায় একশ') আকুল হয়ে কাঁদছেন। শঙ্কর যোগবলে ঢুক্‌লেন অমরকের দেহে; ফলে রাজা উঠলেন বেঁচে। আদিরস চর্চ্চা চল্‌তে লাগ্‌ল অবাধে, অবিশ্রান্তভাবে—সময় মোটে একমাস। কাজ উদ্ধার ক'রে শঙ্কর রাজদেহ হতে বেরিয়ে এলেন এবং বলাই বাহুল্য, রাজার আবার মৃত্যু হলো।

এই ঘটনা হতেই অনেকের অনুমান শঙ্কর রাজা অমরকের নামে 'অমরু-শতক' রচনা ক'রেছিলেন।

অমরু নামে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এমন লোকেরও কিন্তু অভাব নেই। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁর 'ধ্বন্যালোক' নামে রসগ্রন্থে ব'লেছেন,—'তথা হি অমরুকস্য কবেঃ মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধাঃ এব'। আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন নবমশতাব্দীর লোক; কাজেই অমরু(ক) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী।

এতেও কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না, যেহেতু, শঙ্করও জন্মেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে।

আমার বিশ্বাস অমরু-শতক শঙ্করের রচনা নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে আদিরসের ব্যাপক বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না। নিতান্তই একটি

ক্ষণিক প্রয়োজনে এ সাধনা তাঁকে ক'রতে হয়েছিল—এ তাঁর জীবনের এক অতি আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনা, হয়তো বা তুর্ঘটনাই। নিষ্কাম সন্ন্যাসী যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের সঙ্গে একখানি সকাম শৃঙ্গারশাস্ত্রও জগৎকে উপহার দিয়ে যাবেন এমন মনে করাই অসঙ্গত।

অমরু-শতকের কবি হয়তো অমরুই। নাও যদি হয়, ক্ষতি কি? Shakespeare-ই লিখুন আর Bacon-ই লিখুন Hamlet Hamlet। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অমরু-শতকের আলোচনা।

গোড়াতেই বলেছি অমরুশতক প্রেমের কাব্য—ধারাবাহিক কাব্য নয়, কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক বা ওমরের রুবাইয়াতের মতন অসংবদ্ধ কবিতার মালা। কিন্তু সংখ্যা একশ' নয়, একশ' তুই এবং মতান্তরে একশ' তেষট্টি—নানান ছন্দে রচিত এবং সকলগুলিই চতুষ্পদী; কেবল একটি দ্বিপদী—অনুষ্টুভ্ ছন্দে লেখা।

মিলন, বিরহ, বাসকসজ্জা, অভিসার, খণ্ডিতা, মান প্রভৃতি বিচিত্র-বিষয় নিয়ে কবিতাগুলির রচনা; কিন্তু শৃঙ্খলা নেই অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ঐক্য নিয়ে কবিতাগুলি পর্য্যায়ক্রমে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো নয়। স্বকীয়া এবং পরকীয়া তুরকনেরই নায়িকা আছে। রসশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার যে নানানতর ভেদ দেখতে পাই, অধিকাংশ কবিতাতেই কৌশলে তার উপবর্ণন দেখা যায়। হিন্দীকবি বিহারীলালের 'সতসই'-ও এই জাতীয় শৃঙ্গাররসের কাব্য; তবে সতশই বড়ো বই—সতশই সপ্তশতীর অপভ্রংশ, যদিও বিহারীকাব্যে কবিতার সংখ্যা আটশর কম নয়। হয়তো বা বিহারীলালের ওপর অমরুর প্রভাব আছে। বাঙলায় অমরু প্রায় অপরিচিত; কিন্তু হিন্দুস্থানে তা' নয়। অমরু-শতকের একাধিক হিন্দী সংস্করণ আছে।

কোনো কবিতাতেই জয়দেবী মাধুর্য্য দেখলাম না এবং ছন্দও সব জায়গায় ভাবের অনুগত ব'লে মনে হলো না। প্রেমের কবিতার মার্ম্মিক মাধুরীর প্রয়োজনীয়তা যতখানি, রৌপিকেরও তার চেয়ে কম নয়। 'গীতগোবিন্দে' দ্বিতীয় লক্ষণই প্রবল। এদিকে গীতগোবিন্দ অতুলনীয়, অনুকরণের অতীত; এর 'কান্তকোমলপদাবলী' নাম সার্থক। কিন্তু ভাব ও রসের দিকে বড়ো অগভীর—ভক্ত নই বলেই হয়তো আমার এরকম ধারণা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তুটি লক্ষণই বর্ত্তমান।

কিন্তু ভাষায় ছন্দে ললিতমধুর না হলেও অমরু-শতক চমৎকার। চমৎকার এই জন্যে যে এতে ব্যঞ্জনালক্ষণ বেশী। তাই ব'লে প্রত্যেকটি কবিতারই যে এই সম্পৎ আছে, তা' নয়। তবে নিকৃষ্টশ্রেণীর কবিতার সংখ্যা কম। প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে যা নিত্য ঘটে এমন অতি সাধারণ অবস্থার বর্ণনা ক'রতে ক'রতে কবি একসময় তা'র ওপর এমন

একটি অপরূপ স্পর্শ দিয়ে দিয়েছেন, যা'তে অতি সাধারণ অসাধারণের পর্য্যায়ে উঠে গিয়েছে। এই dramatic touch অমরুর বৈশিষ্ট্য এবং এ প্রতিভা শ্রেষ্ঠ কবিদেরই থাকে। অনেক স্থলে কবি ইঙ্গিতে যে-রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, বাচাল ভাষার তা' স্বপ্নেরও অতীত। এই সব কারণে বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের আংশিক অভাবসত্ত্বেও, অমরু-শতককে চমৎকার না ব'লে উপায় নেই। ভাষা এবং ছন্দগত মাধুরী-সৃষ্টির শক্তি যে কবির ছিল না এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবং বিধোঽভূৎ
ইতি নিগদতি নাথে তির্য্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং নকিঞ্চিৎ॥'

এমন কবিতা অল্প হলেও আছে। কিন্তু মাত্র চারটি চরণের অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে একটি অখণ্ড ভাবকে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেওয়া কঠিন নয় কি ?

অমরু প্রেমের কবি এবং তাঁর প্রেম কামগন্ধহীন অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়। নারীপুরুষের যৌনসম্পর্কই তাঁর কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। অমরু-শতকের একমাত্র রস শৃঙ্গার এবং স্বকীয়া পরকীয়া দু'রকমেরই নায়িকার কথা থাকলেও পরকীয়ারই ওপর কবির টান বেশী। টীকাকার অর্জ্জুনবর্ম্মদেব আবার বলেছেন—'পরস্ত্রীগতোঽপ্যয়ং রসঃ···ন পাতকায়' এবং প্রামাণ্য ধরেছেন বাৎস্যায়নের বাক্যকে 'অন্যথা বাৎস্যায়নো মহর্ষিঃ··· পরস্ত্রীসাধনং কথং প্রণীতবান্ ?' অর্জ্জুনবর্ম্মদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ; তখন হয়তো ভারতের কোথাও পবিত্র সুনীতি সমিতির অস্তিত্ব ছিল না। শৃঙ্গাররস আদিরস—বৈষ্ণবমতে মধুর রস। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সকলেরই এই রসটির ওপর অল্পাধিক আসক্তি ছিল। তাঁরা জানতেন—'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।' কথাটা অতিশয় সত্য। শৃঙ্গাররসকে বাদ দিয়ে শ্রেষ্ঠকাব্য দুনিয়ার কোথাও রচিত হয় নাই, হতে পারেও না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সংস্কৃতকাব্যের বিচারভার এখনো আদালতের ওপর পড়ে নাই। এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো—রসোত্তীর্ণ শৃঙ্গারই আমার আলোচ্য। আমি সাহিত্যের কথা বল্‌ছি, sexology-র নয়। সত্যকার সাহিত্যিক ঐন্দ্রজালিক। তাঁর যাদুমন্ত্রে কদর্য্য সুন্দর হয়ে ওঠে। কুৎসিতকে তাঁরাও কুৎসিত বলেই জানেন এবং তার নগ্নতাকে মূর্ত্তি দিতে তাঁরাও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু জীবনে সুন্দর এবং কুৎসিত দুইই আছে আর সাহিত্যের অর্থ 'criticism of life' ; কাজেই সাহিত্যেও কুৎসিতের

স্থান আছেই। শিল্পী একে অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে এ থেকে যায় প্রচ্ছন্ন এবং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে সুন্দর। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী, মানসসুন্দরী, চিত্রাঙ্গদা সাহিত্য; রসরূপটি বাদ দিয়ে সাহিত্যের ভিতর থেকে যারা শুধু ক্লেদ উদ্ধার ক'রতে চায়, অর্থাৎ Oscar Wild এর ভাষায় 'those who find ugly meanings in beautiful things', তাদের নিজের মনেরই ক্লেদের ওপর আসক্তি আছে বলতে হবে, তারা নিজেরাই 'corrupt'। এই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মন নিয়ে যারা অমরু-শতক পড়তে যাবে, তাদের কাছে এ কাব্য নিশ্চয়ই অশ্লীল। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যরসিক যাঁরা, তাঁরা অমরুকে প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে গ্রহণ ক'রবেন।

কয়েকটি কবিতার বাঙলা অনুবাদ দিলাম। অনুবাদ মূলের অনুগত করবারই চেষ্টা করেছি, তবু মর্ম্মানুবাদ (বরঞ্চ free translation) বলাই ভালো। মূল শ্লোকগুলি পাদটীকায় ক্রমানুসারে দেওয়া হলো—

১। ওদের রাতের প্রেম-আলাপন
উচ্চকণ্ঠে উষায় কহিছে শুক;
পাশে গুরুজন—নবীনা বধূর
লজ্জায় হলো অরুণিত সোনামুখ;
কান হ'তে বধূ পলকে খসায়ে
টুকটুকে রাঙা পদ্মরাগের দানা
সমুখে ধরিল—দাড়িমের বীজ?—
তুলে নিল পাখী, অমনি নিমেষে মূক!

২। কোথায় চলেছ, অয়ি করভোরু, এই নিশীথে?
প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর মোর বক্ষের ধন যেথায় আছে।
একা পথে ভয়, তন্বী, তোমার লাগে না চিতে?
পাঁচখানি শর ধনুকে জুড়িয়া সঙ্গী যে মোর মদন আছে।

১। দম্পত্যোর্নিশি জল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ—
স্তৎপ্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদতঃ শ্রুত্বৈব তারং বধূঃ।
কর্ণালম্বিতপদ্মরাগশকলং বিন্যস্য চঞ্চোঃ পুরো
ব্রীড়ার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্ ॥১৬॥

২। কপ্রাস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বত কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥৭১॥

৩।　সখীরা আমায় ব'লে চ'লে গেল—
　　　'ঘুমায়ে পড়েছে, তুইও ঘুমা'।
আমি ধীরে ধীরে বঁধুর অধরে
　　　আবেশে আঁকিনু গোপন চুমা :
সহসা নিরখি রোমাঞ্চ তা'র
　　　ফুটিয়া উঠেছে দেহের তলে—
কপট বঁধুয়া নয়ন তুখানি
　　　মুদে আছে তবে ঘুমের ছলে !
লাজে মরে যাই ; কি আর বলিব ?
　　　বঁধুয়া আমার অতুলনীয়—
যখন-যেমন-তখন-তেমন—
　　　বিধিমতে লাজ হরিল প্রিয়।

৪।　বঁধুর অধরে দংশন-ক্ষত হেরি তা'র কৌতুকে
অভিমানে বধূ লীলাকমলের আঘাত হানিল মুখে :
কমলের রেণু নয়নে লেগেছে— জ্বালায় কাতর বঁধু
মুদিল নয়ন : অমনি পলকে অনুশোচনায় বধূ
রাঙা ঠোঁটহুটি মুকুলিত করি সোনামুখ আনমিয়া
প্রিয়ের নয়নে ফুৎকার দিল, ব্যথায় ব্যাকুল হিয়া :
　　　অমনি চতুর প্রিয়
চুমায় চুমায় রাঙিল ও ঠোঁট—পুলক অসহনীয়।

৫।　নীলপদ্মদলে নয়, দৃষ্টি দিয়ে নিরমিল মালা ;
কুন্দ নয়, শুভ্র হাসি—সেই পুষ্পে সাজাইল ডালা ;
কুম্ভে নয়, পয়োধরে করিল সে অর্ঘ্যবিরচন ;—
প্রিয়তরে নিজ অঙ্গে অপরূপ মঙ্গলাচরণ !

৩।　সুপ্তোঽয়ং সখি সুপ্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া ময়া সরলয়া ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নয়োর্ধূর্ত্তস্য রোমাঞ্চ তো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপাপহৃতা তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥১৭।

৪।　লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
কশ্চিৎকেসরদূষিতেক্ষণইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
মুগ্ধা কুড়্মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ত্ততয়াঽথবা নতিমৃতে তেনানিশং চুম্বিতা ॥১২।

৫।　দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥৪৫।

বিদ্যাপতির রাধার মুখেও শুনি ঃ—

'পিয় যব আওব এমঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥··

অন্যত্র—

'যব হরি আওব গোকুলপুর·····
আলিপন দেওব মোতিমহার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥·····'

৬। শয্যায় মোর এলো যবে প্রিয়তম,
নীবীবন্ধন আপনি খসিল মম;
নিতম্বতটে লুটাল শিথিল শাড়ী ;—
এইটুকু শুধু স্মরণ করিতে পারি।
তার পরে হায় সে যে কে, আমি কি, লীলা সে কেমন ধারা,
কিছু মনে নাই, বিস্মরণীর অতলে হয়েছে হারা।

৭। স্তনপট হতে চন্দন-লেখা নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে;
অধরতলের তাম্বুলরাগ ঘুচে গেছে;
নীল অঞ্জন গ'লে গেছে আর পুলকের স্বেদ জাগে দেহে,
রোমাঞ্চময় শিহর এখনো লাগে দেহে ;—
মিথ্যাবাদিনী, স্নানে গিয়েছিলি? নদীজলে সব ধুয়ে এলি?
আমি কি জানি না প্রসাধন যতো কাহার অঙ্গে থুয়ে এলি?

নায়িকা দূতীকে পাঠিয়েছিলেন আপন নায়কের কাছে, নিজের প্রয়োজনে সম্ভবতঃ। তারপর, এইসব।

৮। বিজনে মোরে ডাকিল বঁধু গোপনকথা আছে;
কৌতূহলে কাননতলে বসিনু তা'র কাছে।

৬। কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং বন্ধনা—
দ্বাসো বিশ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেঘি. সাম্প্রতমহং তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ
কোঽয়ং কাস্মি রতংনুবা কথমিতি স্বল্পাপিমেন স্মৃতিঃ॥১০১॥

৭। নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতট নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥১০৫-পরিশিষ্ট।

৮। অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরসহৃদয়ত্বাদবহিতা।

কানে কানে কি কহিল প্রিয়তম,…
সহসা দেখি ধরেছে বঁধু কবরীখানি মম !
আমি কি করিলাম ?
অধরে মোর অধর তা'র চাপিয়া ধরিলাম ।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—(অবশ্য একটু বদ্‌লে—

'অধরে অধর বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখিল রুধিয়া' ।

৯ ।　অলক্তকের রাঙাকলঙ্ক ললাটপটে,
কঙ্কণ-লেখা কণ্ঠতটে,
কাজলকালিমা আননে জেগে
তাম্বুলরাগ নয়নে লেগে :—
রজনীলীলার লিপিকা অঙ্গে বহিয়া ঊষায় ফিরিল ঘরে ;
বঁধুরে নিরখি অভিমানিনীর হিয়া বেদনায় গুমরি মরে !
তুলিয়া করের লীলাকমলেরে নাসার তলে
ঘননিশ্বাস ফেলিল মানিনী ঘ্রাণের ছলে ।

প্রথম অংশটি দেখে চণ্ডীদাসের রাধাকে মনে পড়ে যায়—

'ছুঁইওনা ছুঁইওনো বঁধু ওইখানে থাক ।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর　　　বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো ।
প্রভাতে উঠিয়া　　　ওমুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভালো ॥
অধরের তাম্বুল　　　নয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।… '

১০ ।　ধরে নাই প্রিয়া অঞ্চল মোর ;
বাহুলতা দিয়া বন্ধ করেনি দ্বার,

ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদতাঘ্রায় বদনং
গৃহীত্বা ধম্মিল্লে সখি স চ ময়া গাঢ়মধরে ॥৯৮।

৯ । লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রাগলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥৬০।

১০ । লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা ন দ্বারদেশেঽর্পিতা
নো বা পাদযুগে স্বয়ং নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ ।
কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠ —
স্তন্ব্যা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপূরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ ॥৬২।

চরণে আমার লুটায়ে পড়েনি,
'যেয়ো নাকো, বঁধু',—বলেনি একটিবার ;
তবু মোর যাওয়া হলো না,—তখন
সজল আষাঢ় নেমেছে ধরণীতলে ;
সমুখ পথের তটিনী ভরিল
কানায় কানায় প্রিয়ার বাষ্পজলে।

১১। সহসা অধরে দংশন লভি
পলকে চকিতা কাঁপাইয়া দুটি কর
'না, না, ছাড়ো, শঠ,'—রোষভরে কয়,
ভুরুদুটি নাচে কামনায় থরথর,
সীৎকারে যার চপল নয়ন,—
রভসে তাহারে যে করিল চুম্বন,
সেই পে'লে সুধা, মূর্খ দেবতা
বৃথা ক'রে মরে সমুদ্রমন্থন।

১২। সমুখে আসি প্রেমের বাণী শোনায় যবে প্রিয়,
বুঝিতে নারি তখন মোর নিখিল ইন্দ্রিয়
নয়ান হ'য়ে বয়ানখানি নিরখে বঁধুয়ার
কিম্বা শোনে শ্রবণ হ'য়ে মধুর ঝঙ্কার !

এমনি একটি প্রকাশবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাচ্ছি—

'অস্তশিখরে সূর্য্যের মতো সমস্তপ্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম।'

১৩। সে আজ বিরহী-মোর গৃহে, সে যে দিকে দিগন্তরে,
সে মোর সমুখে, মোর পিছনে সে, সে যে শয্যা'পরে,
সে আমার পথে পথে, সে আমার নিখিল ভুবনে,
আর মোর কেহ নাই, কিছু নাই আমার জীবনে,
শুধু সে, শুধু সে, সে সে, সে ছাড়া অস্তিত্ব আর নাই,—
এই কি অদ্বৈতবাদ ? কে বলিবে, কাহারে শুধাই ?

১১। সংদষ্টেঽধরপল্লবে সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্ত্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ ॥৬৬।

১২। ন জানে সংমুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥৬৪॥

১৩। প্রাসাদে সা দিশিদিশি চসা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্য্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতিসকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ॥: ২।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময়-ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপদগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।'

সংস্কৃত কবিরও এমনি একটি শ্লোক রয়েছে—

'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥'

কিন্তু

—'এই কি অদ্বৈতবাদ?'

এর তুলনা আছে? এই একটি মোহনস্পর্শে কবিতাটি অপরূপ হয়ে গিয়েছে।

বাহুল্যভয়ে বেশী অনুবাদ দিতে পারলাম না এবং প্রয়োজন আছে ব'লেও মনে করি না।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস

(সূচনা)

সভ্যজগতে ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার একটা বিশেষ প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকে। ঘটনার পারম্পর্য্য কিংবা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেই মতামতের সংস্পর্শে। নচেৎ, মানুষ ঘটনাস্রোতে খড়-কুটোর মতন ভেসেই চলে, জীবনের কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানত অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নয়, যা ক'রে হোক দিন গুজরান করাই যার সমস্যা কিংবা অভ্যাস, সেও জীবনের অসার্থকতা ও নিরর্থকতার বেদনা অনুভব করে। কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, তারও পিছনে ইতিহাস-সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা কাজ করতে থাকে, বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের সঙ্গে যাঁদের দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ যাঁরা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী, তাঁদের ধারণা এই যে তাঁদের মৃত্যুর পরই পৃথিবী উৎসন্ন যাবে, ইতিহাসের গতি মন্দা হবে। যাঁরা কল্পলোকে ফিরে যেতে চান, কিংবা এই লোকেই গোলোক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাঁদের ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত পূর্ব্বোক্ত মতামতের কাব্য-সংস্করণ। বিপ্লব-পন্থীদের ধারণা, ইতিহাসের গতি ক্রমশই দ্রুততর হয়ে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গতির ক্ষেপ দাদুরীর, কূর্ম্মের নয়। তাঁদের কাছে ইতিহাসের ধর্ম্ম হল উন্নতি। অতএব এই সমাজে সুখে বসবাস করতে হলে, এই সমাজ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, একে ভেঙে নতুন সমাজ তৈরী করতে হলে ইতিহাসের ধর্ম্ম বুঝতে হয়। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমাবেশ সাধন ক'রে ভালভাবে এবং আরো ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তার ওপর নির্ভর করছে।

শুধু তর্কের খাতিরে স্বীকার করা চলে যে অ-সামাজিক ব্যক্তির ইতিহাস-সংক্রান্ত সংস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত, অ-সামাজিক ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। দ্বীপে আটক হবার পূর্ব্বে রবিনসন ক্রুসোর সমাজ ছিল, দ্বীপে থাকবার সময় যে রকমে আহার সংগ্রহ করতেন বা অসভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার মধ্যে পূর্ব্বতন সামাজিক সংস্কার রীতিমতই প্রকট ছিল; সেই সমাজে ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁর কমেনি। এক কথায়, রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা বর্ত্তমানকালের সংসারত্যাগী আশ্রম-বাসীদের অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যকারের যোগী কালাতীত হবার জন্য সাধনা করেন শোনা যায়। তিনিও ইতিহাসের হাত থেকে, ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলার প্রয়োজন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। যোগী সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন,

বিশ্বের অকল্যাণ হয়েছে, অকল্যাণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, না ভাবলে কল্যাণ-চিন্তার প্রয়োজনই থাকে না। তা ছাড়া, যোগের ইতিহাস আছে, আবার যোগীরও ইতিহাস আছে, এবং সমাজ কি ভাবে যোগীকে দেখে এসেছে তারও ইতিহাস আছে।

বুদ্ধিজীবিদের কথা স্বতন্ত্র নয়। দার্শনিকদের সব প্রচেষ্টার মূলে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে থাকেই থাকে—কাল-বস্তু মনের রচনা, না তার কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মহাকালের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তন, না, পরিবর্ত্তনের একটি গুণের নাম কাল? অর্থশাস্ত্রের মূলকথা মূল্যনিরূপণ, সেখানেও কালক্ষেপে মূল্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপিত হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কালের উৎপাত। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে ইতিহাসের প্রবেশনিষেধ থাকলেও, পরীক্ষার পূর্ব্বতন ইতিহাস, মনসা-দেবীর মত, কোন না কোন ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ লাভ করে। আইনষ্টাইন কালকে বশ করতে চেষ্টা করেছেন—অঙ্ক কষে। কিন্তু তাঁর পূর্ব্বে মাইকেলসন, মরলি, মিন্‌কাওস্কী, ম্যাক্‌সোয়েল না থাকলে তিনি অন্য কিছু হতে পারতেন, যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না নিশ্চয়। আসল কথা এই, সব জ্ঞানই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবন সামাজিক, অতএব জ্ঞান সমাজের সঙ্গে যোগসাধনের একটি প্রধান উপায়। আবার যখন নানা কারণে সমাজের সঙ্গে সহযোগ-সাধন অসম্ভব হয়, তখন নতুন জ্ঞানের অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন সমাজ ভাঙা হয়, নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা চলে। অতএব বুদ্ধিজীবি ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইতিহাস-সম্বন্ধে সত্য-সংস্কার-সৃষ্টির প্রতি কর্ত্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনি জ্ঞানের উন্নতি করতে পারেন না।

বিশেষত ভারতের এই যুগে। শাসক-সম্প্রদায় (তাঁরা আবার ভিন্ন জাতি) বলছেন, "ধীরে ধীরে ইতিহাস চলে, আমাদের দেশে, ইংলণ্ডে, তাই চলেছে, প্রমাণ এডমণ্ড বার্কের উক্তি; অতএব প্রথমে প্রাদেশিক বৈঠকে আংশিক স্বাবলম্বন, যোগ্যতাপ্রমাণের পর সম্পূর্ণ, তার পর দিল্লীতে ডু-ইয়ারকী, সেখানে যোগ্যতাপ্রমাণের পর ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়ার মতন স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা। ভারতে ইতিহাসের ধারা এই হওয়া উচিত, অতএব এই হবে।" শাসিতের মধ্যে এক শ্রেণী অন্তত উত্তর দিচ্ছেন, "আমরা প্রস্তুত, তবে ইতিমধ্যে আপোষে যদি গোটাকয়েক সর্ত্ত খাড়া করতেই হয়, তবে সেগুলিকে আমাদের শুভের জন্যই প্রয়োগ করা চাই, এবং কিছুদিন পরে সেগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে।" ইতিহাসের অর্থ যে ক্রমোন্নতি দু'দলই স্বীকার করেছেন—হোর্ থেকে মহাত্মাজী পর্য্যন্ত। বছর বারো পূর্ব্বে ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল, মহাত্মাজীর বাক্যে আস্থা রাখলে, তাঁর আদেশ মান্য করলেই আমরা একটা বিশেষ তারিখে ইতিহাসের স্বরাজ-অধ্যায়ের

কল্পনার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের আচার-ব্যবহার কি ভাবে গড়ে উঠেছে, আমরা কতটুকু স্বাধীন, কতটুকু নিয়তির অধীন, কতটুকু নির্ব্বাচন করেছি, কতটুকু নির্ব্বাচিত হয়েছি জানবার পরই ইতিহাস বাহ্য হয়ে উঠতে পারে। নচেৎ, ইতিহাস কল্পনাবিলাসীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের নিকটতম সম্বন্ধ ভূগোল। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অন্য কোন অর্থ নেই— ঘটনা কিছু বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। ঘটনার ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, সে জন্য ব্যাখার বিষয়কে, অর্থাৎ ঘটনার সম্বন্ধ ও পারম্পর্য্যকে যতটা বাহ্য করা যায় ততই ভাল।

মানুষ সমাজ-বদ্ধ হয়েছে বাঁচবার জন্য। বাঁচবার প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে আজকাল নিষ্কাম-ধর্ম্মের কোঠায় তোলবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তার আদি ছিল সকাম, ভুললে চলবে না। কি করে বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায়—এইটাই ছিল মানুষের একটি প্রধান সমস্যা। যতদিন থেকে খাদ্য-সমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে ইকনমিক ফ্যাকটরটি সর্ব্বদাই ছিল, এবং সে ফ্যাকটরটি, অঙ্কের ভাষায়, প্রাইমারী; অর্থাৎ একে আর অন্য কোন ফ্যাকটর-দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরা যাক, আদিম যুগের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন একটি উপায় উদ্ভাবন করলে; সেই থেকে একটি জাতির খাদ্য-সংগ্রহের ভার, কিংবা অন্য কোন শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ভার তার লাঘব হল, খানিকটা শক্তি সঞ্চিত হল, যার জোরে সেই জাতি অন্যদিকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আদিম যুগের আবিষ্কারের পিছনে ও পরে এই বাঁচবার তাগিদ ছিল, নচেৎ আবিষ্কারের প্রচার হতো না, একটি আবিষ্কারের সঙ্গে অন্য আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় কোনটাই টিঁকতে পারত না। যখন একটি কোন আবিষ্কারের সাহায্যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা ও অন্যের অপেক্ষা ভাল ভাবে বাঁচবার উপায় প্রচারিত হলো, তখন সেই আবিষ্কারের সাহায্যে ও তাকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ নতুন ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। কেননা সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক, বাঁচা এবং আরো ভাল করে বাঁচা। যে সমাজে আবিষ্কারক জন্মাল না কিংবা যে সমাজ অনুকরণ করতে পারল না সে পিছিয়ে পড়ল, এই জীবনসংগ্রামে। এই চল্‌ল কিছুকাল —অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার, সেই সঙ্গে নতুন উপায়ে সমাজ গঠন।

কিন্তু আবিষ্কারের গতি সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক, কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এই দুই গতির ভিন্ন হারের

ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়। যখন শিকার ছিল একমাত্র খাদ্যসংগ্রহের উপায়, তখন শিকারীসমাজের আচার-ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের, এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পত্তি-জ্ঞান ও ধর্ম্ম গঠিত হয়েছিল শিকার-বৃত্তির চারপাশে। পশুচারণ যুগে (কিংবা টাইপে) দেখা গেল যে পশুর সাহায্যে শক্তির কম খরচে খাদ্য সংগ্রহ করা চলে। পশুকে বশে আনবার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাষ করা সম্ভব হল; নচেৎ মাটি আঁচড়ানো, ঝুম-চাষ, বাগান-চাষই ছিল। লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে, গ্রাম তৈরী হচ্ছে, মানুষ বসবাস করছে ঘর বাড়ীতে। তাদের জন্য একটা সুনিশ্চিত খাদ্যসরবরাহের প্রয়োজন। সেই থেকে পুরুষ কর্ত্তা হয়ে উঠল, সম্পত্তি বর্ত্তমান আকার ধারণ করলে, স্বর্গের আকার বদলে গেল, ভগবান পুরুষ সেজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যেক যুগে পুরাতন অবস্থার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকত, কোন টাইপই শুদ্ধ ছিল না। যে জাতি পূর্ণভাবে কল-কারখানাকে গ্রহণ করেছে, সে জাতিরও মধ্যে চাষবাস পরিত্যক্ত হয়নি, অন্যে পরে কা কথা! কৃষিপ্রধান জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূসম্পত্তির মালিকমাত্র হয়ে ধনশালী হয়ে উঠলেন। ছোট চাষীরা আর খেতে পায় না, অথচ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা বাড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে পুরাতন কলের সার্থকতা কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কল তৈরী হল। নতুন কারখানার টাকা আসতে লাগল পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। পূর্ব্বতন সমাজের অতিরিক্ত লোক-সংখ্যা আর অতিরিক্ত রইল না, অনেকে কলকারখানায় চাকরী নিলে, কেউ বা বিদেশে চলে গেল। আজ দেড়শ বৎসর মাত্র গোটাকয়েক দেশে এই ব্যাপার ঘটছে, এবং অন্য দেশ এখন সেই সব দেশের অনুকরণ করছে। কারণ এ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রচুর লোকের যথেষ্ট অন্নসংস্থান হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী-সম্প্রদায়। তাঁরা এখনও সেই ফলভোগ করছেন— মাত্র এইটুকু বললে ইতিহাসের রীতি বোঝা যাবে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের ফলে প্রথম উন্নতি হল যন্ত্রবিদ্যার, তার দরুণ কল-কারখানার পসার হল। এক একটি কল যেমন অনেক লোককে খাওয়াতে পারে, তেমনি অনেক লোকের বদলেও সে কাজ করতে পারে। অতএব লোকদের তাড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম অনেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মজুরদের কলকারখানার কাছে কাছে রাখলেই মালিকদের সুবিধা হয়। সুবিধা দুই প্রকারের—এক, যদি চাহিদা বাড়ে তখন সরবরাহ করবার জন্য বেশী লোকের প্রয়োজন

হবে ; আর এক প্রকার—শ্রমিকের একদল যদি মজুরী বেশী চেয়ে বসে তা হলে অন্য শ্রমিকদলের চাকরী পাবার আশঙ্কায় তারা জব্দ থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে চাহিদা তখন বেড়েই চলেছে, নতুন আকার নিয়েছে। কল তৈরীর জন্য নতুন কারখানার প্রয়োজন হল। ইংলণ্ড এই কল তৈরীর ভার নিলে। জনকয়েক লোক আবার কাজ পেলে। তাদের মজুরী বাড়ল। সেই সঙ্গে তাদের সংখ্যা বেড়েই চল্‌ল। তারা যত বাড়ে তত পরিমাণে তাদের মজুরী জোটে না। কিন্তু বিজ্ঞান, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় ক'রে সামাজিক উৎপাদনের উপায়—ব'সে থাকবার ছেলে নয়। সে শুধু দিতেই জানে। কখন দিতে হয়, কি দিতে হয়, কাকে দিতে হয়, কিভাবে দিতে হয় সে জানেই না—বোকা ছেলের মতন। প্রথমে সে তা জানত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান একটা শ্রেণীর বৃত্তি হয়ে উঠেছে, যে শ্রেণীর স্রষ্টা এই ধনীসম্প্রদায়, যে বৃত্তি পরবিত্তভোগী, যার উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় আবিষ্কার করা। এই সময় ধনী-সম্প্রদায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দিলেন, নতুনধরণের বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় ল্যাবরেটারী তৈরী করলেন, নিজেদের কারখানায় বৈজ্ঞানিকদের মাইনে দিয়ে রাখলেন, তাঁদের জন্য পরীক্ষাগার তৈরী করলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কেনা গেলেও বিজ্ঞানকে কেনা যায় না। এইখানেই আবার বিপদ ঘটল। কল যেমন থামে না, বিজ্ঞানও তেমনি থামে না। তাই কলের মালিক নতুন সুর গাইতে বাধ্য হলেন। আজ তাঁরা বলছেন, 'কিছুদিন বিজ্ঞানের উন্নতি রোধ করলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়।' আজ তাঁরা পেটেণ্ট কিনে লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখছেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাতে টান পড়ে, তাকে ভাগবাটোয়ারা করতে হয়। সেইজন্য হয় বিজ্ঞান বন্ধ করা চাই, নচেৎ বিজ্ঞানেরই সাহায্যে ক্ষতি কমিয়ে লাভ বাড়ানো চাই। শেষ উপায়টির নাম সায়ান্টি-ফিক্ ম্যানেজমেণ্ট, র‍্যাশন্যালিজেশন। কিন্তু, উদ্দেশ্য একই, উচ্চ-হারের মুনাফা রক্ষা করা। উপায় একই, শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীতে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। ধনীসম্প্রদায়ের দাস বৈজ্ঞানিকের তথা বিজ্ঞানের দৌলতেই আজ সমাজের এই শ্রী।

কল-কারখানার মালিক ধনীসম্প্রদায় সহজে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়বার পাত্র নন। বিজ্ঞানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাঁরা অন্য উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল বুঝতে পেরে তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন। সেইজন্য গতকয়েক বৎসর ধরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ট্রষ্ট, কার্টেলের প্রসার হচ্ছে। গোটাকয়েক সমবায় বিশেষ কোন দেশ ও সাম্রাজ্য অতিক্রম

করলেও বেশী সংখ্যক সমবায় দেশের মধ্যেই বিস্তৃত। কিন্তু দেশের বাজার বড়ই মন্দা। সেইজন্য ছোট গণ্ডী তৈরী করার প্রয়োজন হল। ভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাধাবিপত্তিও অনেক। সেইজন্য এই বৃহৎ সমবায়গুলি উপনিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করলে। ভের্সাই সন্ধিতে পৃথিবীর বাকী অংশটুকু ধনীজাতির, ধনীশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। উপনিবেশের ব্যবসায় মুনাফা বেশী, বাজার ভাল, সস্তায় কাঁচামাল ও মজুর পাওয়া যায়, এবং ব্যবসায় রাজশক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। উপনিবেশে ধনতন্ত্র না প্রবেশ করলে ধনতন্ত্র মারা যাবে স্থানাভাবে। ধনতন্ত্রের সব চেয়ে উন্নত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা, এবং তারই বাজার হল উপনিবেশ। এই অধিরাজক-শাসনের বেড়াজালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বৎসরে আরো বেশী করে, কারণ অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ-জিলাণ্ড এখন প্রায় স্বাধীন রাজ্যের সামিল, অর্থাৎ সে দেশেও ধনীসম্প্রদায় উঠেছেন, তাঁরাও মুনাফা বাড়াতে চাইছেন। জগতের ইতিহাসের যে ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে তারই সহযোগে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝতে হবে।

শুধু এইটুকু বল্‌লে যথেষ্ট হবেনা। বাহ্যত, এখন ধনতন্ত্রের বোল-বোলাও অবস্থা। কিন্তু ভেতরে ঘুণ ধরেছে। বাহ্যত, অন্তত ওয়েলস্ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কাছে, জগৎ এক হয়ে আসছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ছোট-বড় দল তৈরী হচ্ছে, পৃথিবীতে একটি মহারাজ্য-স্থাপনের পক্ষে এ চিহ্নগুলি শুভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। একধারে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য, অন্য ধারে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; বলকান দেশেও তিন-চারটি ছোট রাজ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ফরাসী-পোল-চেক মিলে একটা দল হয়েছে। তা ছাড়া আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রায় সবটাই য়ুরোপের কোন না কোন রাজ্যের অধীনে। তবুও কোথায় যেন শনির দৃষ্টিপাত হয়েছে। পৃথিবীর একাংশে, মাত্র দু বৎসর আগে, ১৯৩১ সালে, লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হল, কফি গুঁড়িয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হল, সৈনিক রেখে খনি থেকে পেট্রল এবং রবার গাছ থেকে রবার নেওয়া বন্ধ করা হল, তুলোর ক্ষেত-গাছ ও ফলশুদ্ধ চষে ফেলা হল, চিনি যারা তৈরী করে তারা পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ক'রে উৎপাদন কমিয়ে দিলে; তামা, টিন, দস্তা, আলুমিনিয়ম বেশী প্রস্তুত হচ্ছিল বলে খনিতে মজুরের সংখ্যা ও খাটবার সময় কমানো হল, চিলির সোরার ব্যবসা উৎসন্ন গেল, কলে তৈরী সোরার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর অন্যধারে লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরী কমে গেছে, লোকের সংসার খরচ জোটে না, দু কোটির ওপর শ্রমিকের হাতে কাজ নেই, প্রত্যেক

জাতি রপ্তানী করবার জন্য প্রস্তুত, আমদানী করতে অনিচ্ছুক। চারধারে শুল্কের বেড়া, বড় বড় কল-কারখানা বন্ধ, টাকার বাজার, শেয়ারের বাজার যায় যায়, সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকার কাছে ঋণী, অথচ আমেরিকা সে ঋণ শোধ নেবে না জিনিষ নিয়ে, রীতিমত ও যথাযোগ্য টাকা ধার দিয়ে সাহায্যও করবে না, জার্ম্মানীর হাতে টাকা নেই, ফ্রান্সের হাতে বিস্তর সোনা। এই সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে, অথচ সোনার কমতি নেই, পৃথিবী জুড়ে। এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে দৈন্যকে শনির দৃষ্টি ছাড়া কি বলা চলে? যে শিশু বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের দ্বারা লালিত-পালিত সেই শিশুই বড় হয়ে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রকে মেরে ফেলতে চায়। ইতিহাসের নিয়মই এই।

এই প্রবন্ধে ইতিহাসের স্থূলধারা ও তার একটি মাত্র রীতির ইঙ্গিত করা হল। ধারাটি ধন-সমাগমের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস-দ্বারা পুষ্ট। রীতি হল এই যে কোন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার ধ্বংসের কারণ লুকানো থাকে। ধ্বংসের কারণ ভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। তার কারণ ধনতন্ত্র-মূলক সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর তদবস্থস্থিতিপ্রবণতা, এবং বিজ্ঞানের কৃপায় নব-নব উপায়ে উৎপাদনের প্রাচুর্য্য। এই সামাজিক জীবনের স্থিতি, প্রগতি ও অবনতির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে—অর্থাৎ মানুষ তার সমবেত চাহিদা ও চেষ্টার ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে কিংবা চেষ্টা করছে জয় করতে তারই ইতিহাসের সাহায্যে। ভারতবর্ষের ইতিহাস জগতের ইতিহাসের অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য তার পারিপার্শ্বিকের।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

(১)

বিশ্বাসের জগতে স্বপ্ন যে মানুষের জীবনকে অনেকখানি সরস করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। সংসারের বহুবিধ ক্লেশে পীড়িত হয়ে মানুষ নানা সুখের কল্পনা ও কামনা করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে কামনা তার সহসা পূর্ণ হয় না, কল্পনাও ফলবতী হয় না। কিন্তু কখনো কখনো স্বপ্নে সেই কামনা মূর্ত্ত হয়ে তার চিত্তকে আনন্দ প্রদান করে, তাই তখন নির্ধন ধন সঞ্চয় করে, দরিদ্র দারিদ্র্যমুক্ত হয়, বিরহীর প্রিয় সন্দর্শন ঘটে, কেউ বা শত্রুকে নিপাত করবার আনন্দলাভ করে আর কখনো বা আরাধ্য দেবতা রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি বিতরণ করেন। অন্ধ-বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ সেই স্বপ্ন বিচার করে ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখের ছবিই না অঙ্কিত করে!

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ স্বপ্ন বিচার করতে সুরু করেছে। তাই প্রাচীন আসিরীয়ায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র আমরা পাই তা এই স্বপ্ন বিচারেই ভরা, হিব্রু সাহিত্যের Apocalypse ও ভারতীয় বেদও শাস্ত্রীয় মতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার বস্তু নয়, স্বপ্নের মতই তা ঋষিদের চিত্তাকাশে প্রতিভাত হয়েছিল। আর সেই সব শাস্ত্র অবলম্বন করেই প্রাচ্যদেশসমূহে কত বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুক্তির নির্ম্মম হিসাবে স্বপ্নের জগৎ যে মায়ার খেলা ব্যতীত আর কিছু নয় তা নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নেরই যে বাস্তব জীবনের ব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়—আর তাদের ভেতর যে কোন গূঢ় রহস্য নেই তা মনস্তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে স্বপ্নে আমাদের তিনটী শক্তি প্রবল থাকে—দেখবার, শুনবার ও কথা বল্‌বার। আর এ সব শক্তির ক্রিয়া চলে বেশীর ভাগ হয় মনের কোন লুপ্ত বাসনা না হয় জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট কোন বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করে। সুপ্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থানও কখনো কখনো স্বপ্নের সৃষ্টি করে থাকে। কখনো কখনো বা চোখের পাতার সঙ্গে তারকার সংস্পর্শে যে সব বর্ণের (ocular spectra) সৃষ্টি হয় সেই গুলিকে অবলম্বন করেও স্বপ্নের লীলা চলে। এই সব হিসাবে দেখা যায় আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে অলীক—কোন না কোন যোগসূত্র অবলম্বন করে মায়ার রচনা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা সব স্বপ্নেরই যে অর্থ নির্দ্দেশ

করতে পেরেছেন তা নয়, রহস্যময় স্বপ্নও আছে—যেমন creative dreams। কখনো কখনো গণিতজ্ঞ স্বপ্নে নূতন তথ্যের, কবি নূতন ছন্দের বা সুর-সাধক নূতন সুরের সন্ধান পান। সে সব স্বপ্নকে অলীক বলা চলে না, তাই বার্গসোঁর মতে এগুলি স্বপ্ন নয়—জাগ্রত অবস্থায় লুপ্ত-স্মৃতি মাত্র। সেগুলির সন্ধান জাগ্রত অবস্থাতেই মিলেছিল—শুধু অন্যান্য চিন্তার চাপে স্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হয়েছিল—স্বপ্নাবস্থায় তাদের পুনরাবির্ভাব হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে সব স্বপ্নে ভবিষ্যৎদর্শন ঘটে সেগুলির সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক নীরব—সেখানে বার্গসোঁ বলেছেন "I stop on the threshold of mystery."

সম্প্রতি ডান সাহেব (J. W. Dunne) নামক এক পণ্ডিত তাঁর An Experiment with Time পুস্তকে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এডিংটন, রাসেল, ওয়েল্‌স প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করেছেন এবং এ পুস্তক যে বর্ত্তমান শতকের পুস্তকাবলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে এ বিশ্বাসও তাঁরা লেখায় ব্যক্ত করেছেন (the most important book of our age)। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ডান সাহেব যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন সেগুলি বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের জগতে একটা 'হুলুস্থুল' বাধাবে—কারণ সে সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

ডান সাহেব তাঁর পুস্তকে Time বা কালপ্রবাহ সম্বন্ধে বিচার করেছেন। এই বিচারের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নতত্ত্ব। তিনি নিজে নানা সময়ে যে সব স্বপ্ন দেখেছেন সেগুলিকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে—যেগুলির সঙ্গে জীবনের অতীত অনুভূতির যোগ রয়েছে সেগুলিকে বর্জ্জন করেছেন আর যে সব স্বপ্নে তিনি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের আভাস পেয়েছেন সেইগুলির বিচার করে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি বিচার করবার পূর্ব্বে তাঁর অদ্ভুত স্বপ্নগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম স্বপ্ন ঘটে ১৮৯৮ সনে। ডান তখন সাসেক্সের এক হোটেলে। তিনি রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলেন যে ঘড়িতে ঠিক ক'টা বেজেছে এই নিয়ে তিনি হোটেলের এক চাকরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। ডান বল্‌ছেন যে বিকেলে সাড়ে চারটা বেজেছে। কিন্তু চাকর বল্‌ছে যে রাত্রির সাড়ে চারটা। তখন ডানের মনে হলো যে হয়ত তাঁর ঘড়ি সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে গেছে—তিনি জান্‌তে পারেন নি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে নিজের ঘড়িটা বের করে দেখতে পেলেন যে তিনি যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছে—অর্থাৎ বিকেল

সাড়ে চারটায় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ডানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে তিনি তখনই আলো জ্বেলে দেখতে চাইলেন যে ঘড়ি সত্যই বন্ধ হয়েছে কিনা। ঘড়ি সাধারণতঃ তাঁর বিছানার পাশে থাকতো, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘড়ি সেস্থানে দেখতে পেলেন না—তখন বিছানা থেকে উঠে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ঘড়িটা ড্রয়ারের ভেতর পেলেন। ঘড়ি বের করে দেখ্‌লেন যে সত্যই সাড়ে চারটেতে পৌঁছে ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়েছে। তাঁর তখন সন্দেহ হলো যে ঘড়িটা বিকেল সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়েছিল—তিনি দেখেও ভুলে গিয়েছিলেন, সেই জন্যই স্বপ্নে এ কাণ্ড। তিনি ঘড়িটায় পুনরায় চাবি দিলেন, কিন্তু ঠিক সময় জানতে না পারায় কাঁটা না নেড়ে ঘড়িটা রেখে দিলেন। সকালে উঠে যখন ঘড়িটা মেলাতে যাবেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে ঘড়ি ঠিকই চল্‌ছে—মাত্র ২।৩ মিনিটের তফাৎ। পূর্ব্বদিনের বিকেলে বন্ধ হলে তিন-চার ঘণ্টার প্রভেদ হত। তখন তাঁর মনে হলো যখন তিনি স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন তখনই ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল—ঘড়িটা খুঁজে বের করতে দু-তিন মিনিট লেগেছিল এই জন্যই ঘড়িটায় দু-তিন মিনিটের প্রভেদ হয়েছে। ঘড়িটার টিক্ টিক্ হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে যে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চারটায় রয়েছে দেখ্‌তে পেলেন তার কোন অর্থ তিনি তখন খুঁজে পাননি, সেটা রহস্যময়।

সাসেক্স থেকে ডান ইটালীতে যান। ইটালীতে সরেন্তার এক হোটেলে তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ঘটে। সকালে একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্‌তে বিছানায় শুয়ে ক'টা বেজেছে জান্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। ঘড়িটা ছিল মশারির বাইরে একটা ছোট টেবিলের ওপর। শুয়ে শুয়ে ঘড়িটা দেখবার কোন উপায় ছিল না—উঠতে তাঁর তখন খুব আলস্য। অলস-চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে তাঁর তন্দ্রার অবস্থা এলো। তাঁর দৃষ্টি উপরে নিবদ্ধ, চোখের ওপরে প্রায় এক ফুট উঁচুতে শূন্যে সেই স্থানটা সাধারণ দিনের আলোয় আলোকিত, আর তার চারিধারে সাদাটে আবছায়ায় ঘেরা। এই অবস্থায় তিনি ঘড়ি দেখতে পেলেন। দেখলেন যে ঘণ্টার কাঁটা আটটায়, মিনিটের কাঁটা বারো ও এক-এর মাঝখানে আর সেকেণ্ডের কাঁটা স্পষ্ট দেখা যায় না। আরও সঠিক সময় দেখবার জন্য চেষ্টা করতে তাঁর ভরসা হলো না—ভয় হলো স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। তিনি মিনিটের কাঁটার অবস্থান থেকে অনুমান করলেন যে সেটা বারো থেকে এক-এর যে ব্যবধান তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে—সুতরাং সময় হবে আটটা আড়াই মিনিট। এই সিদ্ধান্ত করেই তিনি উঠে পড়লেন ও মশারির বাইরে থেকে ঘড়িটা টেনে এনে দেখলেন যে তখন ঠিক আটটা বেজে

আড়াই মিনিট। ডান এই অদ্ভুত মিলে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন ও মনে করলেন যে তাঁর দেখবার হয়ত একটা নূতন রকমের ক্ষমতা আছে।

ডানের তৃতীয় স্বপ্ন অন্য ধরণের। ১৯০১ সালে বুয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিক হিসাবে তিনি ছুটি পেয়ে ইটালীর উপকূলে আলাস্‌সিওতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করছিলেন। এখানে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে তিনি আফ্রিকায় নীলনদের ধারে খার্ত্তুমের নিকটে একটী শহরে অবস্থান করছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনটী শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ থেকে আস্‌ছে। তারা অত্যন্ত শ্রান্ত, তাদের পোষাক বেরঙা হয়ে গেছে, মুখ রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়েছে। তাদের চেহারা দেখে ডানের মনে হলো যে তারা সৈনিক —আর সেই রেজিমেন্টের সৈনিক যাতে তিনি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সুদান পর্য্যন্ত তিনটী লোক কেন পায়ে হেঁটে এসেছে—এই কথা ভেবে ডান বিস্মিত হলেন। তাদের এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তর দিল যে তারা Cape থেকে সত্যই বরাবর হেঁটে আস্‌ছে। তিনজনের একজন বল্‌লো যে পথে তার খুব কষ্ট হয়েছিল —Yellow fever-এ প্রায় মারা যেতে বসেছিল। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকালে ডান খবরের কাগজ খুলেই বড় হেড লাইনে দেখ্‌তে পেলেন— The Cape to Cairo—"Daily Telegraph"—Expedition at Khartoum। সংবাদে দেখ্‌তে পেলেন যে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সত্যই Cape থেকে খার্ত্তুম পর্য্যন্ত অভিযান করেছিল—পথে তিনজনের একজন জ্বরে মারা গেছে। বাকী দুজন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। অবশ্য ডানের স্বপ্ন দেখবার অনেক পূর্ব্বেই খার্ত্তুমে অভিযান পৌঁছেছিল—কারণ যে সংবাদ-পত্রে ডান খবর পান তা লণ্ডনে ছাপা। অভিযান খার্ত্তুমে পৌঁছুবার পরদিন লণ্ডনে সংবাদ প্রকাশিত হয় আর সে সংবাদ আরও কয়েকদিন পর আলাস্‌সিওতে আসে।

পরের স্বপ্নটা ডানের ঘটে ১৯০২ সালে আফ্রিকাতে। তিনি তখন Orange Free State-এ নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। এখানে তিনি একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি একটী উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন—খুব সম্ভব একটী পাহাড়ের ধারে। জমিটা সাদাটে। আর জমির ফাটল দিয়ে জমাট বাষ্প বেরুচ্ছে। তাঁর মনে হলো যে তিনি একটী দ্বীপে রয়েছেন। আর সেই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উৎপাত শীঘ্রই সুরু হবে বলে সন্দেহ হতে দ্বীপটা উড়ে যাবে বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন আর সেই দ্বীপের "চার হাজার" অধিবাসীকে রক্ষা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। তাদের রক্ষা করবার এক উপায় ছিল তাদের জাহাজে তুলে দেওয়া। তিনি স্থানীয় ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে নানা ভাবে বিপদের

কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন ও জাহাজ পাঠিয়ে দিতে বললেন। নানা স্থানে ছুটোছুটি করে অবশেষে মেয়রকে চিৎকার করে বললেন যে চার হাজার লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। পরদিন সকালে ডান সংবাদপত্র খুলেই বড় হেডলাইনে দেখতে পেলেন—Volcano Disaster in Martinique—Town Swept away—An Avalanche of Flame—Probable loss of over 40,000 lives।

আর একটি হেডলাইনে দেখলেন—A Mountain Expodes। পাহাড় বিস্ফোরণের জন্য জাহাজ সেই পথে এগুতে পারেনি। অগ্ন্যুৎপাতের পরে কতকগুলি জাহাজ যে সব অধিবাসী বেঁচে ছিল তাদের অন্য দ্বীপে সরিয়েছিল। এই স্বপ্নের সঙ্গে ঘটনার প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। গরমিল হচ্ছে জন সংখ্যায়। ডানের স্বপ্নে বারবার ৪০০০ হাজার অধিবাসীর কথা উঠেছে কিন্তু সংবাদপত্রে ৪০,০০০ হাজার অধিবাসীর কথা রয়েছে। ডান কিন্তু সংবাদপত্র পড়বার সময় ৪০০০ হাজারই পড়েন—১৫ বৎসর পরে সংবাদপত্রের ঐ অংশ নকল করবার সময় তাঁর এই ভুল ধরা পড়ে। অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে তিনি পরে যে খবর সংগ্রহ করেন তাতে জানতে পারেন যে ঐ সংখ্যার কোনটাই সত্য নয়।

Cape থেকে কাইরো পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ-অভিযান ও Martinique Disaster সম্পর্কীয় দুটী স্বপ্ন সম্বন্ধে মনে হতে পারে যে এ দুটী হচ্ছে Identifying Paramnesia—যাতে প্রমাণ হয় যে ডান স্বপ্ন দেখেন নি—শুধু সংবাদপত্রে পড়ে তাঁর সেইরূপ অলীক স্বপ্নের কথা মনে হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু এই ব্যাপারের দু'বৎসর পরে ডান পুনরায় যে সব স্বপ্ন দেখলেন তাতে আর তিনি মনে করতে পারলেন না যে তাঁর স্বপ্নগুলি অলীক। স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি রেলিংএ ভর দিয়ে একখানি তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চারদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন, হঠাৎ সেই কুয়াসা ভেদ করে তক্তার উপর দিয়ে একটা বিশাল সর্পাকার বস্তু নীচে নেমে গিয়েছে দেখতে পেলেন। পরমুহূর্ত্তে বুঝতে পারলেন যে এটা হচ্ছে দমকল থেকে ছেড়ে দেওয়া জলধারা—ধূঁয়ার ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে ধূঁয়ার ভেতর রাশি রাশি লোক লাফিয়ে পড়ছে, কণ্ঠনালি রুদ্ধ হলে যেরূপ শব্দ করে সেইরূপ শব্দ করছে—আর ধূঁয়া গাঢ় ও অধিকতর কালো হয়ে চারিদিক ব্যাপ্ত করছে। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকাল বেলা ডান খোঁজ করেও কোন খবর পাননি, কিন্তু সন্ধ্যার সংবাদপত্রে জানতে পারলেন যে পারিসে একটা বড় কারখানায় আগুন লেগেছিল, কারখানার মেয়েরা আগুনের জন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে না পেরে

balcony-তে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে তাদের নামিয়ে নেবার যতক্ষণ সুব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ দমকল থেকে জলধারা বর্ষণ করে bolcony-টা আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু ভেতর থেকে হঠাৎ গাঢ় ধূম আসায় তাদের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০৪ সালে ডান একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি দুখানি জমির মাঝে একটী সরু গলি দিয়ে চল্‌ছেন—দুধারে লোহার রেলিং—আট-নয় ফুট উঁচু। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে বাঁ ধারের জমিতে একটী পাগলা ঘোড়া ছুটোছুটি করছে। রেলিংএর ভেতর দিয়ে বেরোবার কোন পথ নেই দেখে তিনি নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরেই পেছন থেকে ঘোড়াটা ছুটে আস্‌ছে বুঝ্‌তে পারলেন ও প্রাণপণে পলায়ন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরদিন তিনি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে গেলেন। জল থেকে যখন তিনি মাছি তাড়াতে ব্যস্ত তখন তাঁর ভাই ডেকে বল্‌লো—একটা ঘোড়া ছুটে আস্‌ছে। ডান তখন নদীর ওপারে তাকিয়ে যা দেখলেন তা তাঁর গত রাত্রের স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সরু পথ, দুধারে রেলিং, আর ঘোড়াটা পাশের জমির ভেতর ভীষণ বেগে ছুটোছুটি করছে—প্রভেদ এইটুকু যে রেলিংটা লোহার নয়—কাঠের। তখন তিনি তাঁর ভাইকে বল্‌লেন যে রেলিংএ কোথাও দরজা নেই, ঘোড়াটা বেরুতে পারবে না সুতরাং ভয় নেই। এই বলে তিনি যেই মাছ ধরতে সুরু করেছেন অমনি তাঁর ভাই চেঁচিয়ে উঠলোও তিনি সামনে তাকিয়েই দেখতে পেলেন যে ঘোড়াটা কি করে রেলিং ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে পড়ে সরু পথ বেয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। তাঁরা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে মারতে পেছিয়ে গেলেন—ঘোড়াটা পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল।

১৯১৩ সনের শরৎকালে ডান আর একটী স্বপ্ন দেখতে পান। এ স্বপ্নে দেখেন স্কটলণ্ডের Firth of Forth Bridge-এর নিকটবর্ত্তী উঁচু রেলপথের বাঁধ, নীচে সমতল ঘাসের জমি। স্থানটী তিনি পূর্ব্বে চিন্‌তেন। স্বপ্নে এই স্থানটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো যে উত্তরাভিমুখী একটী ট্রেণ বাঁধের ওপর দিয়ে এসে নীচে পড়েছে—কয়েকখানি গাড়ী নীচে শায়িত, আর বড় বড় পাথরের খণ্ড গড়িয়ে এসে নীচে পড়েছে। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন তিনি তাঁর বোন্‌কে ঘটনাটী বিবৃত করলেন ও হাস্‌তে হাসতে বল্‌লেন যে তিনি বন্ধুবান্ধবদের স্কটলণ্ড যেতে বারণ করবেন। ১৪ই এপ্রিল সত্যই স্কটলণ্ডগামী একটী মেল ট্রেণ Firth of Forth-এর ১৫ মাইল দূরে লাইনচ্যুত হয় ও বাঁধের ওপর দিয়ে এসে নীচে পড়ে।

এ রকমের স্বপ্ন ডান আরও দেখেছেন—তবে অনেক ছাঁটকাট করে যেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না সেইগুলিরই বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এ স্বপ্নগুলির বিচারে তিনি মনে করেন না যে এগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া হিসাবে তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে—বা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ধরবার কোন বিশেষ ক্ষমতার জন্যই তিনি এই স্বপ্নগুলি দেখেছেন। জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত সাধারণ ব্যাপার মানুষের ঘটে এগুলি তারই অসংলগ্ন আভাস মাত্র। শুধু নূতনত্ব হচ্ছে এগুলি ঘটনা ঘটবার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন হিসাবে আসছে—যদি ঘটনার পরবর্ত্তী রাত্রিতে এ স্বপ্নগুলি দেখা হতো তাহলে কোনই নূতনত্ব থাকতো না। ডান যে কোন medium হয়েছিলেন তাও বলা চলে না—তাঁর অদৃষ্টদর্শনের ক্ষমতাও ছিল না। স্বপ্নগুলির ভেতর কোন অসাধারণ ব্যাপারও নেই। কালপ্রবাহের গতিকে যদি একটী নূতন ধারা (dimension) হিসাবে ধরা যায় তাহলে বল্‌তে হবে যে ডানের অনুভূতিতে ঘটনাগুলি কখনো কখনো এই কালপ্রবাহে স্ব স্ব স্থানচ্যুত হয়ে ধরা পড়ছিল। কালপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন বল্‌লে এ সব অনুভূতির অর্থনির্দ্দেশ চলে না, কালপ্রবাহ বস্তুতঃ নানা বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য, ডানের ব্যাপারে এই খণ্ডগুলি ওলট-পালট হচ্ছিল—কালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ঘট্‌ছিল না।

এর কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে ডান সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বপ্ন হচ্ছে অতীতকালের ও ভবিষ্যৎকালের অনুভূতির আভাস বা image দিয়ে গঠিত। যে কালপ্রবাহের ভেতর দিয়ে জগৎ চলেছে তা শুধু আমাদের নিজেদের মনের তৈরী বাধায় বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ কালের যে অংশকে আমরা বর্ত্তমান বলি সেটার কোন স্থায়ীত্ব নেই—জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে চৈতসিক বাধা mentally imposed barrier তৈরী করি তাতেই বর্ত্তমানের উৎপত্তি—সেই বাধা বিনষ্ট হলে কাল-প্রবাহে অতীত ও ভবিষ্যৎ অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—তখন আমরা অতীতের ছায়াও যেমনি ধরতে পারি ভবিষ্যতের ছায়াও তেমনি ধরতে পারি। এখানে ডান সাহেবের কথার মূল উদ্ধার করলে তাঁর কথা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'The dreams were composed of **images of past experience and images of future experience blended together in approximately equal proportions.**

That the universe was, after all, really stretched in time, and that the lop-sided view we had of it—a view with the "future" part unaccountably missing, cut off from the growing "past" part by a travelling "present moment"—was due to a purely mentally

imposed barrier which existed only when we were awake? So that, in reality, the associational net-work stretched, not merely this way and that way in space, but also backwards and forwards in Time; and the dreamer's attention, following in natural, unhindered fashion the easiest pathway among the ramifications, would be continually crossing and recrossing that properly non-existent equator which we, waking, ruled quite arbitrarily athwart the whole.

একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে সম্বদ্ধ অতীতের ছায়াও যতটা ধরা যায় ভবিষ্যতের ছায়াও ততটা ধরা যায়—তাহলে শুধু স্বপ্নেই তা' সম্ভব হয় কেন? চেষ্টা করলে সে সব ছায়া জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ পেতে পারে না কি? ডান সাহেবের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জাগ্রত অবস্থায় যদি অতীতের ছায়া চিত্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরা পড়তে পারে। এ সিদ্ধান্ত দৃঢ় করবার জন্য ডান সাহেব নানা বই নিয়ে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় তিনি যে উপায় অবলম্বন করেন সেটা একটু নূতন রকমের। যে বই তিনি পূর্ব্বে কখনো পড়েননি অথচ পরমুহূর্ত্তে পড়তে চাইছেন—সেই বইয়ের নামের ওপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ করা ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। একাগ্রতা এনে যে সব ছায়া মনে ভেসে আসে তার থেকে অতীতের ছায়াগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অপরিচিত ছায়াগুলিকে রাখতে হয়। তারপর বই খুল্‌লেই এই সব ছায়ার কিছু খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। এই উপায়ে ডান সাহেব নূতন নূতন বই নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেছেন সেগুলি প্রায়ই সফল হয়েছে ও তাঁর পূর্ব্ব সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছে।

Relativity অনুসারে ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস চলে—কিন্তু তা অন্যরূপে। 'ক'এর ভবিষ্যৎ 'খ'এর নিকট বর্ত্তমান হিসাবে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু 'ক'এর নিকট যা ভবিষ্যৎ তা ঘটবার দু-তিন দিন পূর্ব্বে যে 'ক'এর নিকটে তা ধরা পড়তে পারে সে কথা Relativity বিশ্বাস করে না। ডান সাহেব নানা ভাবে সেই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কালপ্রবাহের যে বিশিষ্ট গতি আছে তা না জানার দরুনই আমরা অদূর ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কালপ্রবাহের গতি এমনই ধরণের যে আমরা চেষ্টা করলেই কোন এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে যেমন অদূর অতীতের স্মৃতি ধরতে পারি তেমনি অদূর ভবিষ্যতের ছায়াও ধরতে পারি। তার ভেতর কোনই অলৌকিকতা নেই—বিজ্ঞানের হিসাবেই তা সম্ভব।

(২)

ডান সাহেবের কথা সংক্ষেপ করে বল্‌লে এই দাঁড়ায় যে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চিত্ত এত বিক্ষিপ্ত ও বাহ্যজগতের সঙ্গে ব্যবহারে এত

জড়িত হয়ে পড়ে যে তখন আমরা ভবিষ্যতের ছায়া কিছুই ধরতে পারি না। স্বপ্নে যখন বাহ্যজগতের সঙ্গে চিত্তের ব্যবহার থাকে না, তখন ভবিষ্যতের ছায়া কখনো কখনো সেখানে ভেসে আসে। জাগ্রত অবস্থাতেও চিত্তের একাগ্রতা আনতে পারলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরতে পারা যায়। কালপ্রবাহের গতিতে সত্যই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোন ব্যাপার নেই—জাগ্রত অবস্থায় বা চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেই বর্ত্তমানের ধারণা জন্মে, আর সেটা না থাকলে শুধু থাকে কালপ্রবাহের গতির একটা মাত্র ধারা। ডান সাহেবের এই মতগুলিকে যখন বিজ্ঞানের জগৎ মেনে নিয়েছে তখন আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যেসব অনুরূপ মত আছে সেগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে নিদ্রার দুটী অবস্থাভেদ আছে—একটী স্বপ্ন, অন্যটী সুষুপ্তি। স্বপ্নের শব্দগত অর্থ হচ্ছে নিদ্রা, যোগরূঢ় অর্থ নিদ্রিতের 'বিজ্ঞান' বা 'দর্শন' (প্রসুপ্তস্য বিজ্ঞানম্)। এ অবস্থায় নিদ্রিতের নিদ্রা গাঢ় নয়, মন সক্রিয় থাকে ও মনের নানারূপ সৃষ্টি ও কল্পনা চলে। আর সুষুপ্তি হচ্ছে গাঢ় নিদ্রার অবস্থা, তখন মনের কোন কামনাই থাকে না—কোন স্বপ্নদর্শনও হয় না। তাই মাণ্ডুক্য-উপনিষদে সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।" স্বপ্নে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বর্ত্তমান থাকে—বাসনা সূক্ষ্মাকারে প্রবল থাকে, তাই জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যে সব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে স্বপ্নেও সেই সমস্ত ব্যাপারই তার সম্ভব হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসমূহের ক্ষণিক লয় প্রাপ্তি হয়, সেই জন্যই মনের সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়। থাকে শুধু অবিক্ষিপ্ত চৈতন্য—সে অবস্থা যোগের সমাধির অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মকে 'চতুষ্পাদ' বলা হয়েছে—আত্মার সেই চারটী পাদ বা স্থান হচ্ছে—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান, ও "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। বস্তুতঃ এই চারটি, আত্মার বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছু নয়। জাগরিত স্থান—"বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ"। এ অবস্থায় আত্মা 'বহিঃপ্রজ্ঞ' অর্থাৎ আত্মার তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ ও সেই জগতের বিষয়সমূহে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন 'সপ্তাঙ্গ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নানাভাবে বিষয় গ্রহণ করবার শক্তি তার প্রবল। আত্মা তখন 'একোন-বিংশতিমুখ'—অর্থাৎ তখন 'পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও চতুরন্তঃকরণ' সক্রিয়। এ অবস্থায় আত্মা স্থূল জগতের বিষয়সমূহ উপভোগ করে—আর তার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার চলে

আত্মার যখন এই বহির্মুখিতা বন্ধ হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি যখন ভেতরে প্রবিষ্ট হয় তখনই স্বপ্নাবস্থার আরম্ভ। তাই বলা হয়েছে—"স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ।" এ অবস্থায় আত্মার ক্রিয়া স্বপ্নদর্শন, জ্ঞান অন্তর্মুখী। আত্মা তখন সূক্ষ্ম বাসনাসমূহই ভোগ করে—স্থূলজগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকে না—মনের বিভূতিসমূহেরই অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন তৈজস বা তেজোময়। স্বপ্নের এই অর্থ ছান্দোগ্য-উপনিষদেও নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। 'যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনম্ স্বপিতীতি আচক্ষতে। স্বম্ হ্যপীতো ভবতি'—অর্থাৎ যখন কোন লোকের নিদ্রা যাওয়ার কথা বলি তখন বুঝতে হবে যে সে তার সৎ বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েছে। সে তখন নিজের ভেতর প্রবিষ্ট হয়েছে (স্বম্-হ্যপীতো ভবতি) ও সেই অর্থেই 'স্বপিতি' কথা ব্যবহার করা হয়। বাসনাগুলি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলেই মন সেগুলিকে অবলম্বন করে লৌকিক জগতের বিষয়ের অনুরূপ বিষয়সমূহ সৃষ্টি করে। তাই স্বপ্ন নানাপ্রকার বিৎশক্তিময়—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভাবের লীলাও চলে।

সুষুপ্তির অবস্থায় এ সমস্ত লীলার অবসান হয়। তাই সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে "একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"। সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আত্মা 'একীভাব'প্রাপ্ত হয় তখন নানা বিষয়ে আত্মা বিক্ষিপ্ত নয়। বাসনাসমূহ সাময়িকভাবে বিনষ্ট নয়। তার বাসনা বিনষ্ট হলেই বহুর বা দ্বৈতের জ্ঞানও থাকে না—তখন প্রজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি একীভূত ও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। আত্মা সে অবস্থায় আনন্দময় ও আনন্দভোজী অর্থাৎ আনন্দ অবলম্বন করেই আত্মার তখন স্থিতি হয়। আত্মা তখন চেতোমুখ—সমস্ত চেতনা তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। আত্মার তখন আনন্দময় ও আনন্দভোজী হবার কারণ এই তখন বিষয়বিষয়ী আকারে ও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে কোন মানস ব্যাপার ও আয়াস থাকে না, কোন প্রকার ক্লেশও থাকে না—শুধু থাকে আনন্দ। আত্মা তখন চিন্ময় বলেই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিজ্ঞানের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী অর্থাৎ অন্তরে থেকেই সমস্ত শক্তিকে নিয়মত করে, এবং সেইজন্য আত্মা, এই অবস্থায় সমস্ত ভাবের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান; আত্মা সমস্ত জগতের কারণ। সেইজন্যই সুষুপ্তির নামান্তর—কারণ শরীর।

কিন্তু আত্মার এ অবস্থাও শেষ অবস্থা নয়। কারণ সুষুপ্তির অবস্থা সাময়িক, নিদ্রার ঘনত্বের অবসান হলেই সুষুপ্তি অবস্থার সমাপ্তি হয়, সে অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ সে অবস্থা আনন্দময় ও চিন্ময় বটে কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী হলেই আত্মার শেষ অবস্থা লাভ

হয়। আত্মার সে শেষাবস্থা হচ্ছে চতুর্থপাদ বা তুরীয় স্থান, যাকে বলা হয়েছে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। মাণ্ডুক্যে এই তুরীয় অবস্থার যে বর্ণনা রয়েছে সেটা হচ্ছে—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃশ্যম্-অব্যবহার্য্যম্-অগ্রাহ্যম্-অলক্ষণম্-অচিন্ত্যম-অব্যপদেশ্যম্-একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

[তুরীয়পাদ অন্তঃপ্রজ্ঞও নয় বহিঃপ্রজ্ঞও নয়, কিম্বা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্নও নয়, ঘনীভূত প্রজ্ঞাও নয়, জ্ঞাতাও নয় অচেতনও নয়। এই চতুর্থপাদ অদৃশ্য নয়, এর সঙ্গে কোন ব্যবহার চলে না, সে অবস্থা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয়, চিন্তার অতীত, ও শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশনীয় নয়। তার কোন লক্ষণ নেই—স্বকীয় অনুভূতির ব্যাপার। এ অবস্থা নানা প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, শান্ত বা নির্ব্বিকার, মঙ্গলময় ও অদ্বৈত। এই আত্মার প্রকৃত অবস্থা—একমাত্র জ্ঞাতব্য সত্য]।

এখানে আমাদের 'তুরীয়' অবস্থা আলোচনার কোন আবশ্যকতা নেই—শুধু সুষুপ্তির সঙ্গে প্রভেদ দেখাবার জন্যই তার উল্লেখ। সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার অনুরূপ হলেও প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র থাকে বলেই সুষুপ্তির পর পুনরায় স্বপ্ন ও জাগরণ আসে। কর্ম্মবীজ নষ্ট হলেই সুষুপ্তি ও তুরীয়ের অবস্থায় কোন প্রভেদ থাকতো না। তাই বলা হয়েছে—

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥

[সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারণে বিলীন হয় তখন জীব তমোগুণে আবৃত হয়ে আনন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তরার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় সৎরূপ লাভ করেও সেই জীব আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।]

সুষুপ্তির অবস্থায় প্রাণবায়ু কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাও নানা উপনিষদে বিশদ করে বলা হয়েছে। জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থায় প্রাণবায়ু আমাদের দেহের নানা নাড়ী বেয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নহীন নিদ্রার অবস্থায় প্রাণবায়ু হৃদয় থেকে শিরোদেশ পর্য্যন্ত যে সব নাড়ী বিস্তৃত রয়েছে সেই সব নাড়ীতে প্রবেশ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তম্ ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্ন ভবতি।

[সুপ্তাবস্থায় যখন সমস্ত শান্ত হয় ও কোন স্বপ্নদর্শন ঘটে না তখন প্রাণবায়ু নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে—তখন কোন পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না—আত্মা তেজসম্পন্ন হয়।]

এই নাড়ীকে হৃদয়ের নাড়ী (হৃদয়স্য নাড্যঃ) বলা হয়েছে। নাড়ী বহুসংখ্যক তন্মধ্যে একটী হচ্ছে প্রধান—সেটী হৃদয় থেকে শিরোদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। প্রাণ সেই নাড়ীগত হলেই মানুষ অমৃতত্ব বা অমরত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু অন্যান্য নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট হলে ইতস্ততঃ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।*

এই কথাই আরও স্পষ্ট করে অন্যত্র বলা হয়েছে—যখন মানুষ সুপ্ত হয় ও যখন কোন স্বপ্ন দেখে না তখন প্রাণবায়ু একীভূত হয়। তখন বাক্ নামসমূহের সঙ্গে, চক্ষু সমস্ত রূপের সঙ্গে, শোত্র শব্দসমূহের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিন্তার সঙ্গে সেই একীভূত প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়। আর জাগরণের অবস্থায়, জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় তেমনি প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়সমূহে প্রত্যাগত হয় ও নানা বাহ্য লোকের সঙ্গে তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।*

পূর্ব্বেই বলেছি যে সুষুপ্তির যোগের সমাধির অবস্থার অনুরূপ। সুষুপ্তিতে একাগ্রচিত্ততা সাধারণভাবে আসে, কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না বলেই বোধহয় প্রাচীন ঋষিরা যোগাবলম্বনে বহুক্ষণস্থায়ী একাগ্রচিত্ততা আনবার উপায় উদ্ভাবন করেন। যোগাবলম্বনে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগীর চিত্তে সম্পূর্ণ স্থিরতা আসে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অভ্যন্তরে লয় প্রাপ্ত হয়, বাক্ দর্শন, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্যমান জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না—মনে কোন বিকল্পাত্মক জ্ঞান থাকে না--সমস্ত চিৎশক্তির একত্র সমাবেশে তখন চিত্ত তেজোময় হয়, বাহ্য জগতের সঙ্গে ব্যবহার না থাকায় চিত্ত তখন আনন্দময় হয়। এ অবস্থায় কালজ্ঞান থাকে না—অতীত ও ভবিষ্যৎ তখন সমভাবে চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাতেই আমাদের কালজ্ঞানের উৎপত্তি। সুতরাং সেই জগতের সঙ্গে যখন কোন ব্যবহার

---

* শতম্ চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ —
তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। (ছান্দোগ্য)।

* যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তথৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপোতি শোত্রং সর্ব্বৈ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্জলতো সর্ব্বাদিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। (কৌষিতকী উপনিষদ্)।

আর থাকে না তখন কালপ্রবাহ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন ধারণাই থাকে না। এই কথা সিদ্ধপুরুষেরা সাঙ্কেতিক ভাষায় নানা প্রকারে ব্যক্ত করেছেন—

জহি মণ পবণ ণ সঞ্চরই রবি সসি ণাহ পবেস
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিঅ উএস ॥

[সরহ উপদেশ করছেন—সেই সমাধিতে চিত্তের বিশ্রাম সাধন কর যেখানে রবি শশী প্রবেশ করে না, যেখানে মনপবন সঞ্চরণ করে না।]

রবি শশী হচ্ছে দিবারাত্রিরূপ কাল প্রবাহের প্রতীক। সমাধির অবস্থায় কালপ্রবাহের জ্ঞান থাকে না, সেইজন্য বলা হয়েছে যে সেখানে রবি শশীর প্রবেশ নাই ; প্রাণবায়ুর চলাচল বন্ধ হয় বলেই মন স্থিরীকৃত হয়—তখন আর সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে না।

এই হিসাবেই বোধহয় আমাদের যোগ ও দর্শনশাস্ত্রে ধরা হয়েছে যে যোগীগণ ত্রিকালদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁদের নখদর্পণে। সমাধির অবস্থায়, তাঁদের কালপ্রবাহের গতিসম্বন্ধে জ্ঞানের ভূতভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান হিসাবে পৃথক সমাবেশ না হয়ে একত্র সমাবেশ হতো—সুতরাং লৌকিক হিসাবে যা অতীত ও ভবিষ্যৎ, তা তাঁদের নিকট সমাধির অবস্থায় স্পষ্ট প্রতিভাত হতো—এ বিশ্বাস শাস্ত্রকারদের ছিল। সুষুপ্তির অবস্থাতেও তা কিয়ৎপরিমাণে ঘটা সম্ভবপর কারণ সুষুপ্তি ও সমাধিতে চিত্তের অবস্থা শাস্ত্রকারদের হিসাবে অনুরূপ। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে হিন্দুদর্শনানুসারে স্বপ্নের অবস্থা সুষুপ্তির নিম্নস্তরের কিন্তু স্বপ্নাবস্থা থেকেই চিত্ত সুষুপ্তিতে প্রবেশ করতে পারে। তাই স্বপ্নাবস্থার সহসা লয় হয়েই সুষুপ্তি আসে না—সে লয় ক্রমশঃ সাধিত হয়, সুতরাং স্বপ্ন যখন সুষুপ্তির কিনারায় এসে পৌছায় তখন সুষুপ্তির অবস্থায় যে সমস্ত অনুভূতি হয় সেই সমস্ত অনুভূতিই যে কিয়ৎপরিমাণে চিত্তে প্রতিফলিত হবে না তা কে বল্‌তে পারে ?

তাই একথা আমরা নির্ভয়েই বল্‌তে পারি যে কালপ্রবাহের গতি ও স্বপ্ন সম্বন্ধে ডান সাহেব বিজ্ঞানসম্মত-প্রথানুসারে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন তার পরিচয় আমাদের দর্শনশাস্ত্র থেকে পূর্ব্বেই পেয়েছি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জগৎ থেকে আস্‌ছে বলেই যা নূতন ঠেকেছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মাঞ্চুকুয়ো

১

মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা আজ দু'বছর ধরে সমস্ত জগৎকে চিন্তিত করে তুলেছে। এই প্রদেশের আধিপত্য নিয়ে চীন ও জাপানের সঙ্ঘর্ষ আজকের দিনের নৈরাশ্য বৃদ্ধি করছে দু'টি কারণে। এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সখ্য ও এশিয়ার ঐক্য বর্ত্তমান যুগে যে স্বপ্নমাত্র, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অন্যদিকে জগদ্ব্যাপী মহাসংগ্রামের পর যুদ্ধনিরোধের যে বিপুল উদ্যম ও নবযুগ প্রবর্ত্তনার যে বিশাল আশা থেকে জেনীভার জাতিসঙ্ঘ জন্ম নিয়েছিল তার নিষ্ফল পরিণতি এই ব্যাপারে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

চীন ও জাপানের সঙ্ঘাত অবশ্য নূতন নয়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের পর থেকে এই ষাট বছর বারম্বার তার পরিচয় পাওয়া গেছে। ইউরোপের সংস্পর্শের ফল দুই দেশে ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশীর কার্য্যকলাপে চীনবাসীদের মনে বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব অবিচলিত থেকে গেল। সেইজন্য বিংশ শতাব্দীর আগে ইউরোপের কাছে শাসনপদ্ধতি, সমরকৌশল ও নানা বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা চীনে প্রবল হয়নি। পক্ষান্তরে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকেই জাপানীদের সাধনা হলো এই যে ইউরোপের অস্ত্র-শস্ত্র, রণচাতুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতা আয়ত্ত করে এমন শক্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে জাপান পৃথিবীর প্রধান জাতিগুলির সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারে। অতি অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত সাফল্য লাভ করে জাপান যখন প্রাচ্যে তার আধিপত্যের সূচনা করলে তখনও চীনের উদাসীন অলস তন্দ্রাজড়িত ভাব কেটে যাবার লক্ষণ দেখা যায়নি।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের নবার্জ্জিত শক্তির প্রয়োগ প্রতীচ্যেরই পদানুসরণের চিহ্ন। জাপানী সৈন্য ১৮৭৪ সালে সামান্য কারণে ফর্মোজা আক্রমণ ও পর বৎসর লুচু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের প্ররোচনায় চীনের বশ্যতা অস্বীকার করলে পরে, ১৮৯৪ সালে চীনের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কোরিয়াতে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক এই সময়ে জাপানের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সম্মিলিত প্রভাবে ব্যর্থ হলেও রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর (১৯০৫) এ অঞ্চলেও জাপানের গতিরোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনে বাণিজ্য ও বসবাস

সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ অধিকার অর্জ্জন করেছিল তার প্রত্যেকটিতে জাপানেরও অংশ থেকে গেল। ১৯১৪ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বেল্‌জিয়মের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য হওয়ার প্রতিবাদে সমস্ত জগৎ যখন প্রতিবাদ-মুখরিত, ঠিক সেই সময় চীনের আপত্তি সত্ত্বেও জাপান চীনের ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনা করে জার্ম্মানদের হাত থেকে শান্‌-টুং প্রদেশ অধিকার করে। অন্য সকল দেশ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত সেই অবসরে (১৯১৫) জাপান দুর্ব্বল চীনের কাছে একুশটি দাবী জানায়—তার মধ্যে যেগুলি চীনকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল তার ফলে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অধিকার বিশেষ করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ১৯২২ সালে এমেরিকার অনুরোধে শান্‌-টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করা হয় বটে, কিন্তু ওয়াশিংটন্ চুক্তির ফলে চীন-অঞ্চলে জাপানের শক্তি অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত থেকে গেল বলা যেতে পারে। পাঁচ ছ' বছর আগে জাপান শান্‌-টুং প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য দু'বার সৈন্য প্রেরণ করেছিল এ কথাও মনে রাখা ভাল। অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে চীনের সীমার মধ্যে জাপানী সেনার আবির্ভাব এবং চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে জাপানের হস্তক্ষেপ একেবারেই বিরল নয়।

এই সঙ্ঘর্ষে এখন পর্য্যন্ত বারবার চীনেরই পরাজয় হয়ে এসেছে। জাপানের শাসকেরা সুদক্ষ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা জাপানে সুনিয়ন্ত্রিত, শিক্ষিত যোদ্ধা হিসাবেও জাপানীদের সহিত চীনবাসীদের তুলনা হয় না। ভৌগোলিক সংস্থাপনের গুণে জাপানের পক্ষে চীন আক্রমণ সহজ এবং জাপানী নৌবাহিনীর সামনে চীনের উপকূলস্থ জনপদগুলি অসহায়। বহুদিন পর্য্যন্ত চীনের উপর জাপানের প্রভুত্বস্থাপনের পথে দু'টি মাত্র বাধা ছিল—পূর্ব্বদেশে রাশিয়া, এমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতির স্বার্থ এবং চীনের বিরাট বিস্তার। কিন্তু ১৯১৯ সালের পর থেকে চীনের পুনর্জন্মের প্রতীকস্বরূপ জাতীয় মনোভাবের দ্রুত প্রসার তৃতীয় একটি বাধার সৃষ্টি করেছে একথা বলতেই হবে।

২

চীন-অঞ্চলে জাপানীদের উদ্দেশ্য ঠিক সাম্রাজ্য-বিস্তার বলা চলে না—উপকূলস্থিত দ্বীপগুলি ব্যতীত শুধু কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণপ্রান্তস্থ লিয়া-টুং উপদ্বীপ মাত্র জাপানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয়দের অনুকরণে প্রাচ্যে আপন ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা চীনের সম্বন্ধে জাপানের প্রতিকূলতার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান জগতের প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আজ জাপানের যে পদমর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে চীনে প্রভুত্বস্থাপনের উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানের

ব্যবহারের মূলে রয়েছে জাপানের আর্থিক অবস্থা নিরাপদ ও উন্নত করবার প্রচেষ্টা।

জাপানের লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে অথচ ক্ষুদ্রায়তন দেশটির এমন সামর্থ্য নেই যে স্বকীয় সম্পদে দেশবাসী সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারে। মুসোলিনীর ভাষায় জাপানকে বর্ত্তমান জগতের proletarian nation-দের অন্যতম বলে অভিহিত করা যায়। এ অবস্থায় জাপানীদের মতে দু'টি মাত্র উপায় অবলম্বন সম্ভবপর—কেননা আধুনিক ইটালীয়দের মতন জাপানীদেরও বিশ্বাস যে জনসংখ্যানিরোধের চেষ্টা জাতির পক্ষে অকল্যাণকর ও দেশের পতনের সূত্রপাত। প্রথম উপায় দলে দলে বিদেশে বসতি স্থাপন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, এমেরিকা প্রভৃতিতে জাপানীদের অবাধ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিদেশে বসবাসের ফলে স্বদেশের লোক ও শক্তি ক্ষয় অনিবার্য্য,—পররাষ্ট্রে বাস করে স্বদেশের সঙ্গে যোগ রক্ষাও প্রায় অসম্ভব। তাই জাপানীরা তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে এমনভাবে উন্নত করতে চায় যাতে করে বর্দ্ধিষ্ণু লোকসমষ্টির আর্থিক কল্যাণ আপনা হতেই সম্পন্ন হবে।

বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অঞ্চলে প্রতিপত্তি ও একাধিপত্য প্রয়োজন এ বিশ্বাস সকলেরই মনে বদ্ধমূল। নানা দেশের সঙ্গে জাপানের ব্যবসা আছে বটে কিন্তু একমাত্র চীনেই তার প্রভুত্বস্থাপন সম্ভবপর। দেশবাসীদের আর্থিক উন্নতিসাধনের সঙ্কল্প ও চীনের বাহিরে অন্যত্র সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিস্তর বাধা—চীনে জাপান কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সবিশেষ চেষ্টার মূল কারণ এই দু'টি।

চীনের মধ্যে আবার উত্তর সীমান্তে মাঞ্চুরিয়া নামে পরিচিত তিনটি প্রদেশের মূল্য জাপানের নিকট অত্যন্ত অধিক। মাঞ্চুরিয়া, জাপান ও কোরিয়ার প্রতিবেশী, মাঞ্চুরিয়ার ধনসম্পদ সুপ্রচুর, ভবিষ্যতে তার উন্নতির সম্ভাবনাও অসীম। উনবিংশ শতকের শেষে বিদেশী শক্তিবৃন্দের মনে যখন চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সঙ্কল্প উদিত হয় তখন থেকেই জাপানের দৃষ্টি মাঞ্চুরিয়ার উপর ন্যস্ত। ১৯০৫ ও ১৯১৫ সালের সন্ধিগুলির ফলে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ অংশে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও অন্য তিনটি কারণে জাপানীদের কাছে এই প্রভুত্ব ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। জাপান সরে দাঁড়ালে চীন রাশিয়ার হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া রক্ষা করতে পারবে না। তাই রাশিয়ান্‌দের বিতাড়িত করতে সহস্র সহস্র জাপানী মাঞ্চুরিয়ায় দেহরক্ষা করেছে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্যুদ্ধের প্রকোপে চীন যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন জাপানের ইঙ্গিতেই মাঞ্চুরিয়ায় শান্তিভঙ্গ করতে কেউ সাহস পায়নি। গত পঁচিশ বছরে মাঞ্চুরিয়ার

অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে জাপানের অর্থ, পরিশ্রম ও নেতৃত্ব,—জাপানীদের এ বিশ্বাসও দৃঢ়মূল।

মাঞ্চুরিয়া জাপানের উপনিবেশ একথা অবশ্য সত্য নয়—সে দেশে জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি জাপানের শস্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। এই প্রদেশের তূলা, লোহা, কয়লা ও কাঠ জাপানের বহু ফ্যাক্টরীকে আজ কর্ম্মরত রেখেছে। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী পণ্যদ্রব্য বহুপরিমাণে বিক্রয় হয়। জাপানী ধনিকেরা মাঞ্চুরিয়ার সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টায় অর্থনিয়োগ করে প্রভূত লাভ করছে। এই অঞ্চলে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রয়েছে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর হাতে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে এই কোম্পানী জাপানের তত্ত্বাবধানে আসে। সেই অবধি এর অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি বিস্ময়জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রেললাইনের দুই পাশের ভূমিখণ্ড জাপানের সম্পত্তি—লাইন রক্ষার জন্য কোম্পানীকে সৈন্য রাখার ক্ষমতা চীন বাধ্য হয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই কোম্পানীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি—ফ্যাক্টরী, খনি, জাহাজের ডক্, ট্যুরিষ্টদের জন্যে হোটেল, কর্ম্মচারিদের জন্য স্কুল ইত্যাদি; কোন কিছুরই অভাব নেই। জাপানীদের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এই বিশাল বিদেশী শক্তি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার সকল ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করছে।

অথচ এতোদিন পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়া চীনেরই অংশ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সম্রাটদের পতনের পর নূতন রিপাব্লিক্‌কে প্রদেশ-তিনটির শাসক বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। যে সন্ধি কয়েকটির উপর মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত সে সবগুলি চীনেরই সঙ্গে সন্ধি। চীনদেশে ঘোর অরাজকতার দিনেও মাঞ্চুরিয়ার স্বাতন্ত্র্য দাবী করা হয়নি, মনে রাখা আবশ্যক। মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অধিকার যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এ বিষয়ে চীনবাসীদের মনে অন্ততঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তারা কখনও ভোলে না যে মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক উন্নতির হেতু শুধু জাপানের অর্থ ও নেতৃত্ব নয়—গত কয়েক বৎসরে যে লক্ষ লক্ষ চীনবাসী মাঞ্চুরিয়ায় বসতি করেছে তাদের শারীরিক শ্রম ও কর্ম্মকুশলতা ভিন্ন এ উন্নতি অসম্ভব হতো। দুর্ব্বল চীনের কাছ থেকে জাপান যে অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেগুলি অন্যায়, চীনের সকলেরই এই এক মত। সে অধিকার ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নূতন জাতীয়দলের এই বিশ্বাস জাপানের পক্ষে সন্দেহ ও ত্রাসের কারণ।

প্রতিবেশী জাতি দুইটির স্বার্থবুদ্ধিতে এবং ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার সঙ্ঘাতে মাঞ্চুরিয়ার জটিল সমস্যা গঠিত।

৩

দু'বছর আগে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হয়। জাপানী-পরিচালিত রেল-লাইনগুলির প্রতি-যোগিতা করে চীন নূতন লাইন নির্ম্মাণ করাতে এ গোলযোগের সূত্রপাত। জাপানের মতে পূর্ব্বতন সন্ধিগুলির গুপ্তসর্ত্ত অনুসারে চীনের এ স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে; চীন বলে এ সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার কোন কালে দেওয়া হয়নি। এই মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেলে অন্য কারণে—এই সময় মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কোরীয় প্রজা ও চীনা অধিবাসীদের মধ্যে সহসা একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে নাকামুরা নামে এক জাপানী সেনাধ্যক্ষ নিহত হন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দস্যুরা জাপানী রেল-লাইন আক্রমণ করামাত্র জাপানী সৈন্যেরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার প্রধান নগরগুলি অধিকার করে। যেরূপ ক্ষিপ্রভাবে এ কাজ সম্পন্ন হয় তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সমস্ত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অধিকার জাপানীরা পূর্ব্ব থেকে স্থির করে রেখেছিল। জাপানে সৈন্য-বিভাগ মন্ত্রীসভার অধীন নয়—সুতরাং মাঞ্চুরিয়া অধিকার হয়ত সেনাপতি-দের সঙ্কল্পমাত্র ছিল; কিন্তু তাঁদের কাজ জাপানী জনসাধারণের যে সানন্দ সমর্থন পেলে তার ফলে মন্ত্রাদেরও অন্য পন্থা অবলম্বনের কোন উপায় রইল না। এদিকে চীনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত জাপানের আচরণের তীব্র প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ জাপানী পণ্যবর্জ্জনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হলো, কেননা বয়কট্ ব্যাপারে বহুদিনের শিক্ষানবিশীর ফলে চীনেরা সিদ্ধহস্ত। অল্পদিনের মধ্যে এইরূপে চীনের প্রধান বন্দর শাঙ্ঘাই-নগরীতে জাপানী-বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। বর্জ্জন-আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ও জাপানী প্রজার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ-স্বরূপ তখন জাপান শাঙ্ঘাই আক্রমণ করে। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় এবং ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে শাঙ্ঘাই-অঞ্চল থেকে জাপানী সৈন্য অপসৃত হলো। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের মুষ্টি শিথিল হবার কোন লক্ষণ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনার জন্য জাপানেরই অনুরোধে জাতিসঙ্ঘ লীটন্ সমিতির নিয়োগ করেন। এই সমিতির সিদ্ধান্ত জাপানের অনুকূল হবে না এ আশঙ্কায় কিছুদিন হলো জাপান মাঞ্চুরিয়াকে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেছে। জাপানের ছায়াশ্রিত, পৃথিবীর এই নবীনতম রাষ্ট্রটির নাম হয়েছে মাঞ্চুকুয়ো। চীনের অন্তর্গত প্রদেশে যে ক্ষমতা ব্যবহার করা চলে না, তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যে অবশ্য তার পথে কোন বাধা থাকবে না—এই প্রত্যাশাই মাঞ্চুকুয়ো-সৃষ্টির ভিত্তি।

লীটন্ সমিতির সিদ্ধান্ত এখন জাপান নির্ব্বিবাদে পদদলিত করছে। মাঞ্চুকুয়োকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে দলে দলে জাপানী সৈন্য ও কর্ম্মচারী সে দেশে প্রেরিত হচ্ছে ; চীন যাতে তার নষ্ট অধিকার পুনরুদ্ধার না করতে পারে সেজন্য সীমান্তে অভিযানের ব্যবস্থা হয়েছে। মাঞ্চুরিয়ায় স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চীনের পক্ষে স্বাভাবিক একথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবে না। সম্প্রতি জেহোল প্রদেশে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেল তার কারণ চীনের এই চেষ্টা ও জাপানের তাতে বাধাদান। এখন পর্য্যন্ত এই ঘাত-প্রতিঘাতে জাপানই বিজয়ী হয়েছে এ কথা বলা বাহুল্য।

৪

বিগত মহাযুদ্ধের পর জেনীভায় যখন জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধবিগ্রহ থামানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা তখন বিধিবদ্ধ হয় যে জাতিসঙ্ঘের সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে বিবাদের অবসানের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। জাতিসঙ্ঘের কোন সভ্যের, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষ নিবারণের তিনটি পন্থার মধ্যে অন্ততঃ একটি অনুসরণ করার দায়িত্ব এড়াবার ন্যায্যতঃ কোন অধিকার নেই। তৃতীয় কোন দেশের মধ্যস্থতা, হেগ্ নগরীর বিচারালয়ের শরণাপন্ন হওয়া কিম্বা জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিল্ বা সংসদের উপর বিবাদ-নিষ্পত্তির ভার অর্পণ—এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি শান্তিরক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ায় সংঘর্ষ হওয়া মাত্র চীন তৃতীয় প্রণালীর অনুসরণ করে, কিন্তু জাপান প্রথম থেকে জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করার ফলে আজ সর্ব্বত্র লীগ্ অব্ নেশন্সের প্রতিপত্তিহ্রাস ও সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

গত দুই বৎসর জাপান জাতিসঙ্ঘকে পদে পদে অপমান করছে অস্বীকার করা চলে না। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর লীগের সংসদ স্থির করলেন যে মাঞ্চুরিয়ায় দস্যুর প্রকোপ কমামাত্র জাপানের সৈন্য অপসৃত করতে হবে। জাপান এ প্রস্তাবে সম্মত হবার পর দেড় বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সেনাবল বর্দ্ধিতই হয়েছে। এতদিনেও দস্যুদমন না হয়ে থাকলে জাপানের পক্ষে কথাটা গৌরবজনক নয়। কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবে জাপান অবশ্য কিছুতেই সম্মতি দেয়নি যদিও লীগ্ কাউন্সিলের অপর সকল সভ্যেরই মতে ১৯৩১ সালের ১৬ই নভেম্বর জাপানের মাঞ্চুরিয়া শাসনের শেষ দিন ব'লে সাব্যস্ত করা সমীচীন বোধ হয়েছিল। লীটন্ সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে (১৯৩২) মাঞ্চুরিয়া চীনের অন্তর্গত থাকাই ন্যায়সঙ্গত ; তবে জাপানের স্বার্থরক্ষার

জন্য উভয়পক্ষের সম্মতি অনুসারে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার উদ্ভাবন প্রয়োজনীয়। চীন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এর বেশী কোন দাবী জাপানের পক্ষেও শোভন নয়। কিন্তু জাপান এখন মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ও তার সীমাবিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত। লীটন্ রিপোর্ট সেজন্য সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। এর পর জাতিসঙ্ঘ আর কিছু করবেন কিনা সন্দেহ কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এ অপমান কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

লীগ্ অব্ নেশন্‌সের দুর্ব্বলতার কারণ সুস্পষ্ট। সঙ্ঘের বিধানে পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়মবিগহিত করা হয়নি; যুদ্ধঘোষণা না ক'রে অপর দেশ আক্রমণ করার যে প্রথা জাপান অনুসরণ করছে সে সম্বন্ধেও লীগের নিয়মাবলীতে পরিষ্কার কোন নিষেধ নেই। সর্ব্বজাতির সমতা বজায় রাখার জন্য, জাতিসঙ্ঘের কোন নির্দ্ধারণ সকলের সম্মতি ছাড়া গৃহীত হতে পারে না—এই নিয়মের ফলে জাতিসঙ্ঘ স্বভাবতঃই শক্তিহীন। অবশ্য ব্যবস্থা আছে যে বিবাদী ভিন্ন অপর সকলে একমত হলে তারা লীগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারবে। কিন্তু দেশ বিশেষের প্রতি বলপ্রয়োগ অনেকেরই চোখে জাতিসঙ্ঘের আদর্শচ্যুতির নিদর্শন ব'লে গণ্য হওয়া সম্ভব। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এখনও লীগ্ থেকে স্বতন্ত্র রয়েছে। জাপান যদি এখন লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করে তবে তার অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হবে এ আশঙ্কাও আছে। পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলির সহায়তা ভিন্ন জাতিসঙ্ঘের কিছু করার উপায় নেই অথচ তাদের মধ্যে অনেকেরই জাপানের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে এ সন্দেহও অমূলক নয়।

জাতিসঙ্ঘের শক্তি অবশ্য স্বল্পপরিসর কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে সেই সামান্য ক্ষমতা পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলা চলে না। জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব না থাকলে সম্ভবতঃ জাপান চীনের উপর আরও বেশী অত্যাচার করতে পারত। কিন্তু একথাও সত্য যে প্রথম থেকে লীগ্ সংসদ যদি দৃঢ়ভাবে জাপানের কাজের প্রতিবাদ করতেন—জাপানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ, বিদেশ থেকে জাপানের অর্থসাহায্য বন্ধ বা জাপানের পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন এই সব প্রস্তাব যদি প্রথমেই আলোচিত হত—তাহলে জাপান কখনও এতদূর অগ্রসর হবার সাহস পেত না। গত দু'বছরের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে লীগের দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ঔদ্ধত্য বেড়ে চলেছে। লীগ্ অব্ নেশন্‌সের সাবধানতা এ ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়েছে বলা চলে, কেননা এতে শুধু প্রাচ্যে নয় সর্ব্বত্রই জাতিসঙ্ঘের প্রতিপত্তি লুপ্তপ্রায় হয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের শত অভিযোগ থাকলেও সে বিবাদের সমাধান জাতিসঙ্ঘের হাতে

দেওয়াই উচিত ছিল। জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও আন্তর্জাতিক কলহে কোন দেশের যথেচ্ছ আচরণের স্বাধীনতা দাবী, এ দুটি পরস্পর বিরোধী।

লীগ্ অব্ নেশন্সের অকৃতকার্য্যতার একটি প্রধান কারণ এ সম্বন্ধে জনমতের অভাব, তাই এর শোচনীয় পরিণতির জন্যে শুধু লীগ্‌কে দায়ী করা চলে না, দোষ সকলকেই ভাগ ক'রে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনসাধারণ সজাগ ও দৃঢ়চিত্ত হলে গভর্ণমেণ্ট্‌গুলিকে বাধ্য হয়ে লীগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করতে হত। জাতিসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র। অন্ততঃ প্রধান দেশসমূহে জনমত কোন বিষয়ে প্রবল হলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার শক্তি জাতিসঙ্ঘ আপনা হতেই অর্জ্জন করে। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে এশিয়ার নানা দেশের ঔদাসীন্য মনকে পীড়া দেয়।

স্বার্থবুদ্ধি বা অন্য যে কারণেই হোক এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই জাপানের ব্যবহারে সব চেয়ে বেশী আপত্তি জানিয়েছে। চীনদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরই সদ্ভাব ছিল। নবীন চীন নানাভাবে এমেরিকার কাছে ঋণী। জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন শত্রুতাও সর্ব্বজনবিদিত। ১৯৩২ সালের প্রথমে পররাষ্ট্র সচিব মিষ্টার ষ্টিম্‌সন্ ঘোষণা করেন যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে পূর্ব্বতন সন্ধি ভঙ্গ ক'রে যদি কোন নূতন ব্যবস্থা হয় তবে সে বিধানকে যুক্তরাষ্ট্র মেনে চল্‌বে না। সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের পরিষদ (এসেম্‌ব্লি) মিষ্টার ষ্টিম্‌সনের এই non-recognition প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাজ্য ব'লে স্বীকার করা হবে না। পৃথিবীর সকল জাতি যদি এই একটি সামান্য ব্যাপারেও একমত হয়ে চলে তবে জাপানকে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কেননা জাপানের আর্থিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা এমন নয় যে জাপান অন্য দেশের উপর নির্ভর না ক'রে বরাবর তাদের উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে।

৫

জাপান যে শুধু জাতিসঙ্ঘের কভেনাণ্ট্ বা বিধান লঙ্ঘন করেছে তা নয়—দুইটি অন্য সন্ধি ভঙ্গের অপরাধ স্খালনও তার পক্ষে অসম্ভব। ১৯২২ সালে নয়টি রাজ্য সম্মিলিত হয়ে সন্ধি করে যে চীনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অধিকারহ্রাস বা রাজ্যক্ষয় করবার চেষ্টা কেউ করবে না; জাপান সেই ন'টি রাজ্যের অন্যতম। ১৯২৮ সালে জাপান কেলগ্ প্যাক্ট্ স্বাক্ষর করে—তাতে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়াস সকল দেশের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। জর্ম্মানী একটি মাত্র সন্ধিলঙ্ঘনের অপরাধে ১৯১৪ সালে সভ্যসমাজ থেকে বহিষ্কৃতপ্রায়

হয়েছিল। চীনের সীমানার মধ্যে মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন জাপানের তিন-তিনটি সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করার নিদর্শন।

জাপানের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়। সে সম্বন্ধে কিছু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

প্রথমতঃ এ কথা বলা হয়েছে যে বস্তুতঃ জাপান লীগ্ কভেনাণ্ট বা কেলগ্ প্যাক্ট্ লঙ্ঘন করেনি। উক্ত সন্ধিপত্র দুটিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে বলা চলে না। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্রতিশোধ বা reprisals নামে আজ পর্য্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব'লে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। চীনের সঙ্গে বিদেশী শক্তিবৃন্দের ব্যবহারে এর প্রচুর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। গত দশবৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও জাপান নানা কারণে চীনে সৈন্য প্রেরণ করেছে। কিন্তু এই যুক্তি জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার বা মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন সমর্থন করে না। সামান্য বলপ্রয়োগ ও বিশাল অভিযানের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে—প্রথমটির নামে একটি সমগ্র প্রদেশ অধিকার বা রাজ্য জয় কখনই চলে না। লীগ্ কভেনাণ্ট্ বা কেলগ্ প্যাক্টের কোন অর্থ থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই জাপান সন্ধিভঙ্গের দোষে দোষী। আর ১৯২২ সালের সন্ধিটি যে লঙ্ঘিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জাপানের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে চীনকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য বা জাতি ব'লে গণ্য করা অনুচিত। চীনদেশ অরাজক—অন্য রাজ্য সম্বন্ধে সভ্যসমাজ যে সব বিধিবিধান স্থির করেছে চীনে সেগুলি খাটে না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে যখন চীনে অরাজকতা আরো ব্যাপক ছিল তখন জাপান চীনের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে দ্বিধাবোধ করেনি; মাঞ্চুরিয়ায় গোলযোগের প্রথম অবস্থায় জাপান জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টার পরিবর্ত্তে চীন গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনার প্রস্তাব করেছিল; চীনের শাসকেরা বয়কট্ আন্দোলন নিরোধ করতে পারেন নি বারম্বার এই অভিযোগ আনবার সময় জাপানের স্মরণ ছিল না যে চীন অরাজক। তাছাড়া একথা কখনই বলা চলে না যে কোন একটি দেশ অরাজক কিনা এ সিদ্ধান্ত অপর একটি দেশের উপর নির্ভর করবে। একমাত্র জাতিসঙ্ঘই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার অধিকারী। লীগের একটি সভ্যও যখন মুক্তকণ্ঠে জাপানের সমর্থন করতে সাহস পায়নি তখন এ যুক্তির অসারতা স্বতঃসিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ অনেকে বল্‌তে পারেন যে মাঞ্চুকুয়ো চীনের কবল থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে—জাপান ক্ষুদ্র পরাধীন জাতির সাহায্য করছে মাত্র।

একথাও বলা হয় যে মাঞ্চুরিয়া চীনের প্রাচীন সীমার বাইরে তার স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াস দোষের নয়। লীটন্ সমিতির মতামত এ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। সমিতির সভ্যেরা জাপানের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে দেশে কোন আন্দোলন নেই; জাপানের আশ্রিত হয়েও অধিবাসীরা চীনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করতে কিছুমাত্র ব্যগ্র নয়; সে অঞ্চলে তথাকথিত জাতীয় দল জাপানেরই উৎসাহে উদ্ভূত ও এখন পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় মাত্র। বস্তুতঃ মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতার পিছনে জাতীয় কোন প্রেরণা নেই—জাপানের স্বার্থসিদ্ধিই এর ভিত্তি। তা না হলেও চীনের সীমানার মধ্যে অকস্মাৎ জাপানের এই পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তির প্রশংসা করা শক্ত—কারণ সর্ব্বত্র এর অনুকরণ চল্‌লে মঙ্গলের চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী।

উপরের যুক্তি তিনটি after-thought মাত্র। জাপানের চীন আক্রমণের আসল কারণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে আপনার স্বার্থ সংরক্ষণ। মাঞ্চুরিয়া জাপানের আর্থিক উন্নতির পথে যে কত বড় সহায় সে কথা বোঝা সহজ। কিন্তু যে উপায়ে আজ জাপান সে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে তার ফল জাপান ও সমস্ত জগতের পক্ষে বিষময়। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করতে গিয়ে সকল পৃথিবীর বিরাগভাজন হওয়া কি পরিণামে মঙ্গলজনক? নবীন চীনের সঙ্গে অন্তহীন দ্বন্দ্ব কি এতই বাঞ্ছনীয়? এমেরিকা, চীন বা অন্য দেশে জাপানী বাণিজ্যের সবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কি নিতান্ত অল্প? জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ধ্বংসের জন্য দায়ী হওয়া কি গৌরবের কথা? জাপানের প্রকৃত বন্ধু ও স্বয়ং জাপানীদের এসব কথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

শ্রীসুশোভন সরকার

ঝড়

(এল্, এ, জি, ষ্ট্রং হইতে)

মুখে ভীষণ ভ্রূকুটী, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে এবড়োখেবড়ো সরু পথ দিয়া সে চলিতে লাগিল। তারপর খোলা জমি, খানিক দূর গিয়াই সে রাস্তা ছাড়িয়া চড়াই ধরিল। আশেপাশে এখানে ওখানে ছোটখাটো কাঁটা-ঝোপ। মনের ভিতরকার রাগের চোটে উরুর উপর অমানুষিক চাপ দিয়া চলায় নরম ঘাসে তাহার পা বসিয়া যাইতে লাগিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া সে চড়াই উঠিতে লাগিল। থমথমে আকাশ—একবার সে-দিকে চাহিয়াও দেখিল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদস্রাব—সে-দিকেও দৃক্পাত করিল না। রুদ্ধ আক্রোশে তাহার মন ভারাক্রান্ত।

খানিক পরে চড়াই শেষ হইলে কষ্টের অবসান হইল। নিরবলম্ব মেঘের মত তখন সে স্বচ্ছন্দ গতিতে দুলিয়া চলিল। হঠাৎ একটা হালকা হাওয়া উঠিয়া তাহার কপাল ছুঁইল। প্রচণ্ড বিরাগ সত্ত্বেও তাহার স্নিগ্ধ আদর সে অর্দ্ধসচেতনভাবে স্বীকার না করিয়া পারিল না। অথচ তাহার মনেব ভাব তখন উপশান্তি বা লাঘবতার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই সে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সামনের বড় রাস্তা তখনও কিছু দূরে। অধীর পদতাড়নায় এই দূরত্বকে সে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রাস করিতে চায়। পাকা রাস্তার উপর তাহার বুটের লোহা কয়েকবার খট্ খট্ করিয়া উঠিল। এক লাফে সে মাঠের ভিতর পড়িতেই সবুজ তৃণের আস্তরণের মধ্যে সে শব্দ বিলীন হইয়া গেল।

কিছু দূরে দুটী কুলি রাস্তা মেরামত করিতেছিল—অবরুদ্ধ বাতাসে তাহাদের একজনের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শোনা গেল।

"জো! ঝড় আসছে!"

জোর সঙ্গী বলিল, "হুঁ! বাজ পড়তেও পারে।"

উহার স্বর বেশী গম্ভীর, কিন্তু কম স্পষ্ট।

পথিক তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিল না—আকাশের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। সূর্য্যের নিষ্প্রভ আলোকে যেন লজ্জার আভাস। উপত্যকার উপরে চারিদিক হইতে বিরসাকৃতি মেঘেরা আসিয়া জড় হইতেছে, তাহাদের প্রান্ত মেডেনহেয়ারের পক্ষ্মের মত সূক্ষ্ম। ত্রস্ত বিহঙ্গ-

ফুল আতঙ্ক-বিহ্বল ;—তাহাদের কলনাদে নিরাশার কাতরতা। কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথিক চলিতে লাগিল।

একটী নারী। কাছে থাকিলে সমস্ত দেহমন তাহাকে একান্তে চায় কেন? কাছে না থাকিলেই তাহাকে একবারও মনে পড়ে না, এই বা কি রকম? কেন, কেন এ ঝঞ্ঝাট! দূরে গেলে তাহাকে চেনাই যায় না, যেন তাহার অন্তরাত্মা সুদ্ধ বদলাইয়া যায়। যখন তাহার কাছে থাকে, কি শান্ত, তাহাকে খুসী করায় মেয়েটীর কি আগ্রহ! ভুলিয়াও একবার জোর করিয়া কোন কথা বলে না। খুব যেন সুখী, তাহার অসন্তুষ্টির যেন কোনও কারণই নাই। অথচ, একবার যদি চোখের আড়াল হইল, অমনি চিঠি, আর তাহাতে দুনিয়ার যত খুঁতখুঁতি, যত আপত্তি। "কেন ও কথা বল্লে?" ('ভ্যালা, যা হোক, আমার মনে আছে নাকি?') "কেন ও কাজ করলে?" ('বেশ করেছি, আলবৎ করব') "কেন এ কাজ করলে না?" "আমায় অপমান করছ? বেশ না হয় মূর্খ্যু আছি, জানই ত বাপু আমি মূর্খ্যু, তা আমায় অপমান করার কি দরকার ছিল?" ('আঃ জ্বালা, আমার একমাত্র কাজই কি তোমার সমালোচনা করা?')……যখন কাছে থাকে হাসির ঝরণা, দূরে গেলেই তাহার প্রত্যেকটী কাজে আপত্তি!

আর এই যে অভিযোগ, মোটেই ঝাঁঝালো নয়—ভাবিতে ভাবিতে পাথরে হোঁচট খাইয়া সে বেশ গালভরা দিব্য দিল—কেবল অসহ্য ছিঁচ্‌কাঁদনে মেয়েলিপনা! "আমি জানি আমি তোমার নেহাৎ অযোগ্য—তোমার পায়ের ময়লা হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবু আমাকে অমন ঠাট্টা কোরো না, আমার প্রেমকে উপহাস কোরো না।" সব নিপাতে যাক।

আকণ্ঠ রাগে গরগর করিতে করিতে, দাঁতে দাঁত ঘসিতে ঘসিতে সে পথ চলিতে লাগিল। কি অসহ্য ন্যাকামি! এতটুকু আত্মসম্মানও কি নাই? সোজা হইয়া একবার দাঁড়াইতেও কি সে জানে না? কিন্তু সত্যই সে পারে না—না চোখের সামনে, না চিঠির কাগজে। শুধু অন্তহীন অভিযোগের বোঝা; তাও সামনাসামনি কিছু বলার সাহস নাই। একবারও কি কিছু বলার মত বলিয়াছে? একবার সে একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল—ঝোঁকের মাথায় টানিয়া বডিস একটু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। তাতেই কি ছাই আপত্তি করিল! সেফ্‌টিপিন আঁটিয়া বসিয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল। হাঁ, যদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত, কি মুখে এক ঘা কসিয়াও দিত, তাহা হইলে না হয় বাহুবন্ধে নিষ্পেষিত করিয়া, উষ্ণ চুম্বনে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দুর্বিনীতা প্রিয়াকে

বশ মানাইত। মাঝে মাঝে একটু আধটু কড়া কথা নইলে চলে কি? সে চায় এমন নারী যে তাহার সহিত সমানে যুদ্ধ করিবে, তাহার উদ্দাম আবেগের সহিত পাল্লা দিবে। এমন স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ বেতসলতা লইয়া সে করিবে কি? এ না পারে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে, না জানে বেশ চোখা চোখা কথা বলিতে। "আমি তোমার অনেক নিচে, তাই আমাকে অশ্রদ্ধা করো। তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, তার এই প্রতিদান! কেন, আমি কি রাস্তার মেয়েমানুষ?" রাস্তার মেয়েমানুষের সম্বন্ধে কি জানে সে? কেমন হয় রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিলে—কেবল কথা, আর কথা, শুধু কথাই জানে।

ঠিক এই রকম একখানি চিঠি তাহার হাতে। চলিতে চলিতে সে দোমড়ানো চিঠিখানি সমান করিতে লাগিল। হাতের ঘামে জায়গায় জায়গায় লেখা মুছিয়া গিয়াছে—যাক্ এ রসপাত্র দুবার চাখে কার বাবার সাধ্য! আগাগোড়া একই কথা কেবল ওজর আর আপত্তি—কেবল অসহ্য প্যানপ্যানানি। না, চাঁদ, আর তোমায় এমন চিঠি লিখতে দেওয়া হবেনা। আগে আগে এই রকম চিঠি পাওয়ার পর রাগে সে দু এক দিন আর দেখা করে নাই; তাই দেখা হইলে তার রূপের আকর্ষণে রাগের কথা ভুলিয়াও গিয়াছে; ডেজীর সান্নিধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কামনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ কামনায় তাহার অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তাহার মা যে তাহাকে খোঁচা দিয়া অনুক্ষণ বলিবে ডেজী তাহার উপযুক্ত নয়—ডেজীকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে না, এ কথা সে শুনিতে চায় না। অথচ এই দুর্দ্ধর্ষ আকর্ষণের হাত হইতে সে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছে না। ডেজী ভাল তাহাকে বাসে; সেও কি করিয়া বলিবে বাহুপাশে বন্দিনী ডেজীকে ভালবাসে না? ডেজীকে দেখিলেই তাহার সব সংশয় কোথায় মিলাইয়া যায়; আবার ডেজীদের বাড়ীর গলির মোড় ফিরিলেই কুণ্ডলীকৃত সাপের মত সব সংশয় ভিড় পাকাইয়া আসে।

এবার কিন্তু আর না। এই শেষবার। আবার ঐ চিঠি! দুপুর বেলায় এক বোঝা কাঠ আসিবে। তাহার আগে কোনও কাজ নাই। ভালই হইল। রাগের প্রথম অবস্থায়ই সে ডেজীর সঙ্গে দেখা করিয়া একটা হেস্তনেস্ত করিবে। মাথার উপরে পুঞ্জীভূত মেঘ; মনের ভিতর ক্রোধের পুঞ্জীভূত বাষ্প। তাহার মানসিক অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে সে অবাক হইয়া ভাবিল, খড়ের আগুনের মত তাহার রাগ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যায়; আজ ত এতক্ষণ ধরিয়া তুষের আগুনের মত তাহার

অন্তরে ক্রোধের বহ্নি জ্বলিতেছে। সে আগুনের হল্‌কায় তাহার মন যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

বড় রাস্তা মাইল দুই পিছনে পড়িয়াছে। তাহারই উপর দিয়া একখানি মোটর চলিয়া গেল; তাহার হর্ণের বিকট শব্দ শোনা গেল—সামনে কোন বন্ধনমুক্ত ঘোড়া পড়িয়া থাকিবে। মেরিভেল পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময় তাহার গিয়ার বদলানোর শব্দ পর্য্যন্ত অতি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল। তাহার পরিবেষ্টনীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল। সূর্য্য প্রায় অদৃশ্য—আকাশ কাঁচা চামড়ার মত ঘোলাটে। উপত্যকার উপরে কালো মেঘের স্তূপ প্রাসাদচূড়া রচনা করিয়াছে। বৃষ্টি পড়িবে। বেশ ত।

আরেকটা চড়াই—তাহার পরেই ডেজীর বাড়ী দেখা যাইবে। সে জোরে পা চালাইল—এই ত আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ যে! বুদ্ধি বটে, এই ঝড়ের মুখে কাপড় শুকাইতে দিতে বাহিরে আসিয়াছে। কই, এখনও দেখিতে পায় নাই বুঝি? নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যুবতীটীর দিকে সে আগাইয়া চলিল। কি নীরেট আহাম্মক—এই সময়ে কাপড় শুকাইতে দেয়!

একখানা চাদরের ব্যবধানে। চাদরখানা লইয়া একটু অসুবিধায় পড়িয়াছে। দড়ির উপর কিছুতেই চাদরখানা থাকিতেছে না। ডেজী শান্তভাবে চাদরটীকে বাগাইয়া আটকাইয়া দিল। এইবার বাড়ীর ঠিক সামনে। যাঃ দেখিয়া ফেলিল বুঝি। এক মুহূর্ত্ত একটু অবাক হইয়া ডেজী তাকাইয়া রহিল—যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। পর মুহূর্ত্তেই ডেজী উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিল। "ডেভ্ না কি! আজ হঠাৎ এ রকম অসময়ে যে। এস না গো—ভেতরে এস। তোমায় দেখে বড্ড আনন্দ হচ্ছে।"

ডেজীকে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য ডেভ্-এর রাগ পড়িয়া আসিল। ডেজীকে আলিঙ্গন করিবার দুর্জ্জয় কামনা তাহার সর্ব্ব অঙ্গ যেন শিথিল করিয়া দিল। কিন্তু না ঃ—চিঠি ত ভোলা যায় না—ডেভের মনের মধ্যে রাগ আবার ঘনাইয়া আসিল। দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সে ডেজীকে বলিল "এই হতভাগা চিঠির জন্যে এসেছি!" হাতে তখন ডেজীর সেই দোমড়ান চিঠি। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ডেজী তাহা দেখিতে পাইল না। নিজের মনে অজস্র বকিয়া চলিল। "আঃ, চল না ঘরের ভেতরে। এদ্দূর থেকে তেতে পুড়ে এসেছ, একটু জিরোও—"

"দেখছ এই চিঠি?" বলিয়া ডেভ্ ডেজীর চোখের সামনে চিঠিখানা ধরিল। ডেজী একবার দেখিল, কিন্তু ডেভের রাগের কারণ বুঝিতে

না পারায় বলিল, "ওঃ, আমার চিঠি! ও ছাই আবার পড়ছ কেন? কিন্তু তুমি এলে আমার যা ফুর্ত্তি হয়!" মেয়েটা কি উন্মাদ নাকি? এতটুকু বুদ্ধিও কি ঘটে নাই?

"শোন, এই চিঠির জন্যে তোমার কাছে এসেছি।" কটমট করিয়া ডেজীর দিকে তাকাইয়া ডেভ্ বলিতে লাগিল, "তুমি আমার নামে অনেক নালিশ করেছ! তোমায় নাকি অসম্মান করেছি! আরও কত কি!" উত্তেজনায় ডেভী ফুঁসিতে লাগিল। "শোন, তুমি ক্রমাগত এই রকম চিঠি লিখবে, আর আমি মুখ বুজে সহ্য করে যাব---এ হবে না। আমি শেষবার বলে দিচ্ছি—এ চলবে না।" ডেভের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শান্ত, সংযত।

এতক্ষণে ডেজী বুঝিতে পারিল। সে মাথা একটুখানি পিছনে হেলাইয়া করুণ দৃষ্টিতে একবার ডেভের দিকে চাহিল। অন্য সময় ডেজীর মাথা হেলাইবার এই ভঙ্গীটা ডেভের কাছে বড় মধুর ঠেকিত, আজ ইহাই তাহার কাছে অসহ্য ন্যাকামি বলিয়া বোধ হইল।

"ওঃ ওই চিঠি! ডেভী তোমায় মিনতি করি ও চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেলো—ও চিঠি আর পড়ো না। কি ছাই সব লিখেছি ওতে—ওর কি কোনও মানে আছে? একটু ঠাণ্ডা—"

"যদি মানেই না থাকে, ও চিঠি লিখতে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে?"

"তোমার তুটী হাতে ধরি, ডেভী, চল না!"

"গোল্লায় যাও! ফি বার এই রকম চিঠি লেখ কেন, বলবে?" ডেভের নির্ম্মম আঘাতে ডেজীর চোখে ব্যথার ক্ষীণ আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। "চল না লক্ষ্মীটী ভেতরে।" "এর পরের চিঠির জন্যে কথা জমা হচ্ছে বোধহয়।" বিকৃত স্বরভঙ্গী করিয়া ডেভ্, ডেজীর চিঠি হইতে পড়িতে লাগিল--'তুমি বাজারের মেয়েমানুষের মত আমার সঙ্গে খারাপ কথা বল।' কেন আমার মুখের সামনে বলতে কি হয়! নাঃ তা করবে কেন? চিঠির কাগজে না হলে কি কাঁদা যায়? অসহ্য!" ডেভের আয়ত নীলাভ চক্ষুতে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

"ওগো, ওগো আমার খুব অন্যায় হয়েছে। তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছি আর কখনও ও রকম চিঠি লিখব না। তুমি ত জান আমি কি একা! শুধু বাবা আর আমি। মা নেই যে বুদ্ধি দেবে। তুমি চলে গেলে খালি মনে হয় মা যা শেষ বলে দিয়েছিল!" ডেজীর কপোল বাহিয়া অঝোরে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"কি বলেছিল তোমার মা? কখন?"

"মৃত্যুশয্যায়।"

ডেভ্ একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু না—রাগকে সে আজ জীয়াইয়া রাখিবে। আবার কান্না! ন্যাকামি!

"দেখ, বেশ ভেবে চিন্তে বেছে নাও—হয় তোমার মা, নয় আমি। হয় তোমার মুখ বন্ধ হবে—কিন্তু মুখ ত তোমার বন্ধ হবে না—মুখ তোমার থামবে না—আমার প্রতি কাজে দোষ ধরবে, আর মরা মার নাম ক'রে চোখের জল বের ক'রে আমায় ভোলাবে ভেবেছ? কিন্তু আমি ভুলছি না আর। সব দোষ তোমার, তোমার, তোমার।" ডেভ্ চেঁচাইতে লাগিল—কথাগুলি কুৎসিত শোনাইল, তাহাতে সে মরীয়া হইয়া উঠিয়া আরও কদর্য্য ভাষায় ডেজীকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। ডেজী এত দুঃখের মধ্যেও উদ্বিগ্ন হইয়া মেলা কাপড়গুলির দিকে একবার চাহিল। ও কি সাংঘাতিক কেজো মেয়ে! ডেভ্ ডেজীর দিকে আগাইয়া আসিল। তাহার ক্রোধবিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া ডেজী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। "ডেভ্" বলিয়া ডেজী তাহাকে কণ্ঠলগ্ন করিবার জন্য তাহার দুই বাহু বাড়াইল। "ডেভ্! বটে!" বলিয়া ডেভ্ জোর করিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইল, "কাছে থাকলেই ডেভী, ডেভী, আর দূরে গেলেই—আমি বদমাইস! মা মরা কচি মেয়ের ওপর জুলুম করি। একদিন জুলুম কাকে বলে—"

ডেজীর কোমল মসৃণ স্কন্ধে ডেভের নখ বসিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্রিয়ের কামনা মানুষকে কত হিংস্র করিয়া তুলিতে পারে জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া ডেভ্ একটু আতঙ্কিত হইল—খুসীও যে হইল না তাহা নয়। ডেজী তাহার দেহযষ্টি ঋজু করিয়া তুলিয়া ডেভের সামনে এক অভিনব নারীত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া শান্ত, ধীরভাবে শুধু বলিল, "বেশ ব্যথা দিতে চাও, দাও, হ্যাঁ দাও।" দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ডেভ্ বলিল, "উঃ কি সয়তানী! বেটাছেলেকে অপ্রস্তুত করতে কি চমৎকার জানে!" হঠাৎ ডেজীকে ছাড়িয়া দিয়া সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে সুরু করিল।

ব্যাস্, আপদ চুকিয়া গেল। নাঃ ডেজীকে সে কিছু বলে নাই; ডেজী ত বলিতে পারিবে না যে সে তাহাকে মারিয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাই, এই সব চেয়ে ভাল পন্থা। বটে! আমাকে দৌড়াইয়া ধরিবে। দেখ না। বেশ হইয়াছে। এখন কুকুরের মত হাঁফাক। ডেজী তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। দু'একবার ডেজীর কাছে ধরা না দিয়া

দৌড়াইয়া এড়াইয়া তাহার মনে হইল নেহাৎ ছেলেমানুষী হইতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে বলিল, "বেশ! কি চাও বলত!"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে ডেজী বলিল, "ওগো তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমায় ফেলে রেখে অমন করে চলে যেও না। তোমার যা ইচ্ছা করো আমি বাধা দেব না। মারো, আমায় মারো, আমি তাই চাই।" উত্তেজনায় ডেজী কাঁপিতেছিল। বিস্রস্তবেশ ডেজীর ব্লাউজের ফাঁক দিয়া তাহার অনাবৃত বক্ষস্থলের আক্ষোভ দেখা যাইতেছে — তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস ঝলকে ঝলকে ডেভের মুখে আসিয়া লাগিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিবার এক দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা ডেভের সর্ব্ব অঙ্গে যেন এক বন্যা আনিয়া দিল। প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া ডেজীর অনাবৃত কাঁধে হাত রাখিয়া ডেভ্ দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রান্তিতে ডেজীর মাথা হেলিয়া পড়িয়াছে—ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধর; নাসাপুট স্ফুরিত হইতেছে। ডেভ্ সভয়ে চক্ষু মুদিল। অতি ধীরে ডেভ্ বলিল, "না না তুমি নয়"। ডেজী ডেভের আরও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিল, "ডেভি, তোমার যা ইচ্ছে করো, আমার দেহের উপর অত্যাচার করো, কিন্তু দোহাই তোমার চোখ বুজে থাকো না। আমার বড্ড ভয় করছে। লক্ষীটী একবার তাকাও। শুন্‌ছো? সত্যি শুন্‌ছো? তোমার দুটী পায়ে পড়ি একবার তাকাও।" নিষ্পন্দ ডেভ্‌কে দেখিয়া আতঙ্কে ডেজী চীৎকার করিয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ ডেভের মুখে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারিতে লাগিল।

ডেভ্ একটু হাসিয়া নির্বিকার চিত্তে ডেজীর শিলাবৃষ্টির মত আঘাত সহ্য করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের সঙ্গে গায়ের জোর খাটাইয়াই বা লাভ কি? আচ্ছা রাগের মাথায় পাথরে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে না ত? মরুকগে। ডেভ্ চোখ বুজিয়াই রহিল।

আস্তে আস্তে পা সরাইয়া সে একবার খপ্ করিয়া ডেজীকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল। তার পর বেশ জোরে একবার দম লইয়া তাহার সমস্ত দেহের শক্তি দিয়া ডেজীকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ধুপ্ করিয়া ডেজী ঘাসের উপর গড়াইয়া পড়িল, যন্ত্রাণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। কপাল ভাল, পাথরের উপড় পড়িয়া মাথা ফাটে নাই।

তার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর দৌড়। প্রথমে বেশ জোরে, তার পর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৈত্যের মত। চোখ বুজিয়া থাকিতে হইবে নইলে ওদের মায়া কাটানো যায় না। মনে পড়িল ইস্কুলের বইয়ে কাহার কথা পড়িয়াছিল, যে এমন অবস্থায় কান বন্ধ করিয়াছিল। চোখ বোজা কিন্তু তার চেয়েও ভাল।" ডেভী! ডেভী! নাঃ শোনাও ত আর যায় না। চোখ কান দুই বুজিতে হইবে। পাগলের

মত চীৎকার করিতে করিতে ডেভ্ ছুটিয়া চলিল। হোঁচট খাইয়া, কাঁটা ঝোপে পড়িয়া গিয়া পা দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। পথের পাশ হইতে গরু ঘোড়া ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে করিতে ঢালু পথ দিয়া সে তীর-বেগে ছুটিয়া চলিল। একবার পা ফস্‌কাইলে হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। মস্ত এক ফোঁটা জল তাহার চোখের পাতায় হঠাৎ আসিয়া আচমকা এমন এক ধাক্কা মারিল যে সে একটু থতমত খাইয়া চোখ মুছিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইল। আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি!

আকাশ যেন সীসার পাতের ছাত, তাহার কোথাও ঘোলাটে কমলা রঙ্গের, তাহারই পিছনে ঘন নীল, ধূসর, গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, নানান রঙ্গের মেঘ ভিড় পাকাইয়া আসিতেছে। দূরে উপত্যকার উপরে ঘন মেঘের প্রাসাদ। ছোট ছোট পাৎলা মেঘের টুকরা এই মেঘস্তূপে কখনও আসিয়া লাগিতেছে, কখনও বা খসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার ঠিক দক্ষিণে এক রাশ বেগুনী ও নীল রঙ্গের মেঘ যেন কলহপ্রিয় রমণীর মত অঞ্চল আন্দোলিত করিয়াই মুহূর্ত্তে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অঙ্গে জড়াইয়া লইয়া। দূরে এক টুকরা মেঘ কোন্ দিকে যাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্থির হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর অকস্মাৎ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার নিচে অন্ধকারের ঘন যবনিকা সমস্ত বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দিল। প্রান্তরের দিক হইতে শীতল বায়ুর প্রবাহ ডেভের দিকে ছুটিয়া আসিল—ভীষণ মেঘের স্তূপ নামিয়া আসিবার আগেই যেন সেখানকার সব হাওয়া পালাইয়া যাইতে চায়। সমস্ত পৃথিবী যেন আসন্ন বিপদের ভয়ে চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

ডেভ আর একবার হাসিয়া আবার নিচের দিকে ছুটিতে লাগিল। ভ্রূকুটীকুটিল আকাশের দিকে চাহিয়া ডেভ্ বলিল, "দেবো, আজ ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা। ভিজবার আগে নিচের আশ্রয়ে পৌঁছাবোই।" আরও জোরে ডেভ্ ছুটিতে লাগিল। তাহার পায়ের নিচে সরু ফিতার মত রাস্তা জাগিয়া রহিয়াছে। আসিবার সময় যে দুই বুড়াকে দেখিয়াছিল তাহারা বোধহয় মাথা গুঁজিবার জায়গা খুঁজিয়া লইয়াছে। ঘরের মধ্যে বসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা কি রকম ঘাবড়াইয়া গিয়াছে ভাবিতে ডেভের ভারী হাসি পাইল। গরম বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে; আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িতে চায়। যাক্। এই ত পথ! পা দুটা যেন একটু আড়ষ্ট হইয়া আসিল না? দোষই বা কি? তিন মাইল ত প্রায়

হইল, তার উপর কত দিনের অনভ্যাস। কিন্তু হ্যারি শুনিলে বলিবে কি? হ্যারি বুড়ো যে বলে এখানে হাঁটা খুব সোজা।

বাঃ এই ত! উঃ। আর কতটুকুই বা? উঃ আর ত পারি না। চুলোয় যাক। এইবার! নিঃশ্বাস যে আর চলে না। মুখের ঘাম চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিতেছে। যাক, নামিবার সময় অনেকটা সহজ। উঃ, চোখেও ত আর দেখা যায় না। শেষে পা দুটাও যাইবে না কি?

পথ ত মিলিল। টলিতে টলিতে সে ছুটিতেছে। ভীষণ পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। শুধ্ নিজের কণ্ঠস্বরে তাহার বিশ্বাস হইতেছে সে এখনও বাঁচিয়া আছে। ও কিছু না। বিশ্রাম করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

অন্ধকার! আকাশের দিকে চাহিয়া ডেভ্ দেখিল কালির মত আকাশ—যেন একটা মস্ত কাফ্রির মুখ নিচের দিকে তাকাইয়া আছে। আকাশ তাহার দিকে চাহিয়া যেন ভীষণ ভ্রূকুটী করিল—সে চাহনি দেখিতে না পারিয়া সভয়ে ডেভ্ চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল। এক নিমেষে সমস্ত দৈত্যপুরীর কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল। তার পর সে কি প্রবল ধারায় বৃষ্টি! বিদ্যুতের তীব্র আলোতে ডেভের চোখ ধাঁধিয়া গেল, বজ্রের ভীষণ নির্ঘোষ ডেভের কানে তালা লাগাইয়া দিল। মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া ডেভের মুখে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, যেন শত শত দৈত্য নিষ্ঠুর উল্লাসে মাতিয়া ডেভের মুখে জলের ধারা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। বৃষ্টি! অসম্ভব! এ শুধ্ বৃষ্টি নয়। নিশ্চয়ই দেখিতে না পাইয়া সে নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ডুবিয়া মরিতে হইবে। নিস্তার নাই।

বৃষ্টি! চারিদিকে বৃষ্টির অভেদ্য প্রাচীর। বিদ্যুতের অবিরত ঝলক খড়খড়ির ফাঁক দিয়া আলোর ঝলকের মত বৃষ্টির প্রাচীরে আসিয়া আহত হইতেছে। বৃষ্টির অশ্রান্ত কল্লোলে যেন বজ্রনিনাদও মিলাইয়া যাইতেছে।… সহসা বৃষ্টির এই প্রাচীর যেন মন্ত্রপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিচে বনের মধ্যে তখনও বৃষ্টির কলরোল। ডেভ্ দেখিল সে হামাগুড়ি দিয়া একটা ঝোপের দিকে যাইতেছে—মাথার উপর আকাশ তখনও মসীবর্ণ।

অতি সন্তর্পণে সে কোনও মতে উঠিয়া দাঁড়াইল—কালো আকাশের গায়ে যেন খড়িমাটি দিয়া লেখা যায়। আচ্ছা এ রকম অদ্ভুত খেয়াল তাহার মাথায় আসিল কেন? নিশ্চয়ই ঐ বিদ্যুৎ দেখিয়া।…আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তার পর কেমন যেন একটা তীব্র বিকট আলোর বন্যার মধ্যে সে তলাইয়া গেল। তাহার চোখের সামনে একটা

গাছ—তাহার সমস্ত শাখাগুলি এক মুহূর্ত্তে গলা রূপার মত সাদা হইয়া উঠিল—তাহার পরেই আস্তে আস্তে কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত ; তার পরেই অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ডেভ্ ডুবিয়া গেল। নানান রঙের চরকি তাহার চোখের সামনে আলোর ফুল্‌কি ছিটাইয়া ঘুরিতে লাগিল—ঘোরার শব্দ যেন তাহার কানে আসিয়া লাগিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমিয়াছে। উঃ, এই বুঝি ফট্ করিয়া মাথা ফাটিয়া গেল—রক্তে তাহার সমস্ত চোখ মুখ ভিজিয়া গিয়াছে। কই না ? রক্ত ত এত ঠাণ্ডা হয় না। বোধহয় বৃষ্টি ! হাঁ, তাই ত। তবে ঝড় ত এখনও থামে নাই—কিন্তু কমিয়াছে, নইলে সে ডুবিয়া যাইত।

উঃ, ভগবান। রক্ষা করো। আর ত পারি না। কোথায় সে ? খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ভেজা ঝোপের ভিতর হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তখন পর্য্যন্ত সে অক্ষত। আকাশ নির্মেঘ, বৃষ্টি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টি-ধৌত প্রকৃতি সূর্য্যের কিরণে হাসিতেছে। ঝড়ের অবসানে পাখীরা আনন্দে দিশাহারা হইয়া গাহিতেছে। একটু শ্রান্ত ! কিন্তু মনে তাহার কোনও অবসাদ নাই ; চলিতে চলিতে সে লুপ্ত শক্তি যেন অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাহার সম্মুখে একটা পাখী হঠাৎ আকাশে উঠিয়া তাহার আনন্দের প্লাবনে সারা আকাশকে যেন ডুবাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল—ডেজী।

ঝড় তাহার ক্রোধ নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ধীর সমাহিত চিত্তে তাহার আত্মবিস্মৃতির কথা ভাবিতে বসিয়া সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। ডেজীর কি হইল। হয়ত ঝড়ে অজ্ঞান হইয়া কোথায় পড়িয়া আছে। হয়ত ভয়ে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া পালাইতে গিয়া তার মাথায়···না, এ অসম্ভব। নতজানু হইয়া ডেভ্ ডেজীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"ভগবান ! তুমি এ অযোগ্য সন্তানের প্রাণ ত রক্ষা করিয়াছ। সন্তান কিসে—এই পশুর। যে স্ত্রীলোককে আঘাত করিতে পারে—তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে সে পশু না ত কি ?—এই পশুর প্রাণ রাখিয়াছ, ডেজীকে বাঁচাও। তুমি ত জান ডেজী আমার কি। সেই ডেজীকে আমি নিজের হাতে হত্যা করিলাম।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ডেজীর বাড়ীর দিকে ছুটিল। নিশ্চয়ই তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল। সে কি না ডেজীর অনিন্দ্য শিশুমনকে অমন করিয়া আঘাত করিয়াছে। ডেজী তাহাকে এত ভালবাসে যে সে চাহিলে, এমন কি আছে যাহা ডেজী দিতে পারে

না? সে চলিয়া আসিলে তাহার মরা মার কথা ডেজীর মনে পড়ে। তাহার মা তাহাকে কি বলিয়া গিয়াছিল—সে তখন এত ছোট সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—তাই তার মৃত মাতার স্মৃতি পাছে অপমানিত হয়, পাছে না জানিয়া সে তাহার মার অনভিপ্রেত কিছু করিয়া বসে, তাই ত তার অত সংশয়। ডেভী চোখ বুজিয়া ডেজীর মার মৃত্যু-শয্যার ছবির উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। বিশীর্ণ আসন্নমৃত্যু রোগী; একটী কিশোরী সজলনেত্রে তাহার পাশে বসিয়া মাতার প্রত্যেকটী অনুযোগ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। "হাঁ মা, যা বলছ তাই হবে; না, তা কখনও করবো না।" সে কেমন করিয়া অমন অন্ধ হইয়াছিল? ডেজী বাঁচিয়া আছে ত? ভগবান শুধু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ, আমার পাপের জন্য তাহাকে শাস্তি দিও না। শুধু যদি ডেজী বাঁচিয়া থাকে, তাকে কত সোহাগই না করিবে ভাবিতে ভাবিতে ডেভ্ ডেজীর বাড়ীর দিকে চলিল।

ঝড় বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডেজী আবার ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে বাহিরে আসিয়াছে। হঠাৎ দেখে টলিতে টলিতে ডেভ্ তাহার দিকেই আসিতেছে। অধীর আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া ডেজী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। নইলে ডেভ্ সেখানেই পড়িয়া যাইত।

"ছিঃ ডেভী। এঃ একেবারে ভিজে গেছ যে। অসুখ না করে শেষে। এই সব ঝড়টা মাথার উপর দিয়ে গেছে ত? চল এখন, ঢের হয়েছে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলবে এস।"

শুষ্কমুখ ডেজীর দিকে তুলিয়া ডেভ্ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল। "ভগবান, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। যাক্ ডেজী তুমি ত ভাল আছ।"

ডেজী একটু অবাক হইয়া ডেভের দিকে চাহিল। ডেভ্ বলিল, "তোমার লাগেনি ত? ঝড়ের মধ্যে বাইরে ছিলে না ত?" "ঝড়ের মধ্যে? না গো না, জান, বৃষ্টি আসার আগেই আমার কাপড়গুলো তোলা হয়ে গিয়েছিল।"

"সত্যি ডেজী লক্ষ্মীটী বলো, তোমার নিশ্চয় খুব লেগেছিল—সেই আমি যখন তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।"

"দুর।" বলিয়াই ডেজী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ডেভ্‌কে ধরিয়া চড়াই উঠিতে উঠিতে বলিল, "ডেভ্, আমি আর তোমায় কখ্‌খনও বিরক্ত করব না। তোমায় বড্ড চটিয়েছিলুল—না? আর কখ্‌খনও অমন হবে না।"

ডেভ্‌কে ধরিয়া রান্নাঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ডেজী তাহাকে উনুনের কাছে বসাইল। ডেজী রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে যাইতেছে, এমন সময় নেহাৎ সুবোধ বালকের মত ডেভ্‌ বলিল, "ডেজী, এই সমস্ত বৃষ্টিটা আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে। জান, আমি প্রায় ডুবে গিয়েছিলুম— আর আমার চোখের সামনে একটা গাছের উপর যা বাজ পড়ল।"

ঘাড় ফিরাইয়া ডেভের দিকে চাহিয়া ডেজী বলিল, "ওঃ, যা দুর্য্যোগ।"

একা একা বসিয়া অবসাদে ডেভের শরীর যেন ভরিয়া আসিল। সে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল—বোকার মত। ঝড় তাহার মন হইতে সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত প্রবল অনুভূতি নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে —তাহার মনের ব্যথা ডেজীকে কেমন করিয়া বুঝাইবে—ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। তাহাকে দেখিয়াই কেন ডেজী বুঝিতে পারিতেছে না, সে কত অনুতপ্ত। বোঝাইবার ক্ষমতা যে এখন তাহার নাই। যাক ডেজী ভাল আছে। এটাই কি কম কথা। ডেজীকে তবে মারিয়া ফেলে নাই—ভগবানের কম দয়া।

উপরের ঘরের মধ্য দিয়া ডেজী সিঁড়ির কাছে আসিল। তাহার পর ডেজীর ছোট ছু'খানি পা, ক্রমে ডেজীর হাতে এক বোঝা কাপড়, সব শেষে ছোট একখানি মুখ, পরিশ্রমের রক্তিম আভা মাখা।

হাসিতে হাসিতে ডেজী বলিল, "এই নাও কাপড়—বাবার—হাঁ তোমার গায়ে হবে। ও বাবার কথা ভাবছ? নিশ্চয়ই মেরিভেলে আটকে গেছে। হাঁ গো হাঁ বাবা নিজের শরীর বাঁচাতে জানে—সবাই তোমার মত বোকা নয়।"

খপ্‌ করিয়া ডেজীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া যেন শেষবারের মত নিজের কথা বোঝাইতে চাহিতেছে এই ভাবে ডেভ্‌ বলিল, "ডেজী শোন। সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে—আমি পড়ে যাই—প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম—আমার ছু হাত দূরে একটা গাছ বাজে পুড়ে গেল।"

"ষাট ষাট। তা এখন ওঠ। ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল।"

"ডেজী, যখন আমার জ্ঞান হল যখন দেখলাম আমি বেঁচে আছি, আমার ভয় হল—ভয়ঙ্কর ভয় হল তুমি ঝড়ে বাইরে পড়ে আছ—বেঁচে নেই—হয়ত আমিই তোমায় মেরে ফেলেছি।"

নাঃ, ডেজী শুনিতেছে না। শোনার দিকে তাহার মন ছিল না, তাহার দৃষ্টি তখন ঘরের ভিতর কাপড়ের আলমারির দিকে নিবদ্ধ।

"কি বোকা তুমি। তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই?" সে সহাস্যে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "বৃষ্টির অনেক আগে আমি ঘরে এসেছি।

তুমি সেই চলে যাওয়ার পরেই আমি ভিজে কাপড়গুলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। কি যে দেরী করছ। ওঠই নি। লক্ষ্মীটী ওঠ শীগ্‌গীর। যাও কাপড় ছেড়ে এস। তার পর তোমায় বেশ এক গেলাস গরম ওষুধ খাইয়ে দেব, তা হলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।"

আর একবার তাড়াতাড়ি করিতে তাগিদ দিয়া ডেজী অন্তর্দ্ধান করিল।

কি আর করা। ডেজী বুঝিবে না—কোনও দিনই বুঝিবে না। ডেভের মনের মধ্যে যে বেদনার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার আঁচটুকুও ডেজীর গায়ে লাগে নাই। তবুও একথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সে ডেজীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে। আর কখনও তাহাকে আঘাত করা চলিবে না। হয়ত সব মেয়েরই কল্পনাশক্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। দয়িতের কাছে তাহারা হয়ত এই রকম হাসিমুখেই সব কিছু গ্রহণ করে—নিষ্ঠুরতা, নির্য্যাতন পর্য্যন্ত। হয়ত—

ভিজা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডেভ্ বুঝিতে পারিল ঝড়ে তাহার মন হইতে সংশয় ও বিরক্তির বিরাট বোঝা উড়াইয়া লইয়া গেলেও ডেজীর সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

ভীরু

জানিনা সাঁতার ডুবিবার ভয়ে মরি,
তবু জাগে সাধ ডুবিতে সাগরে ; কত কল্পনা করি,
— অতল পরশে কি আছে তোমার,
কতনা মুকুতা-মণি-সম্ভার !
কূলে তব একা আসি'
দেখেছি উদয়-অস্ত-শোণিমা, চাঁদের অমল হাসি
বিম্বিত তব তরল মুকুর 'পরে,
দেখেছি আমার ছায়া লয়ে খেলা করে
উচ্ছল তটের উৎসুক ঢেউগুলি।
মজ্জন-ভয় ভুলি'
গহনে তোমার গাহন লাগিয়া ঝাঁপায়ে পড়িতে গিয়া,
তুষার-শীতল পরশনে শিহরিয়া,
ত্রস্ত চরণে ফিরিয়া এসেছি তীরে,
ভেসেছি অশ্রুনীরে ॥

তরণী বাহিয়া খুঁজিয়াছি পরপার,
যতদূরে যাই তত মনে হয় দিশা নাই সীমানার।
ভরা পালে আমি চলেছি ভাসিয়া,
কল কৌতুকে উঠেছ হাসিয়া :
উজানে বাহিয়া শেষে
দুরু দুরু হিয়া হয়েছে শান্ত নিরাপদ কূলে এসে।
ঢেউ পরে ঢেউ ভেঙে পড়ে সিকতায়,
জানি তারা টানি তোমার গভীরে আমারে ডুবাতে চায়।
ফেনিলোচ্ছল তুহিনপরশা বারি
কেন হেন মনোহারী ?
বিভীষিকা ভরা মৃত্যুপসরা ধরিছে কি বুকে তার
মোর তরে গাঁথা তোমার রতনহার ?
আমি নিশিদিন আহ্বান তব শুনি,
স্বপনের জাল বুনি ॥

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

যাত্রা

অমাবস্যা-তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলি' ঠেলি' কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের মাঝে পথ করি'
চলিয়াছ সঙ্গহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?
নাহি ভয় রজনীর, বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনের নাহিকো ঠিকানা,
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত উপরি
চলিয়াছ স্থিরদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর হাসি আঁধারের,
জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেছে আঁধারের দুর্দ্দম জোয়ারে,
বেলাভূমি স্তব্ধ রাত্রি-আঁধারের উদ্দামপ্রণয়ে,
নিঃশ্বাস রুধিছে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, চলিয়াছ কোথা ?
কোন্ নারী কি ঐশ্বর্য্যভার
ছিনিয়া লইবে বলো বলীয়ান্ দুই বাহু দিয়া।
কোন্ দেশ লক্ষ্য তব অভিনব এ জয়যাত্রার,
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান
তোমারো যাত্রার সাথে সাথে ধায়, সেই সত্য জানো ?
তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্ত্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র একাকী করিছে ?
ভুলিয়াছ বুঝি, বন্ধু, নব নব পথের নির্ম্মাণে
পথ কভু হয়নাকো শেষ ?
পৃথিবীতে কোনো পথ আজো কভু হয়েছে কি শেষ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব অমাবস্যা-তমিস্রারে ঠেলি',
দূরে দূরে ফেলি' কালো হিংস্র সাগরে
—শ্যেনকপোতের প্রেম-কূজনেমুখর কোনো নব অলকায় নহে—
নিয়ে' যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার
যাত্রা করো রোধ
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে

যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
হেরে নাই এখেনি বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন ক্রূর কালো মদমত্ত সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
ডিয়োটিমা, বলো তো বন্ধুরে।
তাই বলি আমার মিনতি
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

শ্রীবিষ্ণু দে

ভোর

কথনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমেল চোখে
নরম ভোরে ?
ছাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শিখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা ?
ঘুমিয়ে রয়েছো, কতবার এল এমন ভোর
এমন আলো !—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্ণা তলে।
আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে
শুননি বুঝি ?—
পাপ্‌ড়ি-হাতের নরম ছোঁয়ায় চম্‌কে উঠে'
অ্যাডোনিস্ হাসে ভোরের মতো।
এম্নি ভোরেই তেপান্তরের মাঠের শেষে
গহন বনে
রাজকন্যার ঘন কালো চুল মেঘের মতো
রাজপুত্রের স্বপনে আসে।
এম্নি ভোরেই আসে একদিন ফুলের কথা
হাওয়ায় ভেসে :
"মোর সাত ভাই চম্পা জেগেছ ?···হয়েছে ভোর"
ঘুম হ'তে জেগে পারুল ডাকে।

আরো কত কথা রূপালী বকের মালার মতো
আকাশে দোলে ;
আকাশের সেই স্বপ্নরা মরা মাটির সনে
মিশে আছে এই নরম ভোরে।

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমরা কবিতা লিখি

(মার্কিন কবি কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গ লিখিত We Write কবিতা হইতে

আমরা কবিতা লিখি, বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদ
মোদের লেখনী-মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ ;
মর্ত্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্ত্য আহ্বান,
কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ !
প্রত্যহের ধূলি-লিপ্ত বিষ-তিক্ত গ্লানি, অপমান,
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা আনিয়া দিই ক্ষণিকের আনন্দ-সংবাদ,
ছন্দোবদ্ধ গান !

আমরা সৌন্দর্য্য-লিপ্সু, পৃথিবীরে মোরা বাসি ভালো—
দিগন্ত-প্রসারী মাঠ, নির্ম্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীর ধারা, অকুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দ বাতাস,
নিশার সীমন্ত-প্রান্তে অর্দ্ধস্ফুট নক্ষত্রের আলো ;
প্রথম পরশ-হতা কিশোরীর ভীরু ভ্রূ-বিলাস
আমরা লুকায়ে দেখি, ভালোবাসি বেণী মেঘ-কালো,
মোদের বেপথু বক্ষে অতর্কিতে ঘনায় ঘোরালো,
ভারাতুর শ্বাস !

তা ব'লে বধির নই, কানে মোরা শুনি দিনরাত
ধ্বনিছে চৌদিক হ'তে ধরণীর আর্ত্ত ক্লিষ্ট রোল ;
জীবন-দোলায় নিত্য মরণের উচ্চকিত দোল
আমরা জানিতে পারি ; দাব-দগ্ধ নির্ম্মম আঘাত,
দুঃসহ তরঙ্গ-ভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুর সঞ্চয় যত অসঙ্কোচে করে আত্মসাৎ ;—
তবু ত রজনী শেষে ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
'খোল্ দ্বার খোল্' !

তনুর লাবণ্য হেরে মোরা হই উন্মাদ-বিহ্বল :
জানি তবু রক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা, কদর্য্য কুৎসিত
আছে তার অন্তরালে ; কুসুমের সঙ্কীর্ণ সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার সম্বল :
মূর্চ্ছাতুর হৃৎ-তন্ত্রী, ভয়-ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ চকিত,
সম্মুখে নিবিড় কালো, পায়ে পায়ে প্রহত উপল—
তবু এ ধরণী পানে চেয়ে চেয়ে চোখে আসে জল,
　　　　কণ্ঠে জাগে গীত !

জানি বন্ধু জানি মোরা, এ ধরণী নয় চিরন্তন,
তুমি-আমি তুচ্ছ কথা ; সবি হবে নিঃশেষে নিলয়,
স্তব্ধ হবে চরাচর, মহাব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুর হবে আজিকার উদগ্র যৌবন !
তবু এ দেহের প্রান্তে যতদিন প্রাণ-বন্ধ রয়,
ক্ষণিক খেলেনা ল'য়ে রচি মোরা অনন্ত স্বপন—
অফুরন্ত গীত-গন্ধে আমাদের নিজস্ব ভুবন
　　　　চির প্রাণময় !

ছন্দের শৃঙ্খলে মোরা রোধিয়াছি সময়ের গতি,
গ'ড়েছি চিন্ময় বিশ্ব বিস্মৃতির বারিধি-বেলায় ;
নশ্বর শূন্যতা শুধু বাহু মেলে ডাকে 'আয়' 'আয়',
সৃষ্টির আনন্দে মোরা ফিরে নাহি চাই তার প্রতি !
মোদের সঙ্গীত-রেশ কেঁপে কেঁপে তারায় তারায়,
লোক হ'তে লোকান্তরে ছুটে চলে ত্রস্ত লঘুগতি—
ভবিষ্যের স্বপ্ন মোরা, অনাগত জানাবে প্রণতি
　　　　আমাদের পায় ।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জয়ন্তী

(হান্‌স্ কারোসা-কৃত 'রুমেনিয়ান্ ডায়ারি'-র অন্তস্থ কবিতার ভাবানুবাদ)

কিশাভের ঊর্দ্ধ চূড়ে কণ্টকিত তুষার-শয়নে
প্রাণ-বিনিময়ে যারা অবশেষে লভিলো বিরাম,
তাদের সমাধিস্তূপ এসো রচি প্রস্তর-চয়নে,
অনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভে এসো লিখি তাহাদের নাম ।

করেনি আক্ষেপ তারা, চাহে নাই অগ্রে বা পশ্চাতে,
মাগেনি বিরতি, আজ্ঞা করিয়াছে নীরবে পালন,
বিদেশের বন্ধ্যা মাটি সিঞ্চি বৃথা হৃদিরক্তপাতে
উপেক্ষার রন্ধ্রে তারা ঢেলে দেছে অখ্যাত জীবন ॥

কোথা এ-ধ্বংসের শেষ ? দিশাহারা মানুষের আঁখি।
অন্ধকার ভবিতব্যে সাবধান, বন্ধু, সাবধান !
যদি দেখো মুমূর্ষুরে, বোলো তারে নম্র কণ্ঠে ডাকি,
যেন সে হিংসার স্পর্শে মৃত্যুর করেনা অপমান।
বোলো তারে শ্রদ্ধাভরে, সে মোদের সবার অগ্রণী ;
বিলুপ্তির ধূলিপথে আমরাও অনুযাত্র তার।
তার পরে জুনিপারে বিরচিয়া শবপ্রাবরণী,
কোরো, বন্ধু, ধ্রুব পদে, কোরো, বন্ধু, তার অনুসার ॥

কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে হেথা হতে পারো ফিরিবারে,
উন্নিদ্র প্রহরা তব থাকে যেন সতত জাগর ;
বিধাতা অচেনা কণ্ঠে ডাকে যদি কখনো তোমারে,
আলস্যের অন্যমনে কোরোনা তাহারে অনাদর।
ভুলোনা তোমার পন্থা নিরন্তর সঙ্কীর্ণ বন্ধুর,
তোমার সুদীর্ঘ বেলা পরিশ্রান্ত শত সাধনায়,
তাহাতে উৎসব নাই, নাই তাহে উল্লাসের সুর,
সন্ত্রস্ত বিশ্রাম তব শৃঙ্গচারী ছাগলের প্রায় ॥

নির্ম্মদ সত্যের বরে চিত্ত তব রহে যেন শুচি।
মিথ্যার দুরভিসন্ধি জাতিদের করেছে পাগল ;
জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বাপিত ; সমস্ত অর্গল গেছে ঘুচি,
অবাধে বিহরে বিশ্বে নিশাচর পিশাচের দল।
মোদের শ্রান্তির পরে চক্রচর চর্ম্মচটীসম
নির্ব্বাক নৈরাশ্য আজি ফিরে সদা নিঃশব্দ সঞ্চারে ;
এ-পক্ষী পতত্রহীন অনপত্য জ্বলন্ত নির্ম্মম,
আপনি সে দুঃশাসন, কিন্তু সবে প্রণমে তাহারে।
শিশুর স্মরণ হতে মুছে আজি চোখের নিমেষে
যুগান্তসাধনধন প্রত্যাদেশ আপ্তবাক্যগুলি।
সর্ব্বভুক বুভুক্ষায় নরকীয় দ্রোণকাক এসে,
দেউল উজাড় করে শ্রুতিস্মৃতি লয়ে যায় তুলি।

হয়তো সমাপ্ত লগ্ন, বৃথা ওই অর্ঘ উপচার ;
বিদীর্ণ মন্দিরকূট ভেঙে পড়ে সন্তপ্তের পরে ;
ভগ্ন সেতু দীপামান ; উদ্বেলিয়া উঠে পারাবার ;
লুপ্ত তীর্থযাত্রাপথ ; স্তবস্তুতি শূন্যে কেঁদে মরে।
উদ্বাস্তু আজিকে আত্মা, নিজগৃহে নাই তার স্থান ;
অন্তরতমের দ্বার শৈবালিত, নাই সেথা ভীড়।
মন আজি হিমায়িত, হিমচারী মৎস্যের সমান
বিকল বাসনারাশি, পঙ্গু আশা, চেতনা নিবিড়॥

যদি কোনো সুলগনে পারো বন্ধু ফিরিবারে ঘরে,
দেখো যেন প্রহরায় কখনো না-আসে অবসাদ ;
স্বার্থের ভঙ্গুর স্বপ্ন উপাড়িয়া ফেলো দৃঢ় করে ;
নিষ্কলঙ্ক বিস্মরণে ঢেকে দিও এ-চণ্ড প্রমাদ ;
আপনারে ঘিরে রেখো স্বয়ম্ভর শৃঙ্খলার পাকে ;
অন্তরে হোমাগ্নি জ্বেলো নিরুদ্দেশ দেবতার তরে ;
নিত্য করো প্রদক্ষিণ তিনবার সে-নাচিকেতাকে ;
প্রিয়ার সান্নিধ্য, বন্ধু, ইচ্ছা হলে খুঁজো তার পরে॥

ধন্য সে, যে পারে পাখা প্রসারিতে কালের গহনে ;
অনিষ্টের মুষ্টি হতে, কেড়ে আনে সে গূঢ় কল্যাণ ;
লঙ্ঘে সে প্রলয়সিন্ধু ; মুক্তির সানন্দ সন্ধিক্ষণে
অচেনা উতল ছন্দে তার কাছে করে আত্মদান।
জগতের গোষ্ঠীপতি, জন্মমৃত্যু-অতিক্রান্ত রবি,
তার দীপ্তি, তার তেজ জ্বলেনা কি আমাদের মাঝে ?
অতীত স্নেহের স্মৃতি, বর্ত্তমান করুণার ছবি
উদ্বায়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে, দেখোনি কি, নিয়ত বিরাজে ?
তারায় তারায় কাঁপে আমাদের চিরন্তন প্রাণ,
সপ্ত সিন্ধু বিচঞ্চল সে-প্রাণের অমৃত পরশে,
সে-প্রাণের উপাদানে নির্ম্মিত স্বয়ং ভগবান,
সৃষ্টির অবেদ্য বার্ত্তা পরিপ্লুত তাহার হরষে॥

চিরসুন্দরের দূত, নামো তবে গিরিশীর্ষ হতে
মৃত ভাবীকথকেরে, মেঘার্ত্ত শ্যেনেরে পরিহরি।
তোমার প্রেমের জ্যোতি ব্যক্ত হোক তমিস্র জগতে,
আত্মীয়ের প্রতীক্ষায় তব বাণী উঠুক গুঞ্জরি।

হয়নি সৎকার যার, উজ্জীবিত হবে সে কেমনে ?
ফিরে চাও, ক্ষেমঙ্কর, লগ্ন আজো হয়নি অতীত ;
চূর্ণ যে-মনুষ্যমূর্ত্তি মিশে আছে স্তব্ধ ধূলিসনে,
নবীন বেদীর মূলে করো তারে পুনশ্চ প্রোথিত।
নহে তো অপরিচিত তুমি করো যে-সত্য প্রচার ;
ইতিমধ্যে বারম্বার অগ্নিদীক্ষা দিয়েছো নিষ্ঠুর।
যে-সন্দিগ্ধ সীমাসন্ধি মাপে রাজ্য আলোর, ছায়ার,
সেখানে মোদের কানে হানো তব আগমনীসুর।
বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগে জড়বক্ষে সে-শিব সঙ্গীতে ;
তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আনে বিশ্বে অমর্ত্ত্য বিপ্লব ;
তব ইন্দ্রজালে পাশ পরিণত অধরা-রশ্মিতে,
জেতারে শেখায় বন্দী লাঞ্ছনার দুরূহ গৌরব॥

কিন্তু যে প্রথার জালে বদ্ধমূল অনীহ পাতালে,
কুড়ায়ে উচ্ছিষ্ট কণা কাটে যার অনুবৃত্ত দিন,
করো তারে আবিষ্কার গতক্লম তুষ্টির আড়ালে,
ধরো ওষ্ঠে সুধা বিষ, করো তারে ভয়ভ্রান্তিহীন।
দাও তারে শক্তি দাও, মিতব্যয়ী ধরণীরে জিনে
সে যেন আহরি আনে জীবনের অজস্র বৈভব ;
আপন দক্ষিণা যেন আপনি সে নিতে পারে চিনে,
রহেনা গ্রহণে তার যেন কভু লোভের সংস্রব।
যেন সে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে দিতে পারে উদার আহুতি
প্রথম সঞ্চয়টুকু চিরন্তন হোমাগ্নির পুটে ;
থাকেনা অভুক্ত যেন অভ্রংলিহ আত্মার আকুতি ;
অমৃতের দানসত্রে নিত্য যেন বিত্ত ভরে উঠে॥

প্রাচীন পথিকসম নির্দ্দেশক চিহ্ন দিও আঁকি
অনুগের তরে, বন্ধু, বালু-হিম-বল্কল-প্রস্তরে ;
পথে যদি মৃত্যু ঘটে, অন্তকালে বিহঙ্গমে ডাকি
মৈত্রীর কুহকলিপি লিখে যেও শুভ্র পক্ষপরে।
কিশভের ঊর্দ্ধ চূড়ে কণ্টকিত তুষারশয়নে
গতাসু বীরের তরে, এসো, তবে কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়ি ;
যাহারা মাগেনি ক্ষান্তি, ঝাঁপ দেছে অমোঘ মরণে,
তাদের মহার্ঘ্য নাম, এসো, বন্ধু, জপমন্ত্র করি॥

শরৎচন্দ্রের যে দুখানি বইয়ের সমালোচনা করতে বসেছি তার মধ্যে 'তরুণের বিদ্রোহ' বইখানি "১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।" এই বক্তৃতার স্পষ্ট উদ্দেশ্য স্বর্গগত দেশবন্ধুর দলের মোক্তাররূপে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গোক্তি ক'রে তাঁর প্রচারিত মতগুলিকে তরুণ দলের কাছে খেলো করা। যিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, তাঁর মত বা তাঁর কার্য্যপ্রণালী সমালোচনা করবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ব্যঙ্গোক্তিমাত্রের দ্বারা কোনো মতকে খণ্ডন করা হয় না এবং ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা কোন মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করাও যায় না। শরৎবাবু লিখেছেন—

"কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ ক'রে।" ..."এবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে, সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন; সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব।" জালিয়ানওয়ালাবাগই হোক্ আর সাইমন কমিশনই হোক্—দেশের আন্দোলন কোনো একটা উত্তেজনার ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তার যন্ত্রবাহিনী থেকে বন্যার আকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রাণশক্তির দুর্নিবার স্রোতপ্রবাহকে, দেশের কল্যাণের পথে প্রবাহিত করতে, দেশের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁরা, যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন, তা যে সকল সময়ই, এমন কি কোন সময়ই অভ্রান্ত হয় এমন বলা যায় না। অভ্রান্ত হওয়া যদি সম্ভবও হোতো তা হলেও তার ফল যে সব সময় আশানুরূপ, এমন কি কল্যাণকর হয় তাও নয়। নানা প্রতিকূল নূতন ঘটনায় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া হয়ত সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এবং লোক-পরিচালনের দুরূহ কার্য্যপ্রণালীতে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে তবে সেই ভ্রান্তি সংশোধনের সমস্যা—সস্তায় যাদের সহজে উত্তেজিত করা যায় এমন তরুণ দলের সামনে দাঁড়িয়ে কটূক্তি করে—নিরাময় চিত্তে "নিভৃত পল্লী"-কোটরে, যেখানে বাহিরের "তর্জ্জন গর্জ্জন গিয়ে পৌঁছবে না", সেখানে আশ্রয় নিলেও মেটে না।

এই সূত্রে বলা ভাল যে শরৎচন্দ্র, তরুণকুলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত না করেও কি ক'রে বক্তব্যে স্পষ্টবাদিতার চেহারা ফোটে তারি চেষ্টায় দিশাহারা হয়ে, এই প্রবন্ধটির মধ্যে তরুণ-স্তুতি ছড়িয়েছেন প্রচুর পরিমাণে ও নির্ব্বিচার প্রশ্রয়ে—আত্মত্যাগে, নিষ্ঠার সঙ্গে খাদি প্রস্তুত করতে, জেলে যেতে, দেশকে ভালবেসে অকাতরে প্রাণ দিতে এই বাংলার তরুণেরা যেমন এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ আবার পাতা চারেক পরেই দেখি যে তাদের আর এক মূর্ত্তি। শরৎচন্দ্র এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগী যুবকদের নির্জ্জীব বলে ভর্ৎসনা করছেন। বলছেন "শান্তি-স্বস্তি-হীন সম্মান-বর্জ্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এত লোভের বস্তু?" (এখানে অবশ্য ভারত কথাটা বাংলার প্রতিশব্দ)। "তরুণ-শক্তি যে প্রাণ দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করে এ যদি তারা ভোলে" ইত্যাদি। অথবা "এই যে যুব-সঙ্ঘ, খোঁজ করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে তেরটা দল। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই" ইত্যাদি। কৌতুকের কথা এই যে এই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের একদলের হয়ে অন্য দলের উচ্ছেদ

সাধনোদ্দেশেই এই বক্তৃতায় সেদিন ব্রতী ছিলেন। যুব-সঙ্ঘে কটা দল সে কথা ছেড়েই দি—অন্ততঃ সেদিন শরৎবাবু যে বৃহত্তর ভারত-সঙ্ঘের মধ্যে "মতের মিল" প্রতিষ্ঠার 'চ্যাম্পিয়ান' স্বরূপ দাঁড়ান নি সে দিকে "তাঁর" দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার লোক বোধহয় সেখানে ছিল না। অথবা যুবকেরা বোধহয় বিশিষ্ট অতিথির প্রতি শিষ্টতার খাতিরে এ কৌতুকাবহ ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করেছিল।

অতএব খদ্দর প্রচারের প্রতি প্রচুর যুক্তিসম্পর্কশূন্য ব্যঙ্গোক্তির পর শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বল্‌ছেন, "এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এই যে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনা দরকার। অভাব-বোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কৌপীন পরিধান—এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বোত্তম উপায়। ......এই ত্যাগের মন্ত্র সর্ব্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে।"

"সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বোত্তম উপায়" এমন কথা সম্প্রতি কে কোথায় বলেছেন সেটা শরৎবাবু বলে দিলেই ভাল করতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা অনামা কাল্পনিক মহৎ লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে এ যেন 'বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে কোঁদল করা।'

একটা কথা শরৎবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অবধান করা উচিত ; সেটা এই, মানুষ যখন কোনো বিশেষ সংকল্প সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের সহজলব্ধ আরামের পথ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ কোনো কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই কৃচ্ছ্র সাধনকে "পুরুষকার" বলে অভিহিত করা অসমীচীন হয়না। এবং পুরুষকারের সঙ্গে "ভগবান করেছেন" "কপালে লেখা" "সংসার ত মায়া দুদিনের খেলা" প্রভৃতি মনোভাব এক পংক্তিতে পাংক্তেয় নয়। সুতরাং কপালের দোহাই যারা দেয় তারা সাধকের দলে নয়। পাঁচ হাত কৌপীন যাঁরা পর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁদের মনে দেশটাকে "পশুর কোঠায়" টেনে নিয়ে যাবার কোনো মৎলব ছিল না। পূর্ব্বে যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের হয়ত নিছক আধ্যাত্মিক কারণ ছিল কিন্তু এবার যিনি দিয়েছেন তাঁর কারণগুলির মধ্যে একটি প্রধান যে অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাটা জনসাধারণের পক্ষে যে সাময়িক সে কথা জাতীয় কংগ্রেসের শাখা-পতির অজানা থাক্‌বার কথা নয়। অবশ্য মানসিক সিদ্ধি ও শক্তিলাভও এই উদ্দেশ্যের অন্যতম হওয়া সম্ভব। ধনী ব্যক্তিকে যদি কোন কারণে দারিদ্র্যে দিনযাপন কর্‌তে বাধ্য হতে হয়, তবে ভিক্ষা ও পরমুখাপেক্ষিতার চেয়ে নিজের জন্যে নিজের হাত পা খাটালে তাকে "চাকরের কোঠায়" গিয়ে পড়্‌তে হয় না। তাতে তার অর্থসমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান ত হয়ই, তাছাড়া আত্মনির্ভরশীলতা, আত্ম-সম্মানবোধ প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষসাধনে তার চিত্ত সম্পদ্‌বান হয়।

যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চলে, কিন্তু গালাগালি বা ব্যঙ্গ ত যুক্তি নয়—রাগ। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ (?) অসহযোগ। তার টিকি বাঁধা রইল তাঁর খাদি চরকার দড়িতে" ইত্যাদি। (২) "স্বরাজের তারিখ ধার্য্য হোলো ৩১শে ডিসেম্বর।" (৩) "পশ্চিম ভারতের কংগ্রেসের নেতাদের মত অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িও না।" (৪) চৌরী-চৌরায় হোলো রক্তপাত। মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে।" (৫) "আবার

সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়া।" (৬) "মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা—"সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে লেখাপড়া শেখানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত" থাকৃতে কেউ বলেন কিনা আমার জানা নেই। দেশের কল্যাণ নির্ভর করে নানা বিষয়ের সাধনায়। তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান ব'লে ধরা যায় এবং অপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক। দেশের মুক্তি ও কল্যাণের পন্থা উদ্ভাবন ও অনুসরণে যাঁরা অগ্রসর সেই সকল মনীষীর মধ্যে যাঁর চিত্তে যে ব্যাপারের সাধনাকে দেশহিতের প্রধানতম উপায় ব'লে মনে হয়, তিনি সেটাকেই বড় ক'রে দেখেন ও বড় ক'রে বলেন, তারি জন্মে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যদান করেন ও অন্যকে দান করবার জন্য আহ্বান করে থাকেন। উৎসাহের আতিশয্যে নিজের উদ্ভাবিত পন্থাকে আবশ্যকের অতিরিক্ত মূল্য দেওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু লোকশিক্ষা, চরকা, জাতিভেদনাশ, বা স্ত্রীজাতির উন্নতি যিনি যতই মঙ্গলকর ব'লে মনে করুন না কেন, অন্যান্য মঙ্গলসাধনের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখ্‌তে উপদেশ দেন দেশের এমন বন্ধু আমাদের চোখে পড়েন নি। শিক্ষাবিস্তারের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ত নয়ই। শরৎবাবু লিখ্‌ছেন, "শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা করতে মানা করিনে, কিন্তু এখানে একটা নাইট্‌-ইস্কুল, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে, যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর।" এর দ্বারা শরৎবাবু দেশের শিক্ষাবিস্তারের এ চেষ্টাটা যে আবশ্যকের পক্ষে ছেলেখেলা, সেই জন্যই দুঃখ করছেন, সুতরাং এ অপেক্ষাও অধিকতর শিক্ষাবিস্তার চেষ্টাকেই সমর্থন করছে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা এদেশে যাঁরাই করছেন তাঁরাই শিক্ষাদানের এই স্বল্প আয়োজনের দীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে থাকেন এবং এই চেষ্টাকে বহুগুণ প্রসারিত, লোকপ্রিয় ও প্রচলিত করা চাই এটা জেনেই তাঁদের এই প্রাণপাত পরিশ্রম। সফলতা লাভ করতে আমাদের দেশের জমিতে দেরী হতে পারে, এই পর্য্যন্ত। অথচ দেশের এই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টাকে তিনি ছেলেখেলা ব'লে বর্ণনা করেছেন সেই চেষ্টা দেখেই আবার তার বাহুল্যে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। বল্‌ছেন, "তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁদের পরে আমার ভরসা কম।" অর্থাৎ তাঁরা লোক খারাপ নয়, তবে নির্ব্বোধ। শরৎবাবুর মতে গভর্ণমেণ্ট ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। যে দেশে গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা শিক্ষাবিস্তার-কল্পে জাগানো সম্ভব নয় সেখানে কি হাত পা ছেড়ে মানুষকে তবে বসে থাকৃতে হবে? তাছাড়া, যে কোনো সংস্কার চেষ্টার প্রেরণাই ব্যক্তি থেকে মণ্ডলী, এবং মণ্ডলী থেকে জাতিকে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে এবং ক্রমে সেটা জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় কেবল ছেলেখেলা হয়, একথা অশ্রদ্ধেয়।

এইটুকু প্রবন্ধের সমালোচনা করতে অনেকখানি লিখ্‌তে হচ্ছে। তার প্রধান কারণ প্রবন্ধটি মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ চেষ্টার প্রতি যুক্তিবিহীন কটূকাটব্যে পূর্ণ এবং তরুণ দলকে উত্তেজিত ক'রে দলবিশেষের পুষ্টিসাধনই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। এমন বক্তৃতা যদি শরৎবাবুর মত মান্য লোকের মুখ থেকে না বেরোতো এবং একে যদি বাংলার অক্ষয় কলঙ্কের মত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না হোতো তবে এর সমালোচনাও দরকার হোতো না। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "সত্য মনে ক'রে অনেক

অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মাজুতে" ইত্যাদি। গোড়ার লাইনটা একটু বদলে "সত্য মনে ক'রে" না লিখে, 'মহাত্মার বিরুদ্ধে তরুণদের উত্তেজিত ক'রে কংগ্রেসে নিজের দল ভারী করব এই মনে ক'রে' লিখলে সত্য মনে করতে হোতো না তবু সত্যই হোতো। আর বাংলার তরুণদলকে কোন্ মন্ত্রবলে সর্কাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত করা সম্ভব শরৎচন্দ্রের চেয়ে সে বিদ্যার বড় ওস্তাদ বাংলা দেশে নেই। কোন্ কোন্ বাক্যবিস্ফুরণে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অভ্রভেদী ক'রে তোলা যায়, কোন্ কোন্ তুলনায় তাদের আহত আত্মম্ভরিতাকে নিরাময় আশ্রয় ও নির্ব্বিরোধ প্রশ্রয় দেওয়া যায়, কোন্ কথায় তাদের উদ্দাম কল্পনাকে মাদকতায় মশ্‌গুল ক'রে তুল্‌তে পারা যায়—এ বিদ্যার তিনি যাদুকর। কিন্তু কাল্পনিক চিত্রকে চিত্তহারী ক'রে প্রকাশ করাই তাঁর ব্যবসা, ঐতিহাসিক সত্যকে অ-সংস্কৃত ভাবে প্রকাশ করতে তিনি অভ্যস্ত নন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধে সত্যভাষণের খাতিরে অপ্রিয়ভাষণের কথা স্থানে স্থানে শাসানো আছে—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সত্যের জন্য অপ্রিয়তাকে ডরান্ নি। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি বারংবার পড়েও এই উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারলেম না। অর্থাৎ নিতান্ত দুঃসাহসিক সত্যভাষণের চিহ্ন কোথাও দেখতে পাই নি; বরং বিস্তর স্তুতিবাক্যে বাংলার তরুণদের (যাদের সম্ভাষণ ক'রে এই বক্তৃতা তাদের) কংগ্রেসের চেয়ে, বরদৌলীওয়ালাদের চেয়ে, নিখিল ভারতের অন্যান্য সকলের চেয়ে, অভ্রভেদী আসনে বসিয়েছেন। তারপর তাদের দলের মধ্যে দলাদলির যে উল্লেখটুকু করেছেন তারও ঝাঁঝটুকু মারবার জন্য তাকে যুগান্তের অভিশাপ, বাঙালীর জাতীয় উত্তরাধিকার-কলঙ্ক, প্রকাশ করেছেন। যাই হোক্ বক্তৃতাটি অক্রোধী ও অকামী মহাত্মার প্রতি কটু ও ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ, তাও আবার দলাদলির সৃজনকল্পে। এ সম্বন্ধে আমি শরচ্চন্দ্রের স্বদেশ ও সাহিত্যের "শেষ প্রশ্ন" শীর্ষক একখানি পত্র থেকে দু চারটি পংক্তি উদ্ধার ক'রে, আমার সমালোচনার এই অংশটি শেষ করব—পাঠক সন্দেহ করবেন না, এই পত্রখানি এই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তারই লেখা।

(১) "মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষাপ্রয়োগ করা চলে না এই কথাটাই অনেক দিনে, অনেক দুঃখে আয়ত্ত কর্‌তে হয়।" আয়ত্ত যে হয় নি তাই প্রমাণ করতেই যেন অধুনা-আলোচ্য বক্তৃতাটির অবতারণা। কত দিনে ও কত দুঃখে আয়ত্ত হবে তার সঠিক উল্লেখ নেই। (২) "মানুষকে আহত করায় নিজের মর্য্যাদা আহত হয় সব চেয়ে বেশী।" আশা করি ভবিষ্যতে একথা তিনি আর বিস্মৃত হবেন না। "আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের আত্ম-সম্মানে আঘাত করা আমার ধাতে পোষায় না।" এই পত্রের লেখকও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় !!!

বইখানার নাম "তরুণের বিদ্রোহ" দেবার কারণ বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না—তবে নামটা বাংলা দেশে ব্যবসা হিসাবে মূল্যবান্ বটে।

এই বইয়ের 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তরের অনপনোদনেয় বেদনা দিয়ে রচনা করেছেন। এর প্রত্যেকটি কথা আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয় নরনারী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। শিশুকাল থেকে প্রতি পদে স্কুলের শিশুপাঠ্য

বই থেকে হেড মাষ্টারের আফিসের খাতা পর্য্যন্ত সব আগাগোড়া মিথ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষ। "কর্ত্তৃপক্ষদের উত্তর ওতে কিছু মিথ্যা হয় না—ও সকলেই জানে।" যেটা সকলে জানে সেটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ভয়ে বা লোভে মিথ্যা বলার এই ক্ষুদ্রতা শিশুর মনে ধীরে ধীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে বড় হয়ে মিথ্যা কথা বলার অপমান, হীনতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে আর আহত করে না। একথা যদিও অতীব সত্য যে আমাদের দেশ দুর্ভাগা, কেননা এ রাজ্যে সত্য বলা সিডিশন কিন্তু একথাও কম সত্য নয় যে ঘরে এবং বাইরে আমরা আমাদের সামাজিক, সাংসারিক ও ব্যাবহারিক জীবনে অসত্যাচরণকে, আমাদের শিশুদের জীবনের সামনে 'ক্লেভারনেস্' ও 'ট্যাক্টফুলনেস্' চতুরতা ও সংসার-বুদ্ধির আদর্শরূপে দাঁড় করিয়ে থাকি। এরই আব্‌হাওয়াতে তারা বড় হয়। সুতরাং যে সম্পাদক শরৎবাবুকে বলেছিলেন গোড়ায় একটা 'যদি' এবং শেষে একটা 'কি না' দিয়ে তিনি রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে থাকেন তাঁর এ বিদ্যার শিক্ষা পিতামাতার এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই হয়েছে। জাতির এই হীনতা শরৎচন্দ্রের চিত্তে তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধকে পীড়িত করেছে। এবং তাঁর অনন্যকরণীয় আবেগময়ী ভাষায় তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর মনের এই দুরপনেয় বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরই ভাষায় বলি, "ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস্ না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নিচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?"

'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। ভাষার উপর লেখকের একটি সহজ অধিকার আছে লেখার মধ্যে বাঁধ কোথাও শিথিল হয়ে যায় নি—পড়তে ভাল লাগে।

"আমার কথা"—শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার কচকচি। তার রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে চাইনে। নৈতিক দিকে একটা কথা বল্‌ব। শরৎচন্দ্র লিখেছেন "আর 'ইন্‌ডিফারেন্স' অর্থে যদি কেউ (ইংরাজরা) এই ইঙ্গিত ক'রে থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজে নি, ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে" ইত্যাদি। আমাদের বল্‌তে দেশের লোকের মধ্যে ক'জনকে বোঝায় তা জানি না। গভীর ব্যথা অত্যন্ত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েকজনের বেজে থাক্‌তে পারে, কিন্তু দেশের লোক বল্‌তে যে বিপুল জন-সঙ্ঘকে বোঝায় তাদের ত শতকরা ৯৯ জনের দেশের সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিই নেই। বাকী লোকের মধ্যে কয়েক সহস্র যারা দেশের ও মহাত্মার খবর রাখেন তাঁদেরও (শরৎচন্দ্রের কথাই তুলে দি) "আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধার কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে পান থেকে এক বিন্দু চূণ যেন না খসতে পায়—তার পর স্বরাজ বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা হয় তা হোক্, কোনো আপত্তি নেই।"—অর্থাৎ হয় যদি ত পরের উপর দিয়েই হোক্। তার ফলাফল না হয় তাঁরা কৃপা ক'রে সহ্য করবেন। এমন কি পরের ছেলের মার খাওয়া, প্রাণ দেওয়া নিয়ে সকাল বিকেল চায়ের আসর, মেসের আড্ডা এবং লাটুবাবুদের বৈঠক-

থানায় বিজয় হুঙ্কারে ফাটাফাটি পর্য্যন্ত করতে রাজী আছেন। গভীর বেদনার কি জাজল্য চিত্র! মহাত্মার কারাদণ্ডে কটা থিয়েটার, বায়স্কোপ, একদিনও খালি পড়ে আছে? শরৎবাবুর এই কথাই ত সব চেয়ে সত্য যে, "তাঁকে মুক্ত করা দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাঁকে জেলে রাখতে পারবে না, তা সে গভর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালী হউন।" এই হাস্যকর গভীর ব্যথাটিকে "সে (গভর্ণমেণ্ট) যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে" ইনডিফারেন্স— "সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা?"

"স্বরাজ সাধনায় নারী" প্রবন্ধে শরৎবাবু লিখেছেন যে "মেয়েদের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে তারা সেই অনুপাতেই সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক দিকে ছোট হয়ে গেছে কিম্বা যারা তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নি অন্য কোন জাত তাদের পরাধীন করতে পারে নি, পারে না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়।" ভগবানের আইন আমার জানা নেই, এবং সে সম্বন্ধে স্পেকিউলেট করা আমার ব্যবসাও নয় কিন্তু স্বাধীনতা যদি সকলেরই কাম্য বস্তু হয় তবে মেয়েদেরও তা থেকে বঞ্চিত করবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। যে জিনিস ভাল, মঙ্গলকর, সে তার নিজের জোরেই মঙ্গলজনক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি প্রাচীন গ্রীস শিক্ষায়, শিল্পে, চিন্তায়, সাহিত্যে অতুলনীয়; কিন্তু সেখানে নারীর স্থান কোথায় ছিল? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর তুর্কী ও মোগলের কথা বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর তুর্কী ছিল 'টেরর অব্ ইউরোপ'। স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল বলেই তা ভাল, তা বই তাকে স্বরাজ-লাভের উপায় ব'লে উৎকোচের ব্যবস্থা করা কেন? কোনো ভাল জিনিসের মূল্যকে তাতে খর্ব্ব করা হয় না কি?

"শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধ পড়লে সেই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তাকে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা ইচ্ছে করলে শরৎচন্দ্র যতটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন ব'লে আমাদের জানা আছে এমন অল্প লোকই আছেন অথচ দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্র অযথা কথার মারপ্যাচে কতকগুলি অবান্তর তর্কের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমের কাছে আমাদের কিছু শেখবার আছে, এই সামান্য সত্যটুকুতে উষ্মা প্রকাশ করলে হয়ত দেশভক্তি প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু স্বদেশপ্রিয়তা যে প্রকাশ পায় না শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে কথা শরৎচন্দ্রকে তাঁর বই থেকেই স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। আসলে শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সেন্স অব হিউমার-এর মধ্যেও কোথায় যেন একটা নাটুকে বাঙালী বীর লুকিয়ে আছে; সে সময়ে এবং অসময়ে তার যাত্রার দলের পোষাকটা পরে আসরে নেমে পড়ে—তার হুঙ্কারে চারিদিকে হাততালি পড়তে থাকে—তখন আর শরৎচন্দ্রকে চেনা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, সে কোনো একটা সত্যের জোরে।"

শরৎচন্দ্র লিখ্ছেন—

"লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে এ একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু একেই যদি মানুষ চরম সত্য ব'লে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্ত ত" ইত্যাদি।

শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং 'ট্রুথে'র গোলমাল করেছেন, দেখ্‌লে. আশ্চর্য্য লাগে। আসল কথা রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের 'চেয়ে একটা নাটকোচিত স্বদেশিয়ানার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলি অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি করে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটে তুলে দেই।

১। সংসারে জয় করা বা কেড়ে নেওয়ার বিদ্যেটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই পশ্চিমের মানুষের বড় সার্থকতা এবং সেটার উপরেই রবীন্দ্রনাথের লোভ।—এটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্রের একটা আবিষ্কার বটে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তার ধারা আজ বাংলা সাহিত্যে নবশক্তিতে নবীন আলোকে, ভারতবর্ষের ধ্যান ও সাধনার পরমসম্পদ—এই বিশ্বব্যাপার ও মানবচেষ্টার অন্তরালে অজেয় আত্মিকশক্তির পরিচয়বার্ত্তাকে ঘোষণা করছে। এ খবর শরৎবাবুকে আমাদের দেবার দরকার আছে কি?

২। ইংরাজরা পৃথিবীকে কামধেনুর মত দোহন করেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী রয়েছি। এ একটি ফ্যাক্ট, একেই চরম সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে বলেছেন।

৩। পশ্চিমের সভ্যতার বোধ করি এই একটি মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। ইত্যাদি।

এ যেন নূতন 'লজিক' পড়া কলেজের ছেলের কথায় কথায় ছল ধরে তর্ক করা। 'সারভাইভেল অব্‌ দি ফিটেষ্ট'-এর রাজ্যে, জগতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর রূপে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে, শক্তিতে জীবনের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে মাথা তুলে রাখ্‌তে পেরেছে—যাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এ যুগের কালের যাচাইয়ে পরখ হয়ে গেছে—ঠিক যেমন কোনও এক যুগে পূর্ব্ব দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হয়েছিল—তাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের অন্তর্নিহিত কোনো মহাশক্তির প্রকাশ বলেই জান্‌তে হবে—কোনো অঙ্কশাস্ত্রই তাকে ফাঁকতালে পাওয়া (এক্‌সিডেন্ট) বল্‌বে না। সেই অন্তর্নিহিত মহৎ শক্তিই তাদের জীবনের মহৎ সত্য—বড় হবার সেই সত্য, একটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'। একদিন পূর্ব্ব দেশের লোক তার যে দিক সাধন করেছিল সে দিকে সে সিদ্ধি লাভ করেছিল—আজ পশ্চিম যদি তার কোনো দিকের সাধনায় বড় হয়ে থাকে তবে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে তার কাছে তা শিখ্‌তে হবে বই কি—এতে রাগের কি আছে? যে লোকটা গায়ে ভীমের মত শক্তি সঞ্চয় করল—তার গায়ের জোর একটা 'ফ্যাক্ট', সে মেছো-বাজারে গুণ্ডামি ক'রে ঠ্যাঠারি বাজারে বাড়ী তোলে এও একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু তিলে তিলে যখন সে শক্তি সঞ্চয়ের সাধনা করেছে এবং সেই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তার ভিতরকার রহস্য বা সত্য কি তার পরস্বাপহরণ না গুণ্ডামি?

শক্তিলাভ করা যদি অভিপ্রেত হয় তবে তার সাধনার গূঢ় তত্ত্ব তার একনিষ্ঠতা, তার 'মেথড্‌স্‌' সব তার কাছ থেকে শিখতে হবে। তারপর আমরা আমাদের শক্তির ব্যবহার কি ভাবে করব তাই দিয়ে আমাদের মেণ্টালিটির (মতির) পরিচয় দেব।

যে বিদ্যুৎ দিয়ে তারা মারছে তাই দিয়ে মানুষকে বাঁচাচ্ছেও ত—সুতরাং মারবার কথাটাই যে একমাত্র ফ্যাক্ট তাও নয়—তাদের জীবনেও নয়। সেইটেই একান্ত ক'রে শেখবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দেন নি।

তাছাড়া, বড় হওয়া বিদ্যাটা ত মাত্র তাদের নর-হত্যাতেই প্রকাশ পায় নি? যে যুগ যুগ সাধনার দ্বারা তারা শক্তি সঞ্চয় করবার মন্ত্র-সকল তাদের জীবনে পরিণত করেছে, তাদের কাজে ও ব্যবহারে, নিষ্ঠায়, আত্মদানে, একাগ্রতায়, তাদের কাজ ও সময়ের সুনিয়ন্ত্রণে, তাদের শৃঙ্খলা ত সৌন্দর্য্যবোধের সাধনায়, ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত হবার শিক্ষায় এবং সর্ব্বোপরি তাদের 'ডিসিপ্লিন ও 'ম্যানলিনেসের' চর্চ্চায় এবং কর্ম্ম সংসাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, তাদের জাতির অন্তর্নিহিত মহৈশ্বর্য্যের যে পরিচয় পাই, সেই ঐশ্বর্য্যেই তাদের চরিত্রের পরম সত্য। এই সত্যই তাদের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে আলোক স্বরূপ, মরু ও মেরু অভিযানের পাথেয়, পৃথিবীব্যাপী অধিকার বিস্তার ও প্রভুত্ব করবার শক্তির উৎস। এ নিয়ে রাগ ক'রে লাভ নেই। উত্তেজনা প্রকাশ করাই এই বই দুখানির অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রকৃতি। সুতরাং সাময়িক উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে, সাময়িক কাগজের বিস্তৃতি গর্ভে নিহিত থাক্‌লেই লেখক অন্ততঃ কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজের প্রতি ও দশের প্রতি অধিক বিবেচনার কাজ করতেন ব'লে আমার বিশ্বাস। নানা ব্যক্তিগত কারণে চিত্ত যখন বিক্ষুব্ধ থাকে তখন যে সব কথা লোকে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারণ করে তাতে বিচারবুদ্ধির চেয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায় বেশী, তাকে সত্যের সামনে বসিয়ে চিরস্থায়ী করবার বুদ্ধিকে সুবুদ্ধি বলা চলে না। সুতরাং এর মধ্যেকার সেই কটি প্রবন্ধ অন্ততঃ ধ্বংস পাবার যোগ্য।

শ্রীজীবনময় রায়।

Talleyrand—By Duff Cooper, (Jonathan Cape).

এককালে জীবনচরিত লিখন নীরস ঘটনা-নির্ঘণ্ট মাত্র ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ এক নূতন শ্রেণীর পুস্তক রচিত হইতেছে যাহা একাধারে জীবনী ও ইতিহাস, সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। আলোচ্য পুস্তক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মন্ত্রীবর তালের্‌াঁর জীবনকাল কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষ। এই অশীতিবর্ষের অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আধুনিক ভারতবাসী আমাদের বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কুপার সাহেব তালের্‌াঁকে উপলক্ষ করিয়া ঐ যুগের ইউরোপীয় রাজনীতির ক্রম-বিকাশ এমন প্রাঞ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইতিহাসে অনভিজ্ঞ পাঠকও সহজেই তাহা বুঝিবেন। এই মহাপুরুষ ইতিহাসে যেন এক অতিকায় কলোসাস্‌। তাঁহার বামপদ বুর্বন যুগে, দক্ষিণপদ বিক্টোরীয় যুগে। আর এই দুইযুগের মধ্যবর্ত্তী কালের ঘটনাপরম্পরার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। কিরূপ আবেষ্টনের মধ্যে এই অসাধারণ ধীসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার শৈশবের ও যৌবনের শিক্ষা হইল, কি প্রকারে ধীরে ধীরে তিনি ফরাসীদেশের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনীতিবিৎ বলিয়া

খ্যাত হইলেন, তাহা কুপার সাহেব উপন্যাসের ন্যায় সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা বাস্তবিকই চমৎকার। গাম্ভীর্য্য, কবিত্ব ও শ্লেষের অপূর্ব্ব সমন্বয়। লেখকের পাণ্ডিত্যের কথা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যে কত স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পাঠক পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। দেখিলে বুঝিবেন যে তাহার জন্য গ্রন্থকার কি কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন। এই কঠিন শ্রমের প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। কেননা এতাবৎকাল তালের‍্যাঁকে লোকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া জানিলেও স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া মনে করিত না। এতদ্দেশে কৌটিল্য ও যবন দেশে মাকিয়াবেলী যে কুটিল রাজনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা অনেকেই তালের‍্যাঁকে সেই নীতির মূর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া জানিতাম। কুপার এই মন্ত্রীপ্রবরের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এ ধারণা ভ্রান্ত। কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা পাঠক বিচার করিবেন।

কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তির গুণাগুণের যথাযথ পরিমাণ করিতে হইলে তাঁহার নিজ যুগের মাপকাঠি লইতে হইবে। কেননা, ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তালের‍্যাঁর দোষগুণ বিচার করিবার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটান শুচিবায়ু, কি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিক্টোরীয় ভব্যতার আদর্শ লইলে চলিবে না। যে যুগে পম্পাদুর ও দ্যুবারীর কক্ষ হইতে ফ্রান্সের শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইত, যে যুগে প্রত্যেক নূতন দার্শনিক চিন্তার ধারা গণিকার সালঁতে প্রবর্ত্তিত হইত, যে যুগে কবি তাঁহার প্রত্যেক নূতন কবিতা লইয়া প্রণয়নীর বৈঠক-খানার দিকে ধাবমান হইতেন, সেই তালের‍্যাঁর যুগ। সুতরাং তাঁহার কার্য্যাবলী বাইবেলের অনুশাসন-অনুযায়ী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

তালের‍্যাঁর জন্ম সাবেক ফ্রান্সের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ঘরে (১৭৫৪)। সাবেক ফ্রান্স বটে, কিন্তু নামে মাত্র। রাজকুলরবি চতুর্দ্দশ লুইয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী শাসনের ফলে দেশের অভিজাত শ্রেণী এখন রাজার আসাসোটাবরদারের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। প্রিন্স আছে, ডিউক আছে, কাউণ্ট আছে, আছে সবাই। কিন্তু তাহাদের একমাত্র কাজ খুব জমকালো সুবর্ণখচিত মখমলের পোষাক পরিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহের মত বিবর্ত্তন। আর সাধারণ প্রজা, যাহাদিগকে এই জরি-পরিহিত চোপদারেরা canaille বলিত তাহাদের উদরে অন্ন নাই; কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে শনৈঃ শনৈঃ রাজদরবারের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাদিগকে আর রিক্তহস্তে গৃহে ফেরানো অসম্ভব। তাহাদের উপদেষ্টা, তাহাদের গুরুস্থানীয় বল্‌টেয়ারপ্রমুখ ভাবুকের দল তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বলটেয়ার রাজদরবারে ফিরিতেন বটে, কিন্তু তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "জগতের প্রথম রাজারা ত ভাগ্যবান সৈনিকমাত্র ছিলেন। দেশের যে যথার্থ সেবক, তাহার বংশগৌরব নিষ্প্রয়োজন।" নৃপতি উপ-নৃপতিদিগের দিন ফুরাইয়াছে, ধর্ম্মযাজকের প্রভাব অন্তর্হিতপ্রায়—একথা সকলেই বুঝিয়াছিল। রাজার আপন বংশের চৌহদ্দির মধ্যেও এই নূতন চিন্তাস্রোত প্রবেশ করিয়াছিল। কালবৈশাখী তখনও বহুদূরে, ঈশান কোণের আকাশ তখনও সুন্দর নীল, তবু যেন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি সমস্ত জাতির মন চঞ্চল ও

অশান্ত করিতেছিল। পরম ভট্টারক লুই যে ইংরেজ জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, যে ইংরেজের রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার মোসাহেব মাত্র ছিল, সেই ইংরেজের হস্তে শেষ জীবনে তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। মার্লবরার হস্তে লুইয়ের নিগ্রহের কথা পড়িয়া রাজপুত মারাঠার হস্তে বৃদ্ধ আলমগীরের লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ে। কি বুর্বন কি মোগল, কেহই বুঝিলেন না যে জীর্ণ অট্টালিকার সংস্কার করিয়া বাহিরের ঠাট বজায় রাখা যায় কিন্তু তাহাকে আর মজবুত করা যায় না। উপরন্তু মেরামতের খরচ দুঃসহ হইয়া পড়ে। যখন রাজকুলরবি লুই অস্তমিত হইলেন, তাঁহার জন্য কেহই কাঁদিল না। রাস্তার canaille তাঁহার কফিনের উপর কর্দ্দম নিক্ষেপ করিল। লুই গেলেন কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের স্থায়ী বোঝাপড়া হইল না। কথায় কথায় ঝগড়া বাধিতে লাগিল। অবশেষে তালের াঁর জন্মের সময় যে সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ চলিল তাহাতে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। Wandiwash-এ ফরাসীর ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চূর্ণ হইল, কুইবেকে কানাডার রাজ্য বিধাতাপুরুষ ইংরেজের হস্তে তুলিয়া দিলেন। তবু ফরাসীজাতি ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িল না। ভারতের নানা রাজদরবারে, আমেরিকার নানা উপনিবেশে লালী, বুসী লাফায়েতের ন্যায় ফরাসী বীর প্রতিহিংসার পথ দেখিতে লাগিলেন। ভারতে প্রতিশোধ হইল না। ভারতের ভাগ্যদেবতা ইংরেজকে দুলাল বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। আমেরিকায় ফ্রান্সের প্রচেষ্টা বৃথা গেল না। U. S. A. নামে এক উজ্জ্বল নবীন নক্ষত্র রাজনৈতিক গগনে উদিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের এই রাজ্য-ক্ষয়ে ফ্রান্সের দুঃখ ঘুচিল না। কিরূপে ঘুচিবে? ফ্রান্সের অবস্থা তখন সঙ্গীন। রাজ্যের সমস্ত বোঝা একা বৃদ্ধ বুর্বন রাজার দুর্ব্বল স্কন্ধে। দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল প্রজার প্রতিনিধিগণ একত্র হইতে পায় নাই। যাহারা পূর্ব্বে সামন্ত ভৌমিক ছিল তাহারা আজ মোসাহেব মাত্র। ঋণজালে জড়িত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রাজা কাহার সাহায্য চাহিবেন? এরূপ অবস্থায় পড়িলে সাধারণ গৃহস্থের যে দশা হয় রাজারও তাহাই হইল। ভণ্ডগুরুও টোটকা চিকিৎসকের কবলে পড়িলেন। নূতন নূতন মন্ত্রী বাহাল হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। কালে লম্পট বৃদ্ধ রাজা পরলোকে গমন করিলেন। সচ্চরিত্র ধীর-প্রকৃতি ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসিলেন। লোকে অনেক আশা করিতেছিল। চ্যানেলের আর পারে ইংলণ্ড। সেখানকার লোকে রাজ্যের কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। রাজা আছেন, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন করেন না। জরীমখমল পরিয়া সাক্ষীগোপালের মত সিংহাসনে বসিয়া থাকেন। তৃতীয় জর্জ হাতে রাজদণ্ড লইতে গেলেন কিন্তু আমেরিকা হারাইয়া অপদস্ত হইয়া পার্লামেণ্ট দমনের দুরাশা ত্যাগ করিলেন। কমন্‌স্‌-সভা দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা। এরূপ ব্যবস্থা ফ্রান্সে করিতে পারিলে কি চমৎকার হয়! নেতৃস্থানীয় অনেক ফরাসীরই এই মত। তাঁরা চান ইংলণ্ডের সহিত সখ্য স্থাপন ও ফ্রান্সে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন। তালের াঁর প্রথম হইতেই এই মূল মন্ত্র ছিল। কুপারের মতে এই নীতি হইতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। পঞ্চাশ বৎসর নানা বাধা বিপত্তির পর তিনি এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮৩০ সালে। কিন্তু ১৭৮৬ সালেও ১৭৯১ সালেও তিনি এই মতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গিজো বলিয়াছেন যে বুর্বনদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার অর্থ ১৭৯১-এর constitution-এর পরাজয় ও ইংরেজী

constitution-এর জয়। বলটেয়ার মণ্টেস্কিউর মত ভাবুকও ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

কুপার সাহেব তালের্‌াঁর প্রেমপ্রবণতা, অর্থলোলুপতা, কিছুই ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। এ কথাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন যে মন্ত্রীপ্রবর নিমকের মর্য্যাদা কখনও রাখেন নাই। কিন্তু কুপারের মতে তিনি তাঁহার ফ্রান্স দেশকে দেশের রাজা বাদশাহের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া দেখিতেন। তাই অখণ্ড ফ্রান্সের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি আপন প্রভুর স্বার্থবলি দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমার বক্তব্য যে আর যাহার স্বার্থই বলি দিয়া থাকুন তালের্‌াঁ নিজের স্বার্থ কোন দিন বলি দেন নাই। কুপার সাহেবের মত জনাস্ব ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

Every change of allegiance that he made was made by France. * * * Like France he responded to the ideals of 1789 and believed in the necessity of the Revolution; like France he abominated the Terror, made the best of the Directory, and welcomed Napoleon as the restorer of order and the harbinger of peace: like France he restored tyranny and grew tired of endless war and so reconciled himself to the return of the Bourbons. When Charles X proved impossible he turned rather wearily, but not without hope, to Louis-Philipe, and once again he reflected the mood of his country. Constitutional monarchy, the maintenance of order and liberty at home, peace in Europe and the alliance with England, to these principles he was never false—and he believed that they were of greater importance than the Kings and Emperors, Directors and Demagogues, Peoples and Parliaments that he served." (P. 354).

আলোচ্য পুস্তক যতই সুলিখিত হউক না কেন, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনে সন্দেহ থাকিবে যে এই অসীম প্রভাবশালী মন্ত্রীপ্রবরের কোন principles ছিল কিনা।

সাবেক ফ্রান্সে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের জীবন নির্ব্বাহের দুই পন্থা ছিল। তাহারা হয় সেনানী হইত, নয়ত ধর্ম্মযাজক। তালের্‌াঁর বাল্যকালে এক পায়ে আঘাত লাগায় তাঁহার সেনানী হওয়ার পথ বন্ধ হইল। অতএব তাঁহাকে পাদরী হইতে হইল। কিন্তু সামান্য পুরোহিতের (Abbe) কাজ করিয়া জীবন কাটানো এরূপ প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তালের্‌াঁ ধর্ম্মযাজক হইলেও ধর্ম্মপরায়ণ কোনদিন ছিলেন না। তাঁহার কিছুই বাধিত না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা count হইয়া পৈতৃক জমীদারী সব পাইলেন। জ্যেষ্ঠ তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে লাগিলেন। সমসাময়িক প্যারিসে স্ত্রীলোকের প্রভাব কত বেশী ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তালের্‌াঁ একজনের পর একজন সুন্দরীকে সারথি করিয়া তাঁহার জীবনরথ চালাইতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সেই এক সুন্দরীর চেষ্টায় কার্ডিনালের লাল শিরোপা তাঁহার প্রায় হস্তগত হইয়াছিল। কেবল স্বয়ং মহারাণীর শত্রুতায় কার্য্য পণ্ড হইল। অবশেষে নিজ পিতার সুপারিশে বিশপ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিশপ মহোদয় Agent-General of the Clergy-র পদ পাইলেন। যখন ১৭৮৯ সালে চতুর্দ্দিকে বিপদজালে বেষ্টিত অল্পবয়স্ক রাজা ষোড়শ লুইকে বাধ্য হইয়া প্রজা মহাসভা (States General) ডাকিতে হইল

তখন তালেরাঁর উপযুক্ত সুযোগ মিলিল। তিনি সভার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন তাহাই নহে, চলিত ভাষায় যাহাকে মোড়লী বলে তাহাই করিতে লাগিলেন। বিশপ মহোদয় কোন দলেরই লোক ছিলেন না। রাজকুমার আর্তোয়া, মন্ত্রী কালন, বিপ্লবপন্থী মিরাবো ও দাস্ত সকলের সঙ্গেই তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। প্রয়োজন মত সকলের সহায়তা করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিলেন। নিজে বিশপ ছিলেন, তথাপি যখন সুবিধা বুঝিলেন সমস্ত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করাইবার উদ্যোগ করিলেন। রাজাকে দূর করিয়া দিয়া সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন তাঁহার অভিমত ছিল না, তথাপি কার্য্যতঃ তিনি সেই সাধারণতন্ত্রের দূত হইয়া ইংলণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলেন। যখন Terror-এর তাণ্ডব আরম্ভ হইল, রাজা রাণী গিলোটীনে গেলেন, তখন তালেরাঁ ইংলণ্ডেই আশ্রয় লইলেন। রবেস্পিয়ারের মন্ত্রীরা তাহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল। কিছুদিন পরে তিনি ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় গেলেন। সেখানে তখন প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত কদর। তালেরাঁ সেই সূত্রে খুব খাতির জমাইলেন ও নিজের নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া লইলেন। অর্থও যথেষ্ট সঞ্চয় করিলেন। এইরূপ যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সঞ্চয় সেই যুগে সকলেই করিতেন। সেজন্য যদি Fox, Clive, Hastings-কে অর্থপিশাচ না বলা হয়, ত ইঁহাকেও বলা চলিবে না।

ফ্রান্সে ডিরেকটরী স্থাপন হইলে পর তালেরাঁ দেশে ফিরিলেন। বারাস তখন প্রধান ডিরেকটর ছিলেন। Madame de Stael-এর আনুকূল্যে তাঁহাকে মুরুব্বী ধরিলেন ও অল্পকালের মধ্যেই আপন কূটবুদ্ধির বলে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন। গল্প আছে যে এই পদ লাভ করিয়া তালেরাঁ অনেকক্ষণ আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করিয়াছিলেন, "অগাধ অর্থ, অগাধ সম্পত্তি"। বারাস বা কেহই তাহাতে আশ্চর্য্য হন নাই। সে যুগে ত আর William Pitt বেশী ছিল না। মন্ত্রীবর পররাষ্ট্র সচীব ছিলেন, সুতরাং পররাষ্ট্রের নিকট হইতে দুই হস্তে পয়সা লুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন প্রেমিকা জুটিতে বিলম্ব হইল না। এই প্রেমিকাকে তিনি পরে যথারীতি বিবাহ করিয়া Princesse de Talleyrand নাম দিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের কলিকাতার একটু যোগ ছিল। ইনিই ছিলেন সেই Madame Grand যাঁহার জন্য Phillip Francis দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে।

এই সময়ে নেপোলিয়ন ইটালীদেশে সেনাপতির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তালেরাঁর লোক চিনিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। অমাত্য হইয়াই তিনি সেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া নেপোলিয়ন বুঝিলেন যে রাজধানীতে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বিচক্ষণ বন্ধু আছেন। পরস্পর সাক্ষাতের পূর্ব্বেই এই দুই মহাপুরুষের পত্রদ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তালেরাঁ প্যারিসে বসিয়া ভিতর হইতে ডিরেকটারীর ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করিয়া ফরাসী দেশের হৃদয় জয় করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবরের এই সময়ের কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কুপার বলিতেছেন,—

"It was typical of Talleyrand that in this, as in every other channel of the vast labyrinth of intrigue, he fulfilled himself no definite function, but served only as the go-between, acquainted with

everybody, knowing everything, and holding in his hands the end of every string."

ডিরেকটরীর শেষ করিতে মন্ত্রীবরের বেশীদিন লাগিল না। নেপোলিয়ন কন্সল উপাধি লইয়া দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া বসিলেন। তালেরাঁর পরামর্শে তিনি ফরাসী রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনোযোগ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার মানসে ইউরোপে শান্তি আনয়নের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক কালের অভিজাত মণ্ডলীকে দেশে ফিরিতে আমন্ত্রণ করা হইল। এমন কি, বুর্বন রাজকুমারদের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ সমস্ত ব্যাপারে তালেরাঁ মধ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনও বুর্বন বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে সর্ব্বেসর্ব্বা করা। তাহাই করিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্সল সম্রাট নাম লইয়া সিংহাসন অধিরূঢ় হইলেন। সীজার ক্রমওয়েল যাহা সাহস করেন নাই নেপোলিয়ন তাহা করিলেন। পরন্তু এই কার্য্যের ফল অপ্রত্যাশিত রকমের হইল। রাজচক্রবর্ত্তীর নজর আর দেশের আভ্যন্তরীন উৎকর্ষসাধনের দিকে রহিল না। কি করিয়া ইউরোপের সর্ব্বদেশে সম্রাটের গরুড়-লাঞ্ছিত ধ্বজা উড়িবে সেই চিন্তাই সার হইল। সচীব তালেরাঁ কন্সলের ভালমন্দ সকল কার্য্যেরই প্ররোচক ও সহায় ছিলেন। এমন কি, এঙ্গীয়ানের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডেও তিনি লিপ্ত ছিলেন, যদিও কুপার সাহেবের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু কয়েকবৎসরের মধ্যেই (১৮০৯) বাদশাহের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। তালেরাঁ ফ্রান্সের মঙ্গলকামী ছিলেন, নিজের স্বার্থও যথেষ্ট বুঝিতেন, কিন্তু নিরর্থক দিগ্বিজয়ের সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। বোনাপার্ট-বংশের গৌরব সাধনেও তাঁহার আগ্রহের একান্ত অভাব ছিল। নেপোলিয়ন মন্ত্রীকে ভালবাসিতেন। তথাপি তিনি সম্রাট, তাঁহার কার্য্যে মন্ত্রী আগ্রহ দেখাইবে না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। একদিন দুইজনের কলহ হইল ও তালেরাঁ অমাত্যের কাজে ইস্তফা দিলেন। ইস্তফা দিলেন কিন্তু রাজসভা ত্যাগ করিলেন না। Vice Grand Elector নামে দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন। বাদশাহ প্রয়োজনমত তাঁহাকে দৌত্য কার্য্যে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর হৃদয়ে আর প্রভুভক্তির লেশমাত্র ছিল না। অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর সহিত সম্রাটের বিবাহের ঘটকালী যে তিনি করিলেন তাহা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ইউরোপের শান্তি সম্বন্ধে চিরদিন তাঁহার যে কল্পনা ছিল অষ্ট্রিয়া ধ্বংস হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইবে। সেই জন্যই অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করিবার পাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮০৯ এর পর তালেরাঁ একনিষ্ঠভাবে ভিতর বাহির দুইদিক হইতেই নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সম্রাটের কালপূর্ণ হইয়াছে। ফরাসী জাতিও বিনা-কারণে যুদ্ধে শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নেপোলিয়নের পরাজয়, বুর্বনদের প্রত্যাগমন সহজেই সাধিত হইল। তালেরাঁর প্রভাব এই সময়ে এমন আশ্চর্য্য রকমের ছিল যে রুশিয়ার জার প্যারিসে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। বুর্বনরাজা মুকুট পরিলে তালেরাঁ আবার পররাষ্ট্র সচীব হইলেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধি হইয়া তিনি বিয়েনা কংগ্রেসে স্বদেশের সহিত ইউরোপের সন্ধি স্থাপন করিলেন। এমন সর্ত্তে সন্ধি হইল যেন ফ্রান্স যুদ্ধে কাহারও হস্তে পরাজিত হয় নাই।

তার পর সম্রাটের এল্‌বা হইতে পলায়ন, একশত দিবসের জন্য পুনরায় সিংহাসন অধিকার, এবং সর্ব্বশেষে ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ন-নাটকের যবনিকা পতন। এই একশত দিবস তালেরাঁর অবস্থা কতকটা ত্রিশঙ্কুরের মত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া তুই রাজার দরবার হইতেই দূরে বসিয়া রহিলেন। যখন ওয়াটারলুতে সম্রাটের নিঃসন্দেহ পরাজয় হইল, তখন মন্ত্রী লুইয়ের নিকট গেলেন কিন্তু লুই তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা কিছুই করলেন না, তখন তালেরাঁ মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর পঞ্চদশবর্ষ তাঁহার রাজদরবারের সহিত কোন যোগ রহিল না।

কিন্তু ১৮৩০ সালে, বৃদ্ধবয়সে পুনরায় তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। অবস্থা অনুকূল, প্রজারা বুর্বন রাজার উপর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছে। প্রজাদলের একজন উপযুক্ত নেতাও প্রস্তুত। তালেরাঁ আবার বিপ্লব বাধাইলেন এবং ফ্রান্সের রাজমুকুট অর্লেয়াঁ বংশের লুই ফিলিপের মাথায় পরাইয়া দিলেন। এবার কিন্তু মন্ত্রীত্ব লইলেন না। অর্থ যথেষ্ট সঞ্চয় হইয়াছিল, শুনা যায়, এক উৎকোচ গ্রহণের দ্বারাই তিনি ছয় কোটী ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। লোকে তামাসা করিয়া বলিত, প্রিন্স যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সুবর্ণ হইয়া যায়। লুই ফিলিপের দূত হইয়া তিনি লণ্ডনে গেলেন এবং সেখানে ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছানুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

১৮৩৪ সালের পর আর সরকারী চাকরীর সহিত প্রিন্সের সংস্রব ছিল না। চারি বৎসর পরে, ৮৪ বর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। লোকের কিন্তু বিশ্বাস, যে তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত ফরাসী রাজদরবারে যাহা কিছু ঘটিতেছিল সবেতেই তাঁর হাত ছিল। তিনি স্বহস্তে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বারণ ছিল তাই সেই আত্মজীবনী ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এখন হইয়াছে। কুপার সাহেব সেই পুস্তক হইতে তালেরাঁর আপন মন্তব্য স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ সত্যবাদী বলিয়া খ্যাত ছিলেন না, তাঁহার আপন কৈফিয়ৎ সর্ব্বত্র অমিশ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই।

আলোচ্য পুস্তকে তালেরাঁর কয়েকটী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় তিনি সুপুরুষ ছিলেন। তবে যে নট এত বড় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার আকর্ষণী শক্তি অন্তরের গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বাংলা ছন্দের মুলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত (প্রাপ্তিস্থানঃ গ্রন্থকার, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর; অথবা দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা)

এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিলো যে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত আর্য্যার সন্তান; কিন্তু যে-জৈব নিয়মের শাসনে প্রাণীমাত্রেই বংশানুক্রমিক অবনতির অধীন, তারি প্রভাবে আর্য্যার মাত্রিক পবিত্রতাও বাংলায় আর অবিমিশ্র নেই। শিশুশিক্ষার অন্যান্য কুসংস্কারের মতো এ-ধারণাও শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না; প্রয়োগের তাগিদে এবং

তার্কিকের নির্ব্বন্ধে মানতে হলো যে বাঙালীর ছন্দশাস্ত্র মূলে হয়তো আর্য্য ঐতিহ্যের ঋণমুক্ত। কিন্তু বাল্য প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার উপসর্গ দুর্ম্মর। তাই সংস্কৃতের মোহ একেবারে কাটাতে না-পেরে, আমি জোর দিলুম প্রাচীন ছান্দসিকদের একটা নাতিপ্রয়োজনীয় বিধানের উপরে, যার কল্যাণে পদান্ত্য বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা কবির রুচিসাপেক্ষ। অবশ্য কেবল এই বিধিমতোই যে বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি বানানো যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তাই কোনো এক অখ্যাত আলঙ্কারিকের কাছ থেকে আরেকটা নিয়ম ধার করলুম, যাতে ক'রে আর্য্যায় যতি ও ছেদের অভিন্নতা প্রমাণ হলো। কিন্তু এতেও যখন বাংলার মাত্রাপরিমাণ পেলুম না, তখন ওই দুই বিধানের সমর্থনে এক তৃতীয় বিধানের পরিকল্পনা করলুম যার ফলে বাংলা কাব্যে শব্দান্ত্য বিরাম আবার যতি ও ছেদের সমকক্ষ হ'য়ে উঠলো।

সুবিধার খাতিরে নিয়ম নির্ম্মাণের নামই অবৈধতা; এবং আমার উপরোক্ত বিধিগুলি সেই অভিধারই উপযুক্ত। তবু আমার মনোভাব যুক্তির প্রসাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলো না। আত্মজিজ্ঞাসাকে আমি এই ব'লে নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম যে বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের মতো একটানা না-হওয়াতে বাংলা ছন্দে প্রতি শব্দের শেষে যে-অবকাশ আসে, তা সংস্কৃততে শুধু চরণান্তেই বর্ত্তমান; কিন্তু এই দুই অবকাশের কালপরিমাণ যদি এক হয়, তবে তাদের ধর্ম্মও এক হবে এবং পদান্ত্য বর্ণের মতো প্রাগ্যতি অথবা প্রাগ্বিরাম বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতাও স্বয়ম্বশ হতে বাধ্য। অনুমানটা হয়তো নিতান্ত অন্যায় নয়; কিন্তু এত ক'রেও সকল সমস্যা মিটলো না। অনেক পরিচিত দৃষ্টান্তে এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত বিধির ব্যতিক্রম তো ঘটলোই, এমন-কি বাংলা কাব্যের একটা বিরাট বিভাগ, অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ, এই নিয়মের বশ্যতা কোনোমতেই মানলে না। বরং তাকে বিজাতীয় ছন্দরীতির সাহায্যে বোঝা গেলো, তবু সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। স্বরমাত্রিককে বৈদেশিক আখ্যা দিতে পারলে, হয়তো গোলোযোগ চুকতো, কিন্তু সেদিকে কোনো সুরাহা ছিলো না। কারণ মেয়েলি ছড়া এবং গ্রাম্য প্রবচন ইত্যাদি যে-ছন্দে রচিত, তাকে পরদেশী বললে, বাংলার প্রাণবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই বহু প্রসিদ্ধ ছন্দোবিদের অনুসরণে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক দ্বৈত মেনে নিয়ে, আমি মনে মনে স্থির করলুম যে স্বরমাত্রিক ছন্দই বাংলা কাব্যের আদিম বাহন; তবে তার উৎপত্তি প্রাক্‌সংস্কৃত যুগে হওয়াতে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিধিবদ্ধতা তার নাগাল পায়নি; কিন্তু জগতের সকল কাব্যকলার মূল নিশ্চয়ই এক; সংস্কৃত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সহজতাকে পরিহার করেছিলো, তাই বাংলা ছন্দের যে-অংশটা সংস্কৃত-গন্ধী, তার নিয়ম জগতের অন্যান্য ছন্দপদ্ধতির অনুরূপ নয়, যেটা অবিকৃত, তার সঙ্গে বাহিরের সংযোগ সুস্পষ্ট।

এই অদ্ভুত ধারণার ইতিহাস প'ড়ে, অনেকেই হয়তো হাসবেন। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই; কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক, তার আনুগত্যে অসম্মান নেই, আছে কেবল গৌরব। আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি, পূর্ব্বসূরিগণের সাধনালব্ধ সিদ্ধান্তকে অকারণে বা অল্পকারণে উপেক্ষা করা আমার স্বভাবে বাধে। উপরন্তু বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্করণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত এবং বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় সত্যের স্থান নেই। বৈজ্ঞানিক নিব্যূঢ়তার পূজা করেন না, তিনি খোঁজেন

অনুমিতির ব্যাপকতা। তিনি জানেন যে পৃথিবীকে অচল ভেবে তার চারদিকে সূর্য্যকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোয় সত্যের অপলাপ হয় না, হয় শুধু অনুমিতি-সংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি। অর্থাৎ পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বললে যতগুলি সমস্যার সমাধান করতে হয়, সূর্য্যকে কেন্দ্রে বসালে ততগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না; তাই বৈজ্ঞানিক সারল্যের খাতিরে আমাদের জগৎকে সৌরকেন্দ্রিক ব'লেই পরিকল্পনা করেন। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। এখানেও সত্যাসত্যের ভাবনা ভাবা অসার্থক, যেটা আলোচ্য সে হচ্ছে এই যে নবতর অনুমান অধিক ব্যাপক কিনা। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকরণেও বাংলা কাব্যের ছন্দোলিপি করা সম্ভব, কিন্তু তাহলে বাংলা ছন্দকে দ্বিধা- বা ত্রিধা-বিভক্ত ব'লে মনে করতে হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য ক'রেও আমি বাংলা ছন্দের ঐক্য খুঁজি, এবং যখন অন্বেষণ সার্থক হয়, তখনো তাঁর অভিজ্ঞতাকে মূল্যহীন ভাবি না, শুধু মানি যে তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তীরা সারল্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এগিয়েছেন।

আমি যত দূর জানি, এই ঐক্যসাধন ব্রতের প্রথম পুরোধা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এ-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"-নামক আলোচ্য পুস্তিকাখানি সেই সন্দর্ভের সংক্ষেপসার। বইখানির রচনারীতি দেখে মনে হয়, গ্রন্থকার বাংলা লেখায় এখনো অনভ্যস্ত। তাছাড়া তাঁর অপ্রাঞ্জল পরিভাষা, ছাপার ভুল এবং ব্যাখ্যার অভাব ইত্যাদি দোষ বইখানির রসগ্রহণের যথার্থ অন্তরায়। কিন্তু এ-সকল দুর্ব্বোধ্যতা এবং দৃষ্টান্ত উদ্ধারে অমার্জ্জনীয় ভুলচুক সত্ত্বেও, অন্তত আমার মনে আর কোনোই সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতিসম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়। এই প্রশংসা অমিত হ'লেও বিবেচনাসম্ভূত। সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি, তখন মনে কেবল প্রতিবাদই জেগেছিলো; কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে পাওয়ার পরে, আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনো ছোটখাট অনেক বিষয়ে কৌতূহলের তৃপ্তি হয়নি, কিন্তু তার জন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তবে আর কোনো অভিযোগ থাকবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কারণ যাঁর দৃষ্টিতে ছন্দের সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে তিনি কোনোমতেই পরাস্ত হতে পারেন না।

জয়-পরাজয়ের কথা বাধ্য হয়ে পাড়লুম; কারণ ছন্দ-যুদ্ধ আজকালকার সাময়িকীর প্রধান উপকরণ। এই বাক্‌বিতণ্ডার—অনেক সময়ে ভদ্রতাবিরুদ্ধ বাক্‌বিতণ্ডার, অনেকখানিই আমার বুদ্ধির অতীত; কেননা ছন্দসম্বন্ধে আমার কতকগুলো কার্য্যকারী ধারণা থাকলেও, এ প্রসঙ্গে গভীর অনুশীলন আমি কখনো করিনি। তবে যতটা বুঝি, তাতে মনে হয়, তর্ক মূলত বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। অবশ্য বাংলা ছন্দ যে বস্তুত ত্রিপথগা, তা কোনো পক্ষই অস্বীকার করেন না, অস্বীকার করার উপায়ও নেই, কারণ এই বিভাগ তিনটি কেবল অনুমানসাপেক্ষ নয়, শ্রুতিগোচরও বটে। কাজেই দ্বন্দ্ব প্রভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে। অমূল্যধনের প্রতিবাদকেরা বলেন যে প্রকার-তিনটি বংশগত নয়, জাতিগত। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই ত্রিধারা বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি; এগুলি অনাদ্যন্ত ও স্বসমুত্থ। অমূল্যধনের বিবেচনায় বাংলা ছন্দ কার্য্যত তিন প্রকারের—

শুধু তিন কেন বহু প্রকারের, হ'লেও তার মূলসূত্র এক ও অবিভাজ্য। এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িক রূপে যতই তারতম্য থাকুক, তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই; তাদের তাল এক কিন্তু ঢঙ ভিন্ন। নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশি যুক্তিবান; কারণ একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ, এমন মনে করা তো কষ্টকল্পনা বটেই, উপরন্তু তাতে কৃতকার্য্য হ'লেও, প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভুক্ত থেকে গেলো। এ ক্ষেত্রে যাঁরা প্রাক্‌রবি কবিমাত্রকেই ছন্দোদুষ্ট ব'লে ভাবতে না-পারবেন, তাঁদের পক্ষে অমূল্যধনের পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর সাহায্যে একদেশদর্শিতা তো বাঁচেই, অসম্ভাব্যতাকেও প্রশ্রয় দিতে হয় না।

অবশ্য পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ অমূল্যধনের নূতন আবিষ্কার নয়; ছন্দোবিচারকমাত্রেই ও-দুটির অস্তিত্ব মেনে এসেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীরা ছন্দে কালের প্রভাব-সম্বন্ধে অমূল্যধনের মতো সচেতন ছিলেন না; তাই তাঁরা অক্ষর বা মাত্রার হিসাবেই ছন্দোলিপি বানাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ কালপরিমাণই হচ্ছে বাংলা ছন্দের প্রাণ। এক ঝোঁকে কতকগুলো কথা ব'লে যাওয়াই বাংলা উচ্চারণের রীতি; কিন্তু বাক্যারম্ভে বাক্‌যন্ত্রের যে-শক্তি থাকে, বাক্যের শেষে স্বভাবতই তা কমে আসে; এবং বাংলা শব্দও যেহেতু কাটা কাটা ভাবে উক্ত হয়, তাই এখানেও ওই উত্থান-পতন ধরা পড়ে। এতে ক'রে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকে; এবং সেই স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। অতএব যদি এই পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আদর্শ ও পরিমাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে অক্ষরমাত্রার কম-বেশিতে বাংলায় ছন্দোপতন হয় না; পাঠক বিনাকষ্টেই অক্ষরমাত্রাকে প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে নিতে পারে ও নেয়।

অবশ্য একথা বলার ব্যাবহারিক মূল্য অল্পই। কিন্তু ছন্দশাস্ত্র যেহেতু কাব্যরচনার পথনির্দ্দেশ করে না, শুধু কাব্যবোধের উপাদান জোগায়, তাই অমূল্যধনের আবিষ্কারকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। এতে ক'রে বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি নিশ্চয়ই ওঙ্কারে পরিণত হলো না, কিন্তু ত্রিবেণীসঙ্গমের সন্ধান মিললো। অর্থাৎ বুঝলুম যে আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ছন্দকে স্বরমাত্রিক, আক্ষরিক, মাত্রিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা গেলেও, আলোচনাটিকে এমন এক পর্য্যায়ে তোলা যায় যেখানে এই প্রকারভেদ নিতান্ত নিরর্থক। ব্যবহারের ক্ষেত্রে অথবা বাংলা কাব্যের আধুনিক কাণ্ডে পূর্ব্বানুমোদিত স্বরভেদ এখনো মোটামুটি খাটবে; এবং যে-গন্থকারেরা অঙ্কব্যতীত ছন্দ লিখতে পারেন না, অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম তাঁদের কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ সহায়তা করবে না। কিন্তু যিনি শুধু কাজ চালিয়েই তুষ্ট নন, বিজ্ঞানসম্মত ঐক্যই যাঁর কাম্য, তিনি ভবিষ্যতে অমূল্যধনকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবেন, তবু আলোচ্য বইখানির ঋণ অস্বীকার করবেন না, তাঁকেও মানতে হবে যে গন্তব্যে পৌছতে না-পারলেও, পথ-সম্বন্ধে অমূল্যধনের ভুল হয়নি।

আমার ব্যক্তিগত জগতে ঐক্যসাধনের প্রয়োজনটাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। হয়তো সেইজন্যেই আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটাতে বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু তাহলেও এটা আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যার দ্বারা শুধু অভিন্নতাই সূচিত হয় এবং বৈষম্য অব্যাখ্যাত থাকে, তার মূল্য সামান্য।

সুতরাং অমূল্যধনের নির্দ্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনো হেতু পাওয়া যায় কিনা, তার বিচারেই এ প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত। প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্ব্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম। এগুলিকে পৃথক আখ্যা দেওয়ার সার্থকতা এই যে এদের কালপরিমাণ এক নয়, ক্রমবিবর্দ্ধমান। ছেদ সাধারণত অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের মানে বোঝে, এবং আগামী বাক্যের ভাবগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়। এইজন্যে ছেদের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক, অন্তত মিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্ক, খুব নিবিড় নয়। কিন্তু যতি নিঃশ্বাস গ্রহণের কাল; কাজেই যে-ছন্দে যতি দূরে দূরে স্থাপিত, সেখানে শব্দ এবং অক্ষরগুলো একটু তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হতে বাধ্য; কারণ বাক্যের মধ্যে শ্বাস নেওয়া বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ফলে যতি-বিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি সকল অক্ষরই প্রায় সমান ভাবে উচ্চারিত হয়, যৌগিক বর্ণ তার যথার্থ মর্য্যাদা পায় না। গদ্যে তো এ রকম ঘটেই, এমন-কি পয়ারও এই জাতীয় ছন্দ; কারণ অন্তত আট মাত্রার পরে তার প্রথম অবকাশ, এবং দ্বিতীয় অবকাশ ছয় বা দশ মাত্রার পরে। সুতরাং গদ্যে বা পয়ারে বর্ণোচ্চারণের খুব স্পষ্টতা নেই, আছে একটা ঝোঁক অথবা তান; এবং তার ফলে যুক্ত অযুক্ত, লঘু গুরু, সব অক্ষরই পয়ারে একমাত্রিক ব'লে গণ্য হয়। পয়ারের এই গুণকেই রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি নামে অভিহিত করেছেন।

পক্ষান্তরে অবকাশ যেখানে ঘন ঘন আসে, সেখানে শ্বাসের অনটন না-থাকাতে প্রত্যেক বর্ণ তার প্রকৃত ওজন পেতে পারে। এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান নামে পরিচিত। এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত এবং এর শোষণ-শক্তি ফলত সুপরিমিত। অর্থাৎ এতে যৌগিক স্বর, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ, হলন্ত অক্ষর ইত্যাদির মাত্রাসংখ্যা দুই এবং সময়ে সময়ে তিন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত অথবা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, আমার মতে, শব্দান্ত্য বিরামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এ-ছন্দে শব্দান্ত্য বিরামই শ্বাসের অবকাশ, যতি নিতান্ত গৌণ। কাজেই এখানে পাঠকের নিঃশ্বাসের পুঁজি সাধারণ উপায়ে ব্যয়িত হয় না, তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে, তাকে অতিরিক্ত কাজের ভার নিতে হয়। ফলে, বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়, এখানে সেটা, ইংরেজি উচ্চারণের মতো, শব্দে শব্দে অনুরণিত হতে থাকে। অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে অর্থ এবং আবেগই একমাত্র লক্ষ্য, ছন্দশিল্পের কারিকুরি নেহাৎ নগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই তাতে যত নিয়মের ব্যতিক্রম চলে, অন্যত্র তা সম্ভব হয় না। সেখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোটখাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলায় না। একটা অবিরাম ও উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গের উপরে ত্রুটি ঢাকবার ভার ছেড়ে দিয়ে, পাঠক ছেদের উদ্দেশে এমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে যে তার স্বাভাবিক বিজোড়বিদ্বেষকে উপেক্ষা ক'রেও, তাকে তিন পাঁচ বা সাত ইত্যাদির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় অনায়াসেই থামানো যায়।

এই বিরাম, যতি ও ছেদ সম্বন্ধে যা বললুম, তার প্রকাশ্য উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখক পরিশিষ্টে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন। এ-ধারণা যদি ভ্রান্তও হয়, আমার শৈশব যতিপ্রিয়তা থেকেই যদি এর জন্ম হয়ে

থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হবো না ; কারণ এ-প্রসঙ্গে যদিও বা ভুল করি, তাহলেও অন্যত্র তিনি আমার অজ্ঞানান্ধকারে সত্যই জ্ঞানদীপ জ্বেলেছেন। সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না, কারণ সমগ্র গ্রন্থখানিই এত সংক্ষিপ্ত যে তাকে আর কমানো আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া পুস্তকখানির সারসংগ্রহের জন্যে যতটা সময় ও স্থানের দরকার, তা আমার নেই। তাই অমূল্যধন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েই আমি ছুটি নিচ্ছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Adventures of the Black Girl in Her Search for God—BY BERNARD SHAW (Constable).

বার্ণাড শ-এর অনন্যসাধারণ লিপিদক্ষতা বিশ্ববরেণ্য। তাঁর কলমের খোঁচাটি পর্য্যন্ত আজ নাট্য জগতে প্রভূত অর্থ উৎপাদনে সমর্থ এবং তিনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। অথচ গত বৎসর Knysna-তে যখন একটানা পাঁচ সপ্তাহ আটক পড়ে লেখবার প্রচুর অবসর পেলেন তখন সামান্য এক কাফ্রি-কন্যার রূপকথা লিখে পাদ্রী-মহলে অনর্থ বাধিয়ে বসলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা অবশ্য তিনি বহুবারই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জগৎকে জানিয়েছেন কিন্তু এই স্বল্পাঙ্গ বইটির শেষভাগে দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাতে বাইবেল-উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তার নিশ্চয়তা আমাদের মত অ-খৃষ্টীয় নিরাসক্ত মনেও চঞ্চলতা এনে দিয়েছে।

বিষয়টি মামুলি এবং শ কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনাবশ্যক সৃষ্টি করেন নি ; তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে তাঁর ক্ষুদ্রকায় বইটি অবলম্বন করে আজ যে ঝড় উঠেছে তার প্রকোপ দেখে মনে হয় তিনি জীবনের সায়াহ্নকালে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তার পিছনে অনেকখানি সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। মনে অবশ্য সন্দেহ জাগে যে ইউরোপ হতে বাইবেলের প্রভাবের সমূল উচ্ছেদ সম্ভব কিনা ; কারণ বর্ত্তমান নিরীশ্বরবাদের যুগেও ইংরাজ ও মার্কিন জনসমষ্টি ঐ ধর্ম্মগ্রন্থকে স্বয়ং পরমেশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হওয়ায় গ্রন্থটির প্রচার ও ব্যবহার আশ্চর্য্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যথা, ভূত বা রোগ তাড়াবার কবচ, আদালতে শপথ গ্রহণ, যুদ্ধে bullet proof, আরও কত কি। এই সকল যাদুকরী মোহকে আগলে আছে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও শক্তিমান গির্জ্জা-সঙ্ঘ।

কিন্তু আলোচ্য বইটিতে শ বাইবেল পড়ার ঔচিত্য অস্বীকার করেছেন, গ্রন্থটির মহত্ত্ব স্বীকার করেও। অসভ্য পৌত্তলিকতা হতে চেতনের বিকাশ ও বৃদ্ধির এই যে কল্পনা, এর বাস্তবতা অর্দ্ধেক ভ্রান্ত হলেও প্রাণের গভীর প্রেরণা নিঃসৃত বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। অনুবাদকদের অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা, কবিপ্রতিভা, সংযম ও শালীনতা তাঁকেও মুগ্ধ করেছে। তথাপি তিনি বাইবেলের প্রভাব নষ্ট করতে চান : কারণ মানব-চৈতন্য স্বভাবতঃ অলস এবং এই আলস্যের জন্য সাধারণ শিক্ষিত লোক রাশীকৃত আবর্জ্জনা পরিষ্কার না করেই নূতন জ্ঞানের বোঝা মনের ভাণ্ডারে

জড় করে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে এবং বহু অনাসক্ত ও উন্নত মনেও পুরাতনের সঙ্গে নূতনের জোড়াতাড়া ও গোঁজামিল দেবার প্রবল অভ্যাসদোষ থেকে যায়।' তাঁর মতে মানব সমাজে বর্ত্তমান নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার মূলে পুরাতনের এই দূষনীয় আকর্ষণীশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেল হতে মেকী, সংকীর্ণ ও কদর্য্য অংশগুলি উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে মহত্ত্বের সঙ্গে সেগুলি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে ভক্ত মনে আসন গ্রহণ করেছে যে বাছাই চলে না। অর্থাৎ নোয়ার ক্রুদ্ধ দেবতা ও জোবের তার্কিক দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রায়িষ্ট এক হয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন যে যখন চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ভাবধারা স্থূলকায় দেবতাদের সহজ সঞ্চরণে আবিল হয়ে ওঠে এবং ধর্ম্মের নামে অভ্যাসদোষ মানুষের মনে স্থান অধিকার করে মানবচৈতন্যকে নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করে, তখন সচেতন মানবমনের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের লেখা শ-এর জীবনী পড়লে ধারণা জন্মায় যে বুদ্ধি-দীপ্ত ঔদ্ধত্য বশতঃ বুঝি চিরকালই শ ক্রায়িষ্টকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছেন। শ-এর সব লেখা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি তবে এই বইটি পড়ে সে ধারণা দূরীভূত হয়েছে। ক্রায়িষ্টকে তিনি অস্বীকার করেন না ; তবে কয়েকটি সরল সত্য কথা আগলে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না, বিশেষ করে তাতে যখন বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাই অধিক। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়েছেন যে পুঁথির জীর্ণ কাগজ চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় সত্যের একমাত্র বাহন নয়।

বিপর্য্যয়ের প্রমাণের অভাব নাই। বার্মিংহামের বিশপ সম্প্রতি ভীতি প্রকাশ করেছেন যে ইংরাজ গির্জ্জা-পন্থীরা বিজ্ঞানের সংঘাতে পথভ্রষ্ট হয়ে ক্রায়িষ্টকে ছেড়ে গোঁড়ামির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছে। শ তারই রেশ টেনে গত মহাযুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণের সাহায্যে আরও প্রমাণ করেছেন যে ধর্ম্মপ্রাণ সুসভ্য ইউরোপ যেরূপ দ্রুতগতিতে আজ অস্ত্র নির্ম্মাণে মত্ত, তাতে অ-খৃষ্টীয়দের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা উচিত।

অনেকের ধারণা শ অতিরিক্ত নাটকীয়, এবং আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁর প্রকৃতি-গত বিরোধ থাকার জন্যেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলেই বিশেষণপ্রাচুর্য্য ও অতিকথনের ভারে তিনি নিজের বক্তব্যকে কলুষিত করে তোলেন। কিন্তু আলোচ্য বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে তাঁর সত্যনিষ্ঠার প্রাখর্য্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সত্য হয়তো মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ও নিজের রূপ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করে অতিবড় ঔদ্ধত্যেরও মাথা নত করে দেয়—কিন্তু নিষ্ঠার মাধুর্য্য সনাতন। শ-এর বহুমুখী প্রতিভার অন্তর্নিহিত এই নিষ্ঠাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

গল্পের কথা এখনও বলা হয়নি। একটি কাফ্রি-কন্যার ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসা কথনচ্ছলে রূপকথার ছাঁদে বইটি লেখা হয়েছে। উড্‌কাট চিত্রে বিচিত্র, ক্ষুদ্রকায় বইটির রচনাভঙ্গীতে সারল্যের মৌলিকতা ফুটে উঠেছে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় উলঙ্গ কাফ্রি-কন্যার আমদানি যাঁরা উদ্ভট মনে করতে পারেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে আফ্রিকাই জগতের মধ্যে আজ একমাত্র মহাদেশ অবশিষ্ট আছে যেখানে অতীত হতে আহৃত সংস্কারের ভার মানবমনকে গতিহীন করতে পারেনি। সে দেশে শিশুসুলভ সরল মনের নির্ভীক ও নির্লজ্জ প্রশ্ন কথার চাতুরীতে প্রবোধ মানে না। বালিকাটির কাছে যখন ঈশ্বর পূর্ণগ্রহণ বা ভূমিকম্পের মতই প্রত্যক্ষ সত্য

ও বাস্তব, তখন সে মিশনারীর কথায় না ভুলে যে একটা লগুড় হাতে নিজেই ঈশ্বর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

একটু অস্বস্তি স্বতঃই মনে জেগে ওঠে যখন নিছক রসের সরলতা বিচিত্রতর করে তুলতে শ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে বিকৃত করে তোলেন। গল্পের প্রারম্ভে মিশনারী চরিত্র অঙ্কনে তিনি অমার্জ্জনীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মহিলা মিশনারীমাত্রেই প্রণয়-ব্যাপারে বৈফল্যবশতঃ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে পরমার্থ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন না তা শ-এর জানা উচিত ছিল। গল্পটিতে মিশনারী-চরিত্রটি অবশ্য গৌণ কিন্তু নিরর্থক নিষ্ঠুর টিপ্পনীর দ্বারা এক শ্রেণীর লোকদের গাত্রদাহ উপস্থিত করিয়ে তাঁর রচনার সম্পদ অণুমাত্রও বেড়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু তাঁর শিল্পচাতুর্য্যের এমনি মহিমা যে কূট তর্কের মধ্যে যুক্তিবৈষম্য প্রয়োগ করেও তিনি রচনাকে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য করতে পারেন।

চঞ্চলচিত্ত, মুখরা, সত্যসন্ধানী কাফ্রি-মেয়েটির ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য, স্পর্দ্ধা ও আত্ম-সংস্থা অবলীলাক্রমে বাইবেলের দুর্দ্ধর্ষ সংহার-মূর্ত্তি দেবতাদের পরাস্ত করে আমাদের জুজুর ভয়পীড়িত মনকে উৎফুল্ল করেছে। ক্রাইষ্টের সন্ধান মিললো যাত্রা-শেষে নয়, পথিমধ্যে কূপপার্শ্বস্থ সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়। তিনি প্রথমে ক্ষিপ্র হস্তে দুই একটি 'ম্যাজিক' দেখিয়ে বালিকাটির হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁর বিনয়-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েও বালিকা চিরন্তন প্রশ্নটি পরিত্যাগ করলে না। অবশেষে ঐ অমায়িক ভদ্রলোকটিকেও স্বীকার করতে হলো—'to find him such as you must go past me'।

গোঁড়া খৃষ্টানদের যাঁরা এইখানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হাহুতোস্মি করতে থাকবেন তাঁদের আশ্বাস দিয়ে সমালোচনাটি এই বলে শেষ করতে পারি যে বালিকাটির অহমিকা আর বেশী দূর গড়ায় নি। ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসার বাতুলতা মস্তিষ্কে প্রবেশ করা মাত্র চতুর বালিকা সনাতন প্রথামত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান লালন পালন ও বৃক্ষ রোপণে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলে।

অবশ্য এইরূপ জীবন্ত সমাধি লাভ করবার পূর্ব্বে তার সরল দৃষ্টির আলোকে বিজ্ঞানের সংকীর্ণতা, শিল্পের অসারতা ও মনুষ্যদের একদেশদর্শিতা উদ্ভাসিত হয়ে তার চিত্তকে তিক্ত করে দিয়েছিল।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Where is Science Going?—BY MAX PLANCK, with a Preface by Albert Einstein, translated and edited by James Murphy, (George Allen & Unwin Ltd.).

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার ও তার ভাবার্থ সম্বন্ধে ইদানিং এতগুলি বই লেখা হয়েছে যে তার তর্কবিতর্কের কচ্‌কচিতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে বল্লেই হয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে এই দুরূহ বাদানুবাদ পুনঃসঞ্জীবিত করা কেন। অপরপক্ষে এ কথা মনে করাও অসঙ্গত হবে না যে এই বাদানুবাদের একটা সুরাহা

করবার জন্য প্লাঙ্ক আইনষ্টাইন তুল্য মহারথীদের বিধান নেওয়া নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব নয়। আলোচ্য বইটির সম্পাদক মার্ফি কতকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ দুই বৈজ্ঞানিকের কাছে গমন করেছিলেন। উপরন্তু আইনষ্টাইনের কাছে তিনি এ প্রস্তাবও করেন যে পুস্তকপ্রকাশক ও কাগজওয়ালার কল্যাণে ইংরাজীশিক্ষিত দেশে 'আপেক্ষিকতা'র যতটা প্রচার হয়েছে, আপেক্ষিকতার চেয়েও নব্যবিজ্ঞানের যা ঢের বেশী গভীর তত্ত্ব সেই Quantum law বা মাত্রাতত্ত্বের ততটা প্রচার হয়নি, অতএব এই তত্ত্বটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করানো অবশ্যকর্ত্তব্য। এ প্রসঙ্গে আইনষ্টাইন্ একরকম এই কথা বলেন যে সাধারণবোধ্য করতে গিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা হয় তাতে বিজ্ঞান বেচারী মারা পড়ে। এডিংটন্ জীনস্ প্রভৃতির লেখায় যে আদর্শবাদ ব্যক্ত হয়েছে সে বিষয়ে মত জানতে চাইলে আইনষ্টাইন্ বলেন—এ সব বৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠকের জন্য সাহিত্যের তাড়নায় যাই লিখুন না কেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক অন্তরাত্মা কখনই কোন অবৈজ্ঞানিক কথার আমল দেবে না। অর্থাৎ পাকা বৈজ্ঞানিক আপন গণ্ডীর বাইরের কোন ব্যাপারেই ফতোয়া জারী করবেন না।

এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানবৃদ্ধ প্লাঙ্ক এই সাধারণপাঠ্য বই কেন রচনা করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিজ্ঞান রচনা করতে হলে কতকগুলি জিনিষ মেনে নিতেই হয়, সুতরাং কোন্ কোন্ জিনিষ মেনে নেওয়া হচ্ছে তার তালিকা দেওয়া বৈজ্ঞানিকেরই কাজ। এই বিষয়ের জবানবন্দীতে প্লাঙ্ক বলেছেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েই বাহ্য-জগতের অতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও পূরাপূরি আস্থাবান।

যে মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আইনষ্টাইন বইটিকে অলঙ্কৃত করেছেন তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি শ্রদ্ধামণ্ডিত। তা থেকে একটু উদ্ধৃত করলাম,—

I am sure Max Planck would laugh at my childish way of poking around with the lamp of Diogenes. Well! why should I tell of his greatness? . . . . His work has given one of the most powerful of all impulses to the progress of science. His ideas will be effective as long as physical science lasts. And I hope that the example which his personal life affords will not be less effective with the later generations of scientists.

মার্ফি প্লাঙ্কের একটি ছোট্ট জীবনচরিত দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় তাঁর এই personal life-এর প্রভাব তাঁর কাজে, লেখায় ও তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে কত সজীব। আজ পঁচাত্তর-এর কাছাকাছি বয়সে তিনি দেশের সর্ব্বোত্তম বৈজ্ঞানিক আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন আর বিজ্ঞানে তাঁর সত্যসন্ধানী খরদৃষ্টি, অকৃত্রিমতা ও ঔদার্য্য, শুধু দেশবাসীর নয়, সারা জগতের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে বিপুল সম্ভ্রম অর্জ্জন করেছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে প্লাঙ্ক গত পঞ্চাশ বছরের বিজ্ঞান বিকাশের একটা বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথাটা এই—সাধারণ লোক মনে করেন যে relativity-র মূলসূত্র হল দেশ কাল ও তার মাপযোপ এই সমস্তকেই আপেক্ষিক বলে প্রতিপন্ন করা। তা নয়,—আসল কথা এই যে দেশকালময় four dimensional world-এ যে কোন

ছুটি ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ একটা পরিমাণ দিয়ে যুক্ত। আপেক্ষিকতা যে ধ্রুবমানকে উড়িয়ে দেয়নি, এ সংবাদটুকু সাধারণ পাঠকের নিশ্চয় কাজে লাগবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর মত তাঁর আগের বইয়েই সুচারুরূপে বিবৃত হয়েছে। তাঁর মতে প্রত্যক্ষমাণ জগতের পিছনে একটা বাস্তব অস্তিত্বমান জগৎ রয়েছে। অবশ্য এ কথা যুক্তি দিয়ে (formal logic) প্রমাণ করা যায় না কিন্তু যুক্তিবলে খণ্ডনও করা যায় না। বৈজ্ঞানিক জগৎ এই আসল জগতেরই প্রতিবিম্ব,—nature's image in science। কিন্তু এ প্রতিবিম্ব অসম্পূর্ণ, আস্তে আস্তে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সৃজিত হচ্ছে না, বৈজ্ঞানিকের মন থেকে স্বপ্রণোদিত হয়েই তা সৃজিত হচ্ছে, সুতরাং বিজ্ঞান কল্পিত জগৎ অভিজ্ঞতার ফল নয় বরং অভিজ্ঞতা-কর্তৃক পরিশাসিত পরিকল্পনার ফল। সম্মুখে যখন বাধা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি যখন আর বিজ্ঞানকে পথ দেখাতে পারে না, তখন বৈজ্ঞানিকের মনে ঐকান্তিক চিন্তার ফলে নূতন তথ্য বিকশিত হয়ে ওঠে। তার পর যাচাই করার ফলে এগুলি কর্ত্তিত বর্জ্জিত বা সম্প্রসারিত হয়ে গৃহীত হয়। এমনি করে মনের এলোমেলো ও হাতধরা প্রণালীতে বা বরাতলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নীত হয়। অতএব বিজ্ঞান কখনই কোন ব্যাপারেরই শেষ মীমাংসা সম্পাদন করে না, বিজ্ঞান সকল অবস্থাতেই তখনকার মত কাজ চালাবার কলকাঠি। বিজ্ঞানের সকল রকম সূত্রও তাই, বিজ্ঞানাঙ্কিত জগতের চিত্রও তাই। কিন্তু এ চিত্র অঙ্কিত করবার জন্য একান্তভাবে ও নির্ব্বিবাদে দু-একটি জিনিষ মেনে নেওয়া চাই। প্রত্যক্ষ জগতের পিছনে একটা আসল জগতের অস্তিত্ব এইরকম একটা অবলম্বন। প্লাঙ্কের মতে এই আসল জগৎকে মেনে নিলেও বিজ্ঞান কোনদিনই তার শেষ পর্য্যন্ত নাগাল পাবে না, কেবল ক্রমশ তার দিকে অগ্রসর হবে, অগ্রসরের পথ কোনদিনই একেবারে রুদ্ধ হবে না। পথ চলাতেই বিজ্ঞান সফলকাম,—আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যত বিজয়সিদ্ধি হয়েছে সবই এর অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

এ কথা বলা বোধহয় বাহুল্য হবে না যে বিজ্ঞানে অস্তি নাস্তির বিচার মাথা তুলে উঠেছে এই নূতন তত্ত্ব থেকে যে বস্তুর মধ্যে সবই ফাঁকি, বস্তুভাগ শূন্যমাত্র। অণু ছিল এতদিন বিজ্ঞানের আদি সত্তা এখন অণু হয়ে দাঁড়িয়েছে সবটাই প্রায় ফাঁকা, শুধু দু দশটি ইলেক্‌ট্রণের রঙ্গভূমি। আবার ইলেক্‌ট্রণ তার বস্তুসত্তা হারিয়ে এসে ঠেকেছে শুধু তরঙ্গে। তরঙ্গ বটে কিন্তু কিসের তরঙ্গ তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এই থেকেই এসেছে সাকার অস্তিত্বের (objective reality) প্রতি সন্দেহের প্ররোচনা ও তাই থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিরূপণের প্রচেষ্টা।

এর পরের দুটি পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক আলোচনা করেছেন causation and free will—যাকে বলা যেতে পারে হেতুধর্ম্ম বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ও ইচ্ছার স্ববশতা। বিজ্ঞানের পক্ষে যে দৃঢ় অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলতা তার আর একটি। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শাসনে সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আনয়ন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ। যেখানে যেখানে বিজ্ঞান দখল পায়নি, বলতে হবে সে সব স্থানে কার্য্যকারণ সূত্রও তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। শুধু পদার্থবিজ্ঞানে নয় অন্যান্য বিজ্ঞানেও,—যেমন জীবতত্ত্বে, উদ্ভিদতত্ত্বে, ধনতন্ত্রে, মনস্তত্ত্বে, এমন কি

সমাজতত্ত্বেও এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলারই অনুসন্ধান চলছে ও যতই এ সব বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে ততই কার্য্যকারণসূত্র প্রয়োগের সফলতা প্রমাণিত হচ্ছে। এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে হঠাৎ Quantum law,—মাত্রাবিধি, এসে হাজির হয়েই কার্য্যকারণের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়িয়েছে।

হেতুবিধির দার্শনিক ও যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি কি, সে সম্বন্ধে প্লাঙ্ক এক অপরূপ ও মনোহর বিশ্লেষণ রচনা করেছেন। তাঁর এ রচনা পঁয়াকারের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পাশে স্থান পাবে বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। প্রচলিত ইউরোপীয় ন্যায় ও দর্শনবাদ আলোচনা করে প্লাঙ্ক দেখিয়েছেন যে হেতুবিধি বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নেই। হেতুবিধিকে একেবারে গোড়া থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, হেতুবিধির ওপরই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতিষ্ঠা। হেতুবিধি আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে প্রায় সব কিছুকেই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করে এসেছে, বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ইলেক্‌ট্রনের নবাবিষ্কৃত আচরণ থেকে। এই আচরণ ধরা পড়েছে নব্যগণিতে, যার অনুসারে ইলেক্‌ট্রনের অবস্থিতি ও গতিমান নির্দ্দেশ করে বলা অসম্ভব, গণনায় তার খানিকটা অনিশ্চিত হবেই হবে। আর কতখানি অনিশ্চিত হবে তার পরিমাণও এই নব্যগণিত নিরূপণ করে দিয়েছে। পাখীটা খাঁচার ঠিক কোনখানটিতে আছে তা নির্ণয় করে বলতে পারি না কিন্তু খাঁচার চৌহদ্দি আমরা নির্দ্দেশ করে বলে দিতে পারি। এই উদাহরণটি আমরা এখানে জুড়ে দিলাম, যদিও প্লাঙ্ক এর উল্লেখ করেন নি। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে তাহলে ও-গণিত কোন কাজের নয়, কিন্তু এ আপত্তি ঠাঁই পাবে না কেননা ও-গণিত পদার্থ-বিজ্ঞানের অণু পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রনের অনেক আচরণ ব্যাখ্যা করেছে যা অন্য কোন গণিতমতে ব্যাখ্যাত হতে পারেনি। আর এ গণিতের মূলে রয়েছে মাত্রাবিধি,—যাতে বলা হয় যে, শক্তি একমাত্রা থেকে পরবর্ত্তী মাত্রায় উঠতে নামতে পারে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী কোন অঙ্কে উপস্থিত হতে বা স্থির থাকতে পারে না। দেখা গেছে ইলেক্‌ট্রন ঠিক এই নিয়মানুসারেই শক্তি ভোগ করে থাকে,—আর এ ছাড়াও মাত্রাবিধি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্লাঙ্ক বলছেন যে, প্রথমত ইলেক্‌ট্রনের অবস্থিতি বা গতিমান নির্ণয় করা যাচ্ছে না বলে এ প্রমাণ হয় না যে ও দুটি কার্য্যকারণসূত্র অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। তাঁর মতে নূতন গণিতকে একদিন হয়ত এমন করে ঢেলে সাজানো যাবে যাতে হেতুবিধির অমোঘতা বজায় থাকবে। দ্বিতীয় কথা, অবস্থিতি প্রভৃতি কতকগুলি অভিজ্ঞানকে এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ধরা যাচ্ছে না বলেই যখন হেতুবিধি নিয়ে এই বিরোধের সৃষ্টি, তখন এও ভেবে দেখা দরকার যে অবস্থিতিই বা বিজ্ঞানে এমন পরমপদ লাভ করল কিসে। এতদিন সে পদ সে পেয়েছিল কেননা তা দিয়েই হেতুবিধি প্রয়োগক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু কোনক্ষেত্রে যদি অবস্থিতি বা গতিমানের বদলে মাত্রাই পরমপদ পায়,—যদি কোন কিছু কয় মাত্রা শক্তির আদান প্রদান করলে এই দিয়েই ঘটনা-পরম্পরা সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়, তবে অবস্থিতি ও গতিমানের প্রতি আমাদের পূর্ব্বকার অশেষ নির্ভরশীলতা জলাঞ্জলি দিতে ক্ষতি কি? বরং এইটিই মনে হয় যে অবস্থিতি ও গতিমানের অভিজ্ঞান সেই পর্য্যায়ের যা সমষ্টি-সম্পর্কে খাটে, খাঁটি ব্যষ্টি সম্পর্কে নয়; পরন্তু মাত্রার প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র ব্যষ্টিতে। অথবা এমনই যদি হয় যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাসূত্র বিসর্জ্জন না দিলে বিজ্ঞানের প্রগতি রুদ্ধ হবে, তবে তার বদলে

যে সূত্র স্বীকার করলে সে প্রগতি সিদ্ধ হবে সেই সূত্রই বিজ্ঞান অবাধে গ্রহণ করবে। কোন সূত্রেরই স্বয়ংসিদ্ধ অধিকার নেই, সেই সূত্রই স্বীকার্য্য যা ব্যাবহারিকক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিশ্লেষণে টিঁকে থাকতে পারে।

প্লাঙ্ক তাঁর আলোচনায় অহং ও ইচ্ছাশক্তির লীলার কথাও বাদ দেননি। তিনি বলেন এ দুটি বিষয়ে জোর করে কোন কথা বলা সম্ভব নয়, তবে এইটেই যেন মনে হয় যে যতই সকল রকম বিজ্ঞানের উন্নতি হবে ততই মানবচরিত্র, ইচ্ছা ও মনের ক্রিয়া-কলাপ, এমন কি মহানুভব ও মহাজ্ঞানীদের কার্য্যাবলী ও প্রতিভা ইত্যাদি সমস্তই গণনার আয়ত্তাধীন হয়ে পড়বে; কিন্তু অহং-এর দ্বার থেকেই বিজ্ঞানকে ফিরতে হবে। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন বিজয়সাধন যেমন তার সার্থকতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞানের এত অধিকার বিস্তার সত্ত্বেও সাধারণের মনে ঐশী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঐশী শক্তি, অহং ও আধ্যাত্মিকতা বিজ্ঞান-পর্য্যালোচনার বাইরে,—religion belongs to that realm that is inviolable before the law of Causation and therefore closed to science।

একটা জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় ন্যায় বা দর্শন কি হেতুবিধি ও বিজ্ঞান এবং reality সম্বন্ধে আধুনিক প্রসঙ্গোপযোগী কোন কিছু আলোক-সম্পাত করতে পারে না?

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Sleepwalkers—BY HERMANN BROCH (Martin Secker).
The Forty-second Parallel—BY JOHN DOS PASSOS (Constable).

পশ্চিমের লেখকেরা দিনে দিনে এমন লিপিচতুর হয়ে উঠছে যে প্রায় সকল আধুনিক পুস্তকই সুপাঠ্য, এবং অনেকগুলি স্মরণীয়। কিন্তু তাহলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষ কমেছে বই বাড়ে নি। যদিও এটা বিশেষ ক'রে নভেলেরই যুগ, এবং প্রতি বৎসরেই একাধিক ভালো নভেল মুদ্রিত হয়, তবু যথার্থ মহৎ উপন্যাস যুদ্ধের পরে বড় একটা আর দেখা যায়না। এই সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্যে টলষ্টয় অথবা হার্ডিকে প্রতিমান হিসাবে ধরা নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের তুল্য লেখক সকল দেশে এবং সকল কালেই বিরল; কিন্তু মুর্, গল্স্‌ওয়ার্দি, ওয়েল্স্, বেনেট্ ইত্যাদির মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কথকদের তুলনাও আধুনিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা শক্ত। এর মূলে হয়তো কোনো একটা কারণ নেই; হয়তো জীবনের সার্ব্বত্রিক দুর্দ্দশাই নভেলেও প্রতিবিম্ব ফেলেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সর্ব্বনাশ নভেলকে যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন, আন্তর দৈন্যই তার প্রধান শত্রু। এ-মতে সম্প্রতিবিদরা সম্ভবত অধীর হয়ে উঠবেন; এবং একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বৈচিত্র্যে নবীনেরা প্রবীণদের বহু পশ্চাতে ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু এটাও সুনিশ্চয় যে নভেল রচনায় কেবল উদ্ভাবনাশক্তিই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে সত্যনিষ্ঠাও হয়তো অনাবশ্যক, যেটা অপরিহার্য্য, সে-গুণ হচ্ছে লরেন্স্ যাকে বলেছিলেন thought adventure, অর্থাৎ দুঃসাহসিক ভাবুকতা।

লরেন্স্ ছাড়াও দু-একজন উত্তরসামরিক ঔপন্যাসিক ওই গুণের মর্য্যাদা বুঝেছেন, সত্য; কিন্তু অধিকাংশই আজ সনাতন আদর্শে আস্থাহারা। অবশ্য এ-মনোভাব মার্জ্জনীয়; এবং সম্প্রতন উপন্যাসের নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানসারূপ্য আমার অনুমোদিত। কিন্তু তর্ক বাধে বিশেষণটির অর্থ নিয়ে। সাহিত্যসভায় আত্মজীবনীর বস্ত্রহরণ শিল্পবিরুদ্ধ ব'লেই সেখানে আত্মোপস্থিতি নিষিদ্ধ নয়; এবং নভেলে ভালো-মন্দের ব্যক্তিগত বিচার অশোভন হলেও তাতে একটা জাগতিক মূল্যজ্ঞান শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, আবশ্যিকও। নৈরাজ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা যে সমার্থবাচক নয়, এই আর্য্যসত্যটিকে আমরা আজ ভুলতে বসেছি। নৈরাজ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা; এবং যে-ব্যক্তি বিধিবদ্ধ বিশ্বকে অহমিকার অহৈতুক অসংস্থিতিতে পর্য্যবসিত করতে পেরেছে, নৈর্ব্যক্তিক তার উপযুক্ত আখ্যা নয়, তার আখ্যা বৈনাশিক। কাজেই সাহিত্যকে যদি যথার্থ ই অনাত্ম্য ক'রে তোলা কাম্য হয়, তবে মূল্যজ্ঞান বাদ দিলে চলবেনা, বরং কোনো একটা লোকোত্তর আদর্শকে প্রাণপণ ব'লে আঁকড়ে ধরতে হবে। সুতরাং ঔপন্যাসিক যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কল্পনাকে বস্তুবিশ্বের সীমান্তরিত না-করেন, চোখে অতিমর্ত্ত্য নিরীক্ষার কজ্জল না-লাগান, মানবজীবনের পরমার্থ মেনে না-নেন, তবে তিনি হয়তো মমত্ববোধের মাদকতা কাটাতে পারবেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষকুণ্ডলী এড়াতে পারবেননা, তবে তিনি হয়তো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের জীবন্মুক্ত বিশ্বম্ভরতার সন্ধান পাবেননা। ঐতিহ্যনির্দ্দিষ্ট পথে চলা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য, এবং মানুষের পশুত্ব অস্বীকার করা অবশ্যই আজ অসম্ভব: তবু আমরা যদি প্রুস্ৎ, লরেন্স্, উল্ফ্ বা জয়েস্-এর মতো আমাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একটা নবাবিষ্কৃত নিকষে পরখ ক'রে দেখতে না-পারি, তবে নৈর্ব্যক্তিক হয়েও আমাদের রচনা সাংবাদিক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আজীবন আবদ্ধ থাকবে।

অবশ্য নূতন প্রতিমান প্রতিষ্ঠা সকল দেশেই দুষ্কর। কিন্তু ঘটনাচক্রের সমাবেশে সর্ব্বস্বান্ত জার্ম্মানিতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে। জার্ম্মানি আজ এমন একটা সর্ব্বনাশের কবলে যে কোনো একজন ব্যক্তির—তা তিনি স্বয়ং নরনারায়ণ হলেও—অধ্যবসায়ে তাকে আর প্রকৃতিস্থ করা যাবেনা। কাজেই এই ব্যষ্টিবিলাসী দেশ আজকে সমষ্টিবাদের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়েছে। এ-বিবরণ কম্যুনিষ্টদ্বেষী নাৎসিদের সম্বন্ধেও খাটে। কারণ তারা যদিও রুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে তারস্বরে প্রাচীন জার্মেনিয়ার মৌখিক প্রশস্তি গাইছে, তবু কার্য্যত ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মঙ্গলকে বড় ক'রে দেখাই তাদের মতবাদের মূলসূত্র, এবং এইজন্যেই তারা আজ এত প্রতাপান্বিত। সমাজতন্ত্রের অনুকম্পায়ীরা যে নাৎসি-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রনিষ্ঠাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তা আমি জানি; কিন্তু উদারপন্থী মনুষ্যধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। যাঁরা বিশ্বমানবের প্রতিভূ, তাঁরা ব্যক্তিমানবকে জনহিতার্থে আত্মবলি দিতে উপদেশ দিয়েছেন; এবং দেশভক্তদের আদর্শও তদনুরূপ। দেশই হোক আর ব্রহ্মাণ্ডই হোক, যদি সামান্য মানুষের আত্মোৎসর্গে কোনো অতিমানুষিক সত্তার কল্যাণ সম্ভবপর হয়, তবে বুঝতে হবে যে বস্তুত মানুষ নগণ্য নয়, তার জীবন প্রকৃতপক্ষে পরমার্থময়। আমার বিবেচনায় টমাস্ মান্ থেকে সুরু ক'রে হের্মান্ ব্রখ্ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানির সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকই মানবজীবনের এই মর্য্যাদা মেনে নিয়েছেন। হয়তো সে-দেশের প্রাত্যহিক জীবন

বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যে আজ একেবারে বঞ্চিত ব'লেই এই অতীন্দ্রিয়প্রিয় জাতি আত্মিক গৌরবের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক এই অন্ধ বিশ্বাসের সাহিত্যিক ফল সত্যই লোভনীয়। অন্ততপক্ষে বর্ত্তমান জার্ম্মানির আখ্যানশিল্পে যে-গভীরতার পরিচয় পাই, তার জোড়া মিলে কেবল ফরাসী ক্যাথলিকদের উপাখ্যানে এবং রুষ বোল্‌শেভিক্‌দের কথাসাহিত্যে। কারণ এই দুই দলও মানবাত্মার অনন্ত দায়িত্ব ও অপার বৈভবে একান্ত আস্থাবান।

বলাই বাহুল্য যে এতাদৃশ উপন্যাসে গল্পাংশ উপলক্ষ্যমাত্র, আসল উদ্দেশ্য লেখকের জাগতিক নিরীক্ষার প্রকাশ। ফলে এ-ধরণের আখ্যায়িকায় নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বসীমা অত্যন্ত অস্পষ্ট: তারা চরিত্র নয়, একটা আদর্শ। কিন্তু এতে ক'রে তাদের ব্যক্তিস্বরূপ কমেনা, বরং তারা মূর্তিমান অভিজ্ঞান হ'য়ে ওঠে; তাদের উত্থান-পতন পাঠকের মনে যে-আবেগ সঞ্চার করে, তথাকথিত বস্তুধর্ম্মী পাত্রপাত্রীরা তার ত্রিসীমানাতেও আসতে পারেনা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর হ'লেও দুর্ব্বোধ্য নয়, কারণ যে-নর-নারীর সঙ্গে আমাদের নিত্যকার আদান-প্রদান চলে, তারা এমনি প্রবৃত্তিসঙ্করে গঠিত যে তাদের আচরণের অর্থ আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই তাদের জীবনে যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আমরা তাকে আর ট্রাজিডি ব'লে ভাবতে পারিনা, কেননা ট্রাজিডির মৌল রহস্য হচ্ছে তার প্রণোদনার অলৌকিক বিশুদ্ধি, তার চরিত্রাবলীর ঐকান্তিক একাগ্রতা, তার সংঘাতের নিখিলব্যাপ্ত মাহাত্ম্য। হের্মান্ ব্রথ্‌-এর মানস পুত্র-কন্যারা এই অবিমিশ্র ট্রাজিডিধাতুতে নির্ম্মিত, তাদের সমস্যা হচ্ছে সাজুয্যের সমস্যা, তাদের বেদনা নিঃসঙ্গতার বেদনা, তাদের জগৎ মূল্যধ্বংসের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। অতএব "দি স্লিপ ওয়াকার্স্"-কে "ম্যাজিক্ মাউন্টেন্"-এর সমগোত্রীয় ব'লে মনে করতে হয়, তার সমকক্ষ খুঁজলে যেতে হয় "জু স্যুস্"-এর কাছে। অবশ্য ব্রথ্ এখনো মান্ বা ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার্-এর মতো অমরত্বের দাবি করতে পারেননা; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি খুব সম্ভব তাঁর প্রথম রচনা, সুতরাং নিরাশ হবার হেতু নেই: ইতিমধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন।

উপন্যাসের সমালোচনায় গল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু এখানে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম অনিবার্য্য। তার মানে এ নয় যে এই সাত-শ-পৃষ্ঠাব্যাপী, তিনখণ্ডে-বিভক্ত উপন্যাসখানিতে আখ্যায়িকা নেই; তার মানে শুধু এই যে পুস্তকখানির আখ্যানসূত্র এমনি জটিল, এতই বিস্তৃত যে তাকে দু-চার পাতায় সরল করা অসাধ্য। নানা উপায়ে, বিবিধ দৃষ্টান্তের অনুকরণে, গল্পে, কবিতায়, নাট্যে, নির্ব্যাজ দার্শনিক সন্দর্ভের সাহায্যে ব্রথ্ যে-তত্ত্বটিকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে এই যে গত পঞ্চাশ বৎসরে পাশ্চাত্য সমাজ এমনি ব্যক্তিপ্রধান হয়ে উঠেছে যে প্রলয়ের অনর্থই তার উপযুক্ত উপসংহার। আজকালকার অরাজকতার বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে রিনেসেন্স্-যুগের মানুষ যবে অখণ্ড ধ্রুপদী আদর্শকে অচল ভেবে জীবনের মধ্যে বস্তু ও আত্মার দ্বৈত আনলে, সেইদিনই আধুনিক সর্ব্বনাশের আরম্ভ। এই ভেদবুদ্ধির ছিদ্র দিয়ে যে-শনি ঢুকলো, এখনো পর্য্যন্ত তারি দশায় য়ুরোপ বিধ্বস্ত। কারণ জীবনকে দ্বিধা করাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তাকে শতধা করতেও কোনো বাধা থাকতে পারেনা। যখন শুধু আত্মার জন্যেই আধ্যাত্ম চিন্তার দরকার, তখন কেবল আর্টের খাতিরে আর্টচর্চ্চাও সঙ্গত। সুতরাং শুধু লোকহত্যার জন্যে যুদ্ধ, খালি পরস্বাপহরণের

উদ্দেশ্যে বাণিজ্য, মাত্র উত্তেজনার নিমিত্ত বিদ্রোহ ইত্যাদি মতবাদও নৈয়ায়িকের সমর্থন পেলে। এর একমাত্র সমাপ্তি মৃত্যুতুল্য নিঃসঙ্গতায়, এবং তারি প্রসারে সংসার আজকে শ্মশানে পরিণত।

এই মহাবাণীকে ব্রখ্ চারটি আদর্শ চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে ফোটাতে চেয়েছেন। ফন্ পাসেনভ্ জাতীয়তার প্রতীক; কাজেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সঙ্গে চক্রচর সৌন্দর্য্যরসিক বের্ট্রাণ্ড্-এর আত্মিক সহযোগ স্থাপিত হলোনা। এদিকে বের্ট্রাণ্ড্ ছিলো কল্পনাজীবী; সুতরাং বিপ্লবী হের্ এশ্-এর সংঘাতে তাকে আত্মহত্যা করতে হলো। কিন্তু হের্ এশ্‌ও জড়জগতের বিশেষ ধার ধারতোনা; অতএব উগ্‌নো-নামক নির্ব্বিবেকী পরজীবীটি যখন আসরে নামলো, তখন ফন্ পাসেনভ্-এর হলো বুদ্ধিভ্রংশ এবং হের্ এশ্-এর ঘটলো অপঘাত। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধা ক'রে নিয়েও উগ্‌নো শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হতে পারলেনা। জীবনযুদ্ধে নির্জ্জিত হয়েও অন্য তিনজন তাদের একনিষ্ঠার জোরে পারিপার্শ্বিক শূন্যতাকে চরম কালে প্রায় আত্মীয়পূর্ণ ক'রে এনেছিলো, কিন্তু উগ্‌নোর বিজনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেলে। তার রমণীসম্ভোগ বলাৎকারের রূপ ধরলে, বংশবৃদ্ধিকে সে উপসর্গ ব'লে ভাবলে, নাগরিক সম্মান তাকে সাধারণের সন্দেহভাজন ও উপহাস্য ক'রে তুললে। ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার চূড়ান্তে উঠে সে বেঁচে রইলো বটে, কিন্তু তার ঘৃতপুষ্ট দেহের ভিতরে হয়তো শুধু মৃত্যুর প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলোনা। অথচ উগ্‌নো নেহাৎ মন্দ লোক ছিলোনা। সাধু-সজ্জনদের মতো সেও কায়-মন-বাক্যে চেয়েছিলো স্থায়িত্ব; শুধু সে যেটা বোঝেনি তা হচ্ছে এই যে অসহযোগে স্থায়িত্ব উৎপন্ন হয়না, সার্ব্বভৌম সদ্ভাবেই তার জন্ম। কিন্তু যে-ম্রিয়মাণ জগতে উগ্‌নো স্থান পেয়েছিলো, সেখানে ঐক্য তো স্বপ্নাতীত বটে, এমনকি হিতকারী বার্ত্তাবিনিময়ের ভাষা সুদ্ধ সে-সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে। মূল্যনাশের এই অবশ্যম্ভাবী অবসান।

"দি স্লিপ্‌ওয়াকার্স্"-এর পরে "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" পড়া এক দিক দিয়ে যেমন অতৃপ্তিকর, অন্য দিকে তেমনি কৌতুকপ্রদ। শের্‌উড্ এণ্ডার্স্‌ন্, অর্নেষ্ট্ হেমিঙওয়ে প্রভৃতির মতো জন্ ডস্ পাসজ্-ও তাঁর অতি আধুনিক উপন্যাস থেকে কেবল দার্শনিকতা নয়, "সাহিত্যিকতা" সুদ্ধ বাদ দিতে প্রস্তুত। এই হাল-আমলের লেখকেরা ঘোরতর জড়বাদী, মন ব'লে কোনো জিনিসে তাঁরা বিশ্বাস করেননা; তাই তাঁদের গল্পের ঝোঁক বিষয়ীকে ছেড়ে বিষয়ের উপর। তাঁদের রচনা অনাত্মরীতির অতিভূমি। এই সমস্ত কাহিনীর কুশীলবেরা সিনেমাছবির মতো কেবল কাজই ক'রে যায়, কখনো এতটুকু ভাবেনা; এবং তাঁদের সাহিত্যাতিরিক্ত শিল্পাদর্শের এইখানেই শেষ নয়। তাঁরা দৈনিকপত্রের হাবভাবের নকল ক'রে আত্মপ্রসাদ পান, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নকে অকাতরে বলি দেন, অর্থসঙ্গতির আশঙ্কায় সদাসর্ব্বদা বেপমান্ থাকেন। কিন্তু তাহলেও তাঁদের পুস্তকাবলীতে একটা একাগ্র সাধনার, একটা নিষ্কাম সংযমের, একটা আত্মসমাহিত সজীবতার আভাস মেলে, যার পাশে ড্রাইসার্‌কে তো বাকসর্ব্বস্ব ব'লে মনে হয়ই, এমনকি সিন্‌ক্লেয়ার্ লুইস্‌কেও বাহুল্যময় লাগে।

এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু তাহলেও আমার বিশ্বাস যে এই কুসংস্কারের একটা বিচারসাপেক্ষ ভিত্তি আছে। ড্রাইসার্-লুইস্-জাতীয় প্রাচীনপন্থী মার্কিনী লেখকদের সঙ্গে যাঁরাই ঘনিষ্ঠ, তাঁরাই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে

ওঁদের চরিত্রাবলীর পটভূমির সঙ্গে ওয়েল্‌সীয় কল্পলোকের সৌসাদৃশ্য কত বিশদ। এই আমেরিকান জগতেও উনিশ শতকের নিঃসংশয় বিজ্ঞান ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরূপে বিরাজমান, এখানেও সকল সাংসারিক সমস্যা শুধু সদিচ্ছার দ্বারা সমাধানসাধ্য, এ-সমাজেও মানুষমাত্রেই প্রচ্ছন্ন উদারনীতির আধার। এ-চিত্র শুধু যে অসত্য, তা নয়, উপরন্তু দুঃসহ অভিজ্ঞতার ধাক্কায় আমরা আজ অন্তত এইটুকু শিখেছি যে এ ধরণের মানসলোকের সংসর্গও বিপজ্জনক। কারণ, জগৎ মূলত মঙ্গলময়, এই রকম শুভবাদের আড়ালে বাস করছিলুম ব'লেই মহাপ্রলয়ের দিনে আমাদের মনে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি জাগেনি, মুখে এসেছিলো অসার অভিবাদ। সুতরাং উত্তরসামরিক সাহিত্যেও যখন সেই অসত্যের পুনরুদ্ধার দেখি, তখন বিতৃষ্ণাবোধ তো স্বাভাবিক বটেই, অধিকন্তু সহজেই মনে হয় যে এ-সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি নয়, প্রচারকার্য্য।

প্রথমে দার্শনিক উপন্যাসের পক্ষে যে-ওকালতি করেছি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উপরোক্ত অভিমত তার পরিপন্থী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই আর বিরোধ থাকবেনা। স্বকীয় তুলাদণ্ডে ভারি কথার বাটখারা দিয়ে জগৎকে ওজন করা অসার্থক ব'লেই দার্শনিক নিরীক্ষার প্রয়োজন; কারণ সার্ব্বজনীন বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত মানদণ্ডের সমীকরণই তত্ত্বদর্শনের প্রধান কর্ত্তব্য। এবং নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসাধনাও যেহেতু একের ভাবনা-বেদনাকে সকলের ভাবনা-বেদনার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তাই অনাত্মীয়রীতির সঙ্গে দার্শনিকের কোনো বিবাদ নেই। প্রচারকের মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটা সর্ব্ববাদিসম্মত, যার মূলমন্ত্র প্রত্যাখ্যান নয়, পরিগ্রহণ, তার বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক; কিন্তু ভেদবুদ্ধি দলপুষ্টি ব্যাতিরেকে টিঁকতে পারেনা, সুতরাং প্রচারকার্য্যই তার নিত্যকর্ম্ম। মানুষমাত্রেই অতুল মর্য্যাদায় অধিকারী, এবং তাই তার আত্মবলিদানে জগতের মঙ্গল নিশ্চিত, একথা বলা এক; আর মানুষ-মাত্রেই কুসংস্কারাপন্ন, এবং বিজ্ঞানই তার একমাত্র মুক্তিমার্গ, এ-তথ্য জাহির করা অন্য। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ আছে। যে ঔপন্যাসিক প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ রূপসৃষ্টি শক্ত নয়; তিনি জানেন যে মানবচরিত্র ক্রিশ্চানের মতো, নীতিকারের হস্তাবলেপে তার অন্তরঙ্গ শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলে সে সহজ সৌন্দর্য্যে স্বসম্মুখ হয়ে ওঠে। অন্য দলের পক্ষে এই রকম নিরীহ সহিষ্ণুতা দুর্লভ; তাঁরা স্থির করেছেন যে জগত্ত্রাণের বীজমন্ত্র শুধু তাঁদেরই আয়ত্তে; কাজেই যে-মানুষ সে-দীক্ষা অগ্রাহ্য করে, তার উচ্ছেদ-কামনায় তাঁরা বাধ্য। ফলে তাঁদের উপন্যাস হিতোপদেশ হিসাবে মহার্ঘ হ'লেও জীবনের চিত্র হিসাবে অতিরঞ্জিত। পূর্ব্বে বলেছি যে সত্যনিষ্ঠা হয়তো ঔপন্যাসিকের অভিষ্ট নয়; কিন্তু সত্যকল্পতা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ। সাহিত্য যতই কল্পনাপ্রবণ হোকনা কেন, তার সঙ্গে কোনো পরিচিত তত্ত্বের সংঘর্ষ ঘটলে, ক্ষতি একা সাহিত্যেরই। এইজন্যেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকে অবৈকল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চান; কারণ যে-শিল্প অবিকল, অখণ্ড, তার সম্পূর্ণতা কোনো অভিমতবিশেষের যাথার্থ্যের সঙ্গে বিজড়িত থাকেনা; সে স্বাবলম্বী, কাজেই তার অদৃষ্টে সংঘাতের দুঃখ নেই, সে সকল পক্ষপাতের অতীত।

বলাই বাহুল্য যে এই সকল মতামত আমার নিজস্ব চিন্তার ফল। আমি যে-লেখকসম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁরা প্রকাশ্যে কোনো আধিদৈবিক আদর্শে বিশ্বাস

করেননা ; তাঁরা জীবনকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনি ক'রেই আঁকতে চান ; ফোটোগ্রাফের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠাই তাদের অভিপ্রেত পদ্ধতি। এবং বোধহয় সেইজন্যেই জন্ ডস্ পাসজ্ আলোচ্য উপন্যাসের বেশ খানিক অংশ পুরাতন দৈনিক-পত্রের পাঠোদ্ধারে ভরেছেন। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" কোনো মানুষের জীবনচরিত নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চৌদ্দ বৎসরই তার মুখ্যপাত্র। এবং আমাদের কালের প্রকৃত স্বরূপ যেহেতু সংবাদপত্রেই সুপরিস্ফুট, তাই যুগচিত্রের প্রত্যেক প্রতীকের বহিঃরেখা তিনি টেনেছেন আষ্টপ্রহরিক খবরের রঙে। এই কালের ট্রাজিডি কতকগুলি সঞ্চরণশীল মূর্ত্তির সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে। মূর্ত্তিগুলি মার্কিনী জীবনের বিভিন্ন ধারার বিগ্রহ, ধ্বংসোন্মুখ সময়স্রোতের বুদ্বুদ, তারা নানা কারণে নানা স্থানে উদ্ভূত এবং সকলেই য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়পয়োধিতে বিলুপ্ত। তারা এরূপ অন্তঃসারশূন্য ও নৈমিত্তিক, জীবনের এমন সমস্ত অখ্যাত স্তরে তাদের উৎপত্তি, এতই অপ্রতিষ্ঠ তাদের ব্যক্তিত্ব যে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিবরণে তত্ত্বদর্শন তো দূরের কথা, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুদ্ধ অবকাশ নেই। কিন্তু আখ্যানবস্তুর এই অকিঞ্চনতা বইখানির সারসংগ্রহে বাধা দিলেও, তাতে ক'রে গ্রন্থকারের জাগতিক নিরীক্ষা বরং উজ্জ্বলতর হয়েছে। কারণ ফটোগ্রাফের পদার্থনির্ভর সত্যপরায়ণতা প্রসিদ্ধ হ'লেও, তার ব্যাপকতা অসীম নয়। অতএব জীবনের অকৃত্রিম আলেখ্য ব'লে যদি কোনো ফোটোগ্রাফের সুনাম থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ফোটোগ্রাফার জীবনের কোনো একটা দিককে সমগ্রতার পরমোত্তম প্রতিনিধিরূপে বেছে নিয়ে তবেই গ্রাহকযন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। এবং এই নির্ব্বাচনের পিছনে জীবনসম্বন্ধে একটা মন্তব্য উহ্য থাকেই থাকে।

কিন্তু এই চিরনিয়ম যদি আলোচ্য লেখকসম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হয়, জন্ ডস্ পাসজ্-এর মনে যদি দার্শনিকতার ছায়ামাত্রও না-থাকে, তবুও মানতে হবে যে নিছক সহজজ্ঞানের সাহায্যে তিনি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই একই সত্য হের্ম্যান্ ব্রখ্ অর্জ্জন করেছেন অতিচেতন বুদ্ধির কল্যাণে। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এ যত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাদের আত্মাও সুষুপ্ত, তারাও নিঃসঙ্গতার দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত, তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহের মিলন হয়তো বা ঘটে, কিন্তু মনের সালোক্য একেবারেই অসিদ্ধ থেকে যায় ; তারাও চলে মৃত্যুর অভিযানে, কেননা বিশ্বে ধ্রুব পাদপীঠ পাবার যোগ্য মূল তাদের নেই,—তাদের জীবন একটা এমনি নিরর্থ উদ্যোগে উপক্রান্ত যে যুদ্ধের সর্ব্বনাশকেও তারা গন্তব্য ব'লে ধরে নিয়ে শান্তি পায়। তাছাড়া উভয় পুস্তকেই রচনারীতির একটা সাদৃশ্য আছে : দুই লেখকই কোনো প্রাচীন প্রকরণকে মেনে চলতে রাজি নন, এমনকি বিপ্লবী আদর্শকেও তাঁরা পুরোপূরি গ্রহণ করতে পারেননা ; গদ্য, পদ্য, সাংবাদিক সংক্ষিপ্ততা সকল পদ্ধতিতেই তাঁদের সমান পক্ষপাত। তবে ব্রখ্ আর্টের তথাকথিত কমঠবৃত্তিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননা, বিনা প্রয়োজনে গল্পের মধ্যে অনবগুণ্ঠিত তত্ত্বকথার অবতারণা করেন ; এবং জন্ ডস্ পাসজ্ শিল্পকে এত ভঙ্গুর ভাবেন যে শিল্পাতিরিক্ত কোনো বস্তুকে কোল দিতে তিনি নারাজ, এমনকি তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাবুকতাও হয়তো অমার্জ্জনীয়। বুঝি সেইজন্যেই "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" "দি স্লিপ্ ওয়াকার্স্"-এর চেয়ে সুখপাঠ্য, এবং "দি স্লিপ্ ওয়াকার্স্" "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল"-এর চেয়ে

গভীরতর। কিন্তু দুখানিই অসাধারণ পুস্তক; তাই আশা করি চিন্তাশীল পাঠক কোনোটিকেই বাদ দেবেননা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Freedom in the Modern World—By JOHN MACMURRAY, with a Preface by C. A. Siepmann (Faber and Faber Ltd.).

প্রতীচ্যদর্শনক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে জন্ ম্যাক্‌মারে একজন উদীয়মান লেখক। বিগত ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের Grote অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল্ কলেজে ইঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় এবং অক্সফোর্ডে যে চিরাগত অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়া প্রবহমান তাহারই মধ্যে ইঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই।

পুস্তিকাটির আলোচ্যবিষয়—"বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার স্বরূপ"। ইহার আয়তনের তুলনায় ইহার ভাবগৌরব যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য তত্ত্বগুলি এত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রন্থকারের পরিচয়-প্রদান-সূত্রে যে ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে ঠিক এই কথারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানির ষোড়শ অধ্যায় ব্রিটিশ ব্রড্‌কাষ্টিং করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে বেতার শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির একরকম যথাযথ পুনরুল্লেখ। বেতার জগতের শ্রোতৃবর্গ অপেক্ষা বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর নিকট ইহার যে একটা অবশ্যম্ভাবী আবেদন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ইহার বহুলপ্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের বিচারনৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

গ্রন্থকারের উপক্রমণিকা ব্যতীত দুই পর্য্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। প্রথম পর্য্যায়ে চারটি বক্তৃতায় "বর্ত্তমান উভয়সঙ্কট" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায় বারটি বক্তৃতায় পর্য্যবসিত এবং এগুলির আলোচ্যবিষয়—"সত্যের স্বরূপ ও স্বাধীনতা"। প্রথম বক্তৃতায় "সত্যই কি বর্ত্তমান সময়ে এক উভয়সঙ্কট উপস্থিত?"—এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের সকল দুঃখ, সকল ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ এই যে আমরা সেই আস্তিক্যবুদ্ধি, সেই আত্মনির্ভরতা ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছি যাহা আমাদের সকল কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। যে কেন্দ্রীভূত আশা ও বিশ্বাসের জৈবপ্রেরণায় আমাদের জীবন চরম কামনার বস্তু হইয়া উঠে, সে বিশ্বাস ও আস্থা আজ অন্তর্হিত। তাই আমাদের জীবন এত দুর্গত, এত মোহাবিষ্ট, এত লক্ষ্যহীন। সেইজন্যই একএক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় বলিয়া উঠি, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' —'কোন্ দেবতার উপাসনা করিব?' জীবনের সেই ধ্রুবতারা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাই 'পথ কোথায়?' বলিয়া ফিরিতেছে। মনে হয় বুঝি বা মানবজীবনের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আত্মপরীক্ষা করিলেই দেখি যে এটা মুখের কথামাত্র, প্রাণের

সাড়া এতে পাই না। "এই উন্নতিকল্পে আমরা কি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি?—কারণ এই ত্যাগস্বীকারই আমাদের বিশ্বাসের মানদণ্ড। সমরনীতিতে আমরা বিশ্বাস না করিতে পারি কিন্তু শান্তিতেই কি আমাদের বিশ্বাস আছে?…দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরাই যাক্—ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতায় কি আমরা বিশ্বাস করি?—আমার তাহা মনে হয় না। তবে কি আমাদের বিশ্বাস যে ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতা নাই?—নিশ্চয়ই তা' আমাদের বিশ্বাস নয়।" মূলকথা, "আমাদের জীবনের সমস্ত আদর্শ আজ প্রাণহীন, এগুলিতে বিশ্বাসও নাই, অবিশ্বাসও নাই। এইখানেই আমাদের উভয়সঙ্কট"। এই উভয়সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাই "আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, আমাদের চিন্তা ও হৃদয়াবেশের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে"। (পৃঃ ২৪—৫)

এইরূপে হৃদয়াবেশ ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির দিক্ হইতে দেখিলে সহজেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য লক্ষিত হয়। এটাও সেই বর্ত্তমান সমস্যারই আর একটা দিক। "বর্ত্তমান যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের অবসানের সময় হইতেই জ্ঞানরাজ্যের পরিধি সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে ভাবপ্রবণতা বা হৃদয়াবেগের দিক্‌টা পরিণতিলাভ করে নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে চিন্তাশক্তির দিক্ হইতে সভ্যতার উচ্চগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছি বটে কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দিক্ হইতে এখনও আমরা আদিম অসভ্য অবস্থায় রহিয়া গিয়াছি। সেজন্য আজ এমন একটি জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি—যেখানে জ্ঞানের অধিকতর প্রসার ক্রমশঃই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিবে।" (পৃঃ ৪৩)

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে "এই উভয়সঙ্কটের উৎপত্তি আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে কোনো বিরোধে বা বিচ্ছেদে নয়, ইহার মূল আমাদের হৃদয়েই নিহিত। মানবজীবনের যাহা একান্ত কাম্য ও উপাস্য তাহা চিন্তা বা ধীশক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হয়না—তাহা কেবল হৃদয়বৃত্তির আলোকপাতেই প্রকাশ পায়। "জীবন কোন বিজ্ঞানের কোঠায় পড়ে না, এটা একটা আর্ট।" (পৃঃ ৫১)

পরিশেষে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের নিষ্কর্ষ উপসংহারে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"বর্ত্তমান সমস্যার উত্তরে আমার এই বলিবার আছে যে আমরা জীবনের মূলীভূত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং সেইজন্যই ক্রমশঃ আমাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে ইহা খুব স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি।" কিন্তু "ধর্ম্ম বা নীতি বলিতে যথার্থ বা প্রাণবান্ ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বুঝি—ধর্ম্মের বা নীতির কতকগুলি বহিরাবরণ ও উপকরণ বা কাল্পনিক প্রতীক নহে। ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরসঙ্গ ও সাহচর্য্য ব্যতীত উহা অনর্থক; এবং নীতি অর্থে বুঝি—মানব জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস, নচেৎ উহা কাল্পনিক মায়াজাল বা বাগাড়ম্বর মাত্র।" (পৃঃ ২০০)

এই বিশ্বাসই মানব জীবনে কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। "যখন তাহার সন্ধান আর মিলে না তখন বাধ্য হইয়াই মানুষ জীবনের নিষেধাত্মক আর একটি উৎস আবিষ্কার করে, সেটি ভয়।" মানুষ ভয়ের প্রেরণাতেই যখন চলে তখন তার আত্মনির্ভরপ্রসূত, আনন্দাত্মক সহজ সাবলীল গতিচ্ছন্দ অন্তর্হিত হয়। তখন মানুষ স্বভাবতই শক্তির শরণ নেয়—এবং সেই শক্তি রাজদণ্ড বা সমাজদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" হইয়া উঠে। "মানুষ তখন ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে আচারতান্ত্রিক হইয়া উঠে।"

(পৃঃ ২০৯)। আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম অনেকটা এই আচারনিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ "দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে যা বুঝায় তাহার অনেকটাই যিশুখৃষ্টের বা সেণ্ট পালের ধর্ম্মানুশাসনের সহিত সম্পর্কবিরহিত" (পৃঃ ২১০)। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে "সমাজসেবা বলিতে যা বুঝায় তাহার উপর আমার কোন আক্রোশ আছে।" আমি "যাহার নিরসনার্থে উদ্যত তাহা জনসেবা, সমাজসেবা বা রাষ্ট্রসেবার উপলক্ষ্যে মানুষের নীতি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানকে স্থানভ্রষ্ট করা।" (পৃঃ ২১০)। যদি জনসেবাকেই মানুষের একমাত্র আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তবে স্বভাবতই মানুষের চেষ্টা ও আশা সমাজগঠনেই আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ হইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্রনীতিই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মোক্ষ হইয়া উঠিবে। "ইহার চরম পরিণতি হইতেছে হয় বলশেভিক্‌বাদ নতুবা ফ্যাসিষ্টবাদ। কারণ বলশেভিজ্‌ম্‌ বা ফ্যাসিজ্‌ম্‌ অন্ধ প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতার আদর্শানুকল্পিত।...কিন্তু আমি ইহার একটিরও উপাসক নই। আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনের সার্থকতা বা উৎকর্ষ তাহার মানবত্বের পূর্ণবিকাশের উপরই নির্ভর করে এবং এজন্য তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।" (পৃঃ ২১৩)

আধুনিক জীবনযাত্রার আর একটি অভাবের দিকে গ্রন্থকার পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান কালে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিকৃষ্টতম বিশেষত্ব তার সৌন্দর্য্যবোধের অভাব ও তৎপ্রতি অনাস্থা।" কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে "সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুসমঞ্জস আচরণই নীতিসম্মত আচরণ।" (পৃ ২১৪)। পরিশেষে এককথায় যদি আমার বক্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বলি "আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়াই আমাদের নৈতিক জীবনের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে আমাদের আত্মস্থ বা আত্মসমাহিত হইতে হইবে, আমাদের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।" এ ত প্রাচীর পক্ষে নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী নয়, তাহারই প্রতীচ্য সংস্করণ মাত্র।

শ্রীসরোজকুমার দাস

The Common Reader—By Virginia Woolf (The Hogarth Press).
Criticism—By Desmond MacCarthy (Putnam).

ব্রুনেতিয়ের্‌ ও লেমেয়্‌ত্রের মধ্যে সমালোচনার জাতিবিচার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব এখন ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে পড়েছে, সে যুদ্ধে আনাতোল্‌ ফ্রঁসের মতো আমিও লেমেয়্‌ত্রের দলে। বাস্তবিক সমালোচনার মাপকাঠি শেষ পর্য্যন্ত তো ব্যক্তিগত রুচির কথাই। অবশ্য রিচার্ডস্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমনা সমালোচকেরা নৈর্ব্যক্তিক বিচারের চেষ্টা করছেন। তাঁর ছাত্র উইলিয়ম এম্‌সনের Seven Types of Ambiguity বিশ্লেষণ জাতীয় সমালোচনার বই। কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্‌কার্থি তাঁর ভূমিকায় সমালোচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মান্‌তে হয়। তিনি বলেছেন, যে শুধু aesthetic emotion ও technical perfection নিয়ে যাঁরা চঞ্চল, তিনি তাদের সঙ্গে নেই। তাঁর সমস্ত স্বভাব দিয়ে তিনি পড়েছেন, সাড়া দিয়েছেন ও সমালোচনা লিখেছেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সকলের ভালো না লাগতেও পারে। এই কারণেই শয়ের লেখা আমার পক্ষে কষ্টপাঠ্য। সুখের কথা, Criticism-এর লেখককে ঠিক তেমনি অসহ্য লাগে না। এমন কি, যদিও রেবেকা ওয়েষ্ট্ ম্যাক্‌-কার্থির নাম গসের সঙ্গেই নিয়েছিলেন তবু পরলোকগত সে জীবন্ত বিশ্বকোষের চেয়ে ম্যাক্‌কার্থিকে আরো নাগরিক ও সাহিত্যিক বলে মনে হল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই জাতের বই রিভিউ করা। প্রায় ত্রিশটী প্রবন্ধ—ডান্ ও রিচার্ডসন্ থেকে এলিয়ট্ ও জয়স্—সমস্তগুলিকে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে পড়ে তার সমালোচনা এক্ষেত্রে অসম্ভব। বিশেষ করেই তাই, কারণ শ্রীমতী উল্‌ফের The Common Reader নামে যা, এখানি কাজে তাই, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা। এর প্রায় সব প্রবন্ধেই সায় দিতে পারা যায়। কথাগুলি লেখা প্রায়ই ভালো। ডানের প্রবন্ধই ধরা যাক্। স্পষ্ট সহজ বুদ্ধির কথা, প্রায় শ্রীমতী উল্‌ফের Donne After Three Centuries-এরই মতো। কিন্তু কোনো লেখাই ভাবায় না; আর যদিও বা ভাবায় তবু শীঘ্রই সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেওয়া বা উড়িয়ে দেওয়া যায়। এলিয়ট্ লিখলে হয়ত ডানের অদৃষ্টপূর্ব্ব কোনো গুণ চোখে পড়ত, কিন্তু এ রকম সুখপাঠ্য হত কি? অবশ্য ম্যাক্‌কার্থির প্রবন্ধগুলিতে সারবান কথা নেই ভাবলে ভুল হবে। তাঁর প্রতি প্রবন্ধেই গ্রহণীয় বক্তব্য আছে। তিনি বহু পড়াশোনা করেছেন ও সাহিত্যাদির বিষয়ে ভেবেছেন। তিনি কোনো highbrow দলে নেই, অথচ তিনি টম্‌লিন্‌সনের মতো এলিয়ট বা লরেন্সের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বাহাদুরি বোধও করেন না। এই প্রবীণ সমালোচকের সৌজন্য ও উদারতা মুরুব্বিবহুল সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে তাই খুসি করেছে। জয়সের মহান্ সাধনার বিফলতা বা হাক্‌স্‌লির অসম্পূর্ণতার কথা ম্যাক্‌কার্থি যখন বলেছেন, তখন সে কথা সাধারণ প্রবীণের অসহ্য সঙ্কীর্ণতাজাত হয় নি। প্রসঙ্গত, হাক্‌স্‌লির সঙ্গে Point Counter Point-এর Quarles-এর মিল, রিচার্ডসন ও রস্কিনের সঙ্গে প্রুস্‌ৎ বা কার্লাইলের সঙ্গে লরেন্সের কোথায় সাদৃশ্য আছে, এই রকম কথা আপাতবোধ্য হলেও ম্যাক্‌কার্থি লিখেছেন বেশ।

শ্রীমতী উল্‌ফের The Common Reader-এ জনসনের একটী কথা রয়েছে

"I rejoice to concur with the common reader; for by the common sense of readers, uncorrupted by literary prejudices, after all the refinements of subtlity and the dogmatism of learning, must be generally decided all claim to poetical honours."

যদিচ এ বাক্যে অনেক তর্কের কথা আছে, সে না হয় থাক্, কিন্তু শ্রীমতী উল্‌ফ সাধারণ পাঠক তো ননই, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে সায় দিয়ে উৎফুল্ল হবার অধিকারও তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। লণ্ডনের টাইপিষ্ট্ মেয়েরা কি পড়েন জানি না, কিন্তু বোধহয় যাঁরা *The Countess of Pembroke's Arcadia*, *Dorothy Osborne's Letters*, *Swifts' Journal to Stella*, *Lord Chesterfield's Letters* পড়ে খুসি হন বা যাঁরা *James Woodforde* বা *Skinner*, *Dr. Burney's Evening Party*, *Jack Mytton*, *Mary Wollstonecraft* প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানবান, তাঁদের পথেঘাটে বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য শ্রীমতী উল্‌ফের প্রবন্ধগুলি আমরা পড়তে পারি, মোটামুটি মান্‌তে পারি ও পড়তে ভালো লাগে। তার কারণ

যদি আমাদের common-sense হয় ও তার ফলে যদি শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ উৎফুল্ল হন, তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ The Strange Elizabethans-এ তিনি সাধারণের মতো রলে, ড্রেক্‌ সিড্‌নি, বেকন্‌ আদির কথা না ভেবে গোদোহনরতা মার্সি হার্ভি ও তার ভাই গাব্রিএল হার্ভির বিষয়েই লিখেছেন। তবু মাঝে মাঝে অতিতীক্ষ্নতা, সৌকুমার্য্যের ত্রুটি ও বিস্তার অন্ধতা থাকলেও শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ প্রকারান্তরে তা ব'লে কিছু অন্যায় বা অশোভন বলেন নি। মারি বা পাউণ্ড্‌ জাতীয় লেখকের সমালোচনার পরে এই স্বচ্ছন্দ চিত্রবহুল রচনাপাঠে স্বস্তি পাওয়া যায়। এবং ম্যাক্‌কার্থির Criticism-ও এই জন্য ভালোই লাগল। অবশ্য শ্রীমতী উল্‌ফের ও ম্যাক্‌কার্থির সমালোচনা ঠিক একজাতের নয়। যথা, প্রুস্তের উপরে ম্যাক্‌কার্থির সারগর্ভ উপাদেয় প্রবন্ধটীতে লেখক এক জায়গায় বলেছেন, Personally, nothing would induce me to live in Proust's world . . . .

How I should have missed in him, as a man, contact with the common massive satisfactions of life, and the steadiness of fundamental good nature! শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ তাঁর ROBINSON CRUSOE-তে প্রসঙ্গত লিখেছেন—"Thus when JUDE THE OBSCURE appears or a new volume of Proust, the newspapers are flooded with protests. Major Gibbs of Cheltenham would put a bullet through his head to-morrow if life were as Hardy paints it; Miss Wiggs of Hampstead must protest that though Proust's art is wonderful, the real world, she thanks God, has nothing in common with the distortions of a perverted Frenchman.

এবং সেই কারণেই বোধহয় ম্যাক্‌কার্থির John Donne ও শ্রীমতী উল্‌ফের Donne After Three Centuries দুটীই ভালো এবং স্বভাবতই অনেকটা এক-রকম হলেও বিভিন্ন। দু একটী কথাই শুধু ধরা যাক্‌। গসের নাম ক'রে ম্যাক্‌কার্থি বলেছেন যে ডানের মন সিড্‌নি রলে জাতের এলিজাবিথানের। এবং শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ বলেছেন যে এলিজাবিথানদের বিশেষত্বগুলির কিছুই ডানের স্বভাবে ছিল না। এলিজাবিথানদের বাক্যবহুলতা, বিস্তৃতির ঝোঁক, নাটকীয় ভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমতী উল্‌ফের কথাগুলি শ্রোতব্য। এবং তাঁর মতে ডান্‌ ঠিক এর বিপরীত। সেইজন্যই ম্যাক্‌কার্থি ডানের Anniversaries লেখার জন্য লজ্জিত বোধ করেন ও শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ লেখেন—

True, the rocket bursts; it scatters in a shower of minute, separate particles—curious speculations, wiredrawn comparisons, obsolete erudition; but winged by the double pressure of mind and heart, of reason and imagination, it soars far and fast into a finer air. . .

ইত্যাদি। কিম্বা ম্যাক্‌কার্থির ধর্ম্মকবিতা সম্বন্ধে একটীমাত্র কথাই ধরা যাক্‌—ডানের ধর্ম্মকবিতাগুলির মধ্যে যেটা তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব সে হলো the monotony of the experience expressed। শ্রীমতী উল্‌ফের কাছে এই অভিজ্ঞতা full of contraries and agonies এবং সেইজন্য এই কবিতাগুলি are poems of climbing and falling, of incongruous clamours and solemnities ইত্যাদি। এবং সেইজন্যই এই কবিতাগুলির ডাকে আমরা

সাড়া দিই—একঘেয়ে ঘুমপাড়ানির সুর এতে জাগে না, জাগে, আগ্রহ ও বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা ও কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা।

তাছাড়া এ দুই বইয়ের রচানারীতিতেও প্রভেদ আছে।

শ্রীবিষ্ণু দে

The Revolt of the Masses—By Jose Ortega y Gasset, (George Allen & Unwin Ltd.).

গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য নিবন্ধ পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের সারভূত বক্তব্য তাঁহারই ভাষায় যথাসম্ভব উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতের শাসক কে?"—এই অধ্যায়ের সূচনাতেই গ্রন্থকার তাঁহার ধারণা স্বল্পাক্ষরে ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইউরোপীয় সভ্যতা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই জনসংঘের বিদ্রোহ সংঘটন করায়। অপর দিকে ইহারই আর এক ভয়াবহ পরিণতি দেখিতে পাই মানবচিত্তের আমূল নৈতিক অবনতিতে। (পৃঃ ১৩৭)

আজিকার দিনে সমস্ত জগদ্ব্যাপী একটা গভীর নৈতিক অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণের এক অত্যুগ্র বিদ্রোহিতাই তাহার অন্যতম প্রকাশ এবং নৈতিক অবনতি হইতেই এই জগদ্ব্যাপী অবনতির উৎপত্তি। ইউরোপের অবনতির কারণ অবশ্য একাধিক। ইহার একটি মুখ্য কারণ এই যে ইউরোপের আত্মকর্তৃত্ব ও অবশিষ্ট জগতের উপর প্রভুত্ব আজ তাহার অধিকারচ্যুত। ইউরোপের স্বীয় প্রভুত্বে অনাস্থা জন্মিয়াছে এবং জগতের অবশিষ্টাংশেরও কোন ধারণাই নাই যে ইউরোপ তাহায় শাসক। পরম্পরাগত একাধিপত্য আজ ছত্রভঙ্গাবস্থায় পর্য্যবসিত।

সর্ব্বত্রই কি রকম একটা অনাস্থা ও অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কি বা কাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম চালিত হইবে তাহা কেহ জানে না। এজন্য মানুষের জীবন যাত্রা 'দিনগত পাপক্ষয়ে'র মতই হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত জগতেই যে একটা অধ্রুব চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা কোনও সৃষ্টির সূচনা নয়, তাহা আত্মপ্রবঞ্চনা বা মায়ামুগ্ধতারই নামান্তর। এ অবস্থায় যাহা আমাদের নিকট অনিবার্য্য বা অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বন্ধের মত আসে তাহাই আমাদের একমাত্র স্থির প্রতিষ্ঠাভূমি ও আশ্রয়। পক্ষান্তরে যাহা কিছু আমার ইচ্ছামত গ্রহণ বা বিসর্জ্জন করিতে পারি তাহা আমাদের জীবনকে মায়াজালে আবৃত করিয়া রাখিবে। পুরুষও যেমন আজ বুঝিয়া উঠিতে পারে না কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া বা কোন প্রতিষ্ঠানের সেবায় তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে, নারীও সেরূপ জানেনা কোন্ শ্রেণীর পুরুষ তাহার পক্ষে একান্ত কাম্য।

কোন এক বৃহৎ ঐক্যসাধনায় আত্মোৎসর্গ না করিলে ইউরোপীয় মানব বাঁচিতে পারে না। যখন এ বিষয়ে তাহার কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তখনই তাহার

অধঃপতন আরম্ভ হয় ও তাহার আত্মিক শক্তি অন্তর্হিত হয়। আমাদের চক্ষের সম্মুখেই তাহার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। যে সব মানবসমষ্টি আজ জগতের বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহারা প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রম বিবর্ত্তনের প্রভাবে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও কোন উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এই জাতিগুলি ইউরোপের পক্ষে কেবল অতীতের দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়া ইহার ক্রমবিবর্ত্তনের গতিরোধ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন জাতিসংঘের এই সংহত অবস্থা বিশ্বমানবের শ্বাসরোধ করিয়াছে। তাই আজ মানব এই অচলায়তনের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতে কহিতেছে। ইহাতেই তার মুক্তি, ইহাতেই তাহার জীবন। পূর্ব্বে যাহা মুক্ত আকাশের তলে নিত্য বিহার ছিল আজ তাহা নিতান্তই প্রাদেশিক, অবরুদ্ধ আকাশেরই প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সকলেই জীবনের এক নূতন প্রেরণা আবিষ্কারে সচেষ্ট। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে এখনও তাহাই হইতেছে—অর্থাৎ যে-বিষপ্রয়োগে এই অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহাই পূর্ণমাত্রায় সেবন করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে অনেকে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ। ইহাই বিনাশের সুনিশ্চিত পথ। দীপে নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ বহুক্ষণব্যাপী আলোকের উল্লাস হয়, মরণোন্মুখ প্রাণীর শেষ প্রশ্বাস যেরূপ গভীর হয়, ইহাও তদনুরূপ। এই যে বর্ত্তমানকালে সমরনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে জাত্যভিমানের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হইতেছে, তাহা ইহারই অন্তিম-প্রয়াণ সূচিত করে।

এই সমস্ত জাত্যভিমান বা জাতীয়তাবাদ নির্দ্দেশশূন্য সুড়ঙ্গের মত। যে শক্তির প্রভাবে মানবসমষ্টি জাতিতে সংহত হয়, জাত্যভিমান সেই শক্তিরই প্রতিকূলাচরণ করে। সেই মৌলিক শক্তি সংযোজনপর, জাত্যভিমানমূলক শক্তি বর্জ্জনপর। জাতি-গঠনের এক অবস্থায় জাতীয়তাব্যঞ্জক শক্তির একটা মূল্য আছে এবং তাহা উচ্চ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইউরোপে এখন সমস্তই সুগঠিত বা অতিমাত্রায় সুসংবদ্ধ। সেজন্য জাত্যভিমানের প্রয়োজন আর নাই। ইহা এখন উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে একটি বায়ু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া সার্থকতালাভ না করায় ইহা শুধু প্রবঞ্চনা হইয়া উঠিয়াছে। আদিম অসভ্য অবস্থার সহিত ইহার যে মূলগত সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ ক্রমাভিব্যক্তিশক্তির বিরোধী।

গ্রন্থকারের নিবন্ধের সহিত আমাদের ভাবগত ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক পুস্তকখানি গভীর ও মৌলিকচিন্তাশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীসরোজকুমার দাস

If the Blind Lead—(An Essay for the Post-Democratic Age); A Realist Surveys Modern Culture, (Benn).

The Coming Struggle for Power—JOHN STRACHEY, (Gollancz).

বর্ত্তমান সভ্যতার এখন সঙ্কটময় অবস্থা। তাকে বাঁচাতে হলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। কিন্তু পরিবর্ত্তনের পর সভ্যতা কি আকার নেবে তা নির্ভর করছে সমাজ যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে তার ওপর। একদল বলছেন, শিক্ষার দ্বারা সমাজের স্তরকে উন্নত করতে হবে; অন্যদল বলছেন, স্তর-বিভাগের জন্যই সর্ব্বনাশ হয়েছে, অতএব বিপ্লবের প্রয়োজন। প্রথম দলের একজন প্রতিনিধি পিঙ্ক্—যাঁর অন্য একটি লম্বা প্রবন্ধ, A Realist Looks at Democracy, কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় দলের প্রতিনিধি, জন্ ষ্ট্রেচী যাঁর মতামত শ্রমিকদলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। দুজনই সভ্যতার হিতকামী, দুজনই সাধারণতন্ত্রের দোষ সম্বন্ধে সচেতন। এ ছাড়া তাঁদের মতে অন্য কোন মিল নেই। সভ্যতার দুর্দ্দিনে দুই শ্রেণীর এই দুইজন সত্যসন্ধিৎসু লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

পিঙ্ক্ বলেন—সভ্যতা কালাতীত নয়, কাল-সাপেক্ষ, বর্ত্তমান যুগের চিহ্ন হল বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য; অতএব বর্ত্তমান সমাজের যে সব আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রতিকূল সেগুলিকে বর্জ্জন করতে হবে। কিন্তু বর্জ্জন করা শিক্ষিতব্যক্তির পক্ষেও শক্ত, কারণ বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বাধাবিপত্তি সৃজন করে। বিশেষতঃ, গ্রীস, রোম, ও মধ্যযুগের অন্ধসংস্কার এবং পুরাতন অনুষ্ঠান আমাদেরকে বর্ত্তমানের উপযোগী সভ্যতা সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। এবং সেজন্য ইতিহাসশিক্ষাই দায়ী। ইতিহাস হয় বিজ্ঞান, না হয় কল্পনা-বিলাস। ইতিহাস বিজ্ঞান হতেই পারে না, অতএব গলস্ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইট সাগা' না প… ভিক্টোরীয়ান যুগের মোটা মোটা ইতিহাস পড়া নিরর্থক। ইতিহাস আমাদের এমন কোন্ মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিতে পারে যার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি? ঐতিহাসিকদের মধ্যেই মতের কোন ঐক্য নেই, অতএব তাঁদের কোন মতামতই ভবিষ্যৎ সমাজের উপকারে আসতে পারে না।

ইতিহাসের মধ্যে যে মূলতথ্য সমাজের কার্য্য-নিয়ামক বিধি বেঁধে দিতে পারে, সেটি ঐতিহাসিকের সংস্কার নয়, সেটি হল যুগ-ধর্ম্ম। যুগ-ধর্ম্ম কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়-বস্তু নয়। বিষয়-বস্তুটি ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সাহিত্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে ঐতিহাসিক মনোভাবই প্রকৃত রস-চর্চ্চার অন্তরায় হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার বেলাও তাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সামাজিক হিতসাধন থেকে বি…ত। সেখানে বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে স্বাধী… ও ভদ্রতা লোপ পাচ্ছে—ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজমের পীড়নে। তাই পিঙ্ক্ সাহেব বলছেন—শিক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নতুনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়কে ঢেলে সাজতে হবে। তিনি চান প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পড়ুন, কারণ এই বিদ্যাগুলিই যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ-সাধন করতে সমর্থ। এক কথায়, প্রত্যেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের এবং এই কালের উপযুক্ত সমাজ সৃষ্টি করার সুযোগ প্রস্তুত করুক। শিক্ষার বিষয়গুলিকে

যুগধর্ম্মের উপযুক্ত করে সাজাবার পর রিসার্চ্চের কথা ওঠে। এখনকার যে রিসার্চ্চ হচ্ছে সে সব উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো। তাদেরকে সামাজিক কল্যাণের দ্বারা গ্রথিত করতে হলে একটি দেশ-জোড়া শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা চাই। তার পর আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা-সমিতির প্রয়োজন। পিঙ্কের মতে, শিক্ষার দ্বারা সভ্যতাকে প্ল্যানের মধ্যে আনিতে হবে। অবশ্য প্ল্যান তৈরী করবেন উচ্চশিক্ষিতেরা, যাঁদের সংখ্যা অল্প, কারণ যে-সে লোক শিক্ষিত হতেই পারেনা, সাধারণ-তন্ত্রবাদী জন-সাধারণ যাই বলুক না কেন। সভ্যতা-উদ্ধারের ভার রাম-শ্যামের হস্তে ন্যস্ত করে ওয়েলসের কোন বংশধরই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—শ্রেণীগত আভিজাত্যে এবং উচ্চশিক্ষার অভিমানে আঘাত লাগে।

এ সব কথা আমাদের নিতান্তই মনোমত। জাতি-ভেদ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সঙ্কুল, সাধারণ-তন্ত্রে অনভ্যস্ত দেশে পিঙ্কের মন্তব্য সোজাসুজি মরমে পৌছবে। তাঁর লেখা আবার বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত। কিন্তু গম্ভীরভাবে পিঙ্কের মন্তব্য আলোচনা করলে মনে হয় (সে আলোচনায় ষ্ট্রেচীর বইখানি খুব সাহায্য করবে) যে কুলীনের দ্বারা সভ্যতার কুল ও শীল রাখা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। তাঁদের দ্বারা সভ্যতার পঙ্কোদ্ধারও হবে না, নতুন সভ্যতার মৃত্তিকা-খননও হবে না। তাঁদের বংশ, বুদ্ধি ও শিক্ষার গৌরব সমাজের একটি শক্তিশালী শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। স্ত্রৈণ স্বামী যেমন নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করার জন্য উচৈচস্বরে নিজের পৌরুষ প্রকাশ করেন, তেমনিভাবে এই কুলীন-সম্প্রদায় তাঁদের শ্রেণীগত কুসংস্কার ও ভয়-ভাবনাগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্যই উচ্চশিক্ষা, বুদ্ধি ও সুপ্রজননের জয়গান করেন। যাঁরা পঙ্কিল করেন কিম্বা পঙ্কজের সামিল তাঁদের হাতে পঙ্কোদ্ধারের ভার দেওয়া মূর্খতা। আসল কথা এই—যে সামাজিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আশ্রয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত হয়েছেন। সেই জন্য মুখে হা হুতাশ করাই তাঁদের শোভা পায়, সভ্যতা রক্ষা করা, নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করা, সমাজ সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যার নিরাকরণ করা তাঁদের সাধ্যাতীত। অন্তত পশ্চিম য়ূরোপে ও আমেরিকায়। সে দেশে তাঁদের অপারগতা যুগধর্ম্মেরই চিহ্ন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক নিয়তির, অনিচ্ছার নয়। এ দেশে হয়ত তাঁদের কাজ এখনও বাকী রয়েছে। ষ্ট্রেচী এই কথা বলছেন, ইতিহাসের ধর্ম্ম ও রীতির নজীরে। পিঙ্ক ইতিহাস মানেন না, সেই জন্য বিশ্ব-নাট্যের কোন ভূমিকায় কুলীন সম্প্রদায় অভিনয় করছেন কিম্বা ভারতবর্ষের মতন দেশে করতে পারেন তিনি বুঝতেই পারেন নি। অথচ পিঙ্ক সাহেব যুগ-ধর্ম্ম মানেন! যুগধর্ম্মের একটা পারম্পর্য্য আছে, তার কারণ আবিষ্কার করাই ইতিহাসের প্রধান কাজ। সেই কারণের ফলাফল ও অর্থ নিরূপণ করাই প্রত্যেক সমাজ-তাত্ত্বিকের কাজ। যে কাজ পিঙ্ক করতে পারেননি সে কাজ ষ্ট্রেচী সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।

যুগধর্ম্ম কথাটি ধরতাই বুলি হয়ে উঠেছে। তার প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝবার জন্য ষ্ট্রেচীর বইখনি পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। এমন বই এক যুগে একখানা লেখা হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলধারা ও তথ্যটি এই বইখানিতে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, লেখকের জানিত ইংরেজীতে লেখা আধুনিক অন্য কোন বইতে অমনভাবে হয়নি। ষ্ট্রেচীর মতে এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল, উপনিবেশে ধনতন্ত্রের বিস্তার, এবং বিস্তারের কারণ, অ-নিয়ন্ত্রিত বাজারের সন্ধান। দেশের ধনী-সম্প্রদায় স্বদেশী বাজারের অবস্থা দেখে শুনে উপলব্ধি

করেছেন যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফা কমবে বই বাড়বে না। সেজন্য তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করতে মনস্থ করেছেন। এক পন্থা হল, বৃহৎ সমবায়ের রচিত একচেটিয়া-ব্যবসার দ্বারা উৎপাদনের মাত্রা কমান, অন্য পন্থা হল বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও পরিদর্শন-কার্য্যের অযথা অপব্যয়কে লঘু করা। মামুলী অর্থশাস্ত্রের monopoly, crisis ও planned economyর মতগুলি অনুশীলন ক'রে ষ্ট্রেচী দেখাচ্ছেন যে তার মধ্যে সার-পদার্থ কিছুই নেই, আছে শুধু ধনতন্ত্রকে যা করে হোক রক্ষা করবার নিষ্ফল প্রয়াস, আছে শুধু ধনতন্ত্রে পুষ্ট অধ্যাপকদের ধনতন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ষ্ট্রেচীর মতে কেন্‌স্‌ ও স্লেটার প্রবর্ত্তিত planned economy এই অধোগামী ধন-তন্ত্রকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। ইতিহাস, অর্থাৎ যুগ-পরম্পরার রীতি অনুসারেই উপনিবেশের মধ্য দিয়ে ধন-তন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বুদ্ধিজীবীর কর্ত্তব্য হল লেবার-পার্টির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের হাতে দেওয়া, সেই সঙ্গে উপনিবেশ-গুলিকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে মুক্তি দেওয়া। ষ্ট্রেচী যুগধর্ম্মের প্রকৃতি ও ইতিহাসের রীতিনীতি বুঝে শ্রমিকতন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং পিঙ্ক্‌ সাহেব ইতিহাসের মর্ম্ম না গ্রহণ করে যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে বুদ্ধিজীবীর দ্বারা সভ্যতা-সৃষ্টির প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে ষ্ট্রেচীর অন্তত ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য নামের তিনটি অধ্যায় পড়তে অনুরোধ করছি। ধর্ম্ম কেন এখন য়ুরোপ থেকে লোপ পেয়েছে, বিজ্ঞান কেন সেখানে আর অগ্রসর হতে না পেরে মিথ্যাদর্শনের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছে, বর্ত্তমান সাহিত্যে কেন এমন ভীষণ নৈরাশ্যের ছাপ পড়েছে জানবার জন্য বইখানি পড়া আবশ্যক। ষ্ট্রেচীর মতে কারণ হল এই যে সমাজের বর্ত্তমান গঠনে সব মূল্যের মাপকাঠি হয়েছে টাকা—তাই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজ এমন শ্রেণীর থাকবে যাঁদের সকল কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি করা। যেদিন মুনাফার বদলে কল্যাণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে সেদিন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সুদিন আসবে। যতদিন শ্রেণীবিভাগ থাকবে ততদিন কল্যাণ-চিন্তাও অসম্ভব, ততদিন ধর্ম্ম হবে সামাজিক ক্ষতের প্রলেপ মাত্র, বিজ্ঞান হবে যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ, ও সাহিত্য হবে নিরর্থক বুদ্ধিবিলাস। ষ্ট্রেচীর বই মুখ্যত ইংরেজের জন্য লেখা হলেও, তার মূল কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভারতবাসীর লাভ বই ক্ষতি হবে না। এ ধরণের নির্ভীক বই এ দেশে লেখা সম্ভব নয়—এইটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ। বাংলা দেশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর বইটা পড়া উচিত বললে যথেষ্ট বলা হলো না। তাঁরা যদি ভাল করে এই বইটা পড়েন তা হলেই বুঝব যে ভবিষ্যৎ সমাজ রচনা করবার জন্য তাঁরা খানিকটা প্রস্তুত হয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিষয়ক এত উৎকৃষ্ট বই সচরাচর চোখে পড়ে না।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।